পিএইচ.ডি. গবেষণার শিরোনাম

মাহমুদ দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি-চেতনা ও গণপ্রতিরোধের স্বরূপ

(Representation of National Liberation-Consciousness and Mass Resistance of Palestine in the Poetry of Mahmoud Darwish)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক	গবেষক
অধ্যাপক ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।	**শাহাদাৎ হোসেন** **পিএইচ.ডি. গবেষক** শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৬-২০১৭, রেজিঃ ১৮৯(পুনঃ) আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

জুন ২০২৩

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

Dr. A B M Siddiqur Rahman Nizami
Professor & Former Chairman
Department of Arabic
Former Director, Centre for Arabic Teaching,
Training & Research (CATTR)
University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh

الدكتور إي بي إيم صديق الرحمن نظامي
أستاذ ورئيس سابق، قسم العربية
مدير سابق، المركز لتعليم العربية والتدريب والبحوث
جامعة داكا، داكا-١٠٠٠، بنغلاديش

Ref. No. .... Date ....

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব শাহাদাৎ হোসেন কর্তৃক (রেজিঃ ১৮৯, শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৬-২০১৭ (পুন:)) পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **মাহমুদ দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি-চেতনা ও গণপ্রতিরোধের স্বরূপ (Representation of National Liberation-Consciousness and Mass Resistance of Palestine in the Poetry of Mahmoud Darwish)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি (থিসিস) আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব এবং একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের (থিসিসের) সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্যকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এই অভিসন্দর্ভটি (থিসিস) আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

৭/৬/২৩

(অধ্যাপক ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Tel: +88-02-9661920-73 Ext: 6100, 6101 Mob: +88-01552428610 E-mail: abmsr66@gmail.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **মাহমুদ দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি-চেতনা ও গণপ্রতিরোধের স্বরূপ** (Representation of National Liberation-Consciousness and Mass Resistance of Palestine in the Poetry of Mahmoud Darwish) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ (থিসিস)টি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক **অধ্যাপক ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে** কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটির (থিসিস) সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি এই মর্মে আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমার দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভে (থিসিসে) কোনো Plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের বলে চালানো) নেই।

শাহাদাৎ হোসেন
৭/৮/২৩

(শাহাদাৎ হোসেন)
পিএইচ.ডি. গবেষক
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৬-২০১৭, রেজিঃ ১৮৯ (পুনঃ)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা এবং শুকরিয়া মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। অসংখ্য দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স.), তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর প্রিয় সাহাবীদের প্রতি।

আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা থাকবে আমার গবেষণাকর্মের সম্মানীয় তত্ত্বাবধায়ক ও পরম শ্রদ্ধেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি। যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সবসময় গবেষণার কাজে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছেন। গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ, সিনোপসিস, সেমিনারের প্রবন্ধ উপস্থাপন, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক বিন্যাসসহ একটি মানসম্পন্ন গবেষণা সম্পন্ন করতে তিনি আন্তরিকভাবে সকল ধরনের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তার মূল্যবান সময় দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত পুরো অভিসন্দর্ভটি ভালোভাবে দেখে পাঠ করে আমাকে তার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক স্যারের প্রতি। স্যার সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, আমার গবেষণার ভুলত্রুটি ধরিয়ে শুধরে দিয়েছেন, আন্তরিকভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে একটি সুন্দর, মানসম্পন্ন গবেষণা সম্পন্ন করতে পারি।

কৃতজ্ঞতা জানাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মো. আব্দুল কাদির স্যারসহ সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, যাঁদের সঠিক পরামর্শ ও উৎসাহের কারণে আমি এই গবেষণাকর্ম সুন্দরভাবে শেষ করার সুযোগ পেয়েছি।

এছাড়া আরবী বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণা-প্রবন্ধের জন্য সেমিনার আয়োজনের কাজসহ বিভিন্ন সময় তাদের সহযোগিতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আমার এই গবেষণা শুরু থেকে শেষপর্যন্ত আমার প্রিয় সহধর্মীনীর সহযোগিতার কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবেনা। গবেষণার কারণে তাকে সীমাহীন কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তার অসম্ভব ধৈর্য্যসহ পাশে না থাকলে আমার এই গবেষণাকর্ম শেষ করা প্রায় কঠিন হয়ে যেতো।

আমি এই গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিসহ অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া বাংলাদেশের ভিতর ও বাহির থেকে বেশ কয়েকজন বন্ধু ও সজ্জন মানুষ বই পাঠিয়ে, গবেষণার বানান সংশোধন করে এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে, আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দোয়া ও প্রার্থনা করি, আমাদের সকলের সহযোগিতা তিনি যেন কবুল করেন এবং উত্তম বিনিময় দান করেন।

গবেষক।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রত্যয়ণ পত্র	
	ঘোষণা পত্র	
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	

Abstract	১
ভূমিকা	৭
প্রথম অধ্যায়	২৭
ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং মাহমুদ দারভীশ	
১.১: ফিলিস্তিন: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	২৮
১.২: ভৌগলিক অবস্থান ও নাম	২৮
১.৩: প্রথম বসতি বিতর্ক: আরব না ইজরাইল?	২৯
১.৪: ফিলিস্তিন: হযরত ইব্রাহীম (আ) ও ইহুদিদের বিস্তার	৩২
১.৫: ফিলিস্তিন: মিশরীয় শাসন	৩৩
১.৬: ফিলিস্তিন: আশিরীয় শাসন	৩৪
১.৭: নেবুখাজ নাছর (নেবুচাদনেজার) এবং বেবিলন	৩৪
১.৮: ফিলিস্তিন: পারস্য শাসন	৩৪
১.৯: ফিলিস্তিন: গ্রিক ও রোমান শাসন	৩৫
১.১০: ফিলিস্তিন: হযরত ঈসা ও খ্রিস্টানদের উত্থান	৩৫
১.১১: ফিলিস্তিন: ইসলাম, আরব ও উসমানি শাসন	৩৫
১.১২: ফিলিস্তিন: ব্রিটিশ ও জায়োনিস্ট উপনিবেশ	৩৭
১.১৩: জায়োনিস্ট উত্থানের ঐতিহাসিক পটভূমি	৩৮
মাহমুদ দারভীশ: জীবন ও কর্মের সারসংক্ষেপ	৪২
১.২.১: মাহমুদ দারভীশ, সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৪২
১.২.২: শিক্ষা	৪৪
১.২.৩: কবিতা	৪৫
১.২.৪: রাজনীতি, পেশা ও কাব্য তৎপরতা	৪৭
১.২.৫: বিয়ে, সম্পর্ক এবং মৃত্যু	৫০
১.২.৬: রচনাবলী	৫১

১.২.৭: কবিতা ৫১
১.২.৮: গদ্য ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাকবা: ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়, প্রতিরোধ-লড়াই-সংগ্রাম ও মুক্তির উৎস **৫৫**

২.১: ভূমিকা ৫৫
২.২: নাকবা পরিচয় এবং উপস্থাপন সংক্রান্ত জটিলতা ৫৬
২.৩: গোড়ার ইতিহাস সন্ধান: উপনিবেশায়ন ও জায়োনিজম ৫৯
২.৪: নাকবা থেকে আত্মপরিচয় ৬৩
২.৫: নাকবা-উত্তর সামাজিক পরিস্থিতি ৬৪
২.৬: নাকবা: একটি চিন্তা ও ইতিহাস ৬৬
২.৭: নাকবার বিবিধ ভাষ্য, জাতীয় চিন্তা ও সাহিত্য ৭২
২.৮: নাকবা-উত্তর ফিলিস্তিনের আরবী সাহিত্য ৭৯
২.৯: দারভীশের কবিতা এবং নাকবা ৯৭
২.১০: নাকবা: উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি ১০৯
২.১১: নাকবা: নতুন সম্ভাবনা এবং বেরিয়ে আসার প্রেক্ষিত ১১১

তৃতীয় অধ্যায়
ফিলিস্তিন, জাতীয় পরিচয়, কর্তাসত্তা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত **১১৮**

৩.১: ব্যক্তি জাতিয়তা ও সমষ্টির এজেন্সি নির্মাণ ১২০
৩.২: 'আমি, 'অপর' এবং আত্মপরিচয় ১৩০
৩.৩: পরিচয়, ভাষা ও পরমার্থিকতা ১৪৬
৩.৪: ভাষা ও আত্মপরিচয় ১৪৯
৩.৫: নাম, পরিচয়, ভাষা ও চিন্তার জগৎ ১৬১

আত্মপরিচয়: ইতিহাস ও উত্তর-উপনিবেশিক প্রেক্ষিত **১৭৫**
৩.২.১: জাতীয় আত্মপরিচয় ১৭৫
৩.২.২: আরব পরিচয় ১৮১
৩.২.৩: উপহাস কিংবা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গি ১৮১
৩.২.৪: জনসংখ্যাতাত্ত্বিক হুমকি (ডেমোগ্রাফিক্যাল থ্রেট) ১৮১
৩.২.৫: স্বাধীন সত্তার উপস্থাপন ১৮২
৩.২.৬: সাধারণ জনমানুষের জীবন যাপনের বয়ান ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৭: শ্রমিকতা ১৮২
৩.২.৮: দ্রোহ ১৮৩

আত্মপরিচয়: প্রেক্ষিত, ঐতিহাসিকতা ও ঐতিহাসিক কর্তাসত্তা ১৯২
৩.৩.১: আত্মপরিচয়: স্থিতি এবং ক্রমবিকাশ ১৯৯
৩.৩.২: আত্মপরিচয়: আরবীয় সত্তা এবং আরব জাতীয়তাবাদ ২০০

আত্মপরিচয়: ফিলিস্তিন, মাতৃভূমি, জীবন ও অস্তিত্বের প্রশ ২০৪
৩.৪.১: নির্যাতন-জুলুম ২০৯
৩.৪.২: দু:খ-ব্যথা (ট্রমা) ২১১
৩.৪.৩: জীবন জীবিকা ২১৪
৩.৪.৪: দেশপ্রেম ২১৯
৩.৪.৫: নারীমানস ২২৪

চতুর্থ অধ্যায়
ফিলিস্তিন: জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম, ইতিহাস এবং বিবিধ প্রেক্ষিত ২৩৭

৪.১: মুক্তির ধারণা, ইতিহাস, জাতীয় মুক্তি এবং ফিলিস্তিন ২৩৮
৪.২: স্বাধীনতা ও মুক্তি: কর্তাভাব ও চৈতন্য ২৩৯
৪.৩: শান্তি কিংবা মুক্তি-সংগ্রাম: ইতিহাস ও মাহমুদ দারভীশ ২৪৮
৪.৪: অসলো চুক্তি: ফিলিস্তিনের বদলে যাওয়া এবং দারভীশের ভিন্ন অভিযাত্রা ২৮৭
৪.৫: মুক্তির সম্ভাবনা, চলমান বিতর্ক এবং দারভীশ ২৯৮
৪.৬: দ্ব্যর্থবোধকতা, দুধারী অবস্থা এবং নতুন সম্ভাবনা ৩০৩
৪.৭: স্বাধীনতা কিংবা মুক্তির রূপকল্প : চিন্তা, বিপ্লব ও রাষ্ট্র ৩১২
৪.৮: আদ দিকতেতুরা: একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য কিংবা রাষ্ট্রগঠনের নতুন বয়ান ও মুক্তির প্রস্তাবনা ৩৪৮
৪.৯: মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা: অন্যতরো অর্থের সন্ধানে ৩৭২

পঞ্চম অধ্যায়
প্রতিরোধ, কাব্য, ভাষা, রাজনীতি ও ফিলিস্তিন ৩৮০
৫.১: ফিলিস্তিন: প্রতিরোধের সত্য ও বিস্তার ৩৮২
৫.২: প্রতিরোধ এবং ইতিহাস ৩৮৪
৫.৩: প্রতিরোধ যখন গণপ্রতিরোধ ৩৯০

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪: দারভীশের প্রতিরোধ ৩৯৩
৫.৫: ছুমুদ এবং প্রতিরোধের নতুনমাত্রা ৪০৫
৫.৬: প্রতিরোধ: দ্রোহ, ক্ষোভ, গণপ্রতিরক্ষা ও গণচৈতন্য ৪১৬
৫.৭: ইজরাইলের সম্রাজ্যবাদ, বলপ্রয়োগের নীতি এবং ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ ৪২৮
৫.৮: জায়োনিস্ট মতাদর্শের স্বরূপ ৪৩২

ভাষা, কাব্য ও গুমানুষ ৪৩৪
৫.২.১: 'গণ' (Mass) কথাটি কেন জরুরি হয়ে ওঠে ৪৩৫
৫.২.২: বর্গ হিসেবে 'গণ' এবং গণমানুষের সত্যাসত্য ৪৪৭
৫.২.৩: অন্তর্পাঠ্যতা (ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি) ৪৫০
৫.২.৪: আন্তপাঠ: প্রাচীন নগর ও সভ্যতা ৪৫৫
৫.২.৫: আন্তপাঠ: সাহিত্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিত ৪৫৫
৫.২.৬: ইমরুল কায়েস ৪৫৬
৫.২.৭: লাবিদ ইবনে আবি রাবীআ ৪৫৯
৫.২.৮: তারফা বিন আল-আবদ ৪৬০
৫.২.৯: আবুল আলা আল মাআরি ৪৬৩
৫.২.১০: আবু তাম্মাম ৪৬৫
৫.২.১১: আল মুতানাব্বী ৪৬৭
৫.২.১২: আন্তপাঠ: ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তি ৪৭১
৫.২.১৩: গণ সম্পর্কে ৪৭২

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রতিরোধ, ভাষা, ইতিহাস, প্রকৃতি ও ধর্ম ৪৭৯

৬.১: প্রতিরোধ: প্রেক্ষিত সাবঅল্টার্ন ও বিউপনিবেশায়ন ৪৮০
৬.২: প্রকৃতি ও প্রতিরোধ ৪৯০
৬.৩: প্রতিরোধ: ভাষা, অর্থ এবং শরীর: নয়া ডিসকোর্সের সন্ধানে ৪৯৮
৬.৪: প্রতিরোধের ভাষা: গায়েব-হাজের কিংবা অনুপস্থিতির উপস্থিতি ৫০৭
৬.৫: প্রতিরোধ: প্রেক্ষিত ভাষা ও অবিনির্মাণ (ডিকনস্ট্রাকশন) ৫১২
৬.৬: ভাষা, অর্থ এবং শরীর: ক্ষমতা ও প্রতিরোধ ৫১৯
৬.৭: প্রতিরোধ: স্থান-কাল, ইতিহাস, স্মৃতি ও পুরাণ ৫২৪
৬.৮: ইতিহাসচিন্তা: বুদ্ধিবৃত্তির প্রেক্ষিতে ৫৩৮

৬.৯: পুরাণ এবং স্মৃতির প্রেক্ষিতে	**৫৪৫**
৬.১০: স্মৃতি, স্মৃতির তাড়া (হন্টলোজি), নির্বাসন ও প্রত্যাবর্তন	**৫৫২**
৬.১১: পুনরুদ্ধার ও ফিরিয়ে আনা	**৫৬০**
৬.১২: পুনর্পাঠ ও পুনরুদ্ধার	**৫৬০**
৬.১৩: নির্বাসন	**৫৬৩**
৬.১৪: পুরাণ ও রূপকথা: মৃত্যুর মোকাবেলা কিংবা প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিত	**৫৬৩**
৬.১৫: পরিবর্তন কিংবা সম্ভাবনার প্রেক্ষিত: কবিতায় ধর্মভাব ও তার যোগাযোগ	**৫৭৭**
৬.১৬: লিবারেশন থিওলজি কিংবা পলিটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি, ফিলিস্তিন এবং মাহমুদ দারভীশ	**৫৭৯**
উপসংহার	**৫৯১**
গ্রন্থপঞ্জী	**৫৯৩**

Abstract

The most immediate consequence of the Arab-Israeli war in the middle of the last century was the loss of Palestinian independence and sovereignty. In the 1948 war, the Nakba or the terrible catastrophe that occurred in the Israeli attack, the demand for freedom and liberation of Palestine was suppressed for some time. But gradually Palestine tried to get out of it. In the post-war situation of 1948, the Arab-Israeli conflict rose to the level at the root of which was the struggle for the establishment of an independent state and the right of self-determination of the Palestinians. In fact, it started with the movement to be freed from the British colonial rule, but in the post-Nakba situation, the freedom struggle of the Palestinians became more intense. For almost a century, Palestine has been struggling to stand up after suffering the worst injustice in human history. Their survival is through movement, struggle, resistance and self-sacrifice. Behind that struggle lies the inspiration, leadership, unparalleled courage of extraordinary people. That courage is in the body as well as in creativity, No nation can be integrated without its culture and intellectual structure. Because liberation is impossible without the desire for liberation. The architects of history organized this dream and desire for liberation. Poet Mahmoud Darwish was one of those who committed himself as the leading role in building the sense of identity, independence, liberation and national consciousness of Palestine.

Mahmoud Darwish is one of the few prominent people who worked tirelessly for the liberation of Palestine or the establishment of an independent state. Darvish was not only a poet, but with his language and intellectual wisdom he was able to create mass aspiration and mass consciousness to build an independent nation. He once drafted the declaration of independence of Palestine and earned the honor of writing his name as an immortal in the history of Palestine. Against the unjust aggression of Israel, not only domestically, but also internationally,

Darwish spread the Palestinian aspirations and dreams of liberation. Darwish turned the demand for independence of the freedom-loving Palestinians into a demand for rights. Darwish became the main voice of Palestine in bringing attention to Palestine among freedom-loving people all over the world. At one point, Mahmud Darwish was anointed as the national poet of Palestine.

In the history of modern nation-states, the concept of identity is a common theme in nation-building or national questions. But it can also be different depending on the country. In the process of Palestine's liberation struggle, the Nakba is integrally connected with the consciousness of nation building, national self-identity, etc. The Nakba has already gained universal acceptance as the fundamental basis of Palestinian nationhood. As a result, the Nakba topic is self-evident in any discussion on the Palestinian issue. The formation of the national mind of Palestine, national liberation, the historical consciousness of the mass resistance-struggle are all connected with the Nakba. The Nakba serves as a major element in the formation of Palestinian political hegemony as well as justification as a historical source of national identity construction.

In fact, the nature of Palestine's national liberation and mass resistance is highlighted here through the review of various issues. The nature of Mahmoud Darwish's position on the Palestinian question and the historical role of his poetry is assessed by reviewing mainly Nakba, colonialism, Israel-Zionism, national identity, nationalism, freedom-liberation, national liberation, resistance-mass resistance, language, history, mythology and religion etc.

Here the question of Palestinian self-identity arises in the frightening situation of Israel's Zionist invaders and racist character. Historically, identity politics has essentially become the politics of self-determination for Palestine. Arab-Palestinian-centric international politics and Zionist polarization have forced Palestinians to move towards building a political identity through anti-Israeli struggle.

Palestine had to fight against two colonial powers. British and Zionist colonial powers. The establishment of settler colonialism is related to the achievement of Israel's larger mission. Where Zionism and colonialism are just two sides of the same coin. As a result, Palestinians have no choice but to continue fighting for national liberation based on national identity against Israel's anti-humanitarian activities. The relationship between Mahmoud Darwish's thoughts and actions is fundamental and identical with the construction of this national self-identity of the Palestinians.

What entity can give form to the individual and national aspirations of a population of unexpressed or suppressed desires in the general? If that entity is a 'poet' then is he merely a poet? That is, what is the nature of the poet's role as a member of society? What is the responsibility of the poet? If you look for the secret of these questions in Mahmud Darvish in the context of Palestine, it can be seen that Darvish had to go a long way beyond the dividing line of the title of 'poet'. The complexities of conflicting politics had to be dealt with. From the Camp David Accords to the Oslo Accords—all national political compromises—he had to choose the independent path—the path that was essentially the path to human emancipation. He has to face many questions. War or peace? The poet had to point the way to the emancipation of the masses in the midst of conflicting conditions - peace and war. He had to navigate the complicated calculus of traditional politics so that the path of the common man became the poet's vow. He was not willing to see the liberation as a foreign power or anti-people power. So he had to go through the thicket of politics and reveal the truth frankly. So what does the concept of liberation actually mean in the context of Palestine historically? What does it mean to deal with or resist liberation? How does the thought of coping and liberation become related to the mass resistance and liberation of the entire population? At the same time, how does his language, poetic consciousness, sense of beauty and aesthetics relate to the whole human being, controlling the whole? Or prevails in the whole? How did his language become the language of oppressed

people? From what place of thought, philosophy and contemplation does his individuality become universal to a people? How did the language of liberation of the dynamic people in a living struggle develop in him?

Struggle and resistance are connected with everything, including the establishment of Palestinian national identity, independence and self-determination. Mass resistance is still widely accepted by Palestinians as a form of struggle for rights. The two intifadas are strong examples of this. For Mahmoud Darwish, resistance is not just a means of practical struggle. Resistance is also an important concept and philosophy. The presence of resistance in a variety of processes and structures, from practical politics to epistemology, spirituality, and intellectualism, is wide and varied. Three main areas of resistance can be identified in Darvish's poetry. First is the language. Second is history. Thirdly, religion.

Darbhish's language is the best example of how politics, language, poetry and power practice can spread from one point. The word language is used here because poetry and language are the same power for Darvish. In that sense, poetry and politics are the same body. Amputation is not possible. At the same time, the conventional definition of politics no longer exists here. Because poetry creates new possibilities, new conditions of meaning. So that the poet and the language of his poetry cannot be stuck in a fixed structure. The special meaning of creating a new history and the impression of exercising new power is created in the language of this poem. Where particular historical moments capture a new power to establish potential politics. If language cannot be seen in this way, resistance is not possible. On the other hand, language is closely related to human desire and language. The will of this living man is embodied in the struggle, so his language, his politics. Where politics and life as a whole are the same thing. In another sense, politics is the reality or nature of living people. Basically, politics, poetry, language and people are just different forms of the same meaning. Because to Darvish, poetry and language are not only the voice of the people but also the essence of human life and immortality.

Without reviewing the language question, Darvish feels, resistance is not possible. Since resistance is a widespread phenomenon. Therefore, resistance is actually the life of man. Human history and political and spiritual development can be accelerated through resistance.

An inquiry into the history of Palestine is important for reviewing the Palestinian crisis. Revisiting the history of Palestine becomes imperative with the development of the overall nation-building language, including the liberation of Palestine, the liberation struggle, mass resistance and the construction of their national identity. Because independent nationhood is a prerequisite for the formation of an independent state. The development of this independent nationhood is closely related to its correct sense of history and revision of history. History and language are among the issues Palestine has to deal with on the road to nationhood. Especially after the establishment of the state of Israel, the Zionist projects—the natural history of Palestine or the history that had been preserved in various ways for thousands of years—undertake intensively multifaceted work to change and reshape it. After the establishment of the State of Israel, the major challenge for the Zionist Israelis was to justify the occupation of other lands by foreigners. As a result, they have to accept the challenge of presenting evidence that the Jews are historically the oldest race and indigenous people in the Palestine region. That is why the Zionist intellectual community felt the responsibility to reconstruct the history of Palestine. On the other hand, such intellectual activities of the Zionists became a new battlefield for the Palestinians. Among the battlefields that lay before Palestine, as important as historical, archaeological and anthropological research is its geographical location.

When Darvish wants to uncover the truth of resistance through history, he also brings forward the commentary on how the method of historical analysis should be. Along with this is the concept of cultural and collective memory which leads his historical thought to more completeness. Since his poetry is not only the art of creating beauty, but also the relationship of knowledge and thought in the interflow of

poetry. Darvish developed a different language of resistance to such narratives of history, metaphors and symbols of mythology. On the other hand, Darwish is not willing to miss the role of religion in the struggle for the liberation of Palestine. He fully applied the role of religion in the question of political liberation and even in the question of spiritual liberation of the people. He deeply understood the cognitive kinship of religion with poetry. Darvish sees the historically revolutionary role of religion in the liberation of oppressed people. Darvish believes that it is impossible to avoid the enormous and fundamental contribution of religion to human emancipation. The necessity of religion for cultural and social reasons in the liberation struggle of the masses can make a language necessary. Darwish revives this wider participation of religion through his poetry. Liberation theology or other historical forms of religion are widely used in his poetry. However, Darvish did not accept any words or concepts that were perfected in a theological canonical framework. He was able to translate the religious figures, their sayings, sayings, behavior used historically and in folk media into the language of poetry. In short, Darvish developed a different language of resistance by enlivening the heroic deeds of the Prophets, religious symbols, religious buildings, religious proverbs, folklore, etc.

Resistance is a fundamental aspect of the ideas and elements that work in Darwish's poetry to unfold the form of Palestinian national liberation and mass resistance. However, the language question becomes the most fundamental area in Darvish's poetry. Language becomes a very deep and comprehensive concept and phenomenon in his poetry. In this study, it can be seen that somehow the topic of language has come up. With the question of language, Darwish was basically able to combine Palestine's self-identity, liberation, freedom, struggle-resistance, the absolute consciousness of human life, spirituality, etc. in one place. As a result, the language in Darwish's poetry becomes very deep and comprehensive. Language and resistance are major essential truths in Darwish's poetry.

Researcher

ভূমিকা

গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে সংঘটিত আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সবথেকে নগদ ফল ছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লুণ্ঠিত হয়ে যাওয়া। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে ইজরাইলের হামলা-আগ্রাসনে যে নাকবা বা ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে সেই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মুক্তির দাবি স্তিমিত হয়ে পড়েছিল কিছু সময়ের জন্য। তবে ক্রমেই ফিলিস্তিন তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে আরব-ইজরাইল সংঘাত ও দ্বন্দ্ব যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল তার মূলে ছিল ফিলিস্তিনীদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রাম। বস্তুত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে এর শুরু হলেও নাকবা-উত্তর পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরো তীব্রতরো হয়ে ওঠে। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে মানবেতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম অন্যায়, নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে ফিলিস্তিন মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টায় তৎপর রয়েছে। তাদের এ টিকে থাকা আন্দোলন, সংগ্রাম, প্রতিরোধ আর আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে। সে সংগ্রামের পিছনে রয়েছে অসাধারণ সব মানুষের অনুপ্রেরণা, নেতৃত্ব, অসম সাহস। সেই সাহস গায়ে-গতরে যেমন, তেমনি সৃজনশীলতায়। কোনো জাতিই তার সংস্কৃতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক মনোগঠন ছাড়া সংহত হতে পারেনা। কারণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তৈরি হওয়া ছাড়া মুক্তি অসম্ভব। এ মুক্তির স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে সংগঠিত করে তোলে ইতিহাসের স্থপতিরা। ফিলিস্তিনের পরিচয়, স্বাধীনতা, মুক্তি ও জাতীয়তাবোধ নির্মাণে যারা সবথেকে অগ্রণী ও প্রধান ভূমিকায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন কবি মাহমুদ দারভীশ ছিলেন অন্যতম।

ফিলিস্তিনের মুক্তি কিংবা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন নিরন্তর মাহমুদ দারভীশ সেসব অল্প কয়েকজন প্রধান মানুষদের একজন। দারভীশ শুধু কবিই ছিলেননা, তিনি তার ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা দিয়ে একটি স্বাধীন জাতি গড়ে তোলার জন্য গণআকাঙ্ক্ষা ও গণচৈতন্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। একসময় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে অমর হিসেবে নিজের নাম লিখার গৌরব অর্জন করেন তিনি। ইজরাইলের অন্যায় আগ্রাসনের বিপরীতে, শুধু অভ্যন্তরীণভাবেই নয় দারভীশ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ফিলিস্তিনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে দেন। মুক্তিকামী ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতার দাবিকে অধিকারের দাবিতে পরিণত করেন দারভীশ। সারা পৃথিবীর মুক্তিপ্রিয় মানুষের কাছে ফিলিস্তিনের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টিতে দারভীশ ফিলিস্তিনের প্রধান কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত হন মাহমুদ দারভীশ।

আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ইতিহাসে জাতিগঠন কিংবা জাতীয় প্রশ্নে পরিচয়ের ধারণা একটি সাধারণ বিষয়। কিন্তু দেশকাল জাতিভেদে এর ব্যাত্যয়ও হতে পারে। ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রামের প্রক্রিয়ায় জাতিগঠন, জাতীয় আত্মপরিচয় ইত্যাদি চেতনাজাত বিষয়ানুষঙ্গের সাথে সামগ্রিকভাবে জড়িয়ে আছে

নাকবা। নাকবা ফিলিস্তিনী জাতিসত্তার মৌলিক ভিত হিসেবে ইতিমধ্যে সর্বজনীনগ্রাহ্যতা লাভ করেছে। ফলে ফিলিস্তিন প্রশ্নে যেকোনো আলোচনায় নাকবা প্রসঙ্গ স্বতসিদ্ধ। ফিলিস্তিনের জাতীয় মানস গঠন, জাতীয় মুক্তি, গণপ্রতিরোধ-লড়াই সংগ্রামের ঐতিহাসিক চৈতন্যসহ সবকিছু জড়িয়ে আছে নাকবার সাথে। নাকবা ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক কর্তাসত্তা গঠনের প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে যেমন তেমনি জাতীয় পরিচয় নির্মাণের ঐতিহাসিক উৎস হিসেবে ন্যায্যতাও তৈরি করে নাকবা।

বস্তুত এখানে বিবিধ বিষয় পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনের জাতীয়মুক্তি ও গণপ্রতিরোধের স্বরূপ কী তা তুলে ধরা হয়। প্রধানত নাকবা, উপনিবেশিকতা, ইজরাইল-জায়োনিজম, জাতীয় পরিচয়, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা-মুক্তি, জাতীয়মুক্তি, প্রতিরোধ-গণপ্রতিরোধ, ভাষা, ইতিহাস, পুরাণ-রূপকথা ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিন প্রশ্নে মাহমুদ দারভীশের অবস্থান এবং ঐতিহাসিকভাবে তার কবিতার ভূমিকার স্বরূপ নির্ণয় করা হয়।

এখানে ইজরাইলের জায়োনবাদী হানাদার ও বর্ণবাদী চরিত্রের ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন উঠে আসে। ঐতিহাসিক দিক থেকে পরিচয়ের রাজনীতি ফিলিস্তিনের জন্য বস্তুত আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের রাজনীতি হয়ে ওঠে। আরব ও ফিলিস্তিনকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং জায়োনবাদী মেরুকরণের ফলে ফিলিস্তিনীদেরকে ইজরাইলবিরোধী লড়াই সংগ্রামের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক আত্মপরিচয় নির্মাণের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

ফিলিস্তিনকে দুধরনের উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হয়। ব্রিটিশ এবং জায়োনিস্ট উপনিবেশিক শক্তি। সেটলার কলোনিয়ালিজম প্রতিষ্ঠা ইজরাইলের বৃহত্তর মিশন সফলকরণের সাথে সম্পর্কিত। যেখানে জায়োনিজম ও কলোনিয়ালিজম একই মুদ্রার দুই পিঠ মাত্র। ফলে ইজরাইলের মানবতাবিরোধী তৎপরতার বিপরীতে জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে ফিলিনীদেরকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই। ফিলিস্তিনীদের এ জাতীয় আত্মপরিচয় নির্মাণের সাথে মাহমুদ দারভীশের চিন্তা ও কর্মের সম্পর্ক মৌলিক ও অভিন্ন।

সাধারণ্যের মধ্যে চাপা পড়ে থাকা কিংবা অবিকশিত বিশেষ বিশেষ অব্যক্ত ইচ্ছাগুলোকে কোন এমন সত্তা একটি জনগোষ্ঠীর নির্বিশেষ ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার আকার দিতে পারে? সেখানে সেই সত্তা যদি ‘কবি’ হন তাহলে তিনি কি নিছকই একজন কবি? অর্থাৎ সমাজের একজন সদস্য হিসেবে কবির ভূমিকার স্বরূপ কী? কবির দায় কী? ফিলিস্তিনের প্রেক্ষাপটে মাহমুদ দারভীশের মধ্যে এসব প্রশ্নের রহস্য তালাশ করলে দেখা যায়—এ ‘কবি’ ডাক নামের ভেদরেখা অতিক্রম করে দারভীশকে অনেক দূর যেতে হয়েছিল। তাকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়। যুদ্ধ নাকি শান্তি? শান্তি এবং যুদ্ধ—বিপরীতমুখী অবস্থার মধ্যেই কবিকে গণমানুষের মুক্তির পন্থা নির্দেশ করে যেতে হয়েছিল। তাকে প্রথাগত রাজনীতির জটিল হিসেব নিকেশ নির্ণয় করে যে পথ বেছে নিতে হয়েছিল তাই যেন সাধারণের পথ হয়ে ওঠে কবির ছিল এমন ব্রত। মুক্তিকে তিনি বিদেশী শক্তি কিংবা গণবিরোধী শক্তির

মানদণ্ডে দেখতে রাজি ছিলেননা কোনোভাবে। তাই তাকে রাজনীতির ঘোর ভেদ করে সত্য কী তা অকপটে উন্মোচন করে দিতে হয়েছে। ফলে ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের প্রেক্ষাপটে মুক্তির ধারণা আদতে কী অর্থ প্রকাশ করে? মুক্তির সাথে মোকাবেলা বা প্রতিরোধের অর্থ কী? এ মোকাবেলা ও মুক্তির চিন্তা কী করে সমগ্র জনগোষ্ঠীর গণপ্রতিরোধের সাথে, মুক্তির সাথে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে? একইসাথে তার ভাষা, কাব্যচৈতন্য, সৌন্দর্যবোধ ও নান্দনিকতা কিভাবে সমগ্র মানব সত্তার সাথে সম্পর্কিত হয়, সমগ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে? কিংবা সমগ্রের মধ্যে বিরাজ করে? কেমন করে তার ভাষা নিপীড়িত মানুষের ভাষা হয়ে ওঠে? কোন চিন্তা, দর্শন ও ভাবুকতার জায়গা থেকে তার ব্যক্তিসত্তা একটি জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বজনীন হয়ে ওঠে? একটি জীবন্ত লড়াই সংগ্রামে গতিশীল জনগোষ্ঠীর মুক্তির ভাষা তার মধ্যে কেমন করে গড়ে ওঠে দারভীশ তারই সাধ-সাধনায় নিমজ্জিত ছিলেন আমৃত্যু।

ফিলিস্তিনের জাতীয় পরিচয়, স্বাধীনতা-মুক্তি কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সবকিছুর সাথে জড়িয়ে আছে লড়াই ও প্রতিরোধ। অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের ধরন হিসাবে ফিলিস্তিনীদের কাছে গণপ্রতিরোধই এখনো পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে স্বীকৃত। দুটি ইন্তেফাদাই এর শক্তিশালী উদাহরণ হতে পারে। মাহমুদ দারভীশের কাছে প্রতিরোধ শুধু ব্যবহারিক লড়াই সংগ্রামের একটি উপায় মাত্র নয়। প্রতিরোধ এক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ও দর্শনও। প্রায়োগিক রাজনীতি থেকে শুরু করে জ্ঞান-দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানান প্রক্রিয়ায় ও কাঠামোয় প্রতিরোধের উপস্থিতি ব্যাপক ও বিচিত্র। প্রতিরোধের প্রধান তিনটি ক্ষেত্র নির্ণয় করা যায় দারভীশের কবিতায়। প্রথমত ভাষা। দ্বিতীয়ত ইতিহাস। তৃতীয়ত ধর্ম।

রাজনীতি, ভাষা, কাব্য ও ক্ষমতা চর্চা এক বিন্দু থেকে কী করে ছড়াতে পারে তার প্রকৃষ্ট নমুনা দারভীশের *ভাষা*। ভাষা কথাটি এখানে এ কারণে ব্যবহার করা হলো যে, কবিতা এবং ভাষা দারভীশের কাছে একই শক্তির নাম। সেই অর্থে কবিতা ও রাজনীতি একই দেহ। অঙ্গবিচ্ছেদ সম্ভব নয়। একইসাথে তাতে রাজনীতির প্রচলিত সংজ্ঞাও আর এখানে থাকে না। কারণ কবিতা নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে, নতুন অর্থের শর্ত তৈরি করে। যাতে স্থির কোনো কাঠামোতে আটকে থাকতে পারেনা কবি এবং তার কবিতার ভাষা। নতুন ইতিহাস তৈরির বিশেষ অর্থ আর নতুন ক্ষমতা চর্চার ছাপ এ কবিতার ভাষাতেই তৈরি হয়। যেখানে বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্ত ধারণ করে নতুন কোনো ক্ষমতা-সম্ভাব্য রাজনীতি কায়েম করতে পারে। ভাষাকে এভাবে দেখা সম্ভব না হলে প্রতিরোধও সম্ভব নয়। অপরদিকে ভাষার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে সপ্রাণ মানুষের ইচ্ছা ও ভাষার সম্পর্ক। এ সপ্রাণ মানুষের ইচ্ছা যে লড়াইয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে তাই তার ভাষা, তার রাজনীতি। যেখানে রাজনীতি এবং সমগ্র জীবন একই বস্তু। অন্য অর্থে রাজনীতিই সপ্রাণ মানুষের হকিকত বা স্বরূপ। মোটকথা রাজনীতি, কাব্য, ভাষা ও গণমানুষ একই অর্থের নানা রূপ মাত্র। কারণ দারভীশের কাছে কবিতা ও ভাষা শুধু জনমানুষের কণ্ঠস্বরই নয় বরং মানুষের পরম জীবনীশক্তি ও অমরত্বের মর্ম। ভাষা প্রশ্নের পর্যালোচনা ছাড়া দারভীশ মনে করেন, প্রতিরোধ সম্ভব নয়। প্রতিরোধ যেহেতু একটি ব্যাপকভিত্তিক

ঘটনা। সেকারণে প্রতিরোধই বস্তুত মানুষের জীবন। প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে মানুষের ঐতিহাসিকতা এবং রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ তরান্বিত করা সম্ভব।

ফিলিস্তিনের সংকট পর্যালোচনার জন্য ফিলিস্তিনের ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তিনের মুক্তি, মুক্তিসংগ্রাম, গণপ্রতিরোধ এবং তাদের জাতীয় পরিচয় নির্মাণসহ সামগ্রিক জাতিগঠনের ভাষা গড়ে তোলার সাথে ফিলিস্তিনের ইতিহাসে পুনর্দৃষ্টি জরুরি হয়ে ওঠে। কারণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের প্রাকশর্ত স্বাধীন জাতিসত্তা। এই স্বাধীন জাতিসত্তা গড়ে ওঠার সাথে রয়েছে তার সঠিক ইতিহাসবোধ এবং ইতিহাস পর্যালোচনার সম্পর্ক। ফিলিস্তিনকে একটি জাতিগঠনের পথে যেসব বিষয় মোকাবেলা করে যেতে হয় তার মধ্যে অন্যতম ইতিহাস ও ভাষা। বিশেষত ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর জায়োনিস্ট প্রকল্পগুলো—ফিলিস্তিনের ন্যাচারাল ইতিহাস কিংবা যে ইতিহাস হাজার বছর ধরে বিভিন্নভাবে সংরক্ষিত ছিল—পরিবর্তন করে নতুনভাবে রূপ দেয়ার জন্য নিবিড়ভাবে নানামুখী কাজ গ্রহণ করে। ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর জায়োনিস্ট ইজরাইলীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বহিরাগতভাবে এসে অন্যের ভূমি দখলকে ন্যায্যতা দেয়া। ফলে প্রথমেই ঐতিহাসিকভাবে ইহুদিরা ফিলিস্তিন অঞ্চলে সবচেয়ে প্রাচীন জাতি ও আদিবাসী কিনা তার প্রমাণ হাজির করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয় তাদেরকে। যেকারণে জায়োনিস্ট বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায় ফিলিস্তিনের ইতিহাস পুনর্গঠনের দায় অনুধাবন করে। অপরদিকে জায়োনিস্টদের এমন বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা ফিলিস্তিনীদের জন্য নতুন ধরনের যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ফিলিস্তিনের সামনে যেসব যুদ্ধক্ষেত্র জ্বলন্ত রয়েছে তার মধ্যে যেমন ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ তদুরূপ গুরুত্বপূর্ণ তার ভৌগলিক অবস্থান।

দারভীশ ইতিহাসের মধ্যদিয়ে যখন প্রতিরোধের সত্য উন্মোচন করতে চেয়েছেন তখন একইসাথে ইতিহাস বিশ্লেষণের পদ্ধতি কেমন হওয়া দরকার তার ভাষ্যও সামনে নিয়ে আসেন। এর সাথে রয়েছে সাংস্কৃতিক ও সামষ্টিক স্মৃতি কিংবা স্মৃতি সম্পর্কিত ধারণা। যা তার ইতিহাসচিন্তাকে আরো পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। তার কবিতা যেহেতু শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কলাকৌশল নয়, তার সাথে কবিতার আন্তপ্রবাহে জ্ঞান ও চিন্তার সম্পর্ক-অভিপ্রকাশও ঘটে সমান্তরালভাবে। ইতিহাসের এমন বয়ানের সাথে রূপকথা, পুরাণের রূপক ও প্রতীকও প্রতিরোধের অন্যরকম এক ভাষা গড়ে তোলেন দারভীশ। অপরদিকে দারভীশ ফিলিস্তিনের মুক্তির প্রশ্নে প্রতিরোধ-লড়াই সংগ্রামে ধর্মের ভূমিকা হাতছাড়া করতে রাজি নন। রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে এমনকি মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রশ্নে ধর্মের ভূমিকা তিনি পুরোপুরি প্রয়োগ করেন। কবিতার সাথে ধর্মের জ্ঞানগত আত্মীয়তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেন। নিপীড়িত মানুষের মুক্তিতে ঐতিহাসিকভাবে ধর্মের বৈপ্লবিক ভূমিকা নির্ণয় করে দেখেন দারভীশ। দারভীশ মনে করেন, মানুষের মুক্তিতে ধর্মের যে বিপুল এবং মৌলিক অংশগ্রহণ রয়েছে তা এড়ানো অসম্ভব। গণমানুষের মুক্তি সংগ্রামে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কারণে ধর্মের অপরিহার্যতা জরুরি এক ভাষা সৃষ্টি করতে পারে। দারভীশ ধর্মের এমন ব্যাপকতরো অংশগ্রহণকে তার কবিতার মধ্যদিয়ে নতুন করে জীবন্ত করে তোলেন। লিবারেশন থিওলজি কিংবা ধর্মের অন্যতরো ঐতিহাসিক রূপগুলো তিনি তার কবিতায় বিপুলভাবে প্রয়োগ করেন। তবে ধর্মতাত্ত্বিক বিধিবদ্ধ কাঠামোয় সিদ্ধ কোনো শব্দ

বা ধারণা দারভীশ গ্রহণ করেননি। ঐতিহাসিকভাবে এবং লোকজ নানান মাধ্যমে ব্যবহৃত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, তাদের বক্তব্য, প্রবাদ, আচরণকে তিনি কবিতার ভাষায় রূপ দিতে সক্ষম হন। মোটকথা, নবীদের সাহসী কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় প্রতীক, ধর্মীয় স্থাপনা, ধর্মীয় প্রবাদ-দৃষ্টান্ত, জনশ্রুতি ইত্যাদিকে উপজীব্য করে দারভীশ প্রতিরোধের ভিন্নতরো এক ভাষা গড়ে তোলেন।

ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি এবং গণপ্রতিরোধের স্বরূপ উন্মোচনে দারভীশের কবিতায় যেসব ধারণা ও উপাদান কাজ করেছে তার মধ্যে প্রতিরোধ একটি মৌলিক দিক। তবে দারভীশের কবিতায় সবচেয়ে মৌলিক ক্ষেত্র হয়ে ওঠে *ভাষাপ্রশ্ন*। ভাষা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক এক ধারণা ও ঘটনা হয়ে ওঠে তার কবিতায়। এই গবেষণায় দেখা যায়, কোনো না কোনোভাবে ভাষার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ভাষা প্রশ্নের সাথে দারভীশ মূলত ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়, মুক্তি, স্বাধীনতা, লড়াই-সংগ্রাম-প্রতিরোধসহ মানুষের জীবনের পরম চৈতন্যবোধ, মারেফত-আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি এক জায়গায় গাঁথতে সক্ষম হন। ফলে দারভীশের কবিতায় ভাষা অনেক গভীর ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। ভাষা ও প্রতিরোধ দারভীশের কবিতায় বড়ধরনের এক অপরিহার্য সত্য। গবেষণা-বিশ্লেষণে ভাষার বিষয়টি গভীরতরো দৃষ্টি বিবেচনা রাখে। প্রতিরোধের সাপেক্ষে ভাষা এখানে কতটুকু বিস্তার করতে পারে কিংবা কতোখানি প্রাসঙ্গিক হতে পারে তার যথাসম্ভব একটি রূপকল্প তুলে আনা হয়েছে।

গবেষণা সম্পর্কিত বক্তব্য

আধুনিক আরবী সাহিত্য এবং সর্বসাম্প্রতিক আরবী কবিতায় বিবিধ ধারা, পদ্ধতি-রীতি ও আঙ্গিকের চর্চা বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। আরবী কবিতার ইতিহাস প্রায় তার ভাষার সমান ইতিহাস। ফলে তার বৈচিত্র্য, ভাষা, কাব্যচৈতন্য, দার্শনিকতা, শিল্প ও নান্দনিক দিকগুলো অনেক গভীর ও ব্যাপক বিস্তীর্ণ। এখানে ঐতিহ্যবাদী ধারা থেকে শুরু করে উত্তরাধুনিক কবিতার যেমন আধিপত্য তৈরি হয়েছে তেমনি তৈরি হয়েছে জনপ্রিয়তাবাদী ধারারও। মাহমুদ দারভীশের কবিতার স্থান নির্ণয় কিংবা তার কবিতার রূপ ও আত্মার বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার কবিতারও একটি ধারাগত সম্পর্ক চিহ্নিত করা যেতো। বস্তুত গত কয়েক দশকজুড়ে আরববিশ্বে যারা কবিতায় প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছেন দারভীশ তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাব্যপুরুষ। এই প্রভাব তৈরির ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার চেয়েও তার কবিতা ও ভাষা প্রকাশের শক্তি বিপুলভাবে উপস্থিত হয় কাব্যবোদ্ধাদের কাছে। তাকে যেমন জনতুষ্টবাদী (Populist) ধারার কবি হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব তেমনি কবিতার আপন ভূমিতে যেসব মৌলিক কবিতার বিস্তার ঘটিয়েছেন দারভীশ তার জন্য তার আবেদন ও সমাদর কবিতার ইতিহাসে সুদীর্ঘকাল ধরে অম্লান থাকবে। রাজনীতিবোধ কিংবা নাগরিক হিসেবে নাগরিক ও গণচৈতন্য তার কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দারভীশ পরিচয়বাদী ছিলেন কিনা—এমন প্রশ্নের চেয়ে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানুষ হিসেবে নিজের আত্মমর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। কিন্তু এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐতিহাসিকভাবে লড়াই-সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। দারভীশের কাছে লড়াই সংগ্রামের অন্য এক নাম ছিলো প্রতিরোধ। ফিলিস্তিনের

মুক্তির জন্য প্রতিরোধই যেখানে একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে—তবে দারভীশ তার কবিতায় প্রতিরোধকে অন্যস্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। এর সাথে প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে তার ভাষা। ভাষা এবং প্রতিরোধ কিংবা উভয়ই একই বস্তু হিসেবে অখণ্ড চরিত্র নিয়ে ধরা দেয় তার কবিতায়।

গবেষণার পূর্বানুমান

যেকোনো কাজ, প্রকল্প কিংবা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম শুরু করার আগে কিছু বিশেষ প্রশ্নকে সামনে রেখে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। উক্ত অভিসন্দর্ভের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মাহমুদ দারভীশের জীবন, কবিতা ও সাহিত্য নিয়ে অসংখ্য কাজ হয়েছে। এবং অনেক কাজ এখনো চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। সাধারণ অর্থে যেকোনো মৌলিক সৃষ্টিশীল মানুষের কাজে এ ধরনের প্রাক-অবস্থান ধরে নেয়া হয়। স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি, পরিচয়, ভাষা, দার্শনিকতা ও প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশ্নগুলো ছিল এ গবেষণার প্রাক-প্রশ্ন। মূলত, গবেষণাকর্মটি শেষধাপ পর্যন্ত পৌঁছাতে এসব প্রশ্নই মৌল ভিত হিসেবে কাজ করেছে।

গবেষণা প্রকল্প ও রূপরেখা

গবেষণার প্রকৃতির দিক থেকে এটি গুণ ও মানের অনুগামী। কারণ যেখানে ঘটনা রয়েছে, সেখানে ঘটনার বিশ্লেষণ এবং দেখার ও বোঝার পদ্ধতিও রয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার রীতির সাথে গুণবিচারেরও সম্পর্ক রয়েছে। সাহিত্যকর্ম হিসেবে এর যেমন সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্পর্ক ও প্রভাব। ইতিহাসের বাস্তবতা এখানে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু বিদ্যমান ফলে তাতে নিছক সাহিত্যিক বিশ্লেষণ কঠিন। কাজে ইতিহাসের বাবস্তবতা এড়িয়ে শুধু সাহিত্যিক বিশ্লেষণ বলে আদতে কিছু হয়না। এর জন্য ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত যেমন বিশ্লেষিত হয়েছে তেমনি অভিযোজন করা হয়েছে তাত্ত্বিক কাঠামো ও ধারণা। ফলে এ গবেষণাটি স্বভাবতই এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো (ex post facto) পদ্ধতির অনুসরণে গড়ে উঠেছে। ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং বিবদমান বাস্তবতা ও নিত্যকার ঘটনার বিশ্লেষণের রীতিতে নৈর্ব্যক্তিক পন্থা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ। যা এখানে নিবিড়ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। পুরো গবেষণার ধরণ বিশ্লেষণধর্মী হলেও বিষয়-চিন্তার কারণে অনেকক্ষেত্রেই তত্ত্বগতভাবে ক্রিটিক্যাল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কখনো কখনো অংশত অনুসরণ করা হয়েছে দার্শনিক, তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্কও। যাতে তাত্ত্বিক নমুনা বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে বিষয়বস্তুকে আরো যৌক্তিক করে তোলা হয়েছে।

সাহিত্যিক রিভিয়্যু

এখানে দারভীশ বিষয়ক কিছু গবেষণা, সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও নিবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে দারভীশ এবং দারভীশ বিষয়ে কি ধরনের কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করা যায়। একইসাথে বর্তমান শিরোনামযুক্ত এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের সাথে মিলে যায় এমন হুবহু কোনো গবেষণা বা গ্রন্থের হদিস পাওয়া যায় কিনা তাও খতিয়ে দেখা যায়।

দারভীশের তরুণ বয়সে যখন তার মাত্র বয়স আনুমানিক বিশ-পঁচিশ বছর তখন মিশরের বিখ্যাত সাংবাদিক ও গবেষক রাজা আল নাক্কাশ (১৯৩৪-২০০৮) দারভীশের জীবন ও কবিতা নিয়ে বই লিখেন– *মাহমুদ দারভীশ: শায়ির আল আরদ আল মুহতাল্লাহ*। সবেমাত্র দারভীশের মাত্র দুটি গ্রন্থ বের হয়েছিল। এই দুটি বইকে কেন্দ্র করেই আল নাক্কাশ দারভীশকে নিয়ে আলোচনা করেন। বইটিতে প্রসঙ্গত দারভীশের সমকালীন অন্যান্য কবিদের সম্পর্কেও আলোচনা আসে। বইটিতে দারভীশ সম্পর্কে আদ্যোপান্ত ধারণা দেয়া হয়। পরবর্তীকালে ফিলিস্তিনের কথাসাহিত্যিক, সমালোচক ও বুদ্ধিজীবী গাসসান কানাফানি (১৯৩৬-১৯৭২) তার *আদাব আল-মুক্বাওয়ামাহ ফী ফিলিস্তিন আল-মুহতাল্লাহ ১৯৪৮-১৯৬৬* (দার মানশুরাত আর রিমাল, ১৯৬৬) গ্রন্থে দারভীশকে প্রতিরোধের কবি হিসেবে অবিষিক্ত করেন। দারভীশের প্রতিরোধ সংক্রান্ত কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে আল নাক্কাশও আলোচনা করেন। তবে কানাফানি বিশেষভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে দারভীশকে *শায়িরুল মুকাওয়ামাহ* বলে অভিহীত করেন। কানাফানির এভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর দারভীশের নামের সাথে প্রতিরোধের কবি অভিধাটি অনেকদিন প্রচলিত ছিল। কানাফানির বইটি শুধু দারভীশের উপর লিখা হয়নি। বরং যেসব কবি সাহিত্যিক প্রতিরোধের জন্য লিখেছেন কিংবা যাদের লেখায় প্রতিরোধের উপাদান রয়েছে তাদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন কানাফানি। যাইহোক, এরপর বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সাহিত্য পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে দারভীশকে নিয়ে অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়। *আল কালিমা, আল কারমেল, আল জিহাত* ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে দারভীশ সম্পর্কিত আলোচনা-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ফিলিস্তিনী লেখকদের মধ্যে দারভীশকে নিয়ে সবথেকে বেশি কাজ করেছেন অধ্যাপক ড. আদিল আসতাহ এবং আবদুহু ওয়াজিন। তিনি ফিলিস্তিনের নাবলুসের আল নাজাহ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আরবী ভাষা বিভাগের অধ্যাপক। দারভীশ নিয়ে তার মলাটবদ্ধ কোনো বই এখনো প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানা যায়নি। তবে দারভীশকে নিয়ে তিনি অনেকদিন ধরে লিখে আসছেন। দারভীশ বিষয়ে তার বিপুল সংখ্যক প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকী, গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। আদিল আসতার গবেষণায় বিশেষভাবে দারভীশের সাহিত্যিক মতাদর্শ, রাজনীতি, কবিতার শৈল্পিক আঙ্গিক, কবিতা বা শিল্প ও মতাদর্শের দ্বন্দ্ব, কবিতার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যসহ ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। আবদুহু ওয়াজিনও দারভীশকে নিয়ে অনেক দিন ধরে লিখে আসছেন। সাধারণত *আল জিহাত* সাময়িকীতে তিনি দারভীশ নিয়ে নিয়মিত লিখে আসছেন। দারভীশ নিয়ে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: محمود درويش يقع علي نفسه: قراءة في أعماله الجديدة।

وازن، عبده، محمود درويش يقع علي نفسه: قراءة في أعماله الجديدة (بيروت: رياض الرئيس للكتب و النشر، ২০০৬) এখানে দারভীশের তিনটি কাব্যগ্রন্থ– *লা তা'তাজির আম্মা ফায়ালতা*, *সারীর আল গারীবাহ ও জিদারিয়্যাহ* নিয়ে আলোচনা করেছেন ওয়াজিন। এবং পরিশেষে দারভীশের সাথে তার একটি কথোপকথন তুলে ধরেন।

২০১১ সালে সিরিয়া থেকে প্রকাশিত হয় দারভীশের জীবনী– محمود درويش: الجوهرة المؤلمة।
عادل محمود، محمود درويش: الجوهرة المؤلمة (دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب - منشورات الطفل، وزارة الثقافة، 2011)
বইটির লেখক আদিল মাহমুদ তাতে দারভীশের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সময়ের নানান কষ্ট ও বেদনাদায়ক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন।

২০১৬ সালে দারভীশকে নিয়ে আরেকটি জীবনীগ্রন্থ বের হয়। বইটি লিখেন ড. ইমাদ আল তারাভিনাহ।
التراونة، د. عماد، حكاية محمود درويش في أرض الكلام (بيروت: الانتشارالعربي، 2016).
লেখক এখানে মোটামুটি দারভীশের জীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে আনেন। তার রাজনৈতিক জীবন থেকে শুরু করে সাহিত্য-কবিতা চর্চা ও পেশাগত জীবনসহ মোটামুটি সবকিছু তুলে আনার চেষ্টা করেন।

২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় সুহাইর মাইকেলের *Identity In Palestinian Literature: Exile Is The Antithesis Of Home*। (Michael, Suheir *Identity In Palestinian Literature: Exile Is The Antithesis Of Home* (California: Humanities, San Francisco San Francisco State University, December, 2007)। বইটিতে ফিলিস্তিনীদের ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহ, স্বাধীনতা আন্দোলন, নাকবা, দারভীশের দেশপ্রেম, জাতিয়তাবোধ, আত্মপরিচয়, নির্বাসন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দারভীশের মৃত্যুর এক বছর পর লিবিয়ান বংশদ্ভুত যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক ও কবি খালেদ মাত্তাওয়া ২০০৯ সালে দারভীশ নিয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের ডিসিপ্লিন থেকে পিএইচ.ডি. গবেষণা করেন। বাংলা ভাষার নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), সেন্ট লুসিয়ান নোবেলজয়ী কবি ডিরেক ওয়ালকট (১৯৩০-২০১৭) এবং মাহমুদ দারভীশের কবিতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। খালেদা মাত্তাওয়ার গবেষণার শিরোনাম: *When the Poet Is a Stranger: Poetry and Agency in Tagore, Walcott, and Darwish* by Khaled Mattawa (Department of English. Duke University, 2009)। মাত্তাওয়া তার গবেষণায় জাতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতিতত্ত্ব ও উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যতত্ত্বের

দিক থেকে আলোচনা তুলে ধরেন। মাত্তাওয়া বস্তুত তিনজনের মাতৃভূমিতে একটি মিল থেকে তার গবেষণার সূত্রপাত ঘটান। রবী ঠাকুরের ভারত, ওয়ালকটের ওয়েস্ট ইন্ডিজ—দুজনের দেশই উপনিবেশিক শাসনাধীন রাষ্ট্র ছিল। দারভীশের ফিলিস্তিনও নতুন উপনিবেশিত একটি দেশ। মাত্তাওয়ার আলোচনায় উত্তর উপনিবেশিকতা, সংস্কৃতি, জাতীয় সাহিত্য, এজেন্সি, সাবজেক্টিভিটি, শিল্পতত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গ সবিস্তারে উঠে এসেছে। মাত্তাওয়া শুধু উপনিবেশিক এবং উত্তর উপনিবেশিক আলোচনার মধ্যে তার গবেষণাকে সীমিত রাখেননি। আরো বিচিত্র দিক থেকে আলোচনাকে ঘনিভূত করে তোলেন।

২০০৯ সালে দারভীশের কবিতায় দার্শনিক প্রসঙ্গ নিয়ে প্রকাশিত হয় ড. খালিদ আবদ আল রাউফ আল জাবার এর: *غواية سيدوري: قراءات في شعر محمود درويش*।
الدكتور خالد عبد الرؤوف الجبر، غواية سيدوري: قراءات في شعر محمود درويش (عمان: دارجرير، ২০০৯). ড. খালিদ জাবার বইটিতে মাহমুদ দারভীশের চারটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন। বইগুলো হলো– *লা তা'তাজির আম্মা ফায়ালতা*, *কাজাহর আল-লাওজ আও আবয়াদ*, *ফী হাদরাত আল গিয়াব* এবং *আছার আল ফারাশাহ*। সত্তা, চৈতন্য, প্রজ্ঞা, *আমি*, আত্মা, পরিচয়, রূপক, প্রতীক, দ্বৈততা-বৈপরীত্য, স্থান-কাল, মৃত্যু ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন খালিদ আল জাবার।

২০১১ সালে প্রকাশিত হয় সুলতান ঈসা আল শিয়ার এর গবেষণা– *الزمن في شعر محمود درويش*।
عيسي الشعار، سلطان، الزمن في شعر محمود درويش (أردن: قسم اللغة العربية، جامعة مؤتة، 2011).
এখানে সুলতান ঈসা আল শিয়ার দারভীশের কবিতায় সময় ও কালের ধারণা, ইতিহাসচিন্তা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন। এটি মূলত সুলতান ঈসা আল শিয়ার এর পিইচ.ডি. গবেষণা। এখানে দেখা যায় কবিতার উপমা, প্রতীক, রূপক ইত্যাদি কাব্যালঙ্কারের মধ্যদিয়ে সময় কখনো দার্শনিক অভিজ্ঞান নিয়ে হাজির হয়েছে, কখনো সাধারণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। দারভীশের কবিতায় কোন প্রেক্ষাপটে, কিভাবে, কোন অর্থে সময় প্রসঙ্গ এসেছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সুলতান।

২০১১ সালে প্রকাশিত হয় মাদীহা আ'রাবের *جمالية الحضور السردي في شعر محمود درويش*।
مديحة أعراب، جمالية الحضورالسردي في شعر محمود درويش (الجزائر: قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة العربي بن مهيدي، 2011)
এখানে মাদীহা আ'রাব দারভীশের কবিতার শিল্প, নন্দনতত্ত্ব ও বর্ণনাভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

২০১৩ সালে মুহাম্মদ মুরাহের *هندسة المعنى في الشعر العربي المعاصر* প্রকাশিত হয়।
محمد مراح، هندسة المعني في الشعر العربي المعاصر (الجزائر: قسم اللغة العربية وأدابها، جامعة وهران، ২০১৩)।

এখানে গবেষক মুহাম্মদ মুরাহ দারভীশের কবিতায় অর্থোৎপাদনের ধরন, প্রেক্ষিত, কৌশল, সৃজনশীলতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

২০১৪ সালে দারভীশ নিয়ে প্রকাশিত হয় খালেদ মাত্তাওয়ার অপর গ্রন্থ– *Mahmoud Darwish: The Poet's Art and His Nation by Khaled Mattawa* (New York: Syracuse University Press, 2014)। বইটিতে ফিলিস্তিনের জাতীয় সাহিত্য, মুক্তি সংগ্রাম, পরিচয়, শিল্প ও সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

খালিদ মাত্তাওয়ার মতো প্রায় একই বিষয়ে পিএইচ.ডি. গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার থেকে সুয়াদ এ. এইচ. এস. এম. অ্যালেঞ্জি। দারভীশ এবং এডওয়ার্ড সাঈদের সাহিত্যে উত্তর-উপনিবেশিক উপাদান নিয়ে কাজ করেন অ্যালেঞ্জি। তার গবেষণার শিরোনাম : *I am neither there, nor here: An Analysis of Formulations of Post-Colonial Identity in the Work of Edward W. Said and Mahmoud Darwish A Thematic and Stylistic Analytical Approach by* Suad A H S M Alenzi (School of Arts, Languages and Cultures, University of Manchester, 2015)। তবে অ্যালেঞ্জি শুধু উত্তর-উপনিবেশিক বিষয়বস্তুর মধ্যেই তার আলোচনা সীমিত রাখেন।

২০১৬ সালে প্রকাশিত হয় মুনা আবু ঈদ এর *Mahmoud Darwish: Literature and the Politics of Palestinian Identity* by Muna Abu Eid (London: I. B. Tauris, ২০১৬)। মুনা মূলত ইজরাইলে বসবাসরত একজন ফিলিস্তিনী গবেষক। বইটিতে দারভীশের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্রিয়তা, রাজনৈতক তৎপরতা, ফিলিস্তিনের জাতীয় পরিচয়, স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামে দারভীশের সংশ্লিষ্টতা-কার্যক্রম-অবদান, শান্তি ও সমঝোতা চুক্তি বিষয়ে দারভীশের স্ববিরোধী অবস্থান, স্বাধীনতার ঘোষণা প্রণয়নের ইতিহাস ও দারভীশ ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা তুলে ধরেন মুনা। একাডেমিক পদ্ধতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে মুনা দারভীশের আলোচনা-সমালোচনা করেন।

২০১৬ সালে প্রকাশিত হয় ফিলিস্তিনের আন নাজাহ ইউনিভার্সিটির গবেষক আয়া এম. জে. হালাবির গবেষণা: *Translation and the Intertextual Space: The Translation of Religious, Historical and Mythical Allusions in the Poetry of Mahmoud by Aya M. J. Halabi* (Nablus: Departent of Applied Linguistics and

Translation, An-Najah National University, 2016)। এখানে হালাবি দারভীশের কবিতায় আন্তপাঠ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করেন। যাতে ঐতিহাসিক চরিত্র, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ধর্মগ্রন্থ, পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনীর ইন্টারটেক্সট হিসেবে দারভীশ কিভাবে কোনো পটভূমিতে তা প্রকাশ করেছেন হালাবি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২০১৭ সালে সুফিয়ান আল মাজদির *اللغة في شعر محمود درويش*। (الماجدي، سفيان، اللغة في شعرمحمود درويش (المغرب: دار توبقال للنشر، 2017) প্রকাশিত হয়। বইটিতে সুফিয়ান আল মাজদি দারভীশের কবিতায় ভাষা প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গদ্য এবং কবিতা উভয় দিক থেকে ভাষাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ নিয়ে বিশদ আলোচনা তুলে ধরেন।

২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় হান্নান দান্দুকার (حنان دندوقه) গবেষণা:
سيميائية القصيدة في ديو ان " سرير الغريبة لـ: "محمود درويش (الجزائر: قسم الآداب واللغة العربية، جامعة محمد خيضر، 2017)
হান্নান দান্দুকার এই গবেষণায় দারভীশে কবিতার চিহ্নতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। চিহ্নতাত্ত্বিক পদ্ধতিগত পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে মূলত দারভীশের কবিতায় বিষয়বস্তু কিভাবে বৈচিত্র্য তৈরি করেছে তার বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২০১৯ সালে আনাস এ. আই. আলহুমামের *A Study of the Dramatic Structure in the Poetry of Mahmoud Darwish from 1967 to 1987* প্রকাশিত হয় A. I. Alhumam, Anas, A Study of the Dramatic Structure in the Poetry of Mahmoud Darwish from 1967 to 1987 (Manchester: School of Arts, Languages and Cultures, University of Manchester, 2019)। বইটিতে ফিলিস্তিনের ইতিহাস, বিদ্রোহ, নাকবা, প্রতিরোধ, পরিচয়, নির্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে বইটির বিশেষ দিক হলো, দারভীশের কবিতার নাটকীয় সংলাপ, সংলাপের রীতি, নাট্য-আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য, ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি, মাইথোলজি, পৌরাণিক ও রূপকথার চরিত্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ।

ফিলিস্তিনী গবেষক আব্দেল কারিম দারাগমেহ ও আহমদ কাবাহা'র যুগ্মভাবে লিখিত প্রবন্ধ *Rifts, Ruptures, And Fractures: The (Ir) Relevance Of Postmodern Conceptual Frames From The Point Of View Of Palestine's Poet Mahmoud Darwish*– ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়। (Daragmeh, Abdel Karim and Ahmad Qabaha, *Rifts, Ruptures, And Fractures: The (Ir) Relevance Of Postmodern Conceptual*

Frames From The Point Of View Of Palestine's Poet Mahmoud Darwish (Arab Studies Quarterly, Vol. 42, No. 3, (Summer 2020)। এ প্রবন্ধে দারভীশের কবিতায় পোস্ট মডার্ন ধারণার সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান করে দেখা হয়। একইসাথে একটি তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যদিয়ে পুরনো এবং নয়া পটভূমির মধ্যে মিল ও ব্যবধানের জায়গাগুলো খতিয়ে দেখা হয়। রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে দারভীশের কবিতা পোস্ট মডার্ন ধারণাগুলোর মুখোমুখী হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিচার হাজির করা হয়।

দারভীশের মৃত্যুর পর ২০১০ সালে অধ্যাপক শরীফ আতিক-উজ-জামানের ভূমিকা ও সম্পাদনায় *মাহমুদ দারবিশ: পাঠ ও বিবেচনা* প্রকাশিত হয়। *মাহমুদ দারবিশ: পাঠ ও বিবেচনা*—ভূমিকা ও সম্পাদনা—শরীফ আতিক-উজ-জামান (ঢাকা: সংবেদ, ফেব্রুয়ারি ২০১০)। এটি মূলত দারভীশের মৃত্যুর স্মরণে সংগৃহীত একটি সংকলন। ২৩৫ পৃষ্ঠার এই সংকলনে বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ, নিবন্ধ, মূল্যায়ন, সমালোচনা, প্রতিক্রিয়া, অনুবাদ, সাক্ষাৎকার স্থান পায়।

২০১৯ সালে প্রকাশিত হয় *ইসফানদিয়র আরিওনের জমজমাট গায়েবানার হাজিরায়*। আরিওন, ইসফানদিয়র, *জমজমাট গায়েবানার হাজিরায়: মাহমউদ দারউইশের দুটো দীর্ঘকবিতার আরবী থেকে বাঙলায়ন, ভূমিকা ও টীকা* (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯)। এখানে লেখক আরিওন দারভীশের *জিদারিয়্যাহ* কাব্যগ্রন্থ ও দীর্ঘ কবিতা *লাইব আল নারদ* এর আরবী থেকে বাংলা অনুবাদ করেন। অনুবাদ শুরু করার আগে জিদারিয়্যাহ সম্পর্কে একটি আলোচনা উপস্থাপন করেন। যেখানে দারভীশের মৃত্যুচিন্তা ও জিদারিয়্যাহ কাব্যগ্রন্থের ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি নিয়ে বিশ্লেষণ করেন।

এছাড়া দারভীশের কবিতা নিয়ে অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য কিছুমাত্র বই ও গবেষণার তথ্যসহ অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে; যাতে বর্তমান শিরোনামযুক্ত এই গবেষণাকর্মের সাথে পুরোপুরি মিলযুক্ত কোনো গবেষণাকর্মের খোঁজ পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে। দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনের জাতীয় পরিচয়, ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রাম ও প্রতিরোধ নিয়ে বিচ্ছিন্ন আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এক মলাটে এমন গবেষণার দেখা মেলেনি। এমনকি মাহমুদ দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনের *জাতীয় মুক্তি-চেতনা* এবং *গণপ্রতিরোধ* বা *গণপ্রতিরোধের স্বরূপ*—ভিন্ন ভিন্নভাবে এমন শব্দবন্ধযুক্ত শিরোনামের কোনো প্রবন্ধ বা গবেষণার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এক নজরে দারভীশের কবিতা সম্পর্কিত একটি চিত্র

যেসব কাব্যগ্রন্থ দারভীশের জীবনকে অনেক দূর নিয়ে যায় সেসব সম্পর্কে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে দারভীশের কবিতার একটি ভিন্নপাঠ যেমন উন্মোচন করা যায়

তেমনি তার কবিতা সম্পর্কে একনজরে সামগ্রিক একটি চিত্র তুলে ধরা যায়। এর মাধ্যমে দারভীশ পাঠ ও গবেষণা অনুসন্ধানে আগ্রহ কিংবা অনুপ্রেণা লাভ করা যায়।

বিতাকাতুন হুবিয়্যাহ (পরিচয়পত্র)

বিতাকাতুন হুবিয়্যাহ (পরিচয়পত্র) ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত *আওরাক আল জায়তুন* (জলপাইয়ের পত্রাবলী) কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা। কবিতাটি বহুলপঠিত। সারাবিশ্বেই কবিতাটি অসম্ভব পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। অনেক ভাষায় এটি অনুদূতি হয়। জাতীয়তাবাদী অবস্থান কবিতাটির প্রধান উপজীব্য। বিশেষত মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাছেরের (১৯১৭-১৯৭০) আরব জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত ছিলেন কবি। আরব জাতীয়তাবাদের উদ্দীপ্ত উচ্চারণ কবিতার মূলবক্তব্য হয়ে ওঠে। কবিতাটির আন্তশরীরজুড়ে ছিল শোষক, আধিপত্যবাদী ইজরাইলের রিরুদ্ধে তীর্যক, শ্লেষমিশ্রিত ও ক্ষোভ উদগিরণ করা অগ্নিঝরা ভাষা। জাতীয়তাবাদের সাথে মার্ক্সবাদী শ্রেণিসংগ্রামের স্পিরিট ছিল কবিতাটির বিশেষ চেতনাজাত উপাদান। কবির সে সময়ের অনুসৃত কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রভাব ছিল কবিতাটির আরেকটি দিক। দারভীশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থভুক্ত এ কবিতা কবিজীবনের প্রথমদিকের হয়েও শেষপর্যন্ত দারভীশের একটি স্মারককবিতা হয়ে ওঠে।

আশিক মিন ফিলাস্তীন (ফিলিস্তিনের এক প্রেমিক)

এটি দারভীশের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। যেসব কাব্যগ্রন্থ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিল এটি তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু, মানবিকক প্রেম, দেশপ্রেম, দেশাত্ববোধ, জাতীয়তাবাদ, সংগ্রাম, ধর্ম, শহীদী মৃত্যু, ইজরাইলী নিপীড়ন ও ধ্বংযজ্ঞের বর্ণনা ইত্যাদি।

হাবীবাতী তানহাদু মিন নাওমিহা (ঘুম থেকে জেগে উঠছেন প্রিয়তমা)

১৯৭০ সালে প্রকাশিত *হাবীবাতী তানহাদু মিন নাওমিহা* দারভীশের অষ্টম কাব্যগ্রন্থ। কবিতার মূল বিষয়বস্তু প্রেম, প্রতিরোধ, স্বাধীনতা, যুদ্ধ-শান্তি বিতর্ক, ইজরাইলের সাথে সংলাপের সম্ভাবনা, জাগরণ-বিপ্লব, ধর্ম, স্বপ্ন-ভবিষ্যত, স্মৃতি, পরিচয়চিন্তা ইত্যাদি। মৃত্যুকে এখানে ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত সম্ভাবনার বীজ হিসেবে অভিষিক্ত করেন কবি। মৃত্যু যেখানে লড়াই-সংগ্রামের গভীর জীবনবোধ হয়ে নাড়া দেয় কবিতায়।

উহিব্বুকা আও লা উহিব্বুকা (আমি তোমাকে ভালোবাসি কিংবা ভালোবাসিনা)

১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। প্রেম, স্মৃতি, পরিচয়, ভাষা, স্বপ্ন, মৃত্যু, শহীদী মৃত্যু, ইজরাইলের দখলদারিত্ব, নাকবার স্মৃতি ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তার রয়ে এই কাব্যগ্রন্থে। ভাষার ভিন্ন আঙ্গিকে বইটির প্রতিটি কবিতা রচিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে এসে কবি তার পুরনো আঙ্গিক থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছেন।

তিলকা ছুরাতুহা ওয়া হাজা ইনতিহার আল আশিক (এই তার রূপছবি আর এটি তার প্রেমিকের আত্মসংহার)

১৯৭৫ সালে এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি দারভীশের ১১তম কাব্যগ্রন্থ। পুরোগ্রন্থটি একটিমাত্র কবিতাসম্বলিত। দীর্ঘ এই কবিতায় দারভীশ নিজেকে অন্যমাত্রায় উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। বিচিত্র বিষয় এখানে এসে উপস্থিত হয়। প্রেম ও প্রকৃতিচৈতন্যের গভীর বয়ান, প্রতিরোধ, বিপ্লব, জায়োনিজম, আত্মা-শরীর, কাল ও সময় সম্পর্কিত চিন্তা, মৃত্যু, ইতিহাসচিন্তা, ঐতিহাসিকতা ইত্যাদি কবিতাটির বিষয়বস্তু। একদিকে দার্শনিকতা, প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য্যবোধের ব্যাপক সমহার অপরদিকে রূপক, প্রতীক, বিপুল চিত্রকল্প আর উপমাসমৃদ্ধ এই কাব্যগ্রন্থ দারভীশের কবিজীবনের অনন্য এক উপহার।

মাদীহ আল জিল আলী (উর্ধ্বছায়ার প্রশস্তি)

১৯৮৩ সালে বইটি লিখেন এবং সে বছরই বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি রচনার পিছনে বিশেষ পটভূমি রয়েছে। ১৯৮২ সালে লেবাননের শাবরা-শাতিলায় ফিলিস্তিনের শরণার্থী শিবিরে ইজরাইলের বর্বরতম হামলা ও গণহত্যার পর দারভীশ তিউনিসিয়ায় যাত্রা করেন। তিউনিসিয়াগামী ওই জাহাজের ডেকে বসে কবি *মাদীহ আল জিল আল আলী* রচনা করেন। এটিও একটিমাত্র কবিতার গ্রন্থ। যেটি দারভীশ এক বসাতেই রচনা করেন। বস্তুত কবিতাটি তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাসেটের পিতায় রেকর্ড করে ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হয়। যেকারণে এটাকে কাসিদাতুন তাসজীলিয়্যাহ (تسجيلية) বলা হয়। মূলত লেবাননের বৈরুতে ছিল পিএলও'র সদর দপ্তর। ইজরাইলের হামলার পর পিএলও আকস্মিকভাবে তাদের সদরদপ্তর তিউনিসিয়ায় স্থানান্তর করে। সে সময় সদর দপ্তরের যাবতীয় জিনিসপত্রসহ পিএলও'র জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং কয়েক হাজার ফিলিস্তিনী যোদ্ধা ছিলেন সেই জাহাজে। শাবরার সেই গণহত্যা নিয়ে দারভীশ জীবন্ত এক কাব্যিক আখ্যান রচনা করেন এই গ্রন্থে। এখানে দারভীশ গণহত্যার করুণচিত্র তুলে ধরেন। একইসাথে জায়োনিজমের সমালোচনা ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কথা উঠে আসে এই কবিতায়। ইতিহাসবোধ, সময়চিন্তা, মৃত্যু, শরীর-আত্মা, লড়াই-সংগ্রাম, প্রতিরোধ, মতাদর্শ, চিন্তা, বিপ্লব, ভাষাপ্রশ্ন, ধর্মচিন্তা ইত্যাদি এই কবিতার বিষয়বস্তু।

হিছার লিমাদায়িহ আল বাহর (সমুদ্রপ্রশস্তির জন্য অবরোধ)

১৯৮৪ সালে এটি প্রকাশিত হয়। এখানে ক্ষমতার সমালোচনা, ক্ষমতার পরিবর্তন, উত্থান-পতন, রাজনীতি, ইতিহাসচিন্তা, সময়চিন্তা, ক্ষমতার সম্পর্ক, রাজনৈতিক ঘটনাবলী ইত্যাদি বিষয় ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার রূপক হিসেবে বর্তমান ফিলিস্তিনকে তুলে ধরা হয়।

হিয়া আগনিয়া, হিয়া আগনিয়া (এইসব গান, সেইসব গান)

বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। বিবদমান পরিস্থিতির সমালোচনা, জায়োনিজম, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, মিডিয়ার সমালোচনা, শহীদী মৃত্যু, যুদ্ধ-শান্তি বিতর্ক, স্বাধীনতা-মুক্তি, প্রতিরোধ, ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠে আসে এই কবিতায়।

উরীদু মা উরীদু (যা ইচ্ছা করি আমি তাই চাই)

এটি ফিলিস্তিনে ১৯৮৮ সালে ব্যাপকভাবে সংঘটিত প্রথম গণইন্তিফাদার পর প্রকাশিত দারভীশের কাব্যগ্রন্থ। এখানে বিশেষভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উঠে আসে। ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সমালোচনা, শান্তি-সমঝোতা নাকি সশস্ত্র উপায়ে প্রতিরোধ? কোন পন্থা বেছে নিতে হয়েছিল ফিলিস্তিনকে? ঐতিহাসিকভাবে সেই সময়ের রাজনীতিতে পিএলও শান্তি ও সমঝোতার পন্থা গ্রহণ করে। দারভীশ বিপরীতে গিয়ে তার সমালোচনা করেন। সেসব সমালোচনার রূপকাশ্রিত কাব্যময় আখ্যান এই গ্রন্থ। বইটির ভাষা ও অর্থগত তাৎপর্য অনেক গভীর। এখানে কবি বিচিত্র প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিক চরিত্র, পৌরাণিক চরিত্র, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, পাখিপুরাণ ও ইতিহাসের বিবিধ ঘটনাবলীকে কবি সাম্প্রতিক ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অনুষঙ্গের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেন। ক্ষমতা, ভাষা, ধর্ম ও রাজনীতি যার মূলকেন্দ্র। এই কাব্যগ্রন্থে *হুদুহুদ*, *কাসীদা আল খুবজ*, *কাসীদা আল আরদ* এর মতো অসাধারণ সব কবিতা রয়েছে।

আহাদা আশারা কাওকাবা (এগারো নক্ষত্র)

এটি দারভীশের প্রকাশিত ১৯তম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটিও রাজনৈতিক বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগ্রহণ করে আছে। ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি বোঝার জন্য বইটি বিশেষভাবে বিবেচিত হতে পারে। এগারো নক্ষত্র দিয়ে যেমন কবি নবী ইউসুফের অপর এগারো ভাই তথা ইহুদী এবং জায়োনিস্ট শক্তিকে বোঝাতে পারেন একইভাবে কবি সে সময় অনুষ্ঠিত স্পেনের মাদ্রিদ সম্মেলনকেও বোঝাতে পারেন। বস্তুত কবি ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংকট সমাধানের যে শান্তি ও সমঝোতার পন্থা পিএলও বেছে নিয়েছিল তারই বিস্তারিত সমালোচনা ও কাব্যময় মন্তব্য

প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থে। এখানেও কবি ইতিহাসের নানান ঘটনা, ধর্মীয় চরিত্র, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, পৌরাণিক কাহিনী–ইত্যাদির মধ্যদিয়ে বর্তমান ফিলিস্তিনকে তুলে ধরেন।

লিমাজা তারাকতা আল হিছানা ওয়াহিদা (ঘোড়াটিকে কেন একা রেখে চলে আসলে?)

১৯৯৫ সালে এটি প্রকাশিত হয়। ১৯৯৩ সালে সংঘটিত অসলো চুক্তির পর এটি ছিল প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। দারভীশ অসলো চুক্তির সমালোচনা করে পিএলও থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর কবিতায় তিনি অন্যভাবে হাজির হন। অকেনখানি গভীর, বিমূর্ত, রহস্যময়, দার্শনিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞানির্ভর কবিতার পন্থা বেছে নেন দারভীশ। এই কাব্যগ্রন্থে তারই সাক্ষ্য হাজির করেন তিনি। এখানে কোরআনের ভাষাগত আঙ্গিক অনুসরণ করা হয়েছে কোথাও কোথাও, অনুসরণ করা হয়েছে বিবিধ পৌরাণিক চরিত্র ও প্রতীক। প্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, হাবিল-কাবিলের দ্বন্দ্ব, কেয়ামত, মৃত্যু, ভাষাচিন্তাসহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ একানে বিবৃত হয়েছে। এসবকিছুর মধ্যদিয়ে কবি বস্তুত বর্তমান সময় ও চলমান ইতিহাসের বয়ান হাজির করেন। এখানে যেমন মানুষের পরিচয়, রাজনীতি ও আত্মতত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় ঐতিহাসিক জ্ঞান।

সারীর আল গারীবাহ (আগন্তুকের বিছানা)

বইটি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। বইটিতে একজন নির্বাসিত কবিসত্তার পরম অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। আত্মপরিচয়, রাজনৈতিক অভিজ্ঞান, সত্তার পরিচয়, আমিত্ব, দেহ-অস্তিত্ব, আত্মজ্ঞান-আত্মতত্ত্ব, সময়চিন্তা, স্থানকাল সম্পর্কিত দার্শনিক জিজ্ঞাসা, প্রতিরোধ, লড়াই, পৌরাণিক পরিভ্রমণ, ধর্মীয় জ্ঞান ইত্যাদি অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ এই কাব্যগ্রন্থ।

জিদারিয়্যাহ (দেয়ালচিত্র)

২০০০ সালে প্রকাশিত হয় দারভীশের অনন্যসাধারণ কাব্যগ্রন্থ *জিদারিয়্যাহ*। প্রাচীন আরবী কবিতা মুআল্লাকা বা ঝুলন্ত কবিতার ভাবকল্প অনুসরণে বইটির নামকরণ করা হয়। কবিতার আঙ্গিকের দিক থেকে এটি মুক্তছন্দে রচিত দীর্ঘ কাসীদা। জাহিলী কবিতার মুখ বা সূচনাস্তবকের আঙ্গিক অনুসরণ করে জিদারিয়্যাহর সূচনা ঘটে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কেমন হতে পারে কবি তাই নিয়ে ভাবছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে কবিকে যে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল তার অভিপ্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যগ্রন্থে। হাসপাতালের বেড ছিল বস্তুত কবির মগ্নতার বিছানা। এই অনুধ্যানের বিছানায় শুয়ে কবি মৃত্যু সম্পর্কিত এক মহাকাব্যিক আখ্যান সৃষ্টি করেন। এক পরমার্থিক অভিযাত্রার ভিতর দিয়ে কবি মহাজাগতিক পরিভ্রমণ করেন। মৃত্যুচিন্তা, ভাষাচৈতন্য, অর্থোৎপাদন প্রক্রিয়া, পরমার্থিক জিজ্ঞাসা-অনুসন্ধান, আত্মানুসন্ধান, আমিত্ববোধ,

সত্তার পুনর্গঠন, পুনরুদ্ধার, প্রত্যাবর্তন, প্রতিরোধ-পরিচয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে সমৃদ্ধ এই কাব্যগ্রন্থ। *জিদারিয়্যাহ* মূলত দারভীশের অমর এক সৃষ্টি। ধর্ম, কোরআন, বাইবেল, তাওরাত, পৌরাণিক চরিত্র, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ও রূপকথার রূপক-প্রতীকাশ্রয়ে ভিন্ন এক ভাষায় সৃষ্টি করেন *জিদারিয়্যাহ*। এখানে যেমন তার যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, রয়েছে ফিলিস্তিনকে ভিন্ন এক প্রতীকী বয়ানে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা। একইসাথে দার্শনিক ও রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ভেদবুদ্ধির সমাহার ঘটেছে এই কাব্যগ্রন্থে।

হালাতু হিছার (অবরোধ পরিস্থিতি)

এটি দারভীশের ২৩তম কাব্যগ্রন্থ। ২০০২ সালে এটি প্রকাশিত হয়। রামাল্লায় ইজরাইলের অবরোধের প্রেক্ষাপটে রচিত হয় এই কাব্যগ্রন্থ। প্রাচীন আরবী কবিতার আঙ্গিকের ছাপ রয়েছে এই কবিতায়। ছোট ছোট স্তবকে পূর্ণ করে তোলা হয়েছে পুরো কাসীদা *হালাতু হিছার*। স্বাধীনতার চৈতন্য, ইজরাইলী নিপীড়নে পীড়িত একটি জাতির গভীর কষ্ট-যন্ত্রণার নিখাদ বয়ান প্রকাশিত হয় এই কাব্যগ্রন্থে। জায়োনিস্ট ইজরাইলের দখলদারিত্ব প্রতিরোধের আহবান, যুদ্ধ-শান্তি বিতর্ক, ভাষাপ্রশ্ন, জুলুমের গভীর অভিপ্রকাশ, স্থানকালের ধারণা, ক্ষমতাসম্পর্কিত বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি ইত্যাদি বিবৃত হয়েছে খুব সহজ ভাষায়।

লা তা'তাজির আম্মা ফায়ালতা (তোমার কৃতকর্মের জন্য কৈফিয়ত দিওনা)

২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় *লা তা'তাজির আম্মা ফায়ালতা*। স্মৃতিসত্তা, বস্তু-ভাষাচিন্তা, স্থানকাল সম্পর্কিত দার্শনিক জিজ্ঞাসা, জায়োনিজ-অপরায়ণ, সত্তার পরিচয়, আত্মানুসন্ধান, স্মৃতি, নির্বাসন, প্রতিরোধ, মৃত্যুচিন্তা, ভাষাবোধ, অর্থোৎপাদন, স্বপ্ন-সম্ভাবনা, ধর্ম-পুরাণ, জেরুজালেম, বায়তুল মোকাদ্দাস ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে।

কাজাহর আল লাওজ আও আবয়াদ (ফুটন্ত বাদামফুলের মতো কিংবা তারোধিক)

২০০৫ সালে প্রকাশিত হয় এই কাব্যগ্রন্থ। অপেক্ষা, মৃত্যু, ভাষাচৈতন্য, পরিচয়-আত্মমর্যাদা, অস্তিত্ববোধ, দেহ-আত্মা, ক্ষমতা, নির্বাসন, আমিত্ববোধ, কর্তৃত্বচিন্তা ইত্যাদি বিষয়ের উপস্থাপন ঘটেছে এই কবিতাগ্রন্থে। বইটির কবিতার বিন্যাসও ছিল ব্যতিক্রম। ৮টি পর্বে ভাগ করা হয় এর সবকটি কবিতা। *আনতা (তুমি), হুয়া (সে/তিনি), আনা (আমি), হিয়া (সে/তিনি) এবং মানফা (নির্বাসন) সংক্রান্ত আরো চারটি পর্ব রয়েছে।* মোট আটটি পর্বে বিন্যস্ত।

লা উরীদু লিহাজিহি আল কাসীদাহ আন তানতাহী (যে কবিতা শেষ হোক আমি চাইনা)

দারভীশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ২০০৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়। স্মৃতি, মৃত্যু, স্থান-কাল সম্পর্কিত জ্ঞান, ইতিহাসচিন্তা, রূপকল্প, ভাষাচৈতন্য, বর্তমানতা, ধর্ম, আন্তর্জাতিকতা, বৈশ্বিকবোধ, চিরন্তনতা, সর্বজনীন সত্য ইত্যাদি প্রসঙ্গে সমৃদ্ধ এই কাব্যগ্রন্থ।

খুতাব আল দিকতাতুর আল মাওজুনাহ

দারভীশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ফ্রান্সে অবস্থানকালে যেসব কবিতা একটি সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল তারই সংগৃহীত রূপ এই কবিতাগ্রন্থ। ২০১৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে রচিত হয় এসব কবিতা। একটি রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত, কিংবা দারভীশ কিধরনের একটি রাষ্ট্র কল্পনা করেন তারই একটি আদর্শিক চিত্র উঠে এসেছে এই কাব্যগ্রন্থে। কিংবা দারভীশ একটি রাষ্ট্রগঠনের মধ্যদিয়ে কিধরনের জীবন যাপন করতে চান, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক-নাগরিকের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, জনগণ, অধিকার, যুদ্ধ-শান্তি, লড়াই-সংগ্রাম, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, প্রতিরোধ, ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-কৃষি-জীবীকা, ভাষা, চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, নারীপ্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়ে সামগ্রিক এক বয়ান উঠে আসে এই কবিতাবইয়ে। এটি বস্তুত দারভীশের আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পিত প্রকল্প। যেখানে তার মতাদর্শিক প্রকাশ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে দারভীশ বস্তুত সেকুলার, গণতান্ত্রিক এবং এক ধরনের কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণার অবতারণা করেন।

ফী হাদরাত আল গিয়াব (অনুপস্থিতির উপস্থিতি)

২০০৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। দারভীশ তার এই গ্রন্থ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তাতে এটাকে যেমন পদ্য বলা যায়না তেমনি গদ্যও বলা যায়না। দারভীশ শেষপর্যন্ত কবিতা হিসেবে বেশি বিবেচনা করতে চান। এটি দারভীশের সবথেকে আলোচিত গ্রন্থ। জিদারিয়্যাহ'র পর এটি দারভীশের আরো একটি অমর গ্রন্থ। দারভীশ এখানে তার প্রজ্ঞা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সংবেদনশীলতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মৃত্যুচিন্তাকে কেন্দ্র করেই বইটির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা, প্রজ্ঞার মহাজাগতিক পরিভ্রমণ, অনুসন্ধিৎসা, ভাষা-অর্থ-কাব্য কিভাবে সৃষ্টি হয়, মানুষ ও ভাষার সম্পর্ক, শরীর-আত্মা, সত্তা-অস্তিত্ব, ক্ষমতার সম্পর্ক, প্রতিরোধ, ধর্ম-সংস্কৃতি, স্মৃতি-পুরাণ ইত্যাদি অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ এই কালজয়ী গ্রন্থ।

আছার আল ফারাশাহ (বাটারফ্লাই ইফেক্ট)

২০০৮ সালে প্রকাশিত হয় *আছার আল ফারাশাহ*। সমালোচকরা এটিকে গদ্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে তার বর্ণনাভঙ্গি, ভাষাগত উপস্থাপনরীতি কবিতার আঙ্গিকে রচিত। যেকারণে গদ্য হয়েও এটি কবিতার মতো পাঠ করা যায়। এটি একটি বড় আকারের গ্রন্থ। যাতে বিচিত্র রূপক ও প্রতীকাশ্রয়ে দারভীশ ফিলিস্তিনের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ফিলিস্তিন কিংবা স্বাধীন ফিলিস্তিনের জন্য সংগ্রামরত লড়াকুদের তিনি বাটারফ্লাই ইফেক্টের সাথে তুলনা করে দেখাতে চেয়েছেন, ফিলিস্তিন এবং তার যোদ্ধারা এমন এক সত্য যাদের চিরকাল দমিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তার প্রত্যাবর্তন অনিবার্য।

জাকিরাহ আল নিসইয়ান (বিস্মৃতির স্মৃতি)

১৯৮7 সালে প্রকাশিত হয়। এটি একটি গদ্যগ্রন্থ। ১৯৮২ সালে লেবাননে শাবরা-শাতিলায় ইজরাইলের অবরোধ ও গণহত্যার স্মৃতির পটভূমিতে রচিত এই গ্রন্থ। দারভীশের আলোচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এখানেও দারভীশ ফিলিস্তিনকেই প্রকাশ করেছেন বস্তুত। অবরুদ্ধ হয়ে গৃহবন্দী দশায় রচিত হয় এই গ্রন্থ। যে স্মৃতি হারিয়ে গেছে, নাকবার মতো ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে কিংবা শাবরা-শাতিলার ভয়ঙ্কর স্মৃতির মতো জায়োনিজমের বিচিত্র তৎপরতার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনের যেসব স্মৃতি নাই করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তারই পুনরুদ্ধারের এক বয়ান এই গ্রন্থ। কফি তৈরি কিংবা কফি পান এর মতো সাধারণ অনুষঙ্গ থেকে পুরো বইটির বিশাল বিস্তার গড়ে তোলেন দারভীশ। বস্তুত এক কাহিনীবয়ানের মধ্যদিয়ে কবি স্মৃতির অন্যতরো দার্শনিক তাৎপর্য হাজির করেন। যাতে তিনি ফিলিস্তিনের প্রতিরোধের ভিন্ন এক রূপকল্প রচনা করেন।

অধ্যায়-পরিচয় ও বিন্যাস

অভিসন্দর্ভটি ৬টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের ভিতরে উপশিরোনাম ও ক্রমসংখ্যার মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদগুলোকে সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়ে ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ফিলিস্তিনের নাম, পরিচয়, ভৌগলিক অবস্থান, শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে জায়োনিজমের উত্থানের পটভূমি সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে মাহমুদ দারভীশের জীবন ও কর্মের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাকবা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপনিবেশায়ন, জায়োনিজম, ইজরাইলের হামলা-নিপীড়ন-দখলদারিত্ব, নাকবাত্তোর সামাজিক পরিস্থিতি, নাকবা বিষয়ক চিন্তা ও ধারণা বিশ্লেষণ, উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতি, নাকবা পরবর্তী ফিলিস্তিনের আরবী সাহিত্য নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়ে ফিলিস্তিনের জাতীয় আত্মপরিচয় ও কর্তাসত্তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কর্তাসত্তা, স্বাধীন সত্তা, সাধারণ মানুষের জীবন, শ্রমিকতা, দ্রোহ, আত্মপরিচয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, ঐতিহাসিকতা, আরবীয় সত্তা, আরব জাতীয়তাবাদ, নির্যাতন, জুলুম, দেশপ্রেম, জীবন ও অস্তিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়ে ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুক্তি সংক্রান্ত ধারণা, মুক্তির কর্তাসত্তা, চৈতন্য, শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কিত বিতর্ক, মুক্তির সম্ভাবনা, চিন্তা, বিপ্লব ও রাষ্ট্র নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায় প্রতিরোধ সংক্রান্ত। এ অধ্যায়ে প্রতিরোধের ইতিহাস, প্রতিরোধ সম্পর্কিত চিন্তা ও ধারণা, গণপ্রতিরোধ, দারভীশের প্রতিরোধ, ছুমুদ, ক্ষোভ, দ্রোহ, ইজরাইলের বলপ্রয়োগ ও সাম্রাজ্যবাদী আচরণ, ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের দ্বিতীয়াংশে *গণ* সম্পর্কিত ধারণা, গণমানুষ, অন্তর্পাঠ্যতা ও সংলাপ বিষয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

এ অধ্যায়ে সাবঅল্টার্ন, বিউপনিবেশায়ন, প্রকৃতি, ভাষা, অর্থ, শরীর, গায়েব-হাজের, ভাষা ও অবিনির্মাণ, ক্ষমতা, স্থান-কাল, ইতিহাস, স্মৃতি, পুরাণ-রূপকথা, নির্বাসন, প্রত্যাবর্তন, ইতিহাসচিন্তা এবং ধর্ম ও লিবারেশন থিওলজি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সবশেষে, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জীর মাধ্যমে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

গবেষক

প্রথম অধ্যায়
ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং মাহমুদ দারভীশ

ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় গত ঊনিশ শতকে উদ্ভব হওয়া বিশ্ববাস্তবতার নতুন পরিস্থিতি। তবে এই আত্মপরিচয়ের পাটাতনের সাথে ফিলিস্তিনী জাতিসত্তার ক্রমবিকাশ এবং তার পূর্ব ঐতিহাসিকতার একটি ছাপ ও আবহ সম্পৃক্ত আছে নিঃসন্দেহে। মাহমুদ দারভীশের চিন্তা, দর্শন, রাজনীতি ও কবিতায় ফিলিস্তিনের যে স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে তার সাথে ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে এখানে ফিলিস্তিনের ইতিহাসের আলোচনাও জরুরি। ফলে অল্প পরিসরে এখানে ফিলিস্তিনের ইতিহাস তুলে ধরা হলো। একইসাথে মাহমুদ দারভীশের জীবন ও কর্মের সারসংক্ষেপ আলোকপাত করা হয়েছে।

১.১: ফিলিস্তিন: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
১.২: ভৌগলিক অবস্থান ও নাম
১.৩: প্রথম বসতি বিতর্ক: আরব না ইজরাইল?
১.৪: ফিলিস্তিন: হযরত ইব্রাহীম (আ) ও ইহুদিদের বিস্তার
১.৫: ফিলিস্তিন: মিশরীয় শাসন
১.৬: ফিলিস্তিন: আশিরীয় শাসন
১.৭: নেবুখাজ নাছর (নেবুচাদনেজার) এবং বেবিলন
১.৮: ফিলিস্তিন: পারস্য শাসন
১.৯: ফিলিস্তিন: গ্রিক ও রোমান শাসন
১.১০: ফিলিস্তিন: হযরত ঈসা ও খ্রিস্টানদের উত্থান
১.১১: ফিলিস্তিন: ইসলাম, আরব ও উসমানি শাসন
১.১২: ফিলিস্তিন: ব্রিটিশ ও জায়োনিস্ট উপনিবেশ
১.১৩: জায়োনিস্ট উত্থানের ঐতিহাসিক পটভূমি

মাহমুদ দারভীশ: জীবন ও কর্মের সারসংক্ষেপ

১.২.১: মাহমুদ দারভীশ, সংক্ষিপ্ত পরিচয়
১.২.২: শিক্ষা
১.২.৩: কবিতা
১.২.৪: রাজনীতি, পেশা ও কাব্য তৎপরতা
১.২.৫: বিয়ে, সম্পর্ক এবং মৃত্যু
১.২.৬: রচনাবলী
১.২.৭: কবিতা
১.২.৮: গদ্য

১.১: ফিলিস্তিন: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ফিলিস্তিনে অনেক নবী-রসূলের জন্ম ও আগমন ঘটেছিল। যে এলাকা সম্পর্কে পবিত্র তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল এবং কোরআনে ইতিবাচক বর্ণনা রয়েছে। পবিত্র কোরআনেও ফিলিস্তিনের বায়তুল মোকাদ্দাসের নাম এসেছে।[১] এমনকি পবিত্র এবং বরকতময় এলাকা হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিভিন্ন হাদিসে বলা হয়েছে। এছাড়া বায়তুল মোকাদ্দাস সংক্রান্ত আরো বেশকিছু হাদিসের বর্ণনা এসেছে বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে। যেখানে ফিলিস্তিনের বায়তুল মোকাদ্দাসের বিজয়ের কথা এসেছে।[২] এরপরও অলৌকিক কারণে এ অঞ্চলটি অতিপ্রাচীনকাল থেকে ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন সময়ে বারবার বহিরাগতদের শাসনে জর্জরিত। নবীদের আমল ছাড়াও বিভিন্ন কালপর্বে ব্যাবিলনীয়, পারস্য, আলেকজান্ডার, গ্রেকো-রোমান, বাইজ্যান্টাইন, ইসলাম-আরব, উমাইয়্যাহ, আব্বাসী, ফাতিমী, ক্রুসেড, মামলুক, আইয়ুব, উসমানী, নেপোলিয়ান, ব্রিটিশ ম্যান্ডেটসহ বহু দখল ও শাসনকাল অতিক্রম করেছে ফিলিস্তিন। এসব শাসন ও দখলদার কোনো কোনো জাতিকে ফিলিস্তিন নিজেদের কল্যাণে ও ইতিবাচক স্বার্থে আত্মীকরণ করে নিয়েছিল। আবার কোনো কোনো জাতি ফিলিস্তিনের উপর জুলুমের এক নরক হয়ে এসেছিল। তাই তাদের সাথে সংঘাত এবং প্রতিরোধও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এভাবে অসংখ্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ, দখল, বসতিস্থাপনে ফিলিস্তিনের ইতিহাসপাঠ যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি অতি বেদনার। বর্তমানকালে ফিলিস্তিন যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, এটিও তেমনি পূর্বধারাবাহিকতার এক জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। যেকোনো সংকটময় অবস্থা তৈরি হওয়ার পেছনে সাধারণভাবে যে ঐতিহাসিক কারণ চিহ্নিত করা হয়, ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রেও সেভাবে চিহ্নিত করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ফিলিস্তিনের সংকট যেন এক ঐতিহাসিক নিয়তি হিসেবে নির্ধারিত হয়ে আছে, যা আর সব সংকটেরও কারণ হিসেবে জটিলতা সৃষ্টি করে।

১.২: ভৌগলিক অবস্থান, পরিচয় ও নাম

সিরিয়ার দক্ষিণ, জর্ডানের পশ্চিম ও লেবাননের দক্ষিণে এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব দিকে ফিলিস্তিন অবস্থিত। চার ধরনের ভৌগলিক অঞ্চল রয়েছে ফিলিস্তিনের। দক্ষিণে রয়েছে সিনাই উপদ্বীপ অঞ্চল। জর্ডান উপত্যকা (Jordern Velly) ও নদী-অববাহিকা (Jordern River), উপকূলীয় ও সমতল ভূমি, পর্বত ও মালভূমি এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় মরুভূমি।[৩] ফিলিস্তিন শব্দটি আরবী নাকি হিব্রু তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। ইহুদি ধর্মবিশারদ এবং ইতিহাসবিদগণ ফিলিস্তিন শব্দকে হিব্রু শব্দ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। তবে মুসলিম ইতিহাসবিদ এবং আররী ভাষাবিদরা আরবী হিসেবেই চিহ্নিত করে থাকেন। ফিলিস্তিন নাম ধারণ করার আগে প্রাচীনকালে এর একাধিক নাম ছিল। গোত্রগুলো

---

১. আল কুরআন, *সূরা বানী ইসরাইল।* আয়াত: ১।

২. আল বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। *ছহীহ আল বুখারী*, হাদিস নং: ৩১৭৬, পৃ. ।

৩. আল-নাক্কাশ, রজা, *মাহমুদ দারভীশ: শায়ির আল-আরদ আল-মুহতাল্লাহ*, (কায়রো, মিশর: দার আল-হিলাল, ১৯৭১ ইং), পৃ. ১১৫।

খ্রিস্টপূর্ব ১২ শতাব্দীতে আক্রমণ করার আগ পর্যন্ত *আরদু ক্যানআন* নামে প্রচলিত ছিল ফিলিস্তিন[৪]। মিশরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে 'ب، ل، س، ت' বা 'বালিস্ত' শব্দ উদ্ধার করেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। যাতে পরবর্তীতে বহুবচন বোঝানোর জন্য শব্দটির শেষে আরবী 'নূন' বর্ণ যুক্ত হয়ে বালিস্তিন গঠিত হয়। কালক্রমে ধ্বনি বিবর্তিত হয়ে এটি ফিলিস্তিন শব্দরূপ লাভ করে।[৫]

১.৩: প্রথম বসতি বিতর্ক: আরব না ইজরাইল?

ঠিক কতো সনে এখানে বসতি স্থাপন শুরু হয় তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ১৪ হাজার সনে প্রস্তরযুগে ফিলিস্তিনের প্রথম মানব বসতি গড়ে ওঠে[৬]। তবে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায়, এখানে প্রথমে যারা বসবাস শুরু করেছিলেন, তারা প্রথমে পশু চারণ করতেন। পরবর্তীকালে তারা কৃষি কাজ শুরু করেন। এভাবে প্রথম মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে ফিলিস্তিন অঞ্চলে। কালক্রমে এখানে নগর সভ্যতারও পত্তন ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৮ হাজার সনে ফিলিস্তিনের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রথম নগর গড়ে ওঠে। যার নাম ছিল 'আরীহা'(أريحا)।[৭]

মূলত এ অঞ্চলটি ছিল ধর্মের উৎসভূমি। যে কারণে দেখা যায় সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান, সিনাই, মিশর ও ফিলিস্তিন অঞ্চলে কোরআনে বর্ণিত প্রায় সব নবি-রসূলের আগমন। সিরিয়ার দামেস্কের উত্তরে হীলে কাহছিতে চতুর্থ মানব হাবিলের কবর উদঘাটন করা হয়। এছাড়া হযরত আদম, ইবরাহীম (আ.) সহ বিভিন্ন নবী রসূলের কবর সিরিয়া-ইরাকসহ বৃহত্তর আরব অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে এখানকার আদি উত্তারাধিকার আরব-ইসলামের প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত বলে এমন দাবি আরব মুসলমানদের। হযরত আদম (আ.) এর ১৩০ বছর পর হযরত শীষ, ২৩৫ বছর পর হযরত ইউনুস (আ.) এর আগমন হয় এই অঞ্চলে। প্রায় ৩২৫ বছর পরে আদম (আ.) এর পঞ্চম পুরুষ কেনানের জন্ম। তারই সূত্র ধরে কেনানদের বিস্তার এই আরব উপদ্বীপেই। খৃস্টপূর্ব তিন হাজার সনে কেনানরা আরব উপদ্বীপ থেকে সিরিয়ার দক্ষিণের এই অংশে এসে বসতি বিস্তার করে। ঐতিহাসিকভাবে তারাই ফিলিস্তিনের প্রথম সংগঠিত অধিবাসী বলে প্রমাণিত। ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থ তাওরাতেও কেনানদের কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে জায়োনিস্ট ইহুদিরা কেনানদের থেকে ইতিহাস শুরু করলেও তারা ফিলিস্তিনকে আদি অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। ঐতিহাসিক এবং প্রাচ্যবিদ লিওন

---

[৪]. খান, জাফার আল ইসলাম, *তারীখু ফিলিস্তিন আল ক্বদীম*, (বৈরুত, লেবাননঃ দার আল-নাফায়েস, ৩য় সং., ১৯৮১ ইং), পৃ. ১৫। এবং জিওগ্রাফী, প্যালেস্টাইন, ১৪ জানুয়ারি, ২০২১, http://www.ambasciatapalestina.com/en/palestine/geography/#targetText=Palestine%20is%20located%20to%20the,and%20Hills%20and%20Southern%20Desert

[৫]. *ফিলিস্তিন আরাবিয়্যাহ মুনজু ইসতাওত্বনাহা আল-কানআনিয়্যুন* (কাতার: আল জাজিরা), ভিজিট: অক্টোবর ৩, ২০০৪। فلسطين عربية منذ استوطنها الكنعانيون | الجزيرة نت (aljazeera.net)

[৬]. আল ক্বত্বাত্বী, আরীজ আহমাদ, *ফিলিস্তিন ফী মাজাল্লাহ আল-মানার আল-ছাদিরাহ ফী মিছর (১৮৯৮-১৯৪০)* (গাজা: দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১১।

[৭]. সালেহ, ড. মুহসিন মুহাম্মদ, আল-*ক্বাদিয়্যাহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ, খলফিয়্যাতুহা আত-তারীখিয়্যাহ ওয়া তাত্বওয়ারাতুহা আল-মুআছিরাহ* (বৈরুত: মারকাজ আজ-জাইতুনাহ লিদদিরাসাত ওয়া-আল-ইসতিশারাত, ২০১২ ইং), পৃ. ১৩।

কাতিয়ানির মতে, এই কেনানরা মূলত ছিল আরব। তারা সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করতো। যেটি ফিলিস্তিন নামে পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়। তারা সিরিয়ার উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী ফিনিশীয় জাতির গোত্রভুক্ত। ফিনিশীয়রা সেইসব সেমেটিক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা আরব উপদ্বীপ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২৫০০ সনের মধ্যে সিরিয়ার এই অঞ্চলে আগমন করেন। সেমিটিকদের মধ্যে সুমিরীয় ও আরামীয়রা এখানে এসে যেমন উঁচু বা মালভূমিতে বসবাস করতো তেমনি কেনানিরা এখানে সমতল ভূমিতে থাকতো, যাদের মূল শিকড় ছিল আরব[৮]। কেনানদের ভাষা ছিল কেনানীয় কিংবা ক্যানানাইট ভাষা। যেটা মূল সেমিটিক ভাষার কাছাকাছি। অর্থাৎ প্রাচীন আরবী আর কেনানি ভাষা ধ্বনিগত দিক থেকে প্রায় কাছাকাছি ছিল[৯]।

তবে পশ্চিমের আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা মিশর ও ইরাকের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আলামত থেকে প্রমাণ করেন যে, এই অঞ্চলে কেনানদের বসবাস আরো অনেক প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৭ হাজার বছর আগে থেকে তারা এখানে বসবাস শুরু করেন। এবং যে আরীহা নগরের কথা বলা হয়, তা তাদের হাতেই তৈরি হয় বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন, যেটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন নগরী। এছাড়া জ্যারিকো, আকু (বর্তমানে আক্কা), আশদাদ (বর্তমানে উসদুদ), আল-মাজদাল, গাজা, ইয়াফি (বর্তমানে ইয়াফা), জাফা, আসকেলান ও বিসান তাদের হাতে গড়া নগরী। এছাড়া কিছু নগরীর নাম কালক্রমে একেবারে পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন, ইয়াবুস (বর্তমানে আল-কুদস), শাকীম (বর্তমানে নাবলুস), আশকেলুন (বর্তমানে আসকেলান), বাইতু শান (বর্তমানে বিসান), ছদ্দীম (বর্তমানে হাত্বীন) এবং জাযের (বর্তমানে আবু শাওশাহ)। এসব নগরী এখন অব্দি ফিলিস্তিনের মাটিতে সতেজ, জীবন্ত[১০]।২৮ এছাড়া দুই শতাধিক ছোট্ট ছোট্ট নগরী তারা গড়ে তুলেছিলেন, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নকশা ও শিলালিপি, প্রাচীর ও বোর্ডে যার উল্লেখ রয়েছে। এই নামগুলোর সবই ছিল প্রাচীন কেনানি-আরবী ভাষার। এসব প্রাচীন নগরীর অনেক নামই জায়োনিস্টরা পরিবর্তন করে তারা দাবি করছে, এসব নাম হিব্রু ভাষার। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, এসব নাম এবং প্রাচীন স্থাপত্য ইজরাইলিরা আক্রমণ ও দখল করার আগে থেকেই ফিলিস্তিনে বিদ্যমান ছিল[১১]।

ফিলিস্তিনের ভূমিতে ঐতিহাসিকভাবে উত্তরাধিকার প্রমাণ করার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভাষা কি ছিল কিংবা কারা প্রথম এখানে বসতি গড়ে তুলেছিল তাই মোটামুটি মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এখন পর্যন্ত যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে, তাতে ফিলিস্তিনের আদি অধিবাসী ছিল কেনানরা। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের কাছে এবং বিশেষভাবে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বীকৃত। কিন্তু ইহুদি পণ্ডিত এবং

---

৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০। এবং আল গাদিরি, ফাওজি, *দি হিস্ট্রি অফ প্যালেস্টাইন: আ স্টাডি*, পৃ. ৫ ও ১৭। অনলাইন সংস্করণ: https://www.academia.edu/3358305/The_History_Of_Palestine._A_study_by_Fawzy_Al-Ghadiry

৯. আল মুদাল্লাল, ড. ওয়ালিদ হাসান, ও আদনান আব্দুর রাহমান আবু আমের, *দিরাসাত ফী আল-ক্বাদিয়্যাহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ* (গাজা, ফিলিস্তিন: জামিআহ আল উম্মাহ লি আল-তা'লীম আল-মাফতুহ, ২০১৩ ইং), পৃ. ৫।

১০. আল গাদিরি, ফাওজি, *দি হিস্ট্রি অফ প্যালেস্টাইন, আ স্টাডি*), পৃ. ১৮, https://www.academia.edu/3358305/The_History_Of_Palestine._A_study_by_Fawzy_Al-Ghadiry। এবং আল মুদাল্লাল, ড. ওয়ালিদ হাসান, ও আবু আমের, আদনান আব্দুর রাহমান, *দিরাসাত ফী আল-ক্বাদিয়্যাহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ*, ২০১৩, পৃ. ৭।

১১. প্রাগুক্ত। পৃ. ৭।

ঐতিহাসিকদের যেসব ইতিহাস প্রচারিত তাতে ফিলিস্তিন নামক কোনো ভূখণ্ডকেই স্বীকার করা হয় না। তাদের যুক্তির উৎস হলো তাওরাত এবং তালমুদ গ্রন্থের ভাষ্য। ইহুদি পণ্ডিতরা কেনানদের থেকে ইতিহাস শুরু করলেও ইজরাইলীদেরকে তার উত্তরাধিকার হিসেবে প্রমাণ করেন। অর্থাৎ ইজরাইলীরা এসেছে কেনান থেকে। যদিও বাইবেলে ফিলিস্তিন শব্দের উল্লেখ রয়েছে[১২]। এছাড়া ভাষা পশ্নেও জোর বিতর্ক রয়েছে। জায়োনিস্ট ইতিহাসবিদরা বলছেন, হিব্রুই এ অঞ্চলের প্রাচীন ভাষা। ভাষা বিতর্কে জায়োনিস্টদের যুক্তিতে ফিলিস্তিন বলে কিছু নাই। আদি থেকে ইজরাইল ছিল। জায়োনিস্ট, ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ, তাত্ত্বিক এবং প্রাচ্যবিদদের বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি তাওরাত। কিন্তু গত বিশ শতক থেকে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ইরাকে প্রাচীন সভ্যতার যেসব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা ছিল আরবী। বিশেষত বর্তমান সিরিয়ার দক্ষিণে পর্বতাঞ্চল খনন করে খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার বছর আগের 'ইবলা' (إيبلا) নগরের আবিষ্কার করা হয় ২০১১ সনে। এর খনন কাজ চলে ১৯৬৪ থেকে ২০১১ ইংরেজি সন পর্যন্ত। এতে পুরো খনন কাজ সম্পন্ন করতে সময় লেগেছে দীর্ঘ ৪৭ বছর। এখন পর্যন্ত এ অঞ্চলে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে এটি ছিল সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের ঘটনা। লিখিত ভাষা সম্পদ হলো ইবলা থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। যাতে ১৫ হাজারেরও অধিক লিখিত মাটির পাত্র উদ্ধার করা হয়। এতে প্রাচীন সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন সংক্রান্ত অনেক অজানা তথ্য ও তত্ত্ব উদঘাটন করা সম্ভব হয়। যাতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, আদি ফিলিস্তিনীরা আরবী ভাষায় কথা বলতো। এ ভাষা মেসোপটিমিয়ার ভাষা 'আকাদ' থেকে ভিন্ন ছিল এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের উপকূলীয় এলাকার 'কেনানদের' ভাষার কাছাকাছি ছিল। সিরিয়া-ফিলিস্তিনের এ অঞ্চলে যে ভাষাগুলো প্রচলিত ছিল সেগুলো যেহেতু কাছাকাছি এবং যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাই সেগুলো মূলত একই ভাষার উপভাষা। এবং তারা বিভিন্ন গোত্র-বংশের হলেও একই জাতিভুক্ত ছিল। যা সুমিরীয়, হুরীয় এবং হিত্তীয়দের ভাষা থেকে একেবারে ভিন্ন ছিল।[১৩]

উল্লেখ্য, কেনানরা ছিল বেশ উন্নত জাতি। কৃষিতে এবং কারিগরি শিল্প-উৎপাদনে তৎকালীন সময়ে ওই অঞ্চলে সবচেয়ে দক্ষ ছিল কেনানরা। তৈজষপত্র থেকে শুরু করে লোহার তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জমাদি তৈরিতে তাদের বিপুল সুখ্যাতি ছিল। ঘরের ছাদে পানির হাউজ এবং পানির সরবরাহ করতে মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক অবদান। তবে রাজনৈতিকভাবে তারা সংগঠিত না থাকায় তাদের মধ্যে প্রায়ই হানাহানি ও বিবাদ লেগে থাকতো। যেকারণে মিশর এবং ইয়াহিসসীনদের (হিত্তী জাতি) মতো বহিরাগত শক্তিরা প্রায়ই তাদের উপর আক্রমণ করতো। যেকারণে তারা প্রচুর পতিরক্ষা দেয়াল ও দূর্গ তৈরি করে। নির্মাণ করে বহু প্রাসাদ। যা আজও বর্তমান রয়েছে।[১৪] এই শক্তিশালী ও বৈষয়িকভাবে উন্নত কেনানদের কাছেই আসেন হযরত

---

১২. খান, জাফারুল ইসলাম, *তারীখু ফিলিস্তিন আল-কাদীম*, ১৯৮১, পৃ. ১৫-১৮।

১৩. আল-বাহানসী, ড. আফীফ, *তারীখু ফিলিস্তিন আল-ক্বাদীম মিন খিলালি ইলমি আল-আছার* (দামেশক, সিরিয়া: মানশুরাত আল-হাইয়া আল-আম্মাহ আল-সুরিয়্যাহ লিল কিতাব, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, ২০০৯ ইং), পৃ. ১১।

১৪. আল মুদাল্লাল, ড. ওয়ালিদ হাসান, ও আবু আমের, আদনান আব্দুর রাহমান, *দিরাসাত ফী আল-ক্বাদিয়্যাহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ*, ২০১৩, পৃ. ৫।

মুসা (আ)। কোরআনে যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। *তারা বলে, হে মুসা! তাতে রয়েছে এক শক্তিশালী জাতি*
(قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين) (সুরা আল মায়িদাহ, আয়াত ২২)।

১..৪: ফিলিস্তিন: হযরত ইব্রাহীম (আ) ও ইহুদিদের বিস্তার

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ফিলিস্তিনে আগমনের সাথে ইহুদি-ইজরাইল, খ্রিস্টান ও ইসলামের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে অবিচ্ছিন্ন। মূলত যে ইহুদি কিংবা ইজরাইলীদের নিয়ে এতো কথা তার গোড়ার সম্পর্ক রয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর আগমন এবং তার বংশ থেকে পরবর্তী অন্যান্য নবী রসূলদের বিস্তার সম্পর্কিত ইতিহাসের সাথে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সন্তান ইসমাঈল এবং ইসহাক (আ.) থেকে দুটি ধারার উদ্ভব ঘটে যা ইতিহাসে *আব্রাহামিক রিলিজিয়নস* নামে আলোচিত। দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার ঔরসে প্রথম সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। যেখান থেকে হযরত মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত একটি ধারা। এই ধারাই এখন পর্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রবলভাবে জীবন্ত। অপরদিকে প্রথম স্ত্রী হযরত সারার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন দ্বিতীয় সন্তান হযরত ইসহাক (আ.)। হযরত ইসহাক থেকে হযরত ইয়াকুব (আ.) কিংবা ইজরাইলী ধারার উদ্ভব ঘটে। হযরত ইয়াকুব এর একাধিক স্ত্রী ছিলেন। তাদের বারো সন্তানের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.) এবং বিন-ইয়ামিন ছিলেন একই স্ত্রীর ঔরসজাত। অন্যদের মধ্যে চতুর্থ সন্তান *ইহুদ* ছিলেন সবথেকে চতুর বুদ্ধিমান এবং প্রভাবশালী। পরবর্তীকালে ইহুদ থেকে যেসব বংশ বিস্তার ঘটে কালক্রমে তারাই *ইহুদি জাতি* নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।[১৫]

খ্রিস্টের জন্মের ২৫০০ থেকে ৩ হাজার বছরের মধ্যে বাবেল নগরীর (তৎকালীন সময়ে বাবেল বা বেবিলন ছিল সবচেয়ে উন্নত এক সভ্যতা, বর্তমান ইরাকের উত্তরাঞ্চলে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ছিল এর অবস্থান।) চালদিয়া (Chaldea/Chaldees) অঞ্চলের "উর" (Ur) নামক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। সে সময়ে এই বাবেল নগরীতে বসবাস করতেন চরম প্রতাপশালী সম্রাট নমরুদ। বাবেল ছিল আক্কাদিয়ান সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক রাজধানী শহর। বাইবেলে নিমরুদ নামে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এই নগরীতেই তওহীদের প্রচার করছিলেন হযরত ইব্রাহীম। কিন্তু প্রচারণার ফলে নরুদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তিনি জন্মভূমি ছেড়ে ফিলিস্তিনের কেনানের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। পথিমধ্যে তিনি হারান নামক স্থানে সাময়িক বিশ্রামের জন্য প্রথমবারের মতো অবস্থান গ্রহণ করেন। হারান ইউফ্রেটিস এবং খাবর অঞ্চলের পূর্ব-উত্তর সীমান্তে অবস্থিত। যেখানে তার পিতা *তারেখ* (Tarih) ইন্তেকাল করেন। পরে সেখান থেকে তিনি কেনানের শাকীমে (বর্তমানে এটি নাবলুস নামে পরিচিত) আসেন। এবং আল-খালীলে (ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে যা হেবরন নামেও পরিচিত হয়ে ওঠে) এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। যেটি উরশালিম (উর মানে

[১৫]. রহমান, সাইদুর ও সিদ্দিক, *মুহাম্মদ, ইসরাইল ও মুসিলম জাহান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ ইং), পৃ. ৪০।

নগরী, শালিম বা সালিম মানে নিরাপদ। অর্থাৎ শান্তি বা নিরাপদ নগর।) কিংবা জেরুজালেমের অন্তর্গত ছিল। ইহুদিদের তাওরাত এবং বাইবেল এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। একসময় এখানেই তিনি তার প্রথম সন্তান হযরত ইসমাঈলের জন্মগ্রহণে আল্লাহর অশেষ রহমতে সিক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি আরো এক সন্তান লাভ করেন। যার নাম হযরত ইসহাক। হযরত ইসহাকের ছেলে ইয়াকুবের ঘরে যে বারো সন্তানের জন্ম হয় তাদের প্রত্যেকের নামে একটি করে মোট ১২টি গোত্রের উদ্ভব হয়। এবং এভাবেই এখানে ইহুদি তথা ইজরাইলী বংশের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। একইসাথে তাদের বংশ থেকে হযরত ইউসুফ, আইয়ুব, ইউনুস, মুসা, হারুন, খিজর, দাউদ, সুলাইমানসহ বহু নবী-রসূলের আগমন ঘটে। যাদের প্রায় সবারই অবস্থান ছিল কেনান, জুদাহ, জুদাই, নাবলুস, আকা, সিনাই, জুদাহ এবং ফিলিস্তিনসহ বৃহত্তর এই অঞ্চলে। মোটকথা ফিলিস্তিন তথা জেরুজালেম হয়ে ওঠে এক ঐতিহাসিক পুণ্যভূমি। তবে তাদের বসবাস, নিয়ন্ত্রণ কিংবা ক্ষমতাশীল অবস্থান সবসময় জেরুজালেম তথা ফিলিস্তিনের মাটিতে ছিলনা। তারা কখনো কখনো মিশরে অভিবাসিত হয়েছে। আবার ফিরেও এসেছে। বিশেষ, হযরত ইউসুফের শাসনকালে মিশরে ব্যাপক শক্তিশালী হয়ে ওঠে ইহুদিরা। কিন্তু যে হযরত ইউসুফের যে বিশেষ অনুসারীদের বিস্তার ঘটে মিশরে তার সাথে তার বৈমাত্রেয় অন্যান্য ভাইদের যথেষ্ট ফারাক ছিল। অর্থাৎ হযরত ইউসুফের অনুসারী এবং হযরত ইয়াকুবের অন্য ১০ সন্তান থেকে উদ্ভব হওয়া গোত্রের ইহুদিরা এক নয় বলে ধারণা করা হয়। যাইহোক, কালক্রমে ফারাও বংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠলে তাদের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে ইহুদিরা ফেরাউনদের দাসে পরিণত হয়। সংঘাত চরম আকার ধারণ করলে ইহুদিরা আবার ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমে পালিয়ে আসে।

উল্লেখ্য, হযরত মুসা (আ.) যখন মিশর থেকে ফিলিস্তিনে আগমন করেন, তখন তার সাথে তার অনুসারী হিসেবে যারা এসেছিল তাদেরকে কি ইজরাইলি বলা যায়? কারণ হযরত মুসার আগমনের সময় তার হাত ধরে জেরুজালেমে ইজরাইলীদের প্রবেশের কাহিনীর কোনো শক্তিশালী ভিত্তি নাই। প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো প্রমাণও নাই। যেহেতু তারা শেষপর্যন্ত মুসার সাথে জেরুজালেমে প্রবেশ করেনি। বরং তারা অন্যকোনো স্থানে বসতি গড়ে তুলেছিল।

১..৫: ফিলিস্তিন: মিশরীয় শাসন

প্রাচীন ফারাওরা বারবার হামলা চালিয়ে চেষ্টা করেছিল ফিলিস্তিন দখল করতে। ইহুদিদের পালিয়ে এখানে অবস্থান নেয়ায় ফারাওরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার কেনানের জনগণ বেশ শক্তিশালী ছিল। তাদের মধ্যে বিভেদ থাকলেও তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহতকরণের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ ছিল। আক্রমণ প্রতিরোধে তারা দীর্ঘ প্রাচীর ও দূর্গ তৈরি করে। তবে শেষপর্যন্ত মিশরের ফারাওরা ফিলিস্তিন আক্রমণ করে। হযরত দাউদ ও সোলায়মানের মৃত্যুর পর খ্রিস্টপূর্ব ৯২৫ সনে মিশরের ফারাও সম্রাট শিশান্‌ক হামলা চালিয়ে ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম দখল করে।

১.৬: ফিলিস্তিন: আশিরীয় শাসন

এরপর ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম নগরী ক্রমাগত আক্রমণ ও দখলের কলোনীতে পরিণত হয়। ৭২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ফিলিস্তিন অঞ্চলে হামলা চালায় আশিরীয়রা। এতে তারা ইহুদীদের গুরুত্বপূর্ণ দুটি শহর জেরজালেম এবং ইহুজা দখল করে নেয়। আশিরীয়দের নিয়ন্ত্রণ এবং শাসনের মধ্যদিয়ে ইহুদিদের সবধরনের অবস্থান সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। যেখানে ইরাক-সিরিয়া-ফিলিস্তিনসহ প্রাচীন মেসোপটিমিয়া অঞ্চলে আশিরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় ইহুদিরা বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করে শাসনক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা ব্যর্থ হওয়ার পর আরো বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এতে করে বেশিরভাগ ইহুদিদেরকে আশিরীয়রা ইরাকের দিকে ঠেলে দেয়। খ্রি খ্রি

১.৭: নেবুখাজ নাছর (নেবুচাদনেজার) এবং ব্যাবিলন

মূলত আশিরীয়দের দখলদারিত্বের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনে বেবিলনীয় শাসনকালের সূচনা ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ থেকে ৬০৯ এর মধ্যে আশিরীয়দের পতন হয়। এরপরে বেবিলনীয় রাজা নেবুখাজ নাছরের উত্থান ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৬২০ সনে নেবুখাজ নাছরের বাবা নেবুপোলাসার নেতৃত্বে সংঘটিত বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে আশিরীয়দের পতন ঘটে। এবং তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠীত হন। তারপরই তার পুত্র নেবুখাজ নাছর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তবে ইহুদিরা মনে করেন, নেবুখাজ নাছর ছিলেন প্রচণ্ডরকম ইহুদিবিদ্বেষী। দীর্ঘ আঠারো মাস অবরোধ করার পর ৫৯৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইহুদিদের উচ্ছেদ করে ফিলিস্তিন দখল করে নিয়েছিল নেবুখাজ নাছর। আর ইহুদিদেরকে বেবিলনে বন্দি করা হয়। তবে সেখানে বিদ্রোহের চেষ্টা করলে ইহুদিদের পরিণতি ভয়াবহ খারাপ হয়ে ওঠে। এ সময় পুরো জেরুজালেম নগরী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়। যেখানে আগুনে পুড়ে যাওয়া অনেক নিদর্শন এখনো কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। নেবুখাজ নাছরের ভয়াবহ হামলা ও দমন-পীড়নের ফলে ইহুদিরা আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি দীর্ঘকাল। ফিলিস্তিনের ইতিহাসে এ সময়কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব হিসেবে দেখা হয়। কারণ এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা কাটিয়ে ওঠার পর যে ইহুদিদের পত্তন ঘটে তাদের মাধ্যমে নতুন ধরনের ইহুদিভাষ্য তৈরি হয়।

১.৮: ফিলিস্তিন: পারস্য শাসন

বেবিলনের ক্ষমতা গ্রহণের পর হামলা চালিয়ে ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ফিলিস্তিন দখল করে নেয় পারস্যরা। তারা প্রায় দুই শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিন শাসন করে। এ সময়ে বেবিলন থেকে ফিলিস্তিনে ফিরে আসে ইহুদিরা। এখানে পারস্যরা ছিল মূলত বেবিলনীয় আশিরীয়দের উত্তরসূরী। রাজা সাইরাস ছিলেন

সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন সময়ে পারস্য ২০টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ফিলিস্তিন ছিল ৫ম রাজ্য। আরামীয় ভাষায় যার নাম ছিল *আবর নাহরা*।

১.৯: ফিলিস্তিন: গ্রিক ও রোমান শাসন

খ্রিস্টপূর্ব ৪ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দখল। ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার সিরিয়া ও আল-কুদুসসহ ফিলিস্তিনকে গ্রিক সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করেন। প্রায় দুশ বছর গ্রিকরা শাসন করে এই অঞ্চল। এরপর ৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান রাজা পম্পির নেতৃত্বে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আল-কুদুস, ফিলিস্তিন ও সিরিয়া দখল করে নেয় রোমানরা।

১.১০: ফিলিস্তিন: হযরত ঈসা ও খ্রিস্টানদের উত্থান

রোমান শাসন চলাকালে হযরত ঈসা (আ) এর আগমন ঘটে। বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকে বাইতু লাহম (বর্তমানে যা বেথেলহাম নামে পরিচিত) নামক মরু অঞ্চলে হযরত মারইয়াম (আ.) এর ঔরসে ৪ থেকে ৬ তারিখের মধ্যে হযরত ঈসা জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত ঈসা ছিলেন বনি ইজরাইলের সর্বশেষ নবী। তার সময়কালকে তিনভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে তিনি আল্লাহর বাণী প্রচার করেন। দ্বিতীয় পর্বে তার অনুসারীদের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। তৃতীয় পর্বে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সময়কাল। এ সময়ে ইহুদিদের চক্রান্তে রোমানদের হাতে হযরত ঈসা ক্রুশবিদ্ধ হন। তবে হযরত ঈসার মৃত্যুর পরে রোমান সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃতি লাভ করে। এক পর্যায়ে ৭১ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন দখলের উদ্দেশ্যে রোমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ করে ইহুদিরা। রোমানরা স্থানীয় আরবদের সহযোগিতা নিয়ে ইহুদিদের এই বিদ্রোহ প্রতিহত করে। এ সময় বিপুল সংখ্যক ইহুদি রোমানদে হাতে নিহত হয় এবং অনেকে সিরিয়া, জর্ডান, মিশর ও জাজিরাতুল আরবে পালিয়ে যায়। সর্বশেষ ইহুদিরা ১৩৫ সনে ব্যাপক সংগঠিত হয়ে পুনরায় ফিলিস্তিন দখলের চূড়ান্ত চেষ্টা চালায়, কিন্তু রোমান সম্রাট হ্যাড্রিয়নের পাল্টা হামলায় ইহুদিরা ফিলিস্তিন ত্যাগে বাধ্য হয়। হ্যাড্রিয়ন এ সময় বায়তুল মোকাদ্দাসের যে অংশে ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল তা পুরাপুরি ধ্বংস করে দেয়। এবং সেখানে তিনি নতুন শহর গড়ে তোলেন। যেখানে ইহুদি প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এ ঘটনার পর ব্রিটিশ উপনিবেশের আগ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর ইহুদিদের ফিলিস্তিনে উল্লেখযোগ্য কোনো অবস্থান ছিলনা।

১.১১: ফিলিস্তিন: ইসলাম, আরব ও উসমানি শাসন

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর শাসনামলে সিরিয়া জয়ের লক্ষ্যে হযরত আমর ইবনুল আ'ছের নেতৃত্বে ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে অভিযান পাঠানো হয়। মৃত সাগরের দক্ষিণে ওয়াদিয়ে আরাবাহ নামক স্থানে যুদ্ধে রোমানদের পরাজিত করে ৬৩৪ সনে ইসলামি সৈন্যরা ফিলিস্তিনের গাজা

উপত্যকায় প্রবেশ করে। পরবর্তীতে আজনাদাইন, ইয়ারমুকসহ ছোট-বড় কয়েকটি যুদ্ধের পর ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও ইরাক অঞ্চল পুরো নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ইয়ারমুক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ফিলিস্তিনের খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নেতার শর্ত মোতাবেক খলিফা উমর (রা) ফিলিস্তিন সফর করেন। এ সময় ফিলিস্তিনের জেরুজালেমের গীর্জার প্রধান ধর্মীয় নেতা ছফর নিউস ও পেট্রিকের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাতে গীর্জা ও খ্রিস্টানদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তার কথা বলা হয়। একইসাথে চুক্তিতে শর্তারোপ করা হয়, কোনো ইহুদি পবিত্র নগরীতে বসবাস করতে পারবেনা। এরপর ১৯৪৮ এর আরব-ইজরাইল যুদ্ধের আগ পর্যন্ত জেরুজালেমে কোনো ইহুদির অবস্থান ছিলনা।

ইসলামের চার খলিফার শাসনের পর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সময়ে আরব ও তুর্কি শাসনাধীন ছিল ফিলিস্তিন। ৬৬১ থেকে ৭৫০ ছিল উমাইয়্যাহ শাসন। সিরিয়া কেন্দ্রিক খেলাফত হওয়ায় ফিলিস্তিন খুব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল সে সময়। এ সময়ে খলিফা সোলাইমান বিন আব্দুল মালেক এবং আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান বায়তুল মোকাদ্দাস এর অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করেন। উমাইয়্যা আমলের এই নির্মাণই এখন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন আছে। ৭৫০ থেকে ১২৫৮ পর্যন্ত ছিল আব্বাসীয়দের যুগ। এরমধ্যে ছেদ ঘটায় দুটি সম্প্রদায়। বনি তলুন এবং ফাতিমীয় কিংবা ইসমাইলীয় শাসন। বনি তলুনের নিয়ন্ত্রণে ৮৬৮ থেকে ৯০৫ সাল পর্যন্ত ছিল ফিলিস্তিন। এরপর হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর ফাতিমীয় শাসন প্রতিষ্ঠা হয় ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও মিশরে।

১০৯৫ সন থেকে শুরু হয় খ্রিস্টানদের ক্রুসেড যুদ্ধ। ১০৯৯ সনে প্রায় ৭০ হাজার আরব মুসলমানদের হত্যা করে পুরোপুরিভাবে ফিলিস্তিন দখল করে নেয় ক্রুসেডাররা। এ সময় বায়তুল মোকাদ্দাসসহ জেরুজালেম নগরী তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বারো শতকের মোটামুটি শুরুতে এসে দখলদার ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইমামুদ্দীন জঙ্কির নেতৃত্বে মুসলমান আরবদের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। ১১৪৬ সনে ক্রসেডারদের হাতে নিহত হওয়ার পর ছেলে নুরুদ্দীন জঙ্কির নেতৃত্বে পুনরায় প্রতিরোধ শুরু হয়। ১১৭৪ সনে তার মৃত্যুর পরে এই প্রতিরোধ যুদ্ধের সর্বশেষ মহাপরাক্রম বীর হয়ে আসেন সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী। ১১৮৭ সনে সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী বিখ্যাত হিত্তীনের যুদ্ধে ক্রুসেডারদের সোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বায়তুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন। ১২৯১ সনে সিরিয়া-ফিলিস্তিনসহ ক্রুসেডারদের দখলকৃত সকল ভূমি পুনরুদ্ধার করেন সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী।

১৫১৬ সনে সিরিয়ার আলেপ্পোতে সংঘটিত এক যুদ্ধ জয়ের মধ্যদিয়ে সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ মধ্যপ্রাচ্যে উসমানি খেলাফতের যুগ শুরু হয়। প্রায় চার শতাব্দী পর্যন্ত উসমানীয় খেলাফত অব্যাহত থাকে। পরবর্তীকালে ১৭৯৯ সনে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে ফরাসীরা আক্রমণ করে মিশরে দখল প্রতিষ্ঠা করে। তবে ফিলিস্তিনের আকায় অভিযান চালিয়েও শেষ পর্যন্ত তুর্কি নেতা আহমদ পাশার প্রবল প্রতিরোধে ফিলিস্তিন দখল করা সম্ভব হয়নি।

১.১২: ফিলিস্তিন: ব্রিটিশ ও জায়োনিস্ট উপনিবেশ

উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটেন ও তুরস্কের উসমানীয়দের মধ্যে চরম অবস্থা তৈরি হয়। এরমধ্যে ফরাসিদের সাথে আঞ্চলিক স্বার্থে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলে ব্রিটিশরা। অপরদিকে ইউরোপে ইহুদিবিরোধী এন্টি-সেমিটিক আন্দোলনের ফলে ইহুদিদের পুনর্বাসনের দাবি ওঠে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জায়োনিস্টদের প্রচারণার প্রেক্ষিতে। ফিলিস্তিনে যে উপনিবেশ ব্রিটশরা শুরু করে তা একইসাথে জায়োনিস্ট উপনিবেশও। কারণ ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ এবং জায়োনিস্টদের অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে একইসাথে ঘটে। প্রত্যক্ষভাবে ফিলিস্তিনে যে ব্রিটেনকে দখল করতে দেখা গিয়েছিল, তার পেছেন ছিল জায়োনিস্ট ও ফরাসি নেতৃবৃন্দ। জায়োনিস্টদের সাথে ফরাসিদের সম্পর্ক আরো পুরনো। ধারণা করা হয়, নেপোলিয়ানের সময় থেকে ফরাসিদের সাথে জায়োনিস্টদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারণ ফরাসিরা যখন মিশর দখল করে তখন প্রথম বারের মতো নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসতি গড়ার দাবি তোলে। এ বক্তব্যের ফলশ্রুতিতে জায়োনিস্টরা ফরাসিদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট করার চেষ্টা শুরু করে। পরবর্তীতে ইউরোপে ইহুদিরা কোণঠাসা হয়ে যাওয়ার পর থিওডোর হার্ৎজেলের নেতৃত্বে জায়োনিস্টরা আরো বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে ফরাসিদের সাথে সাথে ব্রিটিশদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জায়োনিস্ট নেতৃবৃন্দ। যে কারণে ঊনিশ শতকের শেষের দিকে ফরাসিদের সহায়তায় ব্রিটিশদের সাথে জায়োনিস্টদের কয়েকটি সমঝোতা স্মারকও আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করা হয়। এতে করে ব্রিটিশ এবং ফরাসিদের সমর্থনে জায়োনিস্টদের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন শুরু হয়। আশপাশের বিশেষ করে ইয়েমেন ও অন্যান্য আরব অঞ্চল থেকে অনেক ইহুদি এসে বসতি স্থাপন শুরু করে। ধীরে ধীরে ইউরোপ থেকে আসা শুরু করে ইহুদিরা। এমন অবস্থায় রাজনৈতিকভাবে বিশ্ব পরিস্থিতিও চরম আকার ধারণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল হিসেবে উসমানি খেলাফতের পতন ঘটে। এ অবস্থায় ১৯১৭ সনে ফিলিস্তিন দখল করে নেয় ব্রিটেন।

ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ উপনিবেশমাত্রই ব্রিটেন এবং জায়োনিস্টদের যৌথ এন্টারপ্রাইজ। এটা সরাসরি রিয়েলাইজড হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। ১৯১৭ সনে বেলফোর ঘোষণার প্রত্যক্ষ ফলাফলই ছিল ফিলিস্তিনে জায়োনিস্ট উপনিবেশ স্থাপন। যেখানে এ ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে জায়োনিস্টদের নেতৃত্বে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের আইনগত বৈধতা দেয়া হয়। বেলফোর ঘোষণার কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিটেন জাতিপুঞ্জের (লীগ অফ নেশনস) আনুষ্ঠানিক সম্মতির মাধ্যমে ফিলিস্তিনে শাসন পরিচালনার বৈধতা আদায় করে নেয়। ১৯২০ সনে প্রস্তাব স্বাক্ষরিত হয়। ১৯২২ সনে জাতিপুঞ্জে প্রস্তাবটি অফিসিয়ালি স্বীকার করে নেয়া হয়। এরপর ১৯২৩ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনে উপনিবেশিক শাসন শুরু করে ব্রিটেন। যদিও তুর্কিদের পতনের পরপরই ফিলিস্তিনের পুরোপুরি দখল প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটেন। ১৯৪৮ সন পর্যন্ত ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ থাকে ব্রিটিশদের হাতে। এ সময়কালটি ঐতিহাসিকভাবে ‘ব্রিটিশ ম্যানডেট’ হিসেবে পরিচিত।

১.১৩: জায়োনিস্ট উত্থানের ঐতিহাসিক পটভূমি

জায়োনিজম একটি আধুনিক বর্গ। নির্ধারিত দিন-ক্ষণ ঠিক করে এর উদ্ভব চিহ্নিত করা কঠিন। তবে ঊনিশ শতকব্যাপী জায়োনিজমের ব্যাপক উত্থানের কালপর্ব। জায়োনিস্ট ধারণার উদ্ভবের ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। যেহেতু মধ্যযুগে ইউরোপব্যাপী ভয়ঙ্কর ইহুদি নিধন সংঘটিত হয়েছিল। বিতাড়ন করা হয়েছিল লক্ষ লক্ষ ইহুদি। এর পেছনে মধ্যযুগের ইউরোপীয় খ্রিস্টান ধর্মীয় মনস্তত্ত্ব ছিল বড় কারণ। ঐতিহাসিকভাবে এই ইহুদি নিধন শুরু হয় ১০৯৬ সালে সংঘটিত খ্রিস্টান ক্রুসেড যুদ্ধের পটভূমিতে। এই নিধন প্রক্রিয়া পনেরো শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রথম শুরু হয় জার্মানিতে। ৫ হাজারের অধিক ইহুদিকে হত্যা করা হয় জার্মানিতে। ১২৯০ সনে ইংল্যান্ড তার দেশে বসবাসকারী প্রায় সব ইহুদিকেই তাড়িয়ে দেয়। এরপর ১৩৮৯ সনে জার্মানিতে পুনরায় ইহুদিবিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এতে হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়। ১৩৯১ সনে স্পেনে ১০ হাজারেরও বেশি ইহুদিকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে রাজা ফার্দিনান্দ এবং রানি ইসাবেলার শাসনামলে ১৪৯২ সনের জুলাইয়ে রাষ্ট্রীয় আদেশ জারি করে ২ লক্ষ ইহুদিকে বহিষ্কার করে তাড়িয়ে দেয় স্পেন।[১৬] পালিয়ে যাওয়ার সময় হাজার হাজার ইহুদি নিহত হয়। এভাবে প্রথম ক্রুসেড থেকে শেষ ক্রুসেড পর্যন্ত সময়কালে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালি, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, স্লোভাকিয়া, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, রাশিয়া থেকে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

জায়োনিজম শব্দটির আদি হল 'জায়ন' বা 'জিয়ন' (Zion)। এর হিব্রু শব্দ Tziyyon। এটি মূল একটি পর্বতের নাম। যেটি ফিলিস্তিনের জেরুজালেমের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। রাজা ডেভিড (পয়গম্বর দাউদ (আ) এবং সলোমনের (সোলায়মান (আ.) পরে ইহুদিদের মধ্যে পৌত্তলিক নানান সংস্কার প্রবর্তিত হয়। ফলে ইহুদিদের বিশ্বাস, এই জিওন পর্বতের উঁচুতেই রাজা ডেভিডের কবর রয়েছে।[১৭] এখন আধুনিক ইহুদিদের কাছে এই জিওন পর্বত একটি তীর্থস্থান হিসেবে সমাদৃত। যদিও প্রাচীন সেই সময়ে এই পর্বতের সাথে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক কোনো সম্পর্ক-সূত্র ছিলনা। যাইহোক, এই জিওন থেকেই জায়নিজমের উৎপত্তি। কিছুটা পিছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, মধ্যযুগে ইহুদি নিধন-উত্তর কালপর্বে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। ঠিক এই সময়ে যেখানে খ্রিস্টানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও ব্যাপক রক্তক্ষয়ী অবস্থার মধ্যদিয়ে ক্রমাগত চার্চভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়তে থাকে এবং ইউরোপব্যাপী খ্রিস্টান ধর্মের আধিপত্য ভেঙ্গে নাগরিকতার ভিত্তিতে জাতীয় চৈতন্যের উত্থান ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে সেখানে নতুন ধরনের রাষ্ট্রকাঠামো তথা জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। প্রায় একইসময়ে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকায়নের

---

১৬. নেলসন, ক্যারি এন্ড নোয়াহ, গ্যাব্রিয়েল, ব্রাহাম, (সম্পাদিত) *দি কনসাইজ হিস্ট্রি অব ইজরায়েল: দি কেইস অ্যাগেইন্স্ট অ্যাকাডেমিক বয়কটস অব ইজরায়েল*, (শিকাগো: ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৫ ইং), পৃ. ৩৮৬-৩৮৭।

১৭. হারৎজেল, থিওডোর, *দি জুইশ স্টেট ১৮৯৬*, (মূল গ্রন্থ "দার জুদেনস্টাট" থেকে সিলভিয়ে ডি অ্যাভিগডর কর্তৃক অনূদিত। যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকান যায়োনিস্ট ইমার্জেন্সি কাউন্সিল, ১৯৪৬ ইং), পৃ. ১-২। এবং আল গাদিরি, ফাওজি, *দি হিস্ট্রি অফ প্যালেস্টাইন*, *আ স্টাডি*, (https://www.academia.edu/3358305/The_History_Of_Palestine._A_study_by_Fawzy_Al-Ghadiry), c…. 32|

সম্প্রসারণ ঘটে। এই আলোকায়নের আলো শুধু খ্রিস্টান দুনিয়াকেই বদলে দেয়নি ইহুদিদের জীবনকেও বদলে দেয় সমানভাবে। যে কারণে ইহুদিদের জন্য ছিল এটি বেশ ভালো সময়। মূলত ইউরোপের নতুন রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে ওঠার পেছনে যে আধুনিক জাতীয় চেতনা কাজ করছিল ঠিক একই চেতনা প্রভাবিত করেছিল ইহুদিদের। ইউরোপের জাতীয় চৈতন্য আর আলোকায়নের স্পিরিট ইহুদিদের মধ্যে জাতীয় চৈতন্যের বীজ তৈরি করে। ক্রুসেডের সময় তারা যে ভয়াবহ গণহত্যার শিকার হয়েছিল এবং চরমভাবে নিগৃহীত হয়েছিল তাতে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে হীনমন্যতা ও আত্মগ্লানিবোধ প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য দ্রুততরো সময়ে ইহুদিরা এই সংকট কাটিয়ে উঠতে না পারলেও তারা তা অতিসত্তর উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ইউরোপীয়দের কাছে যে নিগ্রহের শিকার হয়েছিল ইহুদিরা তারই উদ্ধারপ্রকল্পের শিকড় খুঁজে পায় তারা ইউরোপীয়দেরই উদ্ভাবিত আলোকায়নের মাঝে। এ চৈতন্য থেকে ইহুদি মানসে সাম্প্রদায়িকতাবোধ নতুনভাবে জেগে ওঠে। আলোকায়ন আর আধুনিকতার মাঝে তারা সংগঠিত হওয়ার যে চেতনা ফিরে পেয়েছিল তাই তাদেরকে সংগঠিত করে ইহুদি জাতীয়তাবোধে। এই বোধ থেকে তারাও একটি জাতি হয়ে ওঠা এবং সেই জাতি প্রতিষ্ঠার একটি ভূমির অধিকারবোধও মনে মনে তারা তৈরি করে নেয়। এটাই ছিল বস্তুত জায়োনিজম পরিগঠিত হওয়ার ঐতিহাসিক মনস্তত্ত্ব। ইউরোপে থেকে আলোকিত হওয়ার এই অবস্থাকে ইহুদিরা নাম দিয়েছিলস 'হাসকালাহ' (এম রাবকিন, ইয়াকুভ, *রেলিজিয়াস রুটস অব আ পলিটিক্যাল ইডিওলজি: জুদাইজম অ্যান্ড ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যাট দ্য ক্রেডল অব জায়োনবাদী* (তেল আবিব ইউনিভার্সিটি, ইজরাইল: মেডিটারিয়্যান রিভিয়্যু, ভলিওম: ৫, নং: ১, জুন ২০১২ ইং) পৃ. ৭৭।)। এর সাথে ইহুদি ধর্মতত্ত্বকে তারা ভিত হিসেবে কিংবা তাদের জাতীয় গাঠনিক উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে যায়ন শব্দ থেকে যায়নিজমের উৎপত্তি যে প্রাক-অনুমান নির্দেশ করে, তার সাথে ইহুদি ধর্মতত্ত্ব ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যার মূল কথা হল, ইহুদিদের দাবিকৃত আদিভূমি জায়ন বা জেরুজালেমে ফিরে আসা। এই আদিভূমিই হলো প্রমিজড ল্যান্ড বা প্রতিশ্রুত ভূমি। যা ঈশ্বর কর্তৃক একমাত্র ইহুদিদের জন্য নির্ধারিত ভূমি।

ইহুদিদের কোনো কল্পিত ভূমির কৃত্রিম এই অধিকারবোধ ঐতিহাসিকভাবে জাগিয়ে তোলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। ১৭৮৯ সালে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে তৈরি হওয়া ইশতিহারের মধ্যদিয়ে ইউরোপে ইহুদিরা প্রথম তাদের অধিকার ফিরে পায়। ফরাসিদের দেখাদেখি অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোও আইনগতভাবে ইহুদিদের বসবাসের অধিকার স্বীকার করে নেয়। তবে সে সময় একধাপ এগিয়ে ছিলেন নেপোলিয়ান। মিশর দখলের পর বিলাদ আল-শাম বা সিরিয়ায়ও হানা দিয়েছিলেন নেপোলিয়ান। কিন্তু ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেও তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত দখল করতে পারেননি নেপোলিয়ান। এটি ছিল নেপোলিয়ানের জন্য চরম ক্ষোভ এবং অপমানের। সেই ক্ষোভ তিনি কিছুটা প্রশমন করতে পেরেছিলেন ইহুদিদেরকে জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের আহবানের মাধ্যমে। ১৭৯৯ সনে ফিলিস্তিন দখল করতে না পেরে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সেনাবাহিনীসহ ফিরে আসার সময় অবস্থান করছিলেন সমুদ্র বন্দর আক্কায়। এ সময় ফরাসির সমস্ত

ইহুদিকে তিনি ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমে এসে বসতি স্থাপনের আহবান জানান।[১৮] নেপোলিয়ান জিওন পর্বত আর জেরুজালেম ইহুদিদের সত্যিকার উত্তরাধিকার বলে দাবি করেন। এ দাবির ফলে ইহুদিরা তীব্র উস্কানি পায়। ধারণা করা হয়, ঐতিহাসিকভাবে নেপোলিয়ানই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইহুদিদের ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন।[১৯]

নেপোলিয়ান-উত্তরকালে ইহুদিরা ব্যাপকভাবে সংগঠিত হতে থাকে। ঊনিশ শতকে এসে পুনরায় ইউরোপজুড়ে ইহুদিবিরোধী বর্ণবাদী এন্টি-সেমেটিক মুভমেন্ট ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই মুভমেন্টের ফলে নতুন করে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ খুঁজে পায় ইহুদিরা। মূলত ঊনিশ শতকে জায়োনিজম সক্রিয় হয় সংঘবদ্ধভাবে। এই সময়ে তারা আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারণা চালায়, তাদেরকে আলাদা ভূখণ্ড ব্যবস্থা করে দেয়ার। জুইশ ন্যাশন বা স্বাধীন ইহুদি জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে ফরাসি ও ব্রিটেনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করতে থাকে তারা। এ সময়ে তাদের বিখ্যাত স্লোগান ছিল, “A land with no people is for a people with no land”। কারণ তারা মিথ্যা প্রচার করছিল যে, ফিলিস্তিনে যেখানে তারা বসতি স্থাপন করতে চাচ্ছে তাতে কোনো মানুষের বসতি নাই।[২০]

দৃশ্যত ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে জায়োনিস্ট উপনিবেশায়নকে তরান্বিত করা হয়। বেলফোর ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। এ ঘোষণার সাথে সাথে ইহুদিরা ব্যাপকভাবে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন শুরু করে। যেটি আরবরা মেনে নিতে পারেনি। আরবদের মধ্যে ক্রমাগত ক্ষোভ বাড়তে থাকে। এতে করে ১৯৩৬ এর দিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৯ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশদের ব্যাপক দমন-নিপীড়নের ফলে বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে আসলেও আবরদের ব্রিটিশবিরোধী প্রতিরোধ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। এতে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে ইহুদিদের পাল্টা বিদ্রোহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির মধ্যে ফিলিস্তিন সংকট আরো তীব্র হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে ১৯৪৪ এর দিকে ইহুদিরে এ বিদ্রোহ শুরু হয়। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিতে লক্ষ লক্ষ ইহুদি নিধনের ফলে (ধারণা করা হয় ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যা করে জার্মান নাৎসি বাহিনী। যেটি হলোকাস্ট নামে বিখ্যাত।) ফিলিস্তিনে তাদের জাতীয় চেতনা বাস্তবায়নের মনোভাবকে উস্কে দেয় জায়োনিস্ট নেতারা। প্রায় তিন বছর পর্যন্ত ইহুদিরা সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। যাতে আরব-ইহুদি সংঘাত চরম আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় জাতিসংঘে ফিলিস্তিনকে ভাগ করে আরব-ইহুদি টু-স্টেট বা দুই রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৭ সনের ২৯ নভেম্বর

---

[১৮]. কোবল্যার, *ফ্রানৎস*, *দি ভিশন ওয়াজ দেয়ার, আ হিস্ট্রি অব দি ব্রিটিশ মুভমেন্ট ফর দি রেশটোরেশন অব দি জুইশ টু প্যালেস্টাইন* (ইংল্যান্ডঃ আ ব্রিট-অ্যাম অন-লাইন রিপাবলিকেশন, ১৯৫৬ খ্রি), পৃ. ৩৫। http://www.britam.org/vision/Kobler.pdf,

[১৯]. গোল্ডেইনস্টিন সেপিনওয়াল, অ্যালিসা, *নেপোলিয়ন, ফ্রেঞ্চ জুজ অ্যান্ড দ্য আইডিয়া অব রিজেনারেশন* (আমেরিকান ইহুদি রাব্বি কর্তৃক প্রকাশিত সিসিআআর জার্নাল, ভলিয়ম-৫৪, উইন্টার ২০০৭ খ্রি), পৃ. ১-২।

[২০]. *ইজ'ন্ট ইট ট্রু দ্যাট পালেস্টাইন ওয়াজ এম্পটি অ্যান্ড ইনহেবিটিড বাই নম্যাডিক পিপল*, (ফিলিস্তিনভিত্তিক অনলাইন সাময়িকী ‘পালেস্টাইন রিমেম্বার’র নিবন্ধ, https://www.palestineremembered.com/Acre/Palestine-Remembered/Story414.html#

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনকে দু-ভাগ করে ইজরাইল-ফিলিস্তিন নামে দুই রাষ্ট্রের প্রস্তাব পাশ হয়। যাতে ফিলিস্তিনের ৬০ ভাগ ভূমি ইজরাইলীদের জন্য বরাদ্দ রেখে বাকি উভয় রাষ্ট্রের জন্য জেরুজালেমকে রাজধানী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এ প্রস্তাবের ফলে আরব-ফিলিস্তিনীদের মধ্যে ক্ষোভ ব্যাপকতরো হয়ে ওঠে। প্রস্তাব ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশরা এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোনো ধরনের উদ্যোগ নেয়নি। যে কারণে অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে। পশ্চিমের বিশ্লেষকরা এ ঘটনার নাম দিয়েছিল 'সিভিল ওয়ার' বা গৃহযুদ্ধ।

একপর্যায়ে ঘটনা প্রবাহকে চূড়ান্তে নিয়ে যায় ব্রিটিশরা। ১৯৪৮ এর ১৪ মে মধ্যরাতে ব্রিটিশরা ক্ষমতা ছেড়ে দেয় জায়োনিস্টদের হাতে। পরের দিন ১৫ মে আকস্মিকভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনে ইজরাইল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়া হয়। ঘোষণার সাথে সাথে আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে ১৫ মে ভোরে ফিলিস্তিনে ইরাক, মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবাননসহ আরবলীগভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সামরিক বাহিনী ঢুকে পড়লে ইজরাইলীদের সাথে যুদ্ধ লেগে যায়। যুদ্ধে আরবদের শোচনীয় পরাজয় হয়। এরপর আরো তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইজরাইলের সাথে। সর্বশেষ সংঘাত নিরসনে প্রথমবারের মতো ১৯৭৮ সনে ওয়াশিংটনে বারো দিনব্যাপী গোপন সংলাপের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইজরাইল-মিশরের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। যেটি ক্যাম্প ডেভিড নামে বিখ্যাত। যদিও পরবর্তীকালে জাতিসংঘ এই শান্তি চুক্তির ঘটনার প্রতি নিন্দা জানিয়েছিল। এ চুক্তির ফলে মিশরের আঞ্চলিক স্বার্থ ছাড়া কোনো মূল্য তৈরি করেনি জাতি হিসেবে ফিলিস্তিনের পক্ষে। চুক্তির ফলে বরং যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলাফল হিসেবে ফিলিস্তিনে প্রতিরোধ আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সনে শুরু হওয়া যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৯ এর ১০ মার্চ। এ সময় অমানবিক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ইজরাইলিরা। লক্ষ লক্ষ বাড়িঘর, গ্রাম-শহর ধ্বংস করে দেয় ইজরাইলী সেনাবাহিনী। ৭ লাখ মতান্তরে ৮ লাখ ফিলিস্তিনী মাতৃভূমি ছেড়ে পালিয়ে যায় প্রতিবেশী আরব দেশগুলোতে। যুদ্ধের তিন বছর পর ৭ লাখ ইহুদি ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে দখলকৃত ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে। এছাড়া লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। ইতিহাসে এ চরম পরিস্থিতিকে 'নাকবা' নামে অভিহীত করা হয়।

মাহমুদ দারভীশ: জীবন ও কর্মের সারসংক্ষেপ

মাহমুদ দারভীশ, সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জীবদ্দাশেতই মাহামুদ দারভীশের জীবনী লিখা হয়েছিল। যে সময়ে জীবনী লিখা হয়, তখন দারভীশের বয়স ২৯ সবেমাত্র। মিশরের রজা আল-নাক্কাশ *মাহমুদ দারভীশ: শায়ির আল-আরদিল মুহতাল্লাহ* নামে একটি বই লিখেন। যাতে দারভীশের মোটামুটি ঊনত্রিশ বছরের কর্মকাণ্ডের সারোৎসার উঠে আসে। ১৯৬৯ সনে বইটির প্রথম সংস্করণ বের হয়েছিল। বইটি প্রকাশের সাথে সাথে দারভীশের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সনে বইটির আরো একটি সংস্করণ বের হয়। এর মধ্যে দারভীশের কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়ে যায়।

মাহমুদ দারভীশ নামে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন দারভীশ। এবং এ নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠেন। তবে তার পারিবারিক পুরো নাম মাহমুদ সালীম হুসাইন দারভীশ। ১৯৪১ সনের ১৩ মার্চ ফিলিস্তিনের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা গ্যালিলির পশ্চিম শহর (আরবীতে আল জালীল বলা হয়) প্রাচীন আল আক্কা নগরীর আল বিরওয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত সুন্নি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন[২১]। তার মা হুরিয়া বিনতে আদীব আল বিক্বায়ী[২২]। এবং বাবা সালীম, দাদা হুসাইন, দাদিমা আমিনাহ।[২৩]

দারভীশের জন্মতারিখ নিয়ে গবেষক ও সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও রাজা আল-নাক্কাশ ১৯৪১ এর ১৩ মার্চকেই সাব্যস্ত করেছেন। কারণ তিনি সরাসরি এই মতটি দারভীশের কাছ থেকে পেয়েছেন বলে দাবি করেন। ১৯৭১ সনে কায়রোতে দারভীশের সাথে সাক্ষাতের সময় জন্মতারিখ সম্পর্কে জানতে চাইলে দারভীশ ১৩ মার্চ ১৯৪১ সনের কথা জানান[২৪]। পরবর্তীতে অন্যান্য গবেষক ও সমালোচকগণ দারভীশের জন্মতারিখ সম্পর্কে রাজা আল-নাক্কাশের উদ্ধৃতিটিই ব্যবহার করেন।

দারভীশের জন্মভূমি আল-বিরওয়া বেশ প্রাচীন একটি জনপদ। ভৌত কাঠামোর দিক থেকে এটি মূলত একটি নগর ছিল। বর্তমানে এটি পূর্ব 'আক্কা'র নয় কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। গ্রামটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর নগর কাঠামো ঠিক কখন গড়ে উঠেছিল তা জানা যায়নি। তবে

---

২১. আল-তারাভিনাহ, ড. ইমাদ, *হিকায়াতু মাহমুদ দারভীশ ফী আরদিল কালাম* (বৈরুত: আল ইনতিশার আল-আরাবী, ২০১৬ খ্রি.)

২২. আল-নাবলুসী, শাকের, *মাজনুন আল-তুরাব* (বৈরুত: আল মুয়াসসাহ আল-আরাবিয়্যাহ লি আল-দিরাসাহ ওয়া আল-নাশার, ১৯৮৭ খ্রি.) পৃ. ১৪।

২৩. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতু আল-হিসান* (বৈরুত, লেবানন: রিয়াদ আল-রাঈস লি আ-লকুতুব ওয়া আল-নাশার, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৯।

২৪. আল-নাক্কাশ, রজা, *মাহমুদ দারভীশ: শায়ির আল-আরদ আল-মুহতাল্লাহ* (কায়রো, মিশর: দার আল-হিলাল, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৯৬, ৯৭।

প্রথম ক্রুসেডের সময় রোমান ক্রুসেডাররা নগরটি পুনঃনির্মাণ করেন এবং এখানে তারা বসতিও স্থাপন করেছিলেন। ওই সময় তারা গ্রামটির নাম দিয়েছিলেন বিরওয়াত (بروت)। কালক্রমে আল বিরওয়াত আল বিরওয়াহ নামে পরিচিতি লাভ করে[২৫]। ১০৪৭ সনে পারস্যের প্রখ্যাত মুসলিম পর্যটক নাসির খশরু এলাকাটি ভ্রমণ করেন। তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, তিনি সেখানে হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত শামাউন এর কবর জিয়ারত করেন[২৬]। যেকারণে মুসলমানদের পাশাপাশি খ্রিস্টানদের কাছে আল বিরওয়া ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ইহুদিদের হামলায় এই ঐতিহাসিক তীর্থস্থানটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। ইজরাইলীরা গ্রামটির নামও পরিবর্তন করে ফেলে। আল বিরওয়াকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন নাম দেয়া হয়। তার মধ্যে একটি আহইয়াহুদ (أحيهود), যেটি পুনরায় পরিবর্তিত হয়ে চূড়ান্তভাবে নাম ধারণ করে আলমুশাফ। মুশাফের অধিবাসীদের সবাই ইহুদি। যারা ইয়েমেন থেকে ইজরাইলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল[২৭]।

১৯৪৮ সালে ৩৬ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে একটানা হামলা চালিয়ে গ্রামটির ধ্বংস নিশ্চিত করেছিল ইজরাইলের হানাদার বাহিনী। এই সময় মাহমুদ দারভীশের পরিবার ক্ষেতের ভিতরে লুকিয়ে ছিল। অনেকটা সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় তার পরিবার। সেখান থেকে পালিয়ে তারা লেবাননে আশ্রয় নেন। এক বছর পর দারভীশ লেবাননের সীমান্ত দিয়ে হারানো জন্মভূমি ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন। তখন তার বয়স সাত বছর। কিন্তু দারভীশ দেখলেন, তার গ্রাম, বাড়িঘর পুড়ে গেছে ইজরাইলীদের ধ্বংসলীলায়[২৮]।

১৯৬৯ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির হিব্রু ভাষাভিত্তিক 'জোহাদীরাখ' পত্রিকায় তার প্রথম সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ এর ফেব্রুয়ারিতে লেবাননভিত্তিক সাহিত্যের বিভিন্ন কাগজে এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। দারভীশ তাতে সেই সময়ের বেদনাময় স্মৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

> أذكر نفسي عندما كان عمري ست سنوات . كنت أقيم في قرية جميلة وهادئة هي قرية البروة الواقعة على هضبة خضراء ، ينبسط أمامها سهل عكا . وكنت أبنا لأسرة متوسطة الحال عاشت من الزراعة .
> عندما بلغت السابعة ، توقفت ألعاب الطفولة . وإني أذكر كيف حدث ذلك... أذكر ذلك تماماً : في إحدى ليالي الصيف ، التي اعتاد فيها القرويون أن يناموا على سطوح المنازل ، أيقظتني أمي من نومي

---

২৫. আল-তারাভিনাহ, ড. ইমাদ, *হিকায়াতু মাহমুদ দারভীশ ফী আরদ আল-কালাম* (বৈরুত, লেবানন: আল ইনতিশার আল-আরাবী, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২৯।

২৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯।

২৭. আল-নাক্কাশ, রজা, *মাহমুদ দারভীশ: শায়ির আল-আরদ আল-মুহতাল্লাহ* (কায়রো, মিশর: দার আল-হিলাল, ১৯৭১ ইং), পৃ. ৯৭।

২৮. আল-তারাভিনাহ, ড. ইমাদ, *হিকায়াতু মাহমুদ দারভীশ ফী আরদ আল-কালাম* (বৈরুত, লেবানন: আল ইনতিশার আল-আরাবী, ২০১৬ ইং), পৃ. ৪৩।

> فجأة ، فوجدت نفسي مع مئات سكان القرية أعدو في الغابة . كان الرصاص يتطاير من على رؤوسنا ، ولم أفهم شيئاً مما يجري . بعد ليلة من التشرد والهروب وصلت مع أحد أقاربي الضائعين في كل الجهات ، إلى قرية غريبة ذات أطفال آخرين . تساءلت بسذاجة : أين أنا ؟ وسمعت للمرة الأولى كلمة "لبنان"[২৯]

নিজেকে মনে পড়ে যায় যখন আমার বয়স ছয় বছর ছিল। আমি থাকতাম এক সুন্দর সুনিবীড় গ্রামে। সেই গ্রাম ছিল আল বিরওয়াহ, যার অবস্থান ছিল সবুজ পর্বতের পাদদেশে। এর সামনেই ছিল আক্কা'র সমতল ভূমি। আমি ছিলাম কৃষীজীবী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। যখন আমি সাত বছরে উপনীত হই তখন শৈশবের খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকতাম... কেমন করে সেই ঘটনা ঘটল আমি তার পূর্ণ বিবরণ দিচ্ছি: গ্রীষ্মের কোনো এক রাতে গ্রামবাসীরা গরমের কারণে ঘরবাড়ির ছাদে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, হঠাৎ আমার মা আমাকে জাগিয়ে তুললেন। শত শত গ্রামবাসীর সাথে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম, আমি দৌড়ে ছুটে যাচ্ছি জঙ্গলের ভিতরে। আমাদের মাথার উপর দিয়ে গুলি উড়ে যাচ্ছিল। কী বয়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। পালানোর একরাত পর দিগবিদিক হারিয়ে যাওয়া নিকটাত্মীয়দের একজনের সাথে অচেনা একগ্রামে পৌছালাম যেখানে অন্য শিশুরাও রয়েছে। আমি তাকে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা এখন কোথায়? প্রথমেই শুনলাম একটি শব্দ 'লেবানন'।[৩০]

শিক্ষা

দারভীশের বাবা সালীম দারভীশ পেশায় কৃষক ছিলেন। পাঁচ ছেলে তিন মেয়ের মধ্যে দারভীশ ২য় সন্তান। দারভীশের মা নিরক্ষর ছিলেন। তবে তার দাদা আদীব আল বুকায়ীর সান্নিধ্যে দারভীশ শৈশবের পাঠ নিতে সক্ষম হন। দারভীশের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হয় লেবাননের আদ্দামুর শরণার্থী শিবিরের 'আল-আওনারওয়া' স্কুলে। লেবানন থেকে যখন দারভীশ ফিরে আসেন তখন তিনি ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থী। দাইর আল-আসাদে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন পরিচয় গোপন করে। কারণ দারভীশ ইজরাইলী আইনে অবৈধ অভিবাসী ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন আল-জাদীদা থেকে দুই কিলোমিটার উত্তরে 'কাফার ইয়াসেফ' গ্রামে। ১৯৪৮ সালে সপরিবারে লেবাননে আশ্রয় নেয়ার পর এক বছর বাদে দারভীশ লেবানন থেকে

---

[২৯]. আল-খায়র, হানী, *মাহমুদ দারভীশ রিহলাতু উমার ফী দুরূব আল-শি'র মাওসুআতু আ'লাম আল-শি'র আল-আরাবী আল-হাদীস*, (দামেস্ক, মুয়াসসাসাহ আলা' আল-দীন লি আল-নাশর ওয়া আল-তাওজী', ২০০৫ ইং), পৃ. ৮।

[৩০] . এই অভিসন্দের্ভের সকল বাংলা অনুবাদ গবেষক কর্তৃক অনূদিত।

ফিলিস্তিনে ফিরে এসে গ্যালিলির মাজদে কারুম নগরীর উত্তরে দাইর আল-আসাদে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কয়েক বছর অবস্থান করেন। এরপর তার নিজের গ্রামের কাছাকাছি থাকার জন্য আল বিরওয়ার উত্তর পশ্চিমে আল-জাদীদা এলাকায় বসবাস শুরু করেন। আল-জাদীদা হাইফার একটি এলাকা। পরবর্তীকালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য রাশিয়ার মস্কোয় গমন করেন। তবে দারভীশ উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন করেন আরবেই। সিরিয়ায় অবস্থানকালে তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষায় স্নাতক ও শিক্ষায় ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।[৩১]

কবিতা

দারভীশের কবিতার হাতেখড়ি খুব অল্প বয়সেই ঘটে। স্কুল জীবনেই তিনি ক্ল্যাসিক আরবী কবিতার পাঠ আত্মস্থ করতে সক্ষম হন। কাব্যিক সংবেদনশীলতা শৈশবের একদম শুরুতে দারভীশের অনুভূতিতে জায়গা করে নিয়েছিল। কিশোর মননে এমন অনুভূতি স্বভাবত ছিল বিক্ষিপ্ত। যাতে স্থির হওয়া ছিল কঠিন। তখন কবিতা লেখার একমাত্র প্রেরণা হয়ে ওঠে তার শিক্ষক। কবিতা বিষয়ে দারভীশের অন্যতম উৎসাহদাতা ছিলেন কম্যুনিস্ট আদর্শবাদী শিক্ষক নামির মারকেস। দারভীশ জীবনের প্রথম কবিতা পাঠ করেন নতুন ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম উদযাপন অনুষ্ঠানে। দারভীশ বলেন,

> كنت طالباً في الصف الثامن عندما احتفلوا بمناسبة إقامة دولة إسرائيل . وقد نظموا مهرجانات كبيرة في القرى العربية باشتراك تلامذة المدارس في هذه المناسبة . طلب مني مدير المدرسة أن أشترك في مهرجان عقد في قرية دير الأسد . وعندها ، ولأول مرة في حياتي ، وقفت أمام الميكرفون وبالبنطلون القصير ، وقرأت قصيدة كانت صرخة من طفل عربي إلى طفل يهودي . لا أذكر القصيدة ولكني أذكر فكرتها : يا صديقي ! بوسعك أن تلعب تحت الشمس كما تشاء . بوسعك أن تصنع ألعاباً . ولكني لا أستطيع . أنا لا أملك ما تملكه . لك بيت ، وليس لي بيت ، فأنا لاجئ . لك أعياد وأفراح ، وأنا بلا عيد وفرح . ولماذا لا نلعب معاً ؟ ! وفي اليوم التالي استدعيت إلى مكتب الحاكم العسكري في قرية مجد الكروم . هددني وشتمني، فاحترت . لم أعرف كيف أرد عليه . وعندما خرجت من مكتبه بكيت بمرارة لأنه أنهى تهديده بقوله : إذا استمررت في كتابة مثل هذه الأشعار فلن نسمح لأبيك بالعمل في المحجر ![৩২]

[৩১]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০০-১২১।

[৩২]. আল-নাক্কাশ, রজা, *মাহমুদ দারভীশ: শায়ির আল-আরদ আল-মুহতাল্লাহ*, ১৯৭১, পৃ. ১০৫।

তারা যখন ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করছিল আমি তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এ উপলক্ষে তারা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আরব অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে বড় বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাকে তলব করেন। আমি যেন দাইর আল-আসাদ ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। আমার জীবনে প্রথমবারের মতো হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় আমি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ করি। কবিতাটি ছিল এক ইহুদি শিশুর প্রতি এক ফিলিস্তিনী আরব শিশুর আর্তনাদপূর্ণ চিৎকার। কবিতাটি এখন আর হুবহু মনে পড়েনা। তবে তার মূলভাবনাটি মনে পড়ে: বন্ধু! ইচ্ছে করলেই তুমি খেলা করতে পারো সূর্যের মুক্ত আলোয়। চাইলেই তুমি যতো সব পুতুল বানিয়ে খেলতে পারো। কিন্তু আমি তা পারি না। তোমার যা কিছু আছে আমার তা নেই। তোমার আছে ঘর। আমার কোনো বাড়িঘর নাই। আমি তো এক শরণার্থী। তোমার আছে উৎসব-আনন্দ। অথচ আমার কোনো উৎসব নেই, আনন্দ নেই। ...আমরা কেন একসঙ্গে খেলতে পারিনা? পরদিন মাজদ আল-কারুম গ্রামের সামরিক অফিসারের কার্যালয়ে ডেকে এনে সেই সেনা কর্মকর্তা আমাকে শাসায়, হুমকি দেয়, গাল-মন্দ করে। আমি বুঝতে পারিনি কী করে তার জবাব দেবো। তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসার সময় রাগে-ক্ষোভে আমি কেঁদে ফেলি। কারণ সে আমাকে চূড়ান্তরকম হুমকি দিলো, যদি তুমি এরকম কবিতা লিখে যাও তবে আমরা তোমার বাবাকে আর কখনো পাথর খোলায় কাজ করার অনুমতি দেবো না।

এমন বঞ্চনা আর অধীনতাই দারভীশকে সার্বক্ষণিক অস্থির রাখতো। মুক্তির পথ আর জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথ-উপায় ও জবাব খুঁজতে থাকতেন। এভাবে দিনে দিনে কবিতা আর ভাষার মধ্যে তিনি মুক্তির সোপান গড়ে তোলেন।

প্রায় কৈশোরেই দারভীশ কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত হন। নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পরম আকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ফলে কবিতা আর ভাষাকে মুক্তি সংগ্রামের একমাত্র শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে তৈরি করতে থাকেন দারভীশ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার কবিতা ছাপা হতে থাকে। অপরদিকে সাংস্কৃতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে তিনি গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায়-মহল্লায় 'আমছিয়্যাহ' বা কাব্যসন্ধ্যার আয়োজন করেন। যেখানে তার পঠিত কবিতা সাধারণ ফিলিস্তিনীদের মাঝে মুক্তি ও প্রতিরোধের চেতনায় ব্যাপক আলোড়ন তোলে। ইজরাইলী কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে তার এ সান্ধ্য অনুষ্ঠান আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইজরাইলী পুলিশ সে সময় সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত দারভীশকে তার গৃহে অবরোধ করে রাখতো। এমনকি এক পর্যায়ে সন্ধ্যার পর দারভীশের গৃহত্যাগেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[৩৩]

৩৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ১১১।

রাজনীতি, পেশা ও কাব্য তৎপরতা

ষাটের দশকের শেষ বছরে ইজরাইলী কম্যুনিস্ট পার্টি 'রাকাহ'য় যোগদানের মাধ্যমে দারভীশের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। পেশাগত জীবন শুরু হয় সাংবাদিকতার মাধ্যমে। রাকাহ কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক "আল ইত্তেহাদ" পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ও অনুবাদক হিসেবে যোগ দেন। রাকাহ'র আরেকটি প্রকাশনা 'আল জাদীদ'র' তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি 'আল ইত্তেহাদ'র সম্পাদক ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্ত হন। এরপর তিনি বামপন্থী 'আলমাবাম' পার্টির 'আল ফাজর' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন মিশরীয় আরব ইহুদি ইউসুফ অশিজ।[৩৪]

ফিলিস্তিনের জাতীয় জীবনে প্রায় প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে দারভীশ কলম ধরেছেন তীক্ষ্ণ ভাষায়। যে কারণে ফিলিস্তিনের প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে ওঠে তার কবিতা। ১৯৪৮-এ যুদ্ধে হারানো ভূমি, ক্ষোভ আর বেদনায় যখন জনজীবন ক্লান্ত-উত্তপ্ত তখন দারভীশের প্রথম কবিতার বই 'আছাফীরু বিলা আজনিহা' বা ডানহীন চড়ূই লিখেন ১৯৫৮ সনে, যেটি বের হয় ১৯৬০ সনে। এরপর ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'আলআসাফীরু তামুতু ফিল জালীল' (গ্যালিলিতে চড়ুইদের মৃত্যু)। তবে ১৯৬৪ সালে ২য় কাব্য গ্রন্থ 'আওরাকুজ জাইতুন'(জলপাইয়ের পত্রাবলী) প্রকাশ হবার পর দারভীশের নামের সাথে যুক্ত হয় 'শায়ির আল-মুকাওয়ামাহ' বা প্রতিরোধের কবি উপাধী। পুরো দেশব্যাপী প্রতিরোধের কবি হিসেবে দারভীশের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ৩য় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৬৬ সনে প্রকাশিত হয় 'আশিক মিন ফিলিস্তিন' (ফিলিস্তিনের এক প্রেমিক)। একই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৭ সনে 'আখের আল-লাইল' (রাত্রি শেষে) এবং ১৯৭০-এ প্রকাশিত হয় দারভীশের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'হাবীবাতী তানহাদু মিন নাওমিহা' (নিদ্রা থেকে প্রিয়তমার উত্থান)। ১৯৭৩-এ চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধোত্তর সময়ে দুটি কাব্যগ্রন্থ বের হয়। 'মুহাওয়ালাহ রাক্বম-৭' (উদ্যোগ নম্বর-৭) এবং 'তিলকা ছুরাতুহা ওয়া হাজা ইনতিহার আল-আশিক্ব' (এই তার ছবি এবং প্রেমিকের আত্মসংহার)। ১৯৮২ সনে লেবাননে অবস্থিত ফিলিস্তিনী শরণার্থী শিবির শাবরা শাতিল আরবে (১৯৮২-১৯৮৫ সময়কাল, যেটি লেবাননের প্রথম গৃহযুদ্ধ নামে পরিচিত) ইজরাইলী গণহত্যার এক মহাকাব্যিক দলিল হিসেবে স্বীকৃত 'মাদীহ আল-জিল আল-আলী' (ঊর্ধ্ব ছায়ার প্রশস্তি, ১৯৮৩) ও 'হিছার লিমাদাইহ আল-বাহর' (অবরোধ সমুদ্র বাথান, ১৯৮৪)। পরবর্তীকালে ২০০২-এ ইজরাইলী সেনাবাহিনী কর্তৃক গাজা অবরোধের পটভূমিতে প্রকাশিত হয় 'হালাতু আল-হিছার' (অবরোধ পরিস্থিতি)।

দারভীশের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা সংবাদমাধ্যমে গতিশীল থাকলেও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তিনি বারবার বাধার সম্মুখীন হন। এর ফলে তিনি বেশ কয়েকবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৬১ সালে বিনা

[৩৪]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১১৪। এবং *মাহমুদ দারভীশ*, (কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার বিশেষ প্রতিবেদন), https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/20/محمود-درويش

অনুমতিতে আল জাদীদা গ্রাম ছেড়ে হাইফা শহরে বসবাসের উদ্দেশ্যে যাবার সময় প্রথমবার গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করে। প্রথম কারাবরণ সম্পর্কে দারভীশ বলেন,! لا ينسي ان السجن الأول مثل الحب الأول[৩৫] "প্রথম প্রেমের মতো প্রথম কারাবরণও ভোলা যায় না।" ২য় বার ১৯৬৫ সালে অনুমোদিত পাশ ছাড়া হাইফা থেকে আল কুদুসে যাবার কারণে, তৃতীয়বার ১৯৬৭ সালে হাইফা থেকে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক কাব্যসন্ধ্যায় যাবার কারণে তাকে জেলে পাঠানো হয়। সেই অনুষ্ঠানে তিনি আবৃত্তি করেছিলেন 'নাশীদ আল-রিজাল' (পৌরুষের গান) শিরোনামের দীর্ঘ কবিতা। যা ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তার 'আশিক মিন ফিলিস্তিন'(ফিলিস্তিনের এক প্রেমিক) কাব্যগ্রন্থে 'নাশীদ' (সংগীত) শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে দারভীশ পুনরায় কারাবরণ করেন।

১৯৭১ সালে কায়রোতে মিশরের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক হোসাইন হাইকলের (১৯২৩-২০১৬) সৌজন্যতা পেয়ে দৈনিক আল আহরামে যোগ দেন দারভীশ। মিশরে তিনি কিছুদিন অবস্থান করে ১৯৭২ এর শেষের দিকে লেবাননের বৈরুতে ফিরে আসেন। এ সময় তিনি মুনাজ্জামাহ আল-তাহরীর আল-ফিলিস্তিনী'তে (পিএলও) যোগ দেন। পিএলও'র প্রকাশনা ও গবেষণা বিষয়ক ইনস্টিটিউটের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। একইসময়ে তিনি রাবিতাহ আল-কুত্তাব ওয়া আল-ছাহাফিয়্যীন আল-ফিলিস্তিনিয়্যীন'র (ফিলিস্তিনী লেখক এবং সাংবাদিক সংস্থা) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। এরইমধ্যে দারভীশ ফিলিস্তিনের সীমা ছেড়ে পুরো আরবে কবি হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেন। বৈরুতে অবস্থানের ফলে তার কবিতা ফিলিস্তিনের মুক্তির আবেদনকে সমস্ত আরব বিশ্বের সর্বসাধারণের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলতে সক্ষম হয়। ১৯৮০'র দিকে দারভীশ ফিলিস্তিনভিত্তিক 'আল-কারমেল' সাহিত্য ও চিন্তা বিষয়ক পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন। এর আগে ১৯৭৭ সনে দারভীশ ফিলিস্তিন শিক্ষা ইনস্টিটিউটের প্রধান পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।[৩৬]

১৯৮৭ সালে দারভীশকে ফিলিস্তিনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত (১৯২৯-২০০৪) তার বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৮৮ সনে দারভীশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেন। পাঠ করেন ইয়াসির আরাফাত। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষিত হবার পর ইয়াসির আরাফাত দারভীশকে সংস্কৃতিমন্ত্রী হবার আহবান জানালে তিনি তা বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তখন বলেছিলেন, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, বারুদের ধোঁয়ামুক্ত ফিলিস্তিনে ফিরে গিয়ে কবিতা লেখা।

তবে ইয়াসির আরাফাতের সাথে এ সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ভালো থাকেনি। রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে ইয়াসির আরাফাত এবং পিএলও'র সাথে দারভীশের সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে। ১৯৯৩ সালে তিউনিসে ফিলিস্তিনের জাতীয় পরিষদের সভায় অসলো চুক্তি পাঠ করার সুযোগ হয় দারভীশের। কিন্তু আগে থেকেই আরাফাতের সাথে তার বিরোধ ছিল এই চুক্তি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রত্যাখ্যান

---

[৩৫]. আল নাক্কাশ, রজা, *শায়ির আল আরদ আল মুহতাল্লাহ*, ১৯৭১, পৃ. ১০৫।
[৩৬]. আল-তারাভিনাহ, ড. ইমাদ, *হিকায়াতু মাহমুদ দারভীশ ফী আরদ আল-কালাম*, ২০১৬, পৃ. ৩৮২।

করেন এ চুক্তি। এরপর দারভীশ কার্যনির্বাহি পরিষদের সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা দেন, ইস্তফার কারণ ব্যাখ্যায় প্রতিবাদ করে তিন বলেন,

> إن هذا الاتفاق ليس عادلا؛ لأنه لا يوفر الحد الأدنى من إحساس الفلسطيني بامتلاك هويته الفلسطينية، ولا جغرافية هذه الهوية إنما يجعل الشعب الفلسطيني مطروحا أمام مرحلة تجريب انتقالي.. وقد أسفر الواقع والتجريب بعد ثلاث سنوات عن شيء أكثر مأساوية وأكثر سخرية، وهو أن نص أوسلو أفضل من الواقع الذي أنتجه هذا النص.[৩৭]

> এই চুক্তি ন্যায়সঙ্গত নয়। কারণ তা ফিলিস্তিনের জাতীয় পরিচয় অর্জনে ফিলিস্তিনী মনোভাবের ন্যূনতম সীমা এবং এ আত্মপরিচয়ের ভৌগলিক অবস্থানকেও পূর্ণ করেনি। মূলত এই চুক্তি ফিলিস্তিনের জনগণকে নিক্ষেপ করল পরিবর্তিত এক কঠিন পরীক্ষার সামনে। তিন বছর (ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষিত হবার) পরের এই বাস্তবতা, এই পরীক্ষা, এই অভিজ্ঞতা এমন এক বিষয়কে স্পষ্ট করলো যা আরো বেশি ট্রাজেডিক, আরো বেশি পরিহাসের। অবশ্য অসলো চুক্তির ভাষ্য সেই আসন্ন পরিস্থিতির চেয়ে ভালো যা খোদ এই ভাষ্যই সৃষ্টি করেছে।

এরপর ১৯৯৪ সালে দারভীশ দীর্ঘ দশ বছরের নির্বাসিত জীবন থেকে ফিরে আসেন ফিলিস্তিনে। নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রেখে ইজরাইলী সরকার তখন তাকে শুধু রামাল্লায় থাকবার অনুমতি দেয়। তবে ১৯৯৫ সালে অসুস্থ মাকে দেখার জন্য একবার এবং দ্বিতীয়বার বন্ধু এমিল হাবীবের মৃত্যুতে শেষ যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে ইজরাইলে নিজের শহর ও গ্রাম পরিদর্শনের জন্য কয়েকদিনের অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়া তিনি রামাল্লায় অবরুদ্ধ জীবনকেই মেনে নেন। চরম বঞ্চনা আর অপমানের যন্ত্রণা তাকে সয়ে যেতে হয়। এ যন্ত্রণা চাপিয়ে তিনি অবিরাম লিখে যান। অবরোধের মধ্যেই তিনি ইজরাইলী ট্যাংকের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ছুঁড়ে মারেন কবিতার গুলতি। এক পর্যায়ে ইজরাইলী হানাদাররা তার বাড়িটিও বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়। তবু তার কলম আর কাগজের পাতা বিধ্বস্ত করতে পারেনি তারা। অবরোধের মধ্যেই দারভীশ তার সমকালের শেষ ইন্তিফাদায় অংশ গ্রহণ করেন। এমন সংগীন মুহূর্তে দারভীশ বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। কারণ কবিতাই ছিলো দারভীশের একমাত্র অস্ত্র। দারভীশ লিখেছেন,

[৩৭]. অ্যানতুন, সিনান, *আল-নাক্‌দ আল-রামজি লিইত্তিফাক অসলো ইনদা মাহমুদ দারভীশ* (বৈরুত: মাজাল্লাহ আল-দিরাসাহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ, খণ্ড: ১৩, সংখ্যা: ৫১, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১৪।

كنت أرى من بيتي الدبابات والجنود, لم تكن لدي طريقة مقاومة إلا أن أكتب، وكلما كتبت أكثر كنت أشعر أن الحصار يبتعد وكانت اللغة وكأنها تبعد الجنود لأن قوتي الوحيدة هي قوة لغوية
كتبت عن قوة الحياة واستمرارها وأبدية العلاقة بالأشياء والطبيعة. الطائرات تمر في السماء لدقائق ولكن الحمام دائم.. كنت أتشبث بقوة الحياة في الطبيعة للرد على الحصار الذي أعتبره زائلا, لأن وجود الدبابة في الطبيعة وجود ناشز وليس جزءا من المشهد الطبيعي[৩৮]

ঘর থেকে আমি ট্যাংক, সেনাবাহিনী দেখলাম অথচ আমার কাছে প্রতিরোধ করার মতো কোনো অস্ত্র ছিল না। একমাত্র অস্ত্র ছিল লেখা। আমি যখন প্রবলভাবে লিখতে থাকলাম, আমি দেখলাম অবরোধ দূরে সরে যাচ্ছে। আমি দেখেছি আমার কবিতা যেন ইজরাইলী সৈন্যদের তাড়া করছে। কারণ আমার একমাত্র শক্তি ভাষা...
আমি জীবনের শক্তি, অমরতা আর বস্তু ও প্রকৃতির সাথে তার চিরসম্পর্ক নিয়ে লিখেছি। পাখিরা আকাশে ওড়ে কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু কবুতর থাকবে চিরদিন। আমি অবরোধের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রকৃতির জীবনী শক্তিকে আঁকড়ে ধরে আছি। আমি বিশ্বাস করি এই অবরোধ দ্রুত নিঃশেষ হবে। কারণ প্রকৃতিতে ট্যাংক একটি বহিরাগত অস্তিত্ব, ট্যাংক কখনোই প্রকৃতির অংশ নয়।

১৯৯৮ সালে দারভীশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতালে বিশ্রাম যাপন করেন। সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি হাসপাতালের শয্যায় শুয়েই রচনা করেছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ নির্মাণ *জিদারিয়্যাহ* বা দেয়ালচিত্র। অনেক সমালোচকের মতে এটি একটি মহাকাব্য এবং দারভীশের কাব্য জীবনের মৌলিক সৃষ্টি। তার পুরো কাব্যযাত্রায় যে সত্য, সুন্দর ও চিরন্তনের অনুসন্ধান করে গেছেন, জ্ঞান-দর্শন ও ভাব-ব্যঞ্জনায় প্রকটভাবে তা ধরা দেয় এই কাব্যগ্রন্থে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে।

বিয়ে, সম্পর্ক এবং মৃত্যু

আরবীতে লিখলেও দারভীশ ইংরেজি, ইতালি, ফরাসি, রুশ ও হিব্রু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। দারভীশ বিয়ে করেন দুবার। লেবাননে অবস্থান কালে সিরিয়ার কবি নিজার কাবানীর (১৯২৩-১৯৯৮) ভাগ্নি রানা কাবানীকে বিয়ে করেন। স্ত্রী রানা কাবানী ক্যামব্রিজে পিএইচ.ডি. করতে গেলে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়। পরবর্তীতে প্রায় এক দশক পর আশির দশকের শেষের দিকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন মিশরীয় অনুবাদক হায়াৎ হিনীকে। এই বিয়েও অল্পদিনের মধ্যেই ভেঙ্গে যায়। দারভীশ ছিলেন

[৩৮]. *মাহমুদ দারভীশ ইয়াহদী রাইয়া "হালাতু হিছার" লিল ইনতিফাদা*, (আল জাজিরার বিশেষ নিবন্ধ। দোহা, কাতার: আল জাজিরা, ১৬. ০৪. ২০০২ ইং), محمود درويش يهدي ريع (حالة حصار) للانتفاضة | أخبار ثقافة | الجزيرة نت (aljazeera.net)

অস্থির প্রকৃতির। লাজুক স্বভাবের। তবে বিনয় ছিল তার চারিত্রিক অলঙ্কার। কিন্তু তিনি নিরীহ ছিলেন না। নিরীহ স্বভাবকে চরম ঘৃণা করতেন। সাহস ছিল তার ভবিষ্যত স্বপ্নময়তার বীজ।[৩৯]

দারভীশের অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। কবি সামীহ আল কাসিম, এ্যাডওয়ার্ড সায়ীদ ও মাজেদ আবু শারাব তাদের অন্যতম। তবে এর চেয়েও তার পরম বন্ধু ছিল কবিতা, কাগজ, কলম, ভাষা, জলপাই, অবরুদ্ধ ভূমি আর লড়াইরত চড়ুইয়ের অমর অস্তিত্ব। পৃথিবীর অসংখ্য, অনাগত মুক্তিকামী মানুষের ভালোবাসা আর মুক্তির স্মারক হয়ে দারভীশ ২০০৮ সালের ১০ আগস্ট ইন্তেকাল করেন আমেরিকার টেক্সাসের একটি হাসপাতালে। রেখে গেছেন অমর সৃষ্টি সম্ভার। তার অনেক অনেক রচনা। নিচে কবির সৃষ্টকর্মের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো।

রচনাবলী

কবিতা

১. দারভীশ, মাহমুদ, *আছাফীরু বিলা আজনিহাহ (عصافير بلا أجنحة (ডানাবিহীন চড়ুই)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০ খ্রি.)।

২. দারভীশ, মাহমুদ, *আওরাক আল-জায়তুন (أوراق الزيتون (জলপাইয়ের পত্রাবলী)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪ খ্রি.)।

৩. দারভীশ, মাহমুদ, *আশিক মিন ফিলিস্তিন (عاشق من فلسطين (ফিলিস্তিনের এক প্রেমিক)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬)।

৪. দারভীশ, মাহমুদ, *আখির আল-লাইল (آخر الليل (রাত্রি শেষে)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৭ খ্রি.)।

৫. দারভীশ, মাহমুদ, *আল-আছাফীরু তামুতু ফী আল-জালীল (العصافير تموت في الجليل গ্যালিলিতে চড়ুইদের মৃত্যু)* (বৈরুত: দার আল- আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯ খ্রি.)।

৬. দারভীশ, মাহমুদ, *হাবীবাতি তানহাদু মিন নাওমিহা (حبيبتي تنهض من نومها (ঘুম থেকে জেগে ওঠেন প্রিয়তমা)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭০ খ্রি.)।

৭. দারভীশ, মাহমুদ, *উহিব্বুকা আও লা উহিব্বুক (أحبك أولا أحبك (তোমাকে ভালোবাসি বা নাই বাসি)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২ খ্রি.)।

৮. দারভীশ, মাহমুদ, *মোহাওয়ালাহ রকুম (محاولة رقم (প্রচেষ্টা নম্বর-৭)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪ খ্রি.)।

৯. দারভীশ, মাহমুদ, *তিলকা ছুরাতুহা ওয়াহাজা ইনতিহার আল-আশিক*

[৩৯]. প্রাগুক্ত।

(تلك صورتها وهذا انتحار العاشق (এই তার রূপছবি, এই তার প্রেমিকের আত্মসংহার) (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৫ খ্রি.)।

১০. দারভীশ, মাহমুদ, *আ'রাস (أعراس (বাসর)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রি.)।

১১. দারভীশ, মাহমুদ, *ছবাহ আল-খায়র ইয়া মাজিদ (صباح الخير يا ماجد (শুভ সকাল হে মাজিদ)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.)।

১২. দারভীশ, মাহমুদ, *মাদীহ আল-জিল আল-আ'লী (مديح الظل العالي (উর্ধ্বছায়ার প্রশস্তি)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.)।

১৩. দারভীশ, মাহমুদ, *হিছার লিমাদাইহ আল-বাহর (حصار لمدائح البحر (সমুদ্র প্রশস্তির জন্য অবরোধ)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.)।

১৪. দারভীশ, মাহমুদ, *হিয়া আগনিয়াহ হিয়া আগনিয়াহ هي أغنية هي أغنية (সেই গান, সেই গীত)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.)।

১৫. দারভীশ, মাহমুদ, *ওয়ারদুন আক্বল (ورد أقل (কমদামের গোলাপ)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭ খি.)।

১৬. দারভীশ, মাহমুদ, *মা'সাহ আল-নারজিস ওয়া মুলহাহ আল-ফিদ্দাহ (مأساة النرجس وملهاة الفضة (নারগিস ট্রাজেডি এবং রূপালি কমেডি)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি.)।

১৭. দারভীশ, মাহমুদ, *উরীদু মা উরীদু (أري ما أريد (যা চাই তাহি দেখি)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.)।

১৮. দারভীশ, মাহমুদ, *আহাদা আশারা কাওকাবা أحد عشر كوكبا (এগারোটি নক্ষত্র)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২।

১৯. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতা আল-হিছান ওয়াহীদা (لماذا تركت الحصان وحيدا (ঘোড়াটি কেন ছেড়ে গেলে নিঃসঙ্গ)* (বৈরুত: দার আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.)।

২০. দারভীশ, মাহমুদ, *সারীর আল-গারীবাহ (سرير الغريبة (নির্বাসিতের বিছানা)* (বৈরুত: দার আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.)।

২১. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ (جدارية (দেয়াল চিত্র)* (বৈরুত: দার আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.)।

২২. দারভীশ, মাহমুদ, *হালাতু হিছার (حالة حصار (অবরোধ পরিস্থিতি)* (বৈরুত: দার আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.)।

২৩. দারভীশ, মাহমুদ, *আল-আ'মাল আল-জাদীদাহ (الأعمال الجديدة,* নতুন রচনা সংগ্রহ) (বৈরুত: দার আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪)।

২৪. দারভীশ, মাহমুদ, *লা' তা'তাজির আম্মা ফাআলতা (لا تعتذر عما فعلت (তোমার কৃতকর্মের জন্য কৈফিয়ত দিও না)* (বৈরুত: দার আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.)।

২৫. দারভীশ, মাহমুদ, *কাজাহর আল-লাওজ আও আবআদ (كزهر اللوز أو أبعد) (বাদাম ফুটন্ত ফুলের মতো অথবা তারোধিক)* (বৈরুত: দার আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.)।

২৬. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী হাদরাহ আল-গিয়াব (في حضرة الغياب) (অনুপস্থিতির উপস্থিতি সম্পর্কে)* (রামাল্লাহ: দার আল-শুরুক, প্রথম সংস্করণ, ২০০৬ খ্রি.)।

২৭. দারভীশ, মাহমুদ, *আছার আল-ফারাশাহ أثر الفراشة (বাটারফ্লাই ইফেক্ট (রোজনামচা)* (বৈরুত: দার আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.)।

২৮. দারভীশ, মাহমুদ, *লা উরীদু লিহাজি আল-ক্বাছীদাহ আন তানতাহী (لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي)* (বৈরুত: দার আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.)।

২৯. দারভীশ, মাহমুদ, *খুতাব আল দিকতাতুর আল-মাওজুনাহ (خطب الدكتاتور الموزونة)* (হাইফা: দার আল রাইয়াহ লি আল নাশার, ২০১৩ খ্রি.)।

গদ্য

১. দারভীশ, মাহমুদ, *শাই আন আল-ওয়াত্বন (شيئ عن الوطن) (দেশের কথা)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১ খ্রি.)।

২. দারভীশ, মাহমুদ, *বিদাআন আইয়্যাতুহা আল-হারব বিদায়ান আইয়ুহা আল-সালাম (وداعا أيتها الحرب وداعا أيها السلام) (বিদায় হে যুদ্ধ, বিদায় হে শান্তি)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৪ খ্রি.)।

৩. দারভীশ, মাহমুদ, *ইয়াওমিয়্যাত আল-হুজন আদী (يوميات الحزن العادي) (সহজাত দুঃখের দিনগুলি)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৩ খ্রি.)।

৪. দারভীশ, মাহমুদ, *জাকিরাহ লি আল-নিসইয়ান (ذاكرة للنسيان) (বিস্মৃতির স্মৃতি)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.)।

৫. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী ওয়াছফি হালাতিনা: মাক্বালাতুন মুখতারাহ (১৯৭৫-১৯৮৫) (আমাদের প্রেক্ষিত: নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৭৫-১৯৮৫)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.)।

৬. দারভীশ, মাহমুদ, *আবিরুনা ফী কালামিন আবিরিন* (عابرون في كلام عابر) *(চলমান শব্দের যাতায়াতকারীরা)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.)।

৭. দারভীশ, মাহমুদ ওয়া আল কাসিম, সামীহ, *আল-রাসাইল বিল ইশতিরাক মাআ সামীহ আল-কাসিম (الرسالة بالاشتراك مع سميح القاسم)(সামীহ আল ক্যাসিমের সাথে পত্রবিনিময়)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.)।

৮. দারভীশ, মাহমুদ, *আল-মুখতালিফ আল-হাকীকী (المختلف الحقيقي) (বাস্তবের নানারূপ)* (বৈরুত: দার আল-আওদাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.)।

৯. দারভীশ, মাহমুদ, *আনা আল-মাওক্বা' আদনাহ ()*, দার আল-সাকী, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন, ১৯৯১।

১০. দারভীশ, মাহমুদ, *হাইরাহ আল-আইদ: মাক্বালাতুন মুখাতারাহ (حيرة العائد : مقالات مختارة প্রত্যাবর্তনকারীর অস্থিরতা: নির্বাচিত প্রবন্ধ)*, রিয়াদ আল-রাঈস, প্রথম সংস্করণ, বৈরুত, লেবানন, ২০০৭।

১১. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী ইনতিজার আল বারাবারাহ (في انتظار البرابرة)* (আল আহলিয়াহ, ১ম সংস্করণ: ১৯৮৭ খ্রি., দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৬ খ্রি.)।

দারভীশের বেশিরভাগ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তবে তিনি বেশ কিছু নাটক ও গল্প লিখেছেন যা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকায় তার বিপুল প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কলাম, গল্প, নাটক ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, যার অনেক কিছু এখনো সংকলন কিংবা বই আকারে প্রকাশিত হয়নি। সংগঠিতভাবে তার পরিপূর্ণ রচনাসমগ্রও বের হয়নি। লেবাননের বৈরুতভিত্তিক প্রকাশনাসংস্থা রিয়াদ আল-রাঈস লি আল-কুতুব ওয়া আল-নাশর প্রথম দারভীশের রচনা সমগ্র বের করার উদ্যোগ নেয়। ২০০৫ সনে সংস্থাটি 'আল-আ'মাল আল-কামিলাহ' নামে আল-দীওয়ান বা কবিতা দিয়ে দারভীশের রচনাসমগ্র বের করা শুরু করে। মোট তিন খণ্ডে দারভীশের দীওয়ান বা কবিতার সংকলন প্রকাশ করে সংস্থাটি। দারভীশের মৃত্যুর পর ২০০৯ সনে সংস্থাটি 'আল-দীওয়ান: আল-আ'মাল আল-কামিলাহ আল-জাদীদাহ' নামে আরো একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করে। মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ২০১৩ সনে তার একটি নতুন কবিতার বই প্রকাশিত হয়। 'খুতাব আল-দিকতাতুর আল-মাওজুনাহ' বইটির নাম। যে বইয়ের কবিতাগুলো কবির ফ্রান্সে অবস্থানকালে প্যারিসের একটি আরবী ভাষাভিত্তিক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। এভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তার প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা কিংবা অন্যান্য রচনার সংকলন বের হলে দারভীশের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আরো গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাকবা: ফিলিস্তিনের পরিচয়, প্রতিরোধ-লড়াই-সংগ্রাম ও মুক্তির উৎস

শিল্প-সাহিত্য কিংবা রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চার একাডেকিম পরিসরে 'ফিলিস্তিন প্রশ্ন' একটি পরিচিত পরিভাষা। যাতে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক আত্মপরিচয়, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার, ইজরাইলের সহিংসতা, জননিপীড়ন এবং গণমানুষের মুক্তির প্রশ্ন মৌলিক আলোচ্য বিষয়। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইজরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনীদের এই আত্মপরিচয়ের লড়াই। যে লড়াই যুগপৎভাবে ব্রিটিশ এবং জায়োনিস্ট উপনিবেশ বিরোধিতার মাধ্যমে শুরু হয় তাই ক্রমে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কিংবা জাতীয় আত্মপরিচয়ের আন্দোলনে রূপ নেয়। মানব সভ্যতার ইতিহাস এবং ফিলিস্তিনের ইতিহাস প্রায় সমকালীন হওয়ায় যে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার গভীরতর ভাণ্ডার পুঞ্জীভূত হয়েছে ফিলিস্তিনের তার সাথে এই আত্মপরিচয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ সুদূর ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত, আক্রমণ-প্রতিরোধ, সংঘাত-সংগ্রামের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে ফিলিস্তিনের সামগ্রিক ইতিহাস। তবে উসমানি শাসনোত্তর উপনিবেশিক শাসন-পরবর্তীকালে এসে ফিলিস্তিনের জাতীয় জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ উৎসফলক হয়ে ওঠে নাকবা (Disaster)। ফিলিস্তিনীদের জাতীয় জীবনে ভাষা, সাহিত্য থেকে শুরু করে রাজনীতি-অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে নানাভাবে পরিবর্তনের সূচনা হয় নাকবাকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিকভাবে নাকবা থেকে কিভাবে জাতীয় আত্মপরিচয় ঘটে তার কাব্যময় হদিস খুঁজে পাওয়া যায় মাহমুদ দারভীশের কবিতায়। যেহেতু দারভীশ ছিলেন ফিলিস্তিনী জনগণের লড়াইয়ের অন্যতম জাতীয় ব্যক্তিত্ব ফলে মাতৃভূমি হারানোর গভীর ক্ষত এবং তার জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বিপুলভাবে তার কবিতা ও রচনায় উঠে আসে।

২.১: নাকবা পরিচয় এবং উপস্থাপন সংক্রান্ত জটিলতা
২.২: গোড়ার ইতিহাস সন্ধান: উপনিবেশায়ন ও জায়োনিজম
২.৩: নাকবা থেকে আত্মপরিচয়
২.৪: নাকবা-উত্তর সামাজিক পরিস্থিতি
২.৫: নাকবা: একটি চিন্তা ও ইতিহাস
২.৬: নাকবার বিবিধ ভাষ্য, জাতীয় চিন্তা ও সাহিত্য
২.৭: নাকবা-উত্তর ফিলিস্তিনের আরবী সাহিত্য
২.৮: দারভীশের কবিতা এবং নাকবা
২.৯: নাকবা: উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি
২.১০: নাকবা: নতুন সম্ভাবনা এবং বেরিয়ে আসার প্রেক্ষিত

২.১: নাকবা পরিচয় এবং উপস্থাপন সংক্রান্ত জটিলতা

এক কথায় নাকবার পরিচয় তুলে ধরা কঠিন। তবে কতগুলো শব্দবন্ধের ভিতর নাকবার সাধারণ পরিচয় ধারণ করা সম্ভব। অর্থাৎ নাকবামাত্রই ভূমিহীন, ভূমিচ্যুত, সর্বহারা, উচ্ছেদের শিকার, ভূ-সম্পত্তির মালিকানা থেকে বিতাড়িত, নির্বাসিত, উদ্বাস্তু-শরণার্থী (মানফা, গারবাহ - غربة ،منفي), স্বজন-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন (শাতাত - شتات), মানচিত্রবিহীন, উপনিবেশিত, সীমাহীন জুলুম-নিপীড়ন, সহিংসতা ও গণহত্যার শিকার, ভয়-আতঙ্কগ্রস্থ ও সন্ত্রাস আক্রান্ত একটি বিধ্বস্ত জনগোষ্ঠী এবং এক উড়ে আসা হানাদার জাতির ধ্বংসলীলায় ভেঙ্গে পড়া সমাজ ও দেশের আত্মগাথা। তবে অল্প কথায় নাকবার পরিচয় এবং তাৎপর্য ব্যক্ত করেছেন সিরিয়ার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী কনস্টেনটিন জুরাইক (১৯০৯-২০০০)। ধারণা করা হয়, আরব জাতীয়তাবাদের চিন্তাগত পথিকৃত ছিলেন জুরাইক। একইসাথে জুরাইকই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি ১৯৪৮ এর বিপর্যয়ে নাকবাকে ক্যাটাগরিক্যালি বিশেষভাবে প্রথম ব্যবহার করেন। যাইহোক, জুরাইকের মতে,

> وانما هي نكبة بكل ما في هذه الكلمة من معني و محنة من أشد ما ابتلي به العرب في تاريخهم الطويل، علي ما فيه من محن ومآس.[৪০]

> নাকবা থেকে বিপর্যয় বলতে যেসব অর্থ প্রকাশিত হয় তার প্রতিটি অর্থ ও মর্ম নিয়েই নাকবা। মূলত এটি কঠিনতম এক লড়াই যেখানে আরবরা তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এর সর্বাত্মক শ্রম-সাধনা আর লড়াই-সংগ্রামের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

জুরাইক যেভাবে নাকবাকে চিহ্নিত করেছেন তার পরিসর ছিল পুরো আরব জাতিকে ঘিরে। কিন্তু তার কেন্দ্র এবং উৎস ফিলিস্তিন। নাকবার ব্যবহারগত প্রকাশের বিভিন্নতার কারণে এর পেছনে ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে ধারণাগত কিংবা আদর্শবাদী অবস্থান যে একেবারেই নাই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আধুনিক উদারতান্ত্রিক পরিবেশে ফিলিস্তিনকেন্দ্রিক আলোচনায় নাকবার এরকম বহুবিধ প্রকাশ সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে কবিতা-সাহিত্য কিংবা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লক্ষ করার মতো। যেকারণে দেখা যায়, 'নাকবা' শব্দের ব্যবহারে একধরনের আদর্শবাদী ছাপ পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষত ইজরাইলী গণমাধ্যম ও তাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিসরে নাকবা দিবসে নাকবাকে জাতীয় আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে নিছক শোক হিসেবে দেখানো হয়। যাতে নাকবার অর্থ বিপর্যয় (Disaster), কোথাও দুর্যোগ (Calamity), সংকট, কোথাও আবার ট্রাজেডি কিংবা শোক হিসেবে এর নানামুখী ব্যবহার দেখা যায়। যেখানে নাকবাকে একটি প্রথা এবং জনতুষ্টবাদী

---

[৪০]. জুরাইক, ড. কনস্টেনটিন, *মা'না আল-নাকবাহ* (বৈরুত: দার আল-ইলম লি আল-মালাঈন, ১৯৪৮ ইং), পৃ. ৪-৩৬।

(Populist[৪১]) সংস্কৃতির বাতাবরণে একটি ফ্যাশন হিসেবে রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এতে করে ফিলিস্তিনজুড়ে ১৯৪৮ সনে ইজরাইলী হামলায় যে ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক এবং ব্যাপকবিধ্বংসী মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে তাতে কিছুটা দৃষ্টি এড়ানো যায়। তবে তাতে ফিলিস্তিন ইস্যুর বিপরীতে নাকবাকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা নানা বয়ান-আলোচনা যেমনই হোক না কেন নাকবার সর্বজনীন দৃষ্টিগ্রাহ্য আবেদন গুরুত্বপূর্ণ।[৪২] কাজেই অনুবাদমূলক শব্দ বিপর্যয়, দুর্যোগ কিংবা শোক'র ব্যবহার না করে সরাসরি 'নাকবা' ব্যবহারই এ ধরনের বহুবিধ প্রকাশের বিভ্রান্তি এবং মতাদর্শিক পক্ষপাত এড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারে। এই গবেষণায় 'নাকবা' এবং এর অনূদিত বাংলা শব্দ 'বিপর্যয়' উভয়ই বিভিন্ন সময় ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু তাতে নাকবার সর্বাত্মক অর্থসহই এর ব্যবহার বিবেচ্য বটে। কারণ, নাকবার সাথে ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের আবেগ জড়ানো থাকায় এ মহাট্রাজেডি অনেক সময় বিচিত্র কাব্যময় ব্যাঞ্জনা নিয়ে প্রকাশিত হয়। এধরনের প্রকাশের আড়ালে ফিলিস্তিনজুড়ে যে গণহত্যা চালিয়েছিল ইজরাইলী সেনাবাহিনী চাইলেই তাতে তা অস্বীকার করার মতো ব্যাপার ঘটে যায়না। কারণ, শিল্প-সাহিত্যে এধরনের সংবেদনশীল বিষয়ে যে মাত্রায় নন্দনতাত্ত্বিক এবং ভাবগত প্রকাশ ঘটে তার বাহ্যরূপ বা নিছক আভিধানিক অর্থ দিয়ে সর্বোত বিচার হয় না। অভ্যন্তরে, গভীর পটভূমিতে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। ফলে এরকম পর্যবেক্ষণে হত্যাকাণ্ডের মতো ব্যাপকতরো সহিংস ঘটনা কোনো আদর্শবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও আড়াল করা সম্ভব নয়। মোটকথা বিপর্যয় বললেও গণহত্যাসহ সার্বিক ধ্বংসযজ্ঞই বোঝানো হয়।

নাকবা সংঘটিত হওয়ার আগে দেখা যায়, ১৯৪৮ এর জন্য ইহুদি জায়োনিস্টদের যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল– যা তারা খুব সংগঠিতভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল। যার ফলে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে ইজরাইল রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ নিশ্চিত হয়েছিল। কিছুটা পেছনে দৃষ্টি ফেরালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরবদের বিদ্রোহ, অব্যাহত আন্দোলন ও প্রতিরোধের ঘটনা ইহুদিদের সামরিকভাবে সংগঠিত হওয়াকে ত্বরান্বিত করে। যেমন, ১৯১৭ সালে ব্যালফোর ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ফিলিস্তিনে সামাজিকভাবে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হয় আরদের মাঝে। পরবর্তীতে ১৯২০ এর এপ্রিলে আরব-ইহুদী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ঐতিহাসিকভাবে এ সহিংসতাকে *নবী মুসা রায়ট* হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৪৩] অনুরূপ দাঙ্গার ঘটনা ঘটে ১৯২৯ সালের আগস্টে।[৪৪] জেরুজালেমের বোরাক প্রাচীরে[৪৫]

---

[৪১]. জনতুষ্টবাদ বা পপুলিজম রাজনীতি বিজ্ঞানের একটি ধারণা। ঊনিশ শতকে ব্যবহারিক রাজনীতি, রাজনৈতিক আন্দোলন, জনপরিসরে সক্রিয় তৎপরতা ও দলীয় রাজনীতিসহ বিভিন্ন পরিসরে এ ধারণা গড়ে ওঠে। পপুলিজম মূলত একধরনের মতাদর্শ যেখানে জনগণকে কেন্দ্রে রাখা হয়। জনগণই যেখানে কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। অভিজাত শ্রেণি, স্টাবলিশমেন্ট ও প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা পপুলিজমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পপুলিজমে অনেক সময় ঐতিহ্য, প্রথা, নিয়ম, নীতিকে উপেক্ষা করা হয়। Mudde, C. Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction* (Oxford University Press, 2017), পৃ. ২৫।

[৪২]. বৌচনিক-চেন জি, ড. রাফায়েল, কর্নেল (অব), *দি ফলস 'নাকবা' ন্যারেটিভ* (ইজরাইল: দি বেইজিন-সাদাত সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, পেপার নং ১১৪৩), ভিজিট: এপ্রিল ১৬, ২০১৯। https://besacenter.org/perspectives-papers/nakba-false-narrative/#

[৪৩]. সেগেভ, টম, *ওয়ান প্যালেস্টাইন, কমপ্লিট: জ্যুজ অ্যান্ড অ্যারাবস আন্ডার দ্য ব্রিটিশ ম্যান্ডেট* (লন্ডন: অ্যাবাকাস, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১২৭-১৮১।

[৪৪]. মরিস, বেনি, *রাইটিয়াস ভিক্টিমস: আ হিস্ট্রি অব দি জায়োনিস্ট অ্যান্ড অ্যারাব-কনফ্লিক্ট ১৮৮১-২০০১* (নিউ ইয়র্ক: ভিনটেজ বুকস, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১১৬-১৮৪।

(পশ্চিম প্রাচীর) প্রবেশকে ঘিরে আরব মুসলিম ও ইহুদীদের মাঝে সংঘাত ছড়িয়ে পড়লে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। একইভাবে ১৯৩৩ এর অক্টোবরে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। রাজনৈতিক দিক থেকে এটি ছিল একধরনের নাগরিক বিদ্রোহ (সিভিল ওয়ার)। তবে তাতে পুরনো অনেক বিষয় ঘটনার কারণ হিসেবে ইন্ধন যুগিয়েছে। প্রথমত, ১৯২০ সালে ফ্রান্সের কাছে সিরিয়ার হাশেমী শাসক ফয়সাল পরাজিত হওয়ার ঘটনা। এতে মূলত ফিলিস্তিনের মোহাম্মদ আমিন আল হোসেইনির[৪৬] (১৮৯৭-১৯৭৪) নেতৃত্বাধীন আরব জাতীয়তাবাদীদের পরাজয় ঘটে। ফ্রান্সের বিপরীতে পরাজয়ের কারণে ইহুদী বিরোধিতা আরবদের মাঝে আরো বেশি দানা বাঁধে। দ্বিতীয়ত ছিল ক্রমবর্ধমান বসতি স্থাপনের ঘটনায় ইহুদীদের প্রতি আরবদের মাঝে ক্ষোভ-অসন্তোষ আরো তীব্রতরো হয়ে ওঠে। এরপর ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ জুড়ে স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশবিরোধী আরবদের বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। ঐতিহাসিকভাবে এ ঘটনাকে মহাবিদ্রোহ বলা হয়। এছাড়া ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানীর ইহুদীবিরোধী নাৎসীবাদের উত্থান– যা কোনো না কোনোভাবে আরবদের ইহুদী বিরোধিতাকে আরো বাড়িয়ে দিতে সহায়ক ছিল। কিন্তু আরবদের বিদ্রোহ কিংবা ইহুদী ও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে জায়োনিস্ট ইহুদীরা অভ্যন্তরীণভাবে আরো বেশি সতর্ক হয়ে ওঠে। এসব বিদ্রোহের ঘটনার প্রেক্ষিতে ইহুদীরা সংঘঠিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তৎকালীন জায়োনিস্টদের বসতি স্থাপনকারী সংস্থা ইশুভ (Yishuv) বেশ সংগঠিত একটি আন্ডার-গ্রাউন্ড মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করে। যার নাম দি হাগানাহ। এটি ছিল জায়োনিস্টদের প্রথম সংঘবদ্ধ সশস্ত্র উইং, যেটি এক পর্যায়ে ইজরাইলের সামরিক বাহিনীর মূল ভিত্তিগত বডি হিসেবে নির্ধারিত হয়ে ওঠে। সামরিক শক্তিতে পরিপূর্ণ সক্ষমতা অর্জনে তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাজ করে। তাদের তখন চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিন এবং আরবদের বিরুদ্ধে কঠোর শক্তি নিশ্চিত করা। যার প্রেক্ষিতে তারা নন-স্টেট সংঘবদ্ধ একটি গ্রুপ হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সংগ্রহ করে। যাতে ছিল ১০৪৮৯টি রাইফেল, ৭০২টি হালকা মেশিনগান, ২৬৬৬টি সাবমেশিনগান, ১৮৬টি মধ্যমস্তরের মেশিনগান, ৬৭২টি দুই ইঞ্চি মর্টার, ৯২টি তিন ইঞ্চি মর্টার। তবে ৪৮'র যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে হাগানাহ'র হাতে কোনো ভারি অস্ত্র বলতে যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি সরঞ্জমাদি ছিলনা। তারা এসব কিছু ব্রিটেনের চলে যাওয়ার সময় ব্রিটিশ বাহিনী থেকে সংগ্রহ করতে পারে বলে ধারণা করা হয়। ইশুভ এর গভীর যোগাযোগ ছিল আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ের সামরিক সূত্রগুলোর সাথে। সে সুবাদে দি হাগানাহ অল্পসময়য়ের মধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ এর অক্টোবর থেকে ১৯৪৮ এর জুলাইয়ের মধ্যে দি হাগানাহ'র কারখানাগুলো ৩০ লক্ষ ৯ এমএম বুলেট, ১৫০,০০০ গ্রেনেড, ১৬ হাজার স্টেনগানে ভরপুর হয়ে যায়। এমনকি ১৯৪৮ এর

---

[৪৫]. বোরাক প্রাচীর বা বোরাক ওয়াল। আরবীতে বলা হয়, الْحَائِطِ ٱلْبُرَاق। এটাকে ওয়েস্টার্ন ওয়ালও বলা হয়। মসজিদে আকসার সবচেয়ে প্রাচীন অংশ যেটি মসজিদে আকসার পশ্চিমে অবস্থিত। মুসলিম বিশ্বাস মতে, হযরত মুহাম্মদ (স.) ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণের আগ মুহূর্তে এখানে অবস্থান করছিলেন কিছু সময়ের জন্য। এসময় তিনি এখানে প্রাচীরে পেরেক মেরে সেই পেরেকে বোরাক বেঁধে রেখেছিলেন। বোরাক বেঁধে রাখার কারণে সেই প্রাচীরের নাম বোরাক প্রাচীর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। Al-Jallad, *Ehab, Landmarks Of Al-Aqsa Mosque Under The Microscope* (Baytul Maqdis Center for Literature, 2017)|

[৪৬]. মোহাম্মদ আমিন আল হোসেইনি ব্রিটিশবিরোধী মুসলিম নেতা এবং ইসলামিক স্কলার। ফিলিস্তিনকেন্দ্রিক আরব জাতীয়তাবাদের সংগঠক ছিলেন। Sayigh , Yezid, *Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement:*1949–1993 (New york: Oxford University Press, 2004)

জুলাইয়ের মধ্যেই দি হাগানাহ সামরিক জনশক্তিতেও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ৬৩ হাজারের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে তারা।[৪৭] এতোসব শক্তি অর্জনের মধ্যদিয়ে জায়োনিস্ট শক্তি নিজেদের আয়োজন ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তোলে। যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন তাদের আর পিছু হটতে হয়নি। যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ইহুদিরা তখন ফিলিস্তিনের প্রায় ৮৩ ভাগ জনসংখ্যার অধিকারী। মুহূর্তের মধ্যে এই পরিবর্তন। ৯০ হাজারেরও অধিক আরব ফিলিস্তিনী নিজ ভূমিতে শরণার্থী হয়ে পড়ে। সবশেষে সেই সময়ের অবস্থায় মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার আরব ফিলিস্তিনীর অধিকৃত এলাকায় স্থায়ী হওয়ার সুযোগ হয়। এ ঘটনায় ৭ লাখ মতান্তরে ৮ লাখ ৫০ হাজার ফিলিস্তিনী মাতৃভূমি ছেড়ে পালিয়ে যায় প্রতিবেশী আরব দেশগুলোতে।[৪৮] যুদ্ধের তিন বছর পর ৭ লাখ ইহুদি ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে দখলকৃত ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে। সীমান্তবিহীন অবস্থায় তারা প্রতিবেশি দেশ লেবানন, জর্ডান ও সিরিয়ার শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নেয়।[৪৯] এটা ছিল মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে ফিলিস্তিনের এক মহাদুর্যোগ। ফিলিস্তিনী জাতি এই ভয়ানক ঘটনাকে নাকবা বা দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রতিবছর তারা জাতীয়ভাবে এই দিনটিকে নাকবা দিবস হিসেবে পালন করে।

২.২: গোড়ার ইতিহাস সন্ধান: উপনিবেশায়ন ও জায়োনিজম

১৯৪৭ সনে আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের উপনিবেশ প্রত্যাহার শুরু হয়। ওই সময়কালে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যসহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় নতুন জোয়ারে প্লাবিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সেই সময় বিস্ময়করভাবে পুনরায় পরাধীনতার নিগড়ে বাধা পড়ে যায় দুনিয়ার সবচেয়ে আদিমতম এই জনপদ। ১৯৪৮-এ ইজরাইল রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সীমান্তবিহীন অবস্থায় তারা প্রতিবেশি দেশ লেবানন, জর্ডান ও সিরিয়ার শরর্ণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নেয়।

এই সময়ে ফিলিস্তিন ত্যাগের মুহূর্তে ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইজরাইলের সেনারা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। অসংখ্য নারী, পুরুষ ও শিশু চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মধ্যরাতে অল্প সময়ে ইহুদীরা প্রায় তিন লক্ষেরও বেশি আরবকে বিতাড়িত করে ফিলিস্তিনের ৫৬.৪৭ ভাগ এলাকায় দখল প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। আরবদের সাথে তখনো আক্ষরিক অর্থে যুদ্ধই শুরু হয়নি। ভোরে আরবরা ঢুকে পড়লে যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু তার আগেই মধ্য রাত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ইজরাইল ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে। আরবরা ইহুদীদের ৭০ থেকে ৭৫ হাজার সৈন্যের বিপরীতে ছিল মাত্র ২৪ হাজার। ফলে সবশেষে দেখা গেল, জায়োনিস্ট ইহুদিরা রাতভর ধবংসযজ্ঞ চালিয়ে ১৫ মে সকালে ইজরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দিল খুব তড়িগড়ি করে। এ যুদ্ধের

[৪৭]. মরিস, বেনি, *দি বার্থ অব দি প্যালেস্টানিয়ান রিফিউজি প্রবলেম রিভিজিটিড* (ক্যামব্রিজ, যুক্তরাজ্য: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪ ইং), পৃ. ৩৩-৭০।
[৪৮]. পাপ্পি, এলান, *আ হিস্ট্রি অফ মডার্ন প্যালেস্টাইন* (ক্যামব্রিজ, যুক্তরাজ্য: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬ ইং), পৃ. ১৭০-১৯০।
[৪৯]. নেলসন, ক্যারি এন্ড নোয়াহ, গ্যাব্রিয়েল, ব্রাহাম (সম্পাদিত) *দি কনসাইজ হিস্ট্রি অব ইজরায়েল: দি কেইস অ্যাগেইন্স্ট অ্যাকাডেমিক বয়কটস অব ইজরায়েল* (শিকাগো-নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র: ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪০৭।

মেয়াদ ছিল মাত্র নয় মাস এবং আরো কয়েকদিন; কিন্তু এই সমসয়টাই ছিল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে চরম অভিজ্ঞতার।
ফিলিস্তিনী জাতি এই ভয়ানক ঘটনাকে তাদের জাতীয় জীবনে নাকবা বা মহাবিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করে। প্রতিবছর তারা জাতীয়ভাবে এই দিনটিকে নাকবা দিবস হিসেবে পালন করে।[৫০]

এটি নাকবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু নাকবার গোড়ার ইতিহাস সন্ধান করতে হলে আরো অনেক গভীরে এবং পিছনে যেতে হবে। কারণ, যে নাকবা বা বিপর্যয় ১৯৪৮ সনে প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার মধ্যদিয়ে ঘটেছে তা তার আনুষ্ঠানিক এবং এক প্রকার ঐতিহাসিক পরিণতি হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতঅর্থে নাকবার শুরু আরো অনেক পিছনে। ফিলিস্তিনের ইতিহাস তদন্ত করলে নাকবার গোড়ার চিত্র স্পষ্ট হবে।

ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিন কয়েকটি কালপর্বের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়। উপনিবেশিক এবং উপনিবেশ-উত্তর যুগ এবং দ্বিতীয়ত জায়োনিজম'র সময়কাল। আরব ফিলিস্তিনে কেন চূড়ান্ত পর্যায়ে নাকবা সংঘটিত হয়েছে উপনিবেশায়ন এবং উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতি, সেইসাথে ফিলিস্তিনে জায়োনিস্টদের নেতৃত্বে ইহুদিবসতি স্থাপনের পটভূমি পর্যালোচনা করলে তার কারণ উন্মোচিত হবে। ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভূত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরণ নির্বাসিত বিখ্যাত সমালোচক ও বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাইদ (১৯৩৫-২০০৩) মধ্যপ্রাচ্য এবং ফিলিস্তিন সংকটের ঐতিহাসিক কারণ হিসেবে ইউরোপনির্মিত 'প্রাচ্যবাদ' (Orientalism), কলোনাইজেশন এবং জায়োনিজমকে চিহ্নিত করেছেন।[৫১] জায়োনিজম, কলোনাইজেশন এবং প্রাচ্যবাদ কোনো না কোনোভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সাঈদের মতে, কলোনাইজেশনের প্রাক-পটভূমি গড়ে তোলা হয় প্রাচ্য সম্পর্কীয় 'অপরায়ণ'র ধারণা ও 'উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট'র জ্ঞানীয় মনোভঙ্গীর মাধ্যমে। প্রাচ্যবিদরা প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমা দুনিয়ায় যে ধারণা গড়ে তুলেছেন, তা থেকে ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতা প্রাচ্যের মাটিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক এবং অর্থনীতিকভাবে আধিপত্য কায়েমে নিবিড়ভাবে প্ররোচিত হয়। প্রাচ্য সম্পর্কে যে পরিচয় তুলে ধরা হয় প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণায়, তাতে প্রাচ্যকে 'অপর', 'অসভ্য' এবং নিকৃষ্ট হিসেবে দেখানো হয়। এতে মনস্তাত্ত্বিক পরিগঠনের ফলে প্রাচ্যকে নীচুতর ভাববার, তুচ্ছ হিসেবে দেখবার এবং এর ফলে প্রাচ্যকে বশ করা যায় এমন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে প্রাচ্যবাদ। যাতে ইউরোপের জন্য প্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার যৌক্তিক ভিত্তি তৈরি করে প্রাচ্যবাদী বিদ্যান ও পণ্ডিতগণ। এমন বৈধতাদানের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের প্রেক্ষিতে প্রাচ্যবাদ-উপনিবেশায়নের সাথে জায়োনিজমেরও ঐতিহাসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যা ঊনিশ শতকে অন্যান্য অঞ্চলের মতো ফিলিস্তিনে শুরু হওয়া

---

[৫০]. মুহাম্মদ ফুয়াদ দীব আল সুলতান, *সূরাতু নাকবাহ ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ*, (গাজা: মাজাল্লাহ আল জামিয়া আল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংখ্যা, আরবী ভাষা বিভাগ, জামিয়া আল আকসা, ২০০২ ইং), পৃ. ১৫০ এবং হোসেন, শাহাদাৎ, *মাহমুদ দারভীশের কবিতাঃ ভাব ও বিষয় অনুষঙ্গ*, (আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: মাস্টার্স থিসিস), ২০০৮ ইং)।
[৫১]. ডব্লিউ. সাঈদ, এডওয়ার্ড, *দি কোয়েসশন অব প্যালেস্টাইন* (নিউ ইয়র্ক: টাইমস বুক, ১৯৮০ ইং), পৃ. ৩-১০।

ব্রিটেন কর্তৃক উপনিবেশিক ব্যবস্থায় দেখা যায়। শাসন শুরু হওয়ার এক পর্যায়ে সেখানে জায়োনিস্টরা ইহুদি কলোনাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু করে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। ব্রিটিশ কলোনাইজেশনের মধ্যে জায়োনিস্টদের ইহুদি কলোনাইজেশনকেও যে যৌক্তিকতা দিয়েছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ মুখপাত্র, কূটনীতিক অ্যাভেলি বেয়ারিং (লর্ড ক্রমার নামে পরিচিত, ১৮৭৯ সনে ক্রমার মিশরের গভর্নর ছিলেন) এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমন ব্যালফোর (১৯০২ থেকে ১৯২০ সময়কাল। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৭ সনে তার নামেই ঐতিহাসিক ব্যালফোর ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়; যেটি *ব্যালফোর ঘোষণা* হিসেবে বিখ্যাত।) সাঈদ সে প্রসংগে ইংগিত করেছেন 'ওরিয়েন্টালিজম'-এ। সাঈদ বলেন,

> I think, to underestimate the reservoir of accredited knowledge, the codes of Orientalist orthodoxy, to which cromer and Balfour refer everywhere in their writing and in their public policy. To say simply that Orientalism was a rationalization of colonial rule is to ignore the extent to which colonial rule was justified in advance by Orientalism, rather than after the fact.[৫২]

> আমি মনে করি, স্বীকৃত জ্ঞানের সরবরাহকে তুচ্ছ করতে, প্রাচ্যবিদদের অর্থডক্স নিয়ম-প্রণালী, যেটা ক্রোমার ও ব্যালফোর তাদের লেখা এবং জনসাধারণসংশ্লিষ্ট নীতির সর্বত্র উল্লেখ করেছেন। সহজে বললে, উপনিবেশিক শাসনকে যুক্তিযুক্তকরণ হচ্ছে প্রাচ্যবাদ, যা সেই পরিসরকে তাচ্ছিল্য করে, যেটা ঘটনার পরে না বরং আগেই প্রাচ্যবাদের মাধ্যমে উপনিবেশিক শাসনকে ন্যায্যতা দিয়েছিল।

যায়নিস্টদের বসতি স্থাপনের মধ্যদিয়ে মূলত ফিলিস্তিনে যুগপৎভাবে দ্বৈত-উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া চালু হয়। ১৯১৭ সালে ব্যালফোর ঘোষণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ইহুদিদের বসতি স্থাপন। এই ঘোষণা ইহুদিদের নিছক বসতি স্থাপনের ব্যাপার ছিল না, এটি ছিল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাক-আনুষ্ঠানিক চুক্তি। তবে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসতি স্থাপন শুরু হয় আরো অনেক আগে থেকে। ১৫১৭ সালে উসমানি খলিফা ১ম সুলতানের আমল থেকে। পর্তুগাল, স্পেন থেকে এসে এখানে তারা বসতি স্থাপন করে। যাদেরকে ইসোফ বা আদি ইহুদি গোষ্ঠী বলা হয়। অবশ্য সুলতানের আমলে অন্য অঞ্চল থেকে এসে ইহুদিদের ফিলিস্তিনে বসবাস আর তুর্কি খেলাফতের পতনের প্রেক্ষাপটে ইহুদিদের বসতি স্থাপন এক নয়। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে এ দুই সময়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যাইহোক, ১৮৩৮ সালে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ কনস্যুলেট স্থাপনের পর

---

[৫২]. ডব্লিউ. সাঈদ, এডওয়ার্ড, *দি ওরিয়েন্টালিজম* (লন্ডন: প্যাংগুইন বুকস, ২০০৩ ইং), পৃ. ৩৯।

থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট ইংরেজদের মধ্যে জায়োনিস্টদের সমর্থন বাড়তে থাকে। সমর্থন বাড়ার কারণ ছিল একটি স্মারক চুক্তি। যাতে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসতি গড়ার কথা বলা হয়। চুক্তিটি ছিল, *Memorandum to protestant monarch of Europe for the restoration of the Jews to Palestine (১৭৮৪-১৮৮৫)*। পরবর্তীতে ১৮৪১-১৮৪২ সনে সিরিয়ার দামেস্কে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় হেনরি চার্চিলের সাথে। যাতে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশদের সাথে যায়নিস্টদের চুক্তি রেকর্ড করা হয়।[৫৩]

পরে ব্রিটিশ-জায়োনিস্ট এই সম্পর্ক আরো বিকশিত হয়। দেখা যায়, ব্রিটিশদের সহায়তায় ১৮৮১ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত সময়ে চলা প্রথম 'আলিয়া' (উর্ধ্বারোহণ। মানে পর্বতের উপরে অবস্থিত উপাসনালয়ে ইহুদিদের আরোহণ। তবে জায়োনিস্টরা ইহুদিদের অন্য দেশ থেকে জেরুজালেমে গমনকে 'আলিয়া' বলে থাকে। ১৮৯৪-১৮৯৫ এর এই সময়ে ইউরোপে এন্টিসেমাইটিজম তথা ইহুদিবিদ্বেষের ফলে জায়োনিস্টদের সংগঠিত হওয়া, প্রতিবাদী আন্দোলন, এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, উসমানি খেলাফতের পতন ও দ্বিতীয় আলিয়া'র এই সময়কালে ব্যাপকভাবে ইহুদি বসতি স্থাপন করা হয় ফিলিস্তিনে। সর্বশেষ ১৯২০ এর এপ্রিলে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট এর ফলে চূড়ান্তভাবে ফিলিস্তিনে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপনে আন্তর্জাতিক বৈধতা লাভ করে জায়োনিস্টরা। এর ফলে ১৯৪৬ অর্থাৎ আরব-ইজরাইল যুদ্ধের প্রাক-পরিস্থিতির সময়কালে জায়োনিস্টরা তাদের কলোনাইজেশন প্রক্রিয়া চরম অবস্থায় নিয়ে যায়। এডওয়ার্ড সাঈদ তার *দি কোয়েশ্চন অব প্যালেস্টাইন (The Question Of Palestine)* গ্রন্থে এই কলোনাইজেশনের তীব্রতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। তাতে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে ফিলিস্তিনে মোট জনসংখ্যা ছিল ১৯,১২,১১২ জন। এর মধ্যে শুধু ইহুদিই ছিল ৬,০৮,২২৫ জন।[৫৪] যেটি মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের অধিক।

মোটকথা, নাকবা বলতে যে ঘটনা ১৯৪৮ সালে ঘটেছিল তা এভাবে ধীরে ধীরে চূড়ান্ত অবস্থায় গিয়ে গভীর এবং ঘনীভূতভাবে বিস্ফোরিত হয়। নাকবার কারণগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ফিলিস্তিনের 'ন্যাটিভ' বা আদিবসতিদের ডিসপজেশন ভূমিস্বত্ব কেড়ে নেয়া) ও ডিপপুলেশনের (জনসংখ্যাহ্রসকরণ প্রক্রিয়া) মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে শেষ করে দেয়া কিংবা গুরুত্বহীণ অবস্থায় নিয়ে আসা। দ্বিতীয় কারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপনিবেশায়ন। উসমানি খেলাফতের পতন পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিনে শিক্ষার উপনিবেশায়ণকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করে, যাতে করে সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোতে উপনিবেশায়ণের গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। সমাজের অভিজাত থেকে শুরু করে দরিদ্র শ্রেণি পর্যন্ত কমবেশি এই প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এতে করে সাংস্কৃতিকভাবে পরিচয়ের মনোস্তাত্ত্বিক সংকট তৈরি

---

[৫৩]. নেলসন, ক্যারি এন্ড নোয়াহ, গ্যাব্রিয়েল, ব্রাহাম, (সম্পাদিত) *দি কনসাইজ হিস্ট্রি অব ইজরায়েল: দি কেইস অ্যাগেইন্স্ট অ্যাকাডেমিক বয়কটস অব ইজরায়েল* (শিকাগো-নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র: ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৫ ইং), পৃ. ৩৯০।

[৫৪]. সাঈদ, এডওয়ার্ড, *দি কোয়েসশন অব প্যালেস্টাইন* (নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র: টাইমস বুক, ১৯৮০ ইং), পৃ. ১১।

হয়। বিপরীত দিক থেকে আবার এই নাকবা থেকেই ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়ের গাঠনিক উপাদান সৃষ্টি হয়।[৫৫]

২.৩: নাকবা থেকে আত্মপরিচয়

ফিলিস্তিনীদের আত্মপরিচয় (National Identity) যে ঐতিহাসিক সংকটের মধ্যদিয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার সামগ্রিকতা ধরা যায় 'নাকবা' নামক শব্দবন্ধে। সুনির্দিষ্টভাবে যার অর্থ জাতীয় সংকট। নাকবার সাথে আত্মপরিচয়ের ঐতিহাসিক তৎপরতা কিংবা রাজনৈতিক সূচনার পূর্বশর্তমূলক সম্পর্ক রয়েছে। মাহমুদ দারভীশের কাব্যজীবনের শুরুবিন্দুও এই নাকবার কালপর্বে। যাতে ১৯৪৮ পরবর্তী ফিলিস্তিনের বেড়ে ওঠা আর দারভীশের কৈশোর পার হওয়া নবযৌবন একইসূত্রে গাথা।

ফিলিস্তিনের জনগণ এবং তাদের আত্মপরিচয়ের যে ভাষা তৈরি হয়েছে তাতে মাহমুদ দারভীশের গুরুত্বপূর্ণ অংশিদারিত্ব রয়েছে। আত্মপরিচয়ের ভাষা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের বাইরে গিয়ে আলোচনায় দারভীশের নাম আসবে নিঃসন্দেহে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির পরিসর কিংবা কবিতা ও নন্দনতত্ত্বের রাজনৈতিক আলোচনায় তার নাম আসা যেমন স্বাভাবিক তেমনি ১৯৪৮ পরবর্তী ফিলিস্তিনের জাতীয়বোধ পরিগঠনে যে রাজনৈতিক মানস তৈরি হয়েছে তাতেও ব্যক্তি হিসেবে দারভীশের নাম অনিবার্যভাবে যুক্ত হবে। যেখানে ফিলিস্তিনের জাতীয় আত্মপরিচয়ের ভাষা নির্মাণে দারভীশ তার কৈশোর থেকে শুরু করে গোটা জীবন ব্যয় করে গেছেন। ফিলিস্তিনের সামগ্রিক জাতীয় পরিস্থিতি এবং প্রায় সব জাতীয় ঘটনাবলীর সাথে দারভীশের জীবন ও কবিতা কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

নাকবা সংঘটিত হওয়ার আগে ফিলিস্তিনসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য আরব অঞ্চলের সমকালীন আরবী কবিতা তার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক-গঠন-প্রকৃতিতে কাছাকাছি সাদৃশ্যে বর্তমান ছিল। কবিতার ভাষারীতিও প্রায় একইরকম ছিল। মোটকথা আরবী কবিতার একটা পরিচিত প্যাটার্ন ছিল। কিন্তু নাকবা-পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য আরবী ভাষাভাষী প্রতিবেশী দেশের সাহিত্যে নতুন ধরনের পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মূলত নাকবার ফলে সরাসরি প্রথম প্রভাব তৈরি হয় ভাষা ও সাহিত্যে। এ পরিবর্তন অন্যদের মতো দারভীশের কবিতায়ও দারুণভাবে প্রভাব ফেলে।

লক্ষ করার বিষয় হলো, ভাষা-সাহিত্য, জীবন ও সংস্কৃতিতে নাকবার যেমন নেতিবাচক দিক আছে তেমনি আছে ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক, কারণ এই মহাদুর্যোগ খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের জীবনযাত্রা স্তব্ধ করে দিয়েছিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সবদিক থেকে। ইতিবাচক এ

---

[৫৫]. সাঈদ, এডওয়ার্ড, *অ্যারাবিক প্রোজ অ্যান্ড প্রোজ ফিকশন আফটার ১৯৪৮*, *রিফ্লেকশনস অন অ্যাক্সাইল: অ্যান্ড লিটারেরি অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসেস* (লন্ডন: গ্রানাটা
বুকস, ২০০০ ইং), পৃ. ৬৭।

কারণে যে, পরবর্তীতে এই দুর্যোগের গভীর আঘাত পুনরায় তাদের জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে। নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। এ ঘটনা হয়ে ওঠে তাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। হয়ে ওঠে ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক এক প্রধান নির্ধারক মুহূর্ত। এতে করে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার যে ইচ্ছা অব্যাহত ছিল তা পুনরুদ্ধারের জাতীয় মানস গড়ে ওঠে। এই আত্মানুভূতিই তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ফলে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয় গঠনের প্রবল ইচ্ছা তৈরি হয় তাদের মাঝে। পরিবর্তীকালে নাকবাকে কেন্দ্র করে তাদের নতুন রাজনৈতিক শ্রেণি গড়ে
ওঠে। বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক চর্চা বিকশিত হয়। গড়ে ওঠে নতুন সাহিত্যধারা। নাকবার নানা স্মৃতি নিয়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়। বিশেষত এই নাকবা বা দুর্যোগ তৎকালীন আরবী সাহিত্যের অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে।

২.৪: নাকবা-উত্তর সামাজিক পরিস্থিতি

নাকবা-উত্তর সামাজিক পরিস্থিতি বলতে ফিলিস্তিনীদের সামাজিক জীবনের সামগ্রিক অবস্থার চালচিত্র বুঝায়। ১৯৪৮-এ যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ছিল বেশ গভীর–ব্যাপক–বিস্তৃত। সাধারণ মানুষ নিজেদের হাজার বছরের বসতভিটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের পরস্পরের সম্পর্ক আকস্মিকভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্কগুলো এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যে, অনেকের জীবনেই স্বাভাবিক সেই সম্পর্ক ফিরে আসেনি। রাস্তাঘাট, পুল-কালভার্ট, ঘরবাড়ি, গ্রাম, শহর-বন্দর, হাট-বাজার থেকে শুরু করে প্রায় সবধরনের ভৌত অবকাঠামো ও যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়ায় অর্থনৈতিক অবস্থারও দ্রুত পতন ঘটে। ব্যবসায় বাণিজ্য থেকে শুরু করে সাধারণের জীবীকা উপার্জনের প্রায় সবধরনের স্বাভাবিক উপায় প্রক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে যায়।

মোটকথা, ১৯৪৮ এর যুদ্ধের মাধ্যমে ফিলিস্তিন দখল করে ইজরাইল নামে শুধু একটি রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হয়নি–তাতে করে ইজরাইল একটি দেশের সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক গতি-প্রকৃতিও ধ্বংস করে দেয়। এ যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে ফিলিস্তিনীরা তাদের দেশের প্রধান যে অংশে বসবাস করতো তা ছিল মোটামুটি পুরো দেশটির ৮০ শতাংশেরও বেশি।[৫৬] কিন্তু ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে তারা ৭৭ শতাংশই দখল করে নেয়। এর মধ্যে নিজেদের ভূমিতেই অনেকে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। আবার অনেকে দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয় নেয়। এতে করে তাদের ভাগ্য নির্ভর হয়ে পড়ে সেসব দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আমলাশ্রেণি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের উপর। অপরদিকে ফিলিস্তিনের স্থানীয় আদি আরবরা সংখ্যাগুরু থেকে সংখ্যালঘুতে

[৫৬]. মাসালহা, নূর, *এক্সপালশন অফ দি প্যালেস্টাইনিয়ানস: দি কনসেপ্ট অফ ট্রান্সফার ইন জায়োনিস্ট পলিটিক্যাল থট ১৮৮২-১৯৪৮* (ওয়াশিংটন ডি.সি: দি ইনস্টিটিউট ফর প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৭৫ ।

পরিণত হয়। যাদের সংখ্যা পুরো ভূখণ্ড মিলিয়ে ৬০,০০০ থেকে ১,৬৫,০০০ পর্যন্ত ছিল।[৫৭] এদের প্রতিদিনের জীবন প্রক্রিয়া এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড নয়া প্রতিষ্ঠিত দখলদার ইজরাইল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর হয়ে পড়ে। পশ্চিম তীরে যেসব ফিলিস্তিনীর বসবাস ছিল তারা ফিলিস্তিনের অন্যসব অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একইসাথে তাদের অবস্থা হয়ে পড়ে উদ্বাস্তুদের মতো। সবদিক থেকে সামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থার অধীনে চলে যায় তাদের সার্বিক গতি প্রকৃতি। এ সময় এক পর্যায়ে তারা জর্ডানের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। এবং যারা গাজা উপত্যকায় থাকতো তারা মিশরীয় প্রশাসনের অধীনে চলে যায়। ১৯৬৭-তে তৃতীয় আরব ইজরাইল যুদ্ধে জর্ডান এবং মিশরের অধীন থেকে এই দুটি অংশ পুনরায় দখল করে নেয় ইজরাইল।[৫৮] এ পরিস্থিতিতে ভূমি দখল করে নেয়ার ফলে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। আপনজনের মধ্যে শত শত বছর ধরে লালিত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।[৫৯] যারা কোথাও একসাথে বসবাস করছিল দেখা যায়, তাদের মধ্যে কারো বাবা নেই, কারো মা নেই, কারো ভাই নেই, বোন নেই; আবার কারো কোনো আপনজনই নেই, প্রতিবেশী নেই। কোথাও বিধ্বস্ত বসতবাড়ি বিরান হয়ে আছে। অনেক জায়গায় লাশের গন্ধ। প্রায় ৭০টি বড় ধরনের গণহত্যা সংঘটিত হয়। বনি মরিস এবং ইউসুফে ৮০০ এর অধিক বেসামরিক ফিলিস্তিনীকে হত্যা করা হয়। নূর মাসালহা সবচেয়ে ভয়াবহ ১০টি গণহত্যার কথা জানিয়েছেন।[৬০] এছাড়া ফিলিস্তিন বিষয়ক ইতিহাস বিশ্লেষক বেনি মরিস এসব গণহত্যা নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। হাইফা অয়েল রিফাইনারি ম্যাসাকার, কাফর ইতজিওন ম্যাসাকার, কাফার কাসেম, কাফার আনা, হাদাসসাহ মেডিক্যাল কনভয় ম্যাসাকার, দীর ইয়াসিন ম্যাসাকার, সালিহা ম্যাসাকার, লিদ্দা ম্যাসাকার, আবু শুশা ম্যাসাকার এবং আল দাওয়াইমাহ ম্যাসাকার ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ।[৬১] এভাবে অসংখ্য ফিলিস্তিনীদের হত্যার মধ্যদিয়ে খুব অল্প সময়ে একটি দেশ এবং তার জনগণ মানচিত্রবিহীন হয়ে পড়ে।

ফিলিস্তিনী লেখক ও ইতিহাস বিশ্লেষক ইলিয়াস সানবার ১৯৪৮ সনে সংঘটিত নাকবা পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ‘১৯৪৮’ ফিলিস্তিনের সমসাম্প্রতিক ইতিহাসে একটি কী ডেট বা নির্ধারক তারিখে মোড় নেয়; ১৯৪৮, যে বছরে একটি দেশ এবং তাদের জনগণ মানচিত্র এবং অভিধান থেকে

---

[৫৭]. *প্যালেস্টাইন অ্যান্ড প্যালেস্টাইনিয়ানস (১৯৪৮-৬৭): দি পার্টিশন অফ প্যালেস্টাইন অ্যান্ড ইটস আফটারম্যাথ (ব্রিট্যানিকা, এনসাইক্লোপেডিয়া: যুক্তরাজ্য, অনলাইন সংস্করণ, ২০২২), ভিজিট: এপ্রিল ৩০, ২০১৮।* *https://www.britannica.com/place/Palestine/Palestine-and-the-Palestinians-1948-67*

[৫৮]. আল তাহান, জেনা, *দি নাকসা: হাউ ইজরাইল ওকুপাইড দ্য হোল অফ প্যালেস্টাইন ইন ১৯৬৭* (দোহা, কাতার: আল জাজিরা মিডিয়া নেটওয়ার্ক, ২০২২ ইং) ভিজিট: ৪ এপ্রিল, ২০১৮। https://www.aljazeera.com/features/2018/6/4/the-naksa-how-israel-occupied-the-whole-of-palestine-in-1967

[৫৯]. সাঈদ, এডওয়ার্ড ডব্লিউ, *আফটারওয়ার্ড: দি কন্সিকোয়েন্সিস অফ ১৯৪৮*—ইউজেন এল. রোগান এবং আভি শ্লাইম সম্পাদিত *দি ওয়ার ফর: রিরাইটিং দ্য হিস্ট্রি অফ ১৯৪৮* (নিউ ইয়র্ক: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭ ইং), পৃ. ২৪৮-২৫২।

[৬০]. মাসালাহা, নূর, *সিক্সটি ইয়ার আফটার দ্য নাকবা: হিস্ট্রিক্যাল ট্রুথ, কালেক্টিভ মেমোরি অ্যান্ড দি ইথিক্যাল অবলিগ্যাশনস* (জাপান: *কিওটো বুলেটিন অফ ইসলামিক এরিয়া স্টাডিজ, সংখ্যা: ৩-১, জুলাই ২০০৯*), পৃ. ৩৭-৮৮।

[৬১]. মরিস, বেনি, *দি বার্থ অফ দি প্যালেস্টাইনিয়ান রিফিউজি প্রবলেম রিভিজিটেড* (নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৪ ইং), পৃ. ২৮০-৪৯০।

অদৃশ্য হয়ে যায়। ফিলিস্তিনী জনগণের অস্তিত্ব আর নেই।[৬২] সানবার মনে করেন, আধুনিক রাষ্ট্র বলতে যা বুঝায় সে অর্থে উপনিবেশোত্তর সময়ে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব না থাকলেও ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিন একটি দেশ এবং একটি রাষ্ট্র ছিল। ফলে ইতিহাসের ধারায় জনগণ মাত্রই রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত একটি মৌলিক ধারণা। যেকারণে একটি সীমান্তের মধ্যে কিছু আরব ফিলিস্তিনী বসবাস করলেও তাকে আর সে অর্থে জনগণ অস্তিত্বমান আছে এটা বলা যায় না। কারণ রাষ্ট্র না থাকায় কিংবা দেশ না থাকায় তার জনগণ থেকেও নাই হয়ে যায়। এমন প্যারাডক্সিক্যাল পরিস্থিতির যে জন্ম হয়েছে ফিলিস্তিনে তার তুলনা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর সাথেও মিলে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঘটে যাওয়া ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি, কিংবা পৃথিবীর ভয়াবহতম জাতিগত নাৎসি গণহত্যা, এমনকি দীর্ঘ আট বছর ধরে চলা আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতিবাচক ফলাফলের সাথেও এর দৃষ্টান্ত মেলানো কঠিন। কারণ নাকবার সময়কাল সামান্য হলেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যেহেতু নাকবা এমন একটি ঘটনা, যা শুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হয়নি। ফিলিস্তিনীদের জীবনে প্রতিমুহূর্তেই কোনো না কোনোভাবে নাকবা ঘটে যাচ্ছে। ফলে ইজরাইলী দখলদারিত্বের মধ্যদিয়েই যেহেতু ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অবসান হয়নি ফলে এর ক্ষান্তিও আশু ঘটে যাবে এমন সম্ভাবনা দূর পরাহত।

২.৫: নাকবা: একটি চিন্তা ও ইতিহাস

১৯৪৮ পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যেই একটি রাজনৈতিক শ্রেণি গড়ে ওঠে। এই সময়ে যখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশগুলো ভেঙ্গে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে তখন ফিলিস্তিন একটি ভয়াবহতম বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে যায়। আন্তর্জাতিকভাবে উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর মূল ছিল জাতীয়তাবাদ। বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে এমন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তুঙ্গ অবস্থার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেও ব্রিটিশ এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে আরবদের উত্থান ঘটে। আরব জাগরণও ঐতিহাসিকভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। পশ্চিমা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ছিল রাশিয়া এবং সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শে প্রভাবিত আরব জাতীয়তাবাদের মৌলিক অবস্থান। আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে পরে প্যান-অ্যারাবিজমের সূচনা হয়। এর মধ্যে তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধের আগ মুহূর্তে ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদের উত্থান সামনে আসে। ১৯৬৪ সনে পিএলও (Palestine Liberation Organisation) প্রতিষ্ঠিত হয়। নাকবার পরে এটি ছিল ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে বড়ধরনের রাজনৈতিক ঘটনা।

মূলত আরব জাতীয়তাবাদের প্রভাব এতোটা স্বাভাবিক ছিল যে, স্থানীয়ভাবে ফিলিস্তিনীরা নিজেদের আরব বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। ইজরাইলের দখলের পরে ইহুদীদের বিপরীতে ফিলিস্তিনীদের *আরব* হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়াটাও ছিল এই প্রভাবের বড় উদাহরণ। ফিলিস্তিনী বলার চেয়ে

---

[৬২]. এস সা'দী, আহমদ ও লুঘদ, আবু লায়লা সম্পাদিত, *নাকবা: প্যালেস্টাইন, ১৯৪৮, অ্যান্ড দি ক্লেইমস অফ মেমোরি* (কলম্বিয়া: যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭ ইং), পৃ. ৪।

আরব বলার মধ্যে গর্বোচ্চারণ ছিল বেশ প্রকট। ভাষাগত ঐক্যের কারণে ফিলিস্তিনীদের অন্যান্য আরবদেশের সাথে নিজেদের আরব পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক রাজনীতির পটভূমি কাজ করেছে বটে। কিন্তু শেষপর্যন্ত পুরো বিষয়টি ছিল ফিলিস্তিনকেন্দ্রিক। তারপরও কয়েকটি আরবদেশ ফিলিস্তিন ইস্যুতে এক হওয়াতে ইতিহাসও এমন করে লিখিত হয়েছে *আরব-ইজরাইল* যুদ্ধ নামে। যুদ্ধ এবং প্রতিরোধ মাত্রই তখনো আরব বনাম ইজরাইল হিসেবে দেখানো হতো। ফিলিস্তিন বনাম ইজরাইল—এভাবে দেখা কিংবা লেখা হয়নি। কারণ ফিলিস্তিন ছিল আরব লীগভুক্ত আরব দেশগুলোর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণে। ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার পর বস্তুত *ফিলিস্তিন* নামে স্বাধীন কোনো সত্তা তৈরি না হওয়ার পরিবর্তে বরং ফিলিস্তিন আরব জাতীয়তাবাদ আর প্যান-আরবের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল। নাকবার আগ পর্যন্ত ব্রিটিশ ও জায়োনিস্ট উপনিবেশের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল তা ছিল মূলত ফিলিস্তিনীদের তৈরি করা লড়াই। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আরব লীগের প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনে আরব জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রভাব ও কার্যক্রম প্রবল হয়ে ওঠলে তাতে ফিলিস্তিনীদের নিজস্ব রাজনৈতিক তৎপরতা লীন হয়ে যায়। প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধে আরব লীগ কিংবা আরব নেতৃত্ব ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে এ ব্যর্থতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কিন্তু এই পরাজয় ও ব্যর্থতার তাৎক্ষণিক এবং চূড়ান্তভাবে স্থায়ী শিকার হয় ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের জনগণ।

নাকবার ফলে ফিলিস্তিনীদের জীবনে যে বিপর্যয় ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত ও আঘাত (Trauma) সৃষ্টি হয় তা থেকে তারা পরিত্রাণের উপায় নিয়ে ভাবতে থাকে। নাকবার ভয়াবহ স্মৃতি—যেটি ছিল একটি জাতির সামগ্রিক স্মৃতি (Collective Memory), এ স্মৃতি এবং তা নিয়ে ভাবনা তাদের অন্যকোনো চিন্তার দোরগোড়ায় নিয়ে যায়। আরব নেতৃত্বের ব্যর্থতা তাদের ভাবিয়ে তোলে। ১৯৫৬ সনে সংঘটিত দ্বিতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধে মিশরের রাজনৈতিক বিজয় ফিলিস্তিনী স্বার্থে কোনো প্রভাব ফেলেনি। প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর বিশ্বাসঘাতকতা ফিলিস্তিনীদের জাতীয় উপলব্ধিতে রূপ নেয়। এর প্রত্যক্ষ ফলাফল দেখা যায় ১৯৬৪ সনে। ফিলিস্তিনের যে শ্রেণিটি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিল এবং আরব লীগের স্থানীয় প্রতিনিধিত্বের ভূমিকায় ছিল তারা আরব লীগকে চাপ দিতে থাকলে ১৯৬৪'র ২৮ মে জেরুজালেমে আরব লীগের নেতৃত্বে পিএলও প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে পিএলও'র আহবায়ক সংস্থা ছিল দলটির সাংবিধানিক এবং আইন পরিষদ পিএনসি (Palestine National Council) ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদ এবং মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারকে ঘিরে তৈরি হয় পিএলও'র মতাদর্শ ও মৌলিক অবস্থান। তবে পিএলও'র ফাতাহ ছিল পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের। তাছাড়া পিএফএলপিসহ (পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন) অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশই ছিল মার্ক্সবাদী কিংবা বামপন্থী।[৬৩] পিএলও'র প্রতিষ্ঠা একইসাথে জায়োনিস্ট ইজরাইলের বিরুদ্ধে যেমন সত্য, তেমনি গাজা উপত্যকায় মিশরের নিয়ন্ত্রণ এবং পশ্চিম তীরে জর্ডানের নিয়ন্ত্রণের

---

[৬৩]. বেকার, জিল্লিয়ান, *দি পিএলও: দি রাইজ এন্ড ফল অফ দি প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন* (নিউইয়র্ক: সেন্ট মার্টিন'স প্রেস, ১৯৮৪ ইং), পৃ. ৭০।

বিরুদ্ধেও ছিল। তবে পিএলও'র প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ইজরাইলের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনীদের স্বনিয়ন্ত্রিত এবং সংগঠিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

১৯৬৭ সনে সংঘটিত হয় তৃতীয় আরব ইজরাইল যুদ্ধ। ৬ দিনের এ যুদ্ধকে বলা হয় দ্বিতীয় নাকবা। এর অন্য নাম *নাকসা*। এ ঘটনায় ফিলিস্তিন তার বিপুল পরিমাণ সীমানা হারিয়ে ফেলে। এ যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনী স্বার্থ সম্পর্কে আরব নেতৃত্বের অবস্থান ও ভূমিকার পুনর্বিবেচনা ও পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হয়। বিশেষত তরুণ শ্রেণির মধ্যে এ মনোভাব তৈরি হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত সময়ে মানসিক অস্থিরতা চলতে থাকে ফিলিস্তিনের তরুণ ও যুব সমাজের অভ্যন্তরে। প্রকাশ্য রাজনৈতিক সক্রিয়তার আগে আড়ালে অনেক কিছু ঘটে যায় ফিলিস্তিনী সমাজের বিবিধ ক্ষেত্র ও স্তরে। পিএলও'র আত্মপ্রকাশের আগ পর্যন্ত একটা কালপর্ব হিসেবে ধরে নেয়া যায়। যে সময়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ১৯৪৮'র যুদ্ধের ঘটনায় যারা ফিলিস্তিনে রয়ে যায় তারা সামাজিকভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারেনি। অনেক পরিবারই ইজরাইলী সেনাদের টহল এবং নিপীড়নের ভয়ে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে দীর্ঘদিন। এর ফলে তারা যেমন বাস্তবিক পক্ষে স্থির হতে পারেনি তেমনি মানসিকতার দিক থেকেও প্রবলভাবে অস্থির ছিল। এ অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। কিছুটা স্বাভাবিক হতে সময় লাগে। এ সময় যে তরুণ প্রজন্ম বেড়ে ওঠে তাদের অনেকের মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা। জন্ম নেয় আস্থা ও বিশ্বাসের সংকট। চিন্তার দিক থেকে তারা প্রচণ্ডরকম বিশৃঙ্খল ছিল। এমন কোনো বিশেষ শ্রেণি দেখা যায়নি যাদের মধ্যে বেশ সংগঠিতভাবে চিন্তাভাবনা করতে দেখা যায়। আরবদের পরাজয় এবং নাকবা সম্পর্কিত এমন কোনো বিশেষ মূল্যায়ন কিংবা পর্যালোচনা করতেও দেখা যায়নি। সবাই ছিল বেশ বিক্ষিপ্ত। একটি বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির ছিল চরম সংকট। তরুণদের মধ্যে যারা জাতীয় বিষয়-আশয় নিয়ে ভাবতো তাদের অবস্থা ছিল আরো বিচ্ছিন্ন। জাতীয় অবস্থার চালচিত্র নিয়ে ভাবতে বেশি দেখা যায় যে তরুণ শ্রেণিকে, তাদের কোনো এক পক্ষকে দেখা যায় আরব নেতৃত্বের প্রতি চরম বিরাগ ও ক্ষোভ। আরেক পক্ষকে দেখা যায়, এক পক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে আরবদের পক্ষ নিচ্ছে। পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠতো যে, মাঝেমধ্যে তারা আরবদের পক্ষ-বিপক্ষের বিবাদে গিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলে পড়তো। কিন্তু তাদের মাঝে দেখা যায়নি ফিলিস্তিনের সাধারণ শত্রু চিহ্নিত করার কোনো ভেদবুদ্ধি কিংবা সাধারণ জ্ঞান। যে শত্রুর কারণে তাদের মাঝে সংঘটিত হয়েছে নাকবা কিংবা মহাবিপর্যয়। সৃষ্টি হয়েছে এক মহা-অনিশ্চিয়তার কাল। এমন কোনো চিন্তা ও রাজনৈতিকতার জ্ঞান ও ধারণা পরিলক্ষিত হয়নি যাতে শত্রুর বুদ্ধিমত্তা, শত্রুর সক্রিয়তা, গতি-প্রকৃতি, আয়োজন-প্রস্তুতি, নীতি-পরিকল্পনা, বিপদ-ঝুঁকি মোটকথা শত্রুসম্পর্কিত কোনো আলোচনা পর্যালোচনাই তৈরি হয়নি এই তরুণ শ্রেণির মধ্যে। সাধারণ শত্রু চিহ্নিতকরণে কোনো চিন্তা নেই উদ্বেগ নেই। যেহেতু শত্রুচিন্তার ভিতর দিয়েই মূলত একটি দেশের জাতীয় মনোভাব ও পরিগঠন ত্বরান্বিত হয়। নাকবার অবব্যহিত পরের পরিস্থিতিতে উদিয়মান তরুণ ও যুবসমাজের মাঝে চিন্তাচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তির এমনি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করেন কনস্টেনটিন জুরাইক (১৯০৯-২০০০)। ফিলিস্তিনের সাধারণ শত্রুর স্বরূপ চিহ্নিতকরণের মধ্যদিয়ে জাতীয় গণআকাঙ্ক্ষা নির্মাণের বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষ্য তৈরিতে জুরাইক রীতিমতো পথিকৃত হিসেবে সর্বজন

সমাদৃত। নাকবার সত্যিকারের মর্মার্থ তুলে ধরেছিলেন জুরাইক তার *মা'না আল-নাকবাহ* (معني النكبة) নামক ছোট্ট গ্রন্থে।[৬৪] ১৯৪৮-এ যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র দুই মাস পর বইটি প্রকাশ হয়। যুদ্ধ চলাকালেই প্রকাশিত মাত্র ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠার এই বইয়ে শুধু নাকবা নয়—বরং ফিলিস্তিনের সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি ফিলিস্তিনের সমকালীন পরিস্থিতির পটভূমিতে চিন্তাগত তৎপরতার দিকনির্দেশক পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন তিনি। জুরাইকের আগে ফিলিস্তিনের জাতীয় প্রশ্নে এমন আকর গ্রন্থ রচিত হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সনে *মা'না আল-নাকবাহ মুজাদ্দিদান* (معني النكبة مجددا) নামে বইটির বর্ধিত সংস্করণ বের হয়। *মা'না আল-নাকবাহ*'র প্রকাশের মাধ্যমে মূলত নাকবা বিষয়ক ধারণা ফিলিস্তিনের সমাজে কিভাবে পরিগঠিত হচ্ছে এবং একইসাথে নাকবাকে কেন্দ্র করে তরুণরা কিভাবে চিন্তা করছে, তাদের চিন্তাগত সক্রিয়তার অবস্থা ও গতি-প্রকৃতি জনপরিসরে কিভাবে সঞ্চারিত হয় জুরাইক তা খুব সুনির্দিষ্টভাবে সারনির্যাস আকারে হাজির করেন।

ধরে নেয়া হয়, ১৯৪৮ সনে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলই নাকবা। তবে জুরাইকের বয়ানের মাধ্যমে অনুমান করা যায়, মূলত নাকবা আরো গভীর ও আরো পুরনো। ব্রিটিশ শাসনামলে জায়োনিস্টদের উপনিবেশায়ণ প্রক্রিয়া ও ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সক্রিয়তাই ছিল ফিলিস্তিনীদের জন্য অনানুষ্ঠানিক এবং পূর্ব থেকে চলমান বিমূর্ত নাকবা। ১৯৪৮ ছিল মূলত নাকবা সংঘটনের চূড়ান্ত মুহূর্ত। এ ঘটনায় ফিলিস্তিনে আরবদের পরাজয় শুধু প্রকাশ্যই ছিল না, বিমূর্তভাবেও ঘটে গেছে আরবদের পতন। জুরাইক বিমূর্ত পতন বলতে বুদ্ধিবৃত্তিক পতন বুঝিয়েছেন। সমাজের অগ্রজদের বাইরে সম্ভাবনাময় হিসেবে তরুণদের তিনি চিহ্নিত করেন। চিন্তাগতভাবে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা তিনি দেখেছেন তাদের মধ্যে জুরাইক এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত পরিগঠনের চিন্তা ও বয়ান গড়ে তোলার সম্ভাব্য সত্তা নিহিত আছে বলে উপলব্ধি করেন। কারণ বিশৃঙ্খলাগুলো সচেতন ও অগ্রসর তরুণদের মধ্যেই তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাদের মধ্যে তিনি কখনো দেখেছেন রাজনৈতিক হয়ে ওঠার শক্তি ও পার্টি গঠনের চেষ্টা। আবার দেখেছেন তাদের মাঝে বিপুল প্রশ্ন পরম্পরকে নানানভাবে তৎপর করে তুলছে। নানান রকম চিন্তা ও পঠন-পাঠন তাদেরকে অস্থির করে রাখে। তারা প্রশ্ন করে তাদের ব্যর্থতা নিয়ে, নেতৃত্ব নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, তাদের কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে। তারা অতীত থেকে চিন্তার খোরাক খুঁজে পায়। কিন্তু তারা নাকবা নিয়ে যে পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করে তাতে তারা বস্তুত নাকবার মূলে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। ইতিবাচক কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে কোনো পথ-পদ্ধতিও নির্ধারণ করতে পারে না। দিনশেষে তারা একই জায়গায়, একই ধারণায় আটকে থেকে ঘুরপাক খায়। কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন, এরকম দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার মধ্যেই তরুণরা সংগঠিত হচ্ছে। যারা নতুন করে ভাবছে। তারা আবার এক হচ্ছে। এ অবস্থাই তাদেরকে একটি কার্যকর নতুন চিন্তা ও রাজনীতির দিকে নিয়ে যাবে হয়তো। যারা ফিলিস্তিন এবং তার ভবিষ্যতের জন্য নতুন কোনো ভাবনা নিয়ে কাজ করে যাবে। জুরাইক দেখলেন, নাকবার আঘাতকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এটাই হলো ফিলিস্তিনে ঘটে যাওয়া প্রথম চিন্তা ও সক্রিয়তার নতুন সূত্রপাত।

---

[৬৪]. জুরাইক, কনস্ট্যান্টিন, *মা'না আল নাকবাহ*, ১৯৪৮, পৃ. ৯-৫৩।

أن المتتبع لتاريخ الامم وتطور الحضارات ليلاحظ ان نشوءها و تقدمها منوطان بما يكتنفها من صعاب و شدائد. وليس صحيحا ما يقوله البعض ان الحضرات ظهرت أولا في خصبة الأرض، سهلة الموارد, جيدة المناخ. فاليسر والسهولة لم يكونا يوما من الأيام سبيلا الي النمو والتقدم. وانما نشأت الحضارات و نمت عندما جابهتها في محيطها الطبيعي او البشري مصاعب و مشاكل دعتها الي جهة الفكر وبذل النفس للتغليب عليها. فكان في هذا البذل و الجهد مسبب تقدمها و سبيل خلاصها.

وحال الامم في هذا حال الافراد. وكلنا يعلم أن الفتي الذي ييسر له أبواه جميع أسباب التعلم و العمل، لا يصيب ما يصيبه الفتي المعوز المضطر من كسب و نجاح. ولهذا نرا الأسر في الأغلب أجيالا: جيلا يبني و يجمع بالجد والنصب، ثم يأتي من يتمتع ويتنعم، ثم من يبذر فيضيع.

فالمصائب والشدائد-حتي النكبات- حافز اذن للافراد والجماعات، وعلة من علل تنبهها ونهضتها. ولكنها ليست كذالك في جميع الاحوال. ففي بعضها تكون سببا للتهدم والانهيار، والتبدد والزوال.[৬৫]

যারা জাতির ইতিহাস এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশ অনুসরণ করেন তারা খেয়াল করে দেখতে পাবেন, সেসব জাতির উত্থান এবং অগ্রগতি এমনসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যা তাদের জটিল-কঠিন এবং কষ্টকর শ্রম-সংগ্রাম দিয়ে ঘিরে আছে। যারা বলে আদিতে উর্বর ভূমি, সম্পদের সহজলভ্যতা, ভালো আবহাওয়ার কারণে সভ্যতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তাদের এই বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ উন্নয়ন-অগ্রগতির সুগম হওয়ার ও সহজলভ্যতার ধারা একদিনে গড়ে উঠেনি। বরং সভ্যতার উত্থান ও অগ্রগতি ঘটেছে তখনই যখন সভ্যতাগুলো তার প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য পারিপার্শ্বিকতা-প্রতিবেশের মধ্যে সমূহ কঠিন পরিস্থিতি, সংকট-বিপদ-আপদের মুখোমুখী হয়েছিল– যা তাদেরকে চিন্তা-ভাবনার প্রক্রিয়ায় ব্রত হতে এবং সেসব কঠিন প্রতিবন্ধকতা ও সংকটময় অবস্থা জয় করতে আত্মত্যাগে প্ররোচিত করেছিল। এই আত্মত্যাগ এবং কঠিন লড়াই-সংগ্রামের মধ্যেই রয়েছে অগ্রগতির কারণ এবং মুক্তির পথ।

---

৬৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৭।

এখানে জাতির অবস্থাই ব্যক্তির অবস্থা। আমরা সবাই জানি, বাবা-মাই তার যুব সন্তানের শিক্ষা এবং কর্মের যাবতীয় উপায় উপকরণের সুবিধা নিশ্চিত করেন। কিন্তু একজন দরিদ্র তরুণ যাকে নিরূপায় হয়ে কাজ করতে হয় সে তার আয়-উপার্জন ও সফলতায় যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয় ওই তরুণকে সেরকম কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। যেকারণে অধিকাংশক্ষেত্রে প্রজন্ম আকারে পরিবারগুলোকে দেখি: একটি প্রজন্ম অসামান্য এবং আন্তরিক শ্রম-চেষ্টায় গড়ে তোলে এবং সংগঠিত করে। পরবর্তী প্রজন্ম এসে তা ভোগ করে। এরপরের প্রজন্ম অপচয় করে এবং নষ্ট করে ফেলে।

ফলে নাকবাসহ এই কঠিন সংকট এবং জটিলতাগুলোই ব্যক্তি ও সমষ্টির সাফল্যের চাবি হয়ে ওঠে। কারণ হয়ে ওঠে তাদের চৈতন্য, জাগরণ ও উত্থানের। তবে সবক্ষেত্রে এমনটি নাও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ধ্বংস-অবনতি এবং স্বেচ্ছাচার ও পতনের কারণ হয়ে ওঠে।

তরুণদের সক্রিয় তৎপরতায় দেখা গেল, নাকবা থেকে একটি জাতীয় গণআকাঙ্ক্ষা এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয় কিভাবে তৈরি হতে পারে তার কর্মযজ্ঞ। নাকবার ফলে একটি জনগোষ্ঠী কিভাবে জেগে উঠছে এবং ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছে তার জাতীয় ভাষ্য তৈরি করছে ফিলিস্তিনের যুবক ও তরুণ সমাজ। যেখানে তরুণরা নাকবা কিংবা জায়োনিস্টদের দখলদারিত্বের ফলে সৃষ্ট সংকটের ব্যাখ্যা করছেন যাতে তারা ফিলিস্তিনের জাতি গঠনের উপাদান ও ইস্যুগুলো নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছেন। সংকটের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বাইরে গিয়ে তারা বাস্তব ঘটনা ও শত্রুপক্ষের নীতির মাঝে সম্পর্কের সূত্রায়ণও করছেন। মোটকথা নাকবাকেন্দ্রিক কিংবা খোদ নাকবাই ক্রমাগত একটি চিন্তা, ধারণা কিংবা একটি অপরিহার্য শর্ত হয়ে ওঠে ফিলিস্তিনের জাতীয় রাজনীতিতে। নাকবাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ডিসকোর্স কিংবা বয়ানই মূলত ফিলিস্তিনের ভবিষ্যত জাতীয় রাজনীতির সর্বজনীন নির্ধারক ইস্যুতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ফিলিস্তিনে উদ্ভব হওয়া উদারনৈতিক রাজনীতির (Liberal Politics) ধারা থেকে শুরু করে ইসলাম ও বামপন্থী সবধরনের রাজনৈতিক শ্রেণির কাছে নাকবা জাতীয় চৈতন্যের একটি অবিসংবাদিত গাঠনিক ভিত্তি হিসেবে পরিণত হয়। যেখানে বর্তমান ফিলিস্তিনে ইসলামপন্থী রাজনীতির প্রবল উপস্থিতি যে প্রক্রিয়ায় কার্যকর রয়েছে তাতেও নাকবার মর্মার্থ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

ফলে দেখা যায়, ফিলিস্তিনী জাতিয়তাভিত্তিক নাকবার তাৎপর্য এবং তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা ডিসকোর্স ক্রমবিকশিত হয়েছে। নাকবার কারণে যে খাদ বা মহাগহবর তৈরি হয়েছে তার ভিতর থেকে গড়ে উঠেছে এমন একটি ভাষা যা ফিলিস্তিন জাতির জন্য একটি সর্বজনীন বয়ান তৈরির পরিস্থিতি তৈরি করে। অর্থাৎ নাকবাকে কেন্দ্রে রেখে আরব জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব, ইতিহাসবিদ, রাজনীতিক, চিন্তক, বুদ্ধিজীবী ও বাস্তবে তৎপর অ্যাক্টিভিস্টদের তরফে গড়ে ওঠা নানারকম মতামত ও তর্ক-বিতর্ক ও

চিন্তা-ভাবনার সূত্রায়ণ সংগঠিত করা জরুরি হয়ে পড়ে। বিশেষ করে, ৪৮'র আগের বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাস বিশ্লেষকদের দিক থেকে এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক সময়। যেখানে তারা নাকবাকে একটি ডিককোর্স হিসেবে রূপ দিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

২.৬: নাকবার বিবিধ ভাষ্য, জাতীয় চিন্তা ও সাহিত্য

ব্রিটিশ উপনিবেশ শুরু হওয়ার সাথে সাথে আরব দুনিয়ায় যে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন শুরু হয় তা একইসাথে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও। এই সময়ে অনেক চিন্তাশীল, রাজনীতি বিশ্লেষক ও তাত্ত্বিকদের সক্রিয়তা ছিল লক্ষণীয়। প্রথমত তারা নাকবার একটি তাত্ত্বিক রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। তাদের অধিকাংশ ছিল পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা। পশ্চিমের আধুনিকতা ও উদারনৈতিক ধারায় যেমন প্রভাবিত ছিলেন তেমনি তারা কোনো না কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন মার্ক্সবাদী ধারায়। এরকম একটি অবস্থায় থেকে তারা নাকবার তাত্ত্বিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন, যাতে নাকবা একটি পরিষ্কার উদারতাবাদী ধারায় উপস্থিত হয়। নাকবার ভাষা যে উদারতাবাদ থেকে তৈরি হয়েছে তা শুধু পশ্চিম ও ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ড থেকে জন্ম হয়নি বরং মার্ক্সবাদী উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী ধারা থেকেও এর বিস্তর ভাষ্য তৈরি হয়েছে। পরবর্তীকালে পলিটিক্যাল ইসলামের ধারাগুলো থেকেও নাকবার বিবিধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। একইসাথে রয়েছে গণতান্ত্রিক ও আধুনিক সেক্যুলার মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু চূড়ান্তপক্ষে সবারই লক্ষ্য এবং উপলক্ষ হয়ে উঠেছিল ফিলিস্তিনের জাতীয় পরিচয় ও গণ-আকাঙ্ক্ষার তাত্ত্বিক বয়ানে নাকবাকে একটি মূলপাটাতন হিসেবে নির্ধারণ করা। তাতে সবার দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে উঠেছিল মাত্র।

এছড়া ঠিক কোন অর্থে নাকবাকে দেখা যায়? বিপর্যয়, দুর্যোগ, গণজিঘাংসা, গণহত্যা, জাতিগত নিধন কিংবা জাতিগত নির্মূলকরণ অর্থে? এধরনের বিতর্কও রয়েছে। যেকারণে হলোকাস্ট () অর্থে নাকবার প্রয়োগ ও ব্যাখ্যারও কমবেশি বিস্তার রয়েছে। হলোকাস্ট এর প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা এসেছে জার্মানির নাৎসী বাহিনী কর্তৃক ইহুদী নিধনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঐতিহাসিকভাবে ধারণা করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জার্মানির অ্যাডলফ হিটলার এর নাৎসী বাহিনী ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করে।[৬৬] ইহুদী নিধনের এই ঘটনা ও বিশ্লেষণে 'হলোকাস্ট' শব্দটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাডেমিক পরিসরে এর বহুবিধ সংজ্ঞা, অর্থ ও ব্যাখ্যা সৃষ্টি হয়। ফলে একসময় এটি একটি গ্রহণযোগ্য ক্যাটাগরি হয়ে ওঠে। কিন্তু এর সাথে তুলনা করে নাকবাকে সংজ্ঞায়িত করা কিংবা নাকবাকে খোদ হলোকাস্ট হিসেবে আখ্যায়িত করার যৌক্তিকতা নিয়েও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। লেবাননের কথাসাহিত্যিক, ইতিহাস বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবী ইলিয়াস খুরি মনে করেন, হলোকাস্টের অন্তরালে রয়েছে ইউরোপের বর্ণবাদী মতাদর্শ। এর সাথে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার শেকড়। এমনকি এর সাথে জড়িয়ে আছে

[৬৬]. ফিশেল, জ্যাক আর., *হিস্ট্রিক্যাল ডিকশনারি অফ দি হলোকাস্ট* (টরন্টো: দি স্কারেকরো প্রেস, ২০১০ ইং), পৃ. ১১৫।

ইউরোপজুড়ে গড়ে ওঠা ইহুদীবিরোধী এন্টিসেমিটিজমের ধারণাও। আন্দালুসিয়ান মুসলিম স্পেনে মুসলিম নিধন ও উচ্ছেদের ঘটনা (যেটাকে Reconquista বলা হয়) পরবর্তী ক্রুসেডের ঐতিহাসিক নথিপত্রে হয়ত ইউরোপের ইহুদী বিদ্বেষের কিংবা এন্টিসেমিটিজমের কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে অবশ্যই ইউরোপে নাৎসীবাদের বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিকভাবে ইহুদিবিদ্বেষী এন্টিসেমিটিজমের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। এসব কারণে জার্মানিতে ঘটে যাওয়া কিংবা ইউরোপজুড়ে এন্টিসেমিটিজমের নামে ইহুদীনিধন বা হলোকাস্টের সাথে নাকবার তুলনা পুরোপুরি করা যায়না। এছাড়া নাকবার সাথে রয়েছে আরো কিছু ঐতিহাসিক ও বাস্তব পটভূমি। যেমন সিভিলাইজিং মিশন– বা সভ্যতার মিশন– যেটি শুরু হয়েছে উপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদের মধ্যদিয়ে। এর ফল ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ঘটে গেছে। জায়োনিস্ট প্রকল্পও একই কারণে এমন একটি সম্প্রসারণবাদী ধারণার সাথে একীভূত। যারফলে নাকবা কিংবা ইজরাইলের আত্মপ্রকাশ তারই প্রতিফলন মাত্র।[৬৭] তবে ফিলিস্তিনী নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক হোনাইদা গানেম মনে করেন, নাকবা মূলত হলোকাস্টের একটি প্রতিতুলনামূলক ঘটনার প্রকাশ। কারণ নাকবার সাথে রয়েছে আগাগোড়া জায়োনিস্ট প্রকল্প। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইজরাইল প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে জায়োনিস্ট তার প্রকল্পের প্রাথমিক পদক্ষেপ শুরু করেছে। এটি তারা করেছে ফিলিস্তিনীদের হত্যা এবং তাদের নিজ ভূখণ্ড থেকে উচ্ছে করে ভূমি দখলের মাধ্যমে। যদিও এখনো এই হত্যা ও উচ্ছেদ তৎপরতা চলমান। অপরদিকে জায়োনিস্ট প্রকল্প ইহুদীদের বিরুদ্ধে ইউরোপে সংঘটিত হলোকাস্টের কার্যকর জবাব এই ইজরাইল রাষ্ট্র।[৬৮] হোনায়দা গানিম মনে করেন, এটি জায়োনিজমের বড়ধরনের একটি মিশন। যেটি জায়োনিস্ট মতাদর্শের অংশ। ফিলিস্তিনীরা নিজেরা যেভাবে নিজেদের মুখোমুখী হতে হয়েছিল ১৯৪৮'র যুদ্ধের মাধ্যমে তাতে জায়োনিজমই প্রধান পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। নিজেদের মাতৃভূমি, নিজেদের রক্ত, নিজেদের হাজার হাজার বছরের অর্জন, নিজেদের অস্তিত্বের ধ্বংসাবশেষের উপর জায়োনিজম তার পরিচয়– তার জাতিবাদী ও ধর্মবাদী রাষ্ট্র কায়েম করবে– এ ঘটনাই ফিলিস্তিনীদের নিজেদের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল নাকবার ঘটনায়। ফলে সবমিলিয়ে এটি ছিল জায়োনিজমের বড়ধরনের প্রকল্প। এ ঘটনাকে বোঝার জন্য এতোটুকু তথ্যই যথেষ্ট– যেখানে জায়োনিজম ইউরোপে সংঘটিত হলোকাস্ট থেকে উদ্ধার হওয়া ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আসতে আহবান করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী সময়ে– মোটামুটি ১৯৫০ এর মধ্যে ৫ থেকে ছয় লক্ষ ইহুদী ফিলিস্তিনে– মানে ইতিমধ্যে ফিলিস্তিন দখল করে নয়া প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ইজরাইলে ইউরোপ থেকে আসে। যাদের অধিকাংশই ছিল হলোকাস্টে আহত কিংবা হলোকাস্ট থেকে বেঁচে যাওয়া ইহুদী সম্প্রদায়।[৬৯] ইউরোপে যে ইহুদীরা অপদস্থ হয়েছে, লাঞ্চিত হয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে, সবকিছু তাদের কেড়ে নেয়া হয়েছে তার সবকিছুর দায় ফিলিস্তিন দখল করার মাধ্যমে বুঝিয়ে নিতে চেয়েছে

---

[৬৭]. খুরি, ইলিয়াস, *ফরওয়ার্ড (ভূমিকাংশ)*, বাশির বাশির ও অ্যামোস গোল্ডবার্গ সম্পাদিত *দি হলোকাস্ট অ্যান্ড দি নাকবা: আ নিউ গ্রামার অফ ট্রমা এন্ড হিস্ট্রি* (নিউইয়র্ক: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯), পৃ. ix।

[৬৮]. প্রাগুক্ত।

[৬৯]. গানিম, হোনায়দা, *হোয়েন ইয়াফা মেট (জে) ইয়াফা: ইন্টারসেকশন বিটউইন দি হলোকাস্ট এন্ড দি নাকবা ইন দি শ্যাডো অফ জায়োনিজম* বাশির বাশির ও অ্যামোস গোল্ডবার্গ সম্পাদিত *দি হলোকাস্ট অ্যান্ড দি নাকবা: আ নিউ গ্রামার অফ ট্রমা এন্ড হিস্ট্রি* (নিউইয়র্ক: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯), পৃ. ৯৪।

জায়োনিজম। ইউরোপের হলোকাস্টের ঘটনায় তাদের সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণার প্রতিষেধক হিসেবে ফিলিস্তিন দখলকেই তারা বেছে নিয়েছিল। ফলে ইউরোপের পাপের প্রায়শ্চিত্য ফিলিস্তিনের ভূমি কেড়ে নেয়ার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। সরাসরি জায়োনিস্ট তাই করেছে। আর তার সাথে জড়িয়ে আছে পুরো পশ্চিমা দুনিয়া। দ্বিতীয়ত, হলোকাস্ট থেকে বেঁচে যাওয়া ইহুদীরা নাকবা সংঘটনে সরাসরি ইজরাইলের সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়। ১৯৪৮ এর আরব-ইজরাইল যুদ্ধে তারা সরাসরি অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারী ইজরাইলী সেনার প্রায় অর্ধেক হলোকাস্টে বেঁচে যাওয়া ইহুদী।[৭০]

অপরদিকে ৪৮'র পরে নাকবার ঘটনাবলী সম্পর্কে যেসব গল্প-কাহিনী লোকমুখে (Oral Literature) স্মৃতি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে তাতে নাকবার ভিন্ন ধারার একটি ডিককোর্স তৈরি হয়। এতে নাকবাকে উপজীব্য করে পুরাণ (Mythology) কিংবা লোকজ ধারা সৃষ্টি হয়। এছাড়া ৪৮-এ জায়োনিস্টদের ব্যাপক গণ-বিধ্বংসী ঘটনা সম্পর্কে লোকমুখে যেসব জনশ্রুতির চল রয়েছে তারও যথেষ্ট গুরুত্ব বিবেচিত হয়েছে নাকবাকে ঘিরে তৈরি হওয়া নানান বয়ান, আলোচনা ও পর্যালোচনায়। প্রথম দিকে নাকবার একটি পরিপূর্ণ ডিসকোর্স হয়ে ওঠার সুযোগ না থাকলেও নাকবার আলোচনা ও প্রতর্ক নানা ক্ষেত্র ও পর্যায়ে ক্রিয়াশীল ছিল। ১৯৫৬ এর পরে নাকবা সম্পর্কিত ধারণা ও তত্ত্বালোচনা একটি সংগঠিত প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যেতে দেখা যায়। যা তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ কিংবা দ্বিতীয় নাকবার সময়ে এসে সংগঠিতভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ সময়ে দেখা যায় আরব-চৈতন্য থেকে নাকবার স্পিরিট ফিলিস্তিনের জাতীয় ইস্যুতে (*আল-ক্বাদিয়্যাহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ*) প্রবল হয়ে ওঠে। মোটকথা ৬৭ পরবর্তী ফিলিস্তিনের জাতীয় ইস্যুগুলোতে জাতীয় আত্মপরিচয় কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের গণআকাঙ্ক্ষার তীব্র ছাপ প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৭৯ সনে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির ঘটনার মধ্যদিয়ে নাকবা সম্পর্কিত ডিসকোর্সের কেন্দ্রীয় হেজিমনি কিংবা পুরনো সংহতি ভেঙ্গে পড়ে। এতে নাকবার পাঠ-প্রতিক্রিয়া ও বোঝাবুঝির ডিসকোর্স স্থানীয় অবস্থা থেকে ক্রমাগত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হয়ে ওঠতে দেখা যায়। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রুপ ও ধারাগুলো বিভক্ত হয়ে পড়ায় নাকবার ডিককোর্সেও এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে নাকবার আলোচনা-পর্যালোচনা এক কেন্দ্রিকতা থেকে বের হয়ে ডিসকার্সিভ হয়ে ওঠে। নানা ঘরানায়, বিচিত্র ধারায় নাকবার ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। কিন্তু সবধরনের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাভঙ্গি, মতাদর্শ সত্ত্বেও ডিসকোর্স আকারে নাকবা মূলত একটি চলমান ইতিহাস।[৭১] যার একটি নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস বিচিত্র এবং বহুমুখী মতামতকে ধারণ করেও সমাজে চলমান রয়েছে। যাতে ফিলিস্তিনে ইজরাইলী দখলদারিত্ব, নতুন বসতি স্থাপন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক অভিযান, নিরাপত্তা ইস্যু থেকে শুরু করে ইজরাইল এবং জায়োনিস্টদের ফিলিস্তিন সম্পর্কিত যাবতীয় নীতি ও মতাদর্শ সম্পর্কে এসব চিন্তা ও বয়ানের হালনাগাদের ঘটনাও একটি চলমান প্রক্রিয়া।

---

[৭০]. ইয়াবলঙ্কা, হানা, *সার্ভাইবার অফ দি হলোকাস্ট: ইজরাইল আফটার দি ওয়ার* (ইজরাইল: বেনগুরিন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯ ইং), পৃ. ৯-১৯২।

[৭১]. আলী, জারেফা, *আ ন্যারেশন উইদাউট অ্যান এ্যান্ড: প্যালেস্টাইন এন্ড দি কন্টিনিউইং নাকবা* (বিরজেইত: ফিলিস্তিন, ইব্রাহীম আবু লুগদ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ২০১৩ ইং), পৃ. ৫-৮১।

নাকবা বললেই ধ্বংস, মৃত্যু, হত্যা, গণহত্যা, দখলদারিত্ব, উচ্ছেদ ইত্যাদি অনুষঙ্গ সহজেই চিন্তায় ভেসে ওঠে। কিন্তু নাকবার আরো একটি রূপ ছিল সংস্কৃতি ও জ্ঞানভিত্তিক সম্পদগুলোর ধ্বংস সাধন। ফিলিস্তিন প্রাচীনকালেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল আর্থ-সামাজিক দিক থেকে। বিশেষত অর্থনৈতিক দিক থেকে ফিলিস্তিন জনপদ অনেক বেশি স্বাবলম্বী ছিল। প্রায় ছয় হাজার বছর আগেই ফিলিস্তিন সবদিক থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত জনপদ। এমন দীর্ঘকালের এই জনপদ ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক সম্পদে ছিল ভরপুর। ৪৮'র যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ইজরাইল ফিলিস্তিনের ভৌত এবং অভৌত অসংখ্য কাঠামো-অবকাঠামো, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ দখল করে নিজের আদলে গড়ে তোলে। এটি ছিল একধরনের ঐতিহাসিক অবলেপন এবং নাকবার কার্যকর বাস্তব চিত্র। যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সামাজিক সম্পত্তি, জাতীয় সম্পত্তি, স্কুল, কলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, গীর্জা, দোকান-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকারি আবাসিক কোয়ার্টার, পরিবহন অবকাঠামো, থানা, কারাগার, রেলওয়ে, সামাজিক পাঠাগার, লাইব্রেরি, বইপত্র, রাষ্ট্রীয় নথিপত্র, ব্যক্তিগত জমি-জিয়ারতের দলিল-নথিপত্র, ব্যক্তিগত কাগজপত্র, ঐতিহাসিক নথি, প্রত্নতাত্ত্বিক রেকর্ড, প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী, প্রাচীন অসবাবপত্র, জাদুঘর ইত্যাদি জিনিসপত্র লুট করে দখল করে নিয়েছিল ইজরাইলের জায়োনিস্ট কর্মকর্তারা। বিশেষত ঐতিহাসিক দলিল-নথিপত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্র ও রেকর্ডগুলো হস্তগত করার পর তারা বিকৃতভাবে প্রকাশ করে।[৭২] বস্তুত যতোটুকুতে তাদের মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে ততোটুকু তারা সবার জন্য উন্মুক্ত করে। এভাবে তারা ইতিহাসের একটি মতাদর্শিক বয়ান রচনার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল ৪৮'র নাকবার মধ্যদিয়ে। জায়োনিস্ট ইজরাইলের দিক থেকে সেকারণে ইতিহাসের পুনর্বয়ান কিংবা ইতিহাসের পুনর্গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। একটি প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস যা রেকর্ড হয়ে আছে হাজার হাজার বছর ধরে– লাইব্রেরি, মিউজিয়াম কিংবা প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের নানান মৌলিক জিনিসপত্রে খোদিত ভাষ্যে– সেই রেকর্ডগুলো খুব দক্ষতার সাথে তারা পরিবর্তন করে প্রচারে নিয়ে আসবে– এটি ছিল তাদের মতাদর্শিক কার্যক্রমের অংশ।[৭৩]

ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যাপকভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ফিলিস্তিনের প্রাচীন সম্পদ, ইতিহাস সংরক্ষণ এবং সম্ভাব্য নতুন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রমের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করাসহ গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রকল্প ছিল প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের নীতিগত অংশ। ৪৮'র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এসবের অনেক কিছু ইজরাইলের সামরিক বাহিনী লুট করে নিয়ে যায়। লুটের এমন ঘটনা অন্যান্য সম্পদ লুণ্ঠনের মতোই স্বাভাবিক ছিল না, বরং প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ লুণ্ঠন করা ছিল জায়োনিস্ট কর্তৃপক্ষের নীতিগত সিদ্ধান্তের অংশ। পরবর্তীতে

---

[৭২]. মাসালাহা, নূর, *দি প্যালেস্টাইন নাকবাহ: ডিকলোনাইজিং হিস্ট্রি, ন্যারেটিং দি সাবঅল্টার্ন, রিক্লেইমিং মেমোরি* (লন্ডন ও নিউইয়র্ক: জেড বুকস, ২০১২ ইং), পৃ.১৩৫-১৪৭।

[৭৩]. আল সাহলি, নাবিল, *ইজরাইল ইজ ফালসিফাইং প্যালেস্টাইনিয়ান হিস্ট্রি এন্ড স্টীলিং ইটস হেরিটেজ*, ৬ নভেম্বর ২০১৯, https://www.middleeastmonitor.com/20191106-israel-is-falsifying-palestinian-history-and-stealing-its-heritage/

১৯৬৭ সালের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ইজরাইল আরো বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। এ তৎপরতার অংশ হিসেবে ইজরাইল কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন এলাকায় খনন অভিযান চালিয়েছিল। তবে পিএলও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর *শুউন আল ফিলিস্তিনিয়্যাহ* বা ফিলিস্তিন বিষয়ক নামে একটি জাতীয় গবেষণা সংস্থা গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি থেকে এসব ইস্যুতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এর দায়িত্বে ছিলেন মাহমুদ দারভীশ এবং ইলিয়াস খুরি।[৭৪] দ্বিতীয়ত, লুণ্ঠিত প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পত্তি, ঐতিহাসিক নথি, খনন কার্যক্রম এবং উদ্ভাবিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা এবং অন্যান্য সবধরনের স্থাবর-অস্থাবার অবকাঠামো, সম্পদ ও জিনিসপত্রসহ সবকিছুর স্বত্বাধিকারী হিসেবে বৈধতা নিশ্চিতকরণের জন্য নিজেদের পক্ষে আইন প্রণয়নও করে নিয়েছিল ইজরাইল। কিন্তু ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে এসে সম্পদ ও ভূমি দখল করার মতো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা দখল করা, একইসাথে ফিলিস্তিনের সীমানায় খনন কার্যক্রম চালানো এবং তাতে উদ্ভাবিত বিষয়াদি নিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। আন্তর্জাতিক রীতি নীতির পরিপন্থীই নয়, এমনকি আন্তর্জাতিক আইনেরও লঙ্ঘন।[৭৫] ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার মধ্যদিয়ে ইজরাইল এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করে। ২০০১ সালে ইজরাইল পশ্চিম তীরে সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণ শুরু করে। এতে পশ্চিম সীমান্ত এবং গ্রীন লাইনের মাঝে পড়ে ১৫০০টি প্রত্নতাত্ত্বিক নষ্ট করে দেয়া হয়। এবং ১২৫০টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান হুমকির মুখে পড়ে। মোট প্রায় ২৮০০টি প্রত্নতাত্ত্বিক ভূমি ইজরাইলের সীমানা প্রাচীরের কবলে পড়ে মূলত ইজরাইলের করতলগত হয়ে পড়ে। কারণ ইজরাইল এই প্রাচীর নির্মাণ করতে গিয়ে খনন কাজ চালায়- যাতে কয়েক ডজন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা উদ্ভাবিত হয়। এর কারণ, প্রত্নতত্ত্ব শুধু প্রাচীন কিছু স্থাপনা, জিনিসপত্র কিংবা ঐতিহাসিক কোনো নিদর্শন উদ্ভাবন ও উদ্ধারের বিষয় নয়, বরং এর মধ্যদিয়ে নতুন এবং মতাদর্শের অনুগামী বয়ান গড়ে তোলা যায়। এই বয়ান ও ভাষ্য গড়ে তোলাটা জায়োনিস্ট ভিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর জায়োনিস্টদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি ছিল সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে ইজরাইলীকরণ করা।[৭৬]

মোটকথা শুরু থেকেই ইজরাইল সবসময় একটি পূর্বাবস্থান সৃষ্টি করে রাখে। ঐতিহাসিকভাবে তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইজরাইলের একটি একতরফা অবস্থান থাকতেই হবে এমন একটি কঠোর প্রবণতা তাকে সার্বক্ষণিক তটস্থ রাখে। নাকবা প্রশ্নে যতো বির্তক থাকুক, কিন্তু ইজরাইলের জায়োনিস্ট ইতিহাসবিদরা ফিলিস্তিনী জনগণ প্রশ্নে কি অবস্থান নিচ্ছেন এটি একটি জরুরি ইস্যু হয়ে ওঠে। কারণ এর মাধ্যমে জায়োনিস্টদের অবস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনীরা ইজরাইলের কাছ থেকে যেসব আচরণ সবসময় পেয়ে আসছে তাতে বড় একটি ইস্যু ছিল শরণার্থী। এই শরণার্থিতা বস্তুত ইজরাইলের আচরণের ফলাফল যা ফিলিস্তিনের নিয়তি হয়ে ফিরে ফিরে আসে। নয়ত ফিলিস্তিনের জনগণকে সন্ত্রাসী হিসেবে ইজরাইলের আচরণকে মেনে নিতে হবে।

---

[৭৪]. মাসালাহা, নূর। ২০১২, পৃ. ১৪৩।

[৭৫]. নিউটন, *ক্রিড*, *হবি লবি ফান্ডস ইজরাইলি সেটেলমেন্ট আর্কিওলজি*, ২৬ অগাস্ট ২০১৭, https://www.aljazeera.com/features/2017/8/26/hobby-lobby-funds-israeli-settlement-archaeology

[৭৬]. এইচ. ইয়াহিয়া, আদেল, *লুটিং এন্ড স্যালভ্যাজিং: হাউ দ্য ওয়াল, ইলিগ্যাল ডিগিং এন্ড দি অ্যান্টিকুইটিস ট্রেড আর র‍্যাভেজিং প্যালেস্টাইনিয়ান কালচারাল হেরিটেজ*, জেরুজালেম কোয়াটার্লি ৩৩, উইন্টার ইস্যু (লেবানন: জেরুজালেম কোয়াটার্লি, ইন্সটিটিউট ফর প্যালেস্টানি স্টাডিজ, ইস্যু: ৩৩, উইন্টার ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৩৯-৫৪।

এই পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে জায়োনিজমের ইতিহাস চর্চা বিকশিত হয়েছে। যার ভিতরের মূল চরিত্র বস্তুত বর্ণবাদের কদর্যে নিজের সারাংশ তৈরি করে চলেছে একটি রাষ্ট্র– ইজরাইল। কারণ কোনো অবস্থাতেই ইজরাইলের জায়োনিস্ট ইতিহাস বিশ্লেষক কিংবা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাদের সামরিক বাহিনীর হানাদারির ফল– শরণার্থিতাকে মেনে নিতে পারছে না। না তারা স্বীকার করছে ইজরাইলের ক্রমাগত চালানো ফিলিস্তিনী জাতির নির্মূলকরণের নীতিকে (Ethnic Cleansing)। তাদের কাছে এটি স্বীকার্য নয়। নাকবার তফসীরে যেসব মৌলিক অনুষঙ্গ রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে– ইজরাইলের গণহত্যা, দখলদারিত্ব, উচ্ছেদ, শরণার্থিতা, জাতিগত নির্মূলকরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সম্পদ, তথ্য–নথি ও সরঞ্জমাদির আত্মসাৎ ইত্যাদি। ৪৮'র পর থেকে ফিলিস্তিন এসব ক্ষতি ও শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। একইসাথে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষত পশ্চিমে ইজরাইল ও জায়োনিস্ট সমর্থিত লবির কারণে ফিলিস্তিন যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েছে এমনকি কোথাও কোথাও তাদের থামিয়ে দেয়া হয়েছে অতীতের সেসব ইস্যুতে নতুন ভাষ্য তৈরি করছে তারা। জায়োনিস্ট সমর্থিত বুদ্ধিজীবী এবং ইতিহাস ও রাজনীতি বিশ্লেষকরা ফিলিস্তিন বিষয়ে পশ্চিমে যেভাবে ডিসকোর্স গড়ে তুলেছেন তাতে নাকবাকে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন এমনকি সেসব বয়ান থেকে নাই করে দিয়েছেন। এই হলো ইজরাইল ও জায়োনিজমের 'নতুন ইতিহাস'র অভিযাত্রা। গত শতকের আশির দশক থেকে একদল জায়োনিস্ট ইতিহাস বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, তারা ইতিহাসকে নতুনভাবে লিখবেন।[৭৭] বস্তুত পুরো পশ্চিমে তারা যথেষ্ট সফল হয়েছেন। নাকবা এবং ফিলিস্তিনের অন্যরকম এক চেহারা দিতে তারা সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাস লিখেছেন বটে কিন্তু তাতে নাকবাকে প্রায় নাই করে দেয়া হয়েছে। ইতিহাসের প্রাচীনত্ব থেকে ইতিহাসের মৌলিকতা থেকে ফিলিস্তিনের আদলকে বিকৃত করা হয়েছে। ফিলিস্তিন থেকে যারা জায়োনিজমের বিপরীতে 'অপর' এবং 'বর্ণ-বৈষম্য'র কথা বলে চিৎকার দিচ্ছেন তাদের থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন জায়োনিস্ট একাডেমিশিয়ান ও বুদ্ধিজীবীরা। জায়োনিস্ট বিশ্লেষকরা কিভাবে তাদের বয়ান ও ডিকোর্স গড়ে তুলেছেন তার একটি প্যাটার্ন অনুধাবন করা যায় আমেরিকান স্কলার বেল হুকস'র একটি বক্তব্য থেকে।

> I am waiting for them to stop talking about the "other," to stop even describing how important it is to be able to speak about difference. It is not just important what we speak about but how and why we speak.[৭৮]
>
> 'অপর' সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করতে আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করছি। এমনকি বৈষম্য সম্পর্কে বলতে পারাটা কিভাবে গুরুতপূর্ণ তা বন্ধ করতে আমি

---

[৭৭]. মাসালাহা, নূর। ২০১২, পৃ. ১৪৯।

[৭৮]. হুকস, বেল, *টকিং বেক*, *মার্জিনালিটি অ্যাজ সাইট অফ রেজিসট্যান্স*, রাসেল ফার্গুসন গং (সম্পাদিত) 'আউট দেয়ার: মার্জিনালাইজেশন এন্ড কন্টেম্পোরারি কালচার' থেকে (ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুয়েটস: অ্যামআইটি প্রেস, ১৯৯০ ইং), পৃ. ৩৪৩।

অপেক্ষা করছি। আমরা কি নিয়ে কথা বলি তা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো কিভাবে এবং কেন কথা বলি।

৪৮'র নাকবা এবং তৎপরবর্তী সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ফিলিস্তিন নানাবিধ বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখী হয়ে পড়ে। সমাজে বিচিত্র ভাঙ্গন তৈরি হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে নানা দিক থেকে ছেদ ঘটে যায়। জায়োনিস্ট তৎপরতার ফলে ফিলিস্তিনের জনসমাজে প্রান্তিকতা সৃষ্টি হয় সর্বত্র। জায়োনিজমের বর্ণবাদী সংস্কৃতির ফলাফল সরাসরি ফিলিস্তিনে কার্যকর হয় ৪৮ থেকেই। তবে এই প্রান্তিকতা থেকেই প্রতিরোধের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। প্রতিরোধের বিস্তার ঘটে ফিলিস্তিনের নিম্নবর্গীয় শ্রেণি থেকে। বেল হুকস ফিলিস্তিন নিয়ে এসব কথা না বললেও তার এসব কথার চিহ্নরেখায় নাকবা এবং ফিলিস্তিনের বাস্তবতাকে ধরা যায়। কারণ জায়োনিজম এমন একটি বর্ণবাদী মর্ম ধারণ করে যাতে রাজনৈতিকভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে অপর হিসেবে বিবেচনা করায় তার যাবতীয় কার্যক্রমে অপরায়ণের মনস্তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই জায়োনিজম বস্তুত উপনিবেশিক কর্তৃত্বের মর্ম ধারণ করে। তার অস্তিত্বজুড়ে একদিকে রয়েছে বর্ণবাদ অপরদিকে রয়েছে নিপীড়ক উপনিবেশিক কর্তাসত্তা। তবে এই অপরায়ণের সংস্কৃতি এবং নিজের জাতির অভিমুখ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নতুন ইতিহাস এবং তার ভিত্তিতে নতুন ডিসকোর্স গড়ে তুলতে হবে। জায়োনিজম মূলত এভাবেই একটি তৈরি করা ইতিহাসের চলমান প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। বেল হুকস বলেন,

> Only tell me about your pain. I want to know your story. And then I will tell it back to you in a new way. Tell it back to you in such a way that it has become mine, my own. Re-writing you I write myselfanew. I am still author, authority. I am still colonizer, the speaking subject and you are now at the center of my talk.[79]

> আমাকে শুধু তোমার কষ্টের কথা বলো। আমি তোমার কাহিনী জানতে চাই। তোমার কাহিনী শোনার পর একই গল্পভাষ্য নতুন পদ্ধতিতে তোমাকে বলবো। গল্পটি পুনরায় এমনভাবে বলো যেন এটা আমার, আমার নিজস্ব। তোমাকে পুনরায় লিখে মূলত আমি নিজেকে নতুনভাবে লিখি। আমি এখনো লেখক এবং একইসাথে কর্তৃপক্ষ। আমি এখনো কলোনাইজার– উপনিবেশিক প্রভু, কথা বলার কর্তা। আর এই মুহূর্তে তুমি আমার কথা বলার কেন্দ্রে থাকো মাত্র।

---

[৭৯]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৪৩।

কোনো সমাজে যখন শ্রেণিগত প্রান্তিকতা প্রবলভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সেখানে কর্তৃত্ব করার জন্য শুধু অস্ত্র আর আইনই যথেষ্ট নয়। প্রান্তিকতা যেমন নীতিগতভাবে তৈরি করা যায় তেমনি সেখান থেকে যেকোনো সময় প্রতিরোধেরও সূত্রপাত ঘটতে পারে–তাই প্রয়োজন উপনিবেশিক কর্তৃত্ব। প্রয়োজন নতুন ডিসকোর্স। একটি বক্তব্য, একটি গল্প কিংবা একটি ধারণা ও পুরাণ কিভাবে সমাজে প্রভাব তৈরি করতে পারে– সমাজে নতুন অর্থ তৈরি করতে পারে– তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার আছে। এই চিন্তাভাবনা শুধু অন্যরাই করে কিংবা করবে তা নয়, বরং জায়োনিজম আরো কার্যকরভাবেও করতে পারে। জায়োনিজম সেই গল্প কিংবা হাজার হাজার বছর ধরে নথির মতো সংরক্ষিত প্রামাণ্য ইতিহাসকেও পাল্টে দিতে সক্ষম। এবং সেই গল্প কিংবা সেই ইতিহাসের বয়ানই জায়োনিজমের ট্রেডমার্ক হয়ে উঠতে পারে।

২.৭: নাকবা-উত্তর ফিলিস্তিনের আরবী সাহিত্য

ফিলিস্তিনের সাহিত্যের ইতিহাসে যেসব রূপান্তর ঘটেছে তার মধ্যে নাকবা পরবর্তী সাহিত্যের ধারা বেশ শক্তিশালী ধারা। সার্বিক দিক থেকে নাকবার ফলে ফিলিস্তিনের স্থানীয় আরবী সাহিত্যে ব্যাপকতর পরিবর্তন ঘটে। নাকবার আগে সমগ্র আরব অঞ্চলের আরবী সাহিত্যে ফিলিস্তিনের সাহিত্যিক অবস্থান উল্লেখযোগ্য ছিল না। প্রভাব বিস্তার করার মতো কোনো চরিত্র গড়ে উঠেনি ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক আরবী সাহিত্যের। এর আগে মূলত ফিলিস্তিনের আরবী সাহিত্য কোনো না কোনোভাবে অন্যান্য আরবী ভাষাভাষী দেশ যেমন মিশর, সিরিয়া, লেবানন, ইরাকের সাহিত্য দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল।[৮০] ফিলিস্তিনের সাহিত্যমাত্রই তখন সিরিয়া, লেবানন, মিশর ও ইরাকের প্রতিনিধিত্ব করতো কিংবা এসব দেশের ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্তনগুলো অনুসরণ করতো। এরমধ্যে কায়রো ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডসহ জ্ঞান ও সাহিত্যের জন্য সবচেয়ে প্রভাববিস্তারকারী কেন্দ্র। আর প্রকাশনা এবং সাহিত্যিকদের বিচরণের জন্য সবচেয়ে মোক্ষম জায়গা ছিল বৈরুত। কায়রো ছিল রীতিমতো আরবী সাহিত্যের নেতৃত্বের আসনে। এর বাইরে তখনো সমকালের আরবী সাহিত্যে ফিলিস্তিনের মতো দেশগুলোর কোনো ধরনের মৌলিক অবদান বিবেচ্য হয়ে ওঠেনি। বিশেষ কোনো মূল্য তৈরি করতে পারেনি ফিলিস্তিনের কবিতা কিংবা সামগ্রিক সাহিত্য। তারপরও ফিলিস্তিনে বড় সাহিত্যিকদের জন্ম হয়েছে। ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে যেধরনের প্রতিরোধের সাহিত্যের কথা বলা হয় বিশেষ ধারা হিসেবে–যেটি মূলত আরবী সাহিত্যের সর্বোপরি রাজনৈতিক ধারার অংশ–নাকবার অনেক আগেই আধুনিক আরবী সাহিত্যে এর প্রচলন শুরু হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক আমলের শুরুতে এ ধারার জন্ম। ফিলিস্তিন ছাড়াও ইরাক, সিরিয়া, লেবাননে বিশেষ করে এই ধারার অনুশীলনে প্রচুর সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়। তবে নাকবার পরেও এই ধারা অব্যাহত থাকে।

---

৮০. কানাফানি, গাসসান, *আদাব আল-মুক্বাওয়ামাহ ফী ফিলিস্তিন আল-মুহতাল্লাহ ১৯৪৮-১৯৬৬* (দার মানশুরাত আর রিমাল, ১৯৬৬) পৃ. ১১-৩০।

নাকবার পরে সার্বিক বিপর্যয় থেকে অতিক্রম করে যাওয়ার গণচৈতন্য তৈরি হয় ফিলিস্তিনে। এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেন বুদ্ধিজীবীরা। বিশেষত বিদেশে আশ্রিত প্রবাসী ও নির্বাসিত ফিলিস্তিনীরা। নাকবা পরবর্তী প্রতিকূল অবস্থা এবং ইজরাইলী সহিংস পরিস্থিতির ফলে ফিলিস্তিনের বুদ্ধিজীবীদের বড় একটি অংশ নির্বাসিত হয়ে পড়েন; যারা বিদেশে থেকে দেশের জন্য কাজ করে গেছেন। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তাদের সচেষ্ট তৎপরতায় সাহিত্যের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। নির্বাসন থেকে ফিলিস্তিনে আরবী সাহিত্যের শক্তিশালী ধারার জন্ম হয়। প্রতিবেশী আরব দেশগুলোয় অবস্থানরত ফিলিস্তিনী কবি সাহিত্যিকদের বড় অংশটি এক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে সোচ্চার। ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরেও প্রভাবশালী ধারা গড়ে ওঠে। নাকবার পরপর এই ধারা ছিল মূলত বিপ্লবী সাহিত্য আন্দোলনের ধারা।[৮১]

১৯৪৮ থেকে এক দশকের মধ্যে সামগ্রিক অর্থে ফিলিস্তিনে যে পরিবর্তন ঘটে তাতে এই আন্দোলনের পটভূমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই সময় ফিলিস্তিনের সাহিতে নতুন ধরনের পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে; ফিলিস্তিনের কবি- সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা এই ধারায় শামিল ছিল।[৮২] এতে করে ফিলিস্তিনে প্রথম সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারার উদ্ভব হয়। এর মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিন মিশর, সিরিয়া কিংবা লেবাননের মতো দেশগুলোর সাহিত্যের প্রভাব বলয় থেকে বের হওয়ার প্রথম সুযোগ খুঁজে পায়। বস্তুত এ ঘটনায় সাহিত্যের যে সৃষ্টিশীলতা অর্জিত হয় তা সমগ্র আরবী সাহিত্যেরই একটি নতুনতরো সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে ওঠে। নাকবার ঘটনা শুধু ফিলিস্তিনেই কেন্দ্রীভূত থাকেনি, সমগ্র আরব বিশ্বেই এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে গভীর ও ব্যাপকভাবে। নাকবাকে কেন্দ্র করে বিশেষত ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান ও মিশরের সাহিত্যে রূপান্তর ঘটে। কারণ এসব দেশ কমবেশি ১৯৪৮ এর ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিল। ১৯৪৮ পরবর্তী ফিলিস্তিনে সাহিত্যের স্বাধীন ও মুক্তধারায় বিষয় ও প্রআঙ্গিকে বিশেষ ধরনের রূপান্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধিকৃত ফিলিস্তিনে কবিতা ও গদ্যে যেসব বিষয় শক্তিশালী হয়ে ওঠে তার মধ্যে ছিল বিপ্লবী ধারার সাহিত্য; যাতে ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি এবং সামগ্রিক প্রতিকূলতা ও বাধা মোকাবেলায় প্রতিরোধ সাহিত্যের ধারা সবথেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নাকবা-উত্তর পরিস্থিতি ছিল মূলত ফিলিস্তিনের জাতীয় সাহিত্যের সামগ্রিক কাঠামো ও ভিত্তি তৈরির সময়কাল।

নাকবাকে কেন্দ্র করে কিংবা নাকবার ফলে উদ্ভব হওয়া সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে এডওয়ার্ড সাঈদ বিস্তারিত লিখেছেন। *Arabic Prose and Prose Fiction After 1948* প্রবন্ধে সাঈদ ফিলিস্তিনে নাকবা থেকে সৃষ্ট হওয়া সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে এভাবে মূল্যায়ন করেন:

---

৮১. আল-নাক্কাশ, রজা, মাহমুদ দারভীশ, শায়ির আল-আরদ আল-মুহতাল্লাহ, পৃ. ৫-৮।

৮২. সুয়াদ, এ এইচ এস এম অ্যালেঞ্জি, *অ্যান অ্যানালাইসিস অফ ফরমুলেশন অফ পোস্ট-কলোনিয়াল আইডেন্টিটিইন দি ওয়ার্ক অফ এডওয়ার্ড ডাব্লিউ. সাঈদ এন্ড মাহমুদ দারভীশ: আ থিমেটিক এন্ড স্টাইলিস্টিক অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ* (ম্যানচেস্টার: স্কুল অফ আর্টস, ল্যাঙ্গুয়েজিস এন্ড কালচারস, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার, ২০১৫), পৃ. ৭৬।

> since 1948, I believe that Arabs who wrote (novels, plays, poetry, history, philosophy, political polemic, etc.) undertook a fundamentally heroic enterprise, a project of self-definition and autodidactic struggle unexampled on such a scale since World War II. Consider first the setting that offered itself as historical moment.[৮৩]

> আমি বিশ্বাস করি, ১৯৪৮ থেকে আরবদের যারাই লিখেন (উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ইতিহাস, দর্শন ও রাজনৈতিক বিতর্ক-ভাষ্য ইত্যাদি) মূলতই তারা গ্রহণ করে নিয়েছেন একটি বীরত্বপূর্ণ উদ্যোগ, একটি আত্ম-সংজ্ঞায়ন ও স্বয়ংক্রিয় লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন মাত্রার উদাহরণ নেই। যারা প্রথম স্তরে বিবেচনা করে এমনভাবে যা তাদের নিজেদেরকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত আকারে আখ্যায়িত করেছে।

নাকবা পরবর্তী ফিলিস্তিনের সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন রজা আল নাক্কাশ এবং গাসসান কানাফানি। কানাফানি নাকবা থেকে চিন্তা ও সাহিত্যে কিভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয় তার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। কানাফানি একইসাথে এর সংকটও বিশ্লেষণও করেছেন। সাংস্কৃতিকভাবে একটি অবরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ফিলিস্তিনের বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা কবিতা ও সাহিত্যের অবস্থার প্রেক্ষিত পর্যবেক্ষণ করেন কানাফানি; এ অবস্থাকে তিনি 'সাংস্কৃতিক অবরোধ' (হিছারুন ছাকাফিইয়্যুন) নামে শনাক্ত করেন। এ পরিস্থিতি এমন যেখানে আরবরা নিজেদের দখল হওয়া ভূমিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও অবরোধের শিকার। দ্বিতীয়ত, গ্রাম থেকে যেসব শহরে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিজেদের বিকশিত করার উদ্দেশে প্রতিভাবান তরুণরা আসে সেসব শহরের সামগ্রিক অবস্থাও ইজরাইলী তৎপরতার কারণে বদলে যায়। জায়োনিস্ট ও শত্রুতাপূর্ণ এক আতঙ্কিত পরিবেশের জন্ম হয়েছে এসব শহরে। মোটকথা সার্বিকভাবে তৎকালীন ফিলিস্তিনজুড়ে কোথাও সাহিত্য অনুশীলনের মতো কোনো স্থিতিশীল পরিস্থিতি ছিল না।[৮৪] তবু এ পরিস্থিতি থেকেই সাহিত্যের নতুন ধারার জন্ম হয়। যা সমকালীন আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে 'আদাব আল-নাকবাহ' বা নাকবা সাহিত্য নামে পরিচিত। নাকবা সাহিত্যের চারটি দিক রয়েছে।[৮৫] এক. দেশের ভিতরে চর্চিত ধারা বা অভ্যন্তরীণ ধারা (আদাব আল-দাখিল)। দুই. দেশের বাইরে গড়ে ওঠা সাহিত্যের ধারা, যা নির্বাসন সাহিত্য (আদাব আল-শাতাত/আদাব আল-লুজু'/আদাব আল-গরবাহ) নামে পরিচিত। তিন মুক্তি ও স্বাধীনতার ধারা (আদাব আল-হুররাহ, আদাব আল-ছাওরাহ)। চতুর্থত, প্রতিরোধ সাহিত্য (আদাব

---

[৮৩]. ডাব্লিউ সাঈদ, এডওয়ার্ড, *রিফ্লেকশনস অন অ্যাক্সাইল: এন্ড আদার অ্যাসেইস* (হার্ভাড: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩), পৃ. ৪৫।

[৮৪]. কানাফানি, গাসসান। ১৯৬৬, পৃ. ১৪।

[৮৫]. 'ক্বিরাআহ ইনত্বিবাইয়্যাহ ফী আল-হারকাহ আল-আদাবিয়্যাহ ফী আল-ফিলিস্তিন' (ফিলিস্তিনভিত্তিক *মুআসসাহ আল-কুদুস লি আল-ছাকাফাহ ওয়া আল-তুরাছ*, ৬ এপ্রিল, ২০১১ ইং, http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1147

আল-মুক্বাওয়ামাহ)। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা এবং প্রতিরোধের ধারা মূলত নাকবা পরবর্তী সাহিত্যের প্রকরণ। তবে তা একইসাথে সাহিত্যের ধারাও। সর্বোপরি নাকবা সাহিত্যে সময়ের প্রেক্ষিত বিচেনায় চারটি সময়কাল শনাক্ত করেছেন সাহিত্য সমালোচকগণ। এক. ১৯৪৮ যা নাকবার বছর। দুই. ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৭। তিন. ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৭। চার. ১৯৮৭ এর প্রথম ইনতিফাদা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই চার কালপর্বকে তিনটি প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করা হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত সময়ের এই পর্যায়কে জর্ডান যুগ (আল-আহদ আল-উরদুনি)। দ্বিতীয়ত, ইজরাইলি দখলদারিত্বের যুগ (আহদ আল-ইহতিলাল আল-ইসরাইলী) এবং অপরটি ফিলিস্তিনী কর্তৃত্বের যুগ (আহদ আল-সালত্বহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ)।[৮৬]

জর্ডান যুগ বলা হয়, কারণ ১৯৪৮ সালে আরব-ইজরাইল যুদ্ধে আরবদের পরাজয় হওয়া সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের পশ্চিম ও পূর্বতীর জর্ডানের দখলে চলে যায়। ঠিক যেমন গাজা উপত্যকা চলে যায় মিশরের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত পশ্চিম তীর পূর্ব তীর জর্ডানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। নাকবা-উত্তর এই সময়ের ফিলিস্তিনের সাহিত্যকে ঘুমন্ত সাহিত্যও বলা হয়। সামগ্রিক অর্থে ফিলিস্তিন তখনো উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠেনি। এই সময়ে অভ্যন্তরীণভাবে নিজেদের গুছিয়ে ওঠার একটা ব্যাপার ছিল ফিলিস্তিনীদের। নিজেদের তৈরির একধরনের অস্থিরতা কিংবা তাড়া ছিল। এরমধ্যেই মাহমুদ দারভীশ এবং সামীহ আল কাসিম কিংবা তওফিক আল জিয়াদের মতো বেশ কয়েকজন কবিত্বের শক্তিশালী আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৬৭ এর তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধে পশ্চিম ও পূর্ব তীরের বড় একটি অংশ এবং গাজা উপত্যকার কিছু অংশ দখল করে নেয় ইজরাইল। এ যুদ্ধে ফিলিস্তিনীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ইজরাইল ফিলিস্তিনের উপর পূর্ণ দখলদারিত্ব এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পরে ১৯৭৯ সনে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির ফলে ইজরাইল আরো বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠে। যেকারণে ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত এই সময়কে ইজরাইলি দখলদারিত্বের যুগ বলা হয়। ১৯৮৭ সালে ফিলিস্তিনে প্রথম ইন্তিফাদা সংঘটিত হয়। ইন্তিফাদার এই সময় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাও ঘোষণা হয়। ইন্তিফাদার প্রভাব এবং স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনীদের আত্মপরিচয় এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ঘটে। সেজন্য ১৯৮৭ সনকে ফিলিস্তিনের কর্তৃত্বের যুগ বলা হয়। ইন্তিফাদা সংঘটনে কবিতা-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার ব্যাপকতর ভূমিকা রয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক ফিলিস্তিনী সাহিত্যের স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে আলাদা করে আদাব আল-ইন্তিফাদাহ বা ইন্তিফাদা সাহিত্য নামেও একটি ধারা নির্ণয় করেন।[৮৭]

---

[৮৬]. প্রাগুক্ত।

[৮৭]. সাকীরাক, *তলাআত*, *আল ইনতিফাদাহ ফী শি'রি আল ওয়াতান আল মুহতাল* (অনলাইন সংস্করণ, আল কুতুব.কম), পৃ. ১-৪৪। ভিজিট: এপ্রিল ৩, ২০০৭।
تحميل كتاب الإنتفاضة في شعر الوطن المحتل pdf - مكتبة نور (noor-book.com)
এবং খলীল, ড. ইব্রাহীম, *আলা হাদ্দি আল সাইফ: দিরাসাতুন ফী আদাব আল ইনতিফাদাহ আল ফিলিস্তীনিয়্যাহ ফী আল দাখিল*, ভিজিট: এপ্রিল ৩, ২০০৭।
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://al-adab.com/sites/default/files/aladab_1991_v39_01-03_0005_0013.pdf

তবে নিবিড় তৎপরতা ও গভীর সক্রিয়তার ফলে *নাকবা সাহিত্য* নামে যে ধারার অভিষেক ঘটে ফিলিস্তিনের সাহিত্যে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নাকবা সাহিত্য–এই নামে শক্তিশালী হয়ে ওঠায় যে পরিসর সৃষ্টি করা হয়েছে তা মূলত সম্ভব হয়েছে লিপ্ত-তৎপরতার মধ্য দিয়ে। সাহিত্যকে গণঅবস্থান এবং গণভিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলোতে ক্রমাগত উদযাপন ও সম্প্রসারিত করার মধ্য নিয়ে যে শক্তি ও কর্তৃত্ব তৈরি করা হয় সে দিক থেকে ফিলিস্তিনের সাহিত্য রীতিমতো দৃষ্টান্ত উদ্রেককারী। খাদার মাহযাজ ফিলিস্তিনী সাহিত্যের এমন উত্তরণকে আকস্মিকভাবে দেখার ক্ষেত্রে সতর্ক পর্যবেক্ষণ আরোপ করেন। খাদার মাহযাজ মনে করেন, ফিলিস্তিনে আরবী সাহিত্যের ক্রমবিকাশেরই একটি পর্যায় নাকবা সাহিত্য। কিংবা এটি বড় ধরনের একটি উত্তরণ হিসেবে নাকবা থেকে কবিতা কিংবা সামগ্রিক সাহিত্যের নতুনতরো জন্ম যেখানে ঐতিহাসিক পূর্ব-অভিজ্ঞতার নিরবচ্ছিন্ন ছাপ রয়েছে নিঃসন্দেহে। যা হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো সৃষ্টি নয়। মাহযাজ যেকারণে ফিলিস্তিনে আরবী সাহিত্যের যে স্তর বিন্যাস করেছেন তাতে নাকবার ধারাকে একটি প্রতিনিধিত্বশীল পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৮৮]

ফিলিস্তিনী আরবী সাহিত্য এভাবে অভিষিক্ত হওয়ার ঐতিহাসিকতা পর্যালোচনা না করে নাকবা-উত্তর ফিলিস্তিনের আরবী সাহিত্যের বোঝাবুঝি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বস্তুত নাকবা থেকে যে জাতীয় চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটে তার গোড়া আরো পেছনে আরো গভীরে প্রোথিত। নাকবা পূর্ব ব্রিটিশ বিরোধী গণমানসে সেই চৈতন্যের বীজ ও শিকড় মূলীভূত রয়েছে। সেই সময়ে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকায় অতুলনীয় নজির স্থাপন করেছিলেন ইবরাহীম তোকান। তার কবিতা একদিকে দেশপ্রেম অপরদিকে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিপরীতে আত্মপরিচয়ের নিভৃত উপলব্ধি জাগিয়ে তুলেছিল। প্রতিনিধিত্বশীল কিংবা গণমানুষের অভিমুখ পরিচ্ছন্ন করে তোলার মধ্যে এধরনের সাহিত্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে থাকে। ফিলিস্তিনের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ইহসান আব্বাস (১৯২০-২০০৩) ক্যাটাগরিক্যালি এই বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেন।[৮৯]

প্রকৃতি-নিসর্গ, প্রেম, প্রতিরোধ, স্বাধীনতা, রাজনীতি, ধর্ম, বীরত্ব, দুঃখ, শোক, দ্রোহ, শ্লেষসহ বিচিত্র বিষয়ে সমৃদ্ধ ফিলিস্তিনের কবিতা। নাকবা যুগে গভীর আবেগ ও নিবিড় আবেদন সৃষ্টি হলো কবিতার প্রাণ। বিপ্লব কিংবা জাগরণবাদিতা নাকবা পরবর্তী কবিতার জনপ্রিয়তার ভিত্তি হয়ে ওঠে। অপরদিকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবল হয়ে ওঠা মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং উপনিবেশ বিরোধী গণমনোভাবের কারণে নিম্নবর্গীয় কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল নাকবা-উত্তর সাহিত্যের যুগে। এরসাথে ধর্মীয়ভাবে ব্যাপক প্রাণশক্তি যুগিয়েছে কোরআন, হযরত মুহাম্মদের (স.) জীবন চরিত এবং হযরত ঈসার ত্যাগ ও ভালোবাসার দর্শন। যেকারণে ফিলিস্তিনের প্রথম গণ-ইন্তিফাদায় যুগপৎভাবে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের সর্বজনীন দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। নাকবা পরবর্তী যুগে কবিতার গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল মানবিক আবেদন সৃষ্টি করা। যেকারণে

---

[৮৮]. মাহযাজ, খাদার, *আল-আদাব আল-ফিলিস্তিন ফী নাজরিয়্যাহ আল-আদাব ওয়া আল-নাকদ* (গাজা: মাকতাবাহ আল-মাকতাবাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০ ইং), পৃ. ৯-১৩।

[৮৯]. আব্বাস, ইহসান, *আল-শি'র ফী আল-ফিলিস্তিন হাত্তা আল-আ'ম ১৯৬৭—আল-মাওসূআহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড থেকে* (দামেশক: হাইয়াহ আল-মাওসূআহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১৯।

এসব কবিতায় চিন্তা ও মতাদর্শের গভীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। দার্শনিকতায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে কোনো কোনো কবিতা। আধুনিকতাবাদী বিভিন্ন নিরীক্ষামূলক কবিতা বিশেষত পরাবাস্তববাদী কবিতার দুর্লভ চর্চার পাশাপাশি এখানে রোমান্টিক ও আধ্যাত্মিক কবিতা সমাদৃত হয়ে ওঠে বেশি। সর্বোপরি নাকবা-উত্তর কবিতায় মুক্তি-প্রতিরোধ-ভালোবাসা এ তিন বর্গকে এক জায়গায় পুঞ্জিভূত করে ফিলিস্তিনে জাতীয় আত্মপরিচয়ের ভিত্তি গড়ে ওঠে। একইসাথে জাতীয়তাবাদী মানস অতিক্রম করে বিশ্বজনীন দৃষ্টিও ধরা পড়ে সামীহ আল কাসিম, ইউসুফ আল খাতিব ও মাহমুদ দারভীশসহ অনেকের কবিতায়।

নাকবা-উত্তর কবিতার স্বরূপ বোঝার নিমিত্তে ফাদওয়া তোকান, আবি সালমা, রাশেদ হোসাইন, তওফিক জিয়াদ, সুলায়মান দাগাশ এবং সামীহ আল কাসেমের কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। নাকবা এবং নাকবাপরবর্তী ফিলিস্তিনের আরবী সাহিত্যের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে এই পঞ্চকবির সাহিত্যকৃতির গভীর প্রভাব রয়েছে। এখানে তাদের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

ফাদওয়া তোকান

১৯১৭ সালে নাবলুসের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক অভিজাত পরিবারে ফাদওয়া তোকানের জন্ম। ফিলিস্তিনের আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ কবি হিসেবে পরিচিত কবি ইবরাহীম তোকানের সহোদর বোন ছিলেন ফাদওয়া তোকান। ফাদওয়া ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ব্রিটিশবিরোধী ১৯৩৫-১৯৩৬'র গণঅভ্যুত্থানসহ চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকগুলোতে কবিতায় ফাদওয়ার সোচ্চার উপস্থিতি ছিলো। ১৯৬০ সালে লন্ডন সফর এবং সেখানে দুবছরের অবস্থান তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে কবিতার ফর্মসহ সামগ্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে। আধুনিক হয়েও ঐতিহ্যবাদী ও মুক্তচিন্তার এই নারী দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, স্বাধীনতা ও জনগণের প্রশ্নে ছিলেন আপোশহীন। ফাদওয়া তোকানকে আরবী কবিতা ও নন্দনকলার ঐতিহ্যের সেইসব ক্ষণজন্মা নারীদের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয় যারা আরবী প্রাচীন কাসীদার ক্ল্যাসিক কাব্যনৈপুণ্যরীতি থেকে বেরিয়ে এসে একইসংগে প্রাচীন গীতিময় ছন্দ-মাত্রা এবং আধুনিক দেশীয় সুরের বিন্যাসে নতুন কাব্যভাষা নির্মাণে নিবেদিত ছিলেন। প্রতিরোধের কবিতা ছাড়াও সূফীবাদী, প্রকৃতিবাদী ও রোমান্টিকধারার প্রচুর কবিতা লিখেছেন ফাদওয়া। ফিলিস্তিনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসহ বহু আরব দেশ থেকে বিপুল সম্মাননা অর্জন করেন তিনি।

مدينتي الحزينة يوم الاحتلال الصهيوني

يوم رأينا الموت والخيانهْ
تراجع المدُّ
وأُغلقت نوافذُ السماءْ
وأمسكتْ أنفاسها المدينهْ

يوم انـدحار الموج، يوم أسلمتْ
بشاعة القيعانِ للضياءِ وجهَها
ترمّد الرجاءْ
واختنقتْ بغصَّة البلاءْ
مدينتي الحزينهْ
***
اختفت الأطفال والأغاني
لا ظلَّ، لا صدى
والحزن في مدينتي يدبُّ عاريًا
مخضَّب الخطى
والصمتُ في مدينتي،
الصمتُ كالجبال رابضٌ،
- كالليل غامضٌ، الصمت فاجعٌ
محمّلٌ
بوطأة الموت وبالهزيمهْ
أواه يا مدينتي الصامتة الحزينهْ
أهكذا في موسم القطافْ
تحترق الغلال والثّمار ؟
أوّاه يا نهاية المطاف !
الطاعون[৯০]

জায়নবাদীদের দখলের দিনে আমার শোকাহত শহর

আমি মৃত্যুকে দেখেছি একদা, দেখেছি বিশ্বাসঘাতকরা
গতির মুখে বারবার ফিরে আসছে
তারা রুদ্ধ করে দিয়েছে আকাশের জানালাগুলো
তরঙ্গের পরাজয়ের দিনে তারা
টেনে ধরেছে নগরীর শ্বাস-প্রশ্বাস
আর আমাদের আশারা ছাই হয়ে যায়
যখন বিকৃত মুখে তারা আলোর সামনে এসে
নিজেদের চেহারা তুলে ধরে
এরপর বিপদের গলগ্রহে আটকে লুকিয়ে থাকলো
আমার দু:খ ভারাক্রান্ত নগরী।

---

৯০. *নাদওয়া, সাইয়্যেদ গোদা সম্পাদিত অনুবাদ বিষয়ক* দ্বি-মাসিক ই-ম্যাগাজিন, ভিজিট: এপ্রিল ২২ অক্টোবর, ২০২২।
https://www.arabicnadwah.com/arabpoets/madinati-fadwah.htm

শিশুরা লুকিয়ে গেছে, লুকিয়ে গেছে সংগীত
কোনো ছায়া নেই। কোনো শব্দ নেই।
শুধু আমার নগরির ভিতর দু:খরা উলঙ্গ হয়ে
উর্বর পদক্ষেপের কাছে হামাগুড়ি খায়।
এখন আমার নগরির ভেতর নীরবতা
নীরবতা পাহাড়ের মতো নিস্তব্ধ। উপুড়।
নিস্তব্ধতা রাতের মতো অস্পষ্ট।
নিস্তব্ধতা মৃত্যু আর পরাজয়ের গ্লানি বহন করা এক ট্রাজেডি।
হায় শোকাতুর নিস্তব্ধ নগরী
বুঝি এমনি ফসল তোলার দিনে
ফলফলাদি-শস্যরা পুড়ে যায় ?
হায় শেষ চক্র!
হায় মহামারী!

তওফীক জিয়াদ

ত্বওফীক জিয়াদ কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক। জন্ম ১৯৩২ সালে ফিলিস্তিনের নাছেরায়। তিনি তার শিক্ষাকাল সমাপ্ত করেন নাসেরায় এবং রাশিয়ায়। রুশ সাহিত্যে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য তিনি সোভিয়েত রাশিয়া গমন করেন। দীর্ঘকালব্যাপী তিনি ফিলিস্তিনের অধিকৃত ভূমিতে রাজনৈতিক জীবন যাপন করেন। এবং তিনি তার জনগোষ্ঠীর অধিকারের লড়াইয়ে আমৃত্যু ঘনিষ্ঠভাবে সক্রিয় ছিলেন। শৈশবেই জিয়াদ ইসরাইলী কম্যুনিস্ট পার্টি রাকাহর সদস্য হন। রাকাহ'র প্রতিনিধি হিশাবে বহুবার তিনি নির্বাচিত হয়ে ইসরাইলী নেসেটের সদস্য পদ লাভ করেন। এমনকি তিনি মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ সময় নাসেরার নগর প্রধান (মেয়র) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি প্রচুর রুশ সাহিত্য এবং নাজিম হিকমতের রচনাবলী আরবী ভাষায় তরজমা করেন। সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গল্পসহ তার বিপুল রচনা। বলা যায় তার সমস্ত রচনাই লড়াই ও প্রতিরোধ সম্পর্কিত। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত তার *আশাদ্দু আলা আইয়াদীকুম* (أشد علي أيـاديكم) কাব্য গ্রন্থকে ইজরাইলবিরোধী ফিলিস্তিনীদের লড়াইয়ের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিশাবে গণ্য করা হয়। এছাড়া তার অধিকাংশ কাসীদাই গীতিময়। তিনি মৃত্যু বরণ করেন ১৯৯৪ সালে।

شهيدة

هذه الطفلة ، في جبهتها
خمسُ رصاصاتٍ
وشمسٌ

وشهادة
عينها قبَّرةٌ حمرا
وخدّاها عباده
سقطت زنبقةً من ذهبٍ
في شارع الحرية الطالع
من قلب المدينه
شارع الحريّة الطالع
من قلب الزقاقاتِ ،
ومن قلب المتاريس الحصينة
سقطت تهتف للنّصر
كياناً .. وسيادة
فهي في القلب هتافٌ
وعلى العنق قلادة
وهي عنوان كتابِ
وهي ..
تاريخ ..
ولادة[91]

এক শহীদ কন্যা শিশু

এই সেই শিশু, যার কপাল জুড়ে আছে
পাঁচটি বুলেট
আছে সূর্য
শহিদী মৃত্যু
আছে তার দুচোখ জুড়ে রক্তলাল ভারুই পাখি
কপোল জুড়ে অসংখ্য মানুষ
সোনার পদ্মফুল হয়ে ঝরে পড়ে
নগরীর ভেতরে বয়ে যাওয়া
উদিয়মান মুক্তির রাজপথে।
এখন অলিগলি অসংখ্য সরুপথের ভেতর দিয়ে
উদিয়মান রাজপথ।
এখন সুরক্ষিত দুর্গের ভেতর থেকে
ফেটে পড়ছে বিজয়ের ধ্বনি-

৯১. *আল দিওয়ান*, আরবী কবিতার বৃহৎ প্লাটফর্ম https://www.aldiwan.net/poem11565.html

অস্তিত্ব....ক্ষমতা।
সুতরাং হৃদয়ের ভেতরে সে এক তীব্র ধ্বনি।
গলা জুড়ে সে এক নন্দিত মালা।
সেই এখন বইয়ের শিরোনাম
সেই
এক ইতিহাস
এক জন্ম।

إنزلي يا مطره

إنزلي يا مطره
إنزلي عَ الشجره
يبس الزرّعُ ومات الضّرعُ
والأعين جفّت ،فانزلي يا مطره
واطلعي يا قمره
اطلعي عَ الشجره
من جناحَي قُبّره
زمن مرّ وصاب
ولياليـنا ثقيلة
كبُرَ الهمّ وأضنانا العذاب
وعطاشى نحن والدّرب طويله
فمُنا جفّ به حتى اللعاب
لكن الحلم الذي في القلبِ
يبقى كالشهاب
والأمانيُّ .. عذابُ .. سكّره
وطريق الفقراء الثائرين
وقلوب الشرفاء البَرَرِه
هي مَنجانا الأخير
فاطلعي يا قمره
وانزلي يا مطره
إنزلي ...
يا ...
مطره ..[92]

[৯২]. *আল দিওয়ান*, আরবী কবিতার বৃহৎ প্লাটফম https://www.aldiwan.net/poem11567.html

বৃষ্টি নেমে এসো

বৃষ্টি নেমে এসো
নেমে এসো বৃক্ষের উপর
ফসলরা শুকিয়ে গেছে, পশুদের স্তনরা মরে গেছে
চোখেরা শুকিয়ে গেছে, সুতরাং হে বৃষ্টি নেমে এসো
চাঁদ হে উদিত হও
উদিত হও বৃক্ষের উপর
ভারুই পাখির ডানা বেয়ে
সময়রা বয়ে গেছে। বয়ে গেছে তীব্র বেগে অনেক দূর।
আর আমাদের রাত্রিরা বড় বেশী ভারি হয়ে গেছে।
দুশ্চিন্তা আর আমাদের জুলুম ও কষ্টের ভার কঠিন হয়ে পড়েছে।
পিপাসা, আমরা এবং পথেরা বড় দীর্ঘ হয়ে গেছে।
আমাদের মুখ লালাহীন শুষ্ক হয়ে গেছে।
তবু এতোটুকু ধৈর্য হৃদয়ের ভেতর
অগ্নিশিখার মতো জ্বলে আছে অনির্বান।
নিরাপত্তারা........এক নির্যাতন........চিনির মতো মিষ্টি!
বিপ্লবী গরীবদের পথ
এবং এ্যালিটদের মন
বুঝি এখন আমাদের সর্বশেষ মুক্তির আশ্রয়।
সুতরাং হে চাঁদ জাগ্রত হও
সুতরাং বৃষ্টি হে
নেমে এসো
নেমে এসো
হে
বৃষ্টি।

সামীহ আল কাসিম

সামীহ আল কাসিম ফিলিস্তিনের অন্যতম প্রধান কবি। জন্ম ১৯৩৯ এর ১১ মে। বর্তমান জর্ডানের জারকায় জন্মগ্রহণ করেন সামীহ। তবে জন্মকালে জারকা ছিল ব্রিটিশশাসিত বৃহত্তর ফিলিস্তিন সীমানাধীন এলাকা। পরবর্তীতে সামীহ আল কাসিম ইজরাইলে বসবাস করেন। ফিলিস্তিনের নাজারেহ, রামেহ এবং গ্যালিলী উপত্যকায় ছিল শৈশবের বেড়ে ওঠা। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ ও নাকবায় সামীহ এবং তার পরিবার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। তারা ফিলিস্তিনেই থেকে যান। যুদ্ধোত্তর

পরিস্থিতিতে তাদের এলাকা ইজরাইল নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। পড়াশোনাও এখানেই করেছেন। তবে পেশাগত জীবনে সামীহ সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। মার্ক্সীয় ভাবাদর্শে দীক্ষিত হলেও সামীহ জামাল নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন ছাত্রজীবনেই। ইজরাইলী কম্যুনিস্ট পার্টি হাদাশ'র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ফিলিস্তিনের অধিকারের পক্ষে আজীবন সোচ্চার ছিলেন সামীহ। ফিলিস্তিনের পক্ষে সক্রিয় থাকায় বেশ কয়েকবার ইজরাইল কর্তৃক কারাবরণ করেন। একপর্যায়ে তাকে দীর্ঘদিন গৃহবন্দি করে রাখা হয়। মাহমুদ দারভীশের খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন সামীহ আল কাসিম। ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ কবিতা যাদের হাত ধরে বিকশিত হয়েছে সামীহ তাদের অন্যতম। ২০১৪ সালের ১৯ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন সামীহ।

أكثر من معركةٍ

في أكثر من معركةٍ دامية الأرجاءْ
أشهر هذي الكلمات الحمراء
أشهرها.. سيفاً من نارٍ
في صفِّ الإخوة.. في صفِّ الأعداء
في أكثر من درب وعْرٍ
تمضي شامخةً.. أشعاري
و أخافُ.. أخاف من الغدرِ
من سكين يُغمد في ظهري
لكني، يا أغلى صاحب
يا طيّبُ.. يا بيتَ الشعرِ
رغم الشكّ.. و رغم الأحزانِ
أسمعُ.. أسمعُ.. وقع خطى الفجرِ!
رغم الشكّ.. و رغم الأحزانِ
لن أعدم إيماني
في أنّ الشمس ستشرقُ..
شمس الإنسانِ
ناشرةً ألوية النصرِ
ناشرةً ما تحمل من شوقٍ و أمانِ
كلماتي الحمراء..
كلماتي.. الخضراء! [93]

চারদিকে কানায় কানায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চেয়ে বেশি
এই রক্তিম শব্দসমূহের মাঝে সবচেয়ে বিখ্যাত

---

৯৩. আল কাসিম, সামীহ, *দিওয়ানু সামীহ আল কাসিম* (বৈরুত: দার আল আওদাহ, ১৯৮৭ ইং), সামীহ, পৃ. ৭৬।

সবচেয়ে পরিচিত... আগুনের তরবারি
ভাইয়ের পাশে... শত্রুর পাশে
অসমান পথে প্রান্তে উঁচু হয়ে ওঠে
আমার কবিতা।
আমি ভয় পাই বিশ্বাসঘাতকতা
ভয় পাই আমার পিছে পিছে লুকায় থাকে ছুরি
প্রিয় হে মালিক, ভালো হে, কবিতার ঘর
এতো সংশয়, এতো দুঃখ যন্ত্রণা তবু
শুনি... শুনি ভোরের পদধ্বনি
এতো সংশয়, এতো দুঃখ যন্ত্রণা তবু
হারাতে পারি না কখনো বিশ্বাস
যেখানে উদ্ভাসিত হবে সূর্য...
মানুষের সূর্য
বিজয় ব্রিগেডের প্রকাশ
আকাঙ্ক্ষা ও নিরাপত্তার প্রকাশ
আমার রক্তিম শব্দাবলী
সবুজ শব্দাবলী।

২.৮: দারভীশের কবিতা এবং নাকবা

দারভীশের বক্তব্যে, স্মৃতিচারণে, সাক্ষাৎকারে, প্রবন্ধ-নিবন্ধে, কবিতায় নাকবার প্রসঙ্গ এসেছে বিপুল। নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে গিয়ে দারভীশ শৈশবে যখন তার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন সেই বাস্তবতায় তিনি পরিচয়ের প্রশ্ন মোকাবেলা করেছেন। একটি ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যদিয়ে এই পরিচয়ের মুখে দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। তখন দারভীশের জন্মের সাত বছরের মাথায় আরব-ইহুদি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে যা প্রথম আরব-ইজরাইল যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিন ইজরাইল কর্তৃক দখল হয়ে যায়। যুদ্ধ চলাকালে ইজরাইলের ব্যাপক হামলায় দারভীশের গ্রাম 'আল বিরওয়াহ' পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দারভীশের জীবনীকার রজা আল নাক্কাশ বর্ণনা করেন, ইজরাইলী হানাদারদের তীব্র হামলায় গ্রামটি মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এ সময় কোনো ফসলের ক্ষেতে তার পরিবারের সাথে আত্মগোপন করে থাকায় কোনোমতে বেঁচে যান দারভীশ। এক পর্যায়ে তারা লেবাননে পালিয়ে যান।[৯৪] লেবাননের শরণার্থী জীবন থেকে পালিয়ে নিজের গ্রামে ছুটে এসেছিলেন দারভীশ। নিজের বাস্তুভিটায় ফিরে এসে দারভীশ দেখলেন তার বসতভিটা আর প্রিয় গ্রাম ইজরাইলের দখলে। বিধ্বস্ত গ্রামের স্মৃতির আবেগময় বর্ণনা দিয়ে কবি বলেন,

---

[৯৪]. আল-নাক্কাশ, রজা, *মাহমুদ দারভীশ: শায়িরুল আরদ আল-মুহতাল্লাহ*, পৃ. ৯০।

قيل لي في مساء ذات يوم الليلة نعود إلى فلسطين، وفي الليل وعلى امتداد عشرات الكيلومترات في الجبال والوديان الوعرة كنا نسير أنا وأحد أعمامي ورجل آخر هو الدليل ، وفي الصباح وجدت نفسي أصطدم بجدار فولاذي من خيبة الأمل : أأنا الآن في فلسطين الموعودة ! ولكن أين هي؟ فلم أعد إلى بيتي، و أدركت بصعوبة بالغة أن القرية هدمت وحرقت.[৯৫]

এক সন্ধ্যায় আমাকে বলা হলো, ফিলিস্তিনে ফিরে যাচ্ছি আমরা। রাতভর আমি, আমার এক চাচা ও একজন গাইডসহ আমরা মাইলের পর মাইল উঁচুনিচু পাহাড়ের বন্ধুর পথ পার হয়ে চলছিলাম। ভোরে উঠে হতাশার এক ইস্পাতকঠিন দেয়ালে আঘাত খাই; আমি এখন ঠিক সেই ফিলিস্তিনে? তবে কোথায় সেই ফিলিস্তিন? এরপর আর কখনো আমি আমার ঘরে ফিরে যেতে পারিনি। প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে বুঝে উঠলাম আমার এই গ্রামটি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, ছাই হয়ে গেছে পুড়ে।

বিধ্বস্ত আল বিরওয়াহ ছিল ফিলিস্তিনের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকার গ্যালিলির অন্তর্গত একটি গ্রাম। দারভীশ গ্যালিলিতে চলা ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ইংগিত দিয়েছেন *আল আছাফীরু তামুতু ফী আল-জালিল* কবিতায়। ১৯৬৭ সনে দ্বিতীয় নাকবার দুই বছর পর ১৯৬৯ সনে এই শিরোনামেই দারভীশের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবি বলেন,

কিছুক্ষণ পর আমরা মিলিত হবো	نلتقي بعد قليلْ
এক বছর পর	بعد عامٍ
দু বছর পর	بعد عامين
এক প্রজন্ম পর...	...وجيلْ
এবং ক্যামেরায়	ورَمَتْ في آلة التصوير
উঠে আসবে বিশটি বাগান	عشرين حديقهْ
গ্যালিলির চড়ুই পাখিরা	وعصافيرَ الجليل
এবং সমুদ্রের আড়ালে সত্যের নতুন অর্থের খোঁজে	خلف البحر ’ ومضتْ تبحث
	عن معنى جديد للحقيقهْ
চলতে থাকবে গবেষণা	وطني حبل غسيل-

[৯৫]. আল-তিউনিসি, রাশা, *লাসতু হাকিয়ান ওয়ালা মোরাসিলান হারবিয়্যান লি আল-ক্বাদিয়্যাহ আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ*, ১৬ অগাস্ট ২০০৮, https://www.turess.com/echaab/5995

আমার দেশ মূলত প্রতি মুহূর্তে
রক্তাক্ত রুমাল শুকাবার
এক রশি...

لدم المسفوك[৯৬]

লেবাননের *দাইর আল আসাদ* শরণার্থী শিবিরে মাত্র অল্প কিছুদিন থেকে দারভীশ তার গ্রাম আল বিরওয়ায় প্রথমবারের মতো ফিরে আসেন। ফিরে এসে গ্রামের কোনো নিশানা-চিহ্নই খুঁজে পাননি, পেয়েছেন শুধু তার অতিচেনা বাতাস ও মাটির ঘ্রাণ। পাননি নিজের হারানো বাস্তুভিটা ফিরে পাবার অধিকার। ফিরে এসে বরং তিনি পরিচয় সংকটে পড়েন। ইজরাইলের সেনাদের কাছে পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি। ইতিমধ্যে যেহেতু এই ভূমি তারা কেড়ে নিয়ে গেছে। দারভীশ তাই ক্ষুব্ধ হলেন। যাইহোক, ফিলিস্তিনের সাহিত্যে নাকবার চিত্র গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছে নিসন্দেহে। কবিতা, গল্প-উপন্যাসসহ সাহিত্যের প্রায় সব মাধ্যমেই নাকবার স্বরূপ বিস্তৃত হয়েছে। দারভীশের কবিতায় নাকবা উঠে এসেছে বিচিত্র ভাষায়। নানা অনুষঙ্গে। ইজরাইলের জুলুম, দখলদারিত্ব, নির্বাসন, বিতাড়ন, উচ্ছেদ, বন্দিত্ব, হত্যা-গুম ছাড়াও নিবিড় আবেগ, অভিজ্ঞতা ও অনুভবে ব্যক্ত হয়েছে নাকবার স্বরূপ। নাকবা কবলিত আরব ফিলিস্তিনীদের উপরে ইজরাইলের নির্যাতনের নির্মমচিত্র দারভীশের প্রথম দিকের কবিতাগুলোর প্রধান উপজীব্য ছিলো। *আল মাদীনাহ আল মুহতাল* বা দখলকৃত নগরী শিরোনামের কবিতায় দারভীশ বলেন,

الطفلة احترقت أمها
أمامها...
احترقت كالمساء

পুড়ে গেছে শিশুটির মা
তার সামনেই
সে তবে পুড়ে গেছে সন্ধ্যার মতো।[৯৭]

মাকে খুন করা হয়েছে আগুনে পুড়িয়ে। নিজের সামনে মাকে পুড়তে দেখেছেন শিশু সন্তান। নির্বাক অসহায় শিশুটি শুধু দেখেছেন। এবং দেখতে দেখতে শিশুটিও মরে যায় দগ্ধ হয়ে। এই পুড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি কেমন? সন্ধ্যার মতো। খুব দ্রুত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অন্ধকারে হারিয়ে যায় এর আগুন ও উত্তাপ। তাই কবির অনুভবে সন্ধ্যার মতো একটি দৃশ্য কল্পনা করে এমন মর্মন্তুদ চিত্রকল্প এঁকে তৈরি করেন

[৯৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল-আছাফীরু তামূতু ফি আল-জালীল*, *আল দীওয়ান*, *আল আ'মাল আল উ'লা-১* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লিল কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৭১।
[৯৭]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উলা-২* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লিল কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮৭।

ইজরাইলী নিষ্ঠুরতার করুণ দৃশ্য। *মাররাতান উখরা* শিরোনামের এক কবিতায় কবি ইজরাইলী হত্যাকাণ্ড এবং হত্যাকারীদের অবস্থান কেমন তার একটি চিত্র এঁকেছেন এভাবে...

حذف الظلّ يديها من جبيني
فاختبأنا في الظهيره
قتلوها في الظهيره
بدلا مني،
ولم يعتقلوني
مرة أخرى
لأن القتله
تحت جلدي[৯৮]

আমার ললাট থেকে ছায়াটি সরিয়ে নিলো তার দুহাত
অতপর আমরা লুকিয়ে পড়লাম দুপুরের ভিতর।
আমাকে রেখে
দুপুরে তাকে হত্যা করলো তারা
আরেকবার
তারা আমাকে গ্রেপ্তার করেনি
কারণ হত্যাকারীরা লুকায়ে থাকে
আমার চামড়ার নিচে।

কবিতার ভাষাগুলো সরাসরি হৃদয়স্পর্শী হওয়ায় সাধারণ মানুষের ভিতর দারভীশের কবিতাগুলো সহজেই দাগ কাটে। একদিকে ভাষার সারল্য সুসংহত রয়েছে। আবার শৈল্পিক মানও অক্ষুন্ন রয়েছে। এ ধরনের কবিতাগুলোতে রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। কবি এখানে *জিল* বা ছায়া শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দটি জায়নবাদী হত্যাকারীদের রূপক। কবির ভাষায়- *তারা আমাকে গ্রেপ্তার করেনি/আরেকবার/কারণ তারা লুকিয়ে থাকে/ আমার চামড়ার নিচে/*– এখানে, ‘কারণ তারা লুকিয়ে থাকে আমার চামড়ার নিচে’ বাক্যটি ভাবচিত্র। কবি এখানে ইংগিতময় ভাবকল্পের অবতারণা করেছেন। দারভীশ একটি পরিস্থিতির কথা বোঝাতে চেয়েছেন। যেখানে ইজরাইল এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে যাতে আলাদা করে গ্রেপ্তারের প্রয়োজন অনেক সময় প্রয়োজন হয়না। কারণ পুরো পরিস্থিতি একটি বন্দিশালার মতো। পুরো দেশই একটি কারাগারের মতো। ফিলিস্তিনের মতো তাদের প্রতিটি বসতিদের দেহকেও যেন ঘিরে আছে ইজরাইলের সামারিক বাহিনী। তাই কবি বুঝাতে চেয়েছেন জায়নবাদী শত্রুরা কবিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করেনি। কবি গ্রেপ্তার হয়েই আছে। যেহেতু হত্যাকারী জায়োনবাদী শত্রুরা তার চামড়ার নিচে লুকায়িত। অর্থাৎ শত্রুরা তাকে এবং ফিলিস্তিনের প্রতিটি মানুষকে তারা সার্বক্ষণিক পরিবেষ্টন করে আছে। একই কবিতার অপর একটি অংশে কবি বলেন,

[৯৮]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫, ৭৬।

مرة أخرى
يمر العسكريّ
تحت جلدي
مرة أخرى
يواري شفتي
في تجاعيد النشيد الوطن.[৯৯]

আরেকবার
সেনারা অতিক্রম করে যাবে
আমার চামড়ার নিচ দিয়ে
আরেকবার দেশাত্মবোধক সংগীতের মূর্ছনায়
আমার দুঠোঁট ডুবে যাবে।

পুরো ফিলিস্তিন একটি কারাগার। ইজরাইলের হানাদার বাহিনী ফিলিস্তিনের প্রতিটি নাগরিককেই ঘিরে আছে। ফলে তাদের গ্রেপ্তার করা, না করা সমান কথা। এই ভাবচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তাতে জায়নবাদী সেনাবেষ্টিত পুরো আরব-ফিলিস্তিনীদের শ্বাসরুদ্ধকর জীবন যাপনের করুণ চিত্র স্বার্থকভাবে ফুটে ওঠেছে। *আল সিজনু ওয়া আল ক্বমার* বা কারাগার ও চাঁদ কবিতায় ইজরাইলী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের আবেগময় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। দারভীশ বলেন,

في أخر الليل التقينا تحت قنطرة الجبال
منذ اعتقلت, و أنت أدري بالسبب
الأن أغنية تدافع عن عبير البرتقال
وعن التحدي والغضب
دفنوا قرنفلة المغني في الرمال[১০০]

রাতের শেষে, পর্বতের খিলানের নিচে আমরা মিলিত হলাম।
যখন আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো, কারণটা তুমিই বেশি জানো।
কারণ সংগীতেরাই এখন রক্ষা করে
কমলার সৌরভ,
চ্যালেঞ্জ এবং দ্রোহের ভাষা।
তারা গায়েনের করনফুলকে কবর দিয়েছে বালুর ভিতর।

১৯৪৮ সালে যুদ্ধের ফলাফলকে নাকবা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যতোক্ষণ ইজরাইলের হস্তক্ষেপ এবং আগ্রাসন বন্ধ হচ্ছে না ততোক্ষণ নাকবার ঘটনা ঘটতে থাকবে। ফলে নাকবা একটি

---

৯৯. প্রাগুক্ত। পৃ. ঐ।
১০০. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উলা-১.২০০৫*। পৃ. ২৩১।

চলমান প্রক্রিয়া। নাকবার অতিসাধারণ চিত্র হলো হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ড বিচিত্রপন্থায় সংঘটিত করে চলেছে ইজরাইল। দারভীশের কবিতায় হত্যার অসংখ্য পঙক্তিমালা রচিত হয়েছে। যাতে হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কখনো সরাসরি কখনো উপমা ও প্রতীকের দ্যোতনায়। এইসব হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ দলীল দারভীশের কবিতা। কারণ যখনই ঘটনা ঘটছে তখনই দারভীশ কবিতা লিখেছেন। লিখেছেন মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা। সেইসব দিনের কথা, যখন ফিলিস্তিনের পাশে কেউ ছিল না। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, মানুষ তার মনের যন্ত্রণা, দুঃখ, কান্না প্রকাশ করার মতো সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। ৪৮' পরবর্তী সময়গুলো ছিল এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর সময়। যখন কান্নারা শুকিয়ে যেতো। হৃদয় বোবা হয়ে যেতো। চেহারাগুলো যেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো। চারদিকে বারুদের গন্ধ, পোড়া গন্ধ, লাশের গন্ধ, ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশ, বোমার গর্জন, বুলেটের শব্দ, বাবার চেহারা ঝলসে গেছে, ভাইয়ের খোঁজ নাই– এমন। যুবতী বোনের শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে রাস্তার পাশে পাথরের নিচে। মা কখনো জানালার শিক ধরে তাকিয়ে থাকতো, কখনো বোবা বেদনায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো, চুলোয় আগুন জ্বলেনা অনেক দিন। মাঝে মধ্যে ত্রাণ সামগ্রীর বিরল করুণা। রাস্তায়, অলি-গলি, এখানে-ওখানে পড়ে আছে ছেঁড়া হাত–পা–গলিত লাশ, গর্ভধারিণী নারীর পেট থেকে ছোরা ঢুকিয়ে সন্তান বের করে আনার গা কাঁটা দিয়ে ওঠা ঘটনা। ধর্ষণ করে জলপাইয়ের ডালে ঝুলিয়ে রাখার দৃশ্য। আরো কতো অজানা নির্যাতনের ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে কে জানে। যেখানে হাসি, সুখ, কল্পনাতীত বিষয় ছিল। বন্দুকের নল, বুলডোজার, ট্যাংক, গোলা গৃহহীন খোলা আকাশ ছিল সেই সময়ের ফিলিস্তিনের নিত্যকার দৃশ্য। কিন্তু সেই সময়ের পরিস্থিতি এখনো খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। ফিলিস্তিন এখনো বয়ে বেড়ায় ইজরাইলের দখলদারিত্ব, ধ্বংসযজ্ঞ, হানাদারি আর তার ফলে সৃষ্টি হওয়া প্রতিদিনের–প্রতিমুহূর্তের নাকবা।

কিন্তু পৃথিবীর কেউ তাদের কথা বলুক আর নাই বলুক, কেউ শুনুক আর নাই শুনুক– কবিতা, গান আর সুরই তাদের হাতছানি দেয়। দারভীশ তাদের তার সেই ভাষা দিয়ে একদণ্ড শান্তি দিয়েছিলেন যেন। কারণ দারভীশ তাদের কষ্টের কথা শুনতেন। তাদের কষ্টের কথা তুলে ধরতেন। ফলে দারভীশের কবিতায় তারা যেন জীবন খুঁজে পেয়েছিল। এই ভাষাই তাদের জীবনের অস্তিত্বের কথা বলে, মাটির কথা বলে। স্বাধীনতার কথা বলে। তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলে। তাদের আত্মমর্যাদা এবং নিজের পরিচয়ের কথা বলে। নিজেদের মুক্তির কথা বলে। দারভীশের এই সুর, এই ভাষা, কবিতা ও ছন্দে–মাত্রায় নির্মিত ফিলিস্তিনের আপন মাতৃভূমি। স্বাধীন ভূমি। নাকবার কাহিনী এবং নাকবা থেকে বেরিয়ে আসার নয়া জমিন নির্মাণ করেন দারভীশ। দারভীশ বলেন,

يحكون في بلادنا
يحكون في شَجَنْ
عن صاحبي الذي مضى
وعاد في كفنْ

***

كان اسمه...
لا تذكروا اسمهْ!
خلوه في قلوبنا...
لا تدعوا الكلمةْ
تضيع في الهواء، كالرماد...
خلوه جرحاً راعفاً... لا يعرف الضماد
طريقه إليه...
أخاف يا أحبتي... أخاف يا أيتام...
أخاف أن ننساه بين زحمة الأسماء
أخاف أن يذوب في زوابع الشتاء!
أخاف أن تنام في قلوبنا
جراحنا...
أخاف أن تنام!![১০১]

তারা গল্প বলে, আমাদের দেশের
তারা গল্প বলে দুঃখ বেদনায়
আমার বন্ধুর। সে চলে গেছে
সে ফিরে গেছে কাফনের ভিতর।
তার নাম ছিলো-
তোমরা তার নাম স্মরণ করো না।
তারা তাকে ফেলে গেছে আমাদের হৃদয়ে
তোমরা তার নামের শব্দটি ছুঁড়ে ফেলো না।
ছাইয়ের মতো বাতাসে হারিয়ে যাবে।
তারা তাকে নাক মুখ জখম করে ফেলে গেছে
ব্যান্ডেজে যাকে আর চেনার উপায় নাই-
বন্ধু! আমার ভয় হয়... আমি ভয় পাই অসহায় হে!
আমার ভয় হয়... আমরা তাকে ভুলে যাবো অসংখ্য নামের ভিড়ে
আমার ভয় ... সে চলে যাবে শীতের ঝড়ে।
আমার ভয়... আমাদের হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়বে
আমাদের আহতরা।
আমার ভয় হয়, তারা বুঝি নিস্তেজ হয়ে যাবে।

---

১০১. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬, ২৭।

একদিকে নাকবার আখ্যান বলে গেছেন কবি। অপরদিকে নাকবার কবল থেকে বেরিয়ে আসার মুক্তির পয়গাম শুনিয়েছেন। এসব আখ্যানে যেমন স্বজনহারা কান্নার অশ্রুঝরা গীত গেয়েছেন। তেমনি কবি ভয়ে সতর্কতায় উজ্জীবনের গানে সুর বেঁধেছেন। কবির বড় ভয় আমরা, *আহতরা ঘুমিয়ে গেলে, নিস্তেজ হয়ে গেলে কী করে আবার জাগাবো।* শহীদ হয়ে যাওয়া বন্ধুর নাম ভুলে গেলে কেমন করে জাগবার প্রেরণা পাবো। 'ছালাছু ছুওয়ারিন' (তিনটি ছবি) কবিতায় ১ম চিত্রে কবি আজন্ম সর্বহারা মানুষের দু:খময় অসহায়ত্বের চিত্র ধারণ করেছেন সেসব উপমায়, চিত্রকল্পে যেখানে চাঁদ তার ভূমিকায় বিমুখ থাকে–

كان القمر
كعهده - منذ ولدنا - باردا
الحزن في جبينه مرقرق ...
روافدا ...روافدا
قرب سياج قرية
خر حزينا
شاردا ...[১০২]

চাঁদ ছিলো নিস্প্রভ তার কালের মতো
কেবল দুঃখ ছিলো ঝলমল
বয়ে গেলো নদী হয়ে নালা হয়ে
পল্লীর প্রদীপের কাছেই সে ঢলে পড়ে
শোকে যন্ত্রণায়
তাড়িত বিতাড়িত হয়ে...।

এখানে চাঁদ এবং প্রদীপ নিজেদের সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আবহমান অর্থ ধরে রাখতে পারেনি। কবি তাদের অর্থ ঘুরিয়ে দিলেন উল্টা উপমায়। দারভীশের কবিতায় এই প্রয়োগ তার একটি মৌলিক দিক। তবে নিচের কবিতাংশে দুঃখ আর শোকের দৃশ্য অন্যরকম ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে...

ليس من شوق إلى حضن فقدته
ليس من ذكرى لتمثال كسرته
ليس من حزن على طفل دفنته
أنـــــا أبـــكـــي
أنا أدري أن دمع العين خذلان ... و ملح
أنـــــــا أدري
و بكاء اللحن ما زال يلح

[১০২]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৪।

لا ترشّي من مناديلك عطرا
لست أصحو... لست أصحو

ودعي قلبي... يبكي !
شوكة في القلب مازالت تغزّ
قطرات... قطرات... لم يزل جرحي ينزّ[১০৩]

যে বোন আমি হারিয়েছি তার প্রতি আগ্রহ নেই
যে পুতুলকে আমি মূর্তি ভেবেছি তার জন্য কোনো স্মৃতি নেই।
যে শিশুকে কবর দিয়েছি তার জন্য কোনো দুঃখ নাই
আমি শুধুই কাঁদছি।
আমি জানি, চোখের অশ্রু নিরাশার... নোনা
আমি জানি...
কান্নার সুর শক্ত হয়ে ছাপিয়ে উঠছে
আমি চিৎকার করবো না। আমি চিৎকার করবো না
ছেড়ে দাও আমার হৃদয় সে কাঁদছে।
হৃদয়ে অবিরাম কাঁটা বিঁধছে।
ক্ষতগুলো থেকে চুঁইয়ে পড়ছে নিরন্তর
ফোঁটা ফোঁটা যন্ত্রণার কণা।

কবি কখনো কখনো দমিয়ে যান, হতাশ হয়ে পড়েন। হত্যা, নির্যাতন আর গৃহহীনতার মধ্যেও কষ্ট, শোক চাপিয়ে জেগে উঠেন। প্রাণবন্ত হয়ে উঠেন। আবার লড়াই, প্রতিরোধ শুরু করতে হবে নতুন উদ্যমে জীবনের তাগিদে। কিন্তু লড়াই, জীবনযুদ্ধ যতটুকু এগিয়ে যেতে চায়- প্রতিমুহূর্তের প্রতিকূলতায়, বিদ্বেষের কালো থাবায় প্রবল প্রলয়ংকরী ঝড়ে সবকিছু যেন আবার লন্ডভন্ড হয়ে যায়। এক অন্ধকারের ঝাপটায় কবি বেদনায়, দুঃখে, হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। যেনো অন্ধকার, মৃত্যু ও রক্তচক্ষুদের হিংস্রতাই তার প্রতিমুহূর্তের নিয়তি। কবি আত্মযন্ত্রণায় তখন অন্তর্মুখী হয়ে উঠেন। কবি অবগুণ্ঠিত ব্যাথার প্রকাশ করেন অবগুণ্ঠিত ভাবেই। উচ্চারণ করেন ক্ষোভ আর শে- ষের ভাষা। কবি বলেন:

كل الليل تسقط في أغانينا ضحية
والضوء يشرب ليل أحزاني وسجني
فتعال, مازالت لقصتنا بقية[১০৪]

প্রতিটি কালো রাত্রি নেমে পড়ে আমাদের উৎসর্গীত গানগুলোর ভেতর

[১০৩]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৭, ৫৮।
[১০৪]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৩১।

আর আলোরা পান করে যায় আমার দুঃখ ও কারাগারের অন্ধকার
অতএব আসো, আমাদের গল্প এখনো শেষ হয়নি।

এই কবিতার শেষ পঙক্তিগুলো এরকম:

ستموت يوما حين تغنينا الرسوم عن الشجر
وتباع في الأسواق أجنحة البلابل
وأنا سأغرق في الزخام غدا, وأحلم بالمطر
وأحدث السمراء عن طمع السلاسل
وأقول موعدنا القمر![১০৫]

একদিন তুমি মরবে যখন বৃক্ষের ছায়ারা আমাদের গান শোনাবে,
বাজারে বিক্রি হবে বুলবুলিদের ডানা।
আর আমি আগামীতে ডুবে যাবো ভিড়ের ভেতর।
আমি স্বপ্ন দেখি বৃষ্টির
আমি ব্যক্ত করি তামাটে রঙ-শিকল কড়ার।
আমি বলি আমাদের মুখোমুখী সময় এবং চাঁদ।

চাঁদ শব্দটি সাধারণত ইতিবাচক অর্থে প্রয়োগ হয়। আলো, শান্তি, প্রেম, সুন্দর, সত্য ইত্যাদি রূপকার্থ প্রকাশ করে। কিন্তু কবির বড় অভিমান এই শব্দটির প্রতি। এমনকি চাঁদের প্রতি তার বড় ভয়। কবির অভিযোগ, ফিলিস্তিনের রাস্তায় এই চাঁদের আলো, বা সুন্দরের প্রতিফলন অনুপস্থিত, তার কোনো ভূমিকা নাই। তদুপরি চাঁদ পুরো একটা সময়ের অর্থাৎ মাসের অর্ধেক আলো দেয়। প্রথম দিকে তা অল্প অল্প দেয়। তারপর ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে আবার গায়েব হয়ে যায়। অন্ধকার নেমে আসে। অন্যদিকে দিনের অংশে তার কোনো ভূমিকা আছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। ফলে কবি নানা কারণেই চাঁদ শব্দটি আলোর বা সুন্দরের অর্থে গ্রহণ করতে নারাজ। চাঁদ তার কবিতায় প্রায় ক্ষেত্রে জায়োনবাদী হিংস্রতা, কিংবা তার সাধারণ শত্রুর অর্থে এসেছে। ‘খায়িফুম মিনাল ক্বমার’ বা চাঁদে ভীত কবিতায় চাঁদের স্বরূপ আরো স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়–

خبِّئيني. أتى القمر
ليت مرآتنا حجر!
ألفُ سرّ سرّي
وصدركِ عارٍ
وعيونٌ على الشجر
لا تغطّي كواكباً

[১০৫]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৩২, ১৩৩।

ترشح الملح والخدر
خبِّئيني... من القمر! [১০৬]

আমাকে লুকিয়ে রাখো, চাঁদ এসেছে
হায় আমাদের আয়না যদি পাথর হয়ে যেতো।
অযুত রহস্য, আমার ভেদ
আর তোমার উন্মুক্ত বুক
বৃক্ষের চক্ষু
নক্ষত্রে ঢেকে দিওনা
খুঁজে নাও লবন, অন্তপুর
আমাকে লুকিয়ে নাও চাঁদ থেকে।
[১০৭]

নাকবায় খুন, হত্যা, শরণার্থিতা, উচ্ছেদ, ধ্বংসযজ্ঞ সাধারণ চেনা জানা ঘটনা। কিন্তু জীবন ও জীবীকার চিত্র কেমন ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। ৪৮'র যুদ্ধে বেঁচে থাকা মানুষরা যেসব হুমকির মধ্যে সবথেকে বেশি জর্জিত ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল খাদ্য ও জীবিকা ব্যবস্থাপনার সংকটময় কঠিন পরিস্থিতি। মাঝেমধ্যে নানা চুক্তি, রাজনৈতিক আপোস-রফা ও কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়নের ফলে নানান সংস্থার ত্রাণ তৎপরতা ছিল নিসন্দেহে। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেও অনেক সময় লেগে যায়। অর্থনৈতিক দুর্দশার সবথেকে বড় কারণ, ফিলিস্তিনজুড়ে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ইজরাইলের হাতে চলে আসায় বড় দুর্যোগ নেমে আসে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। ফিলিস্তিনীরা জীবন জীবিকার ক্ষেত্র মারাত্মক সংকটে পতিত হয়। ক্ষুধা-দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করে। জায়নবাদী আগ্রাসন, আক্রমণ ও নির্যাতনের সবচেয়ে বড় আঘাত ছিলো তাদের জীবিকার পথগুলো রুদ্ধ করে দেয়া। ফলে হাজারো ফিলিস্তিনীকে তারা কেবল না খাইয়ে হত্যা করে। যদিও আরববিশ্বসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তৎপরতা ছিলো। মাহমুদ দারভীশের কবিতায় সেইসব দুর্যোগের করুণ চিত্র ফুঠে উঠেছে। দারভীশ বলেন,

كان أبي
كعهده محملا متاعبا
يطارد الرغيف أينما مضي
لأجله ... يصارع الثعالبا
و يصنع الأطفال ...

[১০৬]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩৭।
[১০৭]. হোসেন, শাহাদাৎ, *মাহমুদ দারভীশের কবিতাঃ ভাব ও বিষয় অনুষঙ্গ* (আরবী বিভাগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬ ইং), পৃ. ৫৯।

و التراب ...
و الكواكبا...

আমার বাবা ছিলেন
তার সময়ের মতো কষ্টে ধৈর্যশীল
যেখানেই যান রুটির পেছনে দৌড়ান
কারণ তিনি শৃগালদের সাথে যুদ্ধ করেন।
তিনি তৈরি করেন সন্তান...
মাটি
এবং নক্ষত্র।[১০৮]

অতি সহজ ভাষায় সাধারণ কথা বলার মতো বলে গেলেন কবি তার নিজের কথা। কোনো উপমা নেই। ভান-ভনিতা নেই। অলংকারের ঝলক নেই। তাহলে এটি কি কবিতা? সমালোচনার বিচারদণ্ডে এটি কবিতা নাও হতে পারে। কিন্তু কবি লিখিছেন কবিতা। তাহলে এর বিচার, পর্যালোচনা কী করে সম্ভব। এটি বর্ণনামূলক কবিতার একটি উদাহরণ হতে পারে। সমকালীন আধুনিক আরবী সাহিত্যের গদ্যকবিতার ক্ষেত্রে মুক্তছন্দের প্রকরণ অনুযায়ী এটি একটি উত্তম কবিতা। উদ্ধৃতির প্রথম দুই পঙক্তি ওজন বা সমমাত্রার ছন্দে রচিত। পরবর্তী পঙক্তিগুলোতে মাত্রার অভিন্নতা রক্ষা করা হয়নি। قصيدة نثرية বা গদ্য কবিতায় ছন্দগত কাঠামো দু রকেমের। প্রথমত তাতে নির্দিষ্ট ছন্দ প্রকরণ রক্ষা করা হবে। অন্ত্যমিল থাকবে না। দ্বিতীয়ত অন্ত্যমিল গৌণ। কোনো কোনো পঙক্তিতে অন্ত্যমিল তৈরি হয় খুবই স্বাভাবিকভাবে। অন্ত্যমিল হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে এতে ছন্দের মাত্রামুক্ত ও অবারিত। যাতে নির্ধারিত ছন্দের প্রকরণ অনুযায়ী মাত্রার সমতা রক্ষা করা হয় না। নির্দিষ্ট ছন্দের মাত্রাগত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে মাত্রা বিন্যাস করার ফলে এ ধরনের কবিতাকে মুক্তক ছন্দের গদ্য কবিতা বলা হয়। দারভীশের কবিতায় এ ধরনের গদ্য ছন্দের ব্যবহার বিপুল। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের মতোই আরবী কবিতার ছন্দ ও নান্দনিক কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে ইউরোপীয় আধুনিকতার ফলেই।

এটি একটি বক্তব্য প্রধান কবিতা। ফলে বিচারের পদ্ধতি কবিতার প্রকরণগত জায়গা থেকেই হবে। অতি সাধারণভাবে কবি তার ভাব প্রকাশ করেছেন। এখানে কবিতাটি একটি পরিবারের বাবার ভূমিকা নিয়ে রচিত। ফিলিস্তিনী সমাজে ৬০ এর দশকে একজন বাবার যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি জনপদে জীবীকার জন্য সংগ্রামের মহত্ব তুলে ধরেছেন দারভীশ। এখানে সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তার দুঃখ, আবেগ, অভিব্যক্তি যে সহজ-সাবলীল ভানমুক্ত অকৃত্রিম ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন কবি তাদের ভঙ্গিতে কথা বলেন। দারভীশ তার কাব্যভাষা সেখান থেকেই ধারণ করেন। কিন্তু এই প্রকাশ যতোটা সাধারণ ও সহজ ততোটাই গভীর। এভাবেই কর্ম, জীবন, বাস্তুহারা, ক্ষুধা, জীবিকা, বাঁচার লড়াই, আর রক্ত, খুন, হাতকড়া, বুলেট, বোমা ও বুলডোজারের মুখোমুখী হওয়াই তাদের যেনো নিয়তি।

---

১০৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৫।

এর সাথে দারভীশ ইজরাইলের সমস্ত ধ্বংসাত্মক তৎপরতার পাশে জীবিকার সংগ্রাম কতোট করুণ তার স্বরূপও তুলে এনেছেন। সবকিছুর পর তবু জীবন ফিরে ফিরে আসে- মাটিতে, অস্তিত্বে। যেখানে যুথবদ্ধভাবে ইজরাইলের প্রতিরোধ এবং জীবিকার লড়াই একইসাথে চলমান। কবি বলেন,

و يرسم
جسدا مزدحما بالوطن المطحون
في معجزة الخبز
و يرسم
مهرجان الأرض و الإنسان ،
خبزا ساخنا عند الصباح
الأرض رغيفا كانت
كانت الشمس غزالة
كان إبراهيم شعبا في الرغيف
و هو الآن نهائيّ... نهائيّ
تمام السادسة
دمه في خبزه
خبزه في دمه
الآن
تمام السادس[১০৯]

এবং তিনি আঁকলেন
রুটির মোজেজায়
চূর্ণ-বিচূর্ণ দেশটি দিয়ে একটি ঘননিবীড় দেহ
তিনি আঁকলেন
মানুষ ও পৃথিবীর উৎসব
ভোরের গরম রুটি।
পৃথিবী ছিলো একটি টুকরো রুটি
সূর্য ছিলো এক হরীণ
ইবরাহীম ছিলো রুটির ভিভতর স্বয়ং এক জনগোষ্ঠী
আর তিনি এখন শেষ... শেষ
শেষ ছয়তম বছর
তার রক্ত রুটির ভিতর
তার রুটি রক্তের ভিতর
এখন ছয়তম বছরের শিশুও শেষ।

---

[১০৯]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান. আল আ'মাল আল উলা*-২. ২০০৫. পৃ. ২৮১, ২৮২।

১৯৭৭'র দিকে ফিলিস্তিন এবং লেবাননে ভয়াবহ জায়োনবাদী আগ্রাসন চলতে থাকে। ফিলিস্তিনের অধিকৃত ভূমিসহ বিভিন্ন এলাকার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন বন্ধ করে দেয় ইসরাইলী সেনারা। তেমনি এক পরিস্থিতিতে ইবরাহীম মারজুকের জীবনে ঘটে যায় এক হৃদয় বিদারক ঘটনা। ইবরাহীম মারজুক ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। জলরঙে আঁকতেন ফিলিস্তিনকে। অন্তরঙ্গ সাধনায় মারজুক গভীর মমত্ব দিয়ে আঁকতেন ফিলিস্তিনীদের দুঃখ-দুর্দশার জীবন্ত চিত্র। জায়নবাদী অস্ত্র, গোলা, কামান, ট্যাংক আর বুলডোজারের হিংস্র উৎসবে ধবংস বিধ্বংস মানুষ ও মানবতার বিধ্বস্ত জীবনকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরাই ছিলো ইবরাহীম মারজুকের সাধনা ও লড়াই। কিন্ত কোনো এক সকালে যখন পানির লাইন বন্ধ ছিলো তার দুই সন্তান পাঁচ বছরের লাইলাক এবং ছয় বছরের শামস তাকে জাগিয়ে রুটি আর দুধ চেয়েছিল কিন্তু ইজরাইলী সেনাদের তাণ্ডবে দুই শিশুর জীবনই শেষ হয়ে যায়। তাদের রুটি আজীবনের জন্য কেড়ে নিয়েছিল ইজরাইলী হানাদাররা।[১১০] যে অভিব্যক্তি এসেছে জীবনের গভীর মর্মন্তুদ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে, সেই নাকবা-দুর্যোগের গভীর গ্রাস কবির একার নয়। কারণ কবি এখানে তার সময়ের পুরো আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের প্রতীক মাত্র। যাতে সুস্পষ্ট ইংগিত নির্দেশ করে তার সমসাময়িক ফিলিস্তিনের বাস্তবতার। পরের বক্তব্যে এটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি কবিতায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য, আর জীবন জীবিকার সামগ্রিক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে দারভীশ বলেন,

-২

أقول للمذياع ... قل لها أنا بخير
أقول للعصفور
إن صادفتها يا طير
لا تنسني ، و قل : بخير
أنا بخير
أنا بخير
ما زال في عيني بصر!
ما زال في السما قمر!
و ثوبي العتيق ، حتى الآن ، ما اندثر
تمزقت أطرافه
لكنني رتقته... و لم يزل بخير
و صرت شابا جاور العشرين
تصوّريني ... صرت في العشرين
و صرت كالشباب يا أماه
أواجه الحياه

---

[১১০]. আমাল, ড. মুসা, *আল খুবজু আকছারু মিন আল ওয়ারদি* (আল শারক আল আওসাত), ভিজিট: ১৫ অক্টোবর, ২০১৭, الخبز أكثر من الورد (aawsat.com)

و أحمل العبء كما الرجال يحملون
و أشتغل
في مطعم ... و أغسل الصحون
و أصنع القهوة للزبون
و ألصق البسمات فوق وجهي الحزين
ليفرح الزبون

-٧
قد صرت في العشرين
وصرت كالشباب يا أماه
أدخن التبغ ، و أتكي على الجدار
أقول للحلوة : آه
كما يقول الآخرون
يا أخوتي ؛ ما أطيب البنات ،
تصوروا كم مرة هي الحياة
بدونهن ... مرة هي الحياة. "
و قال صاحبي : "هل عندكم رغيف ؟
يا إخوتي ؛ ما قيمة الإنسان
إن نام كل ليلة ... جوعان ؟"
أنا بخير
أنا بخير
عندي رغيف أسمر
و سلة صغيرة من الخضار

-8
سمعت في المذياع
قال الجميع : كلنا بخير
لا أحد حزين ؛
فكيف حال والدي
ألم يزل كعهده ، يحب ذكر الله
و الأبناء .. و التراب .. و الزيتون ؟
و كيف حال إخوتي
هل أصبحوا موظفين ؟
سمعت يوما والدي يقول:
سيصبحون كلهم معلمين...

سمعته يقول
(أجوع حتى أشتري لهم كتاب)
لا أحد في قريتي يفك حرفا في خطاب
و كيف حال أختنا
هل كبرت .. و جاءها خطّاب ؟
و كيف حال جدّتي

ألم تزل كعهدها تقعد عند الباب ؟
تدعو لنا
بالخير ... و الشباب ... و الثواب!
و كيف حال بيتنا
و العتبة الملساء ... و الوجاق ... و الأبواب!
سمعت في المذياع
رسائل المشردين ... للمشردين
جميعهم بخير!
لكنني حزين...
تكاد أن تأكلني الظنون
لم يحمل المذياع عنكم خبرا...
و لو حزين
و لو حزين[১১১]

২-
আমি রেডিওকে বললাম, তাদেরকে বলে দিও আমি ভালো আছি।
চড়ুইকে বললাম,
যদি হে পাখি, তাদের সাথে তোমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়
আমার কথা ভুলে যেওনা, বলে দিও– ভালো আছি
আমি ভালো আছি
আমি ভালো আছি।
চিরকাল দৃষ্টি আমার চোখের ভিতর
চিরকাল চাঁদ থাকে আকাশের ভিতর
এখনো ছড়িয়ে আছে আমার পুরনো কাপড়
টুকরো হয়ে গেছে তার সবগুলো আঁচল।

---

[১১১]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান, আল আ'মালুল উলা-১.২০০৫*। পৃ. ৪৩. ৪৪, ৪৫, ৪৬।

আমি রিপু করে নিয়েছি... তবু সবই ঠিকঠাক
আমি হয়ে উঠলাম বিশ অতিক্রমী এক যুবক
আমাকে কল্পনা করো। আমি হয়ে গেলাম বিশ বছরের।
আমি হয়ে গেলাম যুবকদের মতো, মা!
আমি জীবনের মুখোমুখী হই।
আমি বোঝা বহন করি অন্যদের মতোই
আমি কাজ করি
হোটেলে, থালা-বাসন ধুই।
কাস্টমারের জন্য আমি কফি বানাই,
এবং কাস্টমারের খুশীর জন্য
মলীন চেহারায় একটু হাসি মাখিয়ে রাখি।

৩-
আমি ভালো আছি
আমি হয়ে গেলাম বিশ বছরের
আমি যুবকদের মতো হয়ে গেলাম, মা!
আমি তাম্রকূটের ধোঁয়া ছাড়ি আর চেয়ারে হেলান দিয়ে
অন্যদের মতো মহাসুখে বলি, আ–হা–হা
আরে ভাই, কী সুন্দরী মেয়ে!
চিন্তা করে দেখো তো এদের ছাড়া জীবন কতো তিক্ত
জীবন কতো কষ্টের
কিন্তু আমার বন্ধু বলল, তোমাদের কাছে কি
রুটি আছে?– ভাই মানুষের কী মূল্য?
যদিও সে প্রতি রাতেই ক্ষুধার্ত থাকে
আমি ভালো আছি।
আমার কাছে আছে তাম্র বর্ণের ঝলসানো রুটি
আছে সবজির ছোট্র একটি ঝুড়ি।

৪-
আমি রেডিওতে শুনেছি–
বিতাড়িতদের জন্য বিতাড়নকারীদের অভিনন্দন
তারা বললো, আমরা সবাই ভালো আছি।
কেউ দুঃখী নাই।
তাহলে আমার বাবা কেমন আছেন?

তিনি কি তার সময়মতো আল্লাহর জিকির,
সন্তানাদি, মাটি, আর জলপাইকে ভালোবাসতে পারেন?
কেমন আছেন আমার ভাই
তারা কি সবাই কর্মজীবী
চাকরিজীবী
আমি একদা আমার বাবাকে বলতে শুনেছি–
তারা সবাই শিক্ষক হবে
আমি শুনেছি, তিনি বললেন,
(আমি কিছুই খাইনা যাতে তাদের জন্য বই কিনতে পারি)
আমাদের বোন কেমন আছে?
সে কি বড় হয়ে গেছে। তার কাছে কি বিয়ের কোনো ঘটক এসেছে?
আমার দাদী, নানী কেমন আছেন?
তারা কি স্বভাব মতো দরোজার সামনে বসতে পারেন
তারা আমাদের জন্য দোয়া করেন–
ভালো থাকার, তারুণ্যের, পুণ্যের
আমাদের ঘর,
মসৃণ চৌকাঠ, স্টোভ আর দরোজাগুলো কেমন?
আমি রেডিওতে শুনেছি–
বিতাড়িতদের প্রতি বিতাড়নকারীদের পত্র–
তারা সবাই ভালো!
কিন্তু আমি একজন দুঃখভারাক্রান্ত
বহু চিন্তা যেন আমাকে গ্রাস করে ফেলছে?
জেনে রাখো, রেডিও তোমাদের জন্য রুটি বহন করে না
যদিও দুঃখী হও
যদিও দুঃখী হও।

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে ভঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ফিলিস্তিনীদের একান্ত জীবন জীবিকার স্বরূপ। কয়েকটি পর্বে বিভক্ত মোটামুটি দীর্ঘ এ কবিতাটি একটি মৃদু ব্যাঙ্গ প্রধান কবিতা। জায়োনবাদী দখলদারীত্ব, আগ্রাসন আর শক্তি প্রয়োগে বিতাড়িত আরব ফিলিস্তিনীদের দুঃখ দুদর্শার ব্যাঙ্গচিত্র প্রধান এই কবিতায় সহজকাব্যভঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছে তাদের দুর্যোগময় জীবনের আলেখ্য। এই ব্যাঙ্গ আরো কাব্যময় হয়ে ওঠে নিচের কবিতাংশটিতে–

على الميناء
وقفتُ. وكانت الدنيا عيونَ شتاءْ
وقشر البرتقال لنا. وخلفي كانت الصحراء!

رأيتُكِ في جبال الشوك
راعيةً بلا أغنام
مطارَدةً، وفي الأطلال...
وكنت حديقتي، وأنا غريب الدّار
أدقُّ الباب يا قلبي
على قلبي...
يقوم الباب والشبّاك والإسمنت والأحجار![112]

আমি থেমে আছি।
বন্দরের উপর। আর দুনিয়া ছিলো শীতল চক্ষু।
আমাদের জন্য আছে কমলার ছোবরা।
আর আমার পেছনে আছে মরুভূমি।
আমি তোমাকে দেখেছি কন্টকময় পাহাড়ে
ছাগলহীন এক রাখাল
পর্বতে পর্বতে বিতাড়িত
তুমি ছিলে আমার উদ্যান। আর আমি গৃহহীন এক প্রবাসী
হায় হৃদয়! দরোজায় টোকা দেই
আর আমার হৃদয়ের সামনে..
দাঁড়িয়ে থাকে দরোজা, জানালা, সিমেন্ট, পাথর!

২.৯: নাকবা: উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতি

ব্রিটিশ শাসন শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফিলিস্তিনে নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়। ব্যাপক হলোকাস্টের মধ্য দিয়ে কায়েম হয় ইজরাইলি রাষ্ট্র। এটা এমন একটা নতুন পরিস্থিতি যাতে একদিকে ব্রিটিশ শাসন পরিবর্তী জায়োনিস্ট দখলদারিত্ব কায়েমের মাধ্যমে ইজরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরদিকে ইজরাইলি সহিংসতার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের অব্যাহত প্রতিরোধের ফলে ফিলিস্তিনের জাতি হয়ে ওঠার লড়াই। যেখানে সরলভাবে বলে দেয়া সম্ভব নয় যে, ব্রিটিশদের পরে পুনরায় ফিলিস্তিন ইজরাইল কর্তৃক একটি উপনিবেশিত দেশ। কিংবা উপনিবেশের ধারাবাহিকতা। একইভাবে দখল করে, গণহত্যা চালিয়ে জায়োনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে ফিলিস্তিনকে ইজরাইলী রাষ্ট্রও বলা যায় না। যেহেতু ফিলিস্তিন এখনো একটি বিশেষ সীমানা এবং জনগোষ্ঠী নিয়ে জাতিগতভাবে রাষ্ট্র হয়ে ওঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। মোটকথা ১৯৪৮ পরবর্তী পরিস্থিতিতে একটি দ্বৈতাবস্থা সৃষ্টি হয় ফিলিস্তিনে। এ অবস্থায় ফিলিস্তিনে যেমন উপনিবেশিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। যেখানে ব্রিটিশ থেকে জায়োনিস্টদের কাছে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে মাত্র। তেমনি একটি উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতিও

[১১২]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৮৯, ৯০।

এখানে সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উপনিবেশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং ব্রিটিশ শাসন অবসান হওয়ার পর ফিলিস্তিনীরা স্বাধীনতা লাভ না করলেও সাধারণত স্বাধীনতা পরবর্তী যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তেমনি একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে সাবেক উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোর সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ সামগ্রিক ব্যবস্থায় নেতিবাচক অবস্থার উদ্ভব হয়। সাধারণভাবে এ অবস্থাকেই বলা হয় উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতি। মূলত উপনিবেশায়নের ফলে এসব নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি হয়। যাতে সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা, কবিতা-সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য ও অর্থব্যবস্থা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়। উত্তর-উপনিবেশিক পাঠ এ অবস্থার ব্যবহারিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আগ্রহী। ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ঘটে। তবে ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে যেমন ফিলিস্তিন একইসময়ে নাকবা-উত্তর অবস্থার মুখোমুখী হয় তেমনি উপনিবেশ-উত্তর পরিস্থিতিও সামনে চলে আসে। ফলে যেখানে নাকবা-উত্তর এবং উপনিবেশ-উত্তর পরিস্থিতি একই অর্থে একইসময়ে ফিলিস্তিনের সামনে উপস্থিত হয়। এমন বিবদমান দ্বান্দ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ফিলিস্তিন মূলত দুটো অবস্থার মুখোমুখি। একদিকে জায়োনিস্ট উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া অপরদিকে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রভাব। এসব আলোচনা এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, মাহমুদ দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় থেকে শুরু করে বৃহত্তর অর্থে ফিলিস্তিনী জনগণের মুক্তির সংগ্রাম এবং প্রতিরোধ সম্পর্কিত আলোচনার কোনো বিশেষ অর্থ তৈরি হয়না।

উপনিবেশ কায়েম হওয়ার ফলে একটি উপনিবেশিত সমাজে আগে থেকে চলে আসা সামগ্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পুরোপুরি বদলে যায়। ঐতিহাসিকভাবে উসমানি খেলাফতের অবসান হওয়ার পর আরব তথা ফিলিস্তিনের সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রশাসনের পুরনো কাঠামো ও ব্যবস্থারও তেমনি রূপান্তর ঘটে। নতুন করে পরিগঠন হয় পুরো ব্যবস্থার। ফলে নতুন করে যেমন শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যবস্থার নয়া প্রবর্তন হয় তেমনি সমাজে সেই প্রবর্তিত কিংবা আরোপিত আধুনিক ব্যবস্থায় দিক্ষীত নতুন শ্রেণিও গড়ে ওঠে। আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সনে ব্রিটিশ উপনিবেশিক প্রভুর প্রস্থান ঘটলেও তাদের প্রবর্তিত এবং প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থার প্রস্থান ঘটেনি। বদল ঘটেনি ঔপনিবেশিক সময়ে তাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা নতুন শ্রেণি কিংবা আধিপত্যপরায়ণ শ্রেণির। ফলে দৃশ্যত উপনিবেশমুক্ত হলেও সেই উপনিবেশিত সমাজ ও রাষ্ট্র যে অবস্থায় এগিয়ে আসে তার নেতৃত্বের ভার যারা তুলে নেয় তারা নতুন কোনো ব্যবস্থা তৈরি করেনি। পুরনো ব্যবস্থাকেই তারা আমূল গ্রহণ করে নেয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুদের দেয়া প্রাক্তন ব্যবস্থাকেই তারা নিমিত্ত হিসেবে ধারণ করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, যেন উপনিবেশিক প্রভুর প্রতিনিধিত্বের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে তার অনুপস্থিতিতে।

উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ব্রিটিশ শাসনামলে। ঐতিহাসিক বাস্তবতা সত্ত্বেও মূলত উপনিবেশায়নের বাস্তবতা অনেক আগেই তৈরি হয়েছে। পোস্ট-কলোনিয়াল তাত্ত্বিকরা মনে করেন,

উপনিবেশায়ন কিংবা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার শর্ত শিল্প-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। তবে ব্রিটিশ উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার সমস্ত উপায় ও ক্ষেত্র যেমন আগেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তেমনি নাকবা পরবর্তী পরিস্থিতিতে নতুন করে জায়োনিস্ট উপনিবেশায়নের মুখোমুখি হয় ফিলিস্তিনীরা। ব্রিটিশ শাসনের সময় সরাসরি যেসব পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে অন্যতম ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-বিচার ও প্রশাসনিক কাঠামো। উপনিবেশোত্তর পরিস্থিতি, নাকবা এবং জায়োনিস্ট সহিংস দখলদারিত্ব–সব মিলিয়ে এসব ক্ষেত্র আরো জটিল হয়ে ওঠে ফিলিস্তিনে। বিশেষত ভূমি, আইন-বিচার ও শিক্ষাব্যবস্থায় জায়োনিস্ট আগ্রাসন ভয়াবহ হয়ে ওঠে।[১১৩] মোটকথা ব্রিটিশ শাসনে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনে ইজরাইলী উপনিবেশায়নের নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রবলতর সহিংস আগ্রাসনের মাধ্যমে সেটলার কলোনাইজেশন জায়োনিস্ট উপনিবেশায়নের প্রত্যক্ষচিত্র। তবে ভাষা ও সাহিত্যেও প্রবলভাবে পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক সাহিত্য যদিও অনেক আগেই আরব জগতে গড়ে ওঠে। তবে ঔপনিবেশিক কালে আধুনিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশে নতুন ধরনের পরিবর্তন ঘটে। উপনিবেশ বিরোধী সাহিত্য এবং প্রতিরোধমূলক রাজনৈতিক ('শি'রুল মোকাওয়ামাহ) কবিতার উন্মেষ ঘটে। নাকবা-উত্তর সাহিত্যে এ ধারা ফিলিস্তিনে কর্তৃত্বশীল হয়ে ওঠে। এই ধারা একদিকে উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয় একইসাথে এটি প্রতিরোধের সাহিত্যিক ভাষ্যও গড়ে তোলে।

২.১০: নাকবাঃ নতুন সম্ভাবনা এবং বেরিয়ে আসার প্রেক্ষিত

ধ্বংস, গণহত্যা, বিপর্যয়, নির্বাসন, দখলদারিত্ব, শরণার্থিতা ইত্যাদি নাকবার সাধারণ এবং প্রত্যক্ষ দিক। অর্থাৎ নাকবা শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে একটি বিপর্যয়ের চিত্র ভেসে ওঠে। কিন্তু নাকবা ফিলিস্তিনীদের জীবনে এমন অর্থ নিয়ে সবসময় হাজির হয়নি। অন্যভাবে হাজির হয়েছে। একদম উল্টোভাবে নাকবার অর্থ তৈরি হয়েছে ফিলিস্তিনীদের জীবনে। নাকবার মানে ধ্বংস– এটি শত্রুপক্ষের একটি তৈরি করা ঐতিহাসিক ঘটনামাত্র। কিন্তু এর বিপরীতেই রয়েছে নাকবার শক্তি। নাকবায় যে দুর্দশার চিত্র আমাদের দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে ঠিক তার গভীরে রয়েছে একই দুর্দশা ও বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসার শক্তি ও সামর্থ। এই বিপর্যয়, সংকট ও দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে মুক্তি ও স্বাধীনতার বীজতলা। রয়েছে শক্তি ও সাহসের অপার রহস্য। এই ইতিবাচক সত্যই বস্তুত নাকবা নিয়ে এতো আলোচনা, বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব-চিন্তার গূঢ় রহস্য। যেকারণে ফিলিস্তিনের নিজের স্বাধীন কক্ষপথে ফিরে আসার মূল পটভূমি হয়ে ওঠে নাকবা। একটি জনগোষ্ঠীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার নাম নাকবা নয়, কিংবা প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়ার দশায় পতিত হওয়ার নাম নাকবা নয়, বরং দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অবস্থা থেকে মুক্তি এবং বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, বেদখল এবং অবরুদ্ধ ভূমির পুনরুদ্ধার ও প্রতিরোধের পরম আকাঙ্ক্ষা ও চৈতন্য যে পরিস্থিতি ধারণ করে আছে তার নামই নাকবা। ফিলিস্তিনী জাতির সার্বিক সংকট থেকে উত্তরণের শক্তি, স্বাধীনতা এবং লড়াই গভীরভাবে নিহিত আছে নাকবার

[১১৩]. মাক্কাবী, ইবরাহীম, *টিচিং কলোনিয়াল হিস্ট্রি এন্ড ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ডেভেলপমেন্ট আমঙ প্যালেস্টাইনিয়ান স্টুডেন্টস ইন ইজরায়েল: রেসিসটিং কলোনাইজেশন থ্রো স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিজম* (ক্ল্যাকসো, আর্জেন্টিনা: ল্যাটিন আমেরিকান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সাইন্স, ২০১৭ ইং), পৃ. ৮-২০।

ভিতর।[১১৪] যেকারণে নাকবা ফিলিস্তিনের মুক্তির সম্ভাবনার এখন পর্যন্ত সর্বজনীন একটি দার্শনিক অভিমুখ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পূর্বের আলোচনায় নাকবার সত্যাসত্য ও দার্শনিকতা তুলে ধরা হয়েছে। একইসাথে ফিলিস্তিনীদের দুঃখ, দুর্দশার চিত্রগুলো তুলে ধরা হয়েছে। কারণ দুর্যোগ এবং বিপর্যয় থেকে তারা নতুন দৃষ্টি খুঁজে পায়। নাকবার ঘটনায় অমানবিক নির্মম পরিস্থিতির ভিতর থেকেই তারা দাঁড়াবার চেষ্টা করে। বিপর্যয় রোধ করে তারা জীবনের নতুন পথ সন্ধান করে। নাকবার ভীতিকর ও অমানবিক অবস্থাই তাদের ভিতর সাহসের সঞ্চার করে। ফলে দৃশ্যত কবি দারভীশ তার সময় ও বাস্তবতাকে যেমন কাব্যময় রূপ দিয়েছেন তেমনি কবি দুর্যোগকবলিত নিপীড়িত মানুষের ভিতর হানাদার শত্রুবিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভকে বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্যাপক অর্থে পরিগঠন করারও চেষ্টা করেন। কারণ দারভীশের কাছে কবিতা, ভাষা, তার জীবন ও অস্তিত্বের মৌলিক অংশ। কবিতা নিছক কোনো নান্দনিক বা বিনোদনের বিষয় ছিলোনা তার কাছে। এমনকি দারভীশ কবিতা ও ভাষাকে প্রচারসর্বস্ব করে দেখাকে পুরোপুরি নাকচ করে দেন।[১১৫] কবিতা, ভাষা ও জীবন অবিচ্ছেদ্য। কবিতায়, ভাষায় মানুষ তার সম্ভাবনা তৈরি করে। কবিতা এবং ভাষা মানুষের অনাগত কাল নির্মাণের তাৎপর্যপূর্ণ চাষভূমি। নতুন সম্ভাবনা, নতুন সময়, নতুন অর্থ, নতুন ধারণা বহন করে ভাষা ও কবিতা। ফলে কবিতা নিছক আর কবিতা থাকে না দারভীশের কাছে। জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। মানুষ লড়াই করে অধিকার আদায়ের জন্য। কবিতাও তেমনি সমান তালে লড়াই করে। দারভীশ তার জীবন্ত উদাহরণ। নাকবার শুরুর দিনগুলোতে তার কবিতা মানুষের মাঝে সাহস আর আশাবাদ জাড়িয়ে তোলে। সাহস, আশাবাদ, ক্ষোভ, দ্রোহ, প্রেম ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান পায় তার কবিতায়। বিপদসংকুল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফিলিস্তিনের মানুষ যখন সহায় হারিয়ে ফেলেছিলো– জীবনে নেমে এসেছিল হতাশা। যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেই নিজের জীবন বাঁচার পথ খুঁজে পায়না– এমন পরিস্থিতিতে কবি আশাবাদ ছড়িয়ে দেবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় ব্রত হলেন। মানুষের মাঝে ঘুরে দাঁড়াবার হিম্মত জাগিয়ে তুললেন। নাকবার দুঃসহ দগদগে স্মৃতির মাঝে মুক্তি ও স্বাধীনতার অঙ্গিকার সৃষ্টির অসম্ভব লড়াইয়ে মানুষকে তীব্রভাবে প্ররোচিত করেছিলেন দারভীশ। জীবন ও সম্ভাবনার জন্য এটিই ছিলো তার মুখ্য– যখন ইজরাইলী আগ্রাসনে চারদিকে অসংখ্য ফিলিস্তিনী গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। খুন হচ্ছিল, কেউ ভাই হারাচ্ছিল, কারো বাবা চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। কারো কলিজার টুকরো মায়ের লাশ গলছিল দেয়ালের কাছে। কারো প্রিয়তম বোনের লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে জলপাইয়ের নিচে। মানুষের জীবন আর মৃত্যুর এমন পরিস্থিতির মধ্যে নতুন করে আশার কথা মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। মানুষ তার ভাষা হারিয়ে বাক রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। শোকে ক্ষোভে নির্বাক সবাই। কবি দারভীশ তখন মাত্র আঠারো-বিশ বছর বয়সের। এই দৃশ্য দেখে কাউকে শান্ত্বনা দেয়া কঠিন। কারণ সবাই একই সমস্যার মধ্যে। বিশ বছর বয়সের দারভীশ তখন সমবেদনা, সাহস আর জেগে ওঠার বাণী নিয়ে আসেন। শোকে,

---

[১১৪]. রাশিদ, ড. ফায়েজ, *খামছুনা আমান আল নাকবাহ* (দামিশক: ইত্তিহাদু কুত্তাব আল আরাব, ১৯৯৯ ইং), পৃ. ১-৮০।

[১১৫]. আল আসতাহ, ড. আদিল, *লাও আন্না আল আনবিয়া আকল্লু ইলহাহা: ওয়াকাফাহ মাআ মাহমুদ দারভীশ ফী জিদারিয়্যাতিহি* (আখাবিয়্যাহ/أخوية), ভিজিট: এপ্রিল ১০, ২০০৫। http://www.akhawia.net/archive/index.php/t-111432.html

বেদনায় নিস্তব্ধ, বোবা, বধির এই মেঘ-বৃষ্টিহীন অনুর্বর মৃত্তিকায় কবি যাদেরকে কবর দিলেন কবি বলেন আমি তাদেরকে কবর দিইনি। আমি তাতে পুঁতে দিয়েছি ভবিষ্যতের বীজ, নতুন শস্য, নতুন ভ্রূণ। এই বিধ্বস্ত অনুর্বর মাটিতে চাষ করে তুলে আনা ফসল দিয়ে আবার আমরা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলবো। আমাদের এই চাষাবাদ অনন্ত– সর্বজনীন। কবি বলেন,

فاحموا سنابلكم من الإعصار
بالصدر المسَمَّرْ
هاتوا السياج من الصدور...
من الصدور، فكيف يكسرْ؟؟
النار تلتهم الحقول الضارعات
وأنت تسهر!
اقبض على عنق السنابل
مثلما عانقتَ خنجرْ!
الأرض، والفلاح، والإصرار،[১১৬]

রোদে পোড়া তামাটে বুক দিয়ে
রক্ষা করো তোমাদের শীষগুলো
গড়ে তোলো বুক থেকে বুকের প্রাচীর
আঁকড়ে ধরো শীষগুলোর গ্রীবা
যেমন তুমি গলাগলী করো খঞ্জরে
জমিনে, কৃষকে, দ্রোহে।

কিংবা,

هكذا متّ واقفا
واقفا متّ كالشجر!
هكذا يصبح الصليب
منبرا.. أو عصا نغم
و مسامیره.. وتر!
هكذا ينزل المطر
هكذا يكبر الشجر[১১৭]

এভাবেই আমি মৃত্যুবরণ করেছি দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে আমি মৃত্যু বরণ করেছি বৃক্ষের মতো

---

১১৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৯।
১১৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৬. ৯৭।

এভাবেই ক্রুশ হয়ে যায়
মিম্বর–মঞ্চ কিংবা সুরের লাঠি
নিঃসঙ্গ... পেরেক
এভাবেই বৃষ্টি পড়ে
এভাবেই বাড়ে বৃক্ষ।

অতিসাধারণ ও সহজ মানুষের জীবনের সাথে মিশে আছে কৃষি। তার সাথে গমের শীষ, তামাটে বুক, খঞ্জর এইসব কৃষকের চিত্রকল্প গণমানুষের জীবনঘনিষ্ট আবেগ ও অনুভবে নাড়া দেয় নিবিড়ভাবে। একইসাথে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতীকী আচার ক্রুশকে কবিতার অনুষঙ্গ করে কবি তার নতুন কাব্যকাঠামো নির্মাণ করেন। কবিতাকে এমনভাবে গণমানুষের কাছে নিয়ে আসলেন দারভীশ যেখানে মানুষ, জীবন ও কবিতা অভিন্ন হয়ে ওঠে। কবিতা এমন হয়ে উঠেছিল যাতে শ্রমিক ও খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষের প্রতি কবির প্রাচীর গড়ে তোলার আহবানের সাথে সাহস, সম্ভাবনা আর দ্রোহের তীব্র উত্তাপ অপ্রতিরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আধুনিক কাব্যের গতিশীল মাত্রায় লেখা কবিতার পঙক্তিগুলোতে দারভীশের দ্রোহ যেমন টগবগে উপচে পড়েছে তেমনি তার প্রেমবোধের উপস্থিতি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ তিনি ঘৃণার বিপরীতে মানুষকে ভালোবাসেন। এখানে মানুষ বলতে ইহুদীদের বুঝিয়েছেন কবি। জনৈক ইজরাইলী তলবকারী পুলিশের কবির পরিচয়পত্র চেক করার ঘটনাকে কেন্দ্রকরে পরিচয়পত্র কবিতা লিখেছিলেন কবি– যে কবিতা পুরো বিশ্বের বিবেকতাড়িত মানুষকে মুহূর্তে নাড়া দিয়েছিল। দারভীশ ইজরাইলের মানুষমাত্রই তার শত্রু– কখনো এমন মনে করতেন না। ইজরাইলী, ইহুদী, জায়োনবাদ– এই শব্দগুলোর মধ্যে ফারাক বজায় রেখেই কবি তার প্রেম ও মানবিক অবস্থান ধারণ করেন। দারভীশের দ্রোহ বিভিন্ন অবস্থায় নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রকাশ হওয়ায় দ্রোহ বিষয়ক কবিতার প্রবলতর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেনি তার অন্যান্য বিষয়ের তুলনায়। কারণ দ্রোহের প্রসঙ্গ ক্ষোভ, আক্ষেপ, প্রতিরোধ, রাজনীতি এমনকি কখনো কখনো প্রেমের অনুষঙ্গ হয়ে নানা কবিতায় বিচিত্ররূপে হাজির হয়েছে। তবে সমসাময়িক কবিদের সাথে তুলনামূলক জায়গায় দারভীশের দ্রোহভাব ও শিল্পমণ্ডিত কাব্যভাষার বিচার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। দারভীশের চিন্তায় নাকবা ফিলিস্তিনের নতুন সম্ভাবনাকে উপস্থিত করেছে নানান উপমা ও রূপকের মাধুর্যে। তার রূপক আর চিত্রকল্প দেশ, মাটি, প্রকৃতি, প্রেম, মানুষ ও সময়। কারণ দারভীশের চিন্তার অভিমুখ- কষ্ট, যন্ত্রণা, দুঃখ-দুর্দশা, বিতাড়ন-নির্বাসন, কারাগার, বন্দিত্ব, হত্যা, খুন আর ধ্বংসযজ্ঞ নয় বরং কবি এসব কিছুর অনিবার্যতার মধ্যে অস্তিত্বমান করেন তার সমগ্র সত্তাকে– ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের জনগণ। এই অস্তিত্বমানতাই নতুন অভিমুখ তৈরির পূর্বশর্ত হয়ে আসে তার কবিতায়। কবির প্রেম, মগ্নতা, লিপ্ততা, সম্পর্ক, লড়াই-সংগ্রাম তাই আবর্তিত হয় মাটির ভিতরে, ভূমিতে, প্রকৃতিতে। এই ভূমিই ফিলিস্তিনের জাতীয় পরিচয়ের রূপক– স্বাধীনতা– মুক্তি ও নয়া ভবিষ্যৎ। দারভীশের কবিতায় ‘ভূমি’জাতীয় শব্দের ব্যবহার অত্যাধিক। যেমন- ভূমি অর্থে– পৃথিবী, মাটি, কাদামাটি, নরম মাটি, বালু, পাহাড়, নুড়ি পাথর, শিলাখণ্ড, পাথর, পর্বত, টিলা, উঁচুভূমি, ঢিবি, শৃঙ্গ-চূড়া, স্থল ভূমি, জঙ্গল, শীর্ষ-শিখর, শুকনো জায়গা, শুষ্ক

মৃত্তিকা ইত্যাদি।[১১৮] বারবার শব্দগুলোর ব্যবহার ছিলো অপরিহার্য। কারণ দারভীশের রক্ত, মাংস ও জীবনের সবকিছুতে একাকারভাবে মিশে গেছে তার দেশ। ধবংসযজ্ঞ, বিপন্ন মানবতা, গৃহহীনতা, দুঃখ, দুর্দশার চিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একই দৃশ্য তাকে দেখে যেতে হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে থাকায় কবির চিন্তা, তৎপরতা, কবিতা ও ভাষায় একই ভাব, একই চিত্রকল্প একই শব্দের পৌনপুনিক ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ ফিলিস্তিনীদের লড়াই সংগ্রাম আর জীবনযাত্রা প্রতিমুহূর্তে একই পরিস্তিতির মধ্যে বিদ্যমান। কবি এই বিদ্যমান সমাজ, ইতিহাস ও সমকালীনতার বাইরে যেতে পারেননা। তার ভাষা ও অস্তিত্ব এখানেই পরিগঠিত। কিন্তু এই পৌনপুনিকতা আরোপিত নয়। কবিতার নান্দনিক কাঠামোকে তা ক্ষুণ্ন করেনি। সীমাবদ্ধ করে দেয়নি তার শিল্প ও জীবনসৌন্দর্য। বরং এ পৌনপুনিকতার অপরিহার্যতা, ভাব, ও ভাষা গণমানুষের সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে নতুন অর্থ ও নতুন তাৎপর্যের দ্বার উন্মোচন করে। শিল্পী হিসাবে এখান থেকেই দারভীশের বিচার অগ্রসর হবে আশা করি। দুর্যোগের ভিতর থেকে আরো যে বিষয়গুলো উঠে আসে– তার মধ্যে প্রতিরোধ, প্রেম, প্রকৃতি, ধর্ম, আলকুদুস, তাওরাত অন্যতম। স্থির বা চর্চিত ইতিহাসের সীমাকে অতিক্রম করে কবি প্রাচীন ফিলিস্তিনের নবী, আসমানী কিতাব ও পবিত্র স্থান আলকুদুসকে জীবন ও অস্তিত্বের জায়গায় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের অনিবার্য উপজীব্য করে তোলেন। এই পঙক্তিগুলোর সাথে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক...

فيا وطن الأنبياء...تكامل!
ويا وطن الزارعين .. تكاملْ!
ويا وطن الشهداء.. . تكامل!
ويا وطن الضائعين .. تكامل!
فكلّ شعاب الجبال امتدادٌ لهذا النشيد.
وكلّ الأناشيد فيك امتدادٌ لزيتونة زمّلتني[১১৯]

হে নবীদের দেশ...পূর্ণ হও
কৃষকের দেশ...পূর্ণ হও
শহীদের দেশ...পূর্ণ হও
হারানোদের দেশ...পূর্ণ হও
অতএব পাহাড়ের শাখারা এই সংগীতেরই বিস্তার
এবং তোমার ভিতরের প্রতিটি সংগীতে
আমার আবরণকারী জলপাইয়ের প্রসার।

أيّها الذاهبون إلى صخرة القدس
مرّوا على جسدي
أيّها العابرون على جسدي

[১১৮]. ফুয়াদ, মুহাম্মদ দীব আল সুলতান, *সূরাতু নাকবাতি ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ* (), পৃ. ১৭৩।
[১১৯]. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৯৫.

لن تمرّوا
أنا الأرضُ في جسدٍ
لن تمرّوا
أنا الأرض في صحوها
لن تمرّوا
أنا الأرض. يا أيّها العابرون على الأرض في صحوها
لن تمرّوا
لن تمرّوا
لن تمرّوا![১২০]

আল কুদুসের শিলাদেশে গমনকারীরা
চলে যাও আমার দেহের উপর দিয়ে
আমার দেহের উপর যাতায়াতকারীরা
অতিক্রম করো না
দেহের ভিতর তো আমিই ভূমি
চৈতন্যের ভিতর তো আমিই ভূমি
অতিক্রম করো না
চৈতন্যের ভিতরের ভূমির উপর পারাপারকারীরা জেনে রাখো আমিই ভূমি
কক্ষনো অতিক্রম করোনা
কক্ষনো অতিক্রম করো না
কক্ষনো অতিক্রম করো না।

দারভীশ তার এসব কবিতায় ফিলিস্তিনের পতিত দশা থেকে বেরিয়ে আসার মূলমন্ত্র রচনা করেন। অভূতপূর্ব এক ভাষাভঙ্গি নির্মাণের মধ্যদিয়ে দারভীশ ফিলিস্তিনের জন্য নতুন এক অর্থের সঞ্চার করেন। পুরো ফিলিস্তিনকে নতুন এক জন্মের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। দারভীশের কবিতা পাঠ করার পর মনে হয় যেন ফিলিস্তিন সত্যি এক নয়া জন্মের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। বিদ্যমান বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে ফিলিস্তিনকে নতুন এক অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের তৈয়ার করার বিস্তৃত আহবানের আকরিক চিহ্ন অঙ্কন করে রাখলেন কবি দারভীশ। যেখানে নাকবা শুধু কবিতা কিংবা সাহিত্যের বিষয় নয়, ফিলিস্তিনের সামগ্রিক অভিমুখ সৃষ্টির এক সাংস্কৃতিক প্রবাহও বটে। ১৯৪৮-পরবর্তী ফিলিস্তিনের সীমানায় যে আনারব এবং ভিন্ন এক জাতির অনুপ্রবেশ ও দখলদারিত্ব কায়েম হয় এবং তার প্রবল পরাক্রম কর্তৃত্বপরায়ণ উপস্থিতি শুধু ফিলিস্তিনের ইস্যু হয়ে থাকেনি একইসাথে তা আরব জনগণের জন্য চূড়ান্ত উদ্বেগেরও প্রশ্ন। ফলে ফিলিস্তিনের স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতি হয়ে ওঠার প্রশ্ন এবং আরবদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানও এক এবং অভিন্ন। কাজে নাকবা-উত্তর সামগ্রিক পরিস্থিতি কথাটির অর্থ মাত্রই একটি ঐতিহাসিক কর্তব্য গড়ে

১২০. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯৯।

তোলারও প্রশ্ন; যা জায়োনিস্ট ইজরাইলের বিপরীতে আরবদের স্বার্থকেও সমান্তরাল জায়গায় নিয়ে আসে। সেজন্য ১৯৪৮ এর পরের পরিবর্তিত অবস্থায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বৃহত্তর আরবদের সামনে যে ঐতিহাসিক শর্ত ও দাবি তৈরি হয় তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে সাঈদের পর্যবেক্ষণ বেশ প্রণিধানযোগ্য। সাঈদ বলেন,

> To say that 1948 made an extraordinary cultural and historical demand on the Arab is to be guilty of the crassest understatement. The year and the processes which it culminated represent an explosion whose effects continue to fall unrelentingly into the present.[১২১]

বলা যায়, আরবদের উপর ১৯৪৮ যে অস্বাভাবিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক চাহিদা তৈরি করেছিল তা হলো চরম অবমূল্যায়নজনিত অপরাধবোধ। ৪৮ এবং তার প্রক্রিয়াগুলো যে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তা মূলত এমন এক ব্যাপকতরো বিস্ফোরণের জন্ম দেয় যার প্রভাব বর্তমানে অবিরামভাবে অব্যাহত রয়েছে।

---

[১২১]. ডব্লিউ সাঈদ, এডওয়ার্ড, *রিফ্লেকশনস অন অ্যাক্সাইল এন্ড আদার এসেইস*, ২০০২, পৃ. ৪৬।

তৃতীয় অধ্যায়
ফিলিস্তিন, জাতীয় পরিচয়, কর্তাসত্তা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

জাতিয়তার উত্থান ফিলিস্তিনে গত শতকের সূচনায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। উসমানি শাসনের শেষলগ্নে এর উন্মেষ ঘটতে শুরু করে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে ফিলিস্তিনীদের জাতীয় জাগরণের ঘটনা তীব্রতরো হয়ে ওঠে উপনিবেশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। প্রায় একইসময়ে পুরো আরব-অঞ্চলে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল তার উত্তাপও ফিলিস্তিনীদের যথেষ্ট প্ররোচিত করেছিল নিসন্দেহে। এসব আন্দোলন জাতীয়তাবাদের ধারায় একসময় জায়োনিস্ট ইহুদীদের বিরুদ্ধেও সংঘটিত হতে শুরু করে। ফলে ১৯৪৮ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধের কারণেই ফিলিস্তিনীদের জাতীয়তাবাদী উত্থান ঘটেছে বিষয়টি আদৌ এতো সরল নয়। ইতিহাসের নানা পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিস্তিনীদের জাতীয় চেতনার পটভূমি তৈরি হয়েছে। যাতে তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার ঐতিহাসিকতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ৪৮’র যুদ্ধে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করার মাধ্যমে যে ইজরাইল রাষ্ট্রের পত্তন ঘটেছে তাতে ফিলিস্তিনের জাতীয়তা কিংবা জাতীয়তাবাদী চেতনা একটি রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়াকে অপরিহার্য করে তোলে। ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় তাদের জনগণ ও নেতৃত্বের লড়াই সংগ্রামের ঐতিহাসিকতা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাদের স্থপতি হিসেবে মৌলিক অংশগ্রহণ রয়েছে তাদের মধ্যে একজন মাহমুদ দারভীশ। নিছক কবি পরিচয়ের কারণে দারভীশের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ঘটেনি বরং দীর্ঘতরো প্রতিরোধ-লড়াই সংগ্রামে প্রথমসারির একজন ছিলেন দারভীশ। এমনকি নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক সততা, সাহস এবং প্রজ্ঞার কারণে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দলিল এবং ঘোষণাপত্র প্রণয়নও করেন দারভীশ। যেকারণে ফিলিস্তিনের অগ্রণী নেতৃত্বের একজন হয়ে ওঠেন দারভীশ। পিএলও’র নির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়ায় নীতি-নির্ধারণী পর্যায়েরও একজন ছিলেন তিনি। কিন্তু কাঠামোগত রাজনৈতিক ধারায় সম্পৃক্ত ছিলেন বলেই তিনি ফিলিস্তিনের অন্যতম স্থপতি হয়ে উঠেছেন এমন নয়, বরং ৪৮’র নাকবা থেকে শুরু করে জীবনের শেষমুহূর্ত অবধি ফিলিস্তিনী জনগণের মাঝে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তোলা এবং ফিলিস্তিনকে নিজের সার্বভৌম স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াগুলোতে নিরলস অংশগ্রহণ তাকে একটি মৌলিক স্তরে নিয়ে যায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বাধীনতা কিংবা মুক্তি যাই বলা হোক না কেন তার জন্য জরুরি ব্যক্তির উত্থান। অন্য কথায় বলা যায়, ব্যক্তি এবং সামষ্টিক এজেন্সি ও কর্তাসত্তা গড়ে তোলা। নাকবার মধ্যদিয়ে এমন একটি আকাঙ্ক্ষা বস্তুত পুরো ফিলিস্তিনজুড়ে প্রবাহিত হয়েছিল। দারভীশের কবিতায় আত্মপরিচয় নানান দিক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে ভাষা অপরদিকে ঐতিহাসিকতা। এই দুই অবস্থার মধ্যে দারভীশ ফিলিস্তিন কিংবা ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর স্বাধীন কর্তৃত্ববোধ ও আমিত্ব প্রতিষ্ঠার

অনিবার্যতা সৃষ্টি করেন। ইজরাইল, জায়োনিজম কিংবা তার উপনিবেশিক ও দখলদার প্রক্রিয়াগুলোর বিপরীতে ফিলিস্তিনের স্বাধীন উপস্থিতির জন্য দারভীশের এ অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১: ব্যক্তি জাতিয়তা ও সমষ্টির এজেন্সি নির্মাণ
৩.২: 'আমি, 'অপর' এবং আত্মপরিচয়
৩.৩: ভাষা এবং আত্মপরিচয়
৩.৪: নাম, পরিচয়, ভাষা এবং পরমার্থিকতা

আত্মপরিচয়: ইতিহাস ও উত্তর-উপনিবেশিক প্রেক্ষিত
৩.২.১: জাতীয় আত্মপরিচয়
৩.২.২: উপহাস কিংবা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গি
৩.২.৩: একইসাথে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক হুমকি (ডেমোগ্রাফিক্যাল থ্রেট)
৩.২.৪: স্বাধীন সত্তার উপস্থাপন
৩.২.৫: সাধারণ জনমানুষের জীবন যাপনের বয়ান
৩.২.৬: শ্রমিকতা
৩.২.৭: দ্রোহ

আত্মপরিচয়: প্রেক্ষিত, ঐতিহাসিকতা ও ঐতিহাসিক কর্তাসত্তা
৩.৩.১: আত্মপরিচয়: স্থিতি এবং ক্রমবিকাশ
৩.৩.২: আত্মপরিচয়: আরবীয় সত্তা এবং আরব জাতীয়তাবাদ

আত্মপরিচয়: ফিলিস্তিন, মাতৃভূমি, জীবন ও অস্তিত্বের প্রশ্ন
৩.৪.১: নির্যাতন-জুলুম
৩.৪.২: দু:খ-ব্যথা (ট্রমা)
৩.৪.৩: জীবন জীবিকা
৩.৪.৪: দেশপ্রেম
৩.৪.৫: মানবিক প্রকৃতি
৩.৪.৬: নারী

৩.১: ব্যক্তি, জাতিয়তা ও সমষ্টির এজেন্সি নির্মাণ

মাহমুদ দারভীশ এবং তার কবিতার প্রাণসত্তায় কতোগুলো মৌল উপাদান রয়েছে। ব্যক্তি–জাতিয়তা ও এজেন্সি এর অন্যতম। জাতীয় পরিচয় কিংবা জাতিগঠনের গোড়ার বস্তু হিসেবে এসব উপাদানের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মাহমুদ দারভীশের জীবনের প্রথম দিকে আরব জাতিয়তাবাদ সম্পর্কিত চাপ ছিল। তার প্রথম দিককার কবিতাগুলোতে আরব জাতীয়তাবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে।[১২২] তবে ক্রমে সেই চাপ তিনি কেটে উঠেছিলেন। ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতার পর সেই চাপ অনেকখানি নিঃশেষ হয়ে আসে। আরব বা প্যান-আরব জাতিয়তাবাদ থেকে ফিলিস্তিনে পরিণতি লাভ করেছে এ জাতিয়তা—এভাবে চিন্তা করলে ধারণাগত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে দারভীশের অবস্থান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে। কারণ আরব জাতীয়তাবাদের যে ঐতিহাসিক বাস্তবতা তাতে আলাদা করে দেশভিত্তিক জাতিয়তার যে ভূমিকা বা আঞ্চলিকতা শেষপর্যন্ত তা মুখ্য হয়ে উঠেছিল। যাইহোক, জাতিয়তা বিষয়টি তার কবিতায় গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এই জাতিয়তার ভিত্তি ফিলিস্তিন। আরব-ফিলিস্তিন জাতিয়তা কেবল ঐতিহাসিক বিষয় নয়—একটি জীবন্ত বাস্তবতাও। ধারণা এবং বর্গ হিসেবে জাতি একটি বিমূর্ত প্রত্যয়—যাকে বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয় করা যায় একটি মৌল হিসেবে। জাতিয়তা এ কারণে যে, ফিলিস্তিন একটি রাষ্ট্র হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। কাজে জাতি হয়ে ওঠার যে বিশেষ ঐতিহাসিকতা তা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ইজরাইলের দখলদারিত্বের যাবতীয় প্রক্রিয়ার মুখোমুখী অবস্থান করে ফিলিস্তিন নিজেকে যে টিকে রাখার প্রাণান্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তার ঐতিহাসিক কর্তসত্তার (Agency) স্বরূপ প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে দারভীশের কবিতায়। মাহমুদ দারভীশ যে চিন্তা ও ভাষাকৌশলযোগে সমগ্র ফিলিস্তিনকে চিত্রায়িত করেছেন তাতে একটি জাতির এজেন্সি বা কর্তাসত্তা কিভাবে গড়ে উঠতে পারে এর আলোচনা সামাজিক বা রাজনীতিবিদ্যার ভাষা ব্যবহার করে যেমন করা যায় তেমনি সাহিত্য বা কবিতার মাধ্যমেও করা যেতে পারে। বস্তুত সাধারণ এজেন্সি কিংবা কবিতার এজেন্সির মধ্যে মর্মগত কোনো ইতরবিশেষ পার্থক্য নাই বৈশিষ্ট্য ও ধরন ব্যতীত।

নিজের স্বাধীন ইচ্ছা, স্বায়ত্ব ও স্বয়ম্ভু অবস্থানে থেকে যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবার সক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বলতে যা বোঝায় তাই এজেন্সি। কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টি নিজের কাজগুলো স্বনির্ভরভাবে করতে সক্ষম কিনা এমন প্রশ্নের সাথে এজেন্সি কথাটির সম্পর্ক কিংবা তাদের যে আত্মপরিচয়ের স্বরূপ রয়েছে তার সাথে তারা যা করছেন সেসব কর্মতৎপরতা ও বিষয়াদির সম্পর্ক শনাক্ত করা যায় এজেন্সি নামক বর্গের মাধ্যমে।[১২৩] এজেন্সির অন্য নাম হলো বরাত। এই বরাত যেমন অন্যের সূত্র–অসিলা ধরে তৈরি হয় তেমনি নিজের বরাতেও ঘটতে পারে। যখন তা নিজের কিংবা স্বাধীন সত্তাজাত হয়ে ওঠে তখন তার ভিন্ন অর্থ তৈরি হতে পারে। এমন স্বাধীন সত্তাজাত কর্তৃত্ববোধ যখন

---

[১২২]. হাম্মাদ, নাজীব, *আল আইদিওলোজিয়্যাহ আল সিয়াসিয়্যাহ ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ: দিরাসাতু নামাজিজ শি'রিয়্যাহ (আলজেরিয়া, আরবী বিভাগ, জামেঅ আল আরাবি বিন মাহদী– উম্মু আল বাওয়াকী, ২০১০ খ্রি.)*, পৃ. ৬৫।

[১২৩]. অ্যাশরফট, বিল, গারেথ গ্রিফিথ, হেলেন টিফিন, *পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডিজ: দি কী কনসেপ্ট* (নিউ ইয়র্ক: রুটলেজ, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬।

অপরাপর ব্যক্তির অর্থাৎ সমষ্টির স্বার্থের সমার্থক হয়ে উঠতে সক্ষম হয় এবং একইসাথে এর যে সর্বজনীন আবেদন গড়ে ওঠে তখন তা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ফলে যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো পক্ষ বা শক্তির না হয়ে শুধু তার নিজের বরাতে সক্রিয় ও তৎপর হতে সক্ষম তার নামই বস্তুত এজেন্সি। এমন এজেন্সি ক্রমাগত ব্যক্তি থেকে জাতি গঠনের একক হিসেবে ঐতিহাসিক সক্রিয়তা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ তৈরি করে তাৎপর্যপূর্ণ নজির স্থাপন করতে সক্ষম। ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন জাতির উত্থানের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে ‘এজেন্সি’র ব্যাপক অর্থময়তা তুলে ধরা সম্ভব। বিশেষত ব্যক্তি ও জাতীয় এজেন্সির ঐতিহাসিকতা উত্তর-উপনিবেশিক সমাজ বিশ্লেষণে প্রতীয়মাণ হয়ে ওঠে। যেকারণে উত্তর-উপনিবেশিক তত্ত্বে এজেন্সির পাঠ-বিশ্লেষণ অনেকদূর সীমা বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। বহিরাগত, উপনিবেশিক কিংবা সাম্রাজ্যের শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার উদ্যোগ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ লড়াই সংগ্রামে উত্তীর্ণ হওয়ার যে সক্ষমতা তা বোধগম্য ও পরিষ্কার করে তোলা হয় এই এজিন্সি’র মাধ্যমে। উত্তর-উপনিবেশিক অধ্যয়নে মূলত এর সূচনা ঘটে। দর্শন, সাহিত্য-শিল্পকলা ও কবিতাসহ অন্যান্য মাধ্যমে এজেন্সি আরো বিস্তারিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যে বা কবিতায় এই এজেন্সি যে প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে তার পুরো আকার তৈরি হয় মূলত ভাষার মাধ্যমে। কবিতার বাক্য কিংবা অর্থের ভিতর দিয়ে এজেন্সির স্বরূপ তৈরি হয় যেখানে প্রতিরোধ এবং দ্রোহের উচ্চারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১২৪] দারভীশের কবিতায় এজেন্সি প্রথমত অনুধাবন করা যায় তার বিদ্রোহী উচ্চারণে। এমন এজেন্সি বোঝার জন্য দ্রোহ-বিদ্রোহ একটি কার্যকর উপাদান। দারভীশ বলেন,

হৃদয়ে আমার পদ্ম কালো
ঠোঁটে অগ্নি লেলিহান
কোত্থেকে এসেছো
যতো ক্ষোভের ক্রুশ
আমি শপথ নিয়েছি আমার সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার
আলিঙ্গন করে নিয়েছি ক্ষুধা আর যাযাবর জীবন
আমার হাতে দ্রোহ
আমার মুখে দ্রোহ
এবং আমার সমস্ত শিরা-উপশিরার রক্তগুলো
কেবল দ্রোহের নির্যাস!

الزنبقاتُ السودُ في قلبي
وفي شَفَتي... اللهبْ
من أي غابٍ جئتني
يا كلَّ صلبانِ الغضبْ ؟
بايعتُ أحزاني...
وصافحتُ التشردَ والسِّغَبْ
غضبٌ يدي....
غضبٌ فمي...
ودماءُ أوردتي عصيرٌ من
غضبْ ![১২৫]

ক্ষোভ এবং ক্রোধ প্রকাশের মাধ্যমে বস্তুত একজন ব্যক্তি কিংবা সমষ্টির এজেন্সি প্রকটভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দারভীশ এখানে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তা ছিল ফিলিস্তিন জাতির একজন ব্যক্তি কিংবা সদস্য হিসেবে। এজেন্সি কিভাবে তৈরি হয় কিংবা গড়ে ওঠে তার চেয়ে জরুরি প্রশ্ন, এ আলোচনায় দারভীশের কবিতায় এজেন্সি কেন প্রাসঙ্গিক। বলা বাহুল্য, দারভীশ এমন এক সময় এই দ্রোহের

---

[১২৪]. গিলবার্ট, হেলেন এবং টম্পকিনস, জোয়ান, *পোস্ট কলোনিয়াল ড্রামা থিওরি: প্রাকটিস, পলিটিক্স* (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক: রুটলেজ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৬৬।
[১২৫]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল-উলা-১*, পৃ. ১৫।

উচ্চারণ করেছিলেন যখন ফিলিস্তিনে ইতিমধ্যে ১৯৪৮ এর প্রথম আরব ইজরাইল যুদ্ধে ফিলিস্তিন জনগোষ্ঠী হিসেবে তার প্রায় সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে। একটি জাতির এর পরে সোজা হয়ে দাঁড়াবার, জাতি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দ্রোহ প্রতিবাদ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলনা। নিজের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য একজন কবির কবিতায় তার জাতি কিভাবে স্বাধীন কর্তৃত্ব গড়ে তুলছে তার দৃষ্টান্ত উঠে আসে উপরের পঙক্তিগুলোতে। একটি জাতির নিজের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার প্রথম পদক্ষেপ এবং প্রথম উচ্চারণ হলো নিজের কর্তৃত্বের জানান দেয়া। আর এ কর্তৃত্ব সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ করা যায় ক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যমে।

জাতিগতভাবে এবং জাতিগত একক হিসেবে এজেন্সির চূড়ান্ত উদাহরণ কেমন হতে পারে মাহমুদ দারভীশের ‘পরিচয়পত্র’ (বিত্বাকাতুন হুবিয়্যাহ) কবিতায় প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে উপস্থাপিত হয়। দারভীশ যখন সদর্পে উচ্চারণ করেন, ‘লিখে রাখো/আমি একজন আরব’ তখন এটি নিছক একটি কাব্যপঙক্তিই নয় এটি হয়ে ওঠে দখলদার শক্তি ইজরাইলের বিরুদ্ধে সমস্ত আরব-ফিলিস্তিন জাতির এক চরম প্রত্যাঘাত। কিঞ্চিত উপহাস মিশিয়ে দারভীশ তার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন,

লিখে রাখো	سجِّل
আমি একজন আরব	أنا عربي
পঞ্চাশ হাজার আমার আইডি নম্বর	ورقمُ بطاقتي خمسونَ ألفْ
সন্তান আমার আটজন	وأطفالي ثمانيةٌ
নবমটি শিগগির আসবে গ্রিস্মের পর	وتاسعهُم.. سيأتي بعدَ صيفْ!
রাগ করলে?	فهلْ تغضبْ؟[১২৬]

মাহমুদ দারভীশের কবি হিসেবে অভিষেক ঘটে যে কাব্যের মাধ্যমে—*আছাফিরু বিলা আজনিহা*’তেও এই কর্তৃত্বসুলভ পঙক্তিমালা বিপুলভাবে লক্ষ করা যায়। কবির এজেন্সি শুধু তার নিজের কিংবা নিজের প্রতিবেশের মধ্যেই সীমিত নয়। কাব্যিক এজেন্সি (পোয়েটিক এজেন্সি) কিংবা কর্তৃত্বভাব তার পুরো জাতির মধ্যে প্রবাহিত করাও এই এজেন্সির অন্তর্গত প্রক্রিয়া।

علموه الرقاد زلزل كراه
وتمرد يا أمتي ! استفيقي ![১২৭]

দুর্বলেরাই শিখিয়েছে তাকে,
কাঁপিয়ে দাও ঘৃণাজীবীদের
বিদ্রোহ করো হে জাতি, উত্থিত হও!

১২৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ৮০।
১২৭. মাহমুদ দারভীশ, *আসাফিরু বিলা আজনিহা* (বৈরুত: দার আল আওদাহ, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৫০।

দারভীশের সূচনা হয়েছে কর্তা ও কর্তৃত্বভাব নির্মাণের মধ্যদিয়ে। তিনি ব্যক্তি-জাতি ও সমষ্টির অর্থ ও মর্ম নির্ণয় করেছেন তার এজেন্সি কিংবা কর্তৃত্ববোধ জাগ্রত করার নিমিত্তে। এটি যেমন জাতিগঠনের প্রশ্ন তেমনি জাতির চৈতন্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান তৈরিরও প্রশ্ন। এই গড়ে তোলাটা সরলভাবে হয় না। নানান মোকাবেলা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যদিয়ে যেতে হয়। নানান সংস্কৃতির সীমা অতিক্রম করে যেতে হয়। একটি শ্রেণি ও সমষ্টিকে গড়ে তুলতে হয় তেমনি তাকে নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াও রক্ষা করতে হয়। পোয়েটিক এজেন্সির জন্য তাই জরুরি হল একটি পাঠক শ্রেণি তৈরি করা—যার সামনে তার ভাষা এবং জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে থেকে একটা দুনিয়া হাজির করা। নতুন দুনিয়া। পাঠক যে স্বপ্নের জন্য নিজের অজান্তে অবচেতনে আকাঙ্ক্ষিত থাকে সে দুনিয়া ক্রমে উদ্ভাসিত করে তোলা। যেহেতু একইসাথে অভ্যন্তরীণ এবং নিজ দেশের বাইরের পাঠক শ্রেণির মুখোমুখী হতে হবে তাই তার জন্য উপযোগিতাও তৈরি করে নিতে হবে নতুন করে। ভিন্ন সমাজ ও জাতির মোকাবেলা করাটা কর্তৃত্ব-প্রক্রিয়ার অন্তর্গত সক্রিয়তা। ফলে এজেন্সি বা কর্তাভাবের বিষয়টি ব্যাপকভাবে হাজির হয়। যেখানে কবির একটা নীতি থাকে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মানুষের সাথে পাঠকের সাথে যুক্ত হবার জন্য।

কাজে এমন প্রশ্ন তখন আসে যে, পোয়েটিক এজেন্সির জন্য কবিতা কেমন অর্থাৎ যখন কবিতা পাঠ করার কথা বলা হয়, তা আসলে কি ধরনের। কিভাবে সেসব কবিতা পাঠ করতে হবে কিংবা তার বোঝাবুঝি তৈরি করতে হবে কিংবা কিভাবে সেই কবিদের পাঠ করা দরকার বা করতে হবে। একটা চলমান ইতিহাস ও সমাজের নিয়ম নীতি ও কাঠামোর বাইরে থেকে একজন কবি যখন কবিতা বলছেন বা কবিতায় যে ভাষা ও অর্থ তৈরি করছেন, প্রকাশ করছেন—এটা আসলে এক ধরনের উত্তর-উপনিবেশিক কবি ও কবিতার প্রকৃতি। মাহমুদ দারভীশের কবিতা ও তার চিন্তার বিশ্লেষণ কি করে এজেন্সি গড়ে তুলতে উপায় হয়ে ওঠে তার প্রাসঙ্গিকতা দেখিয়েছেন খালেদ মত্তাওয়া। খালেদ মনে করেন, উত্তর-উপনিবেশিক কবিকে 'পোয়েট স্ট্র্যাঞ্জার'ও বলা যায়। যেহেতু তিনি আহুত এবং আগন্তুক। এই অর্থে যে, তিনি কাঠামোর বাইরে থেকে এসে কাঠামো পাল্টানোর কথা বলছেন। একইসাথে কাঠামোর ভিতরে থেকে বিরোধী কাঠামোর মুখোমুখী হয়ে উঠছেন। এ ধরনের কবিকে দুইরকম পক্ষকে সামাল দিতে হয়। একটা ভিতরের আরেকটা বাইরের। নিজের জনগণ আবার অপর কোনো শক্তিকেও। যারা তার সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষমতার ইস্যু। কাজে কর্তাভাব গড়ে তোলার তৎপরতার সাথে যুক্ত এমন কবির কাব্য ব্যক্তিত্বের জন্যই তাকে সেকারণে বিভিন্ন চাপ নিয়ন্ত্রণ করে যেতে হয়। তার প্রধান এবং প্রাথমিক কাজ হয়ে ওঠে প্রতিনিয়ত বিবদমান ক্ষমতা কাঠামোর মুখোমুখী হওয়া। ক্ষমতাসীন শ্রেণির মুখোমুখী হওয়াটাও যুগপৎভাবে ঘটে একইসাথে। এটি একজন উত্তর-উপনিবেশিক কবির জন্য একটি লড়াই চালিয়ের যাওয়ার মতো বিষয়।

একজন পোস্টকলোনিয়াল কবির যে ব্যক্তিত্ব তার জন্য তাকে বহুজাতীয় পাঠক শ্রোতা দর্শক ও বহুজাতীয় মানুষজনকে এড্রেস করতে হয়। তাদের সাথে কথা বলতে হয়, তাদের নিজেদের কথাগুলো বলতে হয়। বহুকাঠামোকে মোকাবেলা করতে হয়; কবি যেখানে নিরন্তর পরীক্ষার সম্মুখীন

হন। দারভীশ তেমনই একজন উত্তর-উপনিবেশিক কবি।[১২৮] যেহেতু ফিলিস্তিন মূলত নিও-কলোনিয়াল বা নয়া উপনিবেশিক প্রক্রিয়ার মুখোমুখী হয়ে আপন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত একটি ভূখণ্ড কাজে তার জন্য এটি ছিল অনিবার্য। দারভীশের কাব্য-কবিতা ও চিন্তার জন্য জরুরি হয়ে ওঠে ইজরাইলের মতো নতুন ধরনের একটি উপনিবেশিক শক্তির মুখোমুখী হয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম একটি জাতীয় মানস গড়ে তোলা। দারভীশ বস্তুত এই কাজটি নিরন্তর করে গেছেন। একইসাথে ইজরাইলকে মোকাবেলার ভাষাও তিনি তৈরি করেছেন। তাদের হানাদারী শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কর্তৃত্বের সত্য উচ্চারণের ভাষ্য নির্মাণ করতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন দারভীশ। কবিকে এর জন্য তার কবিতায় প্রবলভাবে উপস্থিত থাকতে হয়। এধরনের কবিতার মৌল বৈশিষ্ট্য হল, কবিতায় কবির প্রবল উপস্থিতি। একইসাথে কবিতায় তার দেশের মানুষ ও প্রকৃতি বিপুলভাবে সম্বোধিত। কথা বলার মুন্সিয়ানা। উচ্চভাষী। মৃদুভাষার বিপরীতে উচ্চকণ্ঠ হওয়া। ক্ষমতার একেবারে মুখের সামনে বসে–দাঁড়িয়ে তার কবিতার সত্য উচ্চারণ করার শক্তি। যেখানে তার নাগরিক, তার ভূমি সীমানা, ভৌগলিকতা, জনজীবনের কথা, তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি, জীবনগাথা, তাদের অধিকারসহ যাবতীয় মৌলসত্য উচ্চারণের ভাষা কিংবা কথা বলার প্রবল সামর্থ—এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যাতে দেখা যায় একজন কবি তার ভূখণ্ডের পুরো জনজীবন, ভূ-প্রকৃতি, ধর্ম-সৃংস্কৃতিকে একই মঞ্চে তুলে আনছেন আর সেই মঞ্চের নাম কবিতা।[১২৯] কবিতার মঞ্চ। এ হলো এজেন্সি নির্মাণের ক্ষেত্রে মৌল প্রকৃতি একজন উত্তর-উপনিবেশিক কবির জন্য। এখাকে কবিকে তার দেশ-সীমানা, জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে ফানা হয়ে যাওয়া এক সত্তার মতো মনে হবে। এটা হলো এ ধরনের কবির চূড়ান্ত পরিণতি কিংবা সর্বোচ্চ বিকশিত পর্যায়। কবি এমন একটি ক্ষেত্র ও পরিবেশ তৈরি করবেন যাতে একটি সর্বজনীন এজেন্সির উন্মোচন ঘটবে। তার ভূমি, সীমান্ত-জাতির আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রক্রিয়া নির্মিত হবে। এর জন্য কবির সাহস, উচ্চকণ্ঠ হওয়াটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ কারণে যে, যেখানে উপনিবেশিক প্রভু ও উপনিবেশিতের মাঝে সংলাপ সম্পর্কিত একটি নীরব সত্য তার দ্বারা উন্মোচিত হতে পারে। কারণ কবি এই ডায়ালগে ক্ষমতাহীনতা, আত্মমর্যাহীনতা, ভূমিহীনতা, জাতিগত ভাবমর্যাদা, ক্ষমতার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রগুলোর সাথে সম্পর্কের অসম অবস্থার কথা বলবেন। কবি যেখানে নিজের জনগোষ্ঠীর লোক, প্রতিনিধি এবং তাদের ভাষ্যকার বা মুখপাত্র হিসেবে অভিষিক্ত হয়ে উঠেন।

নানান অনুষঙ্গের মাধ্যমে দারভীশ তার জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হয়ে থাকতেন। প্রতিরোধ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সবধরনের পরিস্থিতিতে নিজের অংশগ্রহণে দ্বিধাহীন ছিলেন। ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের জনগোষ্ঠী– এই দুই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। এরমধ্যেই সবসময় লিপ্ত থাকা হয়ে ওঠে তার জীবনের মূল লক্ষ্য। এই লিপ্ত থাকা কিংবা কার্যকরভাবে বর্তমান থাকার অর্থ হলো,

---

[১২৮]. মত্তাওয়া, খালেদ, *হোয়েন দি পোয়েট ইজ আ স্ট্র্যাঞ্জার: পোয়েট্রি এন্ড এজেন্সি ইন ট্যাগর, ওয়ালকট এন্ড দারভীশ* (যুক্তরাষ্ট্র: ডিউক ইউনিভার্সিটি, ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৯।

[১২৯]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০।

নিজের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে সার্বক্ষণিক নিশ্চয়তার মধ্যে রাখা। লিপ্ততা এবং উপস্থিতি এক প্রকার আত্মপ্রতিরক্ষার উপায়। কেন এ লিপ্ততা এবং হাজির থাকা? দারভীশ বলেন,

(একজন কবির প্রতি):
গায়েব যখন তোমাকে ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়
ঈশ্বরের একাকিত্বের মতো নির্জনতার আনন্দে ডুবে যাও
সুতরাং হয়ে যাও তোমার হারানো বিষয়ের 'সারসত্তা'
হয়ে যাও তোমার সত্তার 'বিষয়'
হয়ে যাও গায়েবের ভিতর হাজের।

(কবিতার কাছে):
অবরোধকে অবরোধ করে ফেলো

إلى شاعر: كلما غاب
عنك الغياب
تورطت في عزلة الآلهة
فكن " ذات" موضوعك
التائهة
و " موضوع " ذاتك ،
كن حاضراً في الغياب.

إلى الشعر: حاصر
حصارك[১৩০]

কবিতাংশটি দারভীশের *হালাতু হিছার* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। ২০০২ সালে বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ২০০-১-২০০২ সালের দিকে ফিলিস্তিন কার্যত অবরুদ্ধ ছিল। বিশেষত কবি যে শহরে থাকতেন– রামাল্লায়– তখন শহরটি ইজরাইল কর্তৃক পুরোপুরি অবরুদ্ধ ছিল। এমন অবরোধ পরিস্থিতির মধ্যেই কবি লিখেছিলেন *হালাতু হিছার* কিংবা অবরোধ পরিস্থিতি। লেখালিখির এ সময়টি ছিল মূলত প্যারিস থেকে ফিরে আসার পরবর্তী পর্যায়ের। গঠনগত দিক থেকে গ্রন্থটি আরবী কবিতার ক্ল্যাসিক প্রকরণ অনুসরণ করে প্রণীত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে লিপিবদ্ধ। স্তবকগুলোতে পঙক্তির নির্দিষ্ট সংখ্যা রক্ষা করা হয়নি। একইসাথে ছন্দ ও মাত্রার একইরম সংহতিও প্রতিপালিত হয়নি। আধুনিক মুক্তছন্দে লিখিত এটি। যেখানে কোনো কোনো স্তবকে একটিমাত্র পঙক্তি যথেষ্ট। স্তবকগুলোতে বিশেষ কোনো শিরোনামও দেয়া হয়নি। মোটকথা ক্ল্যাসিক এবং আধুনিকতার সমবায়ে *হালাতু হিছার* দারভীশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ হয়ে ওঠে। কবিতাংশটিতে কর্তাসত্তার প্রসঙ্গ বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা সম্ভব। 'সারসত্তা' (জাত) এবং 'বিষয়' (মাওদু') শব্দদুটির দার্শনিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কবি নিজেই ঊর্ধ্বকমা দিয়ে বিশেষভাবে নজর ফেরানোর চেষ্টা করেছেন। *জাত* এবং *মওদু* বর্গ হিসেবে বিশেষত আরব-ইসলামিক দর্শনশাস্ত্রের দার্শনিক ক্যাটাগরি।[১৩১] এ অঞ্চলের দর্শনের গ্রন্থগুলোতেও *বিষয়* এবং *বিষয়ী* নামে দুটি বর্গের আলোচনা রয়েছে। মোটামুটি সব ভাষার দর্শনশাস্ত্রের অধিবিদ্যায় এই দুটি শব্দের বিশেষ পাঠ-পর্যালোচনা রয়েছে। *মওদু*– সাধারণ অর্থে বিষয় (টপিক)। তবে দার্শনিক অর্থে বিষয়ী বা জ্ঞানের কর্তা (সাবজেক্টিভিটি)। সত্তা– মর্ম, আত্মা, আত্ম, নিজ, আপন, পরম ইত্যাদি অর্থে *জাত* শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এখানে *জাত* এবং *মওদু* প্রায় একই অর্থ প্রকাশক। জাত মানে সত্তা– অপর অর্থে

১৩০. দারভীশ, মাহমুদ, *হালাতু হিছার* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস, ২০০২, খ্রি.), পৃ. ৫৬।
১৩১. সাঈদ, জালালুদ্দীন, *মু'জাম আল মুছতালাহাত ওয়া আল শাওয়াহিদ আল ফালসাফিয়্যাহ* (), পৃ. ২০৫, ।

কর্তা। ব্যক্তির সারসত্য—যেহেতু এখানে মওদু'র কথা বলা হয়েছে। মওদু মানে বিষয়ী– আবার অন্য অর্থে সত্তা। কারণ দর্শনের ভাষায় মওদু'র মানে, স্বাধীন জ্ঞান ও চেতনা সম্পন্ন সত্তা।[১৩২] স্বাধীন ব্যক্তিত্ব কিংবা সচেতন চেতনাসম্পন্ন কর্তা হয়ে ওঠা। অপর অর্থে নিজেই নিজের কর্তা হয়ে ওঠা। নিজেই নিজের বিষয় হয়ে ওঠা (*হয়ে যাও তোমার সত্তার 'বিষয়'*)। ফলে *মওদু* মানে কর্তাসত্তাও (সাবজেক্টিভিটি)। *মওদু* থেকে *মওদুইয়্যাহ* (সাবজেক্টিভিটি) বস্তুত আধুনিক পশ্চিমা দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্গ। পশ্চিমা দর্শনে অ্যারিস্টটল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পুরো দর্শনজুড়ে সাবজেক্টিভিটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। তবে আধুনিক কালে রেনে দেকার্তে ও নিটশে থেকে শুরু করে জাক দেরিদা ও মিশেল ফুকো পর্যন্ত বিচিত্র দিক থেকে সাবজেক্টিভিটির আলোচনা ও বিতর্কের ডালপালা ছড়িয়েছে। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, ভাষা, মতাদর্শ, ডিসকোর্স ও মনোবিশ্লেষণসহ বিভিন্ন দিক থেকে এর আলোচনা রয়েছে। যেখানে অবজেক্টকে আলাদা করে সাবজেক্ট স্বয়ম্ভু হয়ে ওঠার ধারণা ছিল প্রবল। এই স্বতন্ত্র সত্তা জগতকে দেখার ক্ষেত্রে কিংবা জগতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার ক্ষেত্রে সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা মনে করে এবং যার মূলকেন্দ্র হয়ে ওঠে নিজের সচেতন বুদ্ধি ও যুক্তি। সাহিত্যেও কমবেশি এ আলোচনার বিস্তার ঘটেছে। তবে দারভীশের কবিতা সাবজেক্ট-অবজেক্ট এর বিভাজনের জন্য প্রাসঙ্গিক না হলেও সাবজেক্টিভিটি বা স্বাধীন কর্তাসত্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এমন স্বাধীন চেতনাসম্পন্ন কর্তাসত্তা অর্জনের আহবান গভীরভাবে বোধগম্য হয়ে উঠেছে দারভীশের কবিতায়। লড়াই-সংগ্রাম-প্রতিরোধের মতো সক্রিয় তৎপরতায় যে রাজনৈতিক জীবনবোধ জরুরি হয়ে ওঠে তাতে কবি এমন পরিপূর্ণ স্বাধীন চেতনাসম্পন্ন কর্তাসত্তা গড়ে তোলার চিন্তা করেছেন। কবি চেয়েছেন চৈতন্য এবং সত্তার অন্তস্থল থেকে স্বাধীন সচেতনভাবে গড়ে ওঠা একটি জাতি, একটি জনগোষ্ঠী।

অন্যদিক থেকে স্বভাবত এই গ্রন্থটিতে ইজরাইলের অবরোধের বিরুদ্ধে নানা মাত্রার কাব্যিক বিস্তার ঘটেছে। যেখানে অবরোধের প্রতীকী বর্ণনা লক্ষ করার মতো। গভীর ভাবব্যাঞ্জনা নিয়ে তার উপস্থিতি ঘটেছে এই গ্রন্থে। কবি যে ধ্যানজ্ঞান–লিপ্ততায় আনন্দে ডুবে থাকার কথা বলেছেন তার গভীরতা বিস্ময়কর। এর সাথে 'গায়েব', ঈশ্বর, নির্জনতা-একাকিত্ব, ডুবে যাওয়া– লিপ্ত থাকা, সত্তা, বিষয়, হাজের– বর্তমান থাকা ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ কনটেক্সচুয়ালি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিবিধ পরিপ্রেক্ষিত থেকে এর বিশ্লেষণের সম্ভাবনাকে উস্কে দিয়েছেন কবি। এতে যেমন রয়েছে, আধ্যাত্মিক ভেদজ্ঞান, রাজনৈতিক পরমার্থিকতা (Political Spirituality), আত্মিক বিকাশের প্রশ্ন, তেমনি রয়েছে ফিলিস্তিনের বিদ্যমান লড়াইয়ে শামেল হওয়ার পরমার্থিক চেতনানুষঙ্গ। রয়েছে কর্তাসত্তা পুনর্গঠনের প্রশ্ন। একটি জাতির কর্তাসত্তার পুনর্গঠন কোথায় থেকে শুরু করতে হবে তার গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে দারভীশের এই কাব্যপঙক্তিতে। এখানে যে ডুবে থাকার—এবং হাজের থাকার কথা বিধৃত হয়েছে—এই লিপ্ততার মানে ক্রমাগত এবং গভীরভাবে বর্তমান থাকা—হাজের থাকা। প্রকটভাবে দৃশ্যমান থাকা। এই লিপ্ততা—এই হাজের থাকার মানে নিছক লিপ্ততা বা হাজের

[১৩২]. প্রাগুক্ত।

থাকা নয়। প্রবলভাবে সর্বব্যাপী বর্তমান থাকা। ইজরাইলের বিরুদ্ধে অবরোধসহ ইজরাইলের যেকোনো নেতিবাচক তৎপরতার বিরুদ্ধে এরচেয়ে শক্তিশালী নির্দেশ-বক্তব্য খুবই বিরল। তাই কবি বলেছেন, *অবরোধকে অবরোধ করে ফেলো*। অর্থাৎ পাল্টা অবরোধের আহবান করছেন কবি।
দারভীশের কবিতায় যে এজেন্সির বয়ান লক্ষ্য করা যায়, তাতে এজেন্সি মাত্রই রাগ, ক্ষোভ-দ্রোহ, কর্তৃত্ব, আমিত্ব-অহং এসব দেখানোর ব্যাপার নয়। একটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বেঁধে ফেলার ব্যাপার নয়। বরং সব কাজই সহজভাবে করতে পারার বিষয়ও এজেন্সি। যেখানে সারাদিনের সমস্ত কাজের মধ্যে নিজের অবস্থানকে সচল রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যাই করা হোক না কেন, তার মধ্যে নিজের অগ্রসর অবস্থান এবং স্বাধীন উপস্থিতি জরুরি। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ আপন হাতে অক্ষুণ্ন রেখে সঞ্চালিত করার নাম এজেন্সি। এজেন্সি এক ধরনের কর্তৃত্ববান ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রকাশ। দারভীশ তার বিখ্যাত কাব্যময় গদ্যগ্রন্থ *জাকিরাহ লি আল নিসইয়ান*–ذاكرة للنسيان–এ কফি সংক্রান্ত যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে ব্যক্তির এজেন্সি কিংবা পোয়েটিক এজেন্সি কেমন হতে পারে তার একটি নজির খুঁজে পাওয়া যায়।

> And coffee, for one who knows it as I do, means making it with your own hands and not having it come to you on a tray, because the bringer of the tray is also the bearer of talk,[১৩৩]
>
> যে ব্যক্তি আমার মতো কফি সম্পর্কে জানে—অর্থাৎ নিজ হাতে কফি তৈয়ার করতে অভ্যস্ত সে ট্রেতে অন্য কর্তৃক বয়ে আনা কফির পেয়ালা পান করেন না। কারণ ট্রে বহনকারী একইসাথে কিছু কথারও ধারক বাহক।

এখানে কফি তৈরি সম্পর্কিত দারভীশ তার নিজের একটি মতামত তুলে ধরেছেন। এটি মানুষের নিত্যজীবনের খুব সাধারণ অনুষঙ্গ হলেও এখানে কবির জীবনবোধ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। অতি সাধারণ কাজের মধ্যেও ব্যক্তি তার আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারেন। এই বক্তব্যের মধ্যদিয়ে কবি একজন ব্যক্তির কর্তাসত্তা কেমন হতে পারে তার একটি প্রতীকী বর্ণনা দিয়েছেন। উদ্ধৃতিটি দেখে মনে হতে পারে যে, এটি একটি সাধারণ বক্তব্য কিংবা কথার কথা। তবে তা নয়। এটি এখানে এসেছে পূর্বাপর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা অনুসরণ করে। যেখানে *কফি* একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করে আছে—যেখানে কফি স্মৃতি এবং বিস্মৃতির অপ্রতিরোদ্ধ আখ্যানের প্রধান নিয়ামক উপাদান হয়ে উঠেছে। কবির নিজের সাথে নিজের সংলাপের একটি রূপমাত্র এই উদ্ধৃত অংশ। ১৯৮২ সালে লেবাননের বৈরুতে আশ্রিত ফিলিস্তিনী জনগণের উপর ইজরাইলি গণহত্যার পটভূমিতে যে আখ্যান রচনা করেছেন দারভীশ সেখান থেকে নেয়া হয়েছে এটি। *জাকিরাহ লি আল*

---

[১৩৩]. মুহাবি, ইবরাহিম, *ম্যামোরি ফর ফরগেটফুলনেস*—মাহমুদ দারভীশের জাকিরা আল নিসইয়ানের অনুবাদ (ক্যালিফোর্নিয়া, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭।

নিসইয়ান– যেখান থেকে উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে– এটি দারভীশের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অন্যতম। বইটিতে ফিলিস্তিনে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, আত্মজীবনী, সাহিত্য-পর্যালোচনা, সমাজ-রাজনীতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ইজরাইল-ফিলিস্তিন লড়াইয়ের জটিল পরিস্থিতি বিষয়ক সংবেদনশীল চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান, সংকট-সম্ভাবনা ইত্যাদি বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ এসেছে।

এজেন্সি প্রথমত ব্যক্তিক দ্বিতীয়ত সামাজিক বা সামষ্টিক। মাহমুদ দারভীশ সমাজ এবং জাতিগত এজেন্সি নির্মাণ করার পূর্বশর্ত হিসেবে প্রধানত ব্যক্তির এজেন্সি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তবে একটি লড়াইরত জাতির মাঝে ব্যক্তির এজেন্সি শেষপর্যন্ত সমষ্টির এজেন্সিই। ব্যক্তির এজেন্সি মানে জাতিগত এজেন্সি– যেখানে জাতিগত এজেন্সি ব্যক্তির মধ্যদিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই এজেন্সির সাথে উত্তর-উপনিবেশিক এজেন্সির একটি ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা রয়েছে। যেকারণে এজেন্সিকে সাবজেক্টিভিটির সাথে মিলিয়েও পাঠ করা যায়। উত্তর-উপনিবেশিক পাঠগুলোর মারফতে এ প্রসঙ্গে বিস্তর আলোচনার পরিসর গড়ে ওঠলেও অনেক আগে থেকেই এজেন্সির নিজস্ব এলাকা রয়েছে পশ্চিমের দর্শন ও জ্ঞানীয় পরিমণ্ডলে। যাইহোক, এজেন্সির সাথে সমাজ বা সমষ্টির একটা সম্পর্ক রয়েছে। কারণ সমাজ কথাটা বাদ দিয়ে সক্রিয় অবস্থানের ফলে বর্গ হিসেবে শুধু ব্যক্তি কোনো মূল্য তৈরি করেনা। ব্যক্তির এজেন্সি যেকারণে একইসাথে অপরের সাথে সংলাপের শর্ত হয়ে ওঠে। অপরদিকে অপরের সাথে সংহতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে এজেন্সি। হোমি কে. ভাভা তার *The Location of Culture* গ্রন্থে এজেন্সির এমন একটি বিন্যাস পর্যালোচনা করেছেন। যাতে প্রথমত, লেখক এবং পাঠকের মাঝে সংলাপের মাধ্যমে তৈরি হয়। পাঠক পর্যন্ত জড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, লেখক বা ব্যক্তির সম্পর্ক অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়ে ওঠা। একইসাথে ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, সংস্কৃতিরও একটা মীমাংসা ঘটে যায়। কারণ সমষ্টির সংস্কৃতি কিংবা বহুস্বর—বহুত্বের বড়ধরনের নিরাকরণ ঘটে যায়—যখন ব্যক্তির এজিন্সিগত বিনিময়, সম্পর্ক একটি বিস্তৃত পরিসরে এসে জড়াজড়ি করে পরিব্যপ্ত হয়ে ওঠে।[১৩৪] প্রসঙ্গত, মাহমুদ দারভীশের নিচের এ কবিতাংশটি পাঠ করা যাক...

-২-

كم أنا ؟
في الظهيرة / لمَّعتُ كل مراياي ، أعددت
نفسي لعيد سعيد . و نهداي ، فرخا
. يمام لياليك يمتلئان بشهوة أمس
أرى في عروق الرخام حليب الكلام
الإباحي يجري و يصرؤخ بالشعراء
اكتبوني ، كما قال ريتسوس . أين
اختفيت و أخفيت منفاي عن رغبتي ؟

১৩৪. ভাভা, কে. হোমি. *দি লোকেশন অব কালচার* (লন্ডন: রুথলেজ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৭১-১৭৫।

لا أرى صورتي في المرايا ، ولا صورة
امرأة من نساء أثينا تُديرُ تدابيرها
. العاطفية مثلي هُنا
كم انا في المساء ذهبت الى السينما
مع احدى الصديقات
كان الهنود القدامى يطيرون في زمن الحرب ,
والسلم كالشهب الأثرية
. مثلي ومثلك
حدقتُ في طائرٍ فرأيت جناحيكَ يرتديان جناحيّ
. في شجر الأكاليبتوس
. ها نحن ننجو نجاة الغبار من النهر
من كان فينا الضحية فليحلم
. الان أكثر من غيره , بيننا
, كم أنا بعد منتصف الليل
أشرقتِ الشمس في دمنا
كم أنا أنت , يا صاحبي
كم انا ! من أنا !! ؟[১৩৫]

দুপুরে প্রতিটি আয়না কতো যে আমি ঝলমল করে তুলতাম
আনন্দময় ঈদের জন্য নিজেকে তৈরি করতাম
ফুঁসে ওঠা স্তন ছুঁয়ে উম দিতো রাত্রিতে দম্পতি কবুতর
গতকালের কামনায় ভরে উঠতো তাদের রাত।
আমি শুধু দেখি মর্মর পাথরের মতো টনটনে শিরায় শিরায়
মুক্ত বাক্যের দুধের নহর প্রবহমান–কবিদের উপর চেঁচিয়ে ওঠে
এইসব বাক্য–আমাকে তারা লেখায়– যেমন রিতসোস[১৩৬] বলেন,
কোথায় হারায় গেলে, আমার ইচ্ছা থেকে
লুকায় ফেললে কোথায় আমার নির্বাসিত জীবন
আয়নার ভিতর আমি দেখিনা আমার রূপ, দেখিনা
এথেন্সের কোনো নারীর ছবি–যারা আমার মতো
তাদের সংবেদনার কল্পলোকগুলো নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখে

কোনো এক বান্ধবীর সাথে সন্ধ্যায় কতো যে যেতাম সিনেমায়

---

[১৩৫]. দারভীশ, মাহমুদ, *সারীর আল গারীবাহ* (), পৃ. ৩২।
[১৩৬]. নোট: ইয়ানিস রিতসোস (১৯০৯-১৯৯০) গ্রিকদেশের মহান কবি। মতাদর্শগতভাবে বামপন্থী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বিখ্যাত। ১৪ এপ্রিল, ২০২৩, *https://web.archive.org/web/20081014095708/http://www.mikis-theodorakis.net/ritsos_e.html*

যেখানে প্রাচীন ভারতীয়রা যুদ্ধ এবং শান্তির কালে উড়তো
প্রত্নতাত্ত্বিক উল্কাপিণ্ডের মতো। আমার মতো তোমার মতো।
পাখির দিকে তাকালাম। দেখলাম, ইউকিলিপটাস গাছের ভিতর
তোমার ডানা দুটি পরেছে আমার ডানা।
এখানে আমরা বালুকে মুক্ত করি নদীর কবল থেকে
আমাদের মাঝে যারা ভিকটিম, তারা স্বপ্ন দেখুক
যারা এখন আমাদের মাঝে আগের চেয়ে অনেক বেশি।

মধ্যরাতের পর কতো যে আমি
যখন আমাদের রক্তের ভিতর দীপ্ত হয়ে উঠতো সূর্য
বন্ধু! আমি কতোটা তুমি–
কতোটা আমি, আমি কে?

ভাভা যে সংস্কৃতি ও ভাষার বহুস্বরের কথা বলেছেন একইসাথে উত্তর-উপনিবেশিক সমাজে কিভাবে ব্যক্তির এজেন্সি সমাজের অপরাপর স্বরগুলোর সাথে একাকার হয়েও একটি সামষ্টিক এজেন্সি হয়ে ওঠে তাতে আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি হয়না। বরং এই পরিব্যপ্ত এবং একধরনের উদার পরিসরে এসে রাজনৈতিক পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার নাম এজেন্সি নয়। পরিচয়ের সামষ্টিক কর্তাসত্তা যেখানে আরো প্রখর হয়ে ওঠতে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে এই বহুস্বরসম্বলিত সমাজ ও সংস্কৃতি বিনির্মাণের মধ্যদিয়ে। দীর্ঘ বর্ণনার পর কবিতাটির শেষদিকে এসে *আমি কে?* বলে দারভীশ সেদিকেই ইশারা করেছেন।

৩.২: 'আমি', 'অপর' এবং আত্মপরিচয়

তত্ত্বগতভাবে আত্মপরিচয় এবং জাতীয় আত্মপরিচয় সম্পর্কে বিস্তর এবং জটিল আলোচনা রয়েছে। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের একক হিসেবে ব্যক্তি ও নাগরিকতার পরিচয়, জাতি বা জাতীয় পরিচয়, সম্প্রদায়-ধর্ম-ভাষাগত পরিচয় থেকে শুরু করে মনস্তত্ত্ব, আত্মা-পরমাত্মা কিংবা বিশ্বজনীনতা ও সর্বজনীনতার পরিচয় পর্যন্ত এসব আলোচনার বিস্তৃতি রয়েছে। সাধারণ অর্থে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন প্রথমত প্রকাশ পায় ব্যক্তি পর্যায়ে। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির নানারকম দ্বন্দ্ব ব্যক্তির অভ্যন্তরে পরিচয়ের প্রশ্নকে উস্কে দেয়। চারপাশে এবং সামনে তাকে যে সমষ্টির একক পরিচয়গত শক্তির মুখোমুখি হতে হয় তাই তার পরিবর্তিত মুহূর্তের নতুন রূপ। অর্থাৎ তাকে তখন একটি ভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। যেটি মূলত তার সত্তার বাইরের বিষয় কিংবা অপর। বস্তুত পরিচয় প্রত্যয়টি সবসময় উপলব্ধ হয় অপর পরিচয়ের সাপেক্ষে। *নিজ* এবং *অপর* এমন একটি বাইনারি অবস্থানের সাপেক্ষে পরস্পরের পরিচয় নির্ণীত হয় কিংবা নিজ এবং অপর পরস্পরের নির্ধারক হয়ে ওঠে।

ধারণাগতভাবে নিজ এমন একটি বর্গ যা আত্মপরিধির আওতায় ব্যক্তির সাধারণ ইচ্ছা থেকে শুরু করে জাতি-রাষ্ট্র পর্যন্ত অবস্থিত এবং বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট সকল স্বার্থ এবং সম্ভাবনা ধারণ করে। এই স্বার্থ এবং সম্ভাবনা এমন একটি পরিস্থিতি ও শর্ত তৈরি করে যাতে *অপর* হিসেবে একটি সত্তা ও পক্ষও গড়ে ওঠে। *অপর* সত্তার গড়ে ওঠাটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে ব্যক্তির রাজনৈতিক সক্রিয়তা ছাড়াও সংঘটিত হতে পারে।

আবার ইচ্ছাকৃতভাবেও *নিজ* তার স্বার্থে *অপর* সত্তা গড়ে তোলে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তির রাজনৈতিক কিংবা জাতিগত আত্মপরিচয় এমন একটি *অপর* সত্তার উপস্থিতি ছাড়া প্রায় অসম্ভব। প্রায়োগিক অর্থে যার সম্পর্ক জ্ঞান ও ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেখানে ক্ষমতা ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা যে নৈর্ব্যক্তিক দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাই মূলত এই আত্মকেন্দ্রিক অবস্থান কিংবা আত্মপরিচয়কে অনিবার্য করে তোলে। ফলে অপরায়ণ (Otherization) ছাড়া পরিচয় সম্ভব কিনা তা একটি বিতর্কযোগ্য প্রশ্ন। মোটকথা ব্যক্তি এবং তার যাপিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা যখন ভিন্ন অবস্থায় এসে পড়ে তখন সেই পরিস্থিতিই ব্যক্তির পরিচয়ের নির্ধারক কারণ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু ব্যক্তি যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো ভৌগলিক সীমানা, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রে অবস্থান করছে, তখন তার ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারিত হয় তার রাষ্ট্র কিংবা স্বদেশের মাধ্যমে।[১৩৭] কাজে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ পরিচয়ের ডগমা (Dogma) যেমনই হোক শেষপর্যন্ত তা তার জাতি এবং রাষ্ট্রের পরিচয়ে লীন হয়। তাই বাস্তবে ব্যক্তি মূলত রাষ্ট্রের একক হিসেবে নির্ধারিত। এমন অবস্থায় ব্যক্তির পরিচয়ের সংকট মাত্রই রাষ্ট্রের সংকট। অথবা রাষ্ট্রের সংকট মাত্রই ব্যক্তির পরিচয়ের সংকট। ফিলিস্তিন মূলত এমনই এক ঐতিহাসিক সংকটের খাদে পড়ে গিয়েছিল। যেকারণে ঐতিহাসিকভাবে বিশ শতকের মাঝামাঝি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনগুলো ছিল মূলত জাতীয় আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার।

তবে ১৯৪৮-পূর্ব আত্মপরিচয় এবং তৎপরবর্তী আত্মপরিচয় একই মর্ম নিয়ে গড়ে ওঠেনি। দুটি সময়কালের পরিপ্রেক্ষিত এবং রাজনৈতিক কাঠামো এক না হওয়ায় যে সাধারণ ভিন্নতা লক্ষ করা যায়, তার ফলে ফিলিস্তিন নামক জাতি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ঠিক কিভাবে এবং কখন গড়ে উঠেছিল তা ইতিহাসবিদ্যার নীতি অনুসারে বলা মুশকিল। অর্থাৎ নিজেদের যারা আজকে *ফিলিস্তিনী*—এই পরিচয়ে পরিচয় দিয়ে থাকেন তাদের মননে কিভাবে এই আত্মপরিচয় তৈরি হয় এটি রাজনৈতিক-অর্থনীতির ইতিহাস অনুসন্ধানের দিক থেকে একটি জরুরি প্রশ্ন। একটি জনগোষ্ঠীর নানা কালপর্বে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে যেতে হয় তাতে চূড়ান্তভাবে যখন একটি পরিচয় নির্ধারিত হয়ে যায় তার জন্য তার রাজননৈতিক-অর্থনীতি এবং নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানগুলোর ইতিহাস বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ফিলিস্তিনী-আমেরিকান একাডেমিশিয়ান বাশারা দুমানির পর্যবেক্ষণ বেশ উল্লেখযোগ্য। কারণ জনগোষ্ঠী হিসেবে চলমান যে আত্মপরিচয় ধারণ করেন ফিলিস্তিনীরা তার হদিস না জানলে তাদের আত্মপরিচয়ের সামাজিক কিংবা জাতিগত কর্তাসত্তা নির্ণয় করা যায় না। দুমানি

---

১৩৭. সুলেমান, ইয়াসির, *দ্য অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ন্যাশনাল আইডেন্টিটি, আ স্টাডি ইন আইডিওলজি* (স্কটল্যান্ড: ইডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩ ইং), পৃ. ৪-৯।

মনে করেন, এই আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার মনস্তত্ত্ব ও ঐতিহাসিকতা বোঝা দরকার। যেখানে তার অনুমান ছিল, নিশ্চয়ই কোনো না কোনো রাজনৈতিক-অর্থনীতির প্রক্রিয়া ও সম্পর্কগুলোর বিচলন ছিল যাতে একটি বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিনিয়োগ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সক্রিয় ছিল। যে সম্পর্কগুলোয় প্রতিপক্ষের সাথে বিনিময়-সমঝোতা-দরকষাকষির ধরন থেকে বোঝা সম্ভব যে, এখানে একটি শ্রেণি গড়ে উঠেছিল যারা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতেন কিংবা তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণের একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফিলিস্তিনের নাবলুস শহর—যেখানে উসমানি শাসনামল থেকে এমনি একটি শ্রেণি তৎপর ছিল। আঠারো-উনিশ শতকব্যাপী জাবাল নাবলুসে নতুন ধরনের এই অভিজাত রাজনৈতিক শ্রেণি গড়ে ওঠে। আর্থিক বিনিয়োগ, লেনদেন, উৎপাদন, বাণিজ্য, কৃষিপণ্যের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের প্রক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সক্রিয়তা ছিল। এই ব্যবসায়ী শ্রেণী সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলোতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা নিতে পারতো। তাদের মধ্যে নানা সময়ে উত্থান-পতনের ঘটনাও ঘটেছে। সময়ের বিবর্তনে জাবাল নাবলুসে দি নাবলুস এডভাইসরি কাউন্সিল তাদের একটি ফোরাম হয়ে ওঠে। যেখান থেকে তারা প্রভাববিস্তারকারী নানাবিধ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে তারা সে সময়ে অটোমান সাম্রাজের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, নাগরিকত্বের বিষয়-আশয়, আত্মপরিচয়, কৃষিকর, আয়কর, আমলাতন্ত্র, সংস্কৃতি, প্রথা, ধর্ম-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা সমঝোতার চর্চা করতেন। মোটকথা উসমানী কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্কের মূল মাধ্যম হয়ে ওঠে জাবাল নাবলুসের কাউন্সিল। এর ফলে জাবাল নাবলুসই হয়ে ওঠে এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্র। কিন্তু এক পর্যায়ে জাবাল নাবলুসে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির সাথে সংঘাত তৈরি হয়। যেহেতু কৃষির উৎপাদন পরবর্তী উদ্বৃত্ত (Surplus Value) ও বাজারের নিয়ন্ত্রণ ছিল শহরের কাছে। অবশ্য এ সংঘাতের ক্রমেই নিরসন ঘটে। গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতির ব্যাপক বিকাশ ঘটায় দ্রুত অবস্থার আরো উন্নতি ঘটে। গাজা, হেবরন, গ্যালিলি, পশ্চিম তীর, নাজারেহসহ আরো কয়েকটি শহর ইতিমধ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।[১৩৮] তবে বর্তমানে পশ্চিম তীর এবং গ্যালিলি সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে।

যাইহোক, বিশ শতকের সূচনালগ্নে এই পুরো ব্যবস্থার পতন ঘটতে শুরু করে যখন জায়োনিস্টদের আগমন ঘটে। কারণ এখানে এসে তারা শুধু থাকতেই শুরু করেনি। সাথে সাথে জমি ক্রয় করে ধীরে ধীরে তারা বসতি বিস্তার করতে থাকে। ব্রিটিশদের আসার পর জায়োনিস্ট ইহুদিদের আরো সম্প্রসারণ ঘটে—তারা প্রশাসন থেকে শুরু করে অর্থনীতি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে জায়গা করে নেয়। আর তাতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা দেয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। মোটকথা, জাবাল নাবলুস থেকে শুরু করে যে রাজনৈতিক শ্রেণিব্যবস্থা ও তার সম্পর্ক এবং প্রক্রিয়াগুলোর বিস্তার ঘটেছিল তার ক্রমপতন ঘটতে থাকায় যে রাজনৈতিক চৈতন্য গড়ে উঠেছিল তারও অবনতি ঘটতে থাকে। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হলে তাদের সেই রাজনৈতিক চৈতন্য পুনরায় জেগে

[১৩৮]. দোমানি, বিশারা, *রিডিসকভারিং প্যালেস্টাইন, মার্চেন্টস এন্ড পিজেন্টস ইন জাবাল নাবলুস, ১৭০০-১৯০০* (বার্কলে: ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৩৩-২৩৬।

ওঠে। ৪৮ এর যুদ্ধ এবং নাকবা পরবর্তী পরিস্থিতিতে যে জাতিয়তাবোধ ফিলিস্তিনজুড়ে গড়ে ওঠে তার ঐতিহাসিক উপাদান, রসদ ও ভিত্তি ছিল মূলত জাবাল নাবলুস কেন্দ্রিক নগর ও কৃষির সমন্বিত রাজনৈতিকতা।

উপরের আলোচনায় মেট্রোপলিটন মনস্তত্ত্ব থেকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশের মাধ্যমে কিভাবে ফিলিস্তিনের জাবাল নাবলুসে জাতিগত এবং সামষ্টিক চৈতন্য গড়ে ওঠে তার একটি নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। তবে সামষ্টিক ও জাতিগত চৈতন্য তৈরির মৌলিকতার উৎপত্তি ঘটে অহংবোধ কিংবা 'আইনেস' (Iness—আমিত্ব কিংবা কর্তৃত্ববোধ) থেকে। আইডেন্টিটি বা আত্মপরিচয় শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সাথে এই অহং বা আমিত্ব সম্পর্কিত অর্থ ও মর্ম সরাসরি সংযুক্ত। আরবীতে আত্মপরিচয় শব্দের প্রতিশব্দ হুবিয়্যাহ (الهوية)। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে হুবিয়্যা শব্দটির রূপান্তর ঘটেছে হাওয়া (هوي) থেকে—যার উৎস বা মূলধাতু হা-ওয়া-ইয়া। হাওয়া মানে অহং, আমিত্ব, প্রবৃত্তি। কামনা-ইচ্ছা। আত্মা। সত্তা। আত্ম। আপন। নিজ। আল হুবিয়্যা'র একটি অর্থ, বস্তুর সাধারণ সত্য (হাকিকত) ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য কিংবা বস্তুর সত্তাসম্পর্কিত মৌলিক গুণাবলি। যেকারণে পরিচয় কথাটির আগে আত্ম কথাটি সংযুক্ত হয়ে 'আত্মপরিচয়' হিসেবে রূপ লাভ করেছে। অপর কথায়, ব্যক্তির নিজসম্পর্কিত উপলব্ধি, স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং নানা অবস্থানভেদে ব্যক্তিত্ব, আচরণ-চারিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাভাবনার পূর্ণ সংরক্ষণের সাথে আল হুবিয়্যাহ বা আত্মপরিচয়ের সম্পর্ক রয়েছে।[১৩৯] দার্শনিক দিক থেকে আত্মপরিচয় বলতে বুঝায়, বস্তু বা ব্যক্তির এমন সত্য যা তাকে অপর থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবে আলাদা করে দেয়। আত্মপরিচয়ের সাধারণ সংজ্ঞা-পর্যায়ের এ আলোচনায় দুটি বর্গ বা ক্যাটাগরি লক্ষ করা যায়। একটি আত্ম-অহং বা *আমি* সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি *আদার* বা *অপর*। মাহমুদ দারভীশ এবং তার কবিতা ও সাহিত্যে *আমি* এবং *অপর* এ দুটি বর্গ বিপুলভাবে লক্ষ করা যায়। যেকারণে আত্মপরিচয় সংক্রান্ত আলোচনার সাথে *আমি* এবং *অপর* দুটি বর্গ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে যেমন আত্মপরিচয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে—দারভীশের কবিতায়ও আত্মপরিচয়ের সংলগ্নতা অনুধাবন করা যায়। দারভীশ তার বন্ধু প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও বিশ্লেষক এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদকে উপলক্ষ করে যে কবিতা প্রকাশ করেছিলেন তাতে আত্মপরিচয় কথাটির একটি পরিচয়জ্ঞাপক অর্থ উদ্ধার করা যায়। দারভীশ বলেন,

[১৩৯]. ব্যক্তির নিজ ও নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত উপলব্ধি এবং বিভিন্ন অবস্থানভেদে নিজের পূর্ণতা, মূল্যবোধ, আচরণ-চারিত্র্য-কর্মপন্থা ও চিন্তার সংরক্ষণকে আত্মপরিচয় বলা হয়। দার্শনিক অর্থে– বস্তুর কিংবা ব্যক্তির হাকিকত যা তাকে অপর থেকে আলাদা করে দেয়। সুনির্দিষ্টভাবে পরিচিতি দান করে। ১৪ এপ্রিল, ২০২৩, *https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/*

আমি বললাম, পরিচয়?
তিনি বললেন: সত্তার প্রতিরক্ষা...
পরিচয় বস্তুত জন্ম-কন্যা, বরং
শেষপর্যন্ত তার মালিকেরই সৃষ্টি
শুধু অতীতের উত্তরাধিকার নয়, আমি একসাথে বহুবিধ
ভূমিকার, আমার ভিতরে বাইরে আমি নতুনতরো
তবু আমি নিহতের প্রশ্ন গ্রহণ করি।
যদি ওখান থেকে আমি না হয়ে উঠতাম তবে
ওখানে প্রতীকী হরিণ পালনে আমার হৃদয়কে প্রশিক্ষণ দিতাম
সুতরাং যেখানেই গিয়েছি সেখানে বয়ে নিয়ে যাও তোমার দেশ
আর বিষয়টি যখন অপরিহার্য হয়ে যাবে তবে হয়ে যাও এক নারগিস...

والهويَّةُ؟ قلتُ
فقال: دفاعٌ عن الذات...
إنَّ الهويةَ بنتُ الولادة, لكنها
في النهاية إبداعُ صاحبها, لا
وراثة ماضٍ. أنا المتعدِّد. في
داخلي خارجي المتجدِّدُ...
لكنني
أَنتمي لسؤال الضحيَّة. لو لم
أكن من هناك لدرَّبْتُ قلبي
على أن يُربِّي هناك غزال
الِكنايَةِ.
فاحملْ بلادك أَنَّى ذَهَبْتَ...
وكُنْ نرجسيّاً إذا لزم الأَمرُ[140]

এখানে অপর বিষয়ক পাঠ কিভাবে দারভীশের কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা বোধগম্য করে তোলাটা জরুরি। সাধারণ জ্ঞান দিয়ে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, সামাজিক পরিসরে একজন ব্যক্তির পরিচয় অপর কারো সাপেক্ষে তৈরি হয় না—যেমন সত্য তেমনি পরিচয়ের জন্য অপরের অস্তিত্বের সত্য অনুধাবন করা যায় সহজে। আধুনিক সময়ে রাষ্ট্র যেসব উপাদান ও প্রতিবেশিক কাঠামো দ্বারা জীবন্ত হয়ে ওঠে সেখানে ব্যক্তির পরিচয়ের সাথে সাথে অপরের ধারণাও স্বভাবত তৈরি হয়। অপরদিকে রাষ্ট্রের শর্তগুলোর ধারণায় না গিয়েও বলা যায়, ব্যক্তি প্রথমত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে গড়ে ওঠা একটি বিষয়বিদ্যা। নিজের অস্তিত্বের সত্য ঘোষণা দেয়ার জরুরত যখন একটি সমাজে হাজির হয় যেখানে—রাষ্ট্র ইতিমধ্যে কার্যকর নেই সেখানে ব্যক্তির পরিচয়ের ঘোষণা দেয়ার অর্থ হচ্ছে *অপর* নামক একটি বর্গের উপস্থিতিকেও অপরিহার্য করে তোলা—যেই অপরের বিরুদ্ধে কিংবা বিপরীতে তার সমস্ত অস্তিত্ব ও বিচলন প্রক্রিয়া জারি রাখতে তাকে লড়াই কিংবা প্রতিরোধের মতো অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যদিয়ে যেতে হয়। তা না হলে *অপর*'র ক্ষমতাময় পরিচয়ের সামনে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যেহেতু রাষ্ট্রহীন সমাজে আত্মপরিচয় মূলত এমন একটি বিষয় যেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। ফলে অপর'র সত্যের মুখোমুখী হয়ে আত্মপরিচয়ের সত্য প্রতিষ্ঠা

[১৪০]. দারভীশ, মাহমুদ, *মাদীহ আল জিল আল আলী* (বৈরুত: দার আল আওদাহ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৬৮।

অনিবার্য নিসন্দেহে। বলা বাহুল, অপর'র সত্য যেখানে হানাদারী, আক্রমণাত্মক এবং দখলদার এমন অবস্থায় ইজরাইল এবং যায়োনিজমের বিপরীতে নিজের পরিচয়ের রাজনীতি কিংবা আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা *অপর*'র চেয়েও বেশি উচ্চারিত প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে ফিলিস্তিনের জনগোষ্ঠীর কাছে। ফলে দারভীশের কবিতায় দেখা যায় আত্মপরিচয় একটি মৌলিক উপাদান এবং সাধারণ অনুষঙ্গ।

আত্মপরিচয়ের সারাংশ সেল্ফ কিংবা অহংবোধ। এর নির্মাণ এবং কাঠামো যে উপায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে দারভীশের কবিতায় তার মধ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে *আমি* (أنا) কিংবা *আমি*'র রূপক ও প্রতীক প্রধান হয়ে ওঠে। কর্তৃত্ববাচক অবস্থানে থেকে আমি কিংবা আমির রূপক এবং আমির নির্দেশক (ইম্পেরাটিভস) সরাসরি এবং কখনো কখনো পরোক্ষভাবে একটি অন্তপ্রবাহ বিস্তার করে রাখে। দারভীশ আত্মপরিচয়ের মর্মার্থ এবং মূলকথার সাথে এই আমিকে কবিতার এজেন্সির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অপরিহার্য করে তুলেছেন। রাজনৈতিক কিংবা রাজনীতির দার্শনিক বিচারে এই *আমি* গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা দিতে পারে। অপরের সাপেক্ষে যে দার্শনিক আমি এই আমি নিছক সেই আমি নয়, একইসাথে আমি নিজেও অপর। কিন্তু স্বাধীন সত্তার জন্য *অপর* এবং *আমি* দুই অপরিহার্য। নিচের পঙক্তিগুলো পাঠ করা যাক...

আমি কি তুমি—আমার অপর	هل أنا أنت إخري
বস্তুত তুমি আমি এক অপর	وأنت أنا أخر
স্বাধীনতার ভূমিতে যাওয়ার এ পথ আমার নয়	ليس هذا طريقي الي أرض
এ নয় আমার পথ নিজের দেহে প্রবেশ করার	حريتي
এবং আমি... দুইবার কখনো আমি হয়ে ওঠবো	ليس هذا طريقي الي جسدي
না	وأنا لن أكون أنا مرتين[১৪১]

সহজ সাবলিল এ পঙক্তিগুলো। স্বাধীন সেল্ফ কিংবা স্বায়ত্বাধীন বিষয়টি কেমন তার একটি স্বরূপ ফুটে উঠেছে। দারভীশ এবং তার দেহ-আত্মা এবং তার ভূখণ্ড স্বাধীনতার প্রশ্নে এক এবং অখণ্ড। রাজনৈতিক চৈতন্যের দিক থেকে স্বাধীনতার যে অর্থ আমরা বুঝতে চাই তার ক্রমবিকাশের সূচনা ঘটে *আমি* থেকে। স্বাধীনতা এবং আমি সেকারণে একই আকার এবং একই সারবস্তুর নির্দেশক। আমি'র অর্থ, মর্ম এবং ব্যবহার বিচিত্র। দারভীশের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য যেমন নিজের উপস্থিতি কার্যকর রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য *আমি* কিংবা উত্তম পুরুষরূপে নিজেকে সবসময় দৃশ্যমান রাখা। স্বাধীনতা, কর্তৃত্ববাদী অহং, আত্মপরিচয় শত্রুর ধারণার দিক থেকে এবং শত্রুবিষয়ক রাজনৈতিকতার কারণে আমি এবং তার অর্থ দারভীশের কবিতায় বিপুল এবং গভীরভাবে এসেছে। এই সেল্ফ কিংবা আমি'র ফেনোমেনলজির (বিষয়বিদ্যা) সাথে রাজনৈতিক হয়ে ওঠার বিষয়টি সেকারণে গুরুত্বপূর্ণ। আমি শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে নিজেকে প্রকাশ করার বিষয় কেবল যুক্ত নয়, নিজের পরিচয় ও স্বয়ং উপস্থিতিকেই জরুরি করে তোলা নয়—বরং একইসাথে নিজের স্বায়ত্বাধীন একটি কার্যকর প্রতিবেশ ও পরিস্থিতি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। এই আমি অখণ্ড এবং নিখাদ

[১৪১]. দারভীশ, মাহমুদ, *সারীর আল গারীবা* (বৈরুত: রিয়াদ আলরাইস লি আলকুতুব ওয়া আলনাশার, ১৯৯৯ খ্রি), পৃ. ৭।

একক। আমি মূলত সমষ্টির কিংবা বহুবৈচিত্র্যের একটি পারমাণবিক মৌল। এর কোনো যৌগিকতা নেই। খাদ নেই। কারণ দারভীশ মনে করেন, একটি জাতির জাতি হয়ে ওঠার জন্য এবং রাজনৈতিক হয়ে ওঠার জন্য তার মূল ও বীজ হিসেবে কাজ করে তার *আমি*—যেখানে কোনোরকম মিশ্রণ থাকা যায় না। খাদ থাকা যায় না। এটি কেবল এবং নিছক। যেকারণে দারভীশ বলেন, *'এবং আমি... দুইবার কখনো আমি হয়ে ওঠবো না'* । *আমি*'র আসলে দুইবার আমি হওয়া যায় না। এখানে দারভীশ ইঙ্গিত করছেন যে, আমি এমন একটি মৌলিক ও বিমূর্ত বস্তু যার পরিগঠন কিংবা সৃষ্টি একবারেই হতে হয়, অবিমিশ্রিত। আরো বোধগম্য করে তোলার জন্য নিচের কবিতাংশটি পাঠ করে নেয়া যাক। দারভীশ যে আমি বা খুদির কথা বলছেন, তার অরগানিজম এবং শিকড় কতোটা শক্তিশালী, ব্যাপক এবং রাজনৈতিক ও দার্শনিক দিক থেকে কতোটা গভীর এই কয়েকটি পঙক্তি থেকে তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। দারভীশ বলেন,

একদিন আমি হয়ে যাবো এক ভাব কোনো তরবারি নাই যা তাকে বয়ে নিবে বিধ্বস্ত পৃথিবীর বুকে, না কোন গ্রন্থ... যেন তা এক পশলা বৃষ্টি পাহাড়ের ওপর এতটুকু তৃণের উদ্বোধনেই বিদীর্ণ হয়ে যায় না কোনো শক্তি তার উপর জয়ী হয় না কোনো ভবঘুরে তাড়িত আদালত।	سأصير يوما فكرة. لا سيْف يحملها إلي الأرضِ اليبابِ ، ولا كتاب كأنّها مطر علي جبلي تصدّع من تفتّح عشْبة، لا القوّة انتصرتْ ولا العدْل الشريد[142]

এখানে পরিচয়ের অন্যরকম একটি পর্যায় দেখা গেল। নিজের পরিচয় কিংবা নিজের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে। রাজনীতি আর রূহানিয়্যাত এই দুই অবস্থা মিলেমিশে এক হলে একজন মানুষের মাঝে কি ধরনের স্তর বিকশিত হয় তার একটি পরম নমুনা অনুধাবন করা যায় এই পঙক্তিগুচ্ছতে। বিরুদ্ধ শক্তির বিপরীতে–জুলুম ব্যবস্থার প্রতিকূলে নিজের অন্তর্গত সত্তার সর্বোচ্চ বিকাশ জরুরি। নিজের আত্মা কিংবা খুদিকে এমন স্তরে নিয়ে যেতে হবে যাতে কোনো নিপীড়ক ক্ষমতা কাঠামো কিংবা কোনো জালেম বিচার প্রক্রিয়া তাকে পরাভূত করতে না পারে। দারভীশ যখন এই কবিতা লিখছেন, বলা বাহুল্য, তিনি ইতিমধ্যে তখন দুনিয়ার সবথেকে নির্মম এবং হানাদার এক শক্তি কর্তৃক সৃষ্টি করা ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়ে নিজের এবং তার জনগোষ্ঠীর মোকাবেলার কথা ভাবছেন। সার্বক্ষণিক যে শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই একমাত্র অবলম্বন—বস্তুত সেখানে তার আপন জনগোষ্ঠীর প্রখর এবং কঠোর মানসিক ও আত্মিক শক্তির বিকল্প নাই। নিজের সম্পর্কের কিংবা নিজের ব্যক্তিত্বের মানসিক ও আত্মিক সক্ষমতার এক পরম এবং অ্যাবসোল্যুট পর্যায় নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন দারভীশ। তার কবিতার এটি ভিন্ন এক নান্দনিক প্রকাশ যা নিছক আধ্যাত্মিক বলে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

---

[১৪২]. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ* (বৈরুত: রিয়াদ আলরাইস লি আলকুতুব ওয়া আলনাশার, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২-৩।

পরিচয় এমন এক বর্গ হিসেবে দারভীশের কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে যা শুধু *জাতীয় আত্মপরিচয়* নামক চিন্তার মধ্যেই আটকে থাকেনি। তদুপরি জাতীয় পরিচয় এটি এমন এক সত্য ফিলিস্তিনের জনগোষ্ঠীর জন্য যা তার অস্তিত্বের নির্ণায়ক এবং অপরিহার্য উপাদান। ফলে দারভীশ যখন পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন তার বিপুল রচনায় তখন তার প্রাথমিক এবং সাধারণ পর্যায় শুরু হয় জাতীয় আত্মপরিচয়ের প্রতিষ্ঠার প্রশ্নকে ঘিরে। তবে দারভীশ জাতীয় কিংবা সামগ্রিক পরিচয়ের নিগড় অনুসন্ধান করেছেন ভিন্নভাবে। একইসাথে তার সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন পরিচয়ের উচ্চমার্গীয় পর্যায় নির্ধারণ করে। অর্থাৎ পরিচয়কে নিছক একটি চিন্তার মধ্যেই আটকে রাখেননি কেবল তার মুক্তিও ঘটিয়ে দিয়েছেন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্বের প্রামাণ্য বাধ্যবাধকতার সীমানায় ঘুরপাক খাওয়ার দশা থেকে। ফলে পরিচয় কখনো কখনো একটি বিশেষ শক্তির দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে তার কবিতায়। যাতে পরিচয় বস্তুত এক অবিস্মরণীয় উপাদান, ইতিহাসের গহবর থেকে বেরিয়ে আসার দায় নেই যার কিন্তু এটি এমন অখণ্ড একক যা তীব্রভাবে বর্তমান। সক্রিয় পদার্থ। সেকারণে দারভীশ পরিচয়কে একটি সম্প্রদায়গত চিন্তার জটিলতার মধ্যেও আটকে রাখতে রাজি নন। পরিচয়কে তাই তিনি নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ পরিচয়ের সারসত্য যতোটা জাতিয়তার কিন্তু তার চেয়ে তা আরো বেশি রাজনৈতিক। রাজনৈতিকতা কিংবা রাজনৈতিক হয়ে ওঠা পরিচয়ের এক অনন্য স্বরূপ। দারভীশ বলেন,

আমি পড়েছি প্রত্নতত্ত্ব
তবে খুঁজতে যাইনি পাথরে
খচিত আত্মপরিচয়। আমি
কি সত্যি আমি?
এক সিপাহী বললেন,
আমিও। আমাকে মুগ্ধ
করে না কোনো কিছু। যে
রহস্যময় ছায়া আমায়
ঘিরে রাখে অথচ আমিই
তারে ঘিরে রাখি
প্রতিনিয়ত।

دَرَسْتُ الأركيولوجيا
دون أَن أَجِدَ الهُوِيَّةَ في
الحجارة. هل أنا
حقاً أَنا؟/
ويقول جنديٌّ: أَنا أَيضاً.
أَنا لا شيءَ يُعْجبُني.
أُحاصِرُ دائماً شَبَحاً
يُحاصِرُني/.[143]

কিংবা

Fine, fine. He knows his duty: *my identity—my gun.* Why then do they level against him countless

[১৪৩]. দারভীশ, মাহমুদ, *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা* (বৈরুত: রিয়াদ আলরাইস লি আলকুতুব ওয়া আলনাশার, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮৫।

accusations: making trouble, violating the rules of hospitality, creating problems, and spreading the contagion of arms? When he holds his peace, his soul is taken out to the stray dogs;[144]

ভালো, ভালো। সে তার দায়িত্বের কথা জানেঃ আমার পরিচয়—আমার বন্দুক। এরপর কেন তারা তার বিরুদ্ধে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আতিথিয়েতা-মানবিকতার রীতিনীতি ভঙ্গ করে, সমস্যা তৈরি করে, অস্ত্রের বিস্তার ঘটিয়ে এতো অভিযোগ তোলে? আবার যখন সে শান্তির কথা বলে তখন (বলা হয়) তার বিবেক বিভ্রান্ত।

রাজনৈতিকতা পরিচয়ের মৌলিক বস্তু। আধুনিক কালের চিন্তাধারা অনুসারে এর পূর্বানুমান হলো, তার বিপরীত বর্গ কিংবা অপর। দারভীশ পরিচয়ের নতুন সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করলেও আধুনিক চিন্তা ও দর্শন থেকে মুক্ত থাকতে চাননি। পরিচয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি মাথায় রাখলে আত্মপরিচয়ের বিপরীতে 'আদার' বা অপর এবং অপরায়ণের ধারণার উৎপত্তি বোঝা সম্ভব। যাইহোক, দারভীশের কবিতায় অপর বলতে ইজরাইল এবং তার দখলদারিত্ব ও আধিপত্যবাদী রাজনীতি এবং যায়োনিজমের অপরায়ণ-চিন্তা, নীতি ও প্রক্রিয়া। অপর এবং অপরায়ণ দুটি আলাদা এবং কিঞ্চিত বিপরীতধর্মী বস্তু। দারভীশ তার বিপরীত এবং বিরুদ্ধশক্তিকে অপর হিসেবে শনাক্ত করতে আগ্রহী। এটি তার রাজনৈতিক অবস্থান। কিন্তু অপরায়ণ একটি চিন্তামূলক এবং মতাদর্শিক বর্গ। যায়োনিজমের একটি মৌলিক দিক হল, অপরায়ণ প্রক্রিয়া। নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও মতাদর্শের বাইরের পক্ষগুলোকে সাধারণভাবে অপর হিসেবে গণ্য করাই যার মৌল চিন্তা। অপরায়ণ এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে তার নিজের অবস্থানের বাইরের সবাইকে চূড়ান্তভাবে নাকচ করা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, উদ্দিষ্ট অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করা। দুর্বল জ্ঞান করা। নিজেকে অ্যাবসোল্যুট মনে করা যাতে অপরের উপর নিজের মাস্টারসুলভ (প্রভু বা কর্তাসুলভ) ক্ষমতা চরিতার্থ করা যায়।[১৪৫] দারভীশ আদারিং বা অপরায়ণের চিন্তা ও প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এই অর্থে দারভীশের চিন্তার অপর হলো জায়োনিজম এবং তার অপরায়ণ প্রক্রিয়া। যায়োনিজমের আদারিং (আদারিং) বনাম দারভীশের অপর একটি বাইনারি চিন্তাও। কবিতা এবং কবিতায় বাহিত চিন্তার বিশ্লেষণের দিক থেকে দারভীশের 'অপর'মূলক চিন্তার উৎপত্তিই শুধু ঘটেনি ক্রমবিকশিতও হয়েছে। যাতে *অপর* একটি বিচিত্র ধারণা হয়ে ওঠে দারভীশের কবিতায়। ফলে যায়োনিজমের অপরায়ণের মোকাবেলায় দারভীশের অপর মূলত একটি প্রকল্পও কারণ এর মধ্যদিয়ে যায়োনিজমের আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি এবং অপরায়ণ প্রক্রিয়াকে *নরমালকরণ* করা যায়। কবিতাংশটির শেষ পঙক্তিতে 'অপর'কে পরীক্ষা

[১৪৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *মেমোরি ফর ফরগেটফুলনেস*, পৃ. ৮।
[১৪৫]. অ্যাশরফট, বিল, *পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডিজ, কী কনসেপ্ট*। পৃ. ১৫৬।

করার কথা বলা হয়েছে। এখানে পরীক্ষা কথাটির অর্থ মূলত মোকাবেলা। অপরকে মোকাবেলা করা। শত্রুর মোকাবেলা করা কিংবা মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করা একটি স্বাভাবিক কর্ম।

অতএব নামকে বলি: আমাকে ছেড়ে দাও বিচ্ছিন্ন হও আমার থেকে। কারণ কথা বলার পর থেকে আমি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছি। প্রসারিত হয়েছে তোমার গুনগুলি। ধারণ করো আমার চারিত্র্য এবং পরীক্ষা করো আমার অপর	أما أنا، فأقول لاسمي: دعك مني وابتعد عني ، فاني ضقت منذ نطقت واتسعت صفاتك! خذ صفاتك وامتحن غيري...[146]

একদিকে একটি বিশেষ টেরিটোরি—বিশেষ এই কারণে যে, যেখানে জায়োনিস্ট রাষ্ট্র এবং তার সীমা চৌহদ্দি দখলদারি এবং খোদ হানাদারি প্রকল্প—ঠিক তার বিপরীতে তার অবজেক্ট হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে আদিম জনগোষ্ঠী ফিলিলিস্তিনকে। তার বিপরীতে জোর দখল করে গড়ে তোলা একটি রাষ্ট্র নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে তিনটি কৌশলকে সামনে রেখে একটি হল ফিলিস্তিনকে ক্রমাগত গলাধকরণ, সীমান্ত সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠাকরণ। তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক রাজনীতির দিক থেকে ফিলিস্তিনকে অপর এবং বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে ইজরাইলী কিংবা জায়োনিস্ট ব্যক্তি ও জাতিগত পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা। অপরমূলক ধারণা বস্তুত বিচ্ছিন্নকরণের ধারণা। আধুনিক চিন্তাধারায় স্বাধীন ব্যক্তির অবস্থান ধারণাগতভাবে আলাদা—এ বক্তব্য আধুনিক রাষ্ট্রে এবং সমাজে যে অর্থ প্রকাশ করে জায়োনিস্ট চিন্তায় আদার'র ধারণা সমার্থ প্রকাশ করে না। ব্যক্তি স্বাধীন—এই কথার মানে আলাদাকরণ বা অপরমূলক নয়। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাধীন অবস্থান অপরাপর ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করে কিংবা নাকচ করে নিজের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে না। ব্যক্তির স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন জীবন যাপন প্রক্রিয়া আর জায়োনিস্ট চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত আদারিং কিংবা আদারনেসের ধারণা এক নয়। জায়োনিস্ট চিন্তা কাঠামোয় আদারনেস একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা। এর নিগড় গ্রন্থিত রয়েছে জায়োনিস্ট ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তা কাঠামোয়। হিব্রু ভাষায় রচিত ইহুদিদের বাইবেলে আদারনেস সম্পর্কিত আলোচনা বিস্তারিত রয়েছে। বাইবেলে 'আদারনেস' শব্দটি বিশেষ এবং ইউনিক একটি চিন্তা ও নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ এর মাধ্যমে একজন ইহুদি এবং জায়োনিস্ট সম্প্রদায় সমগ্র মানবগোষ্ঠী থেকে নিজেদের আলাদা করে নিতে পারে।[১৪৭] যাতে তারা একক, বিশেষ-অনন্য এবং অ্যাবসোল্যুট ভিন্ন এক জাতি হয়ে উঠতে পারে। জাতিগতভাবে এবং বর্ণগত দিক থেকে নিখাদ এবং অবিমিশ্রবাদিতাকে ধর্মতাত্ত্বিকভাবে অবশ্য পালনীয় একটি বিধি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। জায়োনিস্ট চিন্তার এই

---

[১৪৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা*, পৃ. ৭৫।

[১৪৭]. ভি অ্যাডেলম্যান, ডিনা, *YHWH's 'Othering' of Israel,* (নরওয়েঃ ইউনিভার্সিটি অফ অসলো, ২০১৪ খ্রি,), পৃ. ২-৩। ১৫ এপ্রিল, ২০২৩, *(https://www.academia.edu/3621327/YHWH_s_Othering_of_Israel),* আবীর, নাজ্জার, *আদারিং দ্য*, *সেল্ফঃ প্যালেস্টাইনিয়ানস ন্যারেটিং দি ওয়ার অন গাজা ইন দি সোশ্যাল মিডিয়া* (শারজাহঃ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব শারজাহ, জানুয়ারি ২০০৯) পৃ.। (PDF) Othering the Self: Palestinians Narrating the War on Gaza in the Social Media (researchgate.net)

অবিমিশ্রবাদের মধ্যেই আদারনেসের নিগড় গ্রথিত। আদারনেস এমন একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া যাতে অন্যসব দেশ রাষ্ট্র বর্ণ জাতপাত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ থেকে নিজেদের আলাদা করার মধ্যদিয়ে ইজরাইলের ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইহুদি বিধানের অন্যতম হলো প্রতিশ্রুত এবং মনোনীত জাতি ও ভূমি। ইহুদি বিধান মতে, তারাই একমাত্র ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত; এবং তাদেরকেই একমাত্র একটি বিশেষ ভূমি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে—যা আর কাউকে দেয়া হয়নি বা দেয়া যাবেনা।[১৪৮] প্রতিশ্রুতি এবং মনোনয়ন'র এমন বিশ্বাস ও ধারণার মধ্যেই অপরায়ণের বীজ নিখুঁতভাবে রয়ে গেছে। আদারনেস এর ধারণা ইহুদি ধর্মতত্ত্বের এসব ধারণার উপজাত চিন্তা ও নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু এটি ধর্মতাত্ত্বিক সেকারণে এর যেমন রাজনৈতিক ব্যবহার রয়েছে তেমনি সাংস্কৃতিক ব্যবহারও রয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এমনকি নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে এর মনস্তাত্ত্বিক প্রকল্প রয়েছে। কাঠামোগত রাজনীতির বাইরে কি করে আদারনেস ইজরাইল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে তার নিয়ন্ত্রণ প্রবহমান রেখেছে বিবিধ প্রক্রিয়ায়—নৈর্ব্যক্তিকভাবে। আদারনেসের সক্ষমতা মনস্তত্ত্বগত দিক থেকে ব্যাপক। কারণ এটি শুধু ক্ষমতার ভরকেন্দ্র থেকে ক্রিয়া করে না কিংবা এর উৎপত্তি ঘটে না বরং এটি একইসাথে পারস্পরিকও বটে। অর্থাৎ এটি শুধু ফিলিস্তিনেই নয়, একইসাথে ইজরাইল ও ফিলিস্তিনে কার্যকর হতে পারে। উভয়কেই আক্রান্ত করতে পারে কিন্তু এর কেন্দ্রীয় উৎপত্তিস্থল হতে পারে ক্ষমতার উৎস ইজরাইল। ঐতিহাসিকভাবে এর সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৮-এ সংঘটিত নাকবার মাধ্যমে। ওই ঘটনায় ইজরাইল এবং পশ্চিমা উভয়ের পারস্পরিকতার মাধ্যমে আদারনেসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আদারনেস'র ভিতরকার সবথেকে জটিল এবং কার্যকর ধারণা বা বর্গ হল *রেসিপরোসিটি* বা পারস্পরিকতা। বস্তুত কৌশলগত নীতি অনুসরণের মাধ্যমে এর স্বরূপ কি তা অনুধাবন করা যায়। বিশেষত কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কৌশলগত প্রক্রিয়ায় এই *রেসিপরোসিটির* ধারণা কার্যকরভাবে সংঘটিত হয়। অপরপক্ষকে যেখানে নানাবিধ কূটনৈতিক ভাষাগত সৌন্দর্য্যের আতিশয্যে নিজেদের নীতি ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার প্রয়াস করা যায়। ঐতিহাসিক একটি ঘটনায় এটি বোঝা সম্ভব। ঘটনাটির উদ্ভব ঘটে কর্তৃপক্ষীয় ক্ষমতা কাঠামো জায়োনিস্ট থেকে। জায়োনিস্ট প্রকল্প যখন কোনোকিছু সরাসরি রাজনৈতিকভাবে লাভ করতে চেয়েও করা যায়না মনে করে, তখন তারা অন্যভাবে কাজ করতে চায়। এর জন্য তাদের বিধি হয়ে ওঠে *রেসিপরোসিটি*।[১৪৯] এর মাধ্যমে কিছু লক্ষ্য অর্জন করে নিতে চায় তারা। এর সবথেকে সুন্দর এবং কার্যকর উদাহরণ হলো ক্যাম্প ডেভিড এবং অসলো চুক্তির ঘটনা। এ চুক্তিগুলোতে ফিলিস্তিন তার স্বার্থের কারণে সমঝোতায় আসতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু স্বার্থ এবং অধিকার কতোটা নিশ্চিত হয়েছে তা তারা পরবর্তীতে বুঝতে পারে। ফিলিস্তিন বুঝে ফেলে যে, এ চুক্তিদ্বয় তাদের স্বার্থ প্রণিধান করেনি। কিন্তু ততোক্ষণে ইজরাইল তার লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। এই হলো রেসিপরোসিটি। তবে দৃশ্যত, এটি নৈর্ব্যক্তিক হলেও রেসিপরোসিটি বা পারস্পরিকতার ফাঁদে ফেলে ইজরাইল ফিলিস্তিনকে আদারাইজ করতে সক্ষম হয়েছে। এটি জায়োনিস্ট কর্তৃক ফিলিস্তিনকে ডিহিউম্যানাইজড করার সহজ এবং ঝামেলাবিহীন প্রক্রিয়া।

---

[১৪৮]. মারচেদোর, আল্যাঁ, ডেভিড নিওহজ, *দি ল্যান্ড, দি বাইবেল, দি হিস্ট্রি: টোয়ার্ড দ্য ল্যান্ড দ্যাট আই উইল শো ইউ* (নিউইয়র্ক: ফরঢাম ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৯-১৫০।

[১৪৯]. শেহি, লারা, শেহি, স্টিফেন, *অ্যানএক্টম্যান্টস অফ আদারনেস অ্যান্ড সার্চিং ফর আ থার্ড স্পেস ইন দি প্যালেস্টাইন-ইজরাইল মেটরিক্স, সাইকোঅ্যানালিসিস, কালচার এন্ড সোসাইটি* (ওয়াশিংটন: ম্যাকমিলান পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৮৮।

তবে দারভীশের *আদার* শেষপর্যন্ত একটি নরমাল এর ধারণা যেমন তেমনি এটি ব্যক্তির বিশেষ সত্য—যাতে রাজনীতি এবং শিল্পবোধ একইসাথে গড়ে উঠতে সক্ষম। এটি একটি সাংস্কৃতিক পরিসরের প্রশ্নও বটে। ফিলিস্তিনে যেসব প্রতিরোধ চিন্তা সক্রিয় রয়েছে তার মধ্যে ইজরাইলের সাধারণ ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার চিন্তা কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ইজরাইলের ইহুদি জনগণের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার মধ্যদিয়ে বস্তুত যায়োনিজমের আদারনেস প্রকল্পকে নরমাল করা ফিলিস্তিনী রাজনীতির অভ্যন্তরীণ নীতি।[১৫০] দারভীশের চিন্তা এবং কাব্যতৎপরতায় যায়োনিজমের আদারনেসের বিপরীতে যে সক্রিয়তা দেখা যায় তার একটি দিক আদার আর অপরটি হলো *নরমালাইজিং*। মোটকথা ফিলিস্তিনে যেখানে ইজরাইল কর্তৃক আদারিং চলমান ঠিক তার বিপরীতে নরমালাইজিং ফিলিস্তিনী সংগ্রামের একটি কার্যকর দৃষ্টান্ত।[১৫১] দারভীশের কবিতায় কিংবা চিন্তায় ইজরাইল সম্পর্কিত যে ধারণা গড়ে উঠেছে তাতে জায়োনিজম এবং সাধারণ ইহুদি সম্প্রদায় ভিন্ন বর্গ এবং শ্রেণি হিসেবে পরিচিত। নরমালাইজিং বস্তুত আদারিং-কে প্রতিরোধ করার একটি প্রক্রিয়া। আদারিং-কে স্বাভাবিকিকরণের মাধ্যমে মূলত আদারিং এর নিরাকরণ ঘটানো যায়। *হালাতু হিছার* কাব্যগ্রন্থে দারভীশ বলেন,

দোরগোড়ায় অপেক্ষমান হে, ভিতরে আসো
আমাদের সাথে পান করো আরবীয় কফি
তোমরা হয়ত ভাবো—তোমরা আমাদের মতোই মানুষ
ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো হে,
আমাদের ভোরগুলো থেকে বের হয়ে যাও
আমাদের সুখ হয় যখন আমরাও
তোমাদের মতো মানুষ!

أَيُّها الواقفون علي العَتَبات ادخُلُوا،
واشربوا معنا القهوةَ العربيَّةَ
قد تشعرون بأنكمُ بَشَرٌ مثلنا
أَيها الواقفون علي عتبات البيوت
اُخرجوا من صباحاتنا،
نطمئنَّ إلي أَننا
بَشَرٌ مثلكُمْ![152]

যখন ঐতিহাসিকতার প্রশ্ন আসে কিংবা সক্রিয় সম্পর্ক এবং লিপ্ততার প্রশ্ন আসে তখন আমি'র বিপরীত যে অপর তার বাস্তবতার নামই হলো ইজরাইল। বলা বাহুল, দারভীশ যে আমি'র বিস্তার ঘটিয়েছেন তার উপলক্ষ এবং অনুঘটক মূলত ইজরাইল এবং জায়োনিজম। ক্রমেই তা স্পষ্ট হয়ে

---

১৫০. প্রাগুক্ত।
১৫১. হাম্মামি, রেমা, *অন (নট) সাফারিং অ্যাট চেকপয়েন্ট; প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যারেটিভ স্ট্র্যাটেজিস অব সারভাইভিং ইজরাইল'র কারসেরাল জিওগ্রাফি* (অস্ট্রেলিয়া: বর্ডারল্যান্ডস জার্নাল, ভলিয়ম-১৪, নঃ ১, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৬।
১৫২. দারভীশ, মাহমুদ, *হালাতু হিছার*, পৃ. ১৮।

উঠেছে তার কবিতায়। কখনো তিনি সরাসরি কখনো রূপক ও প্রতীকের ছায়ায় তার *অপর*'র বয়ান নির্মাণ করেছেন। বিমূর্তভঙ্গিতে দারভীশ তার অপরের বিপরীতে নিজের অবস্থান জানান দিয়ে গেছেন।

কবুতরের নিশানাগুলোর জন্য—আমাদের ছায়ার জন্য
আমাদের নিজস্ব অস্ত্রের জন্য
আমাদের ধার করা অস্ত্রের জন্য
মধ্যাহ্নে এসে পৌছে গেছে দিন
তোমার কাছে থেকে কতো তরঙ্গ ইঙ্গিতে
ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তোমারই হাত
এবং আমার অপেক্ষায়
আদিম পাথর থেকে উদ্ভূত সমুদ্রের সমুখে
রাখো আমাদের আকার সাকার
এবং বয়ে যাও তোমার অবসর আর আমার অপেক্ষা

انتصف النهار
لرايات الحمام لظلنا،
لسلاحنا الفردي
لسلاحنا المستعار
ليديك كم من موجة
سرقت يديك
من الإشارة وانتظاري
ضع شكلنا للبحر عن
أول صخرة
واحمل فراغك
وانتظاري[153]

এই অপেক্ষা বস্তুত অপরের কারণে। আর সেই কারণ ইজরাইল। ইজরাইলিজম কিংবা জায়োনিজম একই দেহের একই রূপ। এখানে জায়োনিজম ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য নয়, তবে যায়োজিমের অপরমূলক ধারণা ও অনুশীলন দারভীশের কবিতায় জরুরি আলোচনাগুলোর অন্যতম। একইসাথে দারভীশের কাব্যব্যক্তিত্বের প্রবণতা এবং অভিমুখ শনাক্ত করা সম্ভব। দারভীশ বলেন,

যদি তুমি হও তোমার অপর—আমার অপর হই আমি
অথচ আমরা দুজন বন্ধু
স্বীকার করে যারা বোকামির প্রয়োজন...
বোকামির... যেমন 'বন্দুক ব্যবসায়ী'র মাঝে
ইহুদিদের জন্য রয়েছে হৃদয় এবং রুটি
যখন সেথায় ডুবে থাকে দুই চোখ।

لو كنتَ غيرك، لو كنتُ غيري
لكنّا صديقين يعترفان بحاجتنا
للغباء...
أما للغبيّ ، كما لليهودي في
" تاجر البندقية" قلب، وخبز
وعينان تغرورقان؟[154]

[153]. দারভীশ, মাহমুদ, *মাদীহ আল জিল আলী*, পৃ. ।
[154]. দারভীশ, মাহমুদ, *হালাতু হিছার*, পৃ. ৭৩।

ফিলিস্তিনে ইজরাইলি আগ্রাসনের অভিজ্ঞতা যায়োনিজমের অপরমূলক (Otherness) চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটিয়েছে দারভীশের কবিতায়। যে ঐতিহাসিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক অভিজ্ঞান ও বয়ানে যায়োনিজমের অপরমূলক ধারণার জন্ম হয়েছে দারভীশ সেই পুরাকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সমসাম্প্রতিক ইজরাইলের আগ্রাসী প্রকল্পের সাথে মিলিয়ে। পবিত্র কোরআনে এমনকি বাইবেলে নবী ইউসুফ (আ) এবং তার সহোদর ভাইদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা ছিল দারভীশের কবিতায় উঠে আসা জায়োনিস্ট অপরায়ণের গভীর উপজীব্য।
হযরত ইউসুফ শিশু বয়সেই তার অপর দশ ভাইয়ের ক্ষোভ, হিংসা ও জিঘাংসু মনস্তত্ত্বের শিকার হন। অতি শৈশবেই পিতার (নবী ইয়াকুব) ভালোবাসা-মায়া আদরের জাল ছিন্ন করে হিংসার বশবর্তী হয়ে ইউসুফকে নির্জন কূপে ফেলে দিয়েছিলেন তার অপর দশভাই। এ ঘটনার মধ্যদিয়ে বস্তুত জায়োনিস্ট চিন্তায় আদারনেসের উৎপত্তি ঘটে। এ ঘটনার ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বহু তত্ত্ব ও চিন্তার জন্ম হয়েছে। ধর্মতত্ত্বের পরিসর থেকে শুরু করে দর্শন, নৃতত্ত্ব, মনোবিশ্লেষণ, ইতিহাসবিদ্যা ও পুরাতত্ত্বের (মাইথোলজি) বিস্তার ঘটেছে।

ঘটনার সময়ে ফিরে আসা যাক। হযরত ইবরাহীম (আ) এর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার ঔরসে প্রথম সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। অপরদিকে প্রথম স্ত্রী হযরত সারার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন দ্বিতীয় সন্তান হযরত ইসহাক (আ)। হযরত ইসহাক থেকেই হযরত ইয়াকুব (আ) এর জন্ম। ইয়াকুব থেকে ইহুদি কিংবা ইজরাইলী ধারার উদ্ভব ঘটে। হযরত ইয়াকুব এর একাধিক স্ত্রী ছিলেন। তাদের সবার ঘর মিলিয়ে বারো সন্তানের জন্ম হয়। তবে এখানে প্রাসঙ্গিক হলো, হযরত ইউসুফ (আ) এবং বিন-ইয়ামিন। যারা ছিলেন একই মায়ের ঔরসজাত। অর্থাৎ বিন ইয়ামিন আর ইউসুফ ছিলেন সরাসরি সহোদর। আর দশ ভাই ছিলেন নবী ইয়াকুবের অন্যান্য স্ত্রীদের ঔরসজাত। ইউসুফ এবং বিন-ইয়ামিনের একই মায়ের সন্তান হওয়ার বিষয়টি অন্য দশ ভাইয়ের জন্য মানসিকভাবে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্যায় আরো বেশি আগুন ঢেলে দেয় তাদের প্রতি নবী ইয়াকুবের একটু বেশি ভালোবাসা ও আদর। কিন্তু বাবা কখনো তাদের আলাদা করে চিন্তাও করতে পারতেন না। ইউসুফ ছোট হওয়ায় তার প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ স্বভাবতই বেশি ছিল। কিন্তু একটা সময়ে অপর দশ ভ্রাতা এটা মেনে নিতে পারেননি। তারা পরিকল্পনা করলো তাকে পিতার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার। তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার চিন্তা আঁটলো তারা। একেবারে মেরে ফেলার চাইতে অন্য এক ভায়ের পরামর্শে তাকে দূরের গভীর কোনো কূপে ফেলে দেয় তারা।[১৫৫] এ ঘটনাকে মাহমুদ দারভীশ কাব্যময় করে তুলেছেন ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত *ওয়ারদুন আকল্ল* কাব্যগ্রন্থের *আনা ইউসুফু ইয়া আবী* কবিতায়।

---

১৫৫. ইবনে কাছির, *আল বিদায়া ওয়া আল নিহায়া* (বৈরুত: আল মুজাল্লাদ আল আউয়াল, বায়ত আল আফকার আল দাওলিয়্যা, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১২৩ ।

বাবা, আমি ইউসুফ। হায় বাবা,
আমার ভায়েরা আমায় ভালোবাসে না
বাবা, ওরা ওদের মাঝে আমায় চায় না।
আমাকে মারে প্রহার করে ওরা, বাবা।
ওরা আমার উপর পাথর ছোঁড়ে
ওরা আমায় জর্জরিত করে কথায় অপমানে।
ওরা একদিকে মিছেমিছে প্রশংসা করে আমার
অপরদিকে চায় আমি মরে যাই।
আমার সামনেই ওরা
তোমার ঘরের দরোজা বন্ধ করে দিয়েছে
উচ্ছেদ করে দিয়েছে আমাকে তোমার ভিটেমাটি জমিজিরাত থেকে
বাবা, ওরা আমার আঙুর বাগানে বিষ ছিটিয়ে দিয়েছে
হায় বাবা, আমার সমস্ত খেলনা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে ওরা
যখন ভোরের বহমান মৃদু বাতাস
আমার চুলে হাত বুলিয়ে খেলা করে যায়
ওরা সহসা কাতর হলো ঈর্ষায়
ওরা রাগে উত্তেজনায় ক্রুদ্ধ হলো আমার ওপর তোমার ওপর
হায় বাবা! এমন কী করেছি তারা আমার সাথে কেন এমন করল?
প্রজাপতিরা আমার কাঁধে বসে বিশ্রাম নেয়
কুর্নিশ করে গমের শীষ
আর আমার হাতের তালুতে বসে সুখ খুঁজে ফিরে পাখপাখালি
হায় বাবা, এতে আমি ওদের কী ক্ষতি করে ফেলি? কেন ওরা
আমার উপর এতো ক্রুদ্ধ হয়?
তুমিই আমার নাম রেখেছো ইউসুফ
অথচ ওরা আমায় ফেলে দিয়েছে গভীর কুয়ায়

أَنَا يُوسُفٌ يَا أَبِي. يَا أَبِي،
إِخْوَتِي لَا يُحِبُّونَنِي، لاَ
يُرِيدُونَنِي بَيْنَهُم يَا
أَبِي. يَعتدُونَ عَلَيَّ وَيرْمُونَنِي
بِالْحَصَى وَالكَلَامِ يُرِيدُونَنِي
أَنْ أَمُوتَ لِكَيْ
يَمْدَحُونِي . وَهُمْ أَوْصَدُوا بَابَ
بَيْتِكَ دُونِي. وَهُمْ طَرَدُونِي مِنَ
الحَقْلِ. هُمْ
سَمَّمُوا عِنَبِي يَا أَبِي. وَهُمْ
حَطَّمُوا لُعَبِي يَا أَبِي. حِينَ مَرَّ
النَّسِيمُ وَلاَعَبَ
شَعْرِيَ غَارُوا وَثَارُوا عَلَيَّ
وَثَارُوا عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْتُ
لَهُمْ يَا أَبِي؟
الفَرَاشَاتُ حَطَّتْ عَلَى كَتِفَيَّ،
وَمَالَتْ عَلَيَّ السَّنَابِلُ، وَالطَّيْرُ
حَطَّتْ على
راحتيَّ. فَمَاذَا فَعَلْتُ أَنَا يَا
أَبِي؟ وَلِمَاذَا أَنَا؟ أَنْتَ سَمَّيْتَنِي
يُوسُفًا، وَهُمُو
أَوْقعُونِيَ فِي الجُبِّ، وَاتَّهمُوا
الذِّئْبَ؛ وَالذِّئْبُ أَرْحَمُ مِنْ
إِخْوَتِي.. أُبَتِ!
هَلْ جَنَيْتُ عَلَى أَحَدٍ عِنْدَمَا
قُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ أَحدَ عَشَرَ
كَوْكبًا، والشَّمْسَ
والقَمَرَ، رَأَيتُهُم لِي
سَاجِدِينْ.[156]

১৫৬. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উলা-৩*, (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস, ২০০৫, খ্রি.), পৃ. ১৫৯।

আর দোষ চাপিয়েছে নেকড়ের ওপর।
এমন ভাইদের চেয়ে নেকড়ে বাঘ অনেক দয়ার
বাবা, যখন আমি স্বপ্নের কথা বললাম, আমি দেখেছি
এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য-চন্দ্র। দেখেছি তারা আমার জন্য
হাঁটু গেড়ে অবনত হয়ে আছে।

কবিতাটি প্রথম পাঠ করে পুরো ফিলিস্তিনের প্রতি ইজরাইরের বিদ্বেষী মনোভাবের একটি প্রতীকী বয়ান অনুধাবন করা যায় সহজে। এই বিদ্বেষী ও নৃশংস মনস্তত্ত্বের যে নির্মম নজির নবী ইউসুফ এর ঘটনার মধ্য্যিয়ে হাজির হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা ফিলিস্তিনের উপর বর্তমানে চলমান রয়েছে। ইউসুফকে যেমন তাদের মায়ের ঔরসজাত রক্তের সম্পর্কের না হওয়ায় 'অপর' বিবেচনা করে অন্য ভাইয়েরা তাদের আসাবিয়াত থেকে বের করে দিয়েছিল সেই একই 'অপরমূলক' প্রকল্প ফিলিস্তিনীদের জন্য নীতি হিসেবে প্রতিনিয়ত কার্যকর করে যাচ্ছে ইজরাইল এবং জায়োনিস্ট ক্ষমতাকাঠামোগুলো। বিপরীত দিক থেকে ফিলিস্তিনের মুক্তির স্বপ্ন ও প্রত্যাশার চিহ্নও শনাক্ত করা সম্ভব। হযরত ইউসুফ যে স্বপ্নের কথা বলেছিলেন—যেখানে এগারোটি নক্ষত্র তার সামনে হাঁটু গেড়ে মস্তক অবনত করে আছেন বলে যে স্বপ্নের কথা বলেছেন এটি মূলত একটি রূপকাশ্রিত বক্তব্য। যাতে বোঝানো হয়েছে যারা একদা শত্রুতা করেছিল, দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল—আপন বাস্তুভিটা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তারাই আবার পরাভূত হবে। আত্মসমর্পণ করবে। এবং দখলদার ইজরাইল থেকে ফিলিস্তিনের মুক্তি ত্বরান্বিত হবে। অন্যদিক থেকে বলা যায়, কবিতাটির প্লট এতোটাই ফিলিস্তিনের ধর্ম-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের এমনকি তাদের জনশ্রুতির ভিতরকার অন্তর্নিহিত যা বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করা যায় না। কারণ খোদ হযরত ইউসুফ ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন। যেকারণে কবিতাটিতে ইউসুফকে ফিলিস্তিনের এবং অন্য ভাইদের ইজরাইলের রূপক হিসেবে চিত্রিত করা হয়। ইউসুফকে গভীর কূপ থেকে উদ্ধার হওয়ার পর তার নির্বাসন ঘটে মিশরে। আজকের নিপীড়িত ফিলিস্তিনীদের যে দশা তার প্রতিরূপ হযরত ইউসুফ এর বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হওয়া, কূপে পতিত হওয়া, মিশরে নির্বাসিত হওয়া ইত্যাদি—পুরো বিষয়গুলোর মধ্যদিয়ে নিজেদের পরিচয়কে পুনরায় পাঠ করা সম্ভব। হযরত ইউসুফের এই ঘটনার পুনপাঠের মাধ্যমে বস্তুত ফিলিস্তিন তার আত্মপরিচয়কে ইতিহাস এবং তার সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে নতুন করে চিহ্নিত করতে পারে। ইতিহাসকে দারভীশ যেমন মূর্ত করে তুলেছেন যেটাকে নিছক ধর্মীয় মিথ বলে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়—তেমনি ইতিহাসকে আর ইতিহাস বলা যায়না। বরং ইতিহাসকে বর্তমান করে তুলেছেন কবি। এ আলোচনায় আরো যে দুটি বিষয় বোঝা সম্ভব; প্রথমত, ধর্মের নিগড়কে অস্বীকার করা যায় না বরং ইতিাসের বিবর্তনে তার উপযোগিতা বিভিন্নভাবে ঘটে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইজরাইল এবং তার জায়োনিস্ট প্রকল্প—যার একটি

উপাদানকে আদারনেস হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা কতোটা গভীরভাবে তার ধর্ম এবং ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে আছে এ আলোচনায় তা পরিষ্কার।[১৫৭]

৩.৩: পরিচয়, ভাষা ও পরমার্থিকতা

অপরমূলক ধারণা একটা সময়ে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে দারভীশের কবিতায়। পরবর্তীতে দেখা যায়, অপরের বিপরীতে খুদির ধারণা রূপক ও প্রতীকাশ্রিত হয়ে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে তার কবিতায়। এরসাথে আমি এবং আত্ম পরিচয় প্রকাশেও ভিন্নতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ আমি'র একদিকে রয়েছে তার সত্য অপরদিকে সৃষ্টি কিংবা ঐতিহাসিকতা—ফলে এই দুই ভূমিকা ও তৎপরতায় যে ফলাফল তৈরি হয় তার সার্বিকতার নামই হয়ে ওঠে পরিচয়। আর এ পরিচয় ও অভিব্যক্তি ঘটে ভাষার মাধ্যমে। যেখানে দারভীশ আমি'র নতুনতরো ভূমিকায় উত্তীর্ণ। এ ভূমিকা যেমন ঐতিহাসিক তেমনি অধিবিদ্যাগত। আর তার প্রধান বাহন হয়ে ওঠে ভাষা। ব্যক্তিমানুষের পরিচয়ের সীমার বাইরে গিয়ে নতুন করে তাকে ভাবতে হয়েছে। শুধু বিষয়-রাজনৈতিকতার মধ্যে পর্যবসিত না থেকে ব্যক্তির বিকাশ ঘটে নতুনতরো পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে। দারভীশ পরিচয়কে—ব্যক্তির মুখোমুখী যে অপর কল্পলোকে দিব্য হয়ে আছে ইতিমধ্যে তার থেকে আরো উন্নততরো—পরমার্থিকতায় সংজ্ঞায়িত করতে সমর্থ হন।

যদি তুমি অপর হতে যার সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে অবহিত করেছেন অতএব অপরের মাঝে তোমার নাজিল যেন 'আনা'র ('আমি') নুন হয়ে যায়। সুখবর আমাদের জন্য, অতিক্রমকারীদের পদক্ষেপের পর ওখানে তোমার দুই প্রান্তে আলো ঢেলে দিল বাদাম। যখন হরিণ আকাশে তার শিং দিয়ে আঘাত করেছিল তখন তোমার উপর সৌভাগ্য-শান্তি এনে দিয়েছিল বিড়াল আর কবুতর। এরপর প্রকৃতির অন্তশিরায় প্রবাহিত করল ভাষা তার বিন্দু বিন্দু শিশির। সত্য এবং সৃষ্টির দ্বৈততার সমুখে, দূরের আকাশ আর তোমার বিছানার ধানের মাঝে কবিতার নাম কি তবে রক্তের বিনিময়ে রক্তের এক মুহূর্ত এবং মর্মর পাথরের বিলাপ?	إذا كُنْتِ آخرَ ما قالَه اللهُ لي ' فليكُنْ نزولُك نُونَ الـ ((أنا)) في المُثَنّى . وطوبى لنا وقد نَوَّر اللوزُ بَعْدَ خُطَى العابرين' هنا على ضفتيك' ورفَّ عليك القطا واليمامُ بقَرْنِ الغزال طَعَنْتِ السماء' فسال الكلامُ ندى في عروق الطبيعة . ما أُسمُ القصيدةْ أَمام ثُنَائيَّة الخَلْقِ والحق ' بين السماء البعيدة وأَرْزِ سريركِ' حينٌ دَمٌ لدمٍ' ويئنٌ الرخام؟

[১৫৭]. ইতজহাকি, মাশ, সোবহী বোস্তানী, *দি কনসেপ্ট অব আদার ইন কন্টেম্পোরারি প্যালেস্টিনিয়ান এন্ড ইজরাইলি পোয়েট্রি* (ক্যামব্রিজ: দি রুটলিজ হ্যান্ডবুক অফ মুসলিম-জুইশ রিলেশন্স, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৯।

ستحتاج أسطورةٌ للتشمُّس حولك .
هذا الزحامُ
إلهات مِصْرَ وسُومَرَ تحت النخيل
يُغيِّرن أثوابهنَّ
وأسماءَ أيامهن, ويُكْملن رحلاتهنَّ
إلى آخر القافية...

তোমার চারদিকে সূর্যালোকের জন্য এক মিথের প্রয়োজন হবে। এই ভিড় সমাগম মানেই মিশরের দেবীদের যেখানে খেজুর গাছের নিচে তারা তাদের কাপড় বদল করতেন আর পাল্টে নিতেন তাদের দিনের নামগুলি। শেষ অঙ্কে গিয়ে তারা তাদের যাত্রা পূর্ণ করতেন...

وتحتاج أنشودتي للتنفُّسِ: لا الشعرُ شعرٌ
ولا النثرُ نثرٌ. حلمت بأنَّكِ آخر ما قالَهُ
لِيَ اللهُ حين رأيتكما في المنام ' فكان الكلامُ...[158].

অথচ নিঃশ্বাসের জন্য তোমার প্রয়োজন হবে আমার গীতি কবিতার:
কবিতামাত্রই কবিতা নয় এবং গদ্যমাত্রই গদ্য নয়। আমি স্বপ্নে দেখেছি তুমিই অপর পরম, আল্লাহ যেমন আমাকে বলেছেন যখন তোমাদের উভয়কেই দেখেছি আমি স্বপ্নে—অতএব তা ছিল ভাষা—বাক্য।

কিংবা

لو كُنْتُ غيري في الطريق، لما التفتُّ
إلى الوراء، لَقُلْتُ ما قال المسافرُ
للمسافرة الغريبةِ: يا غريبةُ! أَيقظي
الجيتارَ أَكْثَرَ! أَرجئي غَدَنا ليمتدَّ
الطريقُ
بنا، ويتَّسعَ الفضاءُ لنا، فننجو من
حكايتنا معاً: كَمْ أَنتِ أَنتِ... وكم أنا
غيري أمامك ها هنا!

لو كُنْتُ غيري لانتميتُ إلى الطريق,
فلن أعود ولن تعودي. أيقظي الجيتار

চলতে চলতে আমি হতাম যদি আমারই অপর
যার জন্য আমি পিছনে ফিরে তাকাতাম, তবে
বলতাম, এক মুসাফির অপর আগন্তুক
মুসাফিরকে যেমন বলে, আগন্তুক হে! গিটারটি
আরো একটু জাগিয়ে তোলো! বিলম্বিত করো
আমাদের আগামী! যাতে রাস্তাটি আমাদের
কাছে আরো প্রসারিত হয়। যেন বিস্তীর্ণ হয়ে
ওঠে আকাশ। ফলে আমাদের গল্পগুলো থেকে
আমরা একসাথে মুক্ত হবো: তুমি কতোটা
তুমি... এবং তোমার সমুখে কতোটা আমি
আমার অপর!

---

১৫৮. দারভীশ, মাহমুদ, *সারীর আল গারীবাহ*, পৃ. ৭।

كي نتحسّسَ المجهولَ والجهةَ التي
تُغْوي
المسافرَ باختبار الجاذبيّة. ما أنا إلاّ
خُطَايَ، وأنت بوصلتي وهاويتي معاً.
لو كُنْتُ غيري في الطريق، لكُنْتُ
أَخفيتُ العواصفَ في الحقيبة، كي
تكون قصيدتي مائيّةً، شَفَّافَةً, بيضاءَ
تجريديَّةً, وخفيفةً... أَقوى من الذكرى،
وأَضْعَفَ من حُبَيْبَات الندى, وَلَقُلْتُ:
إنَّ هُوِيَتي هذا المدى!
لو كُنْتُ غيري في الطريق, لَقُلتُ
للجيتار: دَرِّبْني على وَتَرٍ إضافيِّ!
فإنَّ البيتَ أَبعدُ، والطريقَ إليه أَجملُ
هكذا ستقول أُغنيتي الجديدةُ كلما
طال الطريق تجدَّد المعنى، وصرتُ
أُثنين
في هذا الطريق: أَنا... وغيري![159]

আমি হতাম যদি আমার অপর, তবে হারায়
যেতাম পথে পথে।
আর কখনো ফিরবো না, তুমিও ফিরবে না।
গিটারটি জাগাও, যেন অনুভব করি অজানাকে;
অনুভব করি সেই পথের অভিমুখ গ্রাভিটির
মোহে মুসাফিরকে যা বিভ্রান্ত করে। আমি তো
আমার ভুল ছাড়া আর কিছু নই। তুমি
একইসাথে আমার কম্পাস একইসাথে আমার
গহবর।
যদি পথে পথে আমি হতাম অন্যকেউ তবে
ঝড়গুলোকে আমার ব্যাগের ভিতর লুকিয়ে
নিতাম। যেন আমার কবিতা হয়ে ওঠে পানিময়,
স্বচ্ছ, নির্মল সাদা, সূক্ষ্ম কোমল... স্মৃতির চেয়ে
শক্তিশালী, শিশির বিন্দুর চেয়ে দুর্বল তবে আমি
বলতাম: এইটুকু ব্যপ্তিই আমার পরিচয়!
যদি রাস্তায় আমি হতাম অপর কেউ, তবে
গিটারটিকে বলতাম: আরো একটি তার আমায়
বাজিয়ে দেখাও!
বাড়িটি নিশ্চয়ই অনেক দূরে—যেখানে যাওয়ার
পথটি আরো সুন্দর
এভাবেই আমার নতুন গানগুলো শিগগির বলে
উঠবে
যখন প্রলম্বিত হতে থাকবে পথ, তৈরি হবে
নতুন অর্থ
আর এই পথে আমি হয়ে যাবো দুই:
আমি ... এবং আমার অপর!

পরিচয়ের রাজনীতি দারভীশ জাতীয় রাজনীতির নমুনা হিসেবে অপরিহার্য করে তুলেছিলেন। অপরদিকে সেই রাজনীতির জন্য ফিলিস্তিনীদের পরমার্থিকভাবেও প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। পরিচয় আর রাজনৈতিক পরমার্থিকতা দারভীশ এক জায়গায় এনে তার অনিবার্যতা জরুরি করে তোলেন। যেকারণে কবিতায় এবং সাহিত্যে দারভীশ পরিচয়কে রাজনীনৈতিক ব্যকরণের বাইরেও পাঠ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ শতকজুড়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য-শিল্পকলায় যে কলাকৌশলগুলো

১৫৯. প্রাগুক্ত।

কাজ করেছে সেখানে দেখা যাবে এক শ্রেণির কবি যারা নিজেরা নিজেদের পরিচয়গুলো গড়ে তুলেছেন নিজের মতো। যেটা তাদেরকে তাদের বিশেষ ভৌগলিকতার মধ্যে চিহ্নিত করতে সহায়ক ছিল। এর সাথে সাথে বিশেষ স্থান দখল করে আছে তাদের ভাষার স্বরূপ, কথা বলার ভঙ্গি এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশের অনন্য রীতি—যার মাধ্যমে তারা স্বতন্ত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন নিজ নিজ অবস্থানজুড়ে। মাহমুদ দারভীশ তাদের মধ্যে অনন্য। শুধু ভাষা আর বিশেষ শিল্পরুচির জন্য যিনি নিজের পরিচয়কে নিছক ব্যক্তির রুচির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি—শিল্প, চিন্তা ও জ্ঞানের পরিমণ্ডলে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

৩.৪: ভাষা এবং আত্মপরিচয়

আত্মপরিচয় দারভীশের কবিতায় বিচিত্র প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পেয়েছে। *নিজ* বা *সত্তা* সম্পর্কিত পরিচয় ও অভিজ্ঞান বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে—নানান উপায়ে বিস্তারের বিশেষ বিষয় হয়ে ওঠে। *নিজ* বা *সত্তা* কথাটি যেমন দেশ, ভৌগলিকতা ও জাতিয়তার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে তেমনি ভাষার মাধ্যমে। বস্তুত ভাষা এর প্রধানতম উপায়। বলা যায়, আত্মপরিচয় যেসব উপাদানকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে দারভীশের কবিতায় তাতে ভাষা অনেক গভীর এবং মৌলিক একটি বিষয় হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে শুরু করে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্য এবং একইসাথে নান্দনিক তাৎপর্যে হাজির দারভীশের পরিচয়ের ব্যপ্তি। এর মধ্যে ভাষা যেমন রাজনৈতিক পরিচয়ের স্বর হয়ে উঠেছে তেমনি ফিলিস্তিনী জাতির মন ও আত্মার পরিচয়ও হয়ে ওঠে এই ভাষা।

বলা বাহুল্য, আরব জাতীয়তাবাদ একই ভাষার কারণে আরব সংহতির একটি ধারণা হয়ে ওঠে গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে। যদিও ফিলিস্তিন প্রশ্নে আরব জাতীয়তাবাদ ভাষাগত সংস্কৃতির কারণে আত্মীয়তা তৈরি করলেও রাজনৈতিক দিক থেকে কোনো সফল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। যেখানে আরব জাতীয়তাবাদের সম্পর্কগুলো থেকে ফিলিস্তিন তার নিজের জাতিসত্তার মুক্তির লড়াই ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। আরব জাতীয়তাবাদ একদিক থেকে একটি সাময়িক আদর্শবাদী প্রাতিষ্ঠানিকতা তৈরি করলেও অপরাপর আরব অঞ্চলগুলোর সাথে সাংস্কৃতিকভাবে আলাদা কিংবা ঐক্য থাকলেও ফিলিস্তিনের মুক্তি-সংগ্রাম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত। অর্থাৎ ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদ গঠনে ভাষার সম্পর্ক এবং সক্রিয়তা অনস্বীকার্য। প্রভাবশালী আরব বুদ্ধিজীবী এবং ইতিহাস বিশ্লেষক ইয়াসির সুলেইমান মনে করেন, জাতিগঠনে ভাষার মৌলিক কারণ এবং ভূমিকা রয়েছে। বিশেষত আরবী ভাষার কারণে আরব দেশগুলোর জাতিয়তা গড়ে ওঠতে ভাষা একটি বড় উপাদান হিসেবে কাজ করে। সুলেইমান মনে করেন, এক্ষেত্রে বিশেষত ভাষার কয়েকটি দিক রয়েছে। প্রথমত ভাষা জাতীয় চরিত্র নির্ধারণ করতে সহায়ক। দ্বিতীয়ত, জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে

তুলতে কার্যকর ভূমিকা রয়েছে ভাষার।[১৬০] অপরদিকে ভাষার সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে যে সংহতি গড়ে ওঠে তার সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক সরাসরি। ফলে ক্ষমতাকেন্দ্রিক মতাদর্শ তৈরিতেও ভাষার ভূমিকা রয়েছে। যেকারণে জাতীয়তাবাদের মূল রসদ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ হিসেবে ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য।[১৬১] আরবী ভাষা থেকে আরব পরিচয় বিষয়ক ডিসকোর্স আরবীয় বয়ানের বৈশিষ্ট্যসূচক দিকও বটে। আরব জাতীয়তা গড়ে ওঠার পেছনে ইয়াসির সুলেইমান দুটি ক্যাটাগরিক্যাল শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি আরব-মন (arab mind) এবং সেল্ফ (self)। আরবীতে যাকে আল আকলিয়্যাহ আল আরাবিয়্যাহ (العقلية العربية) বলা যায়। আরবমন—উচ্চারণের সাথে বস্তুত আরব সংস্কৃতি, যাপিত জীবন, জীবন-প্রক্রিয়া, বেড়ে ওঠা এবং সামগ্রিক ইতিহাসকে নির্দেশ করে।[১৬২] আরব জাতি হয়ে ওঠার সাথে মর্মগতভাবে অ্যারাবনেস জরুরি উপাদান। আরবনেস তৈরি হতে পারে আরবমন কিংবা আরবের সেল্ফ'র অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে।[১৬৩] সেল্ফ মানে, আরবের আপনাত্মা তৈরির এই সেল্ফ-প্রজেক্ট এর সাথে রয়েছে আরব জাতির পরিচয় ও ব্যপ্তি। কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে ভাষার মাধ্যমে। ভাষার সাথে অবশ্য ধর্মও জড়িয়ে আছে। ধর্মের ঐতিহাসিকতা আরবী ভাষার সাথে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যাতে ভাষা এবং ধর্মের সম্পর্ক শরীর ও আত্মার মতো। মোটকথা আরব জাতীয়তা গড়ে ওঠার সাথে ভাষা প্রথমত এবং দ্বিতীয়ত তার সাথে রয়েছে ধর্ম তথা ইসলামের সম্পর্ক।

ফিলিস্তিনের ইতিহাস মাত্রই আরব ইতিহাস নয়—এই প্রশ্ন সামনে রাখলে বোঝা সম্ভব, ইতিহাসের একটি কালপর্বে আরব জাতীয়তাবাদ ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি আদর্শবাদ মাত্র। কিন্তু ফিলিস্তিনের জাতিয়তা তার চেয়ে অনেক বড় একটি ঘটনা যেখানে ভাষার ভূমিকা আদর্শবাদের খোপে সীমাবদ্ধ নয়। ফিলিস্তিনের জাতিসত্তা গঠনে যে ঐতিহাসিকতা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে আছে তার প্রেক্ষিতগুলো মুছে ফেলা যায়নি। ফিলিস্তিনের ভূমি দখলের মতো তার ইতিহাসও বেদখলের শিকার হয় অরিয়েন্টালিস্ট ও জায়োনিস্টদের হানাদারি মনস্তত্ত্বের কাছে। তবে সেই ইতিহাস তাদের প্রতিরোধের ফলে পুরোপুরি দখল করা সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত এডওয়ার্ড সাঈদের একটি বক্তব্য এখানে স্মরণ করা যায়। যাতে ফিলিস্তিনের আদিবাসী কারা এবং তাদের প্রাচীন ভাষা কি—যার মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছে অতি প্রাচীনকাল থেকে। সাঈদ বলেন,

> On the land called Palestine there existed a huge majority for hundreds of years a largely pastoral, a nevertheless socially, culturally, politically, economically identifiable people whose language and religion were (for a huge majority) Arabic and Islam, respectively. This people—or

[১৬০]. সুলেইমান, ইয়াসির, *দ্য অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ন্যাশনাল আইডেন্টিটি, আ স্টাডি ইন আইডিওলজি*, পৃ. ১২০।
[১৬১]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২।
[১৬২]. সুলেইমান, ইয়াসির, *আরাবিক ইন দি ফ্রেইঃ ল্যাঙ্গুয়েজ আইডিয়োলজি এন্ড কালচারাল পলিটিক্স* (স্কটল্যান্ডঃ এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৪১-২৪৪।
[১৬৩] সুলেইমান, ইয়াসির, আরাবিক, *সেল্ফ এন্ড আইডেন্টিটিঃ আ স্টাডি ইন কনফ্লিক্ট এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট* (ইউকেঃ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৬৯-৮০।

> if one wishes to deny them any modern conception of themselves as a people, the group of people—identified itself with the land it tilled and lived on (poorly or not is irrelevant), the more so after wholly European decision was made to resettle, reconstitute, recapture the land for Jews who were brought there from elsewhere.
> (Said, 8)[164]
>
> ফিলিস্তিন নামের ভূখণ্ডে শতশত বছর ধরে যারা বড়ো সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, তাদের বেশিরভাগই গ্রামীণ পশুপালক। তা সত্ত্বেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে তারা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ তাদের অগ্রগতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তাদের (ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠের) ভাষা ও ধর্ম ছিল আরবী ও ইসলাম। কেউ যদি একক বা গোষ্ঠীগতভাবে আধুনিক ধারণা থেকে তাদের অস্বীকার করতেও চায়, তবু এসব লোকজন (যাদের জীবন যাপন সেখানে দারিদ্র্যের হোক বা না হোক সেটা প্রাসঙ্গিক নয়) ভূমি অধিকার ও জীবিকার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। আরও বড়ো আকারে বললে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিদের নিয়ে এসে এখানে পুনর্বাসন, পুনর্গঠন, ভূমি দখল ছিল পুরোটিই ইউরোপীয় সিদ্ধান্ত।

ইউরোপ তথা পশ্চিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ইহুদিদেরকে এনে ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড দখল করিয়ে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল—ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতসহ যেকোনো পরিবর্তনের কারণ এবং ফলাফল বোঝার জন্য সাঈদের এমন মতামত জরুরি। সাঈদের বক্তব্যে ঐতিহাসিকতার সূত্র হিসেবে ধর্মের সাথে সাথে ভাষার প্রসঙ্গ এসেছে। সেকারণে ভাষার প্রশ্ন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে। ভাষা যেহেতু একটি সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে ফলে এর একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত গড়ে ওঠে। কারণ ভাষার সাথে চলমান ইতিহাসের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ভাষার ঐতিহাসিকতা সমাজ ও জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। কোনো জাতির পরিবর্তন কিংবা এগিয়ে যাওয়ার পেছনে ভাষার মৌলিক অংশগ্রহণ থাকে। সাংস্কৃতিকভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে এই পরিবর্তন সবথেকে জীবন্ত হয়ে ওঠে ভাষার মাধ্যমে। ফলে কোনো জাতির পরিবর্তন মাত্রই কোনো না কোনোভাবে ভাষার পরিবর্তন। ভাষা এবং কোনো জাতির পরিচয় বিচার্য হয়ে ওঠে তার যুগপৎ ঐতিহাসিকতার কারণে। এডওয়ার্ড সাপির মনে করেন, জাতীয় পরিচয় কিংবা জাতীয় চৈতন্য গড়ে ওঠে বস্তুত তৃ-উপাদানের মিলিত অভিযাত্রায়। ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ভাষা। এই তৃ-উপাদান জাতি গঠনের কেন্দ্রীয় উপাদান।[১৬৫]

---

১৬৪. সাঈদ, এডওয়ার্ড, *দি কোয়েশ্চন অফ পালেস্টাইন*, (নিউইয়র্ক: ভিনটেজ বুকস, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৭-৮।

১৬৫. সাপির, এডওয়ার্ড, *কালচালর*, *ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড পার্সোনালিটি* (বার্কলে: ইউনিভার্সিটি ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৪৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯।

সাফির মনে করেন, আত্মসচেতন জাতীয়তাবোধের গঠন এবং অভিপ্রকাশের জন্য ভাষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেখানে ভাষা মানে বিশেষ ভাষার ব্যবহার ও প্রবণতা। ভাষামাত্রই যেহেতু ব্যক্তিগত কিছু নয়, বরং খুব সহজাতভাবে এটি সামষ্টিক সেকারণে জাতিগঠন প্রশ্নে ভাষার ইস্যু গঠনমূলক।[১৬৬] তবে ভাষা ব্যক্তি কিংবা জাতির পরিচয়ের সাথে সাথে *মাতৃভূমি* কিংবা *দেশ*'র ধারণাও গড়ে ওঠে। এই ধারণাগুলো সংস্কৃতি এবং জাতিগত মনস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। তবে ভাষা ব্যক্তির এবং জাতির কর্তাসত্তার সামগ্রিক অভিপ্রকাশের নির্ধারক হয়ে ওঠে। যেহেতু ভাষামাত্রই যোগাযোগ কিংবা সম্পর্কের মাধ্যম হয়ে থাকে না, বরং ভাষা ব্যক্তির চিন্তাগত চরিত্রও নির্দেশ করে।[১৬৭] কাজে সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিত বিচারে কিভাবে জাতীয় পরিচয় গঠনের সাথে ঐতিহাসিকভাবে কাজ করে তার সমস্ত দৃষ্টান্ত ভাষায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। মাহমুদ দারভীশ ফিলিস্তিনের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাকে একটি সামগ্রিক রূপ দিয়েছেন। যেখানে ভাষার সাথে 'দেশ' নামক বস্তুর সম্পর্কের কাব্যিক উপাখ্যান প্রতিষ্ঠা করেন দারভীশ। 'দেশ' এমন একটি বিষয় যে, দারভীশের কবিতায় এটি নিছক একটি ভূগোলে সীমাবদ্ধ নয়। এর অর্থ হল, দেশ যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় একটি ভৌগলিক সীমা-চৌহদ্দি আকারে তেমনি তা কল্পনাও করা যায়। আর এ কল্পনা কিংবা প্রত্যক্ষকরণ দুটোই ভাষা অবয়বে প্রতিফলিত। এর ইমেজ কিংবা প্রতীকী তাৎপর্য আছে। দারভীশের কবিতায় এই তাৎপর্য এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, ভাষা শুধু একটি বংশগত কিংবা শরীর কেন্দ্রিক ধ্বনিগত প্রকাশমাত্র নয়, এর সাথে সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সম্পর্ক রয়েছে। একইসাথে ভাষা একটি জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়কেও সাকার রূপে হাজির করে প্রতিচিত্র, রূপক কিংবা প্রতীকের সাহায্যে। অর্থাৎ রূপ কিংবা সাকার রূপে দারভীশ যেমন তার দেশকে দেখতে পান তেমনি আকারবিহীন বা নিরাকার রূপেও। নিরাকার বা বিমূর্ততা একটি জ্ঞানীয় বর্গ হলেও কবিতায় এর বিপুল প্রয়োগ আধুনিক কাব্যভাষায় নতুন অর্থোৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিমূর্ত কবিতা (Abstract Poetry) এবং দারভীশের কবিতায় এ ধরনের আকার নিরাকার প্রসঙ্গের উপস্থাপন ও ভাষাগত বুনন এক নয়। ঐতিহাসিক দেশকালে যে বাস্তব দেশহীনতার অভিজ্ঞতায় ভার বহন করে চলেছে ফিলিস্তিনের মানুষ তাতে কবির সংবেদনশীলতায় দেশহীনতাও এক নিরাকার দেশ। নিরাকার আত্মপরিচয়। তাই আকার-নিরাকার রূপের অর্থময়তায় তার দেশহীন দেশের মানচিত্র যেমন রচিত, তেমনি নিবিড় মানবিক বোধও সৃষ্টি করে তার কবিতা। অন্যকথায়, ইজরাইলি দখলদারিত্ব ফিলিস্তিনে একটি চলমান পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির কারণে ফিলিস্তিনী জনগণের প্রায়ই দেশ ছাড়তে হয়। নির্বাসিত জীবন, ভূমিহীন হওয়া, উদ্বাস্তু কিংবা শরণার্থী হওয়াও যেকারণে একটি অব্যাহত অবস্থা। এ অবস্থার চরম অভিজ্ঞতা হল, রাষ্ট্রহীনতার মধ্যদিয়ে যাওয়া। যাতে শুধু থাকে দেশ। দেশের স্মৃতি। তাই মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ফলে ফিলিস্তিনীদের মনস্তাত্ত্বিক সক্রিয়তা হল, যে দেশ সাকার রূপে আর হাজির নাই সেই দেশকে কল্পনায় মূর্ত করে তোলা। এই দেশ তখন আর বাস্তবে তাকে ধরা দেয় না, ছোঁয়া যায়

---

[১৬৬]. প্রাগুক্ত। পৃ. ।

[১৬৭]. বিতার আই, সামির, *ল্যাঙ্গুয়েজ, আইডেন্টিটি এ্যান্ড আরাব ন্যাশনালিজম: কেস স্টাডি অফ প্যালেস্টাইন* (লন্ডন: জার্নাল অফ মিডল ইস্টার্ন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, রুথলেজ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৫৬।

না। এমন অসম্ভব শুধু সম্ভব হয়ে ওঠে কল্পনায়। মনের গভীরে। দেশ হয়ে ওঠে মনোজগতের এক অবিসম্ভাবী অস্তিত্ব। যা ঘটে যায় ভাষার মধ্যদিয়ে। দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনী জনগণের এমন মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছে বেশ শক্তিশালীভাবে। এতে করে জনবাস্তবতা আর কল্পনা কিংবা কবিতার অর্থ নতুন করে জন্মলাভ করে দারভীশের শক্তিমান সৃষ্টিশীলতায়। এই সৃষ্টিশীলতার আরেক উপকরণ আত্মপরিচয়। আত্মপরিচয় কিংবা নিজেকে শনাক্ত করার এবং নিজের পরিচয় নির্দিষ্ট করার অর্থও তাই সাকার রূপে কিংবা সরাসরি প্রত্যক্ষকরণের বিষয়বিদ্যা হয়ে আর থাকে না দারভীশের কবিতায়। সরাসরি আত্মপরিচয়ের কথা যেসব কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেক অর্থসমৃদ্ধ রূপকাশ্রিত পরিচয়মূলক কবিতাগুলো। দারভীশের কবিতায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়ের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে রূপকাশ্রিত এবং প্রতীকসমৃদ্ধ কবিতাগুলোতে।[১৬৮] কবি বলেন,

كُلَّ شيء صورةٌ فيه . أنا مرآتُهُ
كُلُّ موتٍ صورةٌ. كُلُّ جَسَدْ
صورةٌ. كُلُّ رحيل صورة. كُلُّ بَلَدْ
صورةٌ. قلتُ: كفى متنا تماماً, أين
إنسانيتي؟ أين أنا؟
قال: لا صورة إلاَّ للصوَر[১৬৯]

প্রতিটি বস্তুরই একটি আকার আছে আর আমি
সেই বস্তুর আয়না।
প্রতিটি মৃত্যু একটি আকার। প্রতিটি দেহ একটি
আকার।
প্রতিটি অন্তিম যাত্রা একটি আকার। প্রতিটি দেশ
একটি
আকার। আমি বললাম: আমরা পুরোপুরি শেষ
হয়ে গিয়েছি। কোথায় মনুষ্যত্ব আমার? কোথায়
আমি?
কবি বললেন: সমূহ রূপেরই রূপ আছে আছে
আকার।

এই পঙক্তিগুলো নেয়া হয়েছে *কবির সময় হয়েছে আত্মহত্যা করার* (‘আনা লি আল-শায়ির আন ইয়াক্বতুলা নাফসাহ) নামক কবিতা থেকে। দারভীশের জীবনের প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। আত্মহত্যা না বলে এখানে নিজেকে শেষ করার অর্থও করা যায়। যেটা আরো বেশি যুৎসই হতে পারে। কারণ *আন ইয়াক্বতুলা নাফসাহ* বলে কবি নিজেকে শেষ করার যে কথা ক্ষোভ বা আক্ষেপ করে বলেছেন, তাতে কবি কিংবা তার জনমানস শেষ হয়ে যায় না। ক্ষোভ বরং এই কবিতা নতুন করে অস্তিত্বমান করে তুলেছে তার দেশ এবং জনমানস। দেশভাবনার নতুন নির্মাণ এবং ভাষার নতুন অর্থ সংঘটিত হয়েছে এই কবিতায়। এইরকম নির্মাণ এবং অর্থোৎপাদন উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে সামান্য ব্যাপার নয়; এই ভাবনা যেমন বাস্তব প্রতিরোধের সাথে, তেমনি চিন্তার সাথে, ভাষার সাথে। যে পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিন যায়োনিজমের সাথে লড়ছে সেটা

---

১৬৮. খান, সলিমুল্লাহ, *ভাষা দেশ মৃত্যু: মাহমুদ দারবিশ-এর আকার সাকার নিরাকার*, মাহমুদ দারবিশ: *পাঠ ও বিবেচনা*, *ভূমিকা ও সম্পাদনা: শরীফ আতিক-উজ-জামান* (ঢাকা: সংবেদ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

১৬৯. দারভীশ, মাহমুদ, *হিয়া আগনিয়াহ, হিয়া আগনিয়া, আল-দীওয়ান আল-আ'মাল আল-উলা-৩* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লি আল-কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭২-৭৫।

শুধু ভাবাদর্শের ব্যাপার নয়, যেকোনো চিন্তা আর মতাদর্শের খোলনলচে সরিয়ে দেয়ার পর যা থাকে তাই হল লড়াইয়ের সারাংশ। তাই সর্বজনীন। আর এই সর্বজনীন সারাংশই হল শেষপর্যন্ত ফিলিস্তিন, যার শুরু হয় ভাষার মধ্য দিয়ে। কারণ উপনিবেশায়ন এবং তার আক্রমণের অন্যতম বড় লক্ষ্যবস্তু হল ভাষা। যেখানে ভূমির মালিকানা থেকে সরিয়ে দেয়া গেলেও ভাষা থেকে সরিয়ে দেয়া যায় না। তাই ভূমিচ্যুত করার পর উপনিবেশায়নের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে ভাষা। যেহেতু ভাষা একজন উপনিবেশিতের বোধ এবং তার কর্তাসত্তায় স্বাধীন সত্তা উন্মেষের সম্ভাব্য এলাকা যা উপনিবেশিক প্রভুর জন্য হুমকি কিংবা চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকিপূর্ণ। একইসাথে ভাষার দুনিয়ায় প্রবেশ কিংবা উপনিবেশায়নও সহজ নয়, যতো সহজে সীমান্ত দখল করা যায়। অর্থাৎ এটি এমনি চলমান অস্তিত্ব যে, নিরাকার হয়েও এটি সাংঘাতিকরকম জীবন্ত। ফলে ভিক্টিমের কাছে তার বেঁচে থাকার এবং সক্রিয় থাকার সর্বশেষ উপায় হল ভাষা। নিরাকার হয়েও বস্তুত যা সাকার হয়ে জীবন্ত থাকে উপনিবেশিত ফিলিস্তিনীদের কাছে। কবি যখন বলেন, *প্রতিটি বস্তুরই একটি আকার আছে* তাতে কবি জোর দিয়ে কী বলতে চান? বস্তুমাত্রেরই আকার আছে এটি একটি স্বতসিদ্ধ। তেমনি বস্তুমাত্র নিরাকারও। কিন্তু *আকার আছে* এমন বাক্য উচ্চারণ করার মধ্যদিয়ে যে বস্তু আকারময় ছিল তা যখন অনুপস্থিত বা অদৃশ্য হয়ে গেছে তারই আকার দেখতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন কবি। আর এই আকারই তবে ফিলিস্তিন? কিংবা কবির ফিলিস্তিনের পরিচয়? আকার আছে এমন পুনঃপুন উক্তির ফলে কবি শুধু ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়ই সন্ধান করেন নাই, এরসাথে তিনি মানুষের দৈব অর্থেরও অনুসন্ধান করেছেন। কাজে দারভীশ যে ভাষার কথা বলেছেন তা আত্মপরিচয়ের যেমন তেমনি মানবাত্মার মৌলিকত্ব কিংবা সারবস্তুও। দারভীশ বলেন,

وما دمنا لا نعرف الفرق بين الجامع والجامعة،
لأنهما من جذور لغوي واحد، فما حاجتنا للدولة...
ما دامت هي والأيام الي مصير واحد؟[১৭০]

> জামে' এবং জামেয়া'র মাঝে যে পার্থক্য আমরা সবসময় তা জানিনা
> যেহেতু দুইয়েরই উৎস একই ভাষা থেকে। তাহলে আমাদের রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে কি? রাষ্ট্র এবং সময়কাল উভয়ই আমাদেরকে একই গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

কবি ও কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভাষার সক্ষমতায় নির্ণীত হয় অনেক সময়। তবে ভাষা এবং কবির জীবন সমার্থক হয়ে ওঠে অনেক সময়। ভাষা এতো বেশি যাপিত এবং নির্ধারিত হয়ে ওঠে যে ভাষা এবং কবিতা এক অবিভাজ্য সত্তা হয়ে ওঠে। ভাষাই কবির পরিচয়ের কারণ হিসেবে মৌলিক বিবেচনায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, দারভীশের ভাষা এতো বেশি নির্ধারিত এবং ব্যাপক হয়ে ওঠে যে, ভাষাই তার জীবন ও অস্তিত্বের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। দেশ তার অভিজ্ঞতায় যে ক্ষত সৃষ্টি

[১৭০]. দারভীশ, মাহমুদ, *আছার আল ফারাশাহ* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লিলকুতুব ওয়ান নাশার, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৭০।

করেছিল তার পুনর্গঠন কিংবা পুনরুদ্ধারের বিকল্প প্রকল্প হয়ে ওঠে তার ভাষা। ভাষার অস্তিত্ব কিংবা দেশ একটি অপরটির পরিপূরক। দারভীশ মনে করেন, ভাষা থেকেই ফিলিস্তিনের সৃষ্টি। অর্থাৎ আধুনিক বিশ্বে ফিলিস্তিন নামের যে দেশের চিত্র দেখা যায় তার মূল অনুঘটক বস্তুত ভাষা। ভাষাই তার দেশ।[১৭১] রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে সামগ্রিক প্রকল্প গড়ে উঠেছে তা মূলত ভাষা। এই ভাষামাত্রই কতিপয় অক্ষরের বিন্যাস কিংবা অর্থবিজ্ঞানের নাম নয় বরং ফিলিস্তিনের সর্বস্তরের মানুষ যে চিন্তা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং তার সার্বিক তৎপরতার গতিশীলতা তৈরি করেছে এক কথায় তার নামই ভাষা। এমন ভাষা থেকেই ফিলিস্তিনের সৃষ্টি। ফিলিস্তিন যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত পার হয়ে এসেছে তাতে তার ভাষা প্রধান এক অলঙ্ঘনীয় উপাদান। ভৌত কিংবা ধারণাগত উভয়দিক থেকে ফিলিস্তিনের যে আকার তৈরি হয়েছে সেখানে ভাষা তার প্রাণভোমরা। অন্যকথায়, ফিলিস্তিনের প্রাচীন সংস্কৃতি কিংবা ভাষা-জাতিয়তার যে প্রকল্প ইতিহাসের সূত্র ধরে সামনে এসেছে তা নিয়েই ফিলিস্তিন। সেকারণে দারভীশ মনে করেন, এই ঐতিহাসিকতা বর্তমান। অর্থাৎ ইতিহাসের যাকিছু বর্তমানের উপজীব্য বয়ান হিসেবে নির্মাণ করা হয় তা মূলত তার সৃষ্টি। এই সৃষ্টিই তার ইতিহাসের উত্তরাধিকার কিংবা রক্তের অভিযোজন প্রক্রিয়ার ফলাফল। দারভীশ বলেন,

الهوية هي ما نورَث لا ما نرث. ما نخترع
لا ما نتذكر. الهوية هي فساد المرآة
التي يجب أن نكسرها كلما أعجبتنا الصورة![১৭২]

উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা যা প্রাপ্ত হই তাই আত্মপরিচয়।
কিন্তু আমরা যা রেখে যাই তা আত্মপরিচয় নয়।
আমরা যা সৃষ্টি করি তাই আত্মপরিচয়।
তবে আমরা ইতিহাস হিসেবে যা স্মরণ করি তা আত্মপরিচয় নয়।
আত্মপরিচয় মূলত আয়নার সেই ফাসাদ—যখনই তার ছবি
আমাদের মুগ্ধ করে তখনই তা ভেঙ্গে ফেলা উচিত।

ভাষা দেশ গঠনের মূল হিসেবে বিবেচ্য। দারভীশ ভাষাকে ফিলিস্তিন পরিগঠনের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেন। ভূমির বিকল্প হিসেবেও দেখা যায় ভাষাকে। ফিলিস্তিনের গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক মুআজ ইশতিয়াহ কবিতায় দারভীশের ভাষা সংক্রান্ত অনুমান ও জীবনধারাকে চারটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। যেহেতু দারভীশের কবিতার অভিযাত্রা তার ব্যবহারিক জীবনের ভিতর দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে ফলে তার কবিতার অর্থগত বৈচিত্র্য ও পরিগঠনেও নানান মাত্রা যুক্ত হয়েছে। লিখনী, ভাষা, কবিতা ও কাসিদা। একইসাথে এই চারটি পর্যায়েরও রয়েছে চার ধরনের পটভূমি—অর্থাৎ ভাষা কি করে নানা প্রকরণে নিজের প্রকাশ ঘটায়—যার অন্তরালে ভিন্ন কিংবা অন্যকোনো

---

[১৭১]. বালকাজিজ, আব্দুল ইলাহ এবং প্রমুখ, *হাকাজা তাকাল্লামা মাহমুদ দারভীশ দিরাসাতিন ফী জিকরা রাহীলিহি* (বৈরুত: মারকাজু দিরাসাতিল ওয়াহদাতিল আরাবিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৪৫।

[১৭২]. দারভীশ, মাহমুদ, *আছার আল ফারাশাহ*, পৃ. ২৭০।

অর্থময়তা সক্রিয় থাকে। রাজনীতি, সমাজ, সত্তা এবং দার্শনিকতার বিষয়গুলো এর পিছনে কিংবা ভাষার প্রধান উপলক্ষ হয়ে ওঠে। লিখনী বলতে বোঝায়—ভাষা প্রকাশ করার একটি মাধ্যম। লিখনী ভাষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লিখনী মানে লেখার শিল্প ও কৃৎকৌশলগত নানা প্রকরণ ও অনুষঙ্গ। এসবও ভাষারই অংশ। কারণ লিখনী এমন একটি ক্ষমতা ও কৌশলগত শিল্পমাধ্যম যা অর্থ, অলঙ্কার, দার্শনিকতা থেকে শুরু করে ভাষার অন্তর্গত সবকিছু খুব চতুর সুনিপুণ কারুময়তায় এবং যথোচিৎ উপায়ে উপস্থাপনযোগ্য করে তোলে।[১৭৩] সাধারণ জ্ঞানে ভাষা বলতে যা বোঝায় তার সমৃদ্ধি প্রথমত লিখনী শক্তির উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ভাষার আলোচনায় লিখনী কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ দারভীশ ভাষার সামগ্রিকতা থেকে লিখনীকে আলাদা করে দেখেননি। যেকারণে লেখা আর ভাষা অভিন্ন সত্তার মতো। লেখার প্রধান গুরুত্বের দিক হলো এর মাধ্যমে ভাষায় *পোয়েটিক এজেন্সি* প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। লেখার রূপ তৈরির মাধ্যমে মূলত কবি কিংবা কোনো লেখকের নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় নির্ধারিত হয়ে যায়। লেখা বস্তুত একপ্রকার দেহ। ভাষার দেহ। যে দেহ নির্মাণ করতে হয়। তার অবয়ব গড়ে তুলতে হয়। তাতে সত্তা কিংবা প্রাণও সঞ্চার করতে হয়। এরকম দেহের ধারণা ভাষার সাথে গভীরভাবে যুক্ত একটি চিন্তা হয়ে উঠেছে দারভীশের পরিচয়মূলক দার্শনিকতায়।

من يكتب شيأ يملكه الحروف امامك ..
فخذها من حيادها والعب بها كالفاتح في هذيان الكون ...
الحروف قلقة ...جائعة الى صورة ...والصورة عطشى الى معنى[174]

যিনি কিছু লিখেন তিনি তার কর্তৃত্ব অর্জন করেন। তোমার সমুখে হরফমালা। ধারণ করো তাদের কোনো ভেদাভেদ না করে। আর তা দিয়েই এই বিশ্বজগতে বিজয়ীর মতো খেলে যাও... অক্ষরেরা উদ্বিগ্ন... তারা রূপ-ছুরতের প্রতি ক্ষুধাকাতর...এবং রূপ ছুরত অর্থের পিপাসায় মুখিয়ে...

কিন্তু লেখার সাথে আত্মপরিচয়ের কি সম্পর্ক? লেখার সাথে সত্তার পরিচয়ের সম্পর্ক গভীরের। লেখাকে যে বিস্তৃত এবং গভীর অর্থগত পরিসরে দারভীশ উন্নীত করেছেন তার সম্পর্ক দেশ কিংবা রাজনৈতিকতার সামষ্টিক সম্পর্কের সীমা থেকে শুরু করে আত্মজ্ঞানের সাথে তার সম্পর্ক। দারভীশ যে জগতের কল্পনা হাজির করেন তার মূর্ত হয়ে ওঠার মাধ্যম কেবল ভাষা। ভাষা যেকারণে এক অন্যরকম জীবন। এ জীবন অঙ্কিত হয় লেখার মধ্যদিয়ে। তাই দারভীশ বলেন,

أنا من تقول له الحروف الغامضات :
أكتب تكن
واقرأ تجد .. وإذا أردت القول فافعل ..[175]

আমি সেই ব্যক্তিসত্তা যাকে রূপকময় হরফেরা বলে:

---

[১৭৩]. ইশতিয়াহ, মুআজ, *দারভীশ বায়না হুবিয়াতিল লুগাহ ওয়া লুগাতিল হুবিয়্যাহ ফিল মারহালাতিল আখীরাহ ফী তাজরিবাতিহিশ শি'রিয়্যাহ (মাজাল্লাহ আলমুজমা', আল আদাদ: ১৩, ২০১৮ খ্রি.)*, পৃ. ২।

[১৭৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী হাদরাতিল গিয়াব* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, খ্রি.), পৃ.।

[১৭৫]. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ*, পৃ. ৯।

লিখো হয়ে যাবে
পড়ো পেয়ে যাবে...
এবং যখন বলতে চাও অতএব করে ফেলো...

হয়ে যাওয়া বক্তব্যের সাথে লেখার সম্পর্ক—*লিখো হয়ে যাবে*—হয়ে যাওয়া কথার আসল অর্থ হলো, হয়ে ওঠা কিংবা অস্তিত্বময় হয়ে ওঠা। আকার ধারণ করা। হয়ে যাবে, মানে কোনো কিছু তৈরি হয়ে যাওয়া, কাঠামো ধারণ করা ইত্যাদি। *দ্বিতীয়ত, ভাষা*। এখানে লেখা থেকে আলাদা করে লেখা এবং ভাষাকে যুগপৎভাবে আলোচনা করা যায়। কিন্তু ভাষার আলোচনায় প্রকরণগত কারণে পৃথকভাবে আলাদা করে এর আলোচনা করা জরুরি। যাইহোক, মাহমুদ দারভীশ ভাষার জন্য ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করেন—এ বক্তব্য যেভাবে যে সত্য প্রকাশ করে একইভাবে তার আত্মপরিচয়কেও নির্দেশ করে। ভাষার মাধ্যমেই এই আত্মপরিচয়ের প্রকাশ ঘটে। ভাষা যেমন ব্যক্তির নিজের পরিচয় নির্দেশ করে তেমনি তা দেশ ও ভূমির পরিচয়ও বোঝায়। ভাষা যেকারণে পরিচয়—একটি ক্ল্যাসিক চিন্তা ও বোঝাবুঝির বিষয়ও। দারভীশ বলেন,

من أنا؟ هذا
سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا,
وأنا معلقة... معلقتان... عشر, هذه لغتي
أنا لغتي[176]

আমি কে?
অন্য অনেকের এমন প্রশ্ন, তবে তার কোনো উত্তর নেই। আমি আমার ভাষা, আমি।
আমি একটি মুআল্লাকাহ... দুটি মুআল্লাকাহ... দশটি, এই হলো আমার ভাষা

নিজেকে প্রশ্নের মাধ্যমে আত্মপরিচয়ের কুহেলিকা পরিচ্ছন্ন করে তোলার জ্ঞানের ধারা অনেক প্রাচীন। এটি দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বের অতি প্রাথমিক ধারণা। কবিতার মাধ্যমে এই প্রশ্ন এবং তার উত্তর খুব সহজেই প্রকাশ করা যায়। পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শনগুলোতে দার্শনিক এমন প্রশ্নের বিপুল নজির আছে। কিন্তু যে কথাটি দারভীশ কবিতার ভাষায় নতুন করে বলতে চাইছেন তা হলো, নিজেকে প্রশ্ন করা– আত্মজ্ঞানের সীমা এবং রহস্যগুলো উন্মোচন করে তোলা এবং একইসাথে তার জবাব ভাষাগত সত্তার ভেতর থেকে উপস্থাপন করা। আত্মজ্ঞানকে ভাষার সাথে যুক্ত করে কবিতার শরীর তৈরি করার ধারণা নতুন। ভাষা এবং ব্যক্তিসত্তা একাকার হয়ে উঠেছে দারভীশের এই পঙক্তিগুলোতে। সাধারণত এভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যমে যে আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান করা হতো তার প্রেক্ষাপট ছিল সূফি ভাবধারা এবং ভাববাদী দর্শনের সাথে যুক্ত। তবে দারভীশ এখানে আধ্যাত্মিক চৌহদ্দিতে না গিয়ে আত্মজ্ঞানকে ভাষার সাথে যাপনের কিংবা ভাষাময় অস্তিত্বে একীভূত করেছেন। কিন্তু 'আমিই আমার ভাষা' বলার মাধ্যমে দারভীশ তার ভাষার প্রেক্ষিত থেকে নিজের কর্তাসত্তার জানান দিয়েছেন। 'আমিই আমার কবিতা' একই যুক্তিধারায় প্রকাশিত। ভাববাদী নন্দনতত্ত্বের সীমা

[১৭৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদা* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১১৫।

অতিক্রম করে দারভীশ তার ‘আমি’র পরিচয় নির্মাণ করেছেন ভাষাকে উপজীব্য করে। যেখানে ভাষা এবং চিন্তার বিভাজন রেখা মুছে যায়। তবে তার কেন্দ্রে ‘আমি’কে জায়মান রেখেছেন দারভীশ। ‘আমি’ এবং ভাষা এক হয়েও কর্তার জায়গায় দারভীশ তার চিন্তাসত্তাকে তৈরি করেছেন। যে সহসা জানান দিতে পারেন, ‘আমিই আমার ভাষা’। দারভীশের এটি ছিল নতুতরো বক্তব্য। এর পেছনে ফিলিস্তিনের চলমান ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বগুলো পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে নিসন্দেহে। দারভীশ যেকারণে ভাষা এবং আত্মপরিচয়কে একইসূত্রে গড়ে তুলেছেন ইতিহাসের দাবিকে বিবেচনায় নিয়ে। ভাষার মধ্যদিয়ে যে আত্মপরিচয় দারভীশ গড়ে তুলতে চেয়েছেনু, তার প্রেক্ষিতগুলো ভাষার সংশ্লিষ্টতার মধ্যে বিবেচিত হয়ে উঠেছে তার কবিতায়।

يوقظك سؤالي :متى تبحر السفن؟ فتجيب بعصبية
تستدرج المعنى إلى العبث: لن أخرج! فأذكّرك بأن بيروت
ليست حيفا. وكان عليك أن تقول ذلك هناك، فتخجل
من تصويب الخطأ بالخطأ وتستدرك: أعني لن أخرج من
جهة البحر، لأني لا أجيد السباحة. أمازحك قليلا :لكن
كلامك منظومًا بحري كله
وأنت لا تعرف البحر؟
تهدأ وتقول: البحر سرير استعارات مائية. البحر مشهد لغوي.
البحر إيقاعات.[177]

তোমাকে জাগিয়ে তোলে আমার প্রশ্ন: জাহাজগুলো কখন বেরিয়ে পড়বে সমুদ্রে
ঘাবড়ে গিয়ে তুমি জবাব দেবে। অর্থকে ব্যর্থতায় নিয়ে বলবে: আমি কখনো বের হবোনা
তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেই: বৈরুত কখনো হায়ফা নয়। তোমার তাই বলা উচিৎ ছিল
ভুল দিয়ে ভুল ঠিক করা নিয়ে তুমি লজ্জিত হবে। আবার ঠিক করে বলবে: আমার মনে হয়,
আমি কখনো সমুদ্রে বের হবো না। কারণ, আমি ভালো সাঁতার জানি না। তোমার সাথে
কিঞ্চিৎ কৌতুক করে বলব: তোমার ভাষা বরং সমুদ্রের মতো সবদিক থেকে সুসংবদ্ধ।
তবে তুমি কি সমুদ্রের পরিচয় জানো না? ধীর হও এবং বলো, সমুদ্র হলো পানিময়
রূপকের বিছানা। সমুদ্র এক ভাষার দৃশ্যমঞ্চ। সমুদ্র হলো বহুবিধ সুর তরঙ্গ।

ভাষার প্রেক্ষিত কি? ফিলিস্তিনের পটভূমিতে ভাষার ভূমিকা আর সব দেশের ভূমিকা এক নাও হতে পারে। বৈরুত আর হাইফা এক নয়—স্মরণ করিয়ে দিয়ে দারভীশ ফিলিস্তিনের পরিস্থিতির কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চান। ভাষা যেমন সমুদ্রের মতো গভীর, ব্যাপক এবং সুসংগঠিত তেমনি সমুদ্রও ভাষার মতো। গভীর। ভাষার রূপক সমুদ্র। ভাষা কেমন তার দৃশ্যমান রূপক সমুদ্র। যা দিয়ে ভাষার

[১৭৭]. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী হাদরাতি আল গারীব* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, ১৯৯৫ খ্রি), পৃ. ৭৩।

বিস্তৃতি অনুধাবন করা যায়। এটা হয়ত ভাষার পরিচয়। যেখানে সমুদ্রের পরিচয় জানলে ভাষার পরিচয়ও জানা যায়। দারভীশ বলেন,

وأنت والأن مسجي فوق الكلمات وحيدا، ملفوفا
بالزنبق، والأخصر والأزرق، أدرك ما لم أدرك:
أن المستقبل منذئذ،
هو ماضيك القادم.[১৭৮]

এবং তুমি এখন শব্দের উপর ঢেকে আছো একা, পদ্মফুলের মতো
ভাঁজ হয়ে। সবুজ এবং নীল, আমি জানি যা আমি জানি না:

নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ এখান থেকে
এটাই তোমার আসন্ন অতীত

الكلام إشارات يابسة
تتبادلونها في الضرورات القصوى، كأن يغمى عليك من
سوء التغذية، فتداوى بزيت السمك... هبة العالم
المتمدن لمن اخرجوا من ديارهم. تشربه مكرهًا كما تكره
الألم على إخفاء صوته في ادعاء الرضا[১৭৯].

ভাষা শুষ্ক ইংগিতের মতো
চূড়ান্ত জরুরতে তোমরা পরস্পর বিনিময় করো তার।
যেন তুমি পুষ্টিহীনতার ফলে অচেতন হয়ে পড়ছিলে
ফলে দাওয়াই নাও মৎস্য তেলের...
যাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল
তাদের জন্য সভ্য দুনিয়ার কাছে এক উপহার
তুমি তা পান করো জোর করে
যেমন তুমি ঘৃণা করো আত্মতৃপ্তির দাবিতে তার কণ্ঠ লুকিয়ে ফেলার কষ্ট

الجبالُ هِيَ الجبالُ. ويشربُ الـڤودكا
لكي يبقى الخيالَ على الحياد: أَنا
المسافرُ في مجازي، و الكراكيُّ الشقيَّةُ
إخوتي الحَمْقىَ. وينفُضُ عن هُويَّتِهِ

---

[১৭৮]. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী হাদরাতি আল গিয়াব*, পৃ. ২০।
[১৭৯]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪২।

الظلالَ: هُوِيَّتي لُغتي. أنا.. وأنا.
أنا لغتي. أنا المنفيّ في لغتي.
وقلبي جمرةُ الكُرْديِّ فوق جبالِهِ الزرقاء ../[180]

পাহাড়– সেই পাহাড়। সে পান করে ভোদকা যেন আটকে থাকে
পক্ষপাতহীন কল্পনায়: রূপকের ভিতরে আমি এক পরিব্রাজক। এবং
দুর্ভাগা কারাকি আমার বোকা সব ভাই। তবে সে উঠে আসছে
তার অন্ধকার পরিচয় থেকে: আমার পরিচয় আমার ভাষা...
আমি... এবং আমি।
আমি আমার ভাষা। আমি নির্বাসিত আমার ভাষার ভিতর।
এবং আমার হৃদয় নীল পাহাড়ের উপর জ্বলতে থাকা এক কুর্দি অঙ্গার...

ما دلني أحد علي. أنا الدليل, أنا الدليل
إلى بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت
على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما
قمر الديانات القديمة, والسلام المستحيل
وعليهما أن تحفظا فلك الجوار الفارسي
وهاجس الروم الكبير, ليهبط الزمن الثقيل
عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ [181]

আমাকে কেউ দেখিয়ে দেয়নি পথ। আমি নিজেই দেখাই পথ।
সমুদ্র এবং মরুভূর মধ্যবর্তী পথের আমিই প্রদর্শক।
ভাষা থেকে আমার জন্ম—ছোট্ট দুটি গোত্রের মাঝামাঝি ভারতের পথে
যাদের উপর রয়েছে প্রাচীন ধর্মসমূহের চাঁদ এবং অসম্ভব শান্তি।
প্রতিবেশী পারস্যের আকাশ এবং বৃহত্তর রোমানদের আসক্তি রক্ষা যাদের কর্তব্য
যেন আরবের শিবির থেকে নেমে পড়ে জগদ্দল সময়কাল। তাহলে আমি কে?

وجلستُ خلف الباب أَنظُرُ :
هل أَنا هُوَ ؟
هذه لُغَتي[১৮২]

দরোজার আড়ালে বসে আমি ভাবি:

---

১৮০. দারভীশ, মাহমুদ, *লা' তা'তাজির আম্মা ফাআলতা* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস ওয়া আল নাশার, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৭।
১৮১. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতুল হিছান ওয়াহীদা*, পৃ. ১১০।
১৮২. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ*, পৃ. ৯।

আমি কি সে?
এই সে আমার ভাষা।

দারভীশ ভাষাকে কল্পনা করেছেন বিচিত্র আঙ্গিক থেকে। কারণ ভাষামাত্রই বিচিত্র। রহস্যের আধার। জীবনের একান্ত যাপনে, ব্যক্তির রুচিবোধে, সমাজ ও জাতীয়তাবোধ গঠন প্রশ্নে, অধিকার ও অস্তিত্বের প্রশ্নে, স্বাধীনতা ও জীবনবোধ প্রশ্নে, জাতীয় পরিচয়, মুক্তি ও প্রতিরোধে; প্রকৃতি ও পরমার্থিকতায়— সৌন্দর্য্যবোধ, চিন্তা, জ্ঞান, আধ্যাত্ম ও ভাবুকতায়—ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহার ও অনুষঙ্গ উঠে এসেছে দারভীশের কলমের ছোঁয়ায়।

৩.৫: নাম, পরিচয়, ভাষা এবং চিন্তার জগৎ

গভীর অর্থবোধক হয়ে ওঠে পরোক্ষ পরিচয়বোধক কবিতাগুলো। পরোক্ষ পরিচয়ের তাৎপর্যপূর্ণ মাধ্যম হলো ভাষা। যেখানে আকার-নিরাকার ডিলেমার মধ্যদিয়ে শুধু যে ফিলিস্তিনের জাতীয় পরিচয়ের ব্যথা প্রকাশ পায় তা নয়, একইসাথে তার বহুমাত্রিক অর্থোৎপাদনও সম্ভব। স্মৃতি এবং নামকরণ দুটি ভাষাগত উপাদান পরিচয়ের সাথে যুক্ত। ব্যক্তির সত্তা এবং তার স্থান-কালের পরিচয়ও বহন করে নামের মধ্যদিয়ে। ফলে স্মৃতি এবং নামকরণের প্রতীকী দ্যোতনায় আত্মপরিচয়ের গোড়া সন্ধান করেছেন দারভীশ। ব্যক্তির নাম থেকে শুরু করে স্থান বা অঞ্চলের নাম যে কাব্যশৈলীতে উপস্থাপিত হয় তার একটি পরিচয় নির্ধারক শক্তি-ব্যঞ্জনা তৈরি হয় নিঃসন্দেহে। ১৯৪৮ এর নাকবা পরিস্থিতির মধ্যে ইজরাইল যখন ফিলিস্তিন দখল করে নেয়, দখল করার আগে ইজরাইল নামে তখন কিছু ছিল না। দখলের পরই ইহুদি জাতি নামকরণ করে ইজরাইল। কিন্তু ফিলিস্তিনের ইতিহাস সুদূর প্রাচীন। দেশটি বেহাত হয়ে যাওয়ার পর যে লড়াই ফিলিস্তিন জাতি শুরু করে নাকবা পরবর্তী পরিস্থিতিতে তারই স্বরূপ উন্মোচিত হয় প্রথমত কবিতা এবং ভাষায়। এ লড়াই আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধারের ও পুনঃনির্মাণের। ফলে নতুন করে নামকরণের ঘোষণার অর্থ, হারানো ভূমি কিংবা হারানো ভাষা এবং স্মৃতিকে বর্তমান করে তোলার প্রত্যয়।

ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও আগে থেকে ইহুদিরা সামাজিকভাবে যে প্রভাব বিস্তার করে আসছিল তার মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ছিল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর অনেক কিছু সহজ হয়ে যায় তাদের জন্য। জায়োনিস্ট প্রকল্প যেসব পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল নাম পরিবর্তন। ফিলিস্তিনের হাজার হাজার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নাম ও স্থাপনার নাম বদলে ফেলে জায়োনিস্ট প্রকল্প। ধারণা করা হয় প্রায় পাঁচ হাজার ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক আরবী নামশব্দ পরিবর্তন করে তাতে হিব্রু শব্দ বসিয়ে দেয়া হয়। জায়োনিস্ট প্রকল্প এবং ইজরাইল রাষ্ট্র এধরনের যেসব নাম পরিবর্তন করে হিব্রুকরণ করেছে তার একটি নামকোষ প্রণয়ন করেছে ইনস্টিটিউট ফর পালেস্টাইন স্টাডিজ। বইটির এসব নামের সংকলন যথাযথ তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে

নিবিড় সম্পাদনায় সম্পন্ন করা হয়। যেখানে মূল আরবী নাম, এবং পাশাপাশি বদলে ফেলা হিব্রু নামও যুক্ত করে দেয়া। একইসাথে ইংরেজিতে কি বলা হয় তাও যুক্ত করা হয়। প্রতিটি নামের সাথে একটি ছোট টীকাও সংযুক্ত করা হয়, যাতে মূল নামের উৎস, ঐতিহাসিক পটভূমি, অবস্থান, সময়কাল, কার্যকারণ ইত্যাদির স্বল্প বিবরণ রয়েছে। বইটির ভূমিকার একদম শুরুতে যে তথ্যটি দেয়া হয় তা এখানে তুলে ধরা হলো...

مضي نحو 120عاما علي بداية تغيير الاسماء العربية في فلسطين إلي تسميات أخري عبرية تخدم الأهداف التي وضعتها الحركة الصهيونية و دولة إسرائيل من بعدها، والتي نجحت في عبرنة أكثر من ٩٠٠٠ إسم لمواقع فلسطينية، منها أكثر من ٥٠٠٠ مواقع جغرافي، وعدة مئات من الأسماء التارخية، وأكثر من ١٠٠٠ إسم للمستعمرات.[১৮৩]

নামকে দারভীশ রাজনৈতিক, ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার অংশ করে তুলেছিলেন। তেমনি করেছেন ব্যক্তির সৌন্দর্য্যবোধ ও পরম আত্মজ্ঞানের ব্রত হিসেবে। নাকবা পরবর্তী সময়ে যখন ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধ শুরু হয় দারভীশ তখন উচ্চারণ করলেন নাম নিয়ে। নামের পুনরুদ্ধার মানে পরিচয় ফিরিয়ে আনার আহবান জানান কবি। দারভীশ বলেন,

তুমি আসবে তুমি যাবে নগরগুলোর ভিতর। এই অন্ধকারে তুমিই দেবে গ্রামগুলোর নাম। গরিবদের তুমি সাবধান করো ভাষা থেকে, কথা থেকে, সংবাদঅলাদের থেকে। এবং শীঘ্রই তুমি যাবে। নিশ্চয়ই তুমি যাবে।	تأتي إلى مُدُنٍ وتذهبُ . سوف تعطي الظلَّ أسماء القرى . وتحذِّر الفقراء من لغةِ الصدى والأنبياء وسوف تذهبُ...سوف تذهبُ[১৮৪]

জিদারিয়া (দেয়ালচিত্র) কাব্যগ্রন্থে কবি নাম ও আত্মপরিচয়কে একসূত্রে গেঁথেছেন:

এই তোমার নাম বলেই এক নারী অদৃশ্য হয়ে গেলো আঁকাবাঁকা পথের ভিতর। এটাই তোমার নাম। অতএব ভাল করে রক্ষা করো	/ هذا هُوَ اسمُكَ قالتِ امرأةٌ ، . وغابتْ في مَمَرِّ بياضها هذا هُوَ اسمُكَ ، فاحفظِ

১৮৩. আররাফ, শুকরি, *আল মাওয়াকিউ আল জুগরাফিয়্যাহ ফী ফিলিস্তীন: আল আসমা আল আরাবিয়্যাহ ওয়া আল তাসমিয়্যাত আল ইবরিয়্যাহ* (বৈরুত: মুআসসাসাহ আল দিরাসাত আল ফিলিস্তীনিয়্যাহ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১।

১৮৪. দারভীশ, মাহমুদ, *আল-দীওয়ান. আল আ'মাল আল-উলা-২* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লি আল-কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩০৪।

একটি বর্ণ নিয়েও তার সাথে বিরোধ করবে না
বহন করো না জাত-বর্ণের নিশানা।
বন্ধু হয়ে ওঠো তোমার দিগন্তমুখি আনুভূমিক নামের
জীবীত আর মৃতদের সাথে বিনিময় করো তার অভিজ্ঞতা
এবং এর সঠিক উচ্চারণ চর্চা করো ভিনদেশিদের ছোহবতে
এবং গুহানিবিষ্ট কোনো পাথরে লিখে রাখো এই নাম
হে আমার নাম, আমার বেড়ে ওঠার সাথে তুমি বেড়ে ওঠবে
যেমন আমি বহন করি তোমায় তুমিও বয়ে যাবে আমায়।”

اسْمَكَ جَيِّداً !
لا تختلفْ مَعَهُ على حَرْفٍ
ولا تَعْبَأْ براياتِ القبائلِ ،
كُنْ صديقاً لاسمك الأُفُقِيِّ
جَرِّبْهُ مع الأحياء والموتى
ودَرِّبْهُ على النُطْق
الصحيح برفقة الغرباء
واكتُبْهُ على إحدى صُخُور
الكهف ،
ياإسمي : سوف تكبَرُ حين
أَكبَرُ
سوف تحمِلُني وأَحملُكَ[১৮৫]

নামের এক মহাকাব্যিক আখ্যান বিধৃত হয়েছে দারভীশের বিখ্যাত দেয়ালচিত্র কাব্যগ্রন্থে। প্রথম উদ্ধৃতিতে *নারী, মুখস্থ করো*'র ভাষাগত প্রতীকীমূল্য অসাধারণ। উদ্ধৃতিতে পরিচয়ের কথা উঠে এসেছে। এখানে দারভীশ জাতীয় পরিচয়ের কথা বলছেন, একইসাথে বিপরীতভাবে জাতপাত বর্ণপরিচয় বিরোধী কথাও ব্যক্ত করছেন। বস্তুত, এটাই তোমার নাম। *অতএব ভাল করে মুখস্থ করে নাও*—পঙক্তিটিতে *এটাই তোমার নাম*—অংশে বিশেষ জোর আরোপ করা হয়েছে। এই নাম-পরিচয় বলে কবি কি বুঝাতে চেয়েছেন? কবি মূলত তার মাতৃভূমির নামের কথা ব্যক্ত করেছেন। পরের *ভাল করে মুখস্থ করে নাও* অংশে বিষয়টি পরিষ্কার অনুধাবন করা যায়। যেহেতু নাম স্বভাবতই মনে থাকে। ভুলে যাওয়ার মতো কিছু না। ফলে এমনি এমনি কাউকে তার নাম মুখস্থ করে নিতে বলার কোনো কারণ নাই। এতে নিশ্চয়ই বিশেষ কারণ এবং অন্যকোনো অর্থ রয়েছে। কবি মূল টেক্সটে *হিফজ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার প্রচলিত অর্থ মুখস্থ করা। হিফজ থেকে বাংলা ভাষায় ব্যবহার হওয়া হেফাজত বা সংরক্ষণ করা অর্থেও এর ব্যবহার রয়েছে। যেখানে কবি তার দেশের নাম, তার ভৌগলিক জাতীয় পরিচয় সংরক্ষণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কবি বলেন,

আর আমার নাম আনুভূমিকভাবে পাঁচটি অক্ষরে সজ্জিত
নিজেই আমি ভুল করি নিজ নামের বানান:
মীম/প্রেমের কাঙাল, পিতামাতাহীনতায় নিঃসঙ্গ, অতীত পূর্ণতাময়ী
হা/বাগান এবং প্রিয়তমা, দুটোই অস্থির, দুটোই হারানোর

واسمي ، إن أخطأتُ لَفْظَ
اسمي
بخمسة أَحْرُفٍ أُفُقيّةِ التكوين
لي :
ميمُ / المُتَيَّمُ والمُيتَّمُ والمتمِّمُ ما

---

[১৮৫]. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ (দেয়ালচিত্র)*, পৃ. ৪।

মীম/ধীরে ধীরে প্রেমময় অভিযানোদ্যম, নির্বাসনে অঙ্গীকারাবদ্ধ প্রস্তুত মৃত্যুর-রুগ্ন মনোকামনায় ওয়া/বিদায়-বিরহকাতর, কেন্দ্রাভিমুখী গোলাপ যেখানেই অস্তিত্বমান সেখানেই জন্ম-সৃষ্টির বিশ্বাস, পিতামাতার অঙ্গীকার দাল/দলিল-পথ নির্দেশক, দুয়ার-পন্থ, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া গৃহের অশ্রু এবং এক ভারুই পাখি আমাকে মায়া লাগায়–রক্তাক্ত করে আর এই হলো আমার নাম।	مضى حاءُ / الحديقةُ والحبيبةُ ، حيرتانِ وحسرتان ميمُ / المُغامِرُ والمُعَدُّ المُسْتَعدُّ لموته الموعود منفيّاً ، مريضَ المُشْتَهَى واو / الوداعُ ، الوردةُ الوسطى ، ولاءٌ للولادة أَينما وُجدَتْ ، وَوَعْدُ الوالدين دال / الدليلُ ، الدربُ ، دمعةُ دارةٍ دَرَسَتْ ، ودوريّ يُدَلِّلُني / ويُدْميني وهذا الاسمُ لي[১৮৬]

এই উদ্ধৃতিতে কবির নির্বাসিত জীবনের করুণচিত্র উঠে এসেছে। ক্ষোভ, বেদনা, মায়া, বিচ্ছেদ-বঞ্চনা, ভালোবাসা আর আক্ষেপের উচ্চারণে। দেয়ালচিত্র লেখার সময়টা ছিল ১৯৯৮; ২০০০ সালে বৈরুতের *রিয়াদ আল রাইস লি আল-কুতুব ওয়া আল- নাশর* থেকে বইটির প্রথম সংস্করণ বের হয়। কবি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সে সময়। হার্টের সার্জারির অপেক্ষার সময় অপারেশন থিয়েটারে শুয়ে নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে *জিদারিয়্যা'র* প্লট অংকন করে নেন দারভীশ। নির্বাসিত জীবনে একজন মানুষের সাথে তার মাতৃভূমির কিছুই থাকে না। একমাত্র *নাম* ছাড়া আর যেন কিছুই থাকে না। কবি রুগ্ন অবস্থার আবহ রেখে *মাহমুদ (محمود)* নামে নিজের পরিচয় চিত্রায়িত করেছেন উপরের পঙক্তিগুলোতে। শৈশবের বেদনাময় স্মৃতিও উঠে আসছে এ কবিতাংশে। ইজরাইলি হামলায় জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ায় শৈশবেই পিতা-মাতাকে হারিয়েছিলেন কবি। শৈশবের খেলার সাথী প্রিয়তমা বান্ধবী, ইজরাইলি সেনাদের হামলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নিজের বাস্তুভিটা, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিময় ঘুরে বেড়ানোর বাগান কিংবা মায়াবী ভারুই পাখির কিচিরমিচির সুরের বিরহদশা চিত্রিত হয়েছে এখানে। মূলত এসব বর্ণনাচিত্রই একজন কবি মাহমুদ দারভীশ কিংবা ফিলিস্তিনের একজন ব্যক্তির পরিচয়ের নির্ধারক উপাদান। নামের সাথে আত্মপরিচয়ের সম্পর্ককে কবি কখনো স্বপ্নময় করে তুলতে চেয়েছেন। যেখানে কবির কাছে স্বপ্ন আর দেহতত্ত্ব মাত্রই তার জন্মভূমি এবং আত্মপরিচয়। যে আত্মপরিচয় নাম এবং ভাষায় যুগপৎভাবে ফুটে উঠেছে নতুন মাত্রায়। কবি *মিন মানফা* বা নির্বাসন থেকে কবিতায় বলেন,

[১৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

হৃদয়ের গভীরে ওড়ে এইসব শব্দ রফরফ/
নামের এক আসমানি ভূমি হৃদয়ে, যাকে বয়ে বেড়ায়
শব্দমালা, মৃতরা স্বপ্ন দেখে না অধিক, যদি তারা দেখতো
তবে কেউ বিশ্বাস করতো না তাদের স্বপ্ন...
এইসব শব্দ ওড়ে দেহের ভিতর পতপত খেঁজুর
খেঁজুর বৃক্ষ... যদি নীলের পর নীল লিখে যেতাম
গানগুলো হয়ে যেত সবুজ এবং আমার কাছে জীবন
আসতো ফিরে। শব্দসমগ্র দিয়ে আমি পেয়ে যেতাম
নামের রাস্তা, এই পথ বেশ ছোট...কবিরা খুব বেশি খুশি হয় না
যদি হতো, তবে কেউ বিশ্বাস করতো না কখনো তাদের...

ها هي الكلماتُ ترفرفُ في
/ البال
في البال أرضٌ سماويَّةُ الاسم
تحملها الكلماتُ
ولا يحلم المِيّتون كثيراً، وإن
حلموا
....لا يصدِّقُ أحلامَهُمْ أحَدٌ
هاي هي الكلماتُ ترفرف في
جسدي نحلةً
نحلةً... لو كتبتُ على الأزرقِ
الأزرقَ
اخضرّتِ الأغنياتُ وعادت
.إليَّ الحياةُ
وبالكلمات وجدت الطريق إلى
الاسم
أقصَرَ... لا يفرح الشعراء
كثيراً، وإن
..فرحوا لن يصدِّقهم أَحَدٌ[১৮৭]

নাম বর্গটি দারভীশের কবিতায় বিশেষ স্থান করে আছে। বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার লক্ষ করা গেছে দারভীশের কবিতায়। একেবারে সাধারণ থেকে দার্শনিক অভিজ্ঞানে নাম-বর্গীয় বিদ্যা ও নান্দনিকতার উপস্থাপনসমৃদ্ধ বিপুল কবিতা সৃষ্টি করেছেন দারভীশ। যেখানে পরিচয়ের ভাষা ও ভৌগলিক তাৎপর্য ছাড়াও মানুষের আত্মার পরিচয়ের আধ্যাত্মিকতায় ঋদ্ধ হয়েছে তার কবিতা। অর্থাৎ রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের পর্যায় অতিক্রম করে কবি বিশ্বজনীন পরম সত্তার পরিচয়ের সন্ধানে নিমগ্ন হওয়ার পথে এগিয়ে গেছেন। যেখানে নাম পরমার্থিক সত্তার একটি অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। যেকারণে দারভীশের কবিতায় মানবাত্মার পরিচয়ও তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান। মোটকথা, নাকবা-উত্তর এবং উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যে জাতীয় পরিচয়ের আলোচনায় ভাষা খুব গুরুত্বপূর্ণ বর্গ—যেখানে কবিতা ও সাহিত্যে নাম একটি প্রাসঙ্গিক প্রপঞ্চ। উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে আত্মপরিচয়কে জোর দিয়ে দাবি করতে নামের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেখানে স্বাধিকার ফিরে পেতে নামের তকমা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী পরিসরে ব্যক্তি তার জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় প্রকাশ করতে জোর দিয়ে নিজের নাম প্রকাশ করাটাকে জরুরি মনে করে। ব্যক্তির নাম তাতে তার জনগোষ্ঠীর

[১৮৭]. দারভীশ, মাহমুদ, *কাজাহর আল-লাওজ আও আবআদ* (বৈরুত: রিয়াদ আররাঈস লি আল-কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪৫।

চিহ্ন-প্রতীক হয়ে ওঠে। শুধু ব্যক্তির নিজের নাম নয়, তার জাতির যে কারো নামই হতে পারে, হতে পারে কোনো পরিচিত পাহাড়, বৃক্ষ, পাখি, ফল যা নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, প্রকৃতি ও ভৌগলিক সীমানার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে দারভীশের ভাষা স্বয়ং তার দেশমাতৃকার পরিচায়ক। এরসাথে যেমন রাজনীতি আছে তেমনি আছে কবিতা এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের শক্তি। ব্যক্তিকে যেখানে বিচ্ছন্নভাবে নিছক চেনার ব্যাপার থাকে না, তার ভূ-জাতিগত নাগরিক পরিচয়ের চিহ্নও হয়ে ওঠে এই নাম। কারণ নাম বা ভাষা নিজেই একটি নির্দিষ্ট ইতিহাস ও ভূখণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। যা শুধু আইন, ক্ষমতা কিংবা অস্ত্রের জোরে কেড়ে নিলেও তা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। ফলে দারভীশ নিজের জাতিগত পরিচয়ের প্রশ্নে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন ছিলেন। ব্রিটেনভিত্তিক দৈনিক গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি ইজরাইলি কবি এহুদা অ্যামেচাই'র সাথে তার সম্পর্ক এবং কবিতার প্রসঙ্গ ধরে ফিলিস্তিনের ভাষা এবং আত্মপরিচয়ের কথা ব্যক্ত করেন। দারভীশ বলেন,

> His poetry put a challenge to me, because we write about the same place. He wants to use the landscape and history for his own benefit, based on my destroyed identity. So we have a competition: who is the owner of the language of this land? Who loves it more? Who writes it better?[১৮৮]
>
> তার কবিতা আমাকে চ্যালেঞ্জ করে, কারণ আমরা একই স্থান নিয়ে লিখি। তিনি তার নিজস্ব স্বার্থের পক্ষে এই ভূমি এবং ইতিহাসকে ব্যবহার করতে চান। আর তা করতে চান ধ্বংস করে দেয়া আমার পরিচয়ের উপর দাঁড়িয়ে। সুতরাং আমাদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে—কে তাহলে এই ভূখণ্ডের ভাষার অধিকারী? কে তাহলে তাকে বেশি ভালোবাসে? কে তার জন্য ভালো লিখে?

নাম'র ধারণা কিংবা ব্যবহার ভাষা–সমাজ–সংস্কৃতি কিংবা রাজনৈতিক–অর্থনীতির উৎপাদন সম্পর্কসহ বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু নাম যেহেতু স্বাভাবিকভাবে ভাষার সাথে সম্পর্কিত এবং একইসঙ্গে এটি পরিচয়জ্ঞাপক প্রতীকও; তাই নাম'র ব্যবহারিক বিভিন্নতায় এর অর্থ, ভাব বা উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশের সম্ভাবনা ধারণ করে। যা কোনো না কোনো স্মৃতি, চিহ্ন-পরিচয়কে তুলে ধরার সম্ভাব্য ভাষাবস্তু হয়ে ওঠে। যেমন ব্যক্তির সত্তা এবং তার স্থান-কালের পরিচয় নামের মধ্যে পরিবাহিত হয়। ফলে স্মৃতি এবং নামকরণের প্রতীকী দ্যোতনায় আত্মপরিচয়ের গোড়ার সন্ধান পাওয়া যায় দারভীশের কবিতায়। ব্যক্তির নাম থেকে শুরু করে স্থান বা অঞ্চলের নাম যে কাব্য শৈলিতে উপস্থাপিত হয় তাতে এক প্রকার বৈশিষ্ট্যমূলক পরিচয় নির্ধারক শক্তি-ব্যঞ্জনা তৈরি হয় নিসন্দেহে।

---

[১৮৮]. চ্যান্ডলার, অ্যাডাম, '*দি লিগ্যাসি অব মাহমুদ দারউইশ*' (যুক্তরাজ্য: দি গার্ডিয়ান রিভিয়্যু, অনলাইন সংস্করণ, ৮ জুন, ২০০২ খ্রি.), https://www.tabletmag.com/scroll/140799/the-legacy-of-mahmoud-darwish

নাম যেমন সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক একটি বর্গ তেমনি সাংস্কৃতিকও। ব্যক্তির নিজ বা আত্ম (Self) পরিচয় গঠন কিংবা *নিজ*কে সামাজিক এবং যেকোনো সামষ্টিক এবং জনপরিসরে প্রকাশ করার শুরুবিন্দু বা চিহ্ন এই নাম। বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক গুনাবলী কিংবা প্রশংসা বা নিন্দামূলক কোনো আলোচনা দিয়ে ব্যক্তির বর্ণনা দেয়া যায় মাত্র কিন্তু নাম ছাড়া কোনো অবস্থাতেই এসব আলোচনা কোনো কাজে আসে না। "নাম" যেকোনো ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তুর পরিচয় নির্ধারক। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি যেমন আত্মপরিচয় নির্ধারক হিসেবে কাজ করে তেমনি এটি ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে একটি চিহ্নও বটে। আধুনিক চিহ্নবিজ্ঞানের (semiology) দিক থেকে যাকে দ্যোতক (সিগনিফায়ার) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১৮৯]

জাতীয় আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে নাম ব্যবহারের গুরুত্ব চিহ্নিত করেন পবনেডিক্টা উইন্ট-ভাল (Benedicta Wnndt-Val)। বেনেডিক্টা মনে করেন, কোনো না কোনো সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চয়েজের ফল হিসেবে কাজ করে এই নাম বা ব্যক্তিগত নাম। আমাদের ধর্মীয় পরিচয়, জাতিগোষ্ঠী বা শ্রেণি-বংশ পরিচয়ের পরিব্যপ্তিতে নাম একটি চয়েজের ব্যাপারও। যেটি সমগ্রের চিহ্ন হয়ে ওঠে। আরব দেশগুলোর গোত্র-পরিচয়ের ক্ষেত্রে এই নামের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

মানব সত্তা এবং তার পরিচয় সম্পর্কিত নিজস্ব চৈতন্যের মধ্যে জটিল সম্পর্ক রয়েছে। বেনেডিক্ট এর মতে, পরিচয় (identity) যা নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠভাবে নাম এবং পদ-পদবির মতো নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব নাম আমাদের নিজেদের মাধ্যমে কিংবা আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষের মাধ্যমে আমাদেরকে দেয়া হয়। বেনেডিক্ট মনে করেন, নাম শুধু পরিচয়জ্ঞাপকই নয়, বরং ধর্ম-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সমাজ-ইতিহাস সব মিলিয়ে যে অখণ্ড সত্তা তৈরি হয় নামের মধ্য দিয়ে তা উঠে আসে।[১৯০] বিশেষ করে ফিলিস্তিনের জাতিসত্তার পরিচয়ের ইতিহাসে ভাষা কিংবা নামের প্রশ্ন অনেক প্রাসংগিক। আরব জাতিয় পরিচয় গঠনে সামাজিকভাবে এই নামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন আরব সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক ইয়াসির সুলেমান। সুলেমান করেন, ভাষার পরিসরে আরব জাতিগুলোর ইতিহাসে তাদের ট্রাইবাল-গ্রোত্রগুলোর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যাতে সামাজিকভাবে সামষ্টিক কিংবা ব্যক্তি পর্যায়ে নামের শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে।[১৯১] মাহমুদ দারভীশের কবিতায় বিপুলভাবে নামের ব্যবহার রয়েছে, যা ম্যাটাফিজিক্যালি কখনো প্রতীকীভাবে তার মাতৃভূমির প্রতিনিধিত্ব করছে। নাম শুধু একটি কাবিক্য ব্যাঞ্জনামাত্র নয়, বরং যেখানে তার জন্মভূমি দখল হয়ে যাওয়ার ক্ষোভমিশ্রিত

[১৮৯]. আল শারীফ, রিহাম, *সিমিইয়্যাহ আল উনওয়ানাহ ফী কাসাইদি মাহমুদ দারভীশ* (সিরিয়াঃ আরবী বিভাগ, দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৯-১৫০। রোলাঁ বার্থিস, *ইমেজ*, *মিউজিক*, *টেক্সট* (লন্ডনঃ ফোন্টানা প্রেস, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৯-৫০।

[১৯০]. উইন্ট-ভাল, বেনেডিক্টা, *পার্সোনাল নেম এন্ড আইডেন্টিটি ইন লিটারেরি কনটেক্সট* (অসলো স্টাডিজ ইন ল্যাঙ্গুয়েজ, ৪(২), ২০১২), পৃ. ২৭৩-২৮৪। *View of Personal Names and Identity in Literary Contexts (uio.no)*, ভিজিটঃ ফেব্রুয়ারি ২, ২০২৩

[১৯১]. সুলেইমান, ইয়াসির, ইয়াসির, *দ্য অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ন্যাশনাল আইডেন্টিটি, আ স্টাডি ইন আইডিওলজি*, পৃ. ২৪-১৫০।

ইতিহাসও জড়িয়ে আছে নামের সাথেযে নামের নেপথ্যে ইজরাইল-ফিলিস্তিনের দ্বন্দ্ব যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে মাতৃভূমির প্রতি প্রবল প্রেমময় পরিচয়।

নামের বোধগম্যতা, উপলব্ধি এবং এর বিচিত্র প্রয়োগ দারভীশের কবিতায় বহুমাত্রিক অধিবিদ্যাগত চিন্তার খোরাক হয়ে ওঠে। ইতিহাসের বিশেষ দেশকালে বিশেষ আত্মপরিচয়ের সীমা পার হয়ে দারভীশ "নাম"র অন্যমাত্রিক ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। আত্মপরিচয়ের সংকট ফিলিস্তিনের জনমানসে যে গভীর ক্ষত ও যন্ত্রণা তৈরি করেছে দারভীশের কবিতায় তার প্রকাশ নানাভাবে এসেছে। ""أنت مع الجريدة و مقهي কবিতায় কবির দীর্ঘ নির্বাসনে থাকায় স্বদেশের প্রতি তার ভাবগত উপলব্ধি ও স্মৃতিময় বিচ্ছুরণ ধরা পড়ে। এই ভাবনার জগতের সাথে নাম যুক্ত হয় বেশ অর্থময়তার সাথে, যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। কবি বলেন,

فاصنع بنفسك ما تشاء، إخلعْ
قميصك أو حذاءك إن أَردتَ، فأنت
منسيٌّ وحُرٌّ في خيالك، ليس لاسمكَ
أَو لوجهكَ ههنا عَمَلٌ ضروريٌّ. تكون
كما تكون.... فلا صديقَ ولا عَدُوَّ
هنا يراقب ذكرياتِكَ /[192]

তবে যা ইচ্ছা তাই করো, খুলে ফেলো
জামা কিংবা জুতা যদি চাও,
তোমার কল্পনায় মূলত তুমি বিস্মৃত এবং স্বাধীন
ওখানে তোমার নামের কিংবা তোমার চেহারার
বিশেষ জরুরি কোনো কাজ নেই। তুমি হও
যেমন তুমি হয়ে ওঠো... সুতরাং ওখানে কোনো
বন্ধু নেই, শত্রু নেই যে তোমার স্মৃতি রক্ষা করবে।

নামের সাথে ভাষার সম্পৃক্ততা শুধু পরিচয়ের নয়, চিন্তার খোরাক আর স্বপ্নময়তারও। দারভীশ বলেন,

دَثّريني بصوفك يا لغتي، ساعديني
على الاختلاف لكي أبلغ الائتلاف. لِدِيني
أَلِدْك. أنا ابنك حيناً، وحيناً أبوك
وأمك. إن كنتِ كنتُ، وإن كُنْتُ

[১৯২]. দারভীশ, মাহমুদ, *কাজাহর আল-লাওজ আও আবআদ*, পৃ. ২৫।

كنتِ. وسمّي الزمان الجديد بأسمائه
الأجنبّيةِ يا لغتي، واستضيفي الغريب
البعيد ونَثْرَ الحياة البسيطَ لينضج
شعري. فَمَنْ إن نطقتُ بما ليس
شعراً سيفهمني؟ من يكّلّمني
عن حنينٍ خفيِّ إلى زمن ضائع إن
نطقتُ بما ليس شعراً؟ ومن إن
نطقت بما ليس شعراً سيعرف
أرض الغريب؟[১৯৩]

তোমার রহস্যের চাদরে আমায় ঢেকে ফেলো হে ভাষা!
যেখানে আছে দূরত্ব—ভেদ তার মিলনে সাহায্য করো হে!
তোমায় জন্ম দিবো আমার ধর্মের জন্য—কখনো তোমার
সন্তান আমি, কখনো তোমার পিতা, কখনোবা তোমার জননী
যদি তুমি হতে তবে আমি হতাম, যদি আমি হতাম তবে হতে
তুমি। নতুন সময়ের নাম হবে সেসব অজানা নামে—হে!
দূরের অচেনা অগন্তুক আর সরল জীবনের গদ্যরে তুমি করো
অতিথি। যেন কামেল হয়ে ওঠে আমার কাব্য। সুতরাং যদি
আমি বলি এটি কাব্য নয়—তবে আমায় কে বুঝবে বলো?
যদি বলি এটি কাব্য নয়—তবে হারানো সময়ের প্রতি
গুপ্ত কাতর সম্পর্কে কে আমার সাথে কথা বলবে? যদি বলি
এটি কবিতা নয়্য—তবে সে নিশ্চয়ই সন্ধান পাবে সেই
অজানা আগন্তুকের দুনিয়ার...

১৯৩. কাজাহরিল লাওজি আও আবয়াদি, পৃ. ১২৩

> لا أعرف أُسمكَ، ما أُسمُكَ؟
أُختاري من الأسماء أَقْرَبَها
إلى النسيان. سَمِّيني أَكُنْ في
أهل هذا الليل ما سَمَّيْتني!
> لا استطيع لأنني امرأةٌ مسافرةٌ
على ريح. وأنت مسافر مثلي،
وللأسماء عائلة وبيت واضح
فإذن، أنا «لا شيءَ»..[194]

তোমার নাম জানিনা। কি তোমার নাম?
বিস্মৃতপ্রায় নামগুলো আমার পছন্দ
আমার নাম দাও, আমি হয়ে যবো
এই রাত্রিনিবাসী যেমন করে তুমি দিলে
আমার নাম! আমি পারিনা, কারণ বাতাসে
আমি ভ্রাম্যমাণ এক নারী এবং তুমিও
মতো এক পরিব্রাজক। নামেরও আছে পরিবার
স্পষ্ট ঘর। তবে আমি... আমি কিছুই না...

দারভীশের ভাষা নিজেই তার দেশমাতৃকার পরিচায়ক। এরসাথে যেমন রাজনীতি আছে তেমনি আছে কবিতা এবং নান্দনিক সৌন্দযের্র শক্তি। যেখানে ব্যক্তিকে বিচ্ছন্নভাবে নিছক চেনার ব্যাপার থাকে না, তার ভূ-জাতিগত নাগরিক পরিচয়ের চিহ্নও হয়ে ওঠে এই নাম। কারণ নাম বা ভাষা নিজেই একটি নির্দিষ্ট ইতিহাস ও ভূখ ের প্রতিনিধিত্ব করে। যা শুধু আইন, ক্ষমতা কিংবা অস্ত্রের জোরে কেড়ে নিলেও তা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। যেকারণে দারভীশ নিজের জাতিগত পরিচয়ের প্রশ্নে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন ছিলেন। গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি ইজরাইলি কবি এহুদা অ্যামেচাই'র সাথে তার সম্পর্ক এবং কবিতার প্রসংগ ধরে ফিলিস্তিনের ভাষা এবং আত্মপরিচয়ের কথা ব্যক্ত করেন। দারভীশ বলেন: "তার কবিতা আমাকে চ্যালেঞ্জ করে, কারণ আমরা একই স্থান নিয়ে লিখি। তিনি তার নিজস্ব স্বাথের্র পক্ষে এই ভূমি এবং ইতিহাসকে ব্যবহার করতে চান। আর তা করতে চান ধ্বংস করে দেয়া আমার পরিচয়ের উপর দাঁড়িয়ে। সুতরাং আমাদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে- কে তাহলে এই ভূখ ের ভাষার অধিকারী? কে তাহলে তাকে বেশি ভালোবাসে? কে তার জন্য ভালো লিখে?"

فاحملني كما حملتك الفراشات إلى مدارج الضوء،
خفيفا مثلها، كلما انبلج الصبح من ثقوب بابك الخشبي،
وانهمرت ألوان طايءرة لم تعرف أسماءها، كخواطر

১৯৪. দারভীশ, মাহমুদ, *লা' তা'তাজির আম্মা ফাআলতা*, পৃ. ১০৩।

سماوية مبعثرة، علي حقول خالية من الجيش. هناك
حسبت أن الأرض تطير وترقص. فوقفت علي صخرة
وفتحت ذراعيك للريح وقفزت الي أعلي لتطير، فأحاطت
بك الفراشات كشقيقات، وأعانتك علي الطيران.. ولم
تفلح. لكنها أدخلتك الي مدار اللازورد، ودربتك علي
فقه العزلة. فابتعدت عن البيت، وخلوت الي الشجرالذي
لم تعرف من أسمائه الا ما خف لفظه، كالزيتون
والخرنوب والسنديان والبلوط. ولم تعرف من أسماء
النباتات إلا الخبيزة والهندباء ذات الزهر الليلكي كلون
عيني جدتك.[195]

আমাকে বয়ে নিয়ে যাও, যেমন আলোর স্তরে স্তরে তোমাকে নিয়ে গেছে প্রজাপতি। তার মতো সূক্ষ্মভাবে। যখন তোমার কাঠের দরোজার ছোট ছোট ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভোরের আভা। উপচে পড়ে উড়ন্ত রঙ—ডিভাইন কল্পনার মতো—ছড়িয়ে পড়ছে সৈনিকের পদচিহ্নমুক্ত ক্ষেতে ক্ষেতে—সেসব জিনিসের নাম তুমি জানোনা। আমি ভেবেছিলাম পৃথিবীটা ওড়ে, নৃত্য করে। এরপর আমি দাঁড়ালাম পাথরের উপর। তুমি বাতাসের মুখে দুহাত মেলে দিয়ে আকাশের দিকে লাফ দিলে—যেন তুমি ওড়ে যাবে। অতপর চারপাশে তোমার সহোদরার মতো জড়ো হলো প্রজাপতি। তোমার ওড়ার সহায় হলো যারা। তবু পারলেনা... তবে তারা নিয়ে গেছে তোমায় আকাশের কক্ষপথে গভীর নীল প্রস্তরের গহিন পরতে। এবং তারা দেখিয়েছে তোমায় বিচ্ছেদের তত্ত্বজ্ঞান। আমি বেরিয়ে ঘর থেকে এককী বৃক্ষের কাছে মিলিত হলাম। তুমি জানোনা তার নাম শুধু জানো যতটুকু তার সহজে উচ্চারণ করতে পারো। যেমন জলপাই-অলিভ, ক্যারব, ওক। তোমার জানা নেই সেইসব বৃক্ষ-উদ্ভিদের নাম। শুধু জানো লায়লাক ফুলের মতো ম্যালো এবং ডেন্ডেলিওন উদ্ভিদের নাম। যার রঙ তোমার দাদির চক্ষুর মতো।

1
أو هاهنا
أيذنا قال : قد تحفظ اللغة الأرض مما يلم بها من غيابٍ اذا انتصر الشعر ؟[196]

---

১৯৫. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী হাদরাহ আল গিয়াব*, পৃ. ১৬।
১৯৬. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী সারির আল গারীবাহ*, পৃ. ১৪-১৫

কিংবা এখানে তবে সে কি বলে:
পৃথিবীকে রক্ষা করে ভাষা—যখন
গায়েবের যন্ত্রণায় সে ছটফট করে
যখন জয় হয় কবিতার?

নাম নিয়ে এতোটা বিস্তারে গেলেন কবি দারভীশ? তার প্রায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই নামের প্রসঙ্গ এসেছে কোনো না কোনোভাবে। আক্ষরিক অর্থেই নামের অনুষঙ্গ এসেছে। তেমনি নানা মাত্রায় এর ব্যবহার ঘটেছে তার কবিতায়। *নাম*'র ইস্যুটি প্রথমত ছিল রাজনৈতিক। ক্রমেই রাজনীতির পঙ্কিলতা থেকে বেরিয়ে নতুন দরোজার সন্ধান করেন কবি। নাম যেখানে ছিল ফিলিস্তিনী সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা, ভূখণ্ড ও জাতীয়তার গোড়ার রসদ তা যখন ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল তার প্রতিরোধে আওয়াজ তোলেন দারভীশ। পরিচয়ের এমন পরিমণ্ডল দারভীশ ধীরে ধীরে অতিক্রম করে যান। নাম এক সময়ে তার কবিতায় আত্মজ্ঞানের কিংবা নিজেকে চেনার এক উপায় হয়ে ওঠে। নামের সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও জিজ্ঞাসার সমাহার ঘটে তার কবিতায়। নামের সাথে ভাষা বিষয়ক নানা অর্থ এবং ভাবনার প্ররোচনা সৃষ্টিতে তুমুল আলোড়ন তুলতে সক্ষম হন কবি। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ জিদারিয়্যাহসহ, ফি হাদরাহ আল গিয়াব, সারীর আল গারীবাহ, লিমাজা তারাকতা আল হিছানা ওয়াহিদা, আ'রাস, উহিব্বুকা আও লা উহিব্বুকা প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থে নামের বিচিত্র ব্যবহার লক্ষণীয়। কোথাও কোথাও দেখা যায়, নামকে তিনি নিছক ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেননি বরং তারো অধিক অন্যকোনো অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরে বিধৃত দারভীশের নাম ও ভাষা সংক্রান্ত কাব্যোদ্ধৃতগুলো পাঠ করলে বিষয়টি সহজে অনুমান করা যায়। নামের সাথে জ্ঞান ও চিন্তার সম্পর্কসূত্র ঘটাতে কবিতায় যে সৌন্দর্যের বিন্যাস ও চিন্তার সমান্তরাল উপস্থিতি নির্মাণ করেছেন আরবী কবিতার ইতিহাসে বলা যায় তা খুব বিরল। আল কুরআনে নামকে আদি জ্ঞানের প্রাথমিক আধার হিসেবে চিহ্নিত করতে দেখা যায়। কুরআনে নাম সংক্রান্ত যে বক্তব্য এসেছে তার ব্যাখ্যা ও তাফসীরের বিশাল যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাতে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও দার্শনিক নানান ব্যাখ্যার ধারাও গড়ে ওঠে বিশেষত আরব দুনিয়ায়। আরবীয় জ্ঞান ও চিন্তার ইতিহাসে নাম যেখানে একটি জ্ঞানীয় ক্যাটাগরি কিংবা বর্গ হিসেবে শনাক্ত হয়েছে।

أُسمّي الترابَ امتداداً لروحي
أُسمّي يديّ رصيفَ الجروح
أُسمّي الحصى أجنحهْ
أُسمّي العصافير لوزاً وتين
أُسمّي ضلوعي شجرْ
وأستلّ من تينة الصدر غصناً

وأقذفهُ كالحجرْ
وأنسفُ دبّابةَ الفاتحين[197]

মাটির নাম বলি আত্মার বিস্তার
হাতের নাম বলি আহতের ঘাট
নুড়িপাথরের নাম বলি ডানা
চড়ুইয়ের নাম বলি বাদাম ও ডুমুর
আমার পাঁজরের নাম বলি বৃক্ষ
বুকের ডুমুর বৃক্ষ থেকে সরিয়ে
একটি ডাল নিক্ষেপ করি পাথরের মতো
এবং হাঁকাতে থাকি বিজয়ীর ট্যাঙ্ক।

কিংবা

لن أُسمّيكَ انتقال الرمز من حُلم إلى يومٍ
أسمّيك الدمَ الطائر في هذا الزمانْ
وأسمّيك انبعاث السنبلهْ
أيها الطائر من جُثّتي الكاملة المكتملهْ
في فضاء واضح كالخبزِ...[198]

আমি কখনো বলবোনা তোমার নাম স্বপ্নের রূপক দিনে বদলে যাওয়া
আমি বলি এই সময়ে তোমার নাম ওড়ন্ত রক্ত
আমি তোমার নাম বলি গমশীষের পুনরুত্থান
আমার পূর্ণ লাশ থেকে বের হয়ে আসা হে পাখি
বিশাল মহাশূন্যে তুমি যেন রুটির মতো

ভাষার সাথে সাথে নাম ছিল আরো একটি জরুরি প্রশ্ন। ভাষা যেখানে বাস্তবের রাষ্ট্রহীনতার বিকল্প হয়ে ওঠে দারভীশের কবিতায়। এটি ছিল দারভীশের জন্য গভীর অভিযাত্রা। যেহেতু রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ায় দারভীশ অন্যরকম এক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছেন তার ভাষায়। ভাষাই তার দেশ হয়ে ওঠো—যেখানে কারো অন্যায় হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ নেই, যেখানে ভাষাই হয়ে ওঠে সর্বশেষ গন্তব্য। যেহেতু বাস্তবের যে দেশ-রাষ্ট্র বিদ্যমান নেই তার অস্তিত্ব ভাষার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আরো কোনো গত্যন্তর বিরল হয়ে ওঠে। ফলে ভাষা শুধু মানুষের যোগাযোগের মাধ্যমই নয়, মানুষের চিন্তা-সক্রিয়তা, রাজনৈতিকতা এবং আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার লড়াই ভৌত দেশকালের এক আগাম প্রকল্প হয়ে

১৯৭. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, পৃ. ২৮৬।
১৯৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০২।

ওঠে দারভীশের কবিতায়। মাহমুদ দারভীশ তার জীবনের প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমি ফিলিস্তিন ও তার জাতির কথা ব্যক্ত করে গেছেন নিরলসভাবে। নিজের জীবন এবং ফিলিস্তিনে জাতীয়ভাবে ঘটে যাওয়া প্রায় প্রতিটি ঘটনার ভাষাগত এবং কাব্যিক রূপ দিয়েছেন দারভীশ। তার কবিতায়, গদ্যে, প্রবন্ধে, সাক্ষাৎকারসহ প্রায় প্রতিটি লেখায়-রচনায় ফিলিস্তিনী জনগণের স্বাধীনতা এবং আত্মপরিচয়ের সাধারণ এবং সর্বজনীন অভিব্যক্তি বিচিত্র আঙ্গিকে গভীরভাবে উঠে এসেছে। শেষত, নিজেকে দারভীশ এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেখানে শুধু তার নামই ফিলিস্তিনের সম্মিলিত আত্মপরিচয়ের এক প্রতীক ও স্বাক্ষর হয়ে উঠেছিল।

আত্মপরিচয়: ইতিহাস ও উত্তর-উপনিবেশিক প্রেক্ষিত

৩.২.১: জাতীয় আত্মপরিচয়

উত্তর-উপনিবেশিকতা এটি যেমন একটি প্রক্রিয়া তেমনি একটি ধারণাও—বিশেষত উত্তর-উপনিবেশিকতা জাতি এবং জাতিগত আত্মপরিচয়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ধারণা কবিতা এবং শিল্প-সাহিত্যে গড়ে উঠেছে। উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্য–একটি বর্গ হিসেবে ইতিমধ্যে বেশ অনুশীলিত এবং প্রায় সব দেশেই এর চর্চা রয়েছে। এর বাইরে যেসব দেশ ও জাতি উপনিবেশিত হয়েছিল তাদের সাহিত্যে সরাসরি উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের পাঠ-বিশ্লেষণ ও গবেষণা বিপুলভাবে এগিয়েছে। কিন্তু ফিলিস্তিন যেহেতু এখনো উপনিবেশিকতার মধ্যদিয়ে যাচ্ছে ফলে তার কবিতা কিংবা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্র যথেষ্ট জীবন্ত নিসন্দেহে। যেহেতু উপনিবেশিক শক্তি, কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিকতা কিংবা এর অপরাপর প্রক্রিয়াগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও লড়াই সংগ্রামের ফলে যে উপনিবেশিত জাতির আত্মপ্রকাশ এবং সক্রিয় তৎপরতাগুলো দেখা যায় তাতে প্রধানত এবং প্রথমত উপনিবেশিতের আত্মপরিচয় কেন্দ্রীয় উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৪৮ এর মাধ্যমে যে নাকবা কিংবা নাকবা-উত্তর পরিস্থিতি দেখা যায় ফিলিস্তিনে সেরকম একটি সময় ও পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

ধারণাগতভাবে উপনিবেশিক শক্তির প্রস্থানের মধ্যদিয়ে উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্য-সংস্কৃতি কিংবা রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে কোনো কোনো তাত্ত্বিক মনে করেন, এটা জরুরি নয় যে, উপনিবেশিক শক্তির ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে উত্তর-উপনিবেশিক প্রক্রিয়া সূচনা হওয়া। যেহেতু উপনিবেশিক ক্ষমতা ও শক্তির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে যখন প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায় তখন একপ্রকার উত্তর-পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটে। যেমন, ইজরাইল ফিলিস্তিনে যে উপনিবেশ তৈরি করেছে–তা এখনো বলবৎ থাকার পরও ফিলিস্তিনে একটি উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতি অনেক কাল ধরেই বিরাজ করছে। এর কারণ, ফিলিস্তিন অনবরত প্রতিরোধ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিরোধের ফলে ফিলিস্তিন কোনো না কোনোভাবে বদলে যাচ্ছে নিজের আত্মপরিচয়ের পথে। নিজের স্বাধিকার অর্জনের পথে কখনো কখনো তারা এগিয়ে যায় প্রবলভাবে কখনো স্থির হয়ে যায়। এরকম একটি অবস্থার মধ্যে একইসাথে উপনিবেশিত হওয়া এবং প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজেদের আত্মপরিচয় সংরক্ষণ দুটোই যুগপৎভাবে ঘটছে।[১৯৯]

উত্তর-উপনিবেশিক তত্ত্ব মূলত ভাষাতত্ত্বে প্রবর্তিত হয়। পরে ইতিহাস ব্যাখ্যা, সমাজতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, রাজনীতি-অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি ও মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। উত্তর-উপনিবেশিক তত্ত্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, উপনিবেশিক জাতি–অর্থাৎ উপনিবেশ স্থাপনকারী

[১৯৯]. এ. সায়েগ, ফায়েজ, *জায়োনিস্ট কলোনিয়ালিজম ইন প্যারেস্টাইন* (বৈরুত: রিসার্চ সেন্টার, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশ, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ১১-৪৯।

ইউরোপীয় দেশগুলোর ব্যাপক সমালোচনা। বিশেষত, সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সাথে সাথে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করা হয়–এই অবস্থাকে উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি অধ্যয়নে সীমাহীন গুরুত্ব দেয়া হয়। যাকে উত্তর উপনিবেশিক সাহিত্যে উপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা হয়। তবে ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ কিংবা তত্ত্ব নিয়ে শেষ কথা বলা যায় না। কারণ, ফিলিস্তিন সার্বক্ষণিক ইজরাইলের দখলতারিত্ত্বের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে যেখানে উপনিবেশিক প্রক্রিয়া এখনো চলমান। এ অবস্থার ফলে ফিলিস্তিনের সাহিত্য কিংবা কবিতা অপরাপর উপনিবেশিত জাতিগুলোর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন।

যেহেতু ফিলিস্তিনে ইজরাইলি উপনিবেশ স্থাপন এবং একইসাথে ভূমিদখলের প্রক্রিয়া চলছে সেকারণে এ পরিস্থিতিকে উত্তর-উপনিবেশবাদ বলা যায়না বরং নয়া উপনিবেশবাদ হিসেবে চিনহিত করা যায়। উত্তর-উপনিবেশিক বিদ্যায় আলোচনা করা হয় যে, উপনিবেশিক শক্তি স্বশরীরে আর নেই–কিন্তু তার অশরীরি উপস্থিতি এবং প্রক্রিয়াগুলো রয়ে যায়। কারণ উপনিবেশিক শক্তি এবং তার বিবিধ কাঠামো ও প্রকৃতি উপনিবেশিতের মনস্তত্ত্বে যেমন বিরাজ করে তেমনি উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার নানা পর্যায়ে শিক্ষা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও ক্ষমতা কাঠামোয় বিপুলভাবে বিমূর্তভাবে কার্যকর। কাজে উত্তর-উপনিবেশিকতা মানে উপনিবেশিকতার সম্পূর্ণ বিলয় নয়, বরং উপনিবেশিকতা সেখানে নতুনরূপে পুনজন্ম লাভ করা। এ অবস্থায় প্রশ্ন হলো ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে কেমন করে উত্তর-উপনিবেশিকতা বিরাজ করে এবং তার সাথে জাতীয় আত্মপরিচয় কিভাবে গড়ে ওঠে। এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা যায় ফিলিস্তিনের ভাষা ও সাহিত্যে। প্রসঙ্গত মাহমুদ দারভীশের কবিতা পাঠে এসব প্রশ্নের সমাধান পাওয়া সম্ভব। ফিলিস্তিনে যেমন উপনিবেশিক প্রক্রিয়া বিরাজমান এবং একইসাথে উপনিবেশ বিরোধী প্রতিরোধ এবং আন্দোলন সংগ্রামও কার্যকর রয়েছে। সেদিক থেকে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে জাতিয়তার উপস্থাপন কিংবা জাতিগত আত্মপরিচয়ের স্বরূপ সন্ধান করা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ কায়েমের মধ্যদিয়ে ইজরাইল তার সূচনালগ্নে সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া শুরু করে।[২০০] যদিও ফিলিস্তিন এর মধ্যদিয়েই তার আত্মপরিচয় এবং প্রতিরোধ তৎপরতা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিল।

উপনিবেশবিরোধী লড়াইয়ের ভাষায় জাতিয়তা, জাতীয় চৈতন্য, মাতৃভূমী কিংবা দেশের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অপরদিকে ট্রমা (ক্ষত-বেদনা), উচ্ছেদ, নির্বাসন উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্যের উপজীব্য। দারভীশের কবিতাজুড়ে এসব উপাদান যেমন বিপুলভাবে উপস্থিত তেমনি তার জীবদ্দশায় ঘটে গেছে বাস্তুচ্যুত হওয়ার কষ্ট, দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার চরম ক্ষত ও বেদনার বিশদ বিবরণ।[২০১]

---

২০০. মাক্কাবী, ইব্রাহীম, *টিচিং কলোনিয়াল হিস্ট্রি এন্ড ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যামঙ প্যালেস্টাইনিয়ান স্টুডেন্টস ইন ইজরাইল: রেজিসটিং কলোনাইজেশন থ্রু স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিজম* (আর্জেন্টিনা: ক্লাকসো, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৬-১৮।

২০১. আজমল খান, মোহাম্মদ, *কালচারার মেমোরি এন্ড অ্যাক্সাইলিক পার্সপেক্টিভ অন হোম এন্ড আডেন্টিটি: আ হিস্টোরিকো-লিটারেরি অ্যানালাইসিস অব মাহমদু দারভীশ'স ওয়ার্ক* (ইসলামাবাদ: ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৮৬-১৯৩।

উপনিবেশ প্রভুদের প্রস্থানের পরও ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব রয়ে যায় উপনিবেশিত দেশ ও জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগুলোতে। এটা মূলত বিশেষ ধরনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া–যেটা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের মধ্যদিয়ে ঘটে গেছে।[২০২] একটি দেশের কৃষি প্রকৃতি কিংবা ভৌগলিকতা থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুতে উপনিবেশিক প্রভুদের কর্তৃত্ব ও দখলদারিত্বের ছাপ কিংবা তৈরি করা প্রক্রিয়া ও বিধিব্যবস্থা বলবৎ থাকে। এর ফলে যে বিষয়টি এতে করে ঘটে যায়, তা হলো উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর সর্বক্ষেত্রে 'নিজ' ব্যাপারটির বিনাশ কিংবা বিকৃতি ঘটে। ঐতিহাসিকভাবে এবং ক্যাটাগরিক্যালি বিশেষধরনের বিচ্ছেদ (অ্যালিয়েশন) ঘটে যায়। উপনিবেশায়ন এবং বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বের আদি প্রবক্তা ফ্রানৎজ ফানো এ অবস্থাকে আদার বা অপর হিসেবে চিনহিত করেছেন। উপনিবেশিত রাষ্ট্রে উপনিবেশিক শাসক শ্রেণির পরিচয় প্রসঙ্গে ফানো বলেন,

> The ruling species is first and foremost the outsider from elsewhere, different from the indigenous population, "the others."[203]
>
> শাসকশ্রেণি প্রথমত এবং সর্বাগ্রে আর সব জায়গার দিক থেকে বহিরাগত—আদিম জনগোষ্ঠী—তথা 'অপর' থেকে আলাদা বিচ্ছিন্ন।

উপনিবেশায়ন দৃশ্যত ভৌগলিকভাবে এবং মূর্তভাবে ঘটলেও একইসময়ে উপনিবেশায়ন বিমূর্তভাবে ঘটে। ফলে তার নিজস্ব ব্যবস্থা এবং জারি করা নয়া ব্যবস্থার মধ্যে অপরায়ণের ঘটনারও সৃষ্টি হয়। যেখানে বস্তুত উপনিবেশিতের আত্ম-স্বরূপ কিংবা আরো পরিচিত ভাষায় বলা যায়, আত্মপরিচয়ের সংকট প্রবল হয়ে ওঠে। এটি একদিকে যেমন উপনিবেশিতের হীনমন্যতাসহ মনস্তাত্ত্বিক নানাবিধ জটিলতা তৈরি করে তেমনি তা থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়া গ্রহণের ক্ষেত্রেও তৈরি করে তাদের পরম্পরের নেতিবাচক ও কুটিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তদুপরি আত্মপরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে ওঠে তাদের উপনিবেশ বিরোধী সমস্ত কর্মকাণ্ডে। ভাষা এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিচয়ের সংকট গভীরভাবে লক্ষণীয়। এছাড়া উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর সরাসরি রাজনৈতিক তৎপরতায় পরিচয়ের বিষয় ঐতিহাসিক বটে। তবে ভাষা কিংবা সাহিত্যে এর নজির গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যে এর প্রবর্তন কিংবা সংজ্ঞায়ন শুরু হয় মূলত কালক্রমিক বিভাজনের মাধ্যমে। যেমন, উপনিবেশিক এবং উপনিবেশোত্তর কালপর্ব। এই বিভাজনের ফলে সাহিত্য কিংবা কবিতায় উত্তর-উপনিবেশিক বা উপনিবেশোত্তর সাহিত্যের চারিত্র-প্রকরণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণিত হয়। কারণ উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের

---

[২০২]. লুম্বা, আনিয়া, *কলোনিয়ালিজম/পোস্টকলোনিয়ালিজম* (লন্ডন: রুটলেজ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৩।

[২০৩]. ফানোঁ, ফ্রানৎজ, *দি রিচার্ড অফ দি আর্থ*, রিচার্ড ফিলকক্স কর্তৃক মূল ফরাসি থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত (নিউ ইয়র্ক: গ্রোভ প্রেস, ২০০৪, খ্রি.), পৃ. ৫২।

তরফে আর সবক্ষেত্রে ব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ বিধিব্যবস্থা জারি করা হয়–এমন জারি করা প্রমিত ব্যবস্থা থেকে উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যেও একটি কাঠামো এবং ধারা তৈরি হয় যা তার পূর্বাবস্থা থেকে ভিন্নতর হয়ে ওঠে।

এই দুই কালক্রমিক বৈশিষ্ট্য সামনে রাখার মাধ্যমে বস্তুত পরিচয় একটি মৌলিক এবং সাধারণ চরিত্র হয়ে ওঠে উপনিবেশিত এবং উপনিবেশিক প্রভুদের মাঝে। আত্মপরিচয়ের বিষয়টি শুধু উপনিবেশিতদের ব্যাপার ছিল না, বরং উপনিবেশিক প্রভুদেরও ছিল। যেকারণে দেখা যায়, উপনিবেশিতদের সংস্কৃতি ও ভাষায় উপনিবেশিক শক্তির গোপন এবং কৌশলগত তৎপরতা ছিল–যাতে তারা চেষ্টা তদবিরের কমতি করেনি কিভাবে সর্বক্ষেত্রে তাদের পরিচয় প্রতিষ্ঠার করা যায়। জাতীয় এবং জাতীয় পরিচয় বস্তুত জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ভেতর দিয়ে তৈরি হয়। কারণ উপনিবেশিত জাতিগুলো যখন পরিচয় দাবি করে তখন তারা বিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ এককভাবে তা প্রকাশ করেনা। বরং অতীত সংস্কৃতির–যেটা মূলত তাদের জাতীয় সংস্কৃতি–দোহাই দিয়ে এবং তাদের নিজস্ব অতীত সংস্কৃতির অভিজ্ঞতাগুলো প্রকাশের মাধ্যমে জাতীয় আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার দাবি তোলেন। জাতীয় সংস্কৃতি যেহেতু ইতিমধ্যে গত হয়ে গেছে উপনিবেশায়নের ফলে সেকারণে অতীত কথাটি জাতীয় সংস্কৃতির একটি উপসর্গ হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা মূলত ঔপনিবেশিক আমলের কিংবা উপনিবেশিকতার বৈশিষ্ট্য বহন করে।[২০৪] ফলে জাতীয় পরিচয় উপনিবেশ বিরোধিতা কিংবা উপনিবেশোত্তর অবস্থা থেকে বাদ দিয়ে চিন্তাও করা যায় না।

উপনিবেশিকতা আত্মপরিচয় নির্মাণের নতুন কোনো সম্ভাবনার নাম নয় বরং উপনিবেশিত জাতি তার পরিচয়কে পুনরুদ্ধার করতে পারে উপনিবেশিকতার বিরোধিতার মাধ্যমে। জাতীয় আত্মপরিচয় তার জাতীয় সংস্কৃতিরও পরিবাহক। যেকারণে, উপনিবেশ বিরোধী পরিস্থিতিতে উপনিবেশিত জাতির জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম রাজনৈতিক বিষয় হয়েও অনেক বেশি সম্পর্কিত তার সংস্কৃতির সাথে। কারণ জাতীয় আত্মপরিচয় নির্ধারণ করে নিতে হয় তার যাপিত সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। ফানোন বলেন,

> We know that most of the Arab territories came under colonial domination.Colonialism used the same tactics in these regions to inculcate the notion that the precolonial history of the indigenous population had been steeped in barbarity.The struggle for national liberation was linked to a cultural phenomenon commonly known as the awakening of Islam. The passion displayed by contemporary Arab authors

---

২০৪. ফানোঁ, ফ্রানৎজ, *দি রিচার্ড অফ দি আর্থ*, পৃ. ১৫৪।

in reminding their people of the great chapters of Arab history is in response to the lies of the occupier.[205]

আমরা জানি, অধিকাংশ আরবদেশই উপনিবেশিক ক্ষমতাধীন হয়ে পড়েছে। এসব অঞ্চলেও উপনিবেশবাদ একই কৌশল প্রয়োগ করেছে। তাদের কৌশল ছিল, উপনিবেশিত আদি জনগোষ্ঠীর মনের ভিতর এই ধারণা প্রোথিত করা যে, উপনিবেশিক শক্তির আগমনের আগেই তাদের ইতিহাস ছিল বর্বরতার। এখন তাদের মাঝে একটি সাংস্কৃতিক ফেনোমেনার সাথে যুক্ত হয়েছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম যেটি সাধারণত ইসলামের পুনর্জাগরণের নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। তবে দখলদারদের মিথ্যার জবাবে সমকালীন আরব লেখকরা তাদের জনগণকে আরব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়গুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

সুতরাং উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী যখন আত্মপরিচয়ের আওয়াজ তোলেন, তখন দুটি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে সামনে চলে আসে, একটি হলো ভাষা অপরটি ধর্ম-সংস্কৃতি। এই দুটি বস্তু মিলিয়েই প্রাথমিকভাবে পরিচয় তুলে ধরেন উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী—যাতে তার পুরো জীবন দর্শন একবাক্যে ফুটে ওঠে। ফানো মনে করেন, ব্যবহারিক কারণে জাতীয়তার প্রশ্নে ভাষার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু জাতীয় ভাষার প্রত্যাশাগুলো কিংবা তার প্রকাশ্য হয়ে ওঠাটা উপনিবেশিক ব্যবস্থার বাইরে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় বটে। যেমন আরব রাজনীতির হাল-হাকিকত দেখে ফানো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে একটি শ্লোগানের ট্যাগ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেন, *We blacks, we Arabs*[206]—আমরা কালো, আমরা আরব।

মাহমুদ দারভীশ এবং তার কবিতায় যখন উপনিবেশবিরোধিতা কিংবা উত্তর-উপনিবেশিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের প্রশ্ন আসে প্রথমেই তখন এই প্রসঙ্গ চলে আসে। উপনিবেশিতের যেমন প্রথম কাজই হলো নিজের অবস্থান কি তা ঘোষণা করা। দেখা যায় দারভীশের কবিতাও তার ব্যতিক্রম নয়। নিজের আত্মপরিচয় প্রকাশে দ্বিধাহীন এক দৃপ্ত উচ্চারণ তার জন্য, তার জাতির জন্য দিতে হবে। বিষয়টি এতো গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বতসিদ্ধ যে, কোনো কোনো সময় রাজনীতিবিদরা পর্যন্ত এমন ঘোষণা দিয়ে ফেলেন। বস্তুত এটি হলো মানবিক প্রকৃতির পরম দাবি। এই উদ্দিপ্ত ভাষা ও স্লোগান নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ঘুরে দাঁড়াবার এক অফুরন্ত দুঃসাহস। ফ্রান্স ফানোর মতো করে দারভীশের কবিতায়ও এমন বীরোচিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। 'লিখে রাখো, আমি একজন আরব' ()।

এ পঙক্তিটুকু সামান্য। সামান্য কথাটির ব্যপ্তি এবং গভীরতা এই কারণে বলাবাহুল্য যে, যা বিশেষ নয় তাই সামান্য, আকর। তাই ব্যাপক–প্রচণ্ড শক্তিশালী–বিপুল প্রভাব বিস্তারী। এটি দারভীশের বিখ্যাত

---

২০৫. প্রাগুক্ত। ১৫৬।

২০৬. প্রাগুক্ত। ৬৯।

কবিতা 'পরিচয়পত্র''র একটি বাক্য। বিপুল পঠিত কবিতাটি ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর প্রভাব এখনো চলমান। উত্তর-উপনিবেশিক আরবী সাহিত্যে এই কবিতা বিপুলভাবে পঠিত।[২০৭] দারভীশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'জলপাইয়ের পত্রাবলী'র শেষ কবিতা পরিচয়পত্র। পুরো কাব্যগ্রন্থে একটি কাব্যিক কর্তাসত্তা নির্মাণ করেছেন কবি। উপনিবেশ বিরোধিতার পটভূমিতে এ কাব্যগ্রন্থ একটি মৌলিক অবস্থান তৈরি করেছে। কবিতাটির পটভূমিতে রয়েছে একজন ফিলিস্তিনী এবং একজন ইজরাইলী সেনা কর্মকর্তার মাঝে সংলাপ। ওই ফিলিস্তিনীকে একটি চেকপয়েন্টে নিয়ে ইজরাইলী সেনা যেসব প্রশ্ন করেছেন তার পরিচয়পত্র নিয়ে তার জের ধরে কবিতাটির অবতারণা।

কিন্তু উত্তর-উপনিবেশিক কিংবা উপনিবেশ বিরোধী কবিতা হিসেবে এ কবিতাকে বেছে নেয়ার কারণ কি? কবিতা কিংবা অন্য যেকোনো টেক্সট পাঠের ক্ষেত্রে উপনিবেশ বিরোধী উপাদানগুলো কারণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। উসমানী খেলাফতের পর যেখানে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছিল–এবং একই ধারাবাহিকতায় ফিলিস্তিন দখল করে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘটনা নয়া-উপনিবেশিক প্রক্রিয়া। উত্তর-উপনিবেশিক তত্ত্ব মোতাবেক যেখানে ফিলিস্তিনে উপনিবেশ (ইজরাইল) বিরোধী ক্ষোভ দানা বেধে ওঠে স্থানীয় এবং মূলবসতিদের মাঝে যেটা বস্তুত তত্ত্বগতভাবে উত্তর-উপনিবেশিক উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রেক্ষিত (কনটেক্সট) বিচারে যে ঘটনাগুলো উপনিবেশ বিরোধী মনস্তত্ত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধানত অনুঘটক হিসেবে কাজ করে তার বড় ধরনের একটি অন্তপ্রবাহ এবং খুব জোরালো কাব্যিক ভাষা কিংবা ডিসকোর্স পুরো কবিতাটিজুড়ে প্রবহমান।

কবিতাটি প্রথমেই আদেশমূলক (ইম্পেরাটিভ) বক্তব্য দিয়ে শুরু হয়েছে। সাজ্জিল/আনা আরাবিয়্যুন– এখানে সাজ্জিল শব্দটি আদেশসূচক। উপনিবেশ বিরোধী ভাষা হিসেবে আদেশমূলক বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। উপনিবেশিক–দখলদার আগন্তুক প্রভুকে (মাস্টার/লর্ড) কিংবা তার বশংবদকে চোখের সামনে আদেশমূলক বাক্যে কথা বলা মূলত দখলদারিত্বের শিকার উপনিবেশিতের দিক থেকে সবচেয়ে দুঃসাহসিক ঘটনা। নির্দেশমূলক বাক্য বস্তুত একটি উপনিবেশিক আভিজাত্যবিরোধী মুহূর্ত এবং প্রতিবেশিক আবহ তৈরির ঘটনা। কারণ নির্দেশমূলক বাক্যে কথা বলা সাধারণত সামন্তীয় এবং প্রধানত উপনিবেশিক প্রভুদের ভাষাগত সংস্কৃতির অংশ। তারা যে আনুষ্ঠানিক ভাষায় কথা বলায় অভ্যস্ত তাতে নির্দেশবাক্য একটি বড় ধরনের অনুষঙ্গ। এই নির্দেশবাক্য সাধারণত তারা তাদের উপনিবেশিত প্রজা কিংবা দখল করা যেটি একইসাথে তাদের ভাব এবং আত্মমর্যাদাগত কুলীন সংস্কৃতির পরিহার্য অংশ। ফলে উপনিবেশিত–যাকে ইতিমধ্যে দখল করা হয়েছে–সে যখন নির্দেশবাক্যে কথা বলে তাদেরই মুখোমুখী হয়ে তখন তা একপ্রকার তাদের ভাবমূর্তি কিংবা কৌলিন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটি বড় আঘাত। তবে উপনিবেশ বিরোধী কবিতায় নির্দেশবাক্যের ব্যবহার বিপুল। দ্বিতীয়ত, সাজ্জিল শব্দটির আন্তপাঠ প্রতিক্রিয়া (ইন্টারটেক্সুয়ালিটি)। কবিতাটির ইংরেজি ভাষায় যেসব অনুবাদ হয়েছে তাতে সাজ্জিল শব্দটির অর্থ 'রাইট ডাউন' (লিখে রাখো) করা হয়েছে।

---

২০৭. সি. হ্যারিসন, অলিভিয়া, *ট্রান্সকলোনিয়াল মাগরিব: ইমাজেনিং প্যালেস্টাইন ইন দ্য এরা অফ ডিকলোনাইজেশন* (ক্যালিফোর্নিয়া: স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩৫-৩৯।

কিন্তু তাতে এর পুরো অর্থ প্রকাশ হয় না। আরবী ভাষায় সাজ্জিল এর একটি অর্থ– নিবন্ধন করা, রেকর্ড করা, লিপিবদ্ধ করা। এখানে যে বক্তব্য এবং উদ্দেশ্যগত প্রতিবেশ তৈরি করা হয়েছে কবিতাটিতে 'লিখে রাখো– বলার চেয়ে–রেকর্ড করে রাখো–বাক্যে ক্যাটাগরিক্যালি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। পুরো কবিতাটিতে উপনিবেশ বিরোধী আরো কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায়। যেমন,

৩.২.২: আরব পরিচয়

আত্মপরিচয় এবং এজেন্সি উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উপনিবেশিক প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আত্মপরিচয়–দাবি করার মতো সাহস দেখিয়েছেন দারভীশ। নিজেকে আরব পরিচয় দেয়ার মাধ্যমে। দারভীশের সমকালে আরবী কবিতায় কিংবা সাহিত্যে এটি ছিল বৈপ্লবিক ঘটনা।[২০৮] সম্ভবত দারভীশই প্রথম এভাবে কবিতায় নিজেকে আরব দাবি করার মতো পঙক্তি রচনার জন্য।

৩.২.৩: উপহাস কিংবা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গি

প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠম শ্লোকে ব্যাঙ্গোক্তিমূলক ইঙ্গিত দেখা যায়। 'রাগ করলে?' বলার মাধ্যমে এই ব্যাঙ্গাত্মক সম্বোধন লক্ষণীয়। যেমন, লিখে রাখো!/আমি একজন আরব/আমার পরিচয়পত্রের নম্বর পঞ্চাশ হাজার/আট ছেলে-মেয়ে আমার/নবমটি আসবে গ্রীষ্মকালে/? রাগ করলে?

৩.২.৪: জনসংখ্যাতাত্ত্বিক হুমকি (ডেমোগ্রাফিক্যাল থ্রেট)

উপনিবেশিক দখলদারদের জন্য উপনিবেশিতের জনসংখ্যার আকার একটি উদ্বিগ্নতার বিষয়। ভিকটিমদের জনসংখ্যার বৃদ্ধি দখলদারদের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং হুমকি। কবিতাটির প্রথম শ্লোকেই এই হুমকি উপস্থাপিত হয়েছে। জায়োনিস্ট ইজরাইল ফিলিস্তিনকে সামনে রেখে যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করেছিল তার মাঝে অন্যতম ছিল ফিলিস্তিনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা। কিন্তু ফিলিস্তিনের জনসংখ্যা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কিংবা স্বাস্থ্যগত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব ছিল। ফলে তাদের জন্য সবথেকে সহজ ছিল উচ্ছেদ, নির্বাসন ইত্যাদি নিয়মিত নিপীড়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। দারভীশের কবিতাটিতে যায়োনিজমের এমন প্রকল্পের বিরুদ্ধে একটি শক্ত অবস্থান প্রকাশ হয়েছে। যেখানে ইজরাইলী উপনিবেশ বিরোধী প্রতিরোধমানস স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।[২০৯]

---

২০৮. সিলভারম্যান, নেতানেল হাইম, *রিগার্ডিং আইডেন্টিটি কার্ডস: দি আর্লি এন্টিকলোনিয়াল পোয়েটিকস অব মাহমুদ দারভীশ এন্ড দেয়ার হিব্রু আফটারলাইভস* (টরেন্টো: ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টো, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৭।

২০৯. মাসালহা, নূর, *দি প্যালেস্টাইন নাকবা*, পৃ. ১৬।

৩.২.৫: স্বাধীন সত্তার উপস্থাপন

উপনিবেশিক প্রক্রিয়া যেখানে পুরো বিদ্যমান সেখানে যখন একজন উপনিবেশিতের বাক খুলে যায়, তখন তার চাওয়া কি হতে পারে? পরিচয়পত্র কবিতা তার একটি উদাহরণ হতে পারে? স্বাধীনতা। স্বাধীনতাই মূলত উপনিবেশ বিরোধিতার প্রধান লক্ষ্য। উত্তর-উপনিবেশিক কবিতার লক্ষণ হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান– *আপনাদের নাছদুয়ারে এসে ভিক্ষা চাই না/মাথাও নত করি না দোরগোড়ায়/রাগ করলে?*

৩.২.৬: সাধারণ জনমানুষের জীবন যাপনের বয়ান

উপনিবেশ বিরোধী কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, একই জনপদের অপরাপর সবার সাথে মিলে মিশে নিজেকে উপস্থাপন। অর্থাৎ একটি সংহতিমূলক অবস্থান প্রকাশ করা। যেহেতু সংহতি কিংবা ঐক্যের বিষয়টি সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায় একেবারে প্রান্তিক এবং শ্রমিক শ্রেণিকে ধারণ করার মাধ্যমে। পরিচয়ের একটি সম্মিলিত প্রকাশ সৃষ্টি করা যায় অতিসাধারণ- নিম্নবিত্ত কিংবা দিনমজুর শ্রেণি থেকে শুরু করে। তারুণ্যের প্রথম দিকে দারভীশ কমুনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত ছিলেন হয়ত তার একটি প্রভাব কবিতাটিতে লক্ষ করা যায়।[২১০]

আমার বাবা এসেছেন-/লাঙল-ঠেলা পরিবার থেকে/সম্মানিত বংশের কেউ নন তিনি/আমার বাবার বাপও ছিলেন চাষী/বংশ পরিচয় চৌদ্দকুলের হাল-হাকিকত/ভালো করে জানা আছে

৩.২.৭: শ্রমিকতা

লিখে রাখুন!/আমি একজন আরব/শ্রমিকদের সঙ্গে পাথর ভাঙার কাজ করি/আট ছেলে-মেয়ের বাবা আমি/আমি ওদের জন্য/রুটি, জামাকাপড়, বইখাতার ব্যবস্থা করি-/পাথর ভাঙার কাজ করে।

আদিম এবং মূল জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজের ঐতিহাসিকতা কিংবা শেকড়ের বয়ান

যখন সময় জন্ম নেয়নি/যুগপ্রবাহ ফুলেফেঁপে ওঠেনি।/সাইপাস-জলপাই গাছের আগে/লতাগুল্মাদির বংশবৃদ্ধিরও পূর্বে-/আমি এদেশে শিকড় গেড়ে বসে আছি।

দখলদার ইজরাইলী উপনিবেশিক প্রভুর সামনে সত্য উচ্চারণের দুঃসাহস

লিখে রাখুন!/আমি একজন আরব/আপনারা তো আমার পূর্বপুরুষের-/আঙুরক্ষেত দখল করেছেন

---

[২১০]. ড. আল আরাবি, উমাইশ, *মাহমুদ দারভীশ খীমা আল শি'র আল আরাবী'* (আলজেরিয়া: আলফা লিল ওয়সাইক, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

জমিও কেড়ে নিয়েছেন/যা আমি ও আমার ছেলেরা মিলে চাষ করতাম।/আমাদের নাতিপুতির জন্য-/আপনারা কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি/শুধু এই পাথরগুলো ছাড়া।/জানি, এটাও আপনাদের সরকার কেড়ে নিবে

৩.২.৮: ক্ষোভ ও দ্রোহ

সুতরাং! প্রথম পৃষ্ঠার একদম উপরে লিখে রাখো:/আমি ঘৃণা করি না মানুষ/অথবা দখল করি না অন্যের জমি
কিন্তু আমি যখন ক্ষুধার্ত/জোরদখলকারীর মাংস হয়ে যায় তখন আমার খাবার/সাবধান/সাবধান/আমার ক্ষুধা থেকে/আমার রাগ-দ্রোহ থেকে!”

শেষত, পুরো কবিতার কাব্যিক বর্ণনার মধ্যদিয়ে উপনিবেশিতের কর্তাসত্তা গড়ে তোলার একটি প্রামাণ্য ভাষার উপস্থাপন। পুরো কবিতাটি একবার পাঠ করা যাক...

سجِّل
أنا عربي
ورقمُ بطاقتي خمسونَ ألفْ
وأطفالي ثمانيةٌ
وتاسعهُم.. سيأتي بعدَ صيفْ!
فهلْ تغضبْ؟

سجِّلْ
أنا عربي
وأعملُ مع رفاقِ الكدح في محجرْ
وأطفالي ثمانيةٌ
أسلُّ لهمْ رغيفَ الخبزِ،
والأثوابَ والدفترْ
من الصخرِ
ولا أتوسَّلُ الصدقاتِ من بابِكْ
ولا أصغرْ
أمامَ بلاطِ أعتابكْ
فهل تغضب؟

سجل
أنا عربي
أنا اسم بلا لقبِ

صَبورٌ في بلادٍ كلُّ ما فيها
يعيشُ بفَوْرةِ الغضبِ
جذوري
قبلَ ميلادِ الزمانِ رستْ
وقبلَ تفتّح الحقبِ
وقبلَ السّروِ والزيتونِ
.. وقبلَ ترعرع العشبِ
أبي.. من أسرةِ المحراثِ
لا من سادةٍ نُجُبِ
وجدّي كانَ فلاحاً
بلا حسبٍ.. ولا نسبِ!
يُعلّمني شموخَ الشمسِ قبلَ قراءةِ الكتبِ
وبيتي ’ كوخُ ناطورٍ
منَ الأعوادِ والقصبِ
فهل تُرضيكَ منزلتي؟
أنا اسم بلا لقبِ!

سجلْ
أنا عربي
ولونُ الشعرِ.. فحميٌّ
ولونُ العينِ.. بنيٌّ
وميزاتي:
على رأسي عقالٌ فوقَ كوفيّه
وكفّي صلبةٌ كالصخرِ...
تخمشُ من يلامسَها
وعنواني:
أنا من قريةٍ عزلاءَ منسيّهْ
شوارعُها بلا أسماء
وكلُّ رجالها في الحقلِ والمحجرْ
فهل تغضبْ؟

سجّل!
أنا عربي
سلبتُ كرومَ أجدادي
وأرضاً كنتُ أفلحُها

أنا وجميعُ أولادي
ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي
سوى هذي الصخورِ...
فهل ستأخذُها
حكومتكمْ.. كما قيلا!؟
إذنْ
سجِّل.. برأسِ الصفحةِ الأولى
أنا لا أكرهُ الناسَ
ولا أسطو على أحدٍ
ولكنّي.. إذا ما جعتُ
آكلُ لحمَ مغتصبي
حذارِ.. حذارِ.. من جوعي
ومن غضبي!!

লিখে রাখুন!
আমি একজন আরব
আমার পরিচয়পত্র-নম্বর পঞ্চাশ হাজার
আট ছেলে-মেয়ে আমার
গ্রীষ্মের পরেই শিগগির আসবে নবমটি
রাগ করলে?

লিখে রাখুন!
আমি একজন আরব
পাথর ভাঙ্গার কাজ করি শ্রমিকবন্ধুদের সাথে
আট সন্তান আমার
যাদের জন্য এই পাথর থেকেই
রুটিরুজি, বইখাতা
কাপড়ের জোগান দেই।

আপনাদের দুয়ারে এসে ভিক্ষা চাই না
মাথা নত করি না আপনাদের দুয়ারের
মেজের মসৃণ পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে

লিখে রাখুন!
আমি একজন আরব
কোনোরকম পদপদবী ছাড়া আমিই একটি নাম
যে দেশের সব মানুষ চলে রাগ নিয়ে
সেই দেশে আমি এক সহিষ্ণু
যখন সময়েরই জন্ম হয়নি
কালের পরিক্রমাই শুরু হয়নি
তখন জলপাই চিরহরিত সাইপাস
এবং ঘাস লতাপাতার
বংশবৃদ্ধির অনেক আগেই
এই দেশের গভীরে শিকড়
গেড়ে বসে আছি আমি।

আমার বাবা এসেছেন
লাঙল-ঠেলা চাষা পরিবার থেকে
অভিজাত নেতৃস্থানীয় কেউ নন তিনি
বাবার বাবাও ছিলেন কৃষক
যার বংশ কৌলিন্য কিছুই ছিলনা
বই পড়ার আগে যিনি আমায়
রোদের মহিমা শিখিয়ে দিতেন।

আমার ঘর-বাড়ি বলতে
একটি দারোয়ানের কুঁড়েঘর
বাঁশের কঞ্চি কাঠখড়ি দিয়ে তৈরি
আমার এমন ঘরদুয়ারে আপনি খুশি?
আমি একটি নাম মাত্র
কিন্তু কোনো পদপদবি নাই।

লিখে রাখুন!
আমি একজন আরব
আমার চুলের রঙ কয়লার মতো কালো
চোখের রঙ তামাটে
আর আমার বেশভূষা:

আমার মাথায় রুমালের উপর
বসানো একটি আগাল
আমার হাত-বাহু পাথরের মতো কঠিন
ধরলেই ভেঙ্গে যাবে
আমার ঠিকানা:
আমি এসেছি ভুলে যাওয়া
অরক্ষিত এক গ্রাম থেকে
যার রাস্তাগুলো নামহীন
মানুষগুলো কাজ করে
পাথরখোলায়, ক্ষেতে-খামারে
রাগ করলে?

লিখে রাখুন
আমি একজন আরব
আপনারা তো ছিনিয়ে নিয়ে গেছে
আমার পূর্বপুরুষের আঙুরবাগান
দখল করে নিয়েছেন জমি
আমার সন্তানরা মিলে যা চাষাবাদ করতাম
আমাদের নাতিপুতিদের জন্য
কিছুই রেখে যাননি
শুধু এই পাথরগুলো ছাড়া।
যেমনটি বলা হয়, আপনাদের সরকার
তাও কি কেড়ে নিয়ে যাবে?

সুতরাং!
প্রথম পৃষ্ঠার একদম উপরে লিখে রাখুন:
আমি ঘৃণা করি না মানুষ
অথবা দখল করি না অন্যের জমি
কিন্তু আমি যখন ক্ষুধার্ত
জোরদখলকারীর মাংস হয়ে যায় তখন আমার খাবার
সাবধান
সাবধান
আমার ক্ষুধা থেকে
আমার রাগ-দ্রোহ থেকে!

উপনিবেশিক তত্ত্ব মোতাবেক কবি হয়ে ওঠেন মূলত একজন ভাষ্যকার। কিংবা একজন কথক। আম পাঠক এবং বহুজনের কথক কিংবা উপনিবেশিত মানুষের কণ্ঠস্বর। বহু পাঠক-শ্রোতাকে সম্বোধন করে তাদের সাথে কথা বলা, তাদের কথা বলা–যেখানে উত্তর-উপনিবেশিক একজন কবি যখন কথা বলেন, কবিতা লিখেন তখন তার কথায় কাব্যে শ্রোতাকে কিংবা উদ্দিষ্ট পাঠক শ্রেণিকে উদ্দীপ্ত করার একটি সংবেদনশীলতা দেখা যায়। এই সংবেদনশীলতার মাধ্যমে লেখক কিংবা পাঠক-শ্রোতা মিলে একটি যৌথ সত্তা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে যেতে হয় একজন উত্তর-উপনিবেশিক কবিকে। যেখানে কবি পাঠককে গড়ে তোলেন পরোক্ষভাবে। গড়ে তোলার মূল বক্তব্য হলো পাঠকের অন্তকরণে উপনিবেশ বিরোধী কর্তাসত্তা জাগিয়ে তোলা। অর্থাৎ কবি তার কবিতায় যে ভাষা ও প্রতিবেশ সৃষ্টি করেন তাতে একটি উপনিবেশ বিরোধী সেল্ফ (নিজ/সত্তা) সৃষ্টি হয় উপনিবেশিতের ব্যক্তিত্বে। উত্তর-উপনিবেশ বিরোধী কবিতার জন্য এটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক অবস্থান। নেতানেল সিলভারম্যান (লিভারম্যান কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিকট এবং মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক অধ্যয়ন বিভাগের অধীনে দারভীশের কবিতায় উত্তর-উপনিবেশিকতা বিষয়ে পিএইচ. ডি গবেষণা সম্পন্ন করেন) মনে করেন, দারভীশের 'জলপাইয়ের পত্রাবলী'– দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে উপনিবেশ বিরোধী একটি পরিপূর্ণ বয়ান (ডিসকোর্স) বিশ্লেষণ করা সম্ভব। যেখানে দারভীশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের জনগণের কর্তৃত্বমূলক (সাবজেক্টিভ) কিংবা একটি অধিপতিপরায়ণ ভাষা নির্মাণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

জলপাইয়ের পত্রাবলী'র প্রথম (পাঠকের প্রতি/ইলা আল ক্বারী) এবং দ্বিতীয় (ওয়ালা') কবিতায় দারভীশ তার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন নিশ্চিতভাবে। প্রথম কবিতার উদাহরণ আগেই উল্লেখিত হয়েছে। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি পঙক্তি এমন– হৃদয়ে আমার কালো পদ্ম/ঠোঁটে অগ্নি লেলিহান/কোত্থেকে এসেছো/যতো ক্ষোভের ক্রুশ?–এখানে কবি তার যাপিত জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণা ও ইজরালি দখলদারি প্রক্রিয়ায় নিপীড়নে আক্রান্ত দশায় সৃষ্ট ক্ষোভ ও উদ্বেগের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। যেখানে কবি ক্ষোভকে জীবনের চূড়ান্ত অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করেননি। বরং রাজনৈতিক ক্ষোভকে রাজনৈতিকভাবে দেখার কারণে কবি কবিতায় নিজের বাধ্যবাধকতা এবং অক্ষমতার আবেগ প্রকাশ করেছেন অনায়াসে। এ ক্ষোভের মাধ্যমে শুধু ক্ষোভই প্রকাশিত হয়নি একইসাথে একটি আক্রান্ত–দখল হয়ে যাওয়া জাতির কর্তৃত্বপরায়ণ সত্তার পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা প্রকটভাবে উঠে এসেছে। তবে দ্বিতীয় কবিতা 'ওয়ালা'য় দারভীশ ফিলিস্তিনী জনগণের কর্তাসত্তা এবং তার সাথে সম্পর্কিত ভাষার অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

حملتُ صوتكَ في قلبي وأوردتي
فما عليك إذا فارقتَ معركتي
أطعمتُ للريح أبياتي وزخرفها
إن لم تكن كسيوف النار.. قافيتي !
آمنت بالحرفِ.. إما ميتاً عَدَماً
أو ناصباً لعدوّي حبلَ مشنقةِ
آمنت بالحرف ناراً... لا يضير إذا
كنتُ الرمادَ أنا ... أو كان طاغيتي !
فإن سقطتُ ... وكفي رافع علمي
سيكتبُ الناس فوق القبر :
((لم يَمُتِ))[২১১]

আমি তোমার কণ্ঠ বয়ে গেছি আমার হৃদয়ে শিরায় শিরায়
অতএব যদি তুমি যুদ্ধটা ছেড়ে দাও তবে তোমার দায় কি
আমি তো বাতাসকে ভক্ষণ করিয়েছি আমার পঙক্তিমালা–অলঙ্কার
যদি হায়, আমার অন্ত্যমিল–ছন্দ আগুনের তরবারির মতো না হতো!
আমি বিশ্বাস করি ভাষায়–অক্ষরে... হয় মৃত, অস্তিত্বহীনতা, নয়ত
শত্রুর বিরুদ্ধে ফাঁসির রজ্জু টেনে... আমি বিশ্বাস করি
ভাষা আর অক্ষরের আগুনে...যতক্ষণ না আমি হয়ে উঠি ছাই আমি
কিংবা অত্যাচারী... তবে কাউকে তা আঘাত করবে না...
সুতরাং যদি আমার পতন হয়... যখন আমার পতাকা
ঊর্ধ্বে তুলে রাখে আমারই হাত
তবে মানুষেরা অচিরেই লিখে রাখবে কবরের উপরঃ
‘তার মৃত্যু হয়নি’

এখানে দেখা যায়, কবি তার নিজের সাথে সাথে তার আপন জনগোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করছেন। যেখানে ভাষা কবি এবং তার পাঠকের মাঝে একটি উপায় হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় কবি হয়ে ওঠেন তার পাঠকের–তার জনমানুষের ভাষ্যকার। কারণ কবি বলেছেন, তিনি মানুষের কণ্ঠস্বর

[২১১]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ১৭।

নিজের হৃদয়ে ধারণ করেছেন। রক্তে প্রাণ মনে বহন করে চলেছেন মানুষের ইচ্ছা আকাঙক্ষা, মানুষের ভাষ্য যা তাদের দেশ-মাতৃভূমি এবং জাতিয়তার সাথে মিশে আছে।

'জলপাইয়ের পত্রাবলী' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। বলা বাহুল্য, জলপাই–যেটি অলিভ গাছ। মূলত বিশ্বব্যাপী অলিভ হিসেবেই পরিচিত। অলিভ ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ। আরবী ভাষায় জায়তুন। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রজাতিগতভাবে একই ধারার হওয়ায় জায়তুন এর অনুবাদ করা হয়েছে জলপাই। জায়তুন–অলিভ কিংবা জলপাই ফিলিস্তিনের জাতীয় বৃক্ষ। বস্তুত জায়তুনকে একটি রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন দারভীশ। এমন জাতীয় বৃক্ষ দিয়ে পুরো ফিলিস্তিনকে তিনি ধারণ করতে চেয়েছেন এই একটি শব্দের মধ্যে। অপরদিকে জায়তুনের বিপরীতে 'রীহ' (বাতাস) শব্দ দিয়ে পুরো ইজরাইলকে তিনি শনাক্ত করেছেন। ভৌতগত কারণ ছাড়াও জলপাই বৃক্ষকে যে প্রতীক ও রূপক হিসেবে চয়ন করা হয়েছে যার ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্য অনেক গভীর-ব্যাপক। প্রথমত, জলপাই প্রকৃতির এমন একটি অঙ্গ যার শিকড় ফিলিস্তিনের মাটির তলদেশজুড়ে গভীরে বিস্তৃত এবং তার ডালপালা ও পত্রাবলী আকাশ ছেয়ে আছে। ফিলিস্তিনের মাটি আকাশ থেকে শুরু করে পুরো প্রকৃতিজুড়ে এর বিস্তার অলজ্ঘনীয়। বৃক্ষের মেজাজের সাথেও ফিলিস্তিনের একটি সম্পর্ক রয়েছে। এটি অনেক আদি প্রকৃতি ফিলিস্তিনের। বৃক্ষ একদিকে বেশ গম্ভীর এবং শান্ত-স্থির–যাতে কোনো অস্থিরতা নেই। অশান্ত স্বভাব নেই। বৃক্ষের গুণাগুনকে প্রতীক ও উপমা হিসেবে ব্যবহার করে ফিলিস্তেনের যে উপস্থাপনা ঘটিয়েছেন দারভীশ তার কাব্যে উত্তর-উপনিবেশিক কবিতা হিসেবে তার পাঠ ও বিশ্লেষণ অন্যতরো পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব। ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত এ ধরনের কাব্য–অর্থাৎ নাকবার আগ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের আরবী কবিতা এমনকি সমকালীন পুরো আরবী কবিতায় এ ধারা নতুনতরো।[২১২] দারভীশের প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট কিংবা প্রকৃতির রূপকাশ্রিত এসব কবিতা ইকোসেন্ট্রিক () কিংবা ইকোপোস্টকলোনিয়াল () তত্ত্বের দিক থেকেও পর্যালোচনা করা যায়। যাইহোক, জলপাই একইসাথে ফিলিস্তিনের স্থিতি-স্থাপকতারও প্রতীক। ফিলিস্তিনের প্রাচীনত্ব এবং মৌলিকতার প্রতীক জলপাই। ফিলিস্তিনী জাতির স্থায়ীত্বের প্রতীক জলপাই। কারণ তার শেকড় কিংবা তার ভিত্তি অনেক গভীর পর্যন্ত প্রোথিত। এতোটাই গভীরে যে তাকে কোনো ঝড়ো বাতাস এসে উপড়ে ফেলে দিতে পারে না। জনপদ হিসেবে ফিলিস্তিনের স্থায়ীত্ব এবং অটলতা কতোটা শক্তিশালী তার উপমা যে জলপাই শব্দের মাধ্যমে দারভীশ প্রকাশ করেছেন তাকে যথার্থভাবে অনুধাবন করার জন্য তিনি তার বিপরীতে আরো একটি রূপক ব্যবহার করেছেন–এবং এ বিপরীত রূপক হলো 'বাতাস' (রীহ)। দারভীশ কেন ইজরাইলকে 'রীহ' বা বাতাস শব্দের মধ্যদিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন? বাতাসের বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাবের কারণে ইজরাইলকে বাতাস হিসেবে বিবেচনা করেছেন দারভীশ। এধরনের উপমা তার সমকালে একেবারে মৌলিক। নতুন। বাতাসের বৈশিষ্ট্য হলো অস্থির-চলমান, বহমান। এক জায়গায় এটি স্থির থাকে না। বাতাসের অপর ভূমিকা হলো, অপর কোনো বস্তুকে আঘাত করা। অপরকে তছনছ করে দেয়া। বাতাসের অপর সব গুনের মতো ধ্বংসাত্মক ভূমিকাও রয়েছে ইজরাইলের।

[২১২]. সিলভারম্যান, নেতানেল হাইম, *রিগার্ডিং আইডেন্টিটি কার্ডস: দি আর্লি এন্টিকলোনিয়াল পোয়েটিকস অব মাহমুদ দারভীশ এন্ড দেয়ার হিব্রু আফটারলাইভস* পৃ. ১৫।

যেকারণে পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে এসে এখানকার ভূমি তছনছ করে দিয়েছিল ১৯৪৮ সালে। সেসময় জায়োনিস্ট শক্তি ফিলিস্তিনে ঝড়ো বাতাসের মতো এসেই সব বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। উপড়ে ফেলে দিয়েছিল লাখো কোটি মানুষের স্বপ্ন। গ্যালিলির আল বিরওয়াহ যেখানে দারভীশের বাস্তভিটা ছিল সেই বসতভূমি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নিশ্চি করে দিয়েছিল ইজরাইল। কিন্তু তাকে একমাত্র প্রতিরোধ করতে পারে জলপাইয়ের পত্রাবলী। জলপাই বন। জলপাই এবং তার ডালপালা পত্রাবলী হলো ফিলিস্তিন এবং তার জনগণ। ফিলিস্তিন চাইলেই তাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তাদের সমস্ত আঘাত প্রতিহত করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু এ প্রতিরোধ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাউকে পিছপা হওয়া যাবে না। কবি এমনই দাবি করেছেন উপরের কবিতায়। দারভীশ বলেছেন, *আমি তো বাতাসকে ভক্ষণ করিয়েছি আমার পঙক্তিমালা–অলঙ্কার*–কবি এখানে বাতাস বলতে ইজরাইলকে বুঝিয়েছেন। দারভীশ তার কবিতার ভাষা দিয়ে ইজরাইলকে আঘাত করেছেন। যেহেতু ইজরাইল দারভীশের ভাষার আঘাত খেয়েছে–তার কবিতা দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়েছে।

مرَّ في الأفق كوكبُ
نازلاً... نازلاً
وكان قميصي
بين نار' وبين ريحْ
وعيوني تفكِّرُ
برسوم على التراب
وأبي قال مرة :
الذي ما له وطن
ماله في الثرى ضريح[213]

দিগন্তে নেমে... নেমে
পার হয়ে গেছে নক্ষত্র
যখন আমার জামা ছিল
আগুন ও ঝড়ের মাঝে
অটল; এবং মাটির উপর
বিবিধ রসুম ও প্রথায়
ভাবতে থাকে আমার চোখ
একবার বাবা বললেন:
যার কোনো দেশ নেই
পৃথিবীর এই মাটিতে
বস্তুত তার জন্য

[২১৩]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ১৫৩।

এক টুকরো কবরও নেই

কিংবা

إنا حملنا الحزن أعواماً وما طلع الصباحْ
والحزن نارٌ تُخْمِدُ الأيامُ شهوتَها ,
وتوقظها الرياحْ
والريح عندكَ, كيف تُلْجِمُها ؟
وما لكَ من سلاحْ..
إلاّ لقاءُ الريحِ والنيرانِ...
في وطنٍ مُباحْ؟!

আমরা সয়ে যাচ্ছি দুঃখ বছরের পর বছর, তবু ভোর উদিত হয়নি
দুঃখ তো এক আগুন- কাল তার লেলিহান জিহবা ঢেকে দেয়।
কিন্তু বাতাসেরা তাকে উস্কিয়ে দেয়
তোমার সাথেই এই বাতাস। কী করে নিয়ন্ত্রণ করবে
মূলত তোমার জন্য কোনো অস্ত্র নেই
কেবল বাতাস আর আগুনের মুখোমুখী হওয়া
এক বৈধ দেশে?[২১৪]

আত্মপরিচয়: প্রেক্ষিত, ঐতিহাসিকতা ও ঐতিহাসিক কর্তাসত্তা

আত্মপরিচয় একটি মৌলিক এবং ব্যাপক ভিত্তিক ধারণা হিসেবে গড়ে উঠেছে দারভীশের কবিতায়। ব্যক্তির আত্মদর্শন কিংবা আত্মজ্ঞান থেকে শুরু করে বিচিত্র অনুষঙ্গে যুক্ত হয়েছে এ ধারণা। বিশেষত ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে নিজের যে পরিচয় সে পরিচয়কে ইতিহাসের মধ্যদিয়েও সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। ফিলিস্তিনী হিসেবে যে আত্মপরিচয় তার ঐতিহাসিকতা কেমন কিংবা তার স্বরূপ কিভাবে বিকশিত হয়েছে তার হদিস তলিয়ে দেখার ব্যাপার রয়ে গেছে। ইতিহাসের মধ্যদিয়ে আত্মপরিচয় এবং একইসাথে ফিলিস্তিনী হিসেবে ‘নিজ’ কিংবা ঐতিহাসিক কর্তাসত্তা কিভাবে ক্রমাগত প্রতিফলিত হয়েছে তার নমুনা খুঁজে দেখা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ফিলিস্তিন নামক একটি সত্তার প্রেক্ষিত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে কিভাবে ক্রমে সাধারণ ও সর্বজনীন হয়ে উঠেছে তার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। দারভীশের কবিতায় সেসবের চিহন রয়ে গেছে বিধায় ইতিহাসের মধ্যদিয়ে আত্মপরিচয়ের প্রেক্ষিতগুলো উন্মোচন করা সম্ভব।

[২১৪]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৮.

ফিলিস্তিনের সত্তা (সেল্ফ) ইতিহাসের কতোটা গভীর থেকে উঠে এসেছে? তার অস্তিত্ব ইতিহাসের কোন প্রেক্ষিত থেকে–কোন বীজতলা থেকে উন্মিলীত হয়েছে? এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ইতিহাসের গোড়া নির্ণিত হয়েছে যেভাবে তার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উৎস হলো 'কেনান'।[২১৫] 'ফিলিস্তিন' ধারণা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ–যা তার জন্মের নানা মাত্রিকতার মধ্যে ধারণ করা যায়। কিন্তু ফিলিস্তিন বিষয়ক ধারণা বলতে কি বোঝানো হয়? ফিলিস্তিনের মৌলিকতা কিংবা তার জাতিয়তা (এথনিসিটি) যে কেনান সভ্যতারই সম্প্রসারণ তা পরবর্তীতে বিভিন্ন কালপর্বে বিকশিত হয়ে অনেক গভীরে এবং অনেক দূর বিস্তৃতি লাভ করেছে। ভূমি এবং ভৌগলিকতার ইতিহাসের দিক থেকে ফিলিস্তিন সবসময় ছিল অনন্য। জাতিয়তার দিক থেকেও কেনান এবং ফিলিস্তিন সমার্থক। তবে ধারণা হিসেবে ফিলিস্তিন বিচিত্র অনুষঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছে। আঞ্চলিকতার ইতিহাসের দিক থেকে এবং জনশ্রুতিগতভাবে আদি থেকে শাম দেশের (বিলাদ আল শাম) বিস্তীর্ণ অঞ্চল ফিলাস্তিন (ফিলিস্তিন) হিসেবে পরিচিত ছিল। ফলে ভূমির ইতিহাস ও ভৌগলিকতার বাইরেও এখানে জাতিয়তা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ফিলিস্তিন ধারণার সাথে গভীরভাবে কার্যকর রয়েছে। সাধারণত ফিলিস্তিন যতোটা না ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক হিসেবে প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ক পাঠ্যগুলোতে চর্চিত হয়ে আসছে তার চেয়ে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের ইতিহাস-পাঠ ও চর্চা খুবই নগন্য। ফিলিস্তিনের মানুষের সেদিক থেকে জাতি হয়ে ওঠার কিংবা জাতি হিসেবে তাদের নির্ণিত হবার ইতিহাস অনেকখানি বিরলই বটে। কিন্তু জাতি হয়ে ওঠার চেয়ে ফিলিস্তিনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক প্রাচীন। তার চেয়েও প্রাচীন তাদের জাতিয়তা। যদিও আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে জাতি হয়ে ওঠার যে ধারণা তার উৎপত্তি খুব বেশি দূরের নয়। একইভাবে ফিলিস্তিনকেন্দ্রিক জাতিয়তাবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসও অতি নিকটের।[২১৬]

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ফিলিস্তিনে জাতি-জাতিয়তাবাদ বিষয়ক ধারণাগুলো খুবই জটিল এবং অপ্রামাণ্য বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে। যার যৌক্তিক ভিত্তি সংশয়পূর্ণ। যেভাবে ফিলিস্তিনে জাতিয়তাবাদ গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ উপনিবেশিকতাবাদ এবং জায়োনিস্টদের নয়া-উপনিবেশিকতাবাদ ছিল তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত। কিন্তু ফিলিস্তিনে সাম্প্রতিককালের জাতিয়তাবাদকে আরব জাতিয়তাবাদের মধ্যে নিঃশেষ করার যে ধারণা প্রচার পেয়েছে তা যেমন কৃত্রিম। তেমনি ফিলিস্তিনী জাতিয়তাবাদ কিংবা ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় বলে কিছুই নাই–ধারণারও কোনো প্রামাণ্য ভিত্তি নাই। পশ্চিমা একাডেমিয়ায় সমাদৃত ফিলিস্তিনের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিশ্লেষক নূর মাসালহা মনে করেন, জায়োনিস্ট একাডেমিয়াগুলো এসব প্রচারণা চালিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন– ফিলিস্তিনের স্বতন্ত্র এবং একক পরিচয় বলে কিছু নেই। তাদের জাতিয়তার নিজস্ব কোনো ঐতিহাসিকতা নেই। কারণ তাদের পরিচয় মূলত আরব জাতিয়বাদের শেকড়ে। উপনিবেশিকতার প্রতিক্রিয়ায়। নূর মাসালহা দাবি করেন, তাদের যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই। কারণ জাতিয়তাবাদ মাত্রই একটি কৃত্রিম ধারণা ও ঐতিহ্য (invented traditions)। ইতিহাসের কোনো প্রেক্ষিতে তৈরি করা একটি প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু

---

[২১৫]. মাসালহা, নূর, *প্যালেস্টাইন: আ ফোর থাউজ্যান্ড ইয়ার হিস্ট্রি* (লন্ডন: জেড বুকস, ২০১৮ খ্রি.), পৃ.২১।
[২১৬]. প্রগুক্ত। পৃ. ১২-১৪।

আরব জাতিয়তাবাদের জন্ম মাত্র গত শতকে। মোটামুটি এক শতকে বিস্তার ঘটেছে। বিপরীতে ফিলিস্তিনের রয়েছে চার হাজারেরও বেশি সময়ের জাতিয়তার ইতিহাস। তাদের রয়েছে নিজস্ব পরিচয় ও সংস্কৃতির ইতিহাস। তাছাড়া জায়োনিস্টরা 'ফিলিস্তিনী জাতিয়তাবাদ'কে একটি উপনিবেশিক আবিষ্কার– বলে যে যুক্তিতে খারিজ করে দিতে চেয়েছেন, একই যুক্তি তাদের উপরও বর্তানো যায়। কারণ ব্রিটিশ উপনিবেশ শুধু ফিলিস্তিন কিংবা ফিলিস্তিনী জাতিয়তাবাদই সৃষ্টি করেনি বরং সেই একই জাতিয়তাবাদ–ব্রিটিশ-জায়োনিস্ট সেটলার উপনিবেশিক জাতিয়তাবাদ ইজরাইল নামের একটি রাষ্ট্রেরও জন্ম দিয়েছিল।[২১৭]

দারভীশের কবিতা এবং তার চিন্তায় ফিলিস্তিনের জাতীয় আত্মপরিচয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার ঐতিহাসিকতাও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু ফিলিস্তিন নামক একটি দেশ-একটি জাতি আকস্মিকভাবে তৈরি হওয়া কিংবা কোনো কৃত্রিম আবিষ্কারের ফল নয়–বরং তার সুদূর ইতিহাস আছে। ঐতিহাসিকতা আছে। রাজনৈতিক কারণে দারভীশের কাছে জাতীয়তাবাদের বিবেচনা রয়েছে। কিন্তু দারভীশ ফিলিস্তিনের সত্তায় যে প্রাণ-ভ্রোমরা দেখতে পেয়েছেন তার ঐতিহাসিকতা এবং ইতিহাসের কুলজিনামাও বুঝিয়ে দিতে চান। নূর মাসালহা তার 'ফিলিস্তিন: চার হাজার বছরের ইতিহাস' গবেষণাগ্রন্থে ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় এবং জাতিগঠনে যাদের প্রধান রূপকার মনে করেন তার মধ্যে মাহমুদ দারভীশ অন্যতম। মাসালহা তার গবেষণায় 'ফিলিস্তিনের সত্তা এবং ফিলিস্তিনের হয়ে ওঠা' নামক মেথডোলজি প্রয়োগ করে ফিলিস্তিনে আত্মপরিচয় কিংবা ফিলিস্তিনের হয়ে ওঠার ডিসকোর্স বিশ্লেষণ করেছেন। এই মেথডোলজির ধারণা দারভীশের কবিতা ও চিন্তা থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন।

নূর মাসালহা দেখাতে চেয়েছেন, দারভীশ বস্তুত ফিলিস্তিনের যে সত্তা নির্ণয় করেছেন তাতে রয়েছে বহুবিশ্বাস এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্য। মূলত ফিলিস্তিনের যে সত্তা এটি একইসাথে নির্ণয়ের প্রশ্ন–যা কেবল আত্মোন্মোচন কিংবা নিজেকে আবিষ্কারের সাথেও সম্পর্কিত। এই আত্মোন্নয়ন এবং আত্মোন্মোচনের জন্য নিজেকে যেতে হবে ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ভিতর দিয়ে–যেখানে চলমান ইতিহাস কিংবা বর্তমানের শেকড়ও অবলোকন করে আসা সম্ভব। দারভীশের মনে করেন,

عادوا إلى ما كان فيهم من منازلَ , واستعادوا
قَدَمَ الحرير على البحيرات المضيئة ' واستعادوا
ما ضاع من قاموسهم : زيتونَ رُومَا في مخيّلة الجنودِ
توراةَ كنعانَ الدفينةَ تحت أنقاض الهياكل بين صُورَ وأورشليم
وطريقَ رائحةِ البخور إلى قُرَيْشَ تهبُّ من شامِ لورودِ
وغزالةَ الأبد التي زُفّت إلى النيل الشماليّ الصعودِ
وإلى فحولةِ دجلةَ الوحشيّ وَهْوَ يَزُفُّ سُومَرَ للخلودِ

[২১৭]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৯-২১।

كانوا معاً
كانوا معاً يتحاربون , ويَغْلِبون , ويُغْلَبونْ
كانوا معاً
يتزوَّجون وينجبون سُلالةَ الأَضدادِ أَو نسلَ الجنونْ
كانوا معاً
يتحالفون على الشمال ' ويرفعون على الجحيمْ
جسرَ العبور من الجحيم إلى انتصار الروح فيهم كُلِّهم
ويعاودون الحربَ حول العقل . مَنْ لا عَقْلَ في إيمانِهِ
لا روح فيه[218].

তারা ফিরে এসেছে তাদের মঞ্জিলে যেখানে তারা একদা ছিল
তারা পুনরুদ্ধার করেছে আলোকোজ্জ্বল হ্রদগুলোর উপর বয়ে যাওয়া রেশমি পদক্ষেপ
আবার তারা ফিরিয়ে এনেছে অভিধান থেকে হারিয়ে যাওয়া বস্তুসমূহ: বীর সৈনিকের স্বপ্নে ভাসা রোমের জলপাই,
কেনানের তাওরাত–ধ্বংসস্তুপের ভিতর–জেরুজালেম এবং বিবিধ পাগড়ির স্তুপের মাঝে উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষের নিচে
যার সমাধী হয়েছিল, কুরাইশের পথে ছড়িয়ে পড়া ধূপ-গন্ধ প্রণালী শাম দেশ থেকে গোলাপের নেশায় যা উথলে উঠতো
এবং উত্তর নীল নদের দিকে ধাবমান শাশ্বত হরিণী–শেষাবধি মিলিত হতো দাজলার জংলী কুমারের সাথে যে কিনা চিরকাল সুমিরীয়কে বিয়ে করে যেতো।
তারা এসেছিল একসাথে
তারা যুদ্ধ করতো একসাথে, বিজয় ছিনিয়ে আনতো একসাথে, একসাথে বরণ করতো পরাজয়
তারা বিয়ে করতো, জন্ম দিতো বিপরীত লিঙ্গের বংশধারা কিংবা পাগল সন্তান
তারা ছিল একসাথে
উত্তরাঞ্চল নিয়ে তারা করতো সন্ধি–তারা রূহের বিজয় পেতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির
সেতু বানাতো জাহান্নামের উপর–যেখানে সেই রূহের দুনিয়ায় তারা থাকতো একসাথে সম্মিলিত
বুদ্ধিকে কেন্দ্রে রেখে তারা আবার যুদ্ধে জড়িয়ে যেতো
বস্তুত যার ঈমানে বুদ্ধি নেই তার মাঝে রূহ নেই।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয় 'উরীদু মা উরীদু'। এই কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ কবিতা 'মা'সাতু আল নারজিস মুলহাত আল ফিদ্দাহ' থেকে উপরের পঙক্তিগুলো নেয়া হয়েছে। এটি তার বিখ্যাত কবিতাগুলোর অন্যতম। উরীদু মা উরীদু বের হওয়ার এক বছর পর স্পেনের মাদ্রিদে ইজরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৮ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার অবব্যহিত পরেই

---

২১৮. দারভীশ, *মাহমুদ*, *আল আ'মাল আল উ'লা*-৩, পৃ. ২২৯।

ফিলিস্তিনে প্রথম ইন্তিফাদা সংঘটিত হয়। পুরো এ সময়টা ছিল ফিলিস্তিনে জাতীয় রাজনীতির তীব্র অস্থিরতার সময়। শান্তি আলোচনার দৃশ্যমান তৎপরতার মধ্যেই দারভীশের এ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ কাব্যগ্রন্থে ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়ের অনবদ্য আখ্যান রচনা করেন দারভীশ। নূর মাসালহা ফিলিস্তিনের সত্তা এবং বহু ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির যৌথতায় গড়ে ওঠা আত্মপরিচয় সম্পর্কিত দারভীশের চিন্তার যে প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে উপরের পঙক্তিগুলোতে। দারভীশ ফিলিস্তিনের যে কাব্যময় ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়েছেন তাতে একটি উন্নত জাতির বিবরণ বিধৃত হয়েছে। যেখানে ফিলিস্তিনের প্রাচীনতার কথা বলা হয়েছে। যে কেনান ছিল ফিলিস্তিনের আদি নাম। আদি জাতিয়তা। শাম দেশের উত্তরাঞ্চল ছিল কেনানদের ভৌগলিক অবস্থান। এই ভূখণ্ডেই কেনানরা মানে ফিলিস্তিনীরা তাদের সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে সভ্যতা কেমন ছিল তারই আখ্যান এই কবিতা। কেনানের প্রত্নতাত্ত্বিকতাকে শাম দেশ এবং নীল নদের উত্তরাঞ্চল, দাজলা এবং সুমিরীয় সভ্যতার সাথে যুক্ত করে দেখিয়েছেন দারভীশ। একইসাথে কেনানের সাথে মক্কা নগরীর সম্পর্ক ও যোগাযোগের কথাও উঠে এসেছে। উঠে এসেছে ভূমধ্যসাগরের মধ্যদিয়ে রোম নগর সভ্যতার যোগাযোগ। এর মধ্যে তাওরাতের প্রসঙ্গ ধরে ইহুদি এবং রোমের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মের প্রসঙ্গ এসেছে। শেষ পঙক্তিগুলোতে ইসলামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন দারভীশ। কবিতাটির পুরো বিস্তারের মধ্যদিয়ে দারভীশ যে বিষয়টি সবথেকে বেশি প্রধান করে তুলেছেন তাতে দুটি ধারণা অর্জন করা যায়। প্রথমত জাতীয় সংহতির ধারণা। একটি জাতির জাতি হয়ে ওঠার অপরিহার্য উপাদান তার জাতীয় সংহতি বা ঐক্য। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিকতা। তৃতীয়ত, তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি। তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূল ছিল বুদ্ধি ও জ্ঞান। এটি তাদের ঈমান-বিশ্বাস, ধর্মী নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সাথে যেমন সম্পর্কিত তেমনি তাদের সার্বিক বৈষয়িকতার সাথে সম্পর্কিত। কাজে সামাজিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে যুদ্ধ পর্যন্ত জাতীয় সকল কর্মকাণ্ড সম্মিলিতভাবে কার্যকর করার যে প্রক্রিয়া তার মধ্যদিয়ে তাদের একটি পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিকতা অনুধাবন করা যায়। এবং এই সংহতি ও রাজনৈতিকতার সমন্বয়ে মূলত সামগ্রিকভাবে কেনান তথা আদিম ফিলাস্তিনের ঐতিহাসিক কর্তাসত্তা গড়ে উঠেছে। এই কর্তাসত্তা ঐতিহাসিক–যা কেনানিরা অর্থাৎ ফিলিস্তিন জাতি হাজার বছর ধরে তাদের রক্তের ধারায় বয়ে চলেছে। ফলে রাজনৈতিকতা-জাতীয় সংহতি-জ্ঞান-বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্তাসত্তা কিংবা তাদের ঐতিহাসিকতা এই সামগ্রিকতাই বস্তুত ফিলিস্তিনের জাতি হয়ে ওঠার কিংবা তাদের জাতীয় আত্মপরিচয়ের ঐতিহাসিক বৈধতা (লেজিটিম্যাসি)।

আহাদা আশারা কাওকাবা গ্রন্থে ফিলিস্তিনী ঐতিহাসিকতার অনন্য নজির স্থাপন করেছেন দারভীশ। যেখানে ফিলিস্তিনকে ইতিহাসের ভিতর দিয়ে আরো জীবন্ত ও বর্তমান করে তুলতে সক্ষম হন তিনি। ইতিহাসের জিজ্ঞাসাগুলো ছিল ফিলিস্তিনের বর্তমানকে তার শেকড়ের সাথে এক করে দেখার কিংবা শেকড় কি করে বর্তমানে এসে আরো বিস্তীর্ণ ও গভীর হয়ে উঠেছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার।

هذا غِيابي سَيِّدٌ يَتْلو شَرائِعَهُ، ويَسْخَرُ من رُؤايْ
ما قيمةُ الْمِرْآةِ لِلْمِرْآةِ ؟ لي وَجْهٌ عَليكَ, وأَنتَ لا
تَصْحو منَ التَّاريخ، لا تَمْحو بُخارَ الْبَحْرِ عَنْكْ..
والْبَحْرُ, هذا الْبَحْرُ، أَصْغَرُ من خُرافَتِهِ وأَصْغَرُ مِنْ يَدَيْكْ
هو بَرْزَخُ البلُّورِ, أَوَّلُهُ كآخِرِهِ، وَلاَ مَعْنًى هُنا
لِدخولِكَ الْعبثِيِّ في أُسْطورَةٍ تَرَكَتْ جُيوشاً للرُّكَامِ
لِيَمُرَّ جَيْشٌ آخَرٌ يَرْوي رِوايَتَهُ وَيَحْفِرَ لاِسْمِهِ
جَبَلاً، ويَأْتي ثالِثٌ ويَخُطُّ سِيْرَةَ زَوْجَةٍ خَانَتْ, ويَمْحُو رابعٌ
أَسْماءَ مَنْ سَبَقوا هُنَاك لِكُلِّ جَيْشٍ شاعِرٌ
ومُؤَرِّخٌ...[219]

এই আমার অদৃশ্য-গায়েব– এক নির্দেশক এক নেতা
আবৃত্তি করতেন যিনি তার বিধি-বিধান। বিদ্রুপ করতেন আমার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।
আয়নার জন্য আয়নার কি মূল্য? তোমার উপর আছে আমার এক চেহারা
তুমি উঠে আসবে ইতিহাস থেকে, তবু দূর করতে পারবে না তোমার ভিতরের
সামুদ্রিক উত্তাপ... সমুদ্র—এই সমুদ্র তার পৌরাণিকতার চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র,
ক্ষুদ্র তোমার হাতের চেয়ে, এই সমুদ্র স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এক দুনিয়া,
তার আদি অন্তের মতো, পুরাণের গভীরে তোমার ব্যর্থ প্রবেশের কোনো অর্থ নেই–
এই পুরাণ তার ফৌজদের রেখে গেছে বিধ্বস্ত ইট-পাথরের কাছে
যেন কোনো সিপাহী এসে বলে যায় তার গল্প—তার নামের জন্য খনন করে যায় পাহাড়।
তৃতীয় সিপাহী এসে লিখে যাবে তার বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীর জীবনকাহিনী।
চতুর্থ কোনো সিপাহী এসে মুছে দেবে তার পূর্বসূরীদের প্রতিটি নাম।
ওখানে প্রতিটি সৈনিকের রয়েছে একজন কবি, একজন ইতিহাসবিদ।

কবিতার পঙক্তিগুলো পাঠ করার পর একটি মহাকাব্যিক ভাষা অনুভব করা যায়। মনে হয় কোনো রোমাঞ্চকর পৌরাণিক আখ্যানের ভিতর হারিয়ে যাওয়া কোনো গভীর অভিযাত্রায় জেগে উঠেছে ইতিহাসের রঙমঞ্চ। এই ইতিহাস অনেক গভীর সীমাহীন দীর্ঘ। পুরাণ যেখানে তার সমুদ্রের উপমা হয়ে উঠেছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত পুরাণ তার সমুদ্রের চেয়ে আরো বৃহৎ পরিসর নিয়ে নিজের পরিচয় বহন করে চলেছে। পুরাণ শেষপর্যন্ত আর পুরাণই থাকে না। চলমান ইতিহাসের নির্ধারক উপাদানও রোপন করে যেতে সক্ষম। কিন্তু ইতিহাস অনেক দীর্ঘ আর সমুদ্রের মতো বিস্তৃত-গভীর হলেও তা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। পরিষ্কার। এতোটাই পরিষ্কার যে–তার শুরু এবং আদিই যেন শেষ এর মতো। অর্থাৎ তার সূচনা এবং প্রাচীনতা শেষের মতো মানে বর্তমানের মতো। চলমান বর্তমানের মতোই যেন ছিল তার সূচনাকাল। ইতিহাসকে যখন এমন রূপ দেয়া যায় তখন মূলত তা আর ইতিহাস থাকে না। বর্তমান

২১৯. দারভীশ, *মাহমুদ*, *আল আ'মাল আল উ'লা-৩*, পৃ. ৩১৭।

হয়ে ওঠে। ইতিহাসের এমন বয়ান ফিলিস্তিনের কর্তাসত্তা নির্মাণ-প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দারভীশ বলেন,

هذه لغتي ومعجزتي. عصا سحري.
حدائق بابلي ومسلتي, وهويتي الأولى,[২২০]...

এই আমার ভাষা এই আমার বিস্ময়—যাদুর কাঠি
ব্যাবিলনের উদ্যান, স্মৃতিচিহ্ন এবং আমার প্রথম পরিচয়

কিন্তু ইতিহাস যা অতীত হয়ে গেছে– কিংবা কেবল স্মৃতির মতো হয়ে আছে সেই ইতিহাস একরকম সমান্তরাল নয়। তার আছে জটিল সমীকরণ। বিচিত্র হিসাব নিকাশ। আছে ভাঙ্গা-গড়া। উত্থান-পতন। ইতিহাসের এমন স্বতসিদ্ধ নৈর্ব্যক্তিকতাকেও স্বীকার করে তার উদাহরণের সত্য তুলে এনেছেন দারভীশ। উপরের পঙক্তিগুলো তার অনন্য নজির। কিন্তু এই সিদ্ধতাই শেষপর্যন্ত বর্তমানের গাঠনিক উপাদান হয়ে উঠতে পারে না। তার জন্য ইতিহাসের ন্যারেটিভ বা বয়ান জরুরি। জরুরি ঐতিহাসিক কর্তাসত্তা (হিস্টরিক্যাল এজেন্সি) গঠনের। যে আত্মপরিচয় এবং কর্তাসত্তা আপন ঐতিহাসিকতার মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছিল ফিলিস্তিন কখনো কখনো তা হারিয়েও ফেলে। এই হারিয়ে ফেলার দশা বরং ফিলিস্তিনকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে পারে হয়ত।

وتخاصرت والآخرين.. بحلبة الرقص الطويلهْ
وأنا وأنت , نعاتبُ التاريخَ
والعَلَمَ الذي فقد الرجولهْ
مَن نحن ؟؟[221]

আমি এবং অন্যরা... নৃত্যের দীর্ঘ মেঝেয় হাত ধরে আছি আমরা পরস্পর
আমি এবং তুমি—আমরা কিঞ্চিত তিরষ্কার করি ইতিহাস এবং পতাকার
যে পতাকা এবং ইতিহাস হারিয়েছে তার পৌরুষ।
তাহলে আমরা কারা?

জৈবিক দিক থেকে ‘পৌরুষ’ কথাটির কোনো অর্থ এই আলোচনার সাথে প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায় না। মাহমুদ দারভীশ যখন এই কথা বলছেন তখন সময়কাল ছিল তার দ্বিতীয় কবিতার। ১৯৬৪ সালের ফিলিস্তিন তখন, যখন ফিলিস্তিন তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধের মুখোমুখী। নাকবা পরবর্তী এই সময়ে ফিলিস্তিন চরম আত্মপরিচয়ের সংকটের মধ্যদিয়ে যাচ্ছিল। এই সংকটের মূলে ছিল

---

২২০. দারভীশ, মাহমুদ, *আল আ'মাল কামিলাহ* (মিশর: মুনতাদা মাকতাবাহ আল ইসকান্দারিয়্যাহ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৬৯৬।
২২১. দারভীশ, মাহমুদ, *আল আ'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ৬৮।

ঐতিহাসিক লিগ্যাসি () এবং ইতিহাসের ভিতর থেকে জারিত হওয়া ফিলিস্তিনী কর্তাসত্তার উত্থানজনিত সমস্যা। পৌরুষ কথাটি সেকারণে জীববিদ্যার পাঠোপলব্ধি থেকে দেখার সুযোগ নেই। এই ‘পৌরুষ’ কথার সাথে জড়িয়ে আছে ফিলিস্তিনের হারানো স্পিরিট–রাজনৈতিক হয়ে ওঠার স্পিরিট পুনুরুদ্ধারের প্রশ্ন। দারভীশ সেই দিকেই নজর ফেরাতে চেয়েছেন তার কবিতায়।

৩.৩.১: আত্মপরিচয়: স্থিতি এবং ক্রমবিকাশ

আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন বড়পরিসরে আলোচনার অবকাশ রাখে। কবিতার দার্শনিক পাঠ ও বিশ্লেষণে আত্মপরিচয়ের পর্যালোচনা আরো ঘনিভূত হয়ে উঠতে পারে। তাত্ত্বিক আলোচনায় যেহেতু নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনো আলোচনা এগিয়ে নিতে হয় ফলে আত্মপরিচয় এবং এর বিশ্লেষণ দার্শনিক দিক থেকে আরো পরিচ্ছন্ন করে তোলা সম্ভব। তবে দর্শন কিংবা তত্ত্বগত আলোচনার বাইরে ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকেও আত্মপরিচয়কে দেখা যায়। সেদিক থেকে অধুনা উপনিবেশিক আমলে পরিচয় সংকট ছিল স্পষ্ট বাস্তবতা– যেখানে পরিচয়ের সাক্ষাৎ মোকাবেলা হয় ব্যক্তির সাথে। পরিচয়ের সংকট ও দ্বন্দ্ব এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয় উপনিবেশিক আমলে যেখানে ব্যক্তি এবং তার জাতিয়তার অস্তিত্ব ও সত্তার টিকে থাকার সাথে এ প্রশ্নের আলোচনা সম্পর্কিত। উপনিবেশিকতা বিরোধী যেকোনো আলোচনায় সাধারণত আত্মপরিচয় একটি জরুরি বিষয় হয়ে ওঠে।

আত্মপরিচয় সাধারণত দুইটি পর্যায়ে শনাক্ত করা যায়–ব্যক্তির পর্যায়ে। সমষ্টির পর্যায়ে। ব্যক্তির নিজ বা সত্তা সম্পর্কিত জ্ঞান কিংবা পরিচয় থেকেই শুরু হয় সামষ্টিক পরিচয়। নিজেকে না জানলে–নিজের স্বরূপ বুঝতে বা চিনতে না পারলে অপরকেও তেমনি চেনা-জানা সম্ভব হয় না কিংবা অনেক সময় এটি জটিল হয়ে ওঠে। ফলে সবার আগে আত্মজ্ঞান বা আত্মসচেতনতা জরুরি। আত্মপরিচয়ের জন্য আত্মসচেতনতাও তেমনি প্রাকজ্ঞান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। যেকারণে মাহমুদ দারভীশের সৃষ্টিতে আমি কিংবা আত্মজ্ঞান সম্পর্কে বিপুল কাব্যস্রোতের জন্ম হয়েছে। নিজেকে তাই না জানলে–নিজের পরিচয় পরিষ্কার না হলে অপরকেও তেমনি জানা যায় না। অপরের পরিচয় এবং তার স্বরূপ চেনা যায় না। আর তা না হলে অপরের সাথে মিলিত হওয়া কিংবা অপরের সাথে আত্মার বাধন গড়ে তোলা যায় না। স্থাপন করা যায় না অপরের সাথে ঐক্যের সম্পর্ক। অন্যভাবে বলা যায়, অপর কিবা পরমের সাথে মিলিত হওয়া যায় না। এই অপরই বস্তুত তার সরাসরি পাশে থাকা অপরাপর মানবগোষ্ঠী-সম্প্রদায়। আধুনিক কালে যাকে বলা হয় নাগরিক সমাজ। কিংবা আধুনিক রাষ্ট্রের জাতি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া বা আন্তসম্পর্কসমূহ। জাতি হয়ে ওঠার বিষয়টি বস্তুত ব্যক্তির এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের মধ্যে আত্মীয়তা ও সংহতির চূড়ান্ত প্রকাশ এবং বিকশিত রূপও বলা যায়। কিন্তু জাতি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া–সম্পর্ক এবং এর ধাপগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতিই বস্তুত আত্মপরিচয়ের সাধারণ রাজনৈতিক উপজীব্য। ব্যক্তি থেকে জাতি হয়ে ওঠা ব্যক্তির সংঘবোধের প্রতিফলন হিসেবে যেমন সত্য তেমনি এই সংঘ বা সংহতিবোধ থেকে জাতি হয়ে ওঠার প্রশ্ন তার রাজনৈতিকার সাথে জড়িত। তার আত্মপরিচয় সম্পর্কিত বোঝাবুঝির সাথে সম্পর্কিত। দারভীশের কবিতায় জাতীয় সংহতির চেয়ে

জাতীয় আত্মপরিচয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে দেখা যায়, দারভীশ ব্যক্তির আত্মপরিচয়ের সীমার মধ্যে আটকে থাকেননি–বরং দেশমূলক পরিচয়কে সম্মিলিত অধিকারের দিক থেকে জাতীয় আত্মপরিচয় পরিগঠনের দিকে রূপান্তরিত করেছেন। আবার একইসাথে জাতীয় আত্মপরিচয়ের সীমা অতিক্রম করে মানবাত্মার সর্বজনীন আত্মপরিচয়ের পথে দারভীশ তার অভিযাত্রা নির্ধারণ করেন। এই অভিযাত্রা সরল রেখাচালিত প্রলম্বিত নয়–আবার লম্বালম্বিভাবে ঊর্ধ্বমুখীও নয়। বরং তার অভিযাত্রা পুনরায় আমি এবং আত্মজ্ঞানের স্বরূপ সন্ধানে ফিরে আসে। যেখানে ব্যক্তি-জাতি-জাতিয়তা-সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে নিজের রূপ নির্ণয় কিংবা আত্মাভিজ্ঞানের অনুসন্ধানে দারভীশ তার দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যেতে চেয়েছেন। ধারণাগত বর্গ হিসেবে আত্মপরিচয় একটি ব্যাপক বিষয় হয়ে ওঠে। সত্তা (সেল্ফ) বা আত্মপরিচয় সম্পর্কিত আলোচনাকে সুয়াদ এ এইচ এম এস অ্যালেঞ্জি উত্তর-উপনিবেশিক সাহিত্যের অংশ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। সুয়াদ যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার থেকে এডওয়ার্ড সাঈদ এবং দারভীশের সাহিত্যকর্মের উত্তর-উপনিবেশিক আত্মপরিচয় সংক্রান্ত পাঠ-পদ্ধতি নিয়ে পিএইচ. ডি গবেষণা সম্পন্ন করেন। গবেষণায় সুয়াদ দারভীশের কবিতায় সাত স্তরের আত্মপরিচয় শনাক্ত করেন।[২২২] অপরদিকে ফিলিস্তিনী গবেষক, সাহিত্য সমালোচক ও ইতিহাস বিশ্লেষক ড. নাবীল তান্নুস দারভীশের কবিতায় ছয় পর্যায়ের আত্মপরিচয় বিশ্লেষণ করেছেন।[২২৩] ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় থেকে সামষ্টিক আত্মপরিচয়–এভাবে আত্মপরিয়কে সাত থেকে আটটি স্তরে আলোচনা করা যায়। যেমন, আরব আত্মপরিচয়, ফিলিস্তিনী আত্মপরিচয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফিলিস্তিন, অপরের সাপেক্ষে আত্মপরিচয়, নির্বাসিতের আত্মপরিচয়, সর্বজনীন আত্মপরিচয়, ধর্মীয় আত্মপরিচয়, আত্মজ্ঞানের সন্ধান কিংবা আত্মার পরিচয়।

৩.৩.২: আত্মপরিচয়: আরবীয় সত্তা এবং আরব জাতীয়তাবাদ

দারভীশের কবিতায় প্রথমত 'আরব' পরিচয় খুব বড় হয়ে ওঠে। তার প্রথম এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে আরব কিংবা প্যান আরব জাতীয়তাবাদের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তরুণ কবি হিসেবে দারভীশের উত্থানের সময়কাল ছিল আরব জাতীয়তাবাদের উত্তুঙ্গ সময়কাল। আরব জাতীয়তাবাদ কিংবা প্যান-আরব জাতীয়তাবাদের সাথে সমাজবাদী মতাদর্শ এবং মার্ক্সসবাদী ধারণা মিশে যাওয়ায় আরব কম্যুনিস্টদের বিপুল সমর্থন তৈরি হয়। দারভীশ নিজে কম্যুনিস্ট হওয়ায় আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন আরো জোরালো হয়ে ওঠে। বস্তুত ১৯৪৮ সালে ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘটনায় ইজরাইলের

---

[২২২]. এ এইচ এম এস অ্যালেঞ্জি, সুয়াদ, *আই অ্যাম নেইদার দেয়ার, নর হেয়ার: অ্যান অ্যানালাইসিস অফ ফরমুলেশনস অফ পোস্ট-কলোনিয়াল আইডেন্টিটি ইন দি ওয়ার্ক অফ অ্যাডওয়ার্ড ড. সাঈদ এন্ড মাহমুদ দারভীশ, আ থিমেটিক এন্ড স্টাইলিস্টিক অ্যানালিটিক্যার অ্যাপ্রোচ* (ম্যানচেস্টার: স্কুল অব আর্টস, ল্যাঙ্গুয়েজেস এন্ড কালচার্স, ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১১৬।

[২২৩]. ড. তান্নুস, নাবীল, *তাত্বব্বুরু মাফহুম আল হুবিয়্যাহ ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ* (হাইফা: শাজা আল কারমেল (**شذى الكرمل**), *চতুর্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৮। ভিজিট:* https://www.alwasattoday.com/site-sections/63953.html#

বিপরীতে আরবদের ঐক্য-সংহতি জরুরি হয়ে ওঠে। এ সময়ে প্যান-আরব জাতীয়তাবাদের যে আওয়াজ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার পথিকৃৎ ছিল মূলত মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের।[২২৪] আরব দুনিয়ায় তখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন জামাল নাসের। জামাল আবদেল নাসেরের প্রতি দারভীশেরও বেশ মুগ্ধতা ছিল। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষত পিএলও প্রতিষ্ঠায় জামাল নাসেরের বিশেষ সমর্থন ও অবদান ছিল। দারভীশ যখন মিশর হয়ে গোপন সফরে মস্কো যাচ্ছিলেন তখন জামাল আবদেল নাসের দারভীশের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় নাসের দারভীশকে মিশরে থেকে যেতেও আমন্ত্রণ করেন। এমনকি দারভীশ যখন মিশর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখনও প্রেসিডেন্ট কবি দারভীশের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একধরনের আবেগঘন সম্পর্কের কথা উঠে আসে দারভীশের প্যারিসে অবস্থানকালে ফ্রান্সে নিয়োজিত তৎকালীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রদূত লায়লা শাহিদের সাথে হওয়া বিভিন্ন সময়ের আলাপে। লায়লা শাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে তথ্যটি প্রকাশ করেছেন মিশরীয় লেখক সাইয়্যেদ মাহমুদ তার *"মাহমুদ দারভীশ ফী মিছর,আল মাতান আল মাজহুল"* গ্রন্থে।[২২৫]

প্যান-আরব জাতীয়তাবাদ দারভীশের চিন্তার তারুণ্যের সময়কালে উত্থিত একটি বিষয়। নাকবা পরবর্তী সময়ে মূলত এর উত্থানের ঘটনা ঘটে। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খালের জাতীয়করণকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ ঘটনার পর প্যান-আরব জাতীয়তাবাদী সেন্টিম্যান্ট তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মাহমুদ দারভীশ এ সময়ে 'আল-মাকী' নামের ইজরাইল কেন্দ্রিক কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। এর পর ১৯৫৯ সালে 'আল-আর্‌দ' (ভূমি আন্দোলন) নামে লড়াইয়ের নতুন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়েন মাহমুদ দারভীশ।[২২৬] মানসুর কারদুশ এবং হাবীব খুজি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এই মুভমেন্ট ছিল প্যান-আরব জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠার একটি প্লাটফর্ম। সমাজবাদী মতাদর্শ প্রভাবিত সংগঠনটির প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনের স্বাধীন ভূমি পুনরুদ্ধার করা একইসাথে ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের নিজের ভূমিতে ফিরিয়ে আনা। আল আরদ প্রতিষ্ঠার এক বছর পর ১৯৬০ সালে দারভীশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ আছাফীরু বিলা আজনিহা প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থেই দারভীশের চিন্তা ও ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটে। প্রথম তারুণ্যে দারভীশের মধ্যে আরবীয় সত্তার স্ফূরণ দেখা যায়। মতাদর্শগত দিক থেকে কম্যুনিস্ট চিন্তাধারা আরব জাতীয়তাবাদকে নিতে সমস্যা হয়নি। আরবীয় মতাদর্শ এবং তার সংস্কৃতি একটি উপায় হয়ে উঠেছিল দারভীশের জীবনে। কিন্তু দারভীশ শেষপর্যন্ত মতাদর্শের মধ্যে আটকে থাকতে পারেননি। নিছক উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

يا نسورا بعضها قصت جناحيها أياد أجنبيه

---

[২২৪]. এ এইচ এম এস অ্যালেঞ্জি, সুয়াদ, ২০১৫, পৃ. ৮৩।

[২২৫]. মাহমুদ, সাইয়্যেদ, *আল মাতান আল মাজহুল*, *ভিজিট: ২০ এপ্রিল*, ২০২৩, *https://www.jadaliyya.com/Details/42690*

[২২৬]. খাওয়াজি, হাবীব, *আল কিছছা আল কামিলাহ লি হারকাহ আল-আরদ*, (আল কুদস: মানশুরাত আল আরাবী, ১৯৭৮), পৃ. ২০৪। আজম, আহমদ জামীল, *আল শাবাব আল ফিলাস্তিনী মিন আল হারকাহ ইলা আল হিরাক (১৯০৮-২০১৮)* (ফিলিস্তিন: আল মারকাজ আল ফিলাস্তীনী লিআবহাস আল সিয়াসাত ও আল দিরাসাত আল ইসতিরাতিজিয়্যাজ, ২০১৯), পৃ.।

في السماء المغربية
فتهاوت بيد الموت تغني
بيد الموت تغني
لفظة الموت حياة في الشفاه العربية
والقلوب العربية[২২৭]

হায় শকুন, মাগরিবী আফ্রিকার আকাশে
যার কিছু ডানা কেটে দিয়েছে ভিনদেশী হাত।
অতঃপর মৃত্যুর হাতে নুয়ে নুয়ে তুমি গান গাও
তুমি গান গাও মৃত্যুর হাতে।
আরবের ঠোঁটে
আরবের হৃদয়ে হৃদয়ে মৃত্যুর ভাষাই জীবন।

কবিতাটিতে প্রকটভাবে অনুভব করা যায় সেসময়ের আরব জাতীয়তাবাদের নতুন রূপ-প্যান-আরব জাতীয়তাবাদ। যেখানে 'শকুন'কে একটি বিপরীত উপমায় শোভিত করা হয়েছে এই কবিতায়। আনাকীদ আল দিয়া নামের এই কবিতায় শকুন বস্তুত ইজরাইল বিরোধী এক আরবীয় শক্তির রূপক। সাধারণত শকুনকে শোষণ, জুলুমের প্রতীক এবং মানবতা বিরোধী রূপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু দারভীশ এই কবিতায় শকুনকে নতুনরূপে উপস্থাপন করেছেন। শকুনই মূলত আরবীয় সংস্কৃতির রূপক। আরবীয় সত্তার নির্দেশক। একজন ত্রাতা এবং রক্ষক কিংবা প্রহরী হিসেবে তার রূপায়ণ করা হয়েছে এই কবিতায়। এরসাথে এক সর্বজনীন আরব সত্তার চিত্রায়ণও ঘটেছে এই কবিতায়–যে সত্তা এবং চৈতন্য ধারণ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। মৃত্যু কিংবা লড়াকু পরিস্থিতির মুখোমুখী হওয়ার সময় এই চৈতন্য নতুন জীবন সঞ্চারের প্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

কারণ মানুষের আর সমস্ত পরিচয় নিছক ভৌগলিক পরিচয়ে হারিয়ে যেতে পারে না যেমন সত্য তেমনি কোনো বঞ্চনা আর দখলদারিত্ব তার পরিচয়ের সত্য কেড়ে নিতে পারে না। দারভীশ মনে করেন, একটি জাতি এবং তার বেড়ে ওঠার ভূমি একই সূত্রে একই পরিচয়ে গাথা। তাকে কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দখল করে, কেড়ে নিয়ে সে পরিচয় মুছে ফেলা সম্ভব নয়। ফলে দারভীশ যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সংকটে পড়েন তা ছিল বস্তুত ফিলিস্তিনী জাতি ও রাষ্ট্রের পরিচয়ের সংকট। 'بطاقة هوية' (পরিচয়পত্র) কবিতায় দ্রোহ, ক্ষোভ আর শ্লেষাত্মক ভাষায় কবির এমনই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। দারভীশের বহুলজনপ্রিয় কবিতাগুলোর অন্যতম এই কবিতা। এটি ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত ' أوراق الزيتون' (জলপাইয়ের পত্রাবলী) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। দারভীশ বলেন,

২২৭. দারভীশ, মাহমুদ, *আছাফীরু বিলা আজনিহা* (বৈরুত: দার আল আওদাহ, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৫৫।

লিখে রাখুন
আমি একজন আরব
আপনারা তো ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন
আমার পূর্বপুরুষের আঙুরবাগান
দখল করে নিয়েছেন জমি
আমার সন্তানরা মিলে যা চাষাবাদ করতাম
আমাদের নাতিপুতিদের জন্য
কিছুই রেখে যাননি
শুধু এই পাথরগুলো ছাড়া।
যেমনটি বলা হয়, আপনাদের সরকার
তাও কি কেড়ে নিয়ে যাবে?

সুতরাং!
প্রথম পৃষ্ঠার একদম উপরে লিখে রাখুন:
আমি ঘৃণা করি না মানুষ
অথবা দখল করি না অন্যের জমি
কিন্তু আমি যখন ক্ষুধার্ত
জোরদখলকারীর মাংস হয়ে যায় তখন আমার খাবার
সাবধান
সাবধান
আমার ক্ষুধা থেকে
আমার রাগ-দ্রোহ থেকে!

سجِّل!
أنا عربي
سلبتُ كرومَ أجدادي
وأرضاً كنتُ أفلحُها
أنا وجميعُ أولادي
ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي
سوى هذي الصخورِ...
فهل ستأخذُها
حكومتكمْ.. كما قيلا!؟
إذنْ
سجِّل.. برأسِ الصفحةِ الأولى
أنا لا أكرهُ الناسَ
ولا أسطو على أحدٍ
ولكنّي.. إذا ما جعتُ
آكلُ لحمَ مغتصبي
حذارِ.. حذارِ.. من جوعي
ومن غضبي!![২২৮]

এই একটি কবিতায় দারভীশ ইজরাইল-ফিলিস্তিনের সংঘাতের প্রাথমিক চিত্র এবং নাকবা পরবর্তী সময়েরর সারাংশ তুলে এনেছেন। যেখানে তার কবিতার প্রত্যেকটি শব্দ একটি দেশের রাষ্ট্রহীন হয়ে যাওয়ার মুহূর্তের জাতিগত দ্বন্দ্ব, শ্রেণি-সংঘাত ও মানবিকতার প্রচলিত ধারাগুলোকে চুরমার করে দিয়েছেন। উপনিবেশিত মানুষের বঞ্চনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারহীনতার ইতিহাসে যে দ্রোহের উচ্চারণ তা স্বাভাবিকভাবে এই কবিতায় উঠে এসেছে। দারভীশ বিক্ষুব্ধ ও প্রত্যাঘাতমূলক কাব্যিক বয়ানের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকটকে তার নিজের এবং স্বজাতির প্রত্যেকের আত্মপরিচয়ের সংকটের বিষয়ে প্রতিফলিত করেছেন। কবিতাটির বিবিধ প্রকারের পাঠ ও পাঠোদ্ধার

২২৮. দারভীশ, মাহমুদ, *আওরাক আল-জায়তুন*, *আদ দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উ'লা-১* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লিল কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮০।

সম্ভব। মার্ক্সবাদী সাহিত্যতত্ত্ব কিংবা শ্রেণি-সংগ্রামের দিক থেকে। সাবঅল্টার্ন থিওরির দিক থেকেও সম্ভব। একইসাথে উপনিবেশ বিরোধী সাহিত্যের দিক থেকে যেমন সম্ভব তেমনি সর্বোপরি ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় থেকে শুরু করে প্যান-আরব জাতীয়তাবাদের দিক থেকেও এই কবিতার গুরুত্বপূর্ণ পাঠ ও বিশ্লেষণ হতে পারে।

আত্মপরিচয়: ফিলিস্তিন, মাতৃভূমি, জীবন ও অস্তিত্বের প্রশ্ন

আরব জাতীয়তাবাদ একটি ঢেউ হয়ে এসেছিল আবার তা দ্রুত হারিয়ে যায়। কিন্তু দারভীশের কবিতায় এবং তার জীবনে তার চিহ্ন রয়ে গেছে। এই চিহ্ন এবং তার ঢেউ ফিলিস্তিনজুড়ে বয়ে গিয়েছিল এক সময়। কিন্তু এ চিহ্ন মুছে ফেলা যায় না। আরব জাতীয়তাবাদই ফিলিস্তিনের মূল লড়াই কখনো ছিল না। বরং আরব জাতীয়তাবাদকে ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠার একটি উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিল ফিলিস্তিনের জনগণ। আরবদের সম্মিলিত ঐক্য ও প্রচেষ্টা যাতে তাদের নিজেদের স্বাধীনতা ও জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যুগপৎ শক্তি হিসেবে যুক্ত হতে পারে তাই ছিল ফিলিস্তিনের অভিপ্রায়। যেখানে সর্বোপরি ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় ফিরিয়ে আনার লড়াই সবসময় সামনে ছিল। পুরো আরব অঞ্চল আর আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে এবং এক নয়। তাদের ভিন্নতা আছে। বৈচিত্র্য আছে। ঐক্যও আছে। কিন্তু আরব সংস্কৃতি এবং ভাষার কারণে আঞ্চলিক রাজনীতি বদলে যায়নি। ভাষা এক হওয়ার পরও প্রতিটি অঞ্চল এবং ভূগোলভেদে বিশেষ রাজনীতি ও স্বার্থ যেমন আছে তেমনি আছে তাদের পরিচয়। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই আরবদের মধ্যে আঞ্চলিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রকল্প বিদ্যমান রয়েছে। সুমিরীয়, মেসোপটিমিয়া, বেবিলনিয়া, মিশর, আরব উপদ্বীপ, বিলাদ আল শাম, ‘ফিলাস্তিন’ কখনো এক ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, মিশর আর মেসোপটিমিয়া কিংবা বেবিলনীয় সভ্যতার ভাষাও এক ছিল না। কালক্রমে পরিবর্তন হয়েছে তাদের ভাষা এবং রাজনৈতিক ভূগোলের সীমানা। মিশরীয়দের ভাষার পরিবর্তন কিংবা আরবী ভাষায় বিবর্তিত হওয়ার ইতিহাসও খুব প্রাচীন নয়। ফলে ভাষাগত ঐক্য কিংবা ভিন্নতা থাকুক বা থাকুক অঞ্চলভেদে জাতিয়তা এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ভিন্নতা ছিল। রাজনৈতিক-অর্থনীতি যেমন ভিন্ন ছিল তেমনি ভিন্ন ছিল তাদের নৃতাত্ত্বিক এবং জাতিগত আত্মপরিচয়। ফলে এ কথা বলার সুযোগ নাই যে, প্রাচীনকাল থেকেই ‘আরব’ নামের সর্বজনীন এবং আবহমান কোনো জাতিয়তা কিংবা সত্তা ছিল–যাতে আঞ্চলিক পরিচয়গুলো আরব নামক পরিচয়ে লীন হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত আরব জাতিসত্তা কিংবা আরবী ভাষাভিত্তিক আত্মপরিচয়ের আলোচনা অতিসাম্প্রতিক কালের একটি ফেনোমেনা। কাজে নৃতাত্ত্বিক, ভৌগলিক ও আঞ্চলিকতার দিক থেকে ফিলিস্তিনের নিজস্ব জাতিয়তার ইতিহাস যেমন আছে তেমনি তাদের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের ইতিহাসও আছে।

বস্তুত ফিলিস্তিনের জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে জায়োনিস্টদের বিপরীতে। এ গড়ে উঠার ইতিহাস সাম্প্রতিক কালের। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার দিক থেকে ফিলিস্তিনের জাতি হয়ে ওঠার কালপর্ব বেশিদিনের নয়। নূর মাসালহা মনে করেন, পনেরো শতক থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জাতিবিষয়ক আধুনিক চিন্তার দিক থেকে ফিলিস্তিনের নিজস্ব পরিচয় তৈরি হওয়া শুরু হয়। ফিলিস্তিনের নানান রচনা ও সাহিত্যের নিদর্শন থেকে *আহলে ফিলিস্তিন* কিংবা *আরদু ফিলিস্তিন* শব্দ ব্যবহারের চল ছিল। এ সময়ে তাদের পরিচয় প্রকাশের এসব ভাষাগুলোও কালক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। *আবনাউ ফিলিস্তিন* থেকে *আশ শা'ব* আল ফিলিস্তিনী' এবং আল কিয়ান আল ফিলিস্তিনী-তে বিবর্তিত হয়। আবনাউ ফিলিস্তিন মানে, ফিলিস্তিনের সন্তান, ফিলিস্তিনের জনগণ, শা'বু ফিলিস্তিন মানে ফিলিস্তিনের জনগণ কিংবা ফিলিস্তিনী জাতি। এবং আল কিয়ান আল ফিলিস্তিনী মানে, ফিলিস্তিনী সত্তা।[২২৯] তবে ১৯৪৮ সালের নাকবা ছিল ফিলিস্তিনী জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণের ভিত্তিগত সূচনাকাল। এ সময়ে দারভীশ কিভাবে ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে তার পরিচয় সংক্রান্ত অনুভূতি প্রকাশ করেছেন?

মৃত্যুর প্রলম্বিত পরিস্থিতি	حالة الاحتضار الطويلة
রাস্তায় শৈশবের হত্যাকাণ্ডগুলিতে	أرجعتني إلى شارع في ضواحي
আমাকে বার বার ফিরে এনেছে	الطفولةْ
আমাকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ঘরের ভিতর	أدخلتني بيوتاً
হৃদয়সমূহের ভিতর	قلوباً
গমের শিষগুলো	سنابل
আমাকে দিয়েছে আত্মপরিচয়	منحتني هويَّه
একটি বিষয় আমাকে দিয়েছে	جعلتني قضيَّه
মৃত্যুর দীর্ঘ পরিস্থিতি।"	حالةُ الاحتضار الطويلةْ[২৩০]

ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছেন দারভীশ কখনো প্রত্যক্ষ বা সরাসরি এবং রূপক কিংবা প্রতীকের সাহায্যে। দারভীশের প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলোতে দেখা যায়, আত্মপরিচয়ের কথা সরাসরি ব্যক্ত হয়েছে। তবে অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থে রূপক ও প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। দেখা যায় নাকবা এবং আত্মপরিচয়ের বয়ান যুগপৎভাবে এসেছে দারভীশের কবিতায়।

প্রতিটি চড়ুই, যারা মিলিয়েছে আমার হাত	كلّ العصافير التي
দূর বন্দরের দরোজায়।	لاحقت
প্রতিটি বন্দিশালা	كفي على باب المطار
প্রতিটি শাদা কবর	البعيد
প্রতিটি সীমান্ত	كل حقول القمح ،

[২২৯]. মাসালহা, নূর, *প্যালেস্টাইন: আ ফোর থাউস্যান্ড ইয়ার হিস্ট্রি*, ২০১৮, পৃ. ১৪-১৬, ১৮৮।

[২৩০]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল-দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উ'লা-২* (বৈরুত, লেবানন: রিয়াদ আল-রাঈস লিল কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

كل السجون،
كل القبور البيض
كل الحدود ،
كل المناديل التي لوّحت
،
كل العيون
كانت معي، لكنهم
قد أسقطوها من جواز
السفر
عار من الاسم من
الانتماء؟
في تربة ربيتها باليدين
؟
أيوب صاح اليوم ملء
السماء:
لا تجعلوني عبرة
مرتين
يا سادتي يا سادتي
الأنبياء
لا تسألّوا الأشجار عن
اسمها
لا تسألوا الوديان عن
أمها
من جبهتي ينشق سيف
الضياء
و من يدي ينبع ماء
النهر
كل قلوب الناس
جنسيتي[২৩১]..

প্রতিটি রুমাল যা মুছে দেয়
প্রতিটি চক্ষু
তারা সব আমার সঙ্গে মিশে আছে, অথচ
তারা এদের উধাও করে দিল পাসপোর্ট থেকে
যে মাটি দুহাতে আগলে রেখেছি চিরদিন
সেই মাটিতে নাম নেই-পরিচয় নেই?
আজ আকাশ জুড়ে আইয়্যুব চিৎকার করে বলল:
দ্বিতীয়বার আর আমায় অশ্রু করো না!
হায় জনাব! হায় নবীদের সরদার!
বৃক্ষদের কাছে তাদের নাম জানতে চেয়ো না।
উপত্যকাদের কাছে জানতে চেয়ো না
তাদের উৎস পরিচয়
আমার ললাট থেকে শ্বাস নিচ্ছে
আলোর তরবারি।
আমার হাত থেকে প্রবাহিত হয় নদীর পানি।
মানুষের সকল আত্মাই আমার জাতসত্তা।
সুতরাং তোমরা বরং আমার কাছ থেকে
পাসপোর্ট নিয়ে যাও।

২৩১. দারভীশ, মাহমুদ, *হাবীবাতি তানহাদু মিন নাওমিহা*, *আল-দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উ'লা-১* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লি আল-কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৭১।

২৩২. দারভীশ, মাহমুদ, *হাবীবাতি তানহাদু মিন নাওমিহা*, *আল-দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উ'লা-১* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লি আল-কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৭১।

পঙক্তিগুলো جواز السفر (পাসপোর্ট) কবিতার। এখানে দারভীশ তার দেশ-প্রকৃতি, ধর্ম-সংস্কৃতি ও জীবনঘনিষ্ঠ বিচিত্র দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে পরিচয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটি ১৯৫৯-১৯৬৪ এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ এর দুর্যোগের সময় যে বছর দারভীশের পরিবার লেবাননে পাড়ি দেন সেই বছর ইজরাইলকর্তৃক ফিলিস্তিনে আদম শুমারি হয়। এ সময় তারা ইজরাইলে ছিলনা। না থাকায় অনেক আরবের মতো তাদের নামও আর খাতায় নিবন্ধিত হয়নি। পরবর্তীতে ইজরাইলভিত্তিক কম্যুনিস্ট পার্টি রাকাহ'য় যোগ দিলে দারভীশের বসবাসের বৈধতা মিলে। আইডেন্টিটি কার্ড এবং পাসপোর্ট নিশ্চিত হয়। কবি যখন এই কবিতা লিখছিলেন তখন মার্ক্সীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন; এই কবিতায় স্পষ্ট এর ছাপ রয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তখনকার চলমান সংকটের যথার্থ দলিল এই কবিতাগুলো।

বিত্বকাতুন হুভিয়্যাহ বা পরিচয়পত্র নামের এই কবিতার বিপরীতে *পাসপোর্ট* কবিতায় ভিন্ন অভিব্যক্তিতে হাজির হন দারভীশ। কবি মনে করেন, নিছক কাগুজে একটি পাসপোর্টের মধ্যে মানব সত্তা এবং তার পরিচয় নির্ধারণ করার বাস্তবতা স্থূল ও খণ্ডিত। দেহ প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছুই নয় বলে দারভীশ এখানে চেকপয়েন্টে টহলরত ইজরাইলের সেনাকর্মকর্তাদের প্রতি শ্লেষ প্রকাশ করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে ইজরাইলের রাজনৈতিকতা জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পরিচয়ের ভিত্তিতে যে নির্বিচার বৈষম্য তৈরি করেছে কবি তারই সমালোচনা করেছেন এই কবিতায়। *পরিচয়পত্র* কবিতায় দারভীশ ইজরাইলের বিপরীতে আরব জাতীয়তাবাদের আওয়াজ তোলেন। একইসাথে অন্যায় ও বিভাজিত রাজনীতির বিরুদ্ধে মজলুম শ্রমিক শ্রেণির দ্রোহের ভাষায় ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় তুলে ধরেছেন কবি। অপরদিকে পাসপোর্ট কবিতায় বর্ণবাদসর্বস্ব জায়োনবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিপরীতে কবি বর্ণবৈষম্যহীন মানুষের চিত্র এঁকেছেন। এঁকেছেন এমন এক ভূমির ছবি যেখানে তার অধিকার বিশ্লেষিত হয়েছে প্রকৃতি ও মানবিক বোধের অবিমিশ্র ভাষায়। ইজরাইল কর্তৃক আরবদের উপর পাসপোর্টজনিত হয়রানির বিপদ ছিল এই কবিতার শানে নযুল। কবি তাই বলেন, বৃক্ষকে প্রশ্ন করো না তার নাম নিয়ে, উপত্যকাদের তাদের জন্ম পরিচয়ের জন্য তাদের উৎস নিয়ে প্রশ্ন করো না। কারণ এইসব প্রশ্ন-পরিচয় সাম্প্রদায়িকতার। বর্ণবাদের। বিভাজনের। এই প্রশ্ন সর্বজনীন মানবিক সম্পর্কের নয়। কবির কাছে মানুষের পরিচয় হৃদয়ের। আত্মিকতার। বৃক্ষদের–পাখিদের জন্ম আছে—তাদের জন্মভূমিও আছে। তাকে তার মধ্যেই থাকতে দাও। কারণ তাকে নিছক রাজনীতি করে, পরিচয় নির্ধারণ করে ভাগ করে ফেলা যায় না। জন্মভিটা থেকে তাদের উচ্ছেদ করা যায় না। তুলনামূলক যুক্তি দিয়ে দারভীশ বলেন, পাখি, নদী কিংবা বৃক্ষের যেমন জন্ম আছে জন্মভূমি আছে তেমনি মানুষেরও জন্ম ও জন্মভূমি আছে। এই মানুষই ফিলিস্তিনী মানুষ। যাদের জন্মভূমি দখল করে কেড়ে নিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। কবিতার ভাষাগত কৌশলের আশ্রয়ে কবি মৃদুস্বরে স্বজাতির আত্মপরিচয়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করে গেছেন। একধরনের সর্বজনীন এবং প্রাকৃতিক পরিচয়ের তুলনাগত বয়ান হাজির করার মাধ্যমে কবি পরিচয়ের সত্যযুক্তি তুলে ধরেছেন শক্তিশালী ভাষায়। যেখানে কবির প্রবল আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠেছে। দারভীশ তাই ফিলিস্তিনের মাটিতে নিজের লুণ্ঠিত নাগরিক সত্তা

পুনরুদ্ধারের বাসনায় প্রকৃতি আর মনুষ্যত্বের বিশ্বজনীন সম্পর্কের চিত্র তুলে এনেছেন। ইজরাইলী হানাদারদের উদ্দেশ্যে *আনিল আমানিয়্যাত* কবিতায় কবি তাই বলেন,

বন্ধু!
জেনে রাখো, ভোলগায় কখনো নীল ঢুকে
পড়বে না
ফোরাতে কখনো ঢুকবে না কঙ্গো, জর্ডান
প্রতিটি নদীরই রয়েছে নিজস্ব স্রোতধারা,
গতিপথ এবং জীবন
বন্ধু!... আমাদের ভূমি বন্ধ্যা নয়
প্রতিটি ভূমি, এবং তারও রয়েছে জন্ম।
প্রতিটি ভোর, এবং তারও রয়েছে উত্থানের
নির্ধারিত মুহূর্ত।

يا صديقي
لن يصيب النيل في الفولغا
ولا الكونفو , ولا الأردن ، في
الفرات
كل نهر ، وله نبع ... ومجرى...
! وحياة
يا صديقي! .. أرضنا ليست بعاقر
كل أرض ولها ميلادها ، كل فجر
وله موعد ثائر ![২৩৩]

বলা বাহুল্য, আইডি কার্ড আর পাসপোর্ট এক নয়। একটি নিজ দেশে ব্যবহারের জন্য। অন্যটি অপর দেশে ব্যবহারের জন্য। এতে বুঝা যায়, ইতিমধ্যে দারভীশের মতো তার দেশের অসংখ্য নারী-পুরুষ মাতৃভূমিতে দেশহীন-রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েছেন; তাই তাদের পূর্বপরিচয় আইনগতভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে তাদেরকে ফিলিস্তিনে আসতে হলে অপর দেশের শরণার্থী হিসেবে পাসপোর্ট সঙ্গে করে আসতে হয়। মোটকথা, পরিচয়ের অভিব্যক্তি দারভীশের কবিতায় দুটি অবস্থা থেকে উঠে আসছে। একটি ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে এবং অপরটি ফিলিস্তিনের বাইরে থেকে অর্থাৎ নির্বাসন কিংবা শরণার্থী শিবির থেকে। নির্বাসন এবং শরণার্থিতা দারভীশের কবিতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বিষয়। দুইটি অবস্থারই ভরকেন্দ্র দেশ এবং পরিচয়। দেশমাতৃকার এ পরিচয়ের বিয়োগ পরিবেদনাকে কেন্দ্র করে নির্বাসন, প্রস্থান, মৃত্যু, শরণার্থিতা ও ক্ষত-বেদনা, মানসিক আঘাত নানা মাত্রায়, বিচিত্র আঙ্গিকে, রূপক-প্রতীকের ব্যঞ্জনায়, দার্শনিক-অধিবিদ্যাগত ভাবময়তায়, আধ্যাত্ম চেতনায় এবং বিশ্বজনীন চৈতন্যের মধ্যদিয়ে দারভীশের কবিতায় বিপুল বিস্তার পেয়েছে।

ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়—এটি এমন একটি বিষয় যা শুধু একক কোনো বৈশিষ্ট্যের মধ্যদিয়ে অর্জিত হয়না। শুধু যেমন ভাষার মাধ্যমে আত্মপরিচয় সম্ভব হয়ে ওঠেনা, তেমনি এককভাবে ভৌগলিক জাতিয়তার কারণেও হয়ে ওঠে না। জাতিয়তা–কিংবা ভাষা অপরিহার্য হলেও এর সংরক্ষণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ কিংবা দেশমূলক ধারণা ও উপলব্ধি। তাহলে দারভীশের কাছে দেশ কেমন? কিংবা তার ধারণা? দেশের ধারণা কিংবা উপলব্ধি ছিল মূলত দেশকে ক্রমাগত মূর্ত করে তোলার মতো একটা ব্যাপার। দেশকে যেমন আবেগ দিয়ে অনুভব করা যায় কিংবা

[২৩৩]. দারভীশ, মাহমুদ, *আওরাক আল-জায়তুন (জলপাইয়ের পত্রাবলী)*, *আল-দীওয়ান*, *আল আ'মাল আল-উ'লা-১* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লিল কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

আবেগের মধ্যদিয়ে দেশাত্ববোধ প্রকাশ করা যায় তেমনি দেশ শুধু প্রেম নয় অপরিসীম সংবেদনশীলতার মাধ্যমে দেশ বাস্তব হয়ে উঠতে পারে। ফলে দেশ গড়ে তোলার–নির্মাণ করারও একটি বিষয়।[২৩৪]

দেশ যেহেতু ইতিমধ্যে ভৌগলিকভাবে বিদ্যমান তারপরও কেন মূর্ত করে তোলা—বাস্তব কিংবা কার্যকর করে তোলা—অথবা নির্মাণ করা'র মতো প্রশ্ন আসে? দারভীশের দেশ ফিলিস্তিন কার্যত নেই। নাকবার মর্মন্তুদ স্মৃতির মধ্যে গায়েব হয়ে আছে সেই ফিলিস্তিন। ১৯৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত যে ফিলিস্তিন ছিল ইজরাইলি হামলা এবং তাদের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর সেই ফিলিস্তিন আর একরকম থাকেনি। নিজের বাড়ি-ঘর-গ্রাম সবকিছু হারিয়েছিলেন দারভীশ। ফলে সেই দেশের অনুভূতি স্বাভাবিক হবে না। যা হারিয়ে গেছে তা ফিরিয়ে আনা কিংবা গড়ে তোলার নামই হলো দেশ। অথবা সেই দেশকে ক্রমাগত বর্তমানের লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে উপলব্ধ করার নামই হলো দেশ।[২৩৫] অর্থাৎ ফিলিস্তিন নাকবার সময় যে অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিকভাবে অতিক্রম করেছিল সেসব অভিজ্ঞতা স্বদেশবোধ ও চৈতন্যকে নতুনভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নীত করতে সক্ষম। এসব অভিজ্ঞতা কিংবা বাস্তব ঘটনা ও প্রেক্ষিতগুলোই বস্তুত দারভীশের দেশমাতৃকার আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে পারে। জায়োনিস্টদের নির্যাতন, জুলুম, দখলদারিত্ব, উচ্ছেদ-বিতাড়ন, নির্বাসন, জীবন-জীবিকার করুণ চালচিত্র, দু:খ-যন্ত্রণা, ক্ষোভ-শোক এবং মানবেতর জীবনসহ নানা উৎসঙ্গের ভিতর দিয়ে ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতগুলোর পুনর্বয়ানে জীবন্ত করে তুলেছেন দেশাত্ববোধ কিংবা ফিলিস্তিনের সংবেদী জাতিসত্তার স্বরূপ। কয়েকটি অনুষঙ্গ তুলে ধরা হলো:

৩.৪.১: নির্যাতন-জুলুম

নাকবার নেতিবাচক প্রভাবে জর্জরিত ছিল ফিলিস্তিন। জুলুম-নিপীড়নের চূড়ান্ত পরিস্থিতি চেপে বসে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর উপর। এটি ছিল মূলত নাকবার সময়কার অবস্থা। ১৯৪৮ পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনের সামগ্রিক অবস্থার করুণচিত্র দারভীশের কবিতায় ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে। নাকবা পরবর্তী সময়েও একই অবস্থা অব্যাহত রয়েছে ফিলিস্তিনজুড়ে। ফিলিস্তিনীদের উপরে ইজরাইলের জায়োনবাদী নির্যাতনের নির্মমচিত্র দারভীশের কবিতার বিশেষ উপজীব্য। প্রথম দিককার কাব্যগ্রন্থগুলোতে ইজরাইলী জুলুম নিপীড়নের এমন চিত্র বিপুলভাবে বিবৃত হয়। *আন ইনসান* বা মানুষ বিষয়ক কবিতায় জায়োনবাদী নির্যাতনের চিত্র উঠে আসে এইভাবে–

---

[২৩৪]. মকবেল আল আরেকি, রাশেদ মোহাম্মেদ, *"হোম, হোমলিনেস এন্ড সার্চ ফর আইডেন্টিটি ইন মাহমুদ দারভীশ'স পোয়েট্রি"*, *ইন্টারন্যাশনা জার্নাল অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং*, *আগস্ট সংখ্যা*, (ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংগ, ভল: ১, সংখ্যা: ১, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৩৩।

[২৩৫]. ফারহান, *মোহাম্মদ*, *কনস্ট্রাকশন অফ হোম ইন দি পোয়েট্রি অফ মাহমুদ দারভীশ এন্ড আলী আহমদ সাঈদ এসবার: আ কম্পেরাটিভ স্টাডি*, (আলিগড়: *আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়*, *ভিজিট:* *https://www.academia.edu/37477011/Construction_of_Home_in_the_poetry_of_Mahmoud_Darwish_and_Adonis*), পৃ. ৩।

وضعوا على فمه السلاسل
ربطوا يديه بصخرة الموتى ،
و قالوا : أنت قاتل !
أخذوا طعامه و الملابس و البيارق
ورموه في زنزانة الموتى ،
وقالوا : أنت سارق !
طردوه من كل المرافيء
أخذوا حبيبته الصغيرة ،
ثم قالوا : أنت لاجيء ![২৩৬]

তারা তাদের মুখ বেঁধে রাখলো শিকলে
তারা তার হাত বেঁধে রাখলো মৃতের শিলাস্তুপে
তারা বললো- তুমি খুনি।
তারা তার অন্ন, বস্ত্র, পতাকা কেড়ে নিয়ে
ফেলে দিলো মৃতদের গহীন গহবরে।
তাড়িয়ে দিয়েছে তারা তাকে প্রতিটি বন্দর থেকে।
তারা নিয়ে গেছে তার কিশোরী বান্ধবী
এরপর বললো: তুমি শরণার্থী।

উদ্ধৃত কবিতার পঙক্তিগুলোতে ইজরাইলী নিপীড়নের কিঞ্চিত নজির দেখা গেল। তবে কবিতার ভাষাগুলো অলংকারে ভারাক্রান্ত নয়। সরাসরি এবং হৃদয়স্পর্শী। ফলে সাধারণ মানুষের ভিতর কবিতাগুলো সহজেই দাগ কাটে। তদুপরি দারভীশ ভাষার সারল্য সুসংহত রেখেই শৈল্পিক মান অক্ষুন্ন রেখেছেন। এ ধরনের কবিতাগুলোতে রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। শত্রু বেষ্টনীর মধ্যে অসংখ্য ফিলিস্তিনীর মতো কবিরও জীবন যাপন। তাকে গ্রেপ্তার করা, না করা সমান কথা। এই ভাবচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তাতে জায়োনবাদী সেনা বেষ্টিত পুরো আরব ফিলিস্তিনীদের শ্বাসরুদ্ধকর জীবন যাপনের করুণ চিত্র স্বার্থকভাবে ফুটে ওঠেছে। *আল সিজনু ওয়া আল কমার* বা কারাগার ও চাঁদ কবিতায় ইজরাইলী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের আবেগময় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। দারভীশের অসংখ্য কবিতায় জায়োনবাদী হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কখনো

---

২৩৬. মাহমুদ দারভীশ. *আল দীওয়ান: আল আ'মালুল উলা-১.২০০৫*. পৃ. ২০, ২১।

সরাসরি কখনো উপমা ও প্রতীকের আশ্রয়ে। এই সব হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ দলীল দারভীশের কবিতা। কারণ যখনই ঘটনা ঘটছে তখনই দারভীশ কবিতা লিখেছেন। দারভীশ বলেন:

أنا شاهد المذبحة
وشهيد الخريطة[২৩৭]

আমিই হত্যাকান্ডের সাক্ষী
এবং আমিই মানচিত্রের শহীদ।

৩.৪.২: দু:খ-ব্যথা

হৃদয়ের যন্ত্রণা, দুঃখ, কান্না প্রকাশ করার মতো অবস্থাও নেই। এক শ্বাসরুদ্ধকর সময়। কান্নারা শুকিয়ে যায়। হৃদয় বোবা হয়ে যায়। চেহারাগুলো যেনো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়। চারদিকে বারুদের গন্ধ, ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশ, বোমার গর্জন, বুলেটের শব্দ, বাবার চেহারা ঝলসে গেছে, ভাইয়ের খোঁজ নাই। যুবতী বোনের শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে রাস্তার পাশে পাথরের নিচে। মা কখনো জানালার শিক ধরে তাকিয়ে থাকে, কখনো বোবা বেদনায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, চুলোয় আগুন জ্বলে না অনেক দিন। মাঝে মধ্যে ত্রাণ সামগ্রীর বিরল করুণা। রাস্তায়, অলি-গলি, এখানে-ওখানে পড়ে আছে ছেঁড়া হাত, পা, গলিত লাশ, গর্ভধারিণী নারীর পেট থেকে ছোরা ঢুকিয়ে সন্তান বের করে আনার গা কাঁটা দিয়ে ওঠা ঘটনা। ধর্ষণ করে জলপাইয়ের ডালে ঝুলিয়ে রাখার দৃশ্য। আরো কতো অজানা নির্যাতনের ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে কে জানে। যেখানে একটু হাসির দৃশ্য খুবই বিরল। হাসি, সুখ, কল্পনাতীত বিষয়। বন্দুকের নল, বুলডোজার, ট্যাংক, গোলা গৃহহীন খোলা আকাশ। এসব কিছুর মধ্যেই ফিলিস্তিনীদের জীবন যাপন। এর মধ্যে একটু গান, একটু সুর যেন মুখগুলোর মলিনতা দূর করে হাসি ফোটাবার সুযোগ করে দেয়। সেই গান, সেই সুর, কবিতা সরাসরি সহজেই তাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কবিতা, গান আর সুরেই যেনো নিজেদের খুঁজে পায় তারা। নিজেদের হাসি কান্না মিলিয়ে নিতে পারে তারা এখানেই, বেদনাত্মক মর্মস্পর্শী সুরের মূর্ছনায়। পৃথিবীর কেউ তাদের কথা বলুক আর নাই বলুক, কেউ শুনুক আর নাই শুনুক– কবিতা, গান আর সুরই তাদের হাতছানি দেয়। এখানেই তারা জীবন খুঁজে পায়। এই ভাষাই তাদের জীবনের অস্তিত্বের কথা বলে, মাটির কথা বলে। স্বাধীনতার কথা বলে। আর এই সুর, এই ভাষা, কবিতা ও ছন্দের জগৎ যিনি নির্মাণ করেন তিনিই কবি। অন্তত ফিলিস্তিনীদের জন্য মাহমুদ দারভীশ। কবি জায়োনবাদী হামলায় প্রতিরোধ করতে যাওয়া এক ফিলিস্তিনীর আত্মত্যাগের বনর্ণায় গতিময় কাব্যিক বর্ণনায় কবি একদিকে স্বজন হারা কান্নার অশ্রুঝরা গীত গেয়েছেন। অপরদিকে কবি ভয়ে সতর্কতায় উজ্জীবনের গানে সুর বেঁধেছেন।[২৩৮]

---

[২৩৭]. মাহমুদ দারভীশ. *আল দীওয়ান: আল আ'মালুল উলা-২.* ২০০৫. পৃ. ২৯৩।

[২৩৮]. হোসেন, শাহাদাৎ, *মাহমুদ দারভীশের কবিতাঃ ভাব ও বিষয় অনুষঙ্গ*, পৃ. ৫৬।

দুঃখে ক্ষোভে একজন ফিলিস্তিনী এইভাবেই তার স্বজন হারানো যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। কবির ছন্দে রোদন আর এই কান্না চাপা ক্ষোভে আত্ম যন্ত্রণায় উপচে ওঠে–কিন্তু এই ক্ষোভ, এই ব্যাথা কোথায় প্রকাশ করা যায়? কতোটা বলা যায়। শোক কখনো ক্ষোভ, কখনো ভর্ৎসনা আর কখনো শান্ত্বনা খোঁজে কবির ভাষায়। কবি তখন কথা বলেন প্রকৃতির সাথে, দেশ, মাটি, অস্তিত্ব আর সময়ের অনুষঙ্গ নিয়ে কবি আক্ষেপে প্রশ্ন করেন বন্ধুর সাথে। কবি বলেন,

غابة الزيتون كانت مرة خضراء
كانت – والسماء
غابة زرقاء ---كانت يا حبيبي
ما الذي غيرها هذا المساء؟

জলপাইয়ের বন একবার সবুজ ছিলো
এবং আকাশ ছিলো
নীল জঙ্গল ... হায় প্রিয় বন্ধু
এই সন্ধ্যাই কি তা বদলে দিলো?[২৩৯]

এখানে কবি সন্ধ্যা শব্দটির রূপকে শত্রুপক্ষের চরিত্র প্রকাশ করেছেন, যারা সন্ধ্যার মতো ধুসর, অন্ধকার, তাদের হিংস্র অশরীরী প্রকৃতি, আকাশ ও জীবনের সবুজ সজীবতাকে মলিন করে দিয়েছে। পাল্টে দিয়েছে তার আদি প্রকৃতি, আসল মুখশ্রী।

تشهّيت الطفوله فيك.
مذ طارت عصافير الربيع
تجرّد الشجر
وصوتك كان، يا ماكان،
يأتي
من الآبار أحيانا
و أحيانا ينقطه لي المطر
نقيا هكذا كالنار
كالأشجار.. كالأشعار
تعالي
كان في عينيك شيء أشتهيه
و كنت أنتظر
وشديني إلي زنديك
شديني أسيرا

---

২৩৯. প্রাগুক্ত. পৃ. ২২৪.

منك يغتفر
تشهّيت الطفولة فيك
مذ طارت
عصافير الربيع
!تجرّد الشجرّ
-৩-
و نعبر في الطريق..
..مكبلين
كأننا أسرى
يدي، لم أدر، أم يدك
احتست وجعا
من الأخرى[২৪০]

আমি তোমার ভেতর ভালোবাসি শৈশব।
যখন উড়ে যেতো বসন্তের চড়ুই
উদোম হতো বৃক্ষ
তোমার কণ্ঠ ছিলো কিংবা ছিলো না
আমার কাছে আসতো তোমার কণ্ঠ
কখনো কূপগুলোর ভেতর থেকে
কখনো আমার জন্য বৃষ্টি তাতে ফোঁটা দিতো
পরিস্কার এমনই আগুনের মতো
বৃক্ষের মতো...বৃক্ষের মতো মুষলধারে ঝরতো।
তোমার চোখে ছিলো এমন কিছু যা আমি গভীর ভাবে চাইতাম
আমাকে বেঁধে রাখো তোমার জ্বলন্ত কাঠিতে
আমাকে বেঁধে রাখো বন্দী করে
যার মুক্তি তোমার কাছে
আমি তোমার ভেতর ভালোবাসি শৈশব
যখন উড়ে যায়
বসন্তের চড়ুই
উদোম হয়ে যায় বৃক্ষ।

৩
এবং আমরা রাস্তার ভেতর দিয়ে পার হই

২৪০. মাহমুদ দারভীশ, আদ্দীওয়ান- আল আ'মালুল উলা-১. ২০০৫. পৃ. ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭

পায়ে ডান্ডাবেড়ি পরা
কারাবন্দীদের মতো।
আমি বুঝি না, আমার হাত নাকি তোমার হাত
ব্যাথা অনুভব করে
অন্য হাতের।

৩.৪.৩: জীবন জীবিকা

১৯৪৮-এ যে দুর্যোগের সূচনা হয়েছিলো ফিলিস্তিনীদের জীবনে তার সমাপ্তি এখনো ঘটেনি। মাঝে মধ্যে নানা চুক্তি, রাজনৈতিক আপোস-রফা ও কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়নের ফলে দুর্যোগের কিছুটা হ্রাস প্রাপ্তি হয়। তবে ৪৮' থেকে ৮২ পর্যন্ত সময়কালকে দুর্যোগের বড় ব্যাপ্তি আকারে দেখা হয়। কারণ এসময়ে চারটি আরব ইসরাইল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। '৫৬'র কাফার কাসেমে ইসরাইলের ভয়াবহ হত্যাকান্ড, ৭৯'র পর থেকে লেবাননের উদ্বাস্তু শিবিরে ক্রমাগত আক্রমণ, '৮২'র শাবরা-শাতিল গণহত্যাসহ এসময়ে আরো বহু জঘন্যতম ঘটনা ঘটে। '৪৮'র পর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ইসরাইলের হাতে চলে আসায় ফিলিস্তিনীদের মাঝে সবচেয়ে বড় দুর্যোগ নেমে আসে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। তাদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্র মারাত্মক সংকটে পতিত হয়। ক্ষুধা-দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করে। জায়োনবাদী আগ্রাসন, আক্রমণ ও নির্যাতনের সবচেয়ে বড় আঘাত ছিলো তাদের জীবিকার পথগুলো রুদ্ধ করে দেয়া। ফলে হাজারো ফিলিস্তিনীকে তারা কেবল না খাইয়ে হত্যা করে। যদিও আরব বিশ্বসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তৎপরতা ছিলো। মাহমুদ দারভীশের কবিতায় সেইসব দুর্যোগের করুণ চিত্র ফুঠে উঠেছে। আবেগময় ভাষা, অশ্রুভেজা সুর, ক্ষোভ, শ্লেষ আর দ্রোহের সংমিশ্রণে দারভীশের কবিতায় উঠে আসে ফিলিস্তিনীদের জীবন জীবিকার সংগ্রাম

উপরে উদ্ধৃত কবিতার সহজ উপস্থাপনে শিল্প ও অলংকারের আধিক্য নেই। এটি একটি বক্তব্য প্রধান কবিতা। ফলে বিচারের পদ্ধতি কবিতার প্রকরণগত জায়গা থেকেই হবে। অতি সাধারণ ভাবে দারভীশ তার ভাব প্রকাশ করেছেন। দাড়ি কাটলেন, সেন্ডেল মুছলেন। এরপরের চিত্রটি একেবারেই ভিন্ন। বন্ধু থেকে পোশাক ও টাকা ধার নিলেন প্রিয়জনের জন্য কফি এবং মিষ্টি কিনতে। এই পর্যন্ত বলে কবি থামলেন। উদ্ধৃতির প্রথম এবং শেষ পঙক্তির শেষে বিস্ময়কর চিহ্ন দেয়া আছে। এই দুটি বিস্ময়কর চিহ্ন বক্তব্যটিকে আর সাধারণ জায়গায় রাখেনি। একজন মানুষের গভীরে কতোখানি যন্ত্রণা লুকায়িত আছে তারই প্রকাশ ঘটেছে এখানে। সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তার দুঃখ, আবেগ, অভিব্যক্তি যে সহজ-সাবলীল ভানমুক্ত অকৃত্রিম ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন কবি তাদের ভঙ্গিতেই কথা বলেন। দারভীশ তার কাব্য ভাষা সেখান থেকেই ধারণ করেছেন। কিন্তু এই প্রকাশ যতোটা সাধারণ ও সহজ ততোটাই গভীর। খুবই সূক্ষ্মভাবে শে- ষাত্মক ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে তাতে। এই

ক্ষোভের অভিব্যক্তি এসেছে জীবনের গভীর মর্মন্তুদ দুর্যোগময় অবস্থা থেকে। এই দুর্যোগ কবির একার নয়। কারণ কবি এখানে তার সময়ের পুরো আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের প্রতীক মাত্র। যাতে সুস্পষ্ট ইংগিত নির্দেশ করে তার সমসাময়িক ফিলিস্তিনের বাস্তবতার। পরের বক্তব্যে এটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যদেরকে হাসতে দেখে গভীর মর্মবেদনায় কবির অন্তর্জগত বলে ওঠে আমরাও হাসবো। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, আর জীবন জীবিকার সামগ্রিক অবস্থাকে ইঙ্গিতময় করে তোলেন তার কবিতায়।

কবিতাটি মূলত মাতৃভূমি ফিলিস্তিনকে সম্বোধন করে রচিত। ফলে ফিলিস্তিনের জনগোষ্ঠীর দুঃখ দুর্দশার চলচ্চিত্র আর প্রকৃতিময় আবেগঘন চিত্রকল্প তার কবিতার উপজীব্য হয়ে ওঠে। উদ্ধৃত পঙক্তিগুলোতে এক দিকে যেমন গৃহহীন নির্বাসিত ফিলিস্তিনীদের চিত্র দেখা যায় তেমনি দেখা যায় কর্মহীন মানুষের বেদনাময় দৃশ্য। ঘর ছিলো অথচ ঘর নাই, ছাগল ছিলো, জীবিকার নানা উপায় ছিলো কিন্তু এখন ঘর বাড়ি স্বদেশ ছেড়ে তাড়িত হয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে জীবন কাটায়। মানবেতর জীবন। তবু কি জীবিকার সন্ধানে লোকালয়ে আসতে পারে? নিজ দেশে পরদেশী একজন ফিলিস্তিনীর পক্ষে সহজে তা সম্ভব নয়। কারণ তাকে ধরে নিয়ে যাবে ইসরাইলী হানাদাররা। এভাবেই কর্ম, জীবন, বাস্তুহারা, ক্ষুধা, জীবিকা, বাঁচার লড়াই, আর রক্ত, খুন, হাতকড়া, বুলেট, বোমা ও বুলডোজারের মুখোমুখী হওয়াই তাদের যেনো নিয়তি। তবু জীবন ফিরে ফিরে আসে- মাটিতে, অস্তিত্বে।

দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনীদের দুঃখ, দুর্দশার চিত্রগুলো তুলে ধরার প্রয়াস ছিলো। মূলত এটি ছিলো '৪৮ এর দুর্যোগের বিপরীত বা বিপর্যয়কর দিক। কিন্তু এর কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে। কারণ দুর্যোগ থেকেই তারা নতুন দৃষ্টি খুঁজে পায়। দুর্যোগের অমানবিক নিষ্ঠুর পরিস্থিতির ভেতর থেকেই তারা দাঁড়াবার চেষ্টা করে। বিপর্যয় রোধ করে তারা জীবনের নতুন পথ সন্ধান করে। দুর্যোগের ভীতিকর ও অমানবিক অবস্থাই তাদের ভেতর সাহসের সঞ্চার করে। ফলে দৃশ্যত কবি দারভীশ তার সময় ও বাস্তবতাকে যেমন কাব্যময় রূপ দিয়েছেন তেমন কবি দুর্যোগ কবলিত নিপীড়িত মানুষের ভেতর হানাদার শত্রু বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভকে বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্যাপক অর্থে পরিগঠন করারও চেষ্টা করেন। কারণ দারভীশের কাছে কবিতা, ভাষা, তার জীবন ও অস্তিত্বের প্রধান অংশ। কবিতা নিছক কোনো, নান্দনিক বা বিনোদনের বিষয় ছিলো না তার কাছে। এমন কি দারভীশ কবিতা ও ভাষাকে প্রচার সর্বস্ব বিষয় হিসাবে দেখাকে পুরোপুরি নাকচ করে দেন[২৪১]। কবিতা, ভাষা ও জীবন অবিচ্ছেদ্য। কবিতায়, ভাষায় মানুষ তার সম্ভাবনা তৈরি করে। কবিতা এবং ভাষা মানুষের অনাগত কাল নির্মাণের তাৎপর্যপূর্ণ চাষভূমি। নতুন অর্থ, নতুন ধারণার গর্ভময় সত্ত্বা বহন করে ভাষা ও কবিতা। ফলে কবিতা নিছক আর কবিতা থাকে না দারভীশের কাছে। জীবনের অপরিহার্য অংগ হয়ে ওঠে। মানুষ লড়াই করে অধিকার আদায়ের

---

[২৪১]. আল বিদায়াহ, লাও আন নাল আম্বিয়া আক্বল- ইলহাহা. ড. আদিল আল আসত্বহ.– http://hashm.logu2.com/montada-f7/topic-t105.htm

জন্য। কবিতাও তেমনি সমান তালে লড়াই করে। দারভীশ তার জীবন্ত উদাহরণ। দুর্যোগের দিনগুলোতে তার কবিতা সাহস আর আশাবাদ তৈরি করে। সাহস, আশাবাদ, ক্ষোভ, দ্রোহ, প্রেম ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান পায় তার কবিতায়। বিপদসংকুল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফিলিস্তিনের মানুষ যখন সহায় হারিয়ে ফেললো, হতাশা নেমে আসলো জীবনে। যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেই নিজের জীবন বাঁচার পথ খুঁজে পায়না এমন পরিস্থিতিতে কবি আশাবাদ ছড়াবার চেষ্টা করলেন।

ইজরাইলী আগ্রাসনে চতুর্দিকে অসংখ্য ফিলিস্তিনী গৃহহীন হয়ে পড়েছে। খুন হচ্ছে, কেউ ভাই হারাচ্ছে কারো বাবা চির দিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। কারো জীবনের মহা সম্পদ মা'র লাশ গলছে দেয়ালে কাছে। কারো প্রিয়তম বোনের লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে জলপাইয়ের নিচে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন আর মৃত্যু যেনো হাতের মুঠায়। মানুষ তার ভাষা হারিয়ে বাক রুদ্ধ হয়ে পড়ে। শোকে ক্ষোভে নির্বাক হয়ে যায় সবাই। কবি দারভীশ তখন মাত্র আঠারো-বিশ বছর বয়সের। এই দৃশ্য দেখে কাউকে শান্ত্বনা দেয়া কঠিন। কারণ সবাই একই সমস্যার মধ্যে। বিশ বছর বয়সের দারভীশ তখন সমবেদনা, সাহস আর জেগে উঠার বাণী নিয়ে আসেন। কবি বলেন,

وزرعت أزهاري
في تربة صماء عارية
بلا غيم ......وأمطار[242]

আর আমার ফুলগুলো চাষ করেছি
বধির, মুক্তখোলা মাটির ভেতর
মেঘহীন.....বৃষ্টিহীন।

শোকে, বেদনায় নিস্তব্ধ, বোবা, বধির এই মেঘ-বৃষ্টিহীন অনুর্বর মৃত্তিকায় কবি যাদেরকে কবর দিলেন কবি বলেন আমি তাদেরকে কবর দিইনি। আমি তাতে পুঁতে দিয়েছি ভবিষ্যতের বীজ, নতুন শস্য, নতুন ভ্রণ। এই অনুর্বর মাটিতে চাষ করে তুলে আনা ফসল দিয়ে আবার আমরা প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলবো। আমাদের এই চাষাবাদ অনন্ত।

সাধারণ ও সহজ মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ গমের শীষ, তামাটে বুক, খঞ্জর এইসব কৃষকের চিত্রকল্পের সাথে সাথে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতীকি আচার ক্রুশকে কবিতার অনুষঙ্গ করে কবি তার নতুন কাব্য কাঠামো নির্মাণ করেন। কবি শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষের যে প্রাচীর গড়ে তোলার আহবান জানালেন তার সাথে আছে সাহস আর দ্রোহের আগুন। আধুনিক কাব্যের গতিশীল মাত্রায় লেখা এ কবিতার পঙক্তিগুলোতে দারভীশের দ্রোহ যেমন টগবগে উপচে পড়েছে তেমনি তার প্রেমবোধের উপস্থিতি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ তিনি মানুষকে ঘৃণা করেন না। এখানে মানুষ বলতে ইহুদীদের বুঝিয়েছেন কবি। জনৈক ইসরাইলী তলবকারী পুলিশের কবির পরিচয়পত্র চেক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা এই কবিতা। দারভীশ ইসরাইলের মানুষ মাত্রই তার শত্রু, কখনো

২৪২

মনে করতেন না। ইসরাইলী, ইহুদী, জায়োনবাদী এই শব্দগুলোর মধ্যে ফারাক বজায় রেখেই কবি তার প্রেম ও মানবিক অবস্থানে অটল। কবি আরো বলেন–

-9
إني أتأهَّب للانفجار
على حافة الحلم
كما تتأهب الآبار اليابسة
للفيضان.
إني أتأهَّب للانطلاق
على حافة الحلم
كما تتأهب الحجارة
في أعماق المناجم الميتة
إني أتحفَّز للموت
على حافة الحلم
كما يتحفز الشهيد للموت
مرة أُخرى.
إني أتأهَّب للصراخ
على حافة الحقيقة
كما يتأهَّب البركان
للانفجار.[২৪৩]

আমি প্রস্তুত হয়ে আছি বিস্ফোরণের জন্য
ধৈর্য্যের সীমার উপর
শুকনো কূপগুলো যেমন উন্মুখ হয়ে থাকে
প-   াবনের জন্য
আমি প্রস্তুত হয়ে আছি
ধৈর্য্যের সীমার উপর
পাথরেরা যেমন পড়বার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে
মৃত খনীর গভীরে
আমি মৃত্যুর জন্য উপচে আছি
ধৈর্য্যের সীমার উপর।
শহীদেরা যেমন উদ্যত থাকে
আরেকবার মুত্যুর জন্য
আমি তীব্র উদ্বেল হয়ে আছি চিৎকার দেবার জন্য

[২৪৩]. মাহমুদ দারভীশ. *আল দীওয়ান: আল আ'মালুল উলা*-২. ২০০৫. ৩৯, ৪০।

হাকীকতের কীনারে
আগ্নেয়গীরি যেমন উন্মুখ হয়ে থাকে
বিস্ফোরিত হবার জন্য।

দারভীশের দ্রোহ বিভিন্ন অবস্থায় নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রকাশ হওয়ায় দ্রোহ বিষয়ক কবিতার প্রবলতর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে উঠেনি তার অন্যান্য বিষয়ের তুলনায়। কারণ দ্রোহের প্রসংগ ক্ষোভ, আক্ষেপ, প্রতিরোধ, রাজনীতি এমনকি কখনো কখনো প্রেমের অনুষঙ্গ হয়ে নানা কবিতায় বিচিত্ররূপে হাজির হয়। তবে সমসাময়িক কবিদের সাথে তুলনামূলক জায়গায় দারভীশের দ্রোহের ভাব ও শিল্পমন্ডিত কাব্য ভাষার বিচার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। দুর্যোগ দারভীশের চিন্তায় নতুন সম্ভাবনাকে উপস্থিত করেছে নানান উপমা ও রূপকের মাধুর্যে। তার রূপক আর চিত্রকল্প দেশ, মাটি, প্রকৃতি, প্রেম, মানুষ ও সময়। কারণ দারভীশের চিন্তার অভিমুখ- কষ্ট, যন্ত্রণা, দুঃখ-দুর্দশা, বিতাড়ন-নির্বাসন, কারাগার, বন্দীত্ব, হত্যা, খুন আর ধবংশযজ্ঞ নয় বরং কবি এসব কিছুর অনিবার্যতার মধ্যে অস্তিত্বমান করেন তার সমগ্র সত্ত্বাকে। এই অস্তিত্ত্বমানতাই নতুন অভিমুখ তৈরির পূর্বশর্ত। কবির প্রেম, মগ্নতা, লিপ্ততা, সম্পর্ক, লড়াই-সংগ্রাম তাই আবর্তিত হয় মাটির ভেতরে, ভূমিতে, প্রকৃতিতে। এই ভূমিই ফিলিস্তিনী জাতীয় পরিচয়ের রূপক। দারভীশের কবিতায় 'ভূমি' জাতীয় শব্দের ব্যবহার অত্যাধিক। যেমন- ভূমি অর্থে– পৃথিবী, মাটি, কাদামাটি, নরম মাটি, বালু, পাহাড়, নুড়ি পাথর, শিলা খণ্ড, পাথর, পর্বত, টিলা, উঁচুভূমি, ঢিবি, শৃঙ্গ-চূড়া, স্থল ভূমি, জঙ্গল, শীর্ষ-শিখর, শুকনো জায়গা, শুষ্ক মৃত্তিকা ইত্যাদি।[২৪৪] বারবার শব্দগুলোর ব্যবহার ছিলো অপরিহার্য। কারণ দারভীশের রক্ত, মাংস ও জীবনের সবকিছুতে একাকার ভাবে মিশে গেছে তার দেশ। ধবংসযজ্ঞ, বিপন্ন মানবতা, গৃহহীনতা, দুঃখ, দুর্দশার চিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একই দৃশ্য তাকে দেখে যেতে হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে থাকায় কবির চিন্তা, তৎপরতা, কবিতা ও ভাষায় একই ভাব, একই চিত্রকল্প একই শব্দের পৌনপুনিক ব্যবহার অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ ফিলিস্তিনীদের লড়াই সংগ্রাম আর জীবন যাত্রা প্রতিমুহূর্তে একই পরিস্থিতির মধ্যে বিদ্যমান। কবি এই বিদ্যমান সমাজ, ইতিহাস ও সমকালীনতার বাইরে যেতে পারেন না। তার ভাষা ও অস্তিত্ব এখানেই পরিগঠিত। কিন্তু এই পৌনপুনিকতা আরোপিত নয়। কবিতার নান্দনিক কাঠামোকে তা ক্ষুন্ন করেনি। সীমাবদ্ধ করে দেয়নি তার শিল্প ও জীবন সুন্দরকে। বরং এ পৌনপুনিকতার অপরিহার্যতা, ভাব, ও ভাষা গণমানুষের সাথে একাত্ম হয়ে উঠে নতুন অর্থ ও নতুন তাৎপর্যের দ্বার উন্মোচন করে। শিল্পী হিশাবে এখান থেকেই দারভীশের বিচার অগ্রসর হবে আশা করি। দুর্যোগের ভেতর থেকে আরো যে বিষয়গুলো উঠে আসে– তার মধ্যে প্রতিরোধ, প্রেম, প্রকৃতি, ধর্ম, আলকুদুস, তাওরাত, অন্যতম। স্থির বা চর্চিত ইতিহাসের সীমাকে অতিক্রম করে কবি প্রাচীন ফিলিস্তিনীনের নবী, আসমানী কিতাব ও পবিত্র স্থান আলকুদুসকে জীবন ও অস্তিত্ত্বের জায়গায় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের অনিবার্য উপজীব্য করে তোলেন। এই পঙক্তিগুলোর সাথে বিষয়টি প্রাসংগিক...

---

২৪৪. দীব আস সুলতান, মুহাম্মদ ফুয়াদ, *সূরাতুন নাকবাতি ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ.* পৃ. ১৭৩।

৩.৪.৪: দেশপ্রেম

দারভীশ স্বভাবতই ব্যতিক্রম। অন্য বিষয়গুলোর মতো প্রেমের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা বিদ্যমান। মানুষ মাত্রই এমন যাকে আবেগের প্রকোপ কমবেশি প্রাণিত করে। কবিদের ক্ষেত্রে আবেগ আরো বেশি চঞ্চল। সংবেদনশীল কিংবা গম্ভীর এবং গভীরতর। কবিরূপে দারভীশের বিষয়টি ঠিক এরকম নয়। ভিন্ন কিছু হিসাব নিকাশের দরকার পড়ে তাতে। বলা বাহুল্য প্রকৃতি মাত্রই বিচিত্র। মানুষও তেমনি অনেক বিচিত্র। এই বৈচিত্র্যের ফলে আবেগ উচ্ছ্বাসের বহিপ্রকাশও পৃথক পৃথক হওয়া স্বাভাবিক। এসব কিছুর সাথে দেশ, কাল, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সম্পর্কও নিবীড়ভাবে যুক্ত। তবে বিষয় আকারে প্রেম দারভীশের ভেতর যেভাবে দৃশ্যমান তার গতি প্রকৃতিকে কেবল আলাদা বললে সরলিকরণই হবে। দারভীশ শুধু স্বতন্ত্র নয় প্রেমভাবনায় সাধকের মতো ছিলো তার সময়োচিত ক্রিয়াকর্তব্য। কারণ তার ভাব ও কর্ম ছিলো অভিন্ন। তার সাধনা কেবল চিন্তার মধ্যে, কবিতার মধ্যে ধরা যায় না। লড়াই সংগ্রামের মধ্যেই তাকে ধরতে হয়। তার সক্রিয় জীবন, প্রাণবন্ত কবিতার শহীদি উচ্ছ্বাস ছিলো বাস্তবতার সংঙ্গে একাকার। দারভীশের কাছে জীবন যতোটা সৃষ্টিমুখর ততোটাই সাধননির্ভর। এই সাধনের কেন্দ্রবিন্দু তার জন্মভূমি। সেখান থেকে জলপাইয়ের বনভূমি, ভূমধ্যসাগরের হাতছানি, কমলার সৌরভ, লেবু-মালতীর গন্ধলীলা, গম শীষের সাথে গভীর আলিঙ্গন, সবুজ পাথরের জীবন্ত দেহ, আল কুদুসের পবিত্র ধ্যান, তাওরাত-জাবুর-ইঞ্জীলের ধারায় কুরআনের অশেষ মাজেজা, চড়ুইদের মুক্ত ডানা, ঘুঘু-পাপিয়ার মোহনসুর, আল কারমেল পাহাড়ের সিঁড়ি, কৃষক শ্রমিকের অতলান্ত ঘাম, লড়াকুর ঈমানদীপ্ত বাহু, আর শহীদের প্রতিশ্রুত অমর রক্ত সবকিছুর মধ্যেই দারভীশ এবং দারভীশের মধ্যে সব কিছু। আর এই সাধন রসায়নের মূল উপাদানই তার প্রেমশক্তি।

আরবী কবিতার ইতিহাসে প্রেম বিষয়ক কাব্যভূমি খুবই প্রাচীন। এবং বিকশিত। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে এর ভূমিতে মরুময়তা, অনুর্বরতার গভীর অগভীর ছাপ পড়ে। তবে ঔপনিবেশিক কালপর্বে আরবী কবিতার আধুনিক কাঠামো বিনির্মাণে ইউরোপীয় প্রভাব পুরোদস্তুর ছিলো। তেমনি এ প্রভাব আরবী কাব্যের ভাব সম্পদেও সমানভাবে প্রকট। বিশেষত আরবী প্রেম ও গজলগীতির ধ্রুপদী ধারার পরিবর্তন ছিলো এই অনুকরণবৃত্তির লক্ষণীয় ফসল। অনুকরণ বৃত্তির ফলে মানব প্রকৃতিতে যে অনুর্বরতা ও হীনমন্যতার ফলাফল তৈরি হয় তাতে কোনো সন্দেহ নাই। এর অনেক নেতিবাচক দিক অবশ্যই আছে। এখানে তার বিচার বিশে- ষণের অবকাশ নেই। তবে এর ফলে যে দ্বান্দিক পরিবেশ তৈরি হয় তার নগদ লাভ ছিলো আরবী কবিতার আধুনিক পন্থা ও নব্য-ক্ল্যাসিক ধারা। নতুন করে চিন্তার প্রবণতা তৈরি করে এই পরিবেশ। পুনর্বিবেচনা, পুনর্পাঠের চাপ সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বমুখর এই ধারা-উপধারাগুলো। এর মধ্য দিয়েই আরবী আধুনিক সাহিত্যের পরিগঠন সম্পন্ন হয়। তবে আধুনিক আরবী কাব্যের ধারা পরিগঠনের কালপর্বেই দেশ প্রেমের ছন্দ তীব্র মুখর ছিলো। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির উদ্দীপ্ত চেতনায় দেশপ্রেমের ছন্দ চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রধানত মিশরের কবি হাফিজ ইব্রাহীমের ভেতর। এরপর আহমদ শাওকী,

মারুফ আর রুসাফী ও প্রবাসী কবিসহ অনেকের উল্লেখযোগ্য। প্রেমের সাথে দেশ প্রেমের অভিযোজন ঔপনিবেশিক কালে একটি বাস্তবোচিত ঘটনা। কবিতা ও সংগীতের মাধ্যমে এই ধারা বৈশ্বিকভাবে প্রায় সকল ভাষা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাম্প্রতিক কালে আরবী কবিতার প্রেমের প্রবাহে দারভীশ নতুন ভাবনার জিজ্ঞাসা তৈরি করে। দারভীশের প্রেমের ভুগোল বিচিত্র। গভীর ও বিস্তৃত। দেশ প্রেমের অভিপ্রকাশ এতেটা পরিপূর্ণ যা আরবী সাহিত্যে নয় বরং বিশ্ব সাহিত্যেও বিরল। দেশপ্রেম এ যাবত নারী ও জননীর উপমা পর্যন্ত তরান্বিত ছিলো। প্রচলিত অর্থে দেশপ্রেম দারভীশের কাব্যে আরো ব্যাপক, আরো পূর্ণতামুখী। দেশপ্রেমের চর্চিত ধারার ভেতর দিয়েই দারভীশ হেঁটেছেন। অথচ কবি এই পথকে যেখানে নিয়ে গেলেন তাতে দেশপ্রেম বলে আলাদা আর কিছুই থাকে না। মাটি, দেশকাল, মানুষ, প্রকৃতি সবই অভিন্ন। যা দেশ তাই নারী, যা নারী তাই দেশ, জীবন এবং অস্তিত্ব। অতএব, অস্তিত্বের জন্য প্রেম, অস্তিত্ব মানে পুরো প্রকৃতি। সুতরাং পুরো প্রকৃতির কিংবা বিশ্ব জগতের ভেতর দিয়ে মানব সত্ত্বাকে সামগ্রিক করে তোলার নামই দারভীশের প্রেম, সাধনা কিংবা লড়াই। যেমন দারভীশ বলেনঃ

প্রেমের অভিব্যক্তি ছিলো তার নতুন ব্যঞ্জনাময়। শব্দ সাজানোর স্বতন্ত্র অলংকারিক দ্যুতিতে দীপ্ত হয়ে ওঠে তার ব্যাথাদগ্ধ কল্পনা মাধুর্য। উপমার গম্ভীর প্রণোদনায় ভাস্বর হয়ে ওঠে কবির গভীরতম আবেগের ভারী উচ্চারণ। কবি বলেন দারভীশ এইভাবে প্রেমের প্রকৃতি রচনা করেন। সহজকরে বলেন- অথচ সেখানে গভীরতার অথৈ সম্পর্ক। এই সম্পর্কে যতোটা চিহ্ন রূপকের, বুননের, ততোটাই স্বাতন্ত্র সৃষ্টি করেছে কণ্ঠের সংবেদনময় সুগম্ভীর ইমেজ। হৃদয়ের অতলান্তে দাগ টেনে যায় তার ভাষা ও ভাবমাধুর্য। ইমেজটির সাথে কবির যে প্রেমপ্রতিম সম্পর্ক জড়িয়ে আছে দারভীশ তাকে বোন বলে সম্বোধন করেন।

নারী বোনের রূপে অভিষিক্ত কবি তাকে প্রকৃতির নিগড়ে বাঁধেন হৃদয় দিয়ে। কারণ এই কণ্ঠ, এই ভাষা অস্তিত্বের প্রতিটি অঙ্গ থেকেই ধ্বনিত হয়। প্রতিটি মাটির কণা থেকে, প্রতিটি স্থান থেকে উচ্চারিত হয় এই শব্দ। কিন্তু যতো সংকটের মধ্যেই থাকুক, তারা দুই সত্ত্বাই মূলত কাছাকাছি থাকে। ডান্ডাবেড়ি পড়া পাযুগলের মতো অঙ্গাঅঙ্গী তারা দুজন। প্রেমিক-প্রেমিকা দুজন প্রকৃত অর্থে বন্দী হয়ে আছে। অথচ তারা ভাই-বোন। কিন্তু প্রেম সেখানে পবিত্র সম্পর্কের অভিপ্রকাশ। জায়োনবাদী অপশক্তির হাতে দেশ এবং তার বুকে জড়ানো দুজনই বন্দী। কিন্তু তারা উভয়ই পথ পার হয়ে যাচ্ছে এক সাথে যুথবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে। ফিলিস্তিনী মানুষের এমন নিষ্ঠুর জীবন যাপনের প্রকৃত চিত্রকে দারভীশ ছন্দবদ্ধ করেছেন যে মাত্রায় আরবী কবিতায় তা অভূতপূর্ব। বস্তুত স্বাভাবিক অর্থেই এখানে প্রেম নিষিদ্ধ। অবরুদ্ধ মানুষকে এখানে সার্বক্ষণিক উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, মৃত্যু, বলাৎকার, জিঘাংসা আর লাঞ্চনার মাঝেই থাকতে হয়। সহজ অর্থে এখানে অন্য কোনো চিন্তা করার সুযোগ হয় না। রোমান্টিক, স্বপ্নচারী হওয়ার মতো কোনো বিন্দু বিসর্গ বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন। দারভীশের ভাষায় এখানে প্রেম চড়ুইয়ের মতো, যাকে হাজারো বন্দুকের নল ধাওয়া করে বেড়ায়। এক ডাল থেকে আরেক ডালে নিরাপত্তার খোঁজে সব সময় এক উদ্বেগের মধ্যে

দিন কাটাতে হয় তাকে। এক বাসায় বেশি দিন থাকা সম্ভব হয় না। কিন্তু যেখানেই, যে ডালেই সে একটু শান্তির জন্য, স্বস্তির জন্য ছুটে যাবে- সেখানে গুলির শব্দ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না[২৪৫]। কবিতাটিতে চড়ুই ফিলিস্তিনীদের প্রতীক এবং উদোম বৃক্ষ বা ডালপালাবিহীন বৃক্ষ- শূন্য এবং ধ্বংস করে দেওয়া ঘরের প্রতীক। এই হতাশাপীড়িত মানুষের মাঝে মানসিক প্রশান্তির কোনো অবলম্বন ছিলো না। দারভীশ সেখানে আশার আলো জ্বালিয়েছেন। আর তার নামই প্রেম। বেঁচে থাকার মাঝে নতুন জীবনের, নতুন স্বপ্নের নাম। দারভীশ তার প্রেমের সাধনা করেন দেশকে তার মা'শুক জেনে। তাই কবি আশেকের চোখে মাশুকের ভাব মিলনের সম্পর্ক রচনা করেন এভাবে–

خُذيني تحت عينيكِ
خذيني، أينما كنتِ
خذيني، كيفما كنتِ
أردِّ إليَّ لون الوجه والبدنِ
وضوء القلب والعينِ
وملح الخبز واللحنِ
وطعم الأرض والوطنِ!
خُذيني تحت عينيكِ
خذيني لوحة زيتيَّةً في كوخ حسراتِ
خذيني آيةً من سفر مأساتي
خذيني لعبة... حجراً من البيت
ليذكر جيلُنا الآتي
مساربه إلى البيتِ!
فلسطينيةَ العينين والوشمِ
فلسطينية الإسمِ
فلسطينية الأحلام والهمِّ
فلسطينية المنديل والقدَمين والجسمِ
فلسطينية الكلمات والصمتِ
فلسنينية الصوتِ
فلسطينية الميلاد والموت[২৪৬]

আমাকে ধরো তোমার দুচোখের নিচে
আমাকে ধরো যেখানেই তুমি থাকো
আমাকে ধরো যেভাবেই তুমি থাকো
আমাকে ফিরিয়ে দাও মুখ ও দেহের রঙ
চোখ ও হৃদয়ের আলো,

---

[২৪৫]. আল নাক্কাশ, রাজা, *শায়ির আল আরদ মুহতাল্লাহ*, পৃ. ১৪৫
[২৪৬]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৯২, ৯৩।

মাটি ও সুরের স্বাদ
মাটি আর মাতৃভূমির খোরাক
আমাকে ধরো তোমার দুচোখের নিচে
আমাকে ধরো দুঃখ কুটীরের তৈল চিত্রে
আমাকে ধরো আমার ট্রাজেডিক ভ্রমণের নিদর্শনে
আমাকে ধরো গৃহ পাথরের খেলনায়
যেনো আমাদের আগামী সন্তান স্মরণ করে
বাড়িতে যাবার পথগুলো।
ফিলিস্তিন দুচোখের করুণাময় উল্কি
ফিলিস্তিন এক নাম
ফিলিস্তিন স্বপ্ন, বেদনার
ফিলিস্তিন শব্দমালা ও নীরবতার
ফিলিস্তিন কণ্ঠের, সুরের
ফিলিস্তিন জন্ম-মৃত্যুর।

কবি যেখানেই থাকে, কিংবা তার প্রেমাস্পদ যেভাবেই থাকুক কবির সাথেই থাকে।এই প্রেমাস্পদই তার দেশ। দারভীশ যেখানেই ছিলেন দেশ তার সঙ্গেই ছিলো। আরো মানবিক স্পর্শে উপস্থাপন করেন অনুরাগ, আস্থা ও বেদনার সুর। কবি বলেন–

رأيتكِ عند باب الكهف... عند النار
مُعَلَّقَةً على حبل الغسيل ثيابَ أيتامك
رأيتك في المواقد... في الشوارع...
في الزرائب... في دمِ الشمسِ
رأيتك في أغاني اليُتم والبؤسِ!
رأيتك ملء ملح البحر والرملِ
وكنتِ جميلة كالأرض... كالأطفال... كالفلّ[২৪৭]

আমি তোমাকে দেখেছি গুহার দরোজার কাছে, আগুনের কাছে।
ঝুলে আছো কাপড় শুকানোর দড়ির উপর অসহায়দের কাপড় হয়ে
আমি তোমাকে দেখেছি চুলোর ভেতর, সড়কের উপর
খোঁয়াড়ের ভেতর, আরক্ত রোদের ভেতর
আমি তোমাকে দেখেছি দুঃখ, দারিদ্র্যের গানে

[২৪৭]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৯০

আমি তোমাকে দেখেছি ভরা সমুদ্রে, বালিতে হাবুডুবু
তুমি ছিলে সুন্দর পৃথিবীর মতো, শিশুর মতো

কবির প্রেমের সুতোয় গেঁথে যায় সমগ্র ফিলিস্তিন। নিপীড়িত মানুষই দারভীশের কাব্যের মুখ্য উপমা। ফলে দারভীশের প্রেম এক বিরল চিত্রকল্পের বুননে গড়ে ওঠে। স্বতন্ত্র কাব্যভঙ্গিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে তার কবিতা। দারভীশের প্রেম জটিল ও চরম দুর্যোগময় জীবনের নাম। যেখানে ট্যাংকের নিচে বুলডোজারের নিষ্পেশনে, গোলার ভেতর দারভীশের প্রেম হেঁটে যায়। ধবংসাবশেষের উপর তার প্রেমের বীজ অংকুরিত হয়।
কবি বলেন,

هذه الأرض جلد عظمي
قلبي
فوق أعشابها يطير كنخلة
علقوني علي جدائل نخلة
واشقوني فلن أخون النخلة[২৪৮]

এই মৃত্তিকা আমার হাড়ের চামড়া
আর আমার হৃদয়
উড়ে বেড়ায় তার তৃণগুল্মের উপর মৌমাছির মতো
আমাকে ঝুলিয়ে দাও।
আমাকে ফাঁসি দাও।
আমি কখনো খেজুর গাছের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবো না।

কিংবা,

والفاتحون على سطوح منازلي
!زلازلي لم يفتحوا إلاّ وعود
لم يبصروا إلاّ توهّج جبهتي
لن يسمعوا إلاّ صرير سلاسلي
فإذا احترقت على صليب عبادتي
أصبحت قديساً... بزيّ مقاتل[২৪৯]

বিজয়ীরা আমার ঘরের ছাদের উপর
শুধু মুক্ত করবে আমার ভূপ্রকম্পনের অঙ্গীকার।

---

২৪৮. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৪৬.
২৪৯. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৫০

শুধু দেখবে আমার ললাটের দীপ্ত রোশনাই
শুধু শুনবে আমার শিকল কড়ার খশখশ শব্দ।
অতপর যখন আমাকে দগ্ধ করা হবে ইবাদতের ক্রুশের উপর
লড়াকুর উর্দিতে আমি হয়ে যাবো পবিত্র।

দারভীশ প্রেমকে কিভাবে দেখেছেন? দারভীশের প্রেম ছিলন এমন, "এই মুহূর্তে আমি লিখছি প্রেম নিয়ে। এমন একটি বিষয়ের মাঝখানে এই প্রেমের জন্ম যা এর দুঃখ বেদনা বহন করছে। এবং এই প্রেম হয়ে ওঠছে এমন একটি অংশ যা তার বিষয় থেকে আলাদা হতে পারে না। আমি চাই দুই প্রেমিকের আর সড়কের মধ্যবর্তী দেয়ালটা ভেঙ্গে দিতে। প্রেমিকদ্বয় কেবল প্রেমিকই নয় বরং তারা একটি আত্মত্যাগের একটি প্রত্যাশা, একটি লড়াইয়ের নাম। আমরা কখনো কখনো বিশেষকে নির্বিশেষের সাথে মিলানোর বিষয়ে অনেক কথাই বলি, তবে এই দৃশ্যপট্ আমার কাছে বর্তমানে লেখা বিশেষত আমার গানের মধ্যে প্রত্যক্ষ আকারে ধারণ করে প্রেমিকদ্বয়ের মধ্যকার নানান সম্পর্কের স্বাদ যা বহন করছে কঠিন বাস্তবতার রুচি।"[২৫০]

দারভীশের ব্যক্তির বাইরে যে প্রেমের ছবি সর্বব্যাপী এর মূল কারণ অখণ্ড প্রেমের সত্তা– অবিভাজ্য শক্তি। বস্তু এবং ভাবের যে ঐতিহাসিক বিভাজন তার তর্কের সীমা, ও চরিত্র এড়িয়ে দারভীশ যে প্রেম সত্তা গড়ে তুলেছেন তার সংজ্ঞায় শুধু বলা যায় নির্বিশেষ কিংবা অবিচ্ছেদ্য প্রেমের কাঠামো। যার উৎসভূমি ছিলো মাতৃভূমি, স্বদেশ। এখান থেকেই তিনি তার ভাবের পাটাতন নির্মাণের প্রেরণা লাভ করেন। কিন্ত স্বদেশই একমাত্র সবকিছু এমন কিছু নয়। এটি কেবল তার আদি প্রেরণার স্থল। মূলত প্রেম তার অখন্ড চিন্তারই একটি অংশমাত্র। দেশ বা প্রকৃতিকে জননী মূলক চিন্তা করার আদি ধারার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে দারভীশ তার স্বত্ত্বা ও একক অবস্থান তৈরি করেন যুগল সন্ধিগ্ন ভাবনায়।[২৫১] এই ভাবনা দুটি আলাদা বিষয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন কিংবা বোঝার বিষয় নয়। কবিতার ভাষায় রূপকের আশ্রয়ে কবি তার প্রেমভাবকে বস্তুগত জীবনের নানা উপাদানের সহযোগে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

৩.৪.৫: নারীমানস

প্রেম-মনুষ্যত্ব দৃশ্যত, দুটো আলাদা বিষয় মনে হতে পারে। তবে দুইয়ের মধ্যে নিবীড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মুনষ্যত্ববোধের সাথে যেমন প্রেম জড়ানো, প্রেমের সাথে তেমনি মনুষ্যত্ববোধ যুক্ত। পেম ও মনুষ্যত্ববোধের মাঝে দৃশ্যমান ফারাক তুলে দিয়ে একাকার দানের চেষ্টা করেছেন কবি দারভীশ। মনুষ্যত্ববোধকে প্রেম থেকে আলাদা বিবেচনা করা মুশকিল। ব্যবহারিক জায়গায় দুটোর পৃথক রূপ স্পষ্ট হয়ে গেলেও কবি মনুষ্যত্ববোধকে সরলভাবে দেখেন না। মনুষ্যত্ব কথাটি জ্ঞান প্রক্রিয়াগত

[২৫০]. হোসেন, শাহাদাৎ, *মাহমুদ দারভীশের কবিতাঃ ভাব ও বিষয় অনুষঙ্গ*, পৃ. ১২৮।
[২৫১]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৯।

কোনো প্রত্যয়ের নাম নয়। মানুষের স্বভাব ধর্ম থেকে এর উৎসারণ। কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শগত চর্চার ফলে মনুষ্যত্ব কথাটি মানবতাবাদ অর্থেই বিপুলভাবে প্রচলিত। অথচ মানবতাবাদ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। মানুষকেন্দ্রীক পশ্বিমা মতাদর্শের নাম। যাকে কেন্দ্র করে এক কথায় এখন প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র, পুঁজি ও আরো নানা দর্শন ও চিন্তা। কিন্তু মানবতা একদমই আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এর উল্টোটাই বর্তমান ডমিন্যান্ট ভাষা। পশ্চিমা রাজনৈতিক জ্ঞান কান্ড থেকে এর বিস্তার ঘটে। এই বিস্তারের প্রধান উপায় গণমাধ্যম। আর পশ্চিমের প্রতি হীনমন্য মানুষজন। এই হীনমন্য বা এ্যানলাইটেড জাতি গোষ্ঠির এটি কোনো বিশেষ দিক নয়। সামগ্রিক দিক থেকে একই অবস্থার পরিণতি ভোগ করে তারা। বুঝে কিংবা না বুঝে অর্থাৎ পশ্চিমের সকল কর্তৃত্বের অংশ হিসেবেই ভাষার কর্তৃত্ব। কিন্তু প্রশ্নটা তখনই যখন বিনা বিচারে গ্রহণ করার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসের প্রবণতা দেখা যায়। কথাগুলোর প্রয়োজন ছিলো এই কারণে যে, দারভীশ আদৌ মানবতাবাদী কবি ছিলেন না। দারভীশকে যতদূর পাঠ করেছি তাতে মনে হয়েছে দারভীশ মানবতাবাদী কবি নন। অর্থাৎ পশ্চিমের অর্থে মানবতাবাদী নন। মানুষের স্বভাব ধর্মের মধ্যে যে মনুষ্যত্ববোধ, সহজাতবোa বিদ্যমান দারভীশের মধ্যে সেই চেতনাই হাজির ছিলো। বলা বাহুল্য পশ্চিমের জ্ঞান, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিশ্বব্যাপী পরম কর্তৃত্বশীল। এর প্রভাব বলয় থেকে কারো মুক্ত থাকা এখনো পর্যন্ত আকাশ কুসুম কল্পনার মতো। কিন্তু এই কর্তৃত্ব সার্বজনীন নয়। এর অবসান অবশ্যম্ভাবী। ফলে দারভীশকেও এর বাইরে চিন্তা করা অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। কিন্তু তার তাৎপর্যের জায়গাটা ছিলো তিনি বিনা বিচারে কোনো কিছু গ্রহণে অভ্যস্থ নন। একটা ক্রিটিক্যাল পজিশান তার ছিলো। তার জীবন যাপন চিন্তা ভাবনা ও সাহিত্যের মধ্যে এই দিকটি একেবারেই স্পষ্ট। কতটুকু কী করতে পেরেছেন সেটি অবশ্যই বিচার বিশে- ষণের দাবী রাখে। এর সাথে যুক্ত আছে কবির সামর্থ-অসামর্থের প্রশ্ন ও নানা বাস্তব পরিস্থিতি।

দারভীশ জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। যদিও তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। যতোটুকু যুক্ত ছিলেন তা ছিলো জাতীয় মুক্তির জায়গা থেকে। কারণ জাতীয় মুক্তি এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতি করা এক জিনিস না। এই গবেষণা পত্রের ভূমিকার 'রাজনীতি' অংশে বিষয়টি পরিস্কার করা হয়েছে। প্রসংগের কারণে সংক্ষেপে বলা যায়– তিনি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের অবস্থান গ্রহণ করেন স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে ।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার কারণে মুহূর্তের কর্তব্য আকারে জাতীয়তাবাদী তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছিলো জরুরি প্রশ্ন। তবে এটি তার বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্র নয়। দেশকে মুক্ত করাই ছিলো তার প্রধান প্রশ্ন। দারভীশ মনে করেন প্রতিটি মুহূর্তের একটি উৎস থাকে। প্রতিটি নদীর, প্রতিটি বৃক্ষের, প্রতিটি ভূমির অর্থাৎ সবকিছুরই একটা জন্মস্থান আছে। কিন্ত কোনো অস্বাভাবিক কায়দায় জোর করে এই উৎসভূমি দখল করা যায় না। এটি ঘোরতর অন্যায়। এর বিরুদ্ধে সোচ্ছার হওয়া মনুষ্যত্বের দাবী। যেখানে এর বিরোধীতায় ইহুদী, জায়োনবাদী, মুসলিম বড় কথা নয়।

রাষ্ট্র ও মানবাধিকার কবির এই ভাব ও সত্যকে এড়িয়ে যেতে পারে না। এমনকি এইভাবে সম্বোধন যতোখানি বিনয়ের জন্য দরকারী ততোখানি কবিতার বর্ণনা ভঙ্গিতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। প্রেম, মনুষ্যত্ব বিনয়োচিত সম্বোধনে যেমন দেখা যায়, তেমনি তার দ্রোহ ও ক্ষোভের অগ্নিঝরা উচ্চারণও দৃশ্যমান। বিষয়টি মূলত আগাগোড়াই মানবিক সম্পর্কের আদি ও আসল প্রশ্ন। অর্থাৎ নিজ ভূমিতে ফিলিস্তিনীদের স্বাভাবিক জীবন যাপন রাষ্ট্র ও অধিকারের প্রশ্নকে উৎরিয়ে দারভীশ মানুষ ও প্রকৃতির নিজ নিজ জন্মগত অবস্থানের আদি প্রশ্নকে সামনে এনে স্বাধীকারের ঘোষণা জোরদার করেছেন। কারণ যেখানে প্রতিটি সত্ত্বারই জীবন প্রবাহ একটি বিশেষ জায়গা ও বিশেষ সময়কে কেন্দ্র করেই বেড়ে ওঠে। এটি প্রাকৃতিক। এখানে কোনো ভেদ চলে না। বৈষম্যের দেয়াল স্থাপন করা যায় না। অপরের জায়গায় জোর করে দখল স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তদুপরি পরস্পরের সম্পর্কও ক্ষুন্ন হয় না। প্রকৃতিতে এই সহাবস্থান খুবই পরিস্কার। সেখানে কোনো রাষ্ট্র নাই। মালিকানা নাই। জাতি নাই। বন্ধু সম্বোধন করে তাই কবি ফিলিস্তিনে দখলদারিত্বকে ইসরাইলের অন্যায় ও মনুষ্যত্ব পরিপন্থী কাজ বলে নাকচ করে দেন। "প্রতিটি ভূমিরই জন্ম আছে।/প্রতিটি ভোরেরই একটি উত্থানের মুহূর্ত আছে।" এই একই নিরীখে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় কবি মানুষের যাবতীয় সম্পর্ক বুনতে চান। ফলে বর্ণবাদের রঙ দিয়ে কবিকে মলিন করা যাচ্ছে না। বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ পরম বা আবহমান কোনো সত্য নয়। কেবল পরম আর ধ্রুব কবির প্রস্তাবিত প্রেম ও মনুষ্যবোধ।

প্রেমের মৃত্যু নাই মানে মনুষ্যত্বের মৃত্যু নাই। ধবংস নাই। পরাজয় নাই। এমন কি বিজয়ও তার লক্ষ্য নয়। প্রেম ও মনুষ্যত্বের সাধনায় নিজেকে ফানা করাই লক্ষ্য। সেখানে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নাই। এবং সেখানে আত্মপরিচয়ের বিষয়ও নাই। মানুষের স্বভাব ধর্মের মধ্য দিয়েই প্রেম ও মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে তুলতে হয়। দারভীশ বলেন,

لعلّكم أحياء
لعلّكم أموات
لعلّكم مثلي بلا عنوان
ما قيمة الإنسان
بلا وطن
بلا علم
ودونما عنوان
ما قيمة الإنسان
ما قيمة الإنسان
بلا وطن
بلا علم
ودونما عنوان
ما قيمة الإنسان[২৫২]

[২৫২]. মাহমুদ দরভীশ. *আদ দীওয়ান- আল আ'মালুল উলা-১*, পৃ. ৪৭।

হয়তো তোমরা জীবিত
হয়তো তোমরা মৃত
হয়তো তোমরা আমার মতো ঠিকানাহীন
মানুষের কী মূল্য
দেশহীন
পতাকা বিহীন
ঠিকানাহীন
মানুষের কী মূল্য ?

মানুষের মূল্য কোনো নির্ধারণের বিষয় নয়। দরদামের বিষয় নয়। মানুষের মূল্য প্রেমে, মুনষ্যত্বে। এই মনুষ্যত্ববোধ ইসরাইলের দখলদারী শক্তির আঘাতে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আরো তুমুলভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠেছে। কারণ কবির প্রেম সর্বব্যাপী, তবে কবির শত্রু-মিত্র নির্ধারিত হয় এই প্রেমের ও মনুষ্যত্বের ভেদ রেখা দিয়েই। ইসরাইলের আগ্রাসী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই ভেদ রেখা মুছে দিতে পারেনি। ১৯৪৮ সাল থেকে এখনো পর্যন্ত জবরদখলের সাম্রাজ্যবাদীতা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইল। অবস্থা ভেদে মন্থর ও জোর গতিতে চলে তাদের দখলদারী ভূমিকা। হত্যা, খুন, রাহাজানী, খাদ্য সংকট তৈরি, উচ্ছেদ, বিতাড়ন, নির্বাসনই তাদের সামগ্রিক তৎপরতার চিত্র। যুগ- যুগের এমন চলমান দুর্দশার মধ্যে ফিলিস্তিনী জনগণ তাদের অবস্থানকে ধরে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের এ লড়াই মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে নয়। জনগোষ্ঠী আকারে ফিলিস্তিনে সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সহ ইহুদী, খ্রীষ্ঠান ও নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থান শান্তিপূর্ণভাবে চলে আসছে। ঔপনিবেশিক আমলের পর এই অবস্থান ভেঙ্গে পড়ে। ঐতিহাসিকভাবে জনগোষ্ঠী হিসাবে ফিলিস্তিন প্রাচীনকাল থেকে বহির্শক্তির আগ্রাসন মোকাবেলা করে আসছে। কিন্তু তারা আগ্রাসী নয়। প্রতিরোধে অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী। অন্যান্য আরব অঞ্চলের তুলনায় এখানকার মানুষজন বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের। ফলে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের দৃঢ়তা সহজাত। এটি তাদের দুর্বল কিংবা নিরীহ কোনো দিক নয়। কারণ প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময়কাল ধরে তাদের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস এই কথা প্রমাণ করে না। কিন্তু তারা মানবিক দিকটি বিকিয়ে দেয়নি। যুগের পর যুগ ইসরাইলের নৃশংস ও অমানবিক অত্যাচারে পিষ্ঠ ফিলিস্তিনী কোনো কবি সাহিত্যিক ইহুদীদেরকে নিন্দা করে কবিতা, বা কোনো সাহিত্য কর্ম রচনা করেননি[২৫৩]। ইহুদীদের প্রতি তাদের তীব্র কোনো বিরোধ নেই। বিদ্বেষ নেই। সাধারণ স্থানীয় ইহুদী ও আরব ফিলিস্তিনীদের মাঝে সম্পর্কও স্বাভাবিক। বিরোধীতা বরাবরই শাসক শ্রেণী এবং জায়োনবাদী ইহুদীদের প্রতি। কবির প্রেম ও মানবিক দৃষ্টি জায়োনবাদী শক্তির ফাঁক গলিয়ে গোটা ফিলিস্তিন জুড়েই পরিব্যাপ্ত।

[২৫৩]. আল নাক্কাশ, রাজা, *শায়ির আল আরদ আল মুহতাল্লাহ*, পৃ. ২১৩

দেশপ্রেমের সঙ্গে নারী প্রেম একীভূত হয়ে অভিনব কাব্যিক বয়ানের আঙ্গিক তৈরি হয় দারভীশের কবিতায়। দেশপ্রেমের সাথে নারী বৈচিত্র্যপূর্ন হয়ে ওঠে নানা উপমা, চিত্রকল্প ও নতুন কাব্যভঙ্গিতে। কবি বলেনঃ-

এক ইহুদী মেয়ের সাথে কবির প্রেম হয়। মেয়েটিই বেশি আকৃষ্ট ছিলো কবির প্রতি। এই প্রেম দুই বছর স্থায়ী হয়। মেয়েটির নাম রীতা। দারভীশ নিজেও রীতার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। কবির চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ আখির আল লাইল বা "রাত্রি শেষে"র "রীতা এবং বন্দুক" কবিতায় গাল্পিক ঢঙে এই প্রেমের উপাখ্যান বর্ণিত হয়। কবিতাটির একটি পঙক্তিতে রয়েছে চড়ুইয়ে কথা। যা তার প্রেম ও শান্তির প্রতীক। কিন্ত এই প্রেমের যবনিকা ঘটে দ্রুত। মানুষ মানুষের সম্পর্ক কতোটা বর্ণবাদী রাজনৈতিক হয়ে ওঠে তার উজ্জ্বল নজীর ইহুদী কন্যা রীতা আর কবির সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবার কারণ। কবিতাটির প্রথম স্তবকে কবি বলেনঃ–

بين ريتا وعيوني...بندقية
والذي يعرف ريتا، ينحني
ويصلي
لإله في العيون العسلية[২৫৪]

রীতা আর আমার চোখের মধ্যখানে.....বন্দুক
যে রীতাকে জানে সে এখন রুকু করে
নামাজ পড়ে মধুময় চোখে তার প্রভুর।

ইহুদী এবং ফিলিস্তিনী নারী পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের মাঝে এভাবে বাধা তৈরি করে একটি বন্দুকের নল। যে বন্দুকের বুলেট, গুলি অসংখ্য ফিলিস্তিনী চড়ুইয়ের প্রাণ খুন করে। দারভীশ কখনো ইহুদী বিদ্বেষী ছিলেন না। ফিলিস্তিনী মুসলমান এবং সাধারণ ইহুদীদের মাঝে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন কবি। দারভীশের কাজের দুটো দিক ছিলো গুরুত্বপূর্ণ– রাজনীতি এবং সংস্কৃতি। জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে দারভীশ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন ইসরাইলের আগ্রাসী শক্তিকে মোকাবেলার তাগিদে এবং সাম্প্রদায়িক ভেদ ভেঙ্গে ফিলিস্তিনী গণমানুসের ঐক্য সুসংহত করার জন্য দারভীশ সাংস্কৃতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তরুণ বয়স থেকেই কবি পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গঞ্জে গান কবিতা ও নাট্য সন্ধ্যার আয়োজন করতেন। ১৯৫৬ সালে ইসরাইলের কাফার কাসেমের ভয়াবহ গণহত্যার পর কবির এ তৎপরতা কৌশলগতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এই তৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে দারভীশের সন্ধ্যার পর গৃহত্যাগ নিষিদ্ধ করা হয় ইসরাইল কর্তৃক। তখনো দারভীশের বয়স বিশ অতিক্রম করেনি। ফলে যে বৃহৎ লক্ষ্য দারভীশকে সদাব্যস্ত করে রাখতো মূলত সেটি ছিলো মনুষ্যত্বের ও মানুষকে একত্র করবার। কিন্তু এর প্রধান শত্রু যায়নবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। রীতা এবং কবির মাঝে যে বন্দুক তাদের ঐক্য ও মানবিক সম্পর্ক ভাঙ্গনের

---

[২৫৪]. প্রাগুক্ত. পৃ. ২০০।

আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে সেই বন্দুকই যায়নবাদ ও সাম্রজ্যবাদ। রীতার মতো শোলমীত নামের আরেক ইহুদী নারী দারভীশের প্রতি সাংঘাতিক দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। শোলমীত জায়োনবাদী মতাদর্শকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও যায়নবাদ প্রবল শক্তি দিয়ে তাকে স্তব্ধ করে দেয়। আর এক কদমও আগাতে দেয়নি জায়োনবাদী ইহুদী। শোলমীত অবশ্য জায়োনবাদীদের কঠোরতার কথা স্বীকার করে অনুতাপ প্রকাশ করে কবির কাছে। "প্রিয়ার নিদ্রা থেকে উত্থান" কাব্য গ্রন্থের "বন্দুকের আলোর উপর একখানা পত্র" শিরোনামের দীর্ঘ কবিতায় দারভীশ এর আদ্যোপান্ত বিবরণ দেন গল্প আর নাটকীয় বর্ণনার রীতি অনুসরণ করে। তবে দারভীশ তার লক্ষ্য থেকে সরে দাঁড়ান নি। নিজের আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। "রাত্রি শেষে" কাব্য গ্রন্থের "একজন সিপাহী স্বপ্ন দেখে শুভ্র পদ্মফুলের" শিরোনামের কবিতায় কবি মুনষ্যত্ববোধের জয় চিত্র অংকন করেছেন। কবিতাটি সংলাপধর্মী কাব্যরীতিতে রচিত মোটামুটি দীর্ঘ এই কবিতায় পদ্মফুল, জলপাইয়ের পত্রাবলী, সন্ধ্যার রূপ, চড়ুই, শুভ্রপাখি, আকাশ, শূন্য, মহাশূন্য, কালো পাখি, কবুতর, সূর্য, রক্ত, বন্দুক, আগুন, মহাকাল, ভোরের উদয়, রাজনৈতিক নানা ইংগিতময় ভাষা, আগুনের মুকুট, আগুন লাল গোলাপ, প্রভৃতি উপমা আর অসাধারণ চিত্রকল্পের চারুময় শব্দ বিন্যাস ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাব সমৃদ্ধ সত্য ও সৌন্দর্যের অনবদ্য স্মারক সৃষ্টি করেন। এক ইহুদী সেনা ও কবির মধ্যকার সংলাপের মধ্য দিয়ে উঠে আসে একজন সত্যাগ্রহী সৈনিকের জায়োনবাদী চিন্তায় আক্রান্ত হওয়ার এবং এক পর্যায়ে ভুল বুঝে যায়নবাদকে প্রত্যাখান করার ব্যতিক্রম কাহিনী। কবিতায় প্রথম পর্যায়ে ইহুদী সৈনিক প্রথমত মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন ও সত্যবাদী থাকে। এই সৈনিক ধীরে ধীরে জায়োনবাদী চিন্তাকে পুরোপুরি ধারন করে। চরম আক্রমণাত্মক ও নিষ্ঠুর ভূমিকা পালন করে। বহু ফিলিস্তিনীর জীবন নাশ করে। অনেক ধবংস সাধন করে। শেষ পর্যায়ে সে তার ভুল বুঝতে পারে। আর জায়োনবাদী আদর্শের বিকৃতির কথা ভাবতে দুঃখে, অনুতাপে, অনুশোচনায় অস্থির হয়ে ওঠে। শেষতক তার পূর্ণ প্রত্যাবর্তন ঘটে সত্যের প্রতি, মনুষ্যত্বের প্রতি। এই সৈনিক মূলত কবির এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।[২৫৫] দারভীশ বন্ধু সৈনিকের প্রত্যাবর্তনের মনোভাবকে তুলে ধরেন এইভাবে–

وكل ما يربطني بالأرض من أواصر
مقالة نارية...محاضرة
قد علموني أن أحب حبها
ولم أحس أن قلبها قلبي
ولم أشم العشب والجذور والغصون[২৫৬]

যে আমাকে গেঁথেছে এই ভূমির সাথে
তার সবটুকুই এক আগুনময় ভাষা....বক্তৃতা
তারা আমাকে শিখিয়েছে আমি যেনো এই আগুনের প্রেমে আসক্ত হই
আমি অনুভব করতে পারিনি আগুনের হৃদয় আমার হৃদয়
আমি ঘ্রাণ নিতে পারিনি তৃণগুল্মের, শেকড়ের, ভালবাসার

---

[২৫৫]. হোসেন, শাহাদাৎ, *মাহমুদ দারভীশের কবিতাঃ ভাব ও বিষয় অনুষঙ্গ*, পৃ. ১৩৪।
[২৫৬]. প্রাগুক্ত. পৃ. ২০৪।

কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর সমসাময়িক অনেক কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি সমালোচনা করে দারভীশের চরম প্রতিবাদ করেন। বিরূপ সমালোচনা করেন। বিবৃতি দেন। উদারপন্থী প্রকৃতিবাদী দেশ প্রেমিক ফিলিস্তিনী কবি অধ্যাপক উউসুফ আল খতীব সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাদের সমালোচনা ছিলো জায়োনবাদীদের প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। যে ইহুদীর হৃদয়ে জায়োনবাদী আদর্শের বীজ প্রোথিত হয়ে ডালপালাকারে বিস্তৃত হয় তার প্রত্যাবর্তন কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু দারভীশ এসব সমালোচনায় আদৌ তার অবস্থান থেকে সরে যাননি। তবে দারভীশকে এরকম কবিতার জন্য আপোসকামী উদারপন্থী মনে হতে পারে। যে উদার সরলতায় আদর্শিক বিচ্যুতি ঘটতে পারে। তবে দারভীশ সেই অর্থে উদার ছিলেন না। বরং মানবিক অবস্থান, ঘৃণা প্রদর্শনের ক্ষেত্র, দ্রোহ ও প্রেমের স্থান কালপাত্র ভেদ ঠিক রাখতে জানেন তিনি।

প্রেম ও মনুষ্যত্বের নিগড় একই বিন্দুতে যুক্ত। দেহ ও আত্মাকে আলাদা করার মতো ব্যাপার। তাই দারভীশের প্রেম, মনুষ্যত্ব চেতনা কবিতার জগতে যেভাবে বিদম্যান বাস্তবে অর্থাৎ অন্তত ফিলিস্তিনী মানুষের কাছে তা এখনো স্বপ্নের মতো। কিন্তু কবির শুধু অবদান এতোটুকুই যে, তার কর্তব্য সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে মূলত ফিলিস্তিনকে সে পথের অভিমুখেই তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কবির প্রেম অমর, অক্ষয়।

এই কবিতাংশে দারভীশ এক স্বাধীন নারীর চিত্র অংকন করেন। দুঃখ এবং দ্রোহ কবিতার পুরোটা জুড়েই স্বদেশের প্রশ্নে কবির মৃদু ক্ষোভ ও বেদনা ভরা কাব্যিক উপাখ্যান। এর মূল উপকরণ হলো নারী ও জন্মভূমি। এখানে নারী একই সঙ্গে ভাগ্য বিড়ম্বনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তেমনি ইসরাইলী নির্যাতনের বিরোধীতায় সে বেপরোয়া।[২৫৭] আর তার সঙ্গী কবি এবং স্বদেশ। তবে কখনো কখনো নারী নেতিবাচকভাবে উপস্থিত হয়েছে। দারভীশ তার এক কবিতায় নারীকে ইসরাইলের সাথে তুলনা করেছেন। দারভীশ বলেন,

كفاك يا صديقتي ذئبان جائعان
مص بقايا دمنا وبعدنا الطوفان
وان سغبت مرة لا تتركي الجثمان
وان سئمت بعدها فعنك يا صديقتي ذئبان جائعان
مص بقايا دمنا وبعدنا الطوفان
وان سغبت مرة لا تتركي الجثمان
وان سئمت بعدها فعندك الديدان[২৫৮]

তোমার জন্য বান্ধবী দুটি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রই যথেষ্ট
আমাদের অবশিষ্ট রক্ত শুষে নাও, আর আমাদের

[২৫৭]. হোসেন, শাহাদাৎ, *মাহমুদ দারভীশের কবিতাঃ ভাব ও বিষয় অনুষঙ্গ*, পৃ. ১৩৫।
[২৫৮]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৫০।

পরে আছে তুফান তুমি যদি আবার ক্ষুর্ধাত হও
তবে এই দেহগুলো ছেড়ো না এরপরও যদি তোমার
কষ্ট হয় তবে তোমার পেটের কৃমিগুলোও খেয়ে নাও।

সাথে আছে মৃত্যু। মৃত্যু এখানে তার প্রেমের জন্য বাধা নয় বরং অসম্ভব কে সম্ভব করে তোলার শর্ত হয়ে ওঠে মৃত্যু। দারভীশ যে নারীর কল্পনা করেন। তার পূর্ণতা ঘটে প্রেমে, মিলনে যেখানে দেহ একটি বিশেষ স্তর। লড়াই ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাতে যে অতিক্রমন ঘটে সেখানে কে কর্তা বা পুরুষ এবং কে নারী বা প্রকৃতি সেই প্রশ্ন আর মুখ্য থাকে না। বরং যে স্তরে উন্নীত হয় তাতে সত্য ও সুন্দরের অবগাহনে কবির সন্ধানকে তা আরো ধ্যান মগ্ন করে তোলে। এই মগ্নতার সম্ভাবনা তৈরি হয় মূলত শত্রু নিশ্চিহ্ন করার উভয়ের যূথবদ্ধ লড়াইয়ে। একই কবিতায় কবি বলেন---

و أنا أعرف أنّ الحب شيء
و الذي يجمعنا، الليلة، شيء
و كلانا كافر بالمستحيل.
و كلانا يشتهي جسما بعيدا
و كلانا يقتل الآخر خلف النافذة !
(التي يطلبها جسمي
جميلة
كالتقاء الحلم باليقظة
كالشمس التي تمضي إلى البحر
بزي البرتقالة ..
و التي يطلبها جسمي
جميلة
كالتقاء اليوم بالأمس
و كالشمس التي يأتي إليها البحر
من تحت الغلاله)[২৫৯]

আমি জানি ভালোবাসা এক জিনিস
এবং আজ রাতে যা আমাদেরকে মিলিত করলো সে এক জিনিস
আমরা উভয়ই অসম্ভবকে অস্বীকার কবি
আমাদের উভয়ই চায় দূরবর্তী এক দেহ
আমাদের উভয়ই হত্যা করে জানালার আড়ালে অপর শত্রু
আমার দেহ যা সন্ধান করে
সে এক সুন্দর

---

[২৫৯]. মাহমুদ দরভীশ. *আদ দীওয়ান- আল আ'মালুল উলা-১*, ৩০৬, ৩০৭।

চৈতন্যের সাথে স্বপ্নের মিলনের মতো
কমলার আবরণে সমুদ্র অতিক্রমরত সূর্যের মতো
আমার দেহ যা সন্ধান করে
সে এক সুন্দর
গতকালের সাথে আজকের মিলনের মতো
সূর্যের সাথে ওড়নার তলদেশ দিয়ে আসা
সমুদ্রের মিলনের মতো।

দারভীশ প্রেমের ভূগোল রচনা করেছেন রক্ত দিয়ে। জীবন দিয়ে। তিনি যে প্রেমের সাধনঘর নির্মাণ করেছেন সেই ঘরের শেষ নাই। কিন্তু তার এই ঘরে আসতে হয় রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে। কেবল অতিক্রম নয় নিজের রক্ত দিয়ে হৃদয় ক্ষরণ করে যে পথ-প্রান্তর রচিত হয়, তার সাধন ঘরে পৌঁছাবার তাই একমাত্র পথ সোপান। এই পথ তৈরির মাধ্যমে আত্মদৃষ্টির সন্ধানও অপরিহার্য। এই দৃষ্টি দিয়ে কবি তার প্রেমের সাধন ঘর অবলোকন করতে সক্ষম হন। এই অবলোকন যতোখানি আশার ততোখানিই দুঃসাহসের। কারণ এক দোলাচলের অবস্থা তৈরি হয় সেখানে। বিচ্ছেদ আর মিলনের দুধারী হাতছানী এক দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি করে যা খুবই নাজুক। কিন্তু কবির হৃদয় দমে যাবার নয়। নদীদের কুলুকুলু ডাক, পাইন গাছের মর্মর শব্দ, সমুদ্রের গর্জন, আর বুলবুলিদের পালক পুড়ে যাচ্ছে আমার রক্তের ভেতর।[২৬০]

কান্না ঝরা এই সব পঙক্তিতে শহীদদের প্রিয়তমার প্রতি ব্যাকুলতা উপচে পড়েছে। এর মধ্যেই গভীরভাবে প্রোথিত আছে প্রেমের সম্মোহনী শক্তি। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে কবি তার প্রেমের সোপান গড়েছেন এইভাবে। পূর্বের উদ্ধৃতিগুলোতে চোখ বা দৃষ্টি শক্তির একটি বিশেষ দিক লক্ষ করার মতো। এই বিশেষ দৃষ্টিশক্তিরে মধ্য দিয়ে কবি তার প্রেমের গন্তব্য প্রত্যক্ষ করার পথ খোলাশা করেন। যার চিত্রকল্প হয়ে ওঠে তার হারানো দেশকাল। প্রকৃতি। ক্রিয়তমার চক্ষু। কবি বলেন,

وحين أحدق فيك
أري مدنا ضائعة
أري زمنا قرميزيا
أري سبب الموت والكبرياء
[২৬১]وألهة تترجل أمام المفاجئة ة الرائعة

যখন আমি তোমার ভেতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি
দেখি হারানো নগরগুলো
দেখি রক্তলাল সময়
দেখি মৃত্যু আর গর্বের উৎস

---

২৬০. প্রাগুক্ত. পৃ. ১৬, ১৭
২৬১. প্রাগুক্ত. পৃ. ১৩০

দেখি অলিখিত ভাষা
এবং দেখি দেবতারা বিস্ময়কর আকস্মিকতার মুখে
হেঁটে যায়।

ফিলিস্তিনের রাজনীতির রক্তাক্ত বাস্তবতায় এই প্রেম যতোটা মিলনের ততোটা বিরহের। বারবার কবি এগিয়েছেন, পিছিয়ে পড়েননি। অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে যে স্বপ্ন কবি লালন করেছেন তার চেয়ে তাকে অনেক কুরে কুরে খেয়েছে এই প্রেম। এই স্বপ্ন। সহজ কথায় তার দেশ। দেশ মাতৃকার কোল থেকে শত্রুশক্তি তাকে বিছিন্ন করে দিয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা শুধু কবির নয়। কবি স্বদেশ মাতৃকার সমস্ত বিচ্ছিন্ন সন্তানদের এক অমর প্রতীক। দারভীশ আর সমস্ত জনগোষ্ঠীর এক অভিন্ন এবং সর্বাত্মক সত্ত্বা। দেশ আর মৃত্তিকাকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত বিষয় আবর্তিত হয়। মিলনই কবিকে আমৃত্যু জীবন্ত করে রাখে। মিলনের মানে তার দেশ, মাটি, জলপাই, সবুজ পাথর, শস্যভূমি, নদীনালা, খাল-বিল, গমশীষের চির হাতছানি, কারমেল পাহাড়ের অসংখ্যা সিঁড়ি অর্থাৎ পুরো প্রকৃতির সাথে নিবীড় ভাবে মিলে যাওয়া। যুগের পর যুগ এই মিলনের চেষ্টায় জীবন নিশেষ করে দিয়েছেন কবি। হতাশ হতে গিয়ে আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন। আবার সংগ্রাম শুরু করেন। যতোবেশী এগিয়ে যান ততোবেশী তার প্রিয়তমা দূরে সরে যান। কবি হাঁপিয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রিয়ার সম্মোহন তাকে প্রবলভাবে টানতে থাকে। ফলে কবি একই সময়ে বিরহ অনুভব করেন। তেমনি মিলনও অনুভব করেন। কবি বলেন,

دائما ،
نسمع في الليل خطى مقتر
و يفرّ الباب من غرفتنا
دائم ظلّك الأزرق من يسحبا،
كالسحب المغتربة
من سريري كلّ ليلة؟
الخطى تأتي، و عيناك بلاد
و ذراعاك حصار حول جسمي
و الخطى تأتي
لماذا يهرب الظّل الذي يرسمني
يا شهرزاد؟
و الخطى تأتي و لا تدخل
دائما
أسمع في الليل خطي مقتربة
وتصيرين منافي
تصيرين سجوني....

حاولي أن تقتليني
دفعة واحدة
لاتقتليني
بالخطي المقتربة![২৬২]

প্রতিনিয়ত
আমরা অন্ধকার রাতে শুনতে পাই নিকটবর্তী পদধ্বনি
আর আমাদের কক্ষ থেকে দরোজা পালিয়ে যায় প্রতিনিয়ত
নির্বাসিত মেঘের মতো
তোমার নীল ছায়াকে কারা খুলে নেয়
প্রতি রাতে আমার খাট থেকে ?
পদধ্বনি গুলো আসছে অথচ তোমার দুচক্ষুই স্বদেশ
আর তোমার দুই হাত আমার দেহের চর্তুপাশ ঘিরে আছে
এবং পদধ্বনিগুলো আসছে
হায় শেহেরজাদ?
আমাকে অংকনকারী ছায়াটি পালিয়ে যায় কেনো
এবং তুমি প্রবেশ করো না পদধ্বনিগুলো আসছে

দুঃখ বেদনায় কবি আত্ম হত্যা করার কথা বললেন প্রিয়তমাকে। বহু কবিতায় এইভাবে কবি নিজেকে হত্যার কথা প্রকাশ করেন। এই অভিপ্রকাশ বিপুলভাবে লক্ষণীয়। তীব্র বেদনায় ক্ষোভে কবির অন্তর্জগত পুড়ে দগ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্রণায় ছটপট করতে থাকে তার হৃদয়। কিন্তু এই যন্ত্রনাই কবির আরাধনা। কবি বলেনঃ

عيونِكِ شوكةٌ في القلب
توجعني... وأعبدُها
وأحميها من الريحِ
وأُغمدها وراء الليل والأوجاع... أغمدها[২৬৩]

তোমার চক্ষু এক কাঁটা, বিদ্ধ হয়ে আছে আমার হৃদয়ে
আমাকে ব্যথিত করে...... কিন্তু আমি তারই উপাসনা করি
তাকে রক্ষা করি বাতাসের কবল থেকে
তাকে লুকিয়ে রাখি রাতের আড়ালে আর লুকিয়ে রাখি সমস্ত যন্ত্রণা।

---

২৬২. প্রাগুক্ত. পৃ. ১৩০
২৬৩. দারভীশ, মাহমুদ, আল দীওয়ান, আল আ'মাল আল উলা-১. ২০০৫. পৃ. ৮৭।

এই যন্ত্রণা যতোই লুকিয়ে রাখা হয়। লুকানো সম্ভব হয় না। ভেতরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। ক্ষোভ আর যন্ত্রণা চাপিয়ে কবি তবু তার সাধনার পথে ক্রিয়াশীল হবার চেষ্টা করেন। তবুও যেনো সম্ভব হয় না। "সেই গানগুলো, সেই গীতিগুলো" কাব্য গ্রন্থের "আমি এক দুর্ভাগা প্রেমিক" কবিতায় কবি বলেনঃ

أمر على الحب كالغيم في خاتم الشجرة
مطر ولا سقف لي، لا
أمر كما يعبر الظل فوق الحجر
وأسحب نفسي من جسد لم أرهْ
وأحمل قلبي قميصا علي كتفي

আমি বৃক্ষের আংটির ভেতর মেঘের মতো প্রেমের উপর দিয়ে পার হয়ে যাই
আমার কোনো ছাদ নেই, বৃষ্টি নেই।
আমি পার হয়ে যাই, ছায়া যেমন পাথরের উপর দিয়ে অতিক্রম করে যায়
আমি আমার অদেখা দেহ থেকে আমার আত্মাকে খুলে নেই
আমি আমার কাঁধের উপর জামার মতো বহন করি আমার হৃদয়"[২৬৪]

قلت: الوداع لما يأتي ولا يصل
ورحت أبحث عما غاب من قمري
دع عنك موتك, وارحل أيها الرجل
وارحل وهاجر وسافر داخل السفر
ليس المكان مكانا حين تعقده
ليس المكان مكانا حين تنشده
وكلما حط دوري علي حجر
بحثت للقلب عن حواء ترشده
وكلما مال غصن صحت, كم عدد
الهجرات؟ عدد الأموات يا عدد
والعزف منفرد[২৬৫]

আমি বললাম, বিচ্ছেদ যখন আসে তখন তা মিলনের নয়
আমি চিরকাল সন্ধান করি আমার চাঁদের অদৃশ্য বিষয়
ছেড়ে দাও তোমার থেকে তোমার মৃত্যু, হে পুরুষ প্রস্থান করো।
প্রস্থান করো, হিজরত করো, ভ্রমণ করো ভ্রমনের ভেতর
স্থান আর স্থান থাকে না যখন তুমি তা হারিয়ে ফেলো
স্থান আর স্থান থাকে না যখন তুমি তা খুঁজে বেড়াও

[২৬৪]. মাহমুদ দারভীশ. আল দীওয়ান, আল আ'মাল আল উলা--৩. ২০০৫. পৃ. ৫০।
[২৬৫]. প্রাগুক্ত। ৩৩-৩৪।

যখন ভারুই পাখি নামে পাথরের উপর
তুমি সন্ধান করো হৃদয়ের জন্য পথনির্দেশকারী ঈভ
যখন ডাল হেলে পড়ে আমি চিৎকার করি। হে সংখ্যা
হিজরতের সংখ্যা আর কয়টি মৃত্যুর সংখ্যা আর কয়টি
অথচ বাদ্য নিঃসঙ্গ।

পঙক্তিগুলোতে কোনো আধ্যাত্মিক ইংগিত থাকতে পারে। যা হবে নগদ সঞ্চয়। কিন্তু এ আধ্যাত্মিকতা নিশ্চয়ই বাস্তবতার বাইরে অতিমাত্রিক কিছু নয়। মূলত এখানে দ্বীধাহীন চিত্তে মৃত্যুকে গ্রহণের আহবানই স্পষ্ট। এই মৃত্যুর একটি অর্থ- একটি অযাচিত স্থানকাল থেকে নতুন অবস্থার সন্ধানে বেরিয়ে পড়া। প্রস্থান করা। এছাড়া আর যে অর্থ এটি মৃত্যুর সাধারণ ভাব। নতুন অর্থের তালাশ করা, নতুন দেশকালের খোঁজ করার পুরুষোত্তম আহবানই এখানে মুখ্য হয়ে ওঠেছে। এর সাথে প্রতিটি পরতে পরতে কবির বিরহের করুণ সুর নিঃসঙ্গ বাজনায় বেজে ওঠেছে। তদুপরি কবির মৃত্যু অমর।

দারভীশের কবিতায় নারী এক ধরনের অবস্থা। যা ইতিহাসের সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করে। দারভীশ পরিচয় প্রশ্নে নারীকে সামনে আনেন। কারণ পরিচয় যেকোনো অর্থে– হোক তা ব্যক্তির কিংবা জাতীয় পরিচয়– নারীর সাথে পরিচয়ের সম্পর্ক এড়ানো সম্ভব নয়। ফলে ব্যক্তির উন্মেষ থেকে শুরু করে জাতীয় পরিচয় এবং জাতিসত্তার বিকাশে নারীপ্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবি প্রেম থেমে শুরু করে যেকোনো অর্থে মানবিক অস্তিত্বের সাথে কিংবা সত্তার ধারণা নারীকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। নারী যেকারণে যেমন কসমোলজিক্যাল তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের নানান জটিল অবস্থার স্মারকও বটে। কবি এখানে বিশেষভাবে নারীকে প্রেমের আধার হিসেবে দেখেছেন। তবে একইসাথে নারী সামগ্রিক অর্থে একটি প্রতীক হিসেবেও নির্ধারিত হয়ে উঠেছে দারভীশের আলোচনায়।

চতুর্থ অধ্যায়
ফিলিস্তিনঃ জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম, ইতিহাস এবং বিবিধ প্রেক্ষিত

মুক্তি কথাটির সর্বজনীন কোনো ধারণা লাভ করা মোটামুটি অসম্ভব। কিন্তু মুক্তি প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। কারণ খুব সাধারণ অর্থে মানুষ মুক্তির প্রশ্নে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করছে। শ্রেণীর দিক থেকে, পদ্ধতির দিক থেকে দেশকালভেদে মুক্তি বিশেষ বিশেষ রূপ হয়ে উঠতে পারে। সেদিক থেকে মুক্তি সত্য হয়ে উঠার বিষয়। অর্থাৎ এর একটি ঐতিহাসিক মর্ম আছে। ইতিহাসের গতি প্রকৃতি কিংবা বৈষয়িক সম্পর্কের ঐতিহাসিক রূপ আকারে মুক্তির ধারণা ও তৎপরতা তৈরি হয়। মুক্তির ধারণার জন্য প্রথমে প্রয়োজন ব্যক্তির মনে ও চিন্তায় স্বাধীন চৈতন্যের পরিপালন। চিন্তাগত দিক থেকে মুক্তির শর্ত হলো, মনে-প্রাণে কর্তাভাব জাগিয়ে তোলা। স্বাধীন কর্তৃত্ববোধ তৈরি করা। স্বাধীন চৈতন্য ছাড়া যেহেতু মুক্তি অসম্ভব, সে কারণে বাস্তবের কোনো সক্রিয়তাই মুক্তির জন্য সহায়ক হয়ে উঠতে পারে না। দারভীশ মুক্তির সম্ভাবনাকে বাস্তব, গণমুখী রাজনীতি ও জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকার সাথে মিলিয়ে দেখতে চান। জনগণ কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার অনুগামী ব্যবহারিক রাজনীতিই কেবল মুক্তির সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। ফিলিস্তিনের রাজনীতি ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা সবসময় জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বশীল শর্ত মেনে চলেনি। ফলে সেখানে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মুক্তির জন্য যুদ্ধই একমাত্র সমাধান নাকি শান্তি ও সমঝোতার পন্থা বেছে নিতে হয়েছিল ফিলিস্তিনের জাতীয় রাজনীতিকে? দারভীশ রাজনৈতিক সততার সাথে কখনো আপোষ করেননি। যাইহোক, রাজনৈতিক ইতিহাসের নানা ঘটনার সাথে দারভীশ তার অবস্থানকে সবসময় গণইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। দারভীশের কবিতায় দেখা যায়, মুক্তির জন্য শুধু রাজনীতিই যথেষ্ট নয়, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিমত্তা জরুরি। কারণ চিন্তার সাথে রয়েছে বিপ্লবের সম্পর্ক এবং মুক্তির অন্যতরো অর্থ।

৪.১: মুক্তির ধারণা, ইতিহাস, জাতীয় মুক্তি এবং ফিলিস্তিন
৪.২: স্বাধীনতা ও মুক্তি: কর্তাভাব ও চৈতন্য
৪.৩: শান্তি কিংবা মুক্তি-সংগ্রাম: ইতিহাস ও মাহমুদ দারভীশ
৪.৪: অসলো চুক্তি: ফিলিস্তিনের বদলে যাওয়া এবং দারভীশের ভিন্ন অভিযাত্রা
৪.৫: মুক্তির সম্ভাবনা, চলমান বিতর্ক এবং দারভীশ
৪.৬: স্বাধীনতা কিংবা মুক্তির রূপকল্প : চিন্তা, বিপ্লব ও রাষ্ট্র
৪.৭: আদ দিকতেতুরা: একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য কিংবা রাষ্ট্রগঠনের নতুন বয়ান ও মুক্তির প্রস্তাবনা
৪.৮: মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা: অন্যতরো অর্থের সন্ধানে

৪.১: মুক্তির ধারণা, ইতিহাস, জাতীয় মুক্তি এবং ফিলিস্তিন

মুক্তি ও স্বাধীনতার একটি অর্থ সাধারণ ও সর্বজনীন। অপর একটি অর্থ ঐতিহাসিক কিংবা বিশেষ। এই বিশেষ অর্থটি খুব আলোচ্য হয়ে ওঠে উপনিবেশিক সাহিত্যতত্ত্বের নানা ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক অর্থে মুক্তি এবং স্বাধীনতা সবসময় ঐতিহাসিক এবং বিশেষ। তবে ফিলিস্তিনের মুক্তি-সংগ্রাম সর্বজনীন এবং একইসাথে বিশেষও। গত কয়েক শতকে এতো দীর্ঘ সময় ধরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের যে নজির ফিলিস্তিনীরা সৃষ্টি করেছে তার আবেদন সর্বজনীনতা লাভ করেছে। মানুষের অন্টোলজিক্যাল (স্বত্তাসম্পর্কিত বিদ্যা) বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেমন সত্তাগত ফলে তা সর্বজনীন—কাজে মুক্তি কথাটার মধ্যে একটি সর্বজনীন অনুমান প্রাচীনকাল থেকেই কার্যকর। তারপরও *মুক্তি* নামক এই প্রত্যয় সবসময় একইরকম অর্থ ও আচরণ ব্যক্ত করে না। তার ঐতিহাসিকতা আছে। ইতিহাসের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত আছে। আছে দেশকাল বিশেষে সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ধর্ম-সমাজ-জাতির রাজনৈতিক প্রকাশ। এসব কিছু একটি জাতি হয়ে ওঠার মধ্যেই কেবল সীমিত থাকে না—বরং সে জাতির নিরন্তর ও যথার্থ লড়াই-সংগ্রাম তার আত্মপরিচয়ের চরিত্র, বর্গ ও সীমাও নির্ধারণ করে দেয়। ফিলিস্তিন জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা অর্জনের যে ক্রমাগত এবং ব্যাপকতর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে তার বিচার-বিশ্লেষণ বিভিন্নভাবে হতে পারে। সাহিত্য কিংবা কবিতায় সে বিচার এবং তার স্বরূপ-পরিব্যপ্তি কিভাবে ও কতোদূর বিস্তৃতি লাভ করতে পারে মাহমুদ দারভীশ এবং তার কবিতা এর গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে ওঠতে পারে।

ফলে এখানে স্বাধীনতা ও মুক্তির সম্ভাবনার সাথে ফিলিস্তিনী জাতির কর্তাসত্তা ও চৈতন্য ধারণের পদ্ধতিগত সম্পর্ক এবং দারভীশের কবিতার মধ্যদিয়ে কিভাবে তা প্রতিফলিত হয় তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। একইসাথে ফিলিস্তিনী জনগণের মুক্তির প্রেক্ষিত ও স্বরূপ বিবদমান রাজনৈতিকতার মধ্যে যেভাবে হাজির হয়েছে তার সম্পর্কে দারভীশের অবস্থান এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মুক্তির ঐতিহাসিক অভিমুখ বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

মুক্তি কথাটির সর্বজনীন কোনো ধারণা লাভ করা মোটামুটি অসম্ভব। অর্থাৎ ধারণা আকারে নয় নিছক বিষয় আকারে মুক্তি আপাত এ্যাবসোলিউট বা শাশ্বত। কিন্তু মুক্তি প্রচেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। কারণ খুব সাধারণ অর্থে মানুষ মুক্তির প্রশ্নে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করছে। শ্রেণীর দিক থেকে, পদ্ধতির দিক থেকে দেশকাল ভেদে মুক্তি বিশেষ বিশেষ রূপ হয়ে উঠতে পারে। সেদিক থেকে মুক্তি সত্য হয়ে ওঠার বিষয়। অর্থাৎ এর একটি ঐতিহাসিক মর্ম ও বাস্তবতা আছে। ইতিহাসের গতি প্রকৃতি কিংবা বৈষয়িক সম্পর্কের ঐতিহাসিক রূপ আকারে মুক্তির ধারণা ও তৎপরতা তৈরি হয়। এর যেমন প্রেক্ষিত আছে, ইতিহাস আছে তেমনি আছে তার অন্তর্গত ও বাস্তব দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া। মুক্তির সত্য সেকারণে বিচিত্র। নানারকম।

ঐতিহাসিকভাবে মুক্তি বা স্বাধীনতার যে সত্য আমরা সবসময় দেখি তার দৃশ্যমান বাস্তবতা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ বা সাধারণ অর্থে রাজনীতির গতি প্রকৃতির মধ্যদিয়ে সৃষ্টি হয়। সমাজ দেশকালভেদে এই রাজনীতি নানাভাবে ব্যক্ত হয়। সরাসরি যেমন রাজনীতি বিষয়ক দর্শন, তত্ত্ব বিশ্লেষণে এটি উঠে আসে তেমনি শিল্পকর্ম, সঙ্গীত, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাসসহ সাহিত্যের নানা মাধ্যমে এই মুক্তির চিত্র, স্বাধীনতা এবং তার স্মৃতি ও সারবস্তু পরিব্যক্ত হয়। দারভীশের চিন্তায় মনোনিবেশ করে দেখা যায়, এ সত্য আরো স্পষ্ট। কারণ পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতায় উৎপাদন সম্পর্কের বৈশ্বিক প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ যে আকারে হাজির তার মধ্যেই ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক গতিবিধি নির্ধারিত হচ্ছে। ফলে ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিবেচনায় রেখেই দানা বাঁধছে। অর্থাৎ ফিলিস্তিন আর নিছক একটি মধ্যপ্রাচ্যীয় ইস্যুই নয় ক্রমাগত এটি বিশ্ব রাজনৈতিক সংকটের মূল জায়গা হয়ে উঠতে পারে। ফিলিস্তিন প্রেক্ষাপটে এসব বুঝবার জন্য দারভীশ এবং তার রাজনৈতিক ও কাব্য তৎপরতা গুরুত্বপূর্ণ নিসন্দেহে। বিশেষ উল্লেখ্য, কাব্য কিংবা রাজনীতি যেখানে দারভীশের কাছে একটি লিপ্ততার প্রশ্ন, সক্রিয়তার ও যাপনের প্রশ্ন—যেখানে দুটি বিষয় আলাদা হয়েও একই বিষয়—ফিলিস্তিন—কিংবা একই ইস্যু নিয়ে কাজ করে ফলে সেখানে কবিতাকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা যায় না।

৪.২: স্বাধীনতা, মুক্তি: চৈতন্য ও কর্তাভাব

বর্গ হিসেবে *মুক্তি* সাধারণত ইংরেজি লিবারেশন (Liberation) শব্দের অনুকরণে ব্যবহার হয়। কোনো রাষ্ট্র বা জাতির রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করাকে মুক্তি হিসেবে দেখা হয়। ঐতিহাসিকভাবে মুক্তি শব্দটি নানা অর্থ নিয়ে হাজির হতে পারে। আধ্যাত্মিক মুক্তি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মুক্তি। যেহেতু শব্দটি প্রায় সবসময় একটি শর্তমূলক অবস্থার মধ্যে নিজের অর্থোৎপাদন করতে চায়—অর্থাৎ মুক্তি শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার মানেই হলো, কোনো একটি পরিস্থিতি পূর্বানুমান হয়ে আসে যেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রত্যয় তৈরি হয়। একটি অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে শব্দটি যেখান থেকে স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। কাজে প্রেক্ষিত বিচার করলে কেন ফিলিস্তিনের জন্য জরুরি হয়ে উঠলো মুক্তি এবং স্বাধীনতা? এ প্রশ্নের উত্তরেই রয়েছে এমন এক পরিস্থিতির আলোচনা যেটা ফিলিস্তিনীদেরকে মুক্তির সংগ্রামে নামতে বাধ্য করেছিল। আর সেই পরিস্থিতির নাম হলো প্রথমত ব্রিটেন এবং দ্বিতীয়ত ইজরাইল। ব্রিটেন চলে যাওয়ার পরে একই অবস্থায় আটকে থাকে ফিলিস্তিন।

অন্য অর্থে এই পরিস্থিতির আরেক নাম হলো ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা (Geopolitical Reality) কিংবা পেরিফেরি (Periphery)। নিপীড়ন বা জুলুমের সম্পর্ক রয়েছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সাথে। কেন জুলুমের ঘটনা ঘটে উপনিবেশ বিষয়ক ধারণাগুলোতে এটি একটি জরুরি প্রশ্ন। দেকার্তে (ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তে; ১৫৯৬-১৬৫০) যেমন বলেছিলেন, *আমি চিন্তা করি তাই আমি*

আছি (Cogito ergo sum)—এটি একটি বিখ্যাত দার্শনিক উক্তি। কিন্তু ব্যাপারটা এমন না যে, আমি আছি তাই চিন্তা করি। যুক্তিগত কারণে বরং অস্তিত্বের বিষয়টি যেহেতু প্রমাণের ইস্যু—অর্থাৎ আমি যে আছি এটা কিভাবে বোঝা সম্ভব? আমি চিন্তা করি তাই আমি অস্তিত্বমান। একইভাবে এমন অভিজ্ঞতার ঘটনা ঘটে নিপীড়ন আর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের ঘটনায়।

আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি—অস্তিত্বের সম্ভাবনার এবং নিশ্চয়তার প্রামাণ্য হিসেবে খ্যাত—এই যুক্তিযুক্ত বাক্য নিছক একটি বক্তব্য নয়, আধুনিক দুনিয়া-বিশেষত পশ্চিমা সভ্যতার বিকাশের ভিত্তি হয়ে ওঠে এই আপ্তবাক্য। এখানে মূলত 'আমি' (আই) কেন্দ্রীয় সাবজেক্ট-যা মূলত একটি দুনিয়ার ভিত্তি। আধুনিক মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ড এই 'আমি'কে কেন্দ্র করে আবর্তিত এবং বিকশিত। কিন্তু এই আমি মাত্রই একটি সময়ের চিহ্নও বটে-যা বিশেষ 'আমি'। আমি'র আর যা যা অর্থ সম্ভাব্য হতে পারে তার মধ্যে সেই 'আমি'ই বিশেষ যা তার অস্তিত্বকে তীব্রভাবে ঘোষণা দিতে পারে। অস্তিত্বময় দুনিয়ায় আলাদা করে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা দেয়ার অর্থাৎ আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি-বিষয়টি অধিবিদ্যাজনিত (Metaphysical) প্রত্যয় নয়। যেটি কেবল ধরা যায় অন্টোলজির (Ontology) মাধ্যমে। যার অস্তিত্ব মানে উৎপত্তি হয়েছে অন্যের উপর কর্তৃত্ব করার মধ্যদিয়ে। এছাড়া অস্তিত্বময় বিশ্বে আলাদা করে অস্তিত্ব দাবি করার কোনো অর্থ নাই। এটি পুরনো কোনো দার্শনিক প্রতর্ক (Discourse) নয়, এটি রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ও প্রক্রিয়াগুলোর সাথে সরাসরি যুক্ত। কারণ ইতিহাসের ক্রমবিকাশের যে পর্যায়ে আধুনিকতার কালপর্ব শুরু হয়েছে তার পাটাতনে ব্যক্তি ও আমি মূল খুঁটি হিসেবে প্রধান বিবেচ্য; সেকারণে 'আমি চিন্তা করি'র সবচেয়ে পরিষ্কার ও দৃশ্যমান বাস্তবতা হলো রাজনীতি-যার উদ্ভবের উৎস হলো 'ইগো' (অহং)। ফলে 'আমি চিন্তা করি' এর আগের বাক্যটি বস্তুত হওয়া উচিত 'আই কনকয়্যার'-আমি পরাভূত করি। অপর দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার যে অস্তিত্ব বা ভাষ্য-যার মহিমা মাত্রই রাজনীতি। এখানে সেন্টার বা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে 'আমি'। আর্জেন্টিনার প্রভাবশালী একাডেমিশিয়ান ও দার্শনিক এনরিক ডুসাল (Enrique Dussel: ১৯৩৪)-যিনি লিবারেশন বা মুক্তিবিষয়ক দর্শন ও তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত। ডুসালের একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য,

> That ontology did not come from nowhere. It arose from a previous experience of domination over other persons, of cultural oppression over other worlds. Before the ego cogito there is an ego conquiro; "I conquer" is the practical foundation of "I think." The center has imposed itself on the periphery for more than five centuries. But for how much longer? Will the geopoliti[1]cal preponderance of the center

come to an end? Can we glimpse a process of liberation growing from the peoples of the periphery?[২৬৬]

এখান থেকে অন্টোলজি আসেনি। অপরাপর মানুষের উপর কর্তৃত্ব এবং অপর বিশ্বের উপর সাংস্কৃতিক আধিপত্যের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই এমন অন্টোলজির উৎপত্তি। ইগো কজিটোর আগেই এখানে ইগো কনকোয়্যারো আছে; 'আমি পরাভূত করি' ('আই কনকোয়্যার') মূলত 'আমি চিন্তা করি'র বাস্তব ভিত্তি। পাঁচ শতাব্দীরও বেশি সময়কাল ধরে সেন্টার নিজেকে পেরিফেরির উপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আর কতোকাল চাপিয়ে রাখবে? সেন্টারের ভূরাজনৈতিক পূর্বকর্তৃত্বের কি শেষ হবে? আমরা কি লিবারেশন বা মুক্তির একটি প্রক্রিয়ার পূর্বাভাস দিতে পারি যেটি পেরিফেরির জনগণ থেকে ক্রমে উঠে আসবে?

ডুসালের লিবারেশনের ধারণায় 'সেন্টার' (Centre) এবং 'পেরিফেরি' (Periphery) বেসিক ক্যাটাগরি। একটি সিস্টেম কিংবা একটি ভূরাজনৈতিক পরিসর বা অঞ্চলের একটি কেন্দ্র থাকে। যেটি আর সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এবং এই সেন্টারকে কেন্দ্র করে অন্যসব কিছু আবর্তিত হয়। অন্যসব কিছু বলতে বুঝায় যাতে রয়েছে ক্ষমতা বলয়ের প্রান্তে অবস্থিত সীমান্ত পরিধি বা পেরিফেরি। সেন্টার এমন একটি ধারণা, যা তার ইগো বা সেল্ফের বাইরে আর সবকিছুকে আদার বা 'অপর' হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে তার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব যাদের উপর আরোপ করা হয় তারা সে অর্থে পেরিফেরি। পেরিফেরি সবসময় তার অস্তিত্বের অভিমুখকে সেন্টারের দিকে তাক করে রাখে। পেরিফেরি তাই সেন্টারের নিয়ন্ত্রণ ও নিপীড়ণের বস্তু ছাড়া মূলত আর কিছুই নয়। এটিই মূলত সেন্টারের 'আই কনকোয়্যার দেয়ারফোর আই এনস্লেভ'–ধারণার বাস্তবতা ও সারবস্তু। অর্থাৎ আমি পরাভূত করি তাই আধিপত্য বিস্তার করি এবং দাস তৈরির প্রক্রিয়া কায়েম রাখি। কারণ সেন্টার মনে করে, তার নিজের বাইরে যাকিছু 'আছে' (অস্তিত্বমান–বিয়িং) তা বস্তুত নাই। তুচ্ছ। একমাত্র সেন্টারই 'আছে' বা অস্তিত্বমান। এই যে সেন্টারের আছেময়তা এটাই কেবল 'আছে' () কিংবা সেন্টারই কেবল স্বাধীন অস্তিত্ব।

এই আলোচনা টেনে আনা হয়েছে মাহমুদ দারভীশের কবিতা বা চিন্তার জগত এবং ফিলিস্তিনের মুক্তির বিষয় বোঝার জন্য। ডুসালের লিবারেশন বিষয়ক এই তত্ত্ব-বিশ্লেষণকে একটি নমুনা হিসেবে ধরে নিলে এটা বোঝা সম্ভব যে, ঐতিহাসিকভাবে ইজরাইল বনাম ফিলিস্তিনের সম্পর্ক সেন্টার ও পেরিফেরির (কেন্দ্র ও প্রান্ত: কর্তৃত্ব এবং অধিপতিপরায়ণমূলক অবস্থা যেখান থেকে সূচিত হয় তাই কেন্দ্র অপরদিকে কেন্দ্রের আধিপত্য-কর্তৃত্ব যার উপর দিয়ে বয়ে যায় তাই হলো প্রান্ত।) মতোই একটি বিবদমান ঘটনা। কিন্তু এই আলোচনায়, মুক্তির ধারণা কিভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে তা

---

২৬৬. ডুস্যাল, এনরিক, *ফিলসফি অব লিবারেশন*, *(অ্যাকুইলিনা মার্টিনেজ ও ক্রিস্টাইন মরকোভস্কি কর্তৃক স্প্যানিশ থেকে অনূদিত)*, (নিউ ইয়র্ক: অরবিস বুকস, ১৯৮৫ খ্রি), পৃ. ৩।

বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। মুক্তির বিষয়টি মানুষের মাঝে হাজির হওয়ার জন্য সাব্জেক্টিভিটি (Subjectivity) জরুরি–যা ইতিহাসের বিশেষ লগ্নে মানুষকে একটি ব্যাপকতরো পটভূমিতে নিয়ে আসতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তৈরি করে তোলে। সাব্জেক্টিভিটি (Subjectivity), বলা বাহুল্য, ইংরেজি এই শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু গত শতকের শেষ দিকে অর্থাৎ উপনিবেশ বিষয়ক পাঠগুলোতে শব্দটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। মুক্তি বা স্বাধীনতা বিষয়ক ধারণার সাথে সাবজেক্টিভিটির সম্পর্ক রয়েছে। ব্যক্তির নিজস্ব জগত কিংবা ব্যক্তি বিষয়ক ধারণাগুলোর সাথে এর সম্পর্ক থাকলেও মনস্তত্ত্ব, মনোবিশ্লেষণমূলক অধ্যয়ন, ভাষা কিংবা সমাজ ও আধুনিক নৃতত্ত্বের পরিধিতে এর বিস্তৃর্ণ আলোচনা ও পাঠের ক্ষেত্র রয়েছে। আধুনিকতা গড়ে ওঠার সময়ে যেসব ধারণা ও দর্শন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার মধ্যে সাব্জেক্টিভিটি অন্যতম। ব্যক্তির গড়ে ওঠার সাথে সাবজেক্টিভিটির সম্পর্ক। ব্যক্তির নির্মাণে ইউরোপজুড়ে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার মূলে সাবজেক্টিভিটি জড়িয়ে আছে। ধর্মের বিপরীতে কিংবা আসমানি সম্পর্কের বাইরে সবকিছুর কেন্দ্রে এবং মৌলে ব্যক্তির সত্তা সার্বভৌম এবং নির্ধারক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে গাঠনিক উপাদান হিসেবে রয়েছে সাবজেক্টিভিটির ভূমিকা ও প্রকল্প। সাবজেক্টিভিটি বা কর্তৃত্ববোধ এমন ব্যক্তির নির্ধারক উপাদান। অন্য কারো দ্বারা চালিত না হয়ে ব্যক্তির স্বয়ংক্রিয় এবং স্বচালিত চৈতন্য ও বোধবুদ্ধির কার্যপ্রক্রিয়া ও বাস্তব সক্রিয় তৎপরতাই এর নিয়ামক শক্তি। এখানে ব্যক্তি যেমন ‘অপর’কে অনুমান করে তার অস্তিত্ব জানান দেয় তেমনি সাবজেক্ট ও অবজেক্টের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে কিংবা একটি স্বতঃসিদ্ধ সাবজুগেশনের (অপরকে কর্তৃত্বকরণের প্রক্রিয়া) মধ্যদিয়ে ব্যক্তির সাবজেক্টিভিটি গড়ে ওঠে। মোটকথা, ব্যক্তি কিংবা সাবজেক্ট সবসময় একটি ঊর্ধ্বতন সত্তা ও কর্তৃপক্ষ। ধর্মের বাধনমুক্তির বিষয়টি এরসাথে ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। স্বাধীনতা-মুক্তি কিংবা উপনিবেশ-বিরোধী পাঠগুলোতে অন্যতরো অর্থে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মুক্তির জন্য যে পৌরুষোচিত সত্তা বা দাসসুলভ উপনিবেশিত মনোবৃত্তির বিপরীতে যে কর্তৃবাচক ব্যক্তিত্ব জরুরি তা অর্জিত না হলে মুক্তির চৈতন্য বাস্তব হয়ে ওঠে না। কাজে মুক্তি ও স্বাধীনতাবিষয়ক ধারণার সাথে সাবজেক্ট কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তিন যখন ঐতিহাসিকভাবে নাকবা থেকে বের হতে চেয়েছিল তখন মূলত তারা ইতিহাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্টিভিটি ধারণ করার প্রক্রিয়া নিজেদের তৈরির পথে পদক্ষেপ সূচনা করল। যেখানে তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রত্যয় জড়িয়ে আছে তাদের সমস্ত সংগ্রাম ও স্মৃতিসত্তায়। মাহমুদ দারভীশের রাজনৈতিক চিন্তা ও তৎপরতায় এই সাবজেক্টিভিটি জাগিয়ে তোলার ব্যাপক এক প্রাণান্তকর চিন্তা ও আয়োজন লক্ষণীয়। তার কবি জীবনের প্রথম পদক্ষেপগুলোতে এই স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। দারভীশ তার নিজেকে এবং তার জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রশ্নে ক্রমাগত সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন নিরলসভাবে। প্রাথমিকভাবে কর্তাভাব (সাবজেক্টিভিটি) ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে জাগিয়ে তোলার বিকল্প নাই। দারভীশ প্রথমত এই কর্তাভাব ও কর্তাসত্তা জাগিয়ে তুলতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছেন তার কবিতায়-গদ্যে। অপরের দাসত্ব, দখলদারিত্ব ও আধিপত্যের বিপরীতে প্রথমতরো কাজ হলো আত্মোপলব্ধি। এই আত্মোপলব্ধির মূল বৈশিষ্ট্য হলো নিজেকে কর্তা মনে করা। দারভীশ যেমন *‘এবং সে ফিরে আসল... কাফনে (...وعاد في كفن)* কবিতায় বলেন,

শিশুদের জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল
যখন সকল মা জড়িয়ে ধরে লাশের খাট সন্তানের
দূর সফরের যাত্রী বন্ধুরা হে,
প্রশ্ন করো না: কখন সে আসবে
প্রশ্ন করো না এতো বেশি
বরং প্রশ্ন করো, কখন
জেগে উঠবে মানুষেরা...

((قلبي على أطفالنا))
وكل أم تحضن السريرا !
يا أصدقاء الراحل البعيد
لا تسألوا: متى يعود
لا تسألوا كثيرا
بل اسألوا : متى
يستيقظ الرجال ![২৬৭]

দারভীশের প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থগুলোতে সাধারণত জাতিগত নিপীড়ন, কষ্ট-যন্ত্রণা, দেশপ্রেম, দ্রোহ-ক্ষোভ, ইজরাইলী দখলদারিত্ব ও প্রতিরোধের অনুষঙ্গ বিপুলভাবে এসেছে। এরসাথে এসেছে স্বজাতিকে জাগিয়ে তোলার দৃপ্ত প্রত্যয়। সেদিক থেকে একজন কবির রাজনৈতিক বোধ ও চৈতন্য তার কবিতায় যেভাবে প্রতিফলিত হতে পারে তার মধ্যে তার জনগোষ্ঠীর জন্য সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অর্থাৎ ফিলিস্তিনী জনগণের মুক্তির প্রশ্ন কিভাবে দারভীশ রাজনৈতিক ব্যক্তিসত্তা হিসেবে ব্যবহার করেছেন তার চেয়ে বরং গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে তিনি মুক্তি বিষয়টি নিজের কবিতায় কিভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে কবিতা কিংবা রাজনীতির সম্পর্ক কী এই প্রশ্নের চেয়ে বরং বেশি প্রাসঙ্গিক তিনি যা বলতে চেয়েছেন তাতে একটি জাতির বোধ, স্বপ্ন-আশা ও প্রবল আত্মবিশ্বাস কিভাবে কবিতা থেকে জারিত করা সক্ষম। কবি প্রথমে 'শিশুকে' মনস্থ করলেন। একজন শিশুই যেহেতু ভবিষ্যতে বর্তমান হয়ে ওঠবে তাই শুরুতেই শিশুর মনোজগত ও ব্যক্তিত্ব লক্ষ্যবস্তু হওয়া প্রয়োজন। আর তার সাথে বড়দের প্রজন্মকে সম্পর্কিত করাও জরুরি। যেখানে ফিলিস্তিনী জাতির মুক্তি সংগ্রামের অভিযাত্রায় শিশু এবং পরিণত প্রতিটি মানুষই লড়াইয়ের অপরিহার্য অংশ। '*كنت لا أزال صغيرا*' কবিতায় কবি বলেন,

[২৬৭]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উ'লা-১* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লিল কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩১।

মনে করি না আমি সেসব,	أنا لا أذكرها لكنها
কিন্তু সে এক আশা ডুবিয়ে রাখে বাবার পৃথিবী	أمل يغرق دنيا أبويا
চোখে মুখে উষ্ণ আভা	ووميض ساخن في أعين
তার নীরবতা কথা বলে প্রতিভাদীপ্ত কবিতার	صمتها ينطق شعراً عبقريا
আর বড়দের কথা–স্বপ্ন ও চৈতন্যের কথা...	وحديث من عجوز، ورؤي
জাগিয়ে তোলে আমাদের ভিতর ঈমান ও বিশ্বাস	يقظات... توقظ الايمان فينا
জীবন্ত হৃদয়ে হৃদয়ে বিপুল ইন্তিফাদা	وانتفاضات قلوب حية
এবং এক সূচনা চাষ করে যাচ্ছে সিনাইর ভোর	وانطلاق يزرع الفجر السنيا
মনে করিনা আমি সেসব, কিন্তু সেসব তো কেবল	انا لا أذكرها، لكنها
অনেক ছবি চোখের কোটরে চাষ হতে থাকে নিরন্তর।	صور مزروعة في مقلتيا[২৬৮]

দারভীশের তারুণ্যের আদিপর্বের আরো কিছু পঙক্তিমালার দিকে নজর দেয়া যাক। এসব কবিতা দিয়ে দারভীশ তার কবিতার তারুণ্যকে অতিক্রম করে যান। এ পঙক্তিগুলোতে দেখা যায় জাতীয় মনন এবং জাতির অবিভাজ্যতা কিভাবে নির্মাণ করছেন একজন কবি। কিভাবে তার ফসল বুনে ফেলেছেন বিরাট বীজতলায়। একটি জাতি গঠনের প্রথম এবং মৌলিক দিক হলো তার কর্তৃত্ববোধ। স্বায়ত্ববোধ। আধুনিক ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মূল উপজীব্যটুকুই কবিতা আর চিন্তার মিলিত দাবির অপূর্ব সমন্বয়ে পঙক্তিবদ্ধ করেছেন কবি দারভীশ। দারভীশ বলেন,

• আমি একজন আরব...	أنا عربي..
কোনোরকম উপাধী ছাড়া আমিই একটি নাম	أنا اسم بلا لقب،
সময় সৃষ্টির আগে	جذوري
কালের পরিক্রমা শুরু হবার আগে	قبل ميلاد الزمان رست
ভারুই পাখি—জলপাই	و قبل تفتح الحقب
এবং ঘাসেদের জীবন নড়েচড়ে ওঠার আগেই	و قبل السرو و الزيتون
গভীরে প্রোথিত আমার শিকড়।	و قبل ترعرع العشب[269]

সময় আর স্থানের অপরিহার্যতা, কালের অধিবিদ্যাগত চৈতন্যকে কবি তার অহং আর আত্মপরিচয়ের মধ্যেই কেবল সনির্বদ্ধ রাখেননি এক পরম উদ্দীপ্ত পৌরুষোচিত দৃপ্ত উচ্চারণে নিজের এবং তার জাতির মানসে পরাধীনতা–জড়তা-বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে স্বাধীন হবার সর্বপ্লাবী আগুন জ্বালিয়ে দেন। সারা পৃথিবী দাপিয়ে কাঁপিয়ে অজানা মহাবিশ্ব পর্যন্ত নেতৃত্ব দেবার অফুরন্ত এবং দুঃসাহসিক এক প্রবল আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন কবি। কবির অগ্নিঝরা উচ্চারণ...

---

[২৬৮]. দারভীশ, মাহমুদ, *আছাফীরু বিলা আজনিহাতিন (প্রথম কাব্যগ্রন্থ)* (বৈরুত: দার আল আওদাহ, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ১৭।

[২৬৯]. দারভীশ, মাহমুদ, *আলু দীওয়ান, আল আ'মালুল উ'লা-১*, পৃ. ৮১।

আমি বরফে জ্বালিয়ে দেই আগুন	واشعل الثلج وأنتفض
শোণিতধারার গভীর থেকে	بانطلاق
আমি উত্থিত হই	من فؤادي ومن صميم
হৃদয়ের প্রবল সংবেদনায়	عروقي
একটি ডানা ডুবে যায় ক্ষতের মহিমায়	في شموخ الجراح غمس
আরেক ডানা পার হয়ে যায় মহাশূন্য	جناحا
পাথরের আকাশে দিগন্ত যায় কাঁপিয়ে	وجناح عبر الفضاء الطليق
দাপিয়ে এশিয়ার এক ঈগল।	زلزل الافق بانتفاضة نسر
তোমার জীবন মানে মহাবিশ্ব, সারা সৃষ্টিজগত	أسيوي علي سماء العقيق
এবং তোমার ডানা দুটি কেবল স্বাধীন	عمرك الكون والانام جميعا
উড্ডয়নের কাহিনী	وجناحاك قصة التحليق[270]

আত্মচৈতন্যে প্রখর বিশ্বাসী ছিলেন দারভীশ। মুক্তির ধারণায় দারভীশ প্রথমত নিজের চৈতন্যকে মুক্ত এবং স্বাধীন রাখতে প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মুক্ত থাকার শক্তি অর্জন হলে অপরের মুক্তির ধারণা লাভ করাটা তরান্বিত হয়। ফলে নিজের মুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নিজের মুক্তি কিভাবে সম্ভব? দারভীশ মনে করেন, নিজেকে এর জন্য যেকোনো খোপে, যেকোনো চিন্তা কিংবা মতাদর্শে আবদ্ধ রাখলে নিজের চৈতন্যকে সচেতন রাখা অসম্ভব। সেকারণে প্রথমেই জরুরি চিন্তার মুক্তি। কোনো বিশেষ চিন্তায় প্রতিনিয়ত আটকে
না থাকা। নিজের সত্তার ভিতর সেকারণে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম অপর আরো একটি সত্তার উপস্থিতি অপরিহার্য। যেন নিজেকে কোনো কল্পনায়, চিন্তায় নিত্য আবদ্ধ না থাকতে হয়। কবি তাই বলেন,

سأصرخ في عزلتي،
لا لكي أوقظ النائمين.
ولكن لتوقظني صرختي
من خيالي السجين![271]

একাকী চিৎকার করে ওঠি—এ কারণে নয় যে
কারো ঘুম ভেঙ্গে ফেলি
বরং নিজের কারারুদ্ধ কল্পনা থেকে
আমার ঘুম ভাঙ্গে আমারই চিৎকার

[২৭০]. দারভীশ, মাহমুদ, *আছাফীরু বিলা আজনিহাতিন*, ১৯৬০, পৃ. ১৭।
[২৭১]. দারভীশ, মাহমুদ, *হালাতু হিছার (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস, ২০০২ খ্রি.)*, পৃ. ৩৫।

কিংবা

بلادٌ علي أُهْبَةِ الفجر. صرنا أَقلَّ ذكاءً ،
لأَنَّا نُحَمْلِقُ في ساعة النصر:
لا لَيْلَ في ليلنا المتلألئ بالمدفعيَّة.
أَعداؤنا يسهرون وأَعداؤنا يُشْعِلون لنا النورَ
في حلكة الأَقبية.[272]

একটি দেশ ভোরের কিনারে তবু আমরা এতোটা সচকিত নই
বিজয়-লগ্নে আমরা যেহেতু গভীরভাবে দেখি না:
কামান-ট্যাঙ্কে চমকিত আমাদের রাতের ভিতর কোনো রাত নেই
শত্রুরা আমাদের জেগে আছে, বদ্ধঘরের ঘন অন্ধকারে আলো
আমাদের জন্য জ্বালিয়ে রাখে তারাই।

এবং..

لا تنامي .. حبيبتي
خلف شباكنا نهارْ !

سقط الوردُ من يدي
لا عبير , ولا خَدَرْ
لا تنامي.. حبيبتي
العصافير تنتحرْ
ورموشي سنابلٌ
تشرب الليلَ والقدرْ
صوتُك الحُلْوُ قبلةٌ
وجناحٌ على وترْ
غُصْنُ زيتونةٍ بكى
في المنافي على حجرْ
باحثاً عن أُصولهِ
وعن الشمس والمطرْ
لاتنامي .. حبيبتي
العصافير تنتحرْ
عندما يسقط القمر

২৭২. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০।

كالمرايا المحطمة
يشرب الظلُّ عارَنا
ونُداري فرارَنا
عندما يسقط القمر
يصبح الحب ملحمة[273]

ঘুমিয়ে পড়ো না প্রিয়তমা...
আমাদের জানালার আড়ালেই আছে এক উজ্জ্বল দিন!

আমার হাত থেকে পড়ে গেছে গোলাপ
কোনো ঘ্রান নেই, পর্দা নেই
ঘুমাইও না প্রিয়তমা...
আত্মহত্যা করছে পাখিরা
আমার চোখের পাতার রোমগুলো যেন গমের শীষ
তুমি পান করো রাতের অন্ধকার এবং নিয়তি
তোমার মিষ্টি কণ্ঠ যেন একেকটি চুম্বন
গিটারের তারের ওপর একটি ডানা
একটি ডাল জলপাইয়ের—কাঁদে তারা
পাথরে বসে নির্বাসনে মূলের খোঁজে
সূর্য ও বৃষ্টির সন্ধানে;
ঘুমিও না প্রিয়তমা...
আত্মহত্যা করছে পাখিরা
যখন বিচূর্ণ আয়নার মতো ঝরে পড়ে চাঁদ
আমাদের লজ্জা পান করে ছায়া
আমরা পালিয়ে ঘুরে বেড়াই
যখন ঝরে পড়ে চাঁদ
ভালোবাসা হয়ে ওঠে এক মহাকাব্য।

বিভিন্নভাবে কবি মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছেন। যার লক্ষ্য ছিল একটি জাতির মুক্তি এবং নির্মাণ। একজন ব্যক্তি মানুষের সকল সম্ভাবনাকে একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে নিবিষ্ট করার জন্য তিনি ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। শত্রুর সার্বিক অবস্থান থেকে, ব্যক্তির নিজের সীমাবদ্ধতা থেকে, অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্যতা থেকে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা কিংবা বৈচিত্র্য সংরক্ষণের দিক থেকে; শিল্পরুচি, প্রেম ও আধ্যাত্মবোধ থেকে, শ্রমিকতা থেকে—ইত্যাদি বহুবিধ অবস্থান থেকে কবি

২৭৩. দারভীশ, মাহমুদ, *আদ দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উ'লা-১*, পৃ. ১৯৫।

ফিলিস্তিনের জনসাধারণের মাঝে নিজেদের জাতিগঠন এবং জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতরো করে তোলায় সচেষ্ট ছিলেন। সেকারণে কবি রাজনৈতিক মুক্তি থেকে শুরু করে ব্যক্তির সকল বৈষয়িক মুক্তির অর্থ ও আবেদনকে নিজের চিন্তায় ও কবিতায় গ্রাহ্য করে তুলেছেন।

৪.৩: শান্তি কিংবা মুক্তি-সংগ্রাম: ইতিহাস ও মাহমুদ দারভীশ

ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ এবং তৎপরবর্তী সময়ে ইজরাইলের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয় তার ধরণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ক্রমাগতভাবে শুধু একটি যুদ্ধের মধ্যদিয়ে যায়নি ফিলিস্তিন। এখানে নানারকম রাজনৈতিক বোঝাপড়া ছিল। কূটনীতিক উদ্যোগ ছিল। যুদ্ধাবস্থায় বিভিন্ন সময়ে আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি সংঘটিত হয়। ফলে নিরেট যুদ্ধ বলতে যা বুঝানো হয়, এটি ঠিক তা নয়। সশস্ত্র লড়াই চলমান থাকা অবস্থায় অন্তর্বর্তী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে বারবার ফিলিস্তিন একাট্টা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করার পথ থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি ও সমঝোতার পন্থাও খুঁজে নিয়েছিল। ফলে মুক্তি কথাটা ফিলিস্তিনে সশস্ত্রতার মধ্যে আর আটকে থাকেনি। তারা প্রয়োজনে সশস্ত্র হয়ে ওঠে আবার প্রয়োজনে শান্তি ও সমঝোতার পথ অনুসরণ করে।

ফলে ফিলিস্তিনে মুক্তি শব্দটি ঐতিহাসিকভাবে যে অর্থ ও সর্বব্যাপী আন্দোলনের আবেদন সৃষ্টি করেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে তার একটা আনুষ্ঠানিক রফা হয়ে যায় ১৯৭৮ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের মধ্যস্থতায় সংঘটিত সমঝোতায়। যেটি ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি নামে বিখ্যাত। অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে ফিলিস্তিনীরা যে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে আসছিল এবং এরইমধ্যে তিনটি যুদ্ধেও তারা অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু এই সমঝোতা চুক্তির মধ্য দিয়ে সেই সশস্ত্র লড়াইয়ের পথ পরিহার করে তারা শান্তির পথে হাঁটা শুরু করল। এটি ছিল ইজরাইল বিরোধী ফিলিস্তিনীদের চলমান মুক্তির লড়াইয়েরইতিহাসে সবথেকে বড়ধরনের ঘটনা। কারণ এরপর ফিলিস্তিনীদের জাতীয় ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে গণমুখী সক্রিয়তা দৃশ্যমান ছিল তা এই চুক্তির মধ্য দিয়ে স্তিমিত হওয়া শুরু হয়। বলা যায় ভাঙ্গনের সূচনা ঘটে। কাজে মুক্তি কথাটার যে ঐতিহাসিক অর্থ ফিলিস্তিনীদের রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল তা ক্রমেই শান্তিবাদী ধারায় পর্যবসিত হয়। এরফলে শান্তির মধ্যে কিংবা শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যেই ফিলিস্তিন কিংবা দেশটির বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষগুলো ফিলিস্তিনী জাতির মুক্তি এবং মুক্তির ইচ্ছা দেখতে পায়। পরবর্তীতে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে ইজারাইলের প্রবল সহিংসতার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের গণপ্রতিরোধ বা ইন্তিফাদার ঘটনা ঘটে। তারপরও বেশ কয়েকটি শান্তি ও সমঝোতা চুক্তিও সংঘটিত হয়। মোটকথা, শেষপর্যন্ত শান্তি প্রক্রিয়াই যেখানে মুক্তির সমার্থক হয়ে ওঠে।

ফিলিস্তিনের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের সূচনা কিভাবে হয়েছে এবং কিভাবে বিস্তারিত ও জটিল হয়ে উঠেছে তার হদিস বিভিন্নভাবে পাওয়া সম্ভব। অপরদিকেফিলিস্তিনের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসের যেমন নানান পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে তেমনি দারভীশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কিংবা

ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তির লড়াই সম্পর্কেও দারভীশের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা গেছে। বিষয়টি অন্যভাবেও বলা যায়, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল পিএলও যে নীতি ও গঠনতন্ত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে তা তারা সবসময় ধরে রাখেনি। ক্যাম্প ডেভিড থেকে শুরু করে অসলো পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি জাতীয় ইস্যুতে বিশেষত ইজারাইল-ফিলিস্তিন প্রশ্নে পিএলও তার নীতি ও অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিল। ফলে দারভীশকেও তার অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তবে দারভীশ সবসময় পার্টির অবস্থান অনুসরণ করেননি।দারভীশ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি নিয়ে যেমন সমালোচনা করেছিলেন তেমনি সর্বশেষ অসলো চুক্তির প্রবল বিরোধী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও দারভীশ গণমানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার যে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে সাথে নিয়েই তিনি তার পথ পরিক্রমা অনুসরণ করে গেছেন। ফিলিস্তিনীদের এই গণচৈতন্য ধারণ করতে গিয়ে দারভীশ বিপুল লড়াইয়ের মুখোমুখী হন। এটা ছিল তার কবি ব্যক্তিত্ব ও একইসাথে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ধরে রাখার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। প্রবল আত্মবিশ্বাসী কবিসত্তা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সম্মিলনে দারভীশ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থেকেও নিজেকে আলাদা করে রাখার সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য ধারণ করার ফলে দারভীশকে পিএলও'র সমালোচনা করতে কোনোরকম টানাপোড়েনে ভুগতে হয়নি। এডওয়ার্ড সাঈদের একটি বক্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো। সাঈদ বলেন,

> He never belonged to any political party; his mordant wit, fierce political independence, and exceptionally refined cutural sensibility kept him at a distance from the frequent coarseness of Palestinian and Arab politics.[২৭৪]
>
> তিনি কোনো রাজনৈতিক দলকে কখনো আপন করে নিতে পারেননি; তার জ্বালাময়ী রস, তীব্র রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং ব্যতিক্রমী পরিশীলিত সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা তাকে ফিলিস্তিন ও আরব রাজনীতির সাধারণ রূঢ ও স্থুল অবস্থা থেকে কিছুটা দূরত্বে রেখেছে।

মাহমুদ দারভীশ ফিলিস্তিনী সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের কর্তাসত্তা আকারে খোদ নিজের এবং তার জনগোষ্ঠীর মুক্তির মানস একইসঙ্গে ধারণ করেন। এই কর্তাসত্তা কিংবা মুক্তির চেতনা ব্রিটিশ উপনিবেশিকোত্তর সময়ে যেভাবে গড়ে উঠেছিল নাকবা পরবর্তীকালে সেই চৈতন্য নতুন করে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ফিলিস্তিন ক্রমাগত ধর্ম-বর্ণ ও সংস্কৃতির নানা প্রশ্নসহ আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে যায়। কবি হিসেবে জাতীয় রাজনীতির এসব জটিল সম্পর্ক এবং লড়াই

---

২৭৪. সাঈদ, এডওয়ার্ড, *অন মাহমুদ দারভীশ* (নিউ ইয়র্ক: জেন স্টেইন, গ্র্যান্ড স্ট্রিট, ৪৮ তম সংখ্যা, অবলিভিওন-উইনটার, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১১২।

সংগ্রামের যে রক্তাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় তাতে যুগপৎভাবে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করতে সক্ষম হন দারভীশ।

চরম সংঘাতময় বৈরী অবস্থার মধ্যে ফিলিস্তিনের সংগ্রাম ও প্রতিরোধের প্রক্রিয়াগুলো গড়ে উঠলেও সুবিধাজনক কোনো অবস্থায় পৌঁছাতে পারেনি। কারণ আগে থেকেই ইজরাইল নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে সক্ষম হয়। কিছু সুবিধা তারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে এমনিতেই পেয়ে যায়। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল হিসেবে একদিকে ব্রিটিশদের ফিলিস্তিনে শাসন প্রতিষ্ঠা সেইসাথে জায়নবাদীদের ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের ব্যাপক সুযোগ তৈরি করে দেয়। একইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলও ছিল ইজরাইলের সম্পূর্ণ অনুকূলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যদিয়ে দুনিয়াব্যাপী উপনিবেশিক শাসনের অবসানে নতুন করে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি ও ক্ষমতার সূত্রপাত ঘটে। এ অবস্থা ইজরাইলের জন্য ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে বড়ধরনের ইতিবাচক ঘটনা। তাতে ইজরাইলের জায়োনবাদী পরাক্রম অশেষ বিষফোঁড়া হয়ে ওঠে আরব ফিলিস্তিনীদের জন্য। এমন রক্তাক্ত বলিবৎ সময় ফিলিস্তিনীদেরকে একটি জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তির লড়াইয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। দারভীশের বেড়ে ওঠা ছিল এই সংঘাতময় ও বিপর্যয়তিষ্ট কালপর্বে। এমন পরিস্থিতিতে কবিতা কিংবা ভাষার ক্ষমতা রাজনৈতিক শক্তি ও তৎপরতার সাথে একাকার হয়ে জেগে ওঠে দারভীশের অন্তর্গত সত্তায়। তাঁর কাব্যচেতনা সেই সময়ের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও শর্তের জায়গাগুলো পাঠ করে ক্রমবিকশিত হয়েছে নিসন্দেহে। অর্থাৎ চলমান ইতিহাস, সাধারণ মানুষ, জাতীয় জীবন আর নিজের অভিযাত্রা ও বিচলনকে একই সমতলে নির্ণয় করে দারভীশ ফিলিস্তিন প্রশ্ন কিংবা দেশটির রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন মোকাবেলা করতে চেয়েছেন।

ফিলিস্তিনের পটভূমিতে মুক্তির ইতিহাস যেভাবে শুরু হয়েছিল তা একই গতিতে একই বৈশিষ্ট্যে এগিয়ে যায়নি। বিচিত্র তার ইতিহাস। ১৯২০-এ ম্যান্ডেটরি ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই মুক্তি সংগ্রাম আরো বেগবান হয়ে ওঠে। নানান ঘটনার সূত্রপাত ঘটে ফিলিস্তিন ও আরব দুনিয়ার সেসময়ের পরিস্থিতিগুলোতে। এক পর্যায়ে উত্তেজনামুখর পরিস্থিতিতে আরব ইজরাইল যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। ইাজরইল রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা ছিল এই যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ফলাফল আর যে মুক্তিযুদ্ধ ফিলিস্তিনীরা শুরু করেছিল তার মধ্যেই তাদের আরো প্রবলভাবে নিবিষ্ট হওয়ার তাগিদ তাদের তাড়া করে। একটা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে আরেকটি বন্দিদশায় তাদের নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছিল। ফলে তাদের যুদ্ধ থেমে থাকেনি। ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৭৬ ছিল তাদের সরাসরি মুক্তি সংগ্রামের কতগুলো ঘটনার দিকচিহ্ন। ১৯৪৮ এর পর দ্বিতীয় নাকবা থেকেই দারভীশ প্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

মস্কোর পাঠ চুকিয়ে ১৯৭০ এর শেষ দিকে মিশরে এসে সেখানে ১৯৭২ পর্যন্ত অবস্থান করেন দারভীশ। তার এক বছর পর ১৯৭৩ সালে কবি পিএলও-য় যোগদান করেন।[২৭৫] আনুষ্ঠানিকভাবে পিএলওতে যোগদানের মধ্য দিয়ে দারভীশ ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূল প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেন। এটি ছিল ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বৈধ প্রক্রিয়া। যেখানে সম্পৃক্ত হয়ে দারভীশ ফিলিস্তিনের মূল ধারার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।১৯৭৩ সালে তিনি বৈরুতে ফিরে আসেন তবে ফেরার আগেই তাকে মাতৃভূমি ফিলিস্তিনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইজরাইল।

১৯৬৪ এর ২৮ মে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পিএলও। দারভীশ সে সময় একেবারে তরুণ ছিলেন। তারুণ্যের কালেতার বিদ্রোহী মানস ইতিমধ্যে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থে তীব্রভাবে উপস্থিত। চিন্তাভাবনায় মেজাজেছিলেন আপোশহীন। এই আপোশহীনতা দারভীশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।দেখা যায়,ইজরাইলের সাথে যেকোনো ধরনের শান্তি উদ্যোগের ব্যাপারে দারভীশ বেশ কঠোর ছিলেন[২৭৬]। দারভীশ মনে করতেন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মুক্তি কেবল ইজলাইলের সাথে সশস্ত্র উপায়েই সম্ভব। এর বাইরে আর কোনো পথ সন্ধানের বিরোধী ছিলেন তিনি। পিএলও'র আদর্শ ও নীতিও ছিল তাই। ১৯৬৪ সালে দলটি যে চার্টার বা জাতীয় ভাষ্য প্রণয়ন করে ইজরাইল প্রশ্নে সেটিও ছিল অত্যন্ত আপোশহীন। মূলত এ চার্টারই ছিল পিএলও'র আদর্শিক ঘোষণাপত্র যেটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়েআহমদ সুরিয়ানির নেতৃত্বে প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে ইয়াসির আরাফাত পিএলও'র প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর একই নীতি বহাল রাখেন।

১৯৭৪ সালে পিএলও একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল–যার লক্ষ্য ছিল মাতৃভূমি ফিলিস্তিনে একটি রাষ্ট্র গঠন করা। পিএলও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি ছিল জোটটির বড় ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনা।[২৭৭] তবে পরের বছর ১৯৬৮ সালে পিএলও তাদের চার্টারে কিছুটা সংশোধন আনে। তাতে পরবর্তী দশবছর সামনে রেখে তারা তাদের রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করে–এতে তারা ইজরাইলের সাথে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমঝোতা ও সংলাপের নীতি অন্তর্ভুক্ত করে।[২৭৮] পিএলও'র নীতি ছিল ফিলিস্তিনী সকলকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করা।[২৭৯] মাহমুদ দারভীশের মনস্তত্ত্ব আর পিএলও'র তৎপরতার মধ্যে কিঞ্চিত অভিন্ন চরিত্র দেখা যায়। তদুপরি

[২৭৫]. *মাহমুদ দারভীশ: আল সীরাহ আল জাতিয়াহ (মাহমুদ দারভীশ ফাউন্ডেশন)*, *ভিজিট: ২৫ এপ্রিল ২০২৩*, https://mahmouddarwish.ps/article/645/السيرة-الذاتية, তবে কোনো কোনো গ্রন্থে ১৯৭২ সালে দারভীশ পিএলও-তে যুক্ত হন বলে উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ড. আলী আল কাইয়্যিম, *মাহমুদ দারভীশ: সাজ্জিল! আনা আরাবিয়্যুন (আল কুতুব.কম, ২০০৮)*, *ভিজিট: এপ্রিল ২৭*, ২০২৩, *https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-*

[২৭৬]. আবু ঈদ, মুনা, *মাহমুদ দারভীশঃ লিটারেচার এন্ড দ্য পলিটিক্স অব প্যালেস্টাইন আইডেন্টিটি*, (লন্ডন, নিউয়র্ক: আই. বি. তাউরিস কো. লি., ২০১৬ খৃ.), পৃ. ১৩৯।

[২৭৭]. প্রাগুক্ত।

[২৭৮]. *প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশান (পিএলও): হিস্ট্রি এন্ড ওভারভিউ* (যুক্তরাষ্ট্রঃ জুইশ ভার্চুয়াল লাইব্রেরি), ভিজিটঃ ৪ মার্চ ২০২২, https://www.jewishvirtuallibrary.org/history-and-overview-plo)

[২৭৯]. উল্লেখ্য, মিশরের কায়রোয় আরব লীগের নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালের ২৮ মে প্রতিষ্ঠিত হয় পিএলও। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জাতীয় জোটবদ্ধ সংগঠন পিএলও। কব্বান, হেলেনা, *দি প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশান: পিপল, পাওয়ার এন্ড পলিটিক্স* (যুক্তরাজ্যঃ ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪ খ্রি)।

পিএলও'র রাজনৈতিক অভিমুখ ক্রমাগত অহিংস পন্থায় যেমন গড়িয়েছে তেমনি একটা তীব্রতর উদারনৈতিক পন্থায় নিজেদের পর্যবসিত করতে হয়েছে জাতীয় মুক্তির এই দিশারীকে। কিন্তু পিএলও'র সাথে ঠিক সেভাবে দারভীশের অভিযাত্রা স্থির হয়নি। দারভীশ ভিন্ন দিকে তার যাত্রা ঠিক করে নিয়েছেন। কারণ পিএলও'র উদারনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থান শেষপর্যন্ত দারভীশ মেনে নিতে পারেননি। মাহমুদ দারভীশ শান্তির পথ শেষপর্যন্ত বেছে নিলেও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে শত্রুমিত্রের সীমারেখার কথা তিনি ভুলে যাননি।[২৮০]

দারভীশ সবসময় ইজরাইলের সাথে শান্তি প্রশ্নে কঠোর নীতি অনুসরণ করে যাননি। তার অস্থির ব্যক্তিত্বএকইসাথে রাজনীতির নানা গতিবিধি–অবস্থান পরিবর্তনের পেছনে একটা কারণ ছিল।১৯৭৪ সালে পিএলও একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল–যার লক্ষ্য ছিল মাতৃভূমি ফিলিস্তিনে একটি রাষ্ট্র গঠন করা। পিএলও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি ছিল জোটটির বড় ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনা।[২৮১] দারভীশ তার অবস্থান পিএলও'র সিদ্ধান্তে পরিবর্তন করেন অর্থাৎ রাষ্ট্র গঠন প্রশ্নে একমত হন। বস্তুত এটি ছিলইজরাইলের সাথে শান্তি প্রক্রিয়া বিষয়ে বোঝাবুঝির প্রশ্নে পিএলও'র একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। এধরনের সিদ্ধান্তে আসাটা ছিল বড়ধরনের চ্যালেঞ্জ, কারণ পিএলও বরাবরই একটি র‍্যাডিকেল নীতি অবলম্বন করে আসছিল–যাতে তাদের একটি নিয়মিত শসস্ত্র গ্যারিলা বাহিনী ছিল। যাদের লক্ষ্য ছিল শুধু শসস্ত্র লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে ইজরাইলী দখল উচ্ছেদ করে ১৯৪৮ সনের দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। পিএলও প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মাথায় এ সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৬৭ সালে। তবে পরের বছর ১৯৬৮ সালে পিএলও তাদের চার্টারে কিছুটা সংশোধন আনে। তাতে পরবর্তী দশবছর সামনে রেখে তারা তাদের রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণ করে–এতে তারা ইজরাইলের সাথে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সমঝোতা ও সংলাপের নীতি অন্তর্ভুক্ত করে।[২৮২] পিএলও'র নীতি ছিল ফিলিস্তিনী সকলকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করা।[২৮৩]

মাহমুদ দারভীশের মনস্তত্ত্ব আর পিএলও'র তৎপরতার মধ্যে কিঞ্চিত অভিন্ন চরিত্র দেখা যায়। তদুপরি পিএলও'র রাজনৈতিক অভিমুখ ক্রমাগত অহিংস পন্থায় যেমন গড়িয়েছে তেমনি একটা তীব্রতর উদারনৈতিক পন্থায় নিজেদের পর্যবসিত করতে হয়েছে জাতীয় মুক্তির এই দিশারীকে। কিন্তু পিএলও'র সাথে ঠিক সেভাবে দারভীশের অভিযাত্রা স্থির হয়নি। দারভীশ ভিন্ন দিকে তার যাত্রা ঠিক করে নিয়েছেন। কারণ পিএলও'র উদারনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থান শেষপর্যন্ত দারভীশ মেনে নিতে পারেননি। উদারনৈতিক কথার অর্থ হল, জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে পিএলও'র যে আদর্শিক নীতি তা থেকে সরে গিয়ে কূটনৈতিক পন্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে তারা গণমানুষের মুক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছার বিপরীতে

---

[২৮০]. আবু ঈদ, মুনা, *মাহমুদ দারভীশঃ লিটারেচার এন্ড দি পলিটিক্স অব প্যালেস্টাইন আইডেন্টিটি*, (লন্ডন, নিউইয়র্ক: আই. বি. তাউরিস কো. লি., ২০১৬ খৃ.), পৃ. ১৩৯।

[২৮১]. প্রাগুক্ত।

[২৮২]. *প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও): হিস্ট্রি এন্ড ওভারভিউ*, https://www.jewishvirtuallibrary.org/history-and-overview-plo

[২৮৩]. উল্লেখ্য, পিএলও মূলত কতগুলো রাজনৈতিক দলের জাতীয় জোট সংগঠন। কারণ ১৯৬৭-এ পিএলও'র প্রধান নীতি ছিল, ইজরাইল

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর দেয়া প্রস্তাবনার মধ্যে ফিলিস্তিনের নিয়তি নির্ধারণ করে নিয়েছেন। মাহমুদ দারভীশ শান্তির পথ শেষপর্যন্ত বেছে নিলেও জাতীয় মুক্তির প্রশ্নেশত্রুমিত্রের সীমারেখার কথা তিনি ভুলে যাননি।[২৮৪]

দারভীশের চিন্তা ও রাজনৈতিক তৎপরতায় নানা ওঠানামার প্রবণতা ছিল। দারভীশ তার কঠোর অবস্থান তথা সহিংস নীতি থেকে পিএলও'র মতোই সরে গিয়েছিলেন।সরে যাওয়াটা ঠিক পিএলও'র মতো ছিল না। সহিংসতা থেকে অহিংস পন্থায় যাত্রা করলেও দারভীশ সবসময় জাতীয় আত্মমর্যাদা রক্ষায় প্রতিরোধ এবং শত্রু মোকাবেলার একটি পন্থা ঠিক রেখেই নিজের অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। দারভীশ মনে করতেন এটিই ছিল ফিলিস্তিনী জাতি ও জনমানুষের ইচ্ছার জায়গা। কঠোরতা থেকে অহিংস অবস্থায় যাওয়ার মধ্যে অনেক স্ববিরোধ ও চড়াই উৎরাই ছিল তারপরওএর একটি পর্যায়ক্রমিক ধারাও তার জীবনযাত্রায় লক্ষ করার মতো। তার জীবদ্দশার সূচনা লগ্নে যে কঠোর বিদ্রোহী মনোভাব দেখা গেছে ক্রমাগত তা কিভাবে শান্তিতে লীন হয়েছে এর একটা পর্যায়ক্রমধারা তুলে ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

দারভীশের জীবন শুরু হয় একটি ট্রাজেডিক পরিস্থিতিতে। ইজরাইলি দখলদারিত্ব ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ তার শৈশবের কোমল চিন্তাপটে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। গ্যালিলির আল বিরওয়ায় নিজের বাস্তুভিটার ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার সকল অস্তিত্ব তাকে স্বাধীনতা কিংবা ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধের নিবিড় উপলব্ধির সামনে সহসা স্থির করে দিয়েছিল। অতি শৈশবেই দারভীশ নিজের আত্মপরিচয় আর মুক্তির মানস নিয়ে বেড়ে ওঠেন। এই মুক্তি যেমন তার নিজের তেমনি তার জাতির। গণমানুষের। দারভীশ জন্ম নিয়েই আগুন দেখেছেন, আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে ধ্বংসের তীব্রতা আর নৃশংস রক্তের স্রোত দেখেছেন। ট্যাংক, কামানসহ বড় বড় যুদ্ধ মেশিনের ক্ষীপ্রতা দেখেছেন। দেখেছেন মাইলের পর মাইল পুড়ে যাওয়া– বোমা ও বোলডোজারে বিধ্বস্ত ঘর বাড়ির বিরান ভূমির ভূতুড়ে পরিস্থিতি। দেখেছেন ইজরাইলের সহিংস যুদ্ধ এবং তাদের অসংখ্য গণহত্যা আর লাশের সংখ্যাতত্ত্ব। অবরোধ, দেয়াল নির্মাণ, পানির লাইন বন্ধ করে মেরে ফেলার ঘৃণ্য তৎপরতার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী হয়ে আছেন। এসব কিছু তাকে ভারাক্রান্ত করেছে। তার ভাষাকে শক্তি দিয়েছে। দিয়েছে দ্রোহের মহিমা। দিয়েছে ভাষায় বর্ণে অক্ষরে ছন্দে ছন্দে গর্জে ওঠার বীজ বপনের নান্দনিক কৌশল। দিয়েছে মুক্তি আর স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবীত করে মানুষকে জাগিয়ে তোলার অদম্য এক ব্যক্তিত্ব।

ফিলিস্তিনের প্রতিটি ঘটনাই তার কবিতাকে নির্মিতি দিয়েছে। কবিতায় উঠে এসেছে সাধারণ জনমানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিটি বিষয় আশয়। দারভীশের কবিতা এবং তার সার্বিক তৎপরতা লক্ষ করলে তার কাব্যিক এবং চিন্তার অভিযাত্রায় মোটামুটি চার ধরনের উত্তরণ বা পর্ব শনাক্ত করা

---

[২৮৪]. আবু ঈদ, মুনা, *মাহমুদ দারভীশঃ লিটারেচার এন্ড দ্য পলিটিক্স অব প্যালেস্টাইন আইডেন্টিটি*, (লন্ডন, নিউইয়র্ক: আই. বি. তাউরিস কো. লি., ২০১৬ খৃ.), পৃ. ১৩৯।

যায়। পর্যায়গুলো পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় দারভিশ ফিলিস্তিনের মুক্তির প্রশ্নে কি করে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছেন। একইসাথে মুক্তি কথাটি শান্তির ধারণায় ক্রমাগতভাবে যে রূপ নিয়েছে তাতে ফিলিস্তিনের জাতীয় চৈতন্যের একটি বিকশিত এবং পরিণত পটভূমি তার কবিতা কিংবা মানসভূমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তবে ফিলিস্তিনের প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক *আদিল আল আসতাহ* দারভীশের কবিতার অভিযাত্রাকে ছয়টি পর্যায়ে চিহনিত করেন।[২৮৫] এসব উত্তরণ পর্যায় পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় দারভিশ ফিলিস্তিনের মুক্তির প্রশ্নে কি করে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছেন।

১৯৬০ থেকে ১৯৬৮'র এই সময়ে মাহমুদ দারভীশের সাত থেকে আটটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সময়কালটি ছিল দারভীশের কবিতা ও জাতীয় চিন্তায় লিপ্ত থাকার প্রাথমিক পর্যায়। এতে দারভীশ ফিলিস্তিনীদের দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা-প্রেম-ভালোবাসা, ইজরাইলি দখলদারিত্ব, বিপ্লব, লড়াই ও শহীদদের বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষ যে দিকটি এই সময়ে তার কবিতার প্রধান দিক হয়ে ওঠে তা হলো প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তি কিংবা জাতীয় আত্মপরিচয়।[২৮৬] এরইমধ্যে প্রতিরোধের কবি হিসেবে অভিহীত হন দারভীশ। গাসসান কানাফানি প্রথম তাকে এই নামে অভিষিক্ত করেন[২৮৭]। এছাড়া রাজা আল নাক্কাশ ১৯৬০ সালে তার *শাইর আল আরদ আল মুহতাল্লাহ*-গ্রন্থে দারভীশের পরিচয় দিয়েছেন প্রতিরোধের কবি হিসেবে। তবে নাক্কাশ দারভীশকে প্রধান প্রতিরোধের কবি হিসেবে অভিহীত করেন।[২৮৮]

দ্বিতীয়ত, ১৯৬৯ পর থেকে ১৯৮৮ সনে প্রথম ইন্তেফাদা পর্যন্ত আরেকটি কালপর্ব। এ সময়ে অনেক ঘটনা ঘটে যায় ফিলিস্তিনে। সময়কালটি বিশেষ কিছু ঘটনা পরম্পরায় এগিয়ে যায় যাতে একটি জাতির সমকালের সাধারণ প্রবণতা শনাক্ত করা সম্ভব। ব্যক্তি মাহমুদ দারভীশ যেখানে ফিলিস্তিনের জনগোষ্ঠীকে বোঝার একটি রূপক হয়ে ওঠেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠেন। হয়ে ওঠাটা ঐতিহাসিকভাবে জরুরি হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক নানা পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। দৃশ্যত,চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধ, রুশ যাত্রা, মিশর-লেবাননে অবস্থান, মাতৃভূমিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, পিএলওতে যোগদান, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি,শাবরা-শাতিল আরব গণহত্যা, পিএলও'র কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়া,স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়নসহ ইত্যাদি অনেক উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। জাতীয় জীবনের এসব ঘটনাবলীতে কোনো না কোনোভাবে দারভীশের সম্পৃক্ততা ছিল। এর বাইরে তার ব্যক্তি জীবনেও কিছু ঘটনা উল্লেখযোগ্য ছিল। 'রীতা'

---

[২৮৫]. আসতহ, আল আদিল, *মাহমুদ দারভীশ ওয়া মারাহিলুহু আল শি'রিয়্যাহ* (আল আন্তোলজিয়া, ভিজিট: ১০ মার্চ, ২০২০ খ্রি.), *https://alantologia.com/blogs/26765/*

[২৮৬]. ইউসুফ, বারাহমেহ, *দি পোয়েট্রি অফ মাহমুদ দারভীশ: আ স্টাডি অব দি থ্রি ডেভেলপমেন্ট ফেজেস অফ হিজ পোয়েটিক ক্যারিয়ার*, (যুক্তরাজ্য: রিসার্চগেট, https://www.researchgate.net/publication/316191506_The_Poetry_of_Mahmoud_Darwish_A_Study_of_the_Three_ Developmental_Phases_of_his_Poetic_Career:)

[২৮৭]. কানাফানি, গাসসান, *আদাব আল মুকাওয়ামাহ ফী ফিলিস্তিন আল মুহতাল্লাহ ১৯৪৮-১৯৬৬* (ত্রিপলি: দার আল মানশুরাত আল রমাল, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৮-১১১।

[২৮৮]. আল নাক্কাশ, রাজা, *শাইর আল আরদ আল মুহতাল্লাহ* (কায়রো: দার আল হিলাল, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৭।

নামের ইজরাইলী এক নারীর সাথে তার সম্পর্কের অবসান, বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, হার্ট অ্যাটাকের শিকার, জায়োনিস্ট কবি লেখকদের তীব্র সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠা, ইজরাইল কর্তৃক কবিতা নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। প্রায় এক দশকের এ সময়কালজুড়ে দারভীশের চিন্তায় এসব ঘটনাবলীর পরিষ্কার ছাপ লক্ষ করা যায়। এ সময়ে রাজনৈতিক সংহতি এবংজাতীয় ঐক্য-চিন্তা এবং জাতীয় মুক্তির চিন্তা দারভীশের চিন্তার প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। ফলে জাতীয় সংহতি নির্মাণ, জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধ কমিয়ে সাধারণ প্লাটফর্ম গড়ে তোলা, স্বাধীন ও পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হওয়া–এধরনের বিষয়গুলোতে দারভীশ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছিলেন।

দারভীশ *রীতা* নামের যে ইজরাইলি নারীর প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, তার সাথে তার ইতি ঘটে যায় ১৯৬৭ এর আরব ইজরাইল যুদ্ধের মধ্যদিয়ে। ব্যক্তিগত এ অভিজ্ঞতা তার কবিতা ও রাজনৈতিক চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে।[২৮৯] তার প্রকৃত নাম তামার বেন অমি (Tamar Ben-Ami)।[২৯০] কিন্তু কবি জীবনের এ প্রেম ঐতিহাসিক হয়ে যায় বিশ্লেষকদের কাছে। অন্য এক তাৎপর্যের সন্ধান তারা খুঁজে নিয়েছেন। যে প্রেম শেষপর্যন্ত দারভীশের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। যাতে দেখা যায়, দারভীশ ইজরাইল আর জায়োনিজমকে কি করে আলাদা করে নিয়েছেন–অর্থাৎ জায়োনিস্ট রাষ্ট্র কাঠামো এবং তার রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো দূরে রেখে ইজরাইলের সাধারণ মানুষের সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও ধারণার উদাহরণ হয়ে ওঠে এ প্রেম। কিন্তু জায়োনিস্ট ইজরাইলী আগ্রাসনের হলাহলের মধ্যে এ সম্পের্কের অবসান হলেও ইজরাইলী জনগণের সাথে মৈত্রী স্থাপন ও ফিলিস্তিন-ইজরাইলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চিন্তা দারভীশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এধরনের অবস্থান উদারনৈতিক হলেও রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক কাঠামো এড়িয়ে দুই দেশের জনগণের মাঝে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার যে চিন্তা রাজনৈতিক দিক থেকে তার তাৎপর্য অপরিসীম। কৌশলগত কারণে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে মিত্রতা গড়ে তোলার যে প্রজ্ঞা দারভীশ তার 'রিতা' নামক কবিতার ভাষায় বিস্তার করেছেন মূলত তাই ফিলিস্তিনী জনগণের রাজনৈতিক শক্তির উত্থানে গভীর জ্বালানীর মতো। কবিতার ভাষায় দারভীশ বলেন,

آه.. ريتا
بيننا مليون عصفور وصوره
ومواعيدُ كثيرة
أطلقتْ ناراً عليها.. بندقيّةٌ[291]

হায়... রীতা
আমাদের মাঝে লক্ষ লক্ষ চড়ুই আর তার রূপছবি
বিপুল মিলনভূমি

---

[২৮৯]. *দি বিগ রিভীল: দি আইডেন্টিটি অব মাহমুদ দারভীশ'স ইনফ্যামাস লাভার 'রিতা' ফাইনালি রিভীলড (ভিজিট: ২৫ এপ্রিল ২০২৩)*, https://www.albawaba.com/entertainment/mahmoud-darwish-595919

[২৯০]. ফারবার, অ্যালোনা, *হোয়েন দি প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল পোয়েট ফেল ইন লাভ উইথ আ জু (ভিজিট: ২৫ এপ্রিল ২০২৩)*, https://www.haaretz.com/jewish/.premium-palestinian-poet-in-love-with-a-jew-1.5250557

[২৯১]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান আল আ'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ২০১।

আগুন যাতে নিক্ষেপ করছে এক রাইফেল।

এখানে যে *রাইফেল* (বান্দুকিয়্যাহ) শব্দটি দেখা যায়, যা দৃশ্যত কবিতার ভাষায় দুই দেশের জনগণকে আলাদা করে দিয়েছে। রাইফেল মানে এখানে সামরিক প্রক্রিয়া যা মূলত ইজরাইল ও জায়োনিস্ট চিন্তা ও প্রক্রিয়ার রূপক হয়ে এসেছে। কবিতাটি যখন লিখেছেন তখনো দারভীশ পিএলও'য় যোগদান করেননি। কিন্তু তাতে পিএলও'র নীতি ও অবস্থানের সাথে দারভীশের অবস্থান এক হয়ে যায়না যেমন তেমনি দারভীশকে একাট্টা শান্তিবাদীও বলা যায় না। কবিতাটিতে প্রেমের আখ্যান বর্ণিত হওয়ায় আপাত অহিংসবাদী মনে হতে পারে দারভীশকে। কিন্তু দারভীশ এখানে পরোক্ষভাবে ইজরাইলের সমালোচনা করেছেন। রিতাকে নিয়ে আরো একটি কবিতা লিখেছেন ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত *'আল আছাফীরু তামূতু ফিল জালিল'* কাব্যগ্রন্থের 'রিতা... আহিবীনী' কবিতায়। এখানেও প্রায় একই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। তৃতীয় আরেকটি সময়কাল ছিল ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত । রাজনৈতিক মতবিরোধ, সমালোচনা, রাজনীতি থেকে সরে আসা এবং নতুনতরো কাব্যের সন্ধান ছিল এ সময়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯৯৬ থেকে ২০০৮–এ সময় ছিল দারভীশের কবিতা ও চিন্তার অভিযাত্রায় চতুর্থ বা শেষ কালপর্ব। মৃত্যু, প্রতিরোধ দর্শন, দেশচিন্তা এবং রূহানিয়াত কিংবা পরমার্থিকতা এ সময়ের কবিতাকে প্রবলভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

কিন্তু দারভীশ শান্তিবাদী নাকি সহিংস এমন একটি প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। ফিলিস্তিন প্রশ্নে ঠিক কোন অবস্থান দারভীশকে নিতে হয়েছিল। প্রশ্নটি রাজনৈতিক অবশ্যই। রাজনৈতিক ইস্যু মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে এমন সরলরৈখিক সমিকরণে দারভীশকে বোঝা যায় না। তবে শান্তি প্রশ্নের চেয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তির প্রশ্ন ছিল তার কাছে জরুরি প্রশ্ন।[২৯২] ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম গদ্যগ্রন্থ *ইয়াওমিয়্যাত আল হুজন আল আদী* (يوميات الحزن العادي)। বইটিতে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রশ্নে দারভীশকে আলোচনা করতে দেখা যায়। ১৯৪৮ সালে সংঘটিত আরব-ইজরাইল যুদ্ধ পরবর্তী ইজরাইলে আরব-ফিলিস্তিনীদের আত্মপরিচয় সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে মন্তব্য করেন মাহমুদ দারভীশ। তাতে খানিক ব্যাখ্যা করে মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আসেন। দারভীশ বলেন,

> When the war ended, the structure set up to maintain the balance in Israeli Arab identity collapsed, and the humiliation of the Arab world upset the foundations of this sacrosanct hope, which had previously helped to maintain stability. It was difficult to feel confident that the contradiction in the identity was only temporary. An unusual and critical situation had arisen, voices were for

[২৯২]. আবু ঈদ, মুনা। পৃ. ১৩৯।

advocating a sacred war of liberation, but salvation did not come.[২৯৩]

পতিত আরব পরিচয় এবং আরব দুনিয়ার উপর চাপিয়ে দেওয়া লাঞ্ছনা-নিপীড়ন এমন পবিত্র প্রত্যাশার ভিত্তিগুলো নড়বড়ে করে দেয় যা স্থিতিশীলতা রক্ষায় একসময় সহায়ক ছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরব পরিচয় এবং নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষায় ইজরাইলে একটা কাঠামো বা প্রাতিষ্ঠানিকতা গড়ে ওঠে। পরিচয়ের সংঘাত যে সাময়িক মাত্র সেটা আস্থার সাথে অনুভব করাটা কঠিন হয়ে পড়েছিল। একটা অস্বাভাবিক সংকটাপন্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার জন্য একটি পবিত্র যুদ্ধের পক্ষে আওয়াজ উঠেছে ঠিক কিন্তু মুক্তি আসেনি।
এখানে মুক্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে একটি ফারাক টেনেছেন দারভীশ। লিবারেশন শব্দটি মুক্তি অর্থে ব্যবহার হয়। সালভেশন স্বাধীনতা অর্থে। এবং সালভেশন বা স্বাধীনতা একটি পরম ও সর্বজনীন বিষয়। দুটি শব্দের মধ্যে যে ফারাক দেখিয়েছেন তাতে একইসাথে মুক্তি ও স্বাধীনতার তাৎপর্য পরিষ্কার। কিন্তু শান্তি কথাটি ব্যবহারিক দিক থেকে দুই অর্থে ব্যবহার হয়। শান্তি–যেটি মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে অর্জিত হয় কিংবা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সাধারণ এবং সর্বজনীন অর্থে প্রকাশিত। এর বাইরে শান্তির আরেকটি অর্থ রয়েছে–যেটি যুদ্ধের বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়–যা মূলত প্রত্যক্ষ এবং দৃশ্যমান বাস্তবতায় একটি রাজনৈতিক আচারকে নির্দেশ করে। কৌশলগত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তর্গত একটি ক্যাটাগরি বা বর্গ এই শান্তি। বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে যুদ্ধপরিস্থিতি এড়িয়ে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তার নাম শান্তি। কাজে ব্যবহারিক রাজনীতির দিক থেকে শান্তি কথাটি মূলত একটি অবস্থার পরের বা মধ্যবর্তী ঘটনা। যা তার আগের অর্থাৎ যুদ্ধ বা সশস্ত্রতার পর্যায়কে নির্দেশ করে। যখন রাজনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় যুদ্ধই একমাত্র উপায় হয়ে ওঠাটা ঐতিহাসিক বাস্তবতায় জরুরি হয়ে যায় তখন শান্তি কথাটার অর্থ মূলত যুদ্ধ প্রক্রিয়ারই অন্তর্গত একটি কৌশল হতে পারে। যেখানে যুদ্ধ এবং শান্তি বস্তুত একটি অবিভাজ্য ঘটনা। সম্পূরক প্রক্রিয়া। মাহমুদ দারভীশের কাছে ফিলিস্তিন প্রশ্নের সমাধান শান্তি থেকে আলাদা করে শুধু যুদ্ধ কিংবা সশস্ত্রতা বাদ দিয়ে শুধু শান্তি এভাবে একতরফা হয়ে এগিয়ে যায়নি।

যুদ্ধ–সংঘাত একইসাথে মুক্তি ও শান্তি–এরকম একটি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায় দারভীশের বিখ্যাত কবিতা 'আবিরুনা ফী কালামিন আরাব'-এ। কবিতাটিতে ফিলিস্তিনীদের মুক্তির প্রশ্নে ইজরাইলের

---

২৯৩. দারভীশ, মাহমুদ, *জার্নাল অব অ্যান অর্ডিনারি গ্রিফ (ইয়াওমিয়্যাত আল হুজন আর আদী)*, আরবী থেকে অনুবাদ: ইবরাহীম মোহাবী (নিউইয়র্ক: আর্কিপিলেগো বুকস, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১৩৩।

বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের আগুন ঢেলে দিয়েছেন দারভীশ। প্রেক্ষিত বিচারে সে সময়টাও ছিল বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। শাবরা শাতিল আরব গণহত্যার রক্ত শুকিয়ে যায়নি তখনো–অপরদিকে ইজরাইলি আগ্রাসনও বন্ধ হয়ে যায়নি–ঠিক এম অবস্থায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার আয়োজন শুরু করে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ পিএলও। এরইমধ্যে ফিলিস্তিনজুড়ে সংঘটিত হয় ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রথম ইন্তেফাদা–যেখানে আগুন ছড়িয়ে দারভীশ লিখলেন,

অতএব আমাদের অধিকার রয়েছে আমাদের ভূমিতে যা ইচ্ছা করার
এখানে অতীত আমাদের
প্রথম আদিম জীবনের কণ্ঠস্বর আমাদের
আমাদের আছে বর্তমান, ভবিষ্যৎ
এখানেই আমাদের ইহকাল পরকাল
সুতরাং বের হয়ে যাও আমাদের ভূমি থেকে
বের হয়ে যাও আমাদের স্থলসীমা থেকে... সমুদ্র থেকে
যব থেকে লবণ থেকে... আমাদের ক্ষতস্থানগুলো থেকে
সবকিছু থেকে, বের হয়ে যাও স্মৃতির শব্দভাণ্ডার থেকে

فلنا في أرضِنا ما نعمل
ولنا الماضي هنا
ولنا صوت الحياة الأول
ولنا الحاضر، والحاضر، والمستقبل
ولنا الدنيا هنا... والآخرة
فاخرجوا من أرضنا
من برنا ..من بحرنا
مِن قمحنا .. مِن ملحنا .. مِن جرحنا
من كل شيء، واخرجوا
من مفردات الذاكر[294]

কবিতাটি যখন লিখছিলেন দারভীশ তখন প্যারিসে অবস্থান করছিলেন। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে আরবী ভাষাভিত্তিক সাময়িকী *প্যারিস উইকলি*-তে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে কবিতাটি চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল পুরো ইজরাইলে। রাজনৈতিক পক্ষগুলো থেকে শুরু করে সাধারণ ইহুদিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কারণ ইৎরাইলীদের বের হয়ে যেতে বলছেন কবি। এই বক্তব্য তারা সহ্য করতে পারেনি। ইৎরাইলের প্রবল প্রতিবাদ ও বিরোধিতার কারণে কবিতাটি নিষিদ্ধ করে জায়োনিস্ট কর্তৃপক্ষ। কবিতাটি ইৎরাইলীদের নেতিবাচক সমালোচনায় এতো বেশি মিডিয়া কাভারেজ পেয়েছিল যে, তাতে পুরো আরব বিশ্ব ছাড়িয়ে পশ্চিমা দুনিয়া পর্যন্ত এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার ফলে সারা আরবে কবিতাটির বিক্রি হয়েছিল বিপুল। ধারণা করা হয়, লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়েছিল এ কবিতার। তবে সংখ্যার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এর সার্কুলেশন যে ছিল বিপুল তাতে কোনো সন্দেহ নাই।[২৯৫] সে সময় হিব্রু ছাড়াও ইৎরাইলের সবকটি উপভাষায় ব্যাপকভাবে অনূদিত হয় এ কবিতা। পুরো কবিতাটি এখানে তুলে ধরা হলো:

---

[২৯৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *আবিরুনা ফী কালামিন আবির* (জর্ডান: আল আহলিয়াহ লি আল নাশর ওয়া আল তাওজী', ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩।
[২৯৫]. হোসেন, ইফতেখাইর, *মাহমুদ দারভীশ: দি এক্সপ্রোপ্রিয়েটিড পোয়েট* (ভিজিট: ২৫ এপ্রিল ২০২৩), https://www.observerbd.com/news.php?id=153099

أيها المارُّون بين الكلمات العابرة
احملوا أسماءكم وانصرفوا
واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، و انصرفوا
وخذوا ما شئتم من زرقة البحر و رمل الذاكرة
و خذوا ما شئتم من صورٍ كي تعرفوا
أنَّكم لن تعرفوا
...كيف يبني حجرٌ من أرضنا سقف السماءْ

أيها المارُّون بين الكلمات العابرة
منكم السيف – ومنَّـا دمنا
منكم الفولاذ والنار- ومنَّـا لحمنا
منكم دبابة أخرى- ومنا حجرُ
منكم قنبلة الغاز- ومنا المطرُ
وعلينا ما عليكم من سماء وهواء
فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا
وادخلوا حفل عشاء راقصٍ.. وانصرفوا
.وعلينا، نحن، أن نحرس ورد الشهداءْ
!و علينا، نحن، أن نحيا كما نحن نشاء

أيها المارُّون بين الكلمات العابرة
كالغبار المُرّ مرّوا أينما شئتم ولكنْ
لا تمروا بيننا كالحشرات الطائرة
فلنا في أرضنا ما نعملُ
و لنا قمح نربِّيه و نسقيه ندى أجسادنا
: و لنا ما ليس يرضيكم هنا
حجر... أو حَجَلُ
فخذوا الماضي، إذا شئتم، إلى سوق التحفْ
و أعيدوا الهيكل العظمي للهدهد، ان شئتم،
.على صحن خزف
فلنا ما ليس يرضيكم: لنا المستقبلُ
ولنا في أرضنا ما نعمل

أيها المارُّون بين الكلمات العابرة
كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة ، وانصرفوا
وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس

أو إلى توقيت موسيقى مسدس
فلنا ما ليس يرضيكم هنا ، فانصرفوا
ولنا ما ليس فيكم : وطن ينزف و شعباً ينزف
وطناً يصلح للنسيان أو للذاكرة

أيها المارُّون بين الكلمات العابرة
آن أن تنصرفوا
وتقيموا أينما شئتم ولكن لا تقيموا بيننا
آن أن تنصرفوا
ولتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتو بيننا
فلنا في أرضِنا ما نعمل
ولنا الماضي هنا
ولنا صوت الحياة الأول
ولنا الحاضر، والحاضر، والمستقبل
ولنا الدنيا هنا... والآخرة
فاخرجوا من أرضنا
من برنا ..من بحرنا
مِن قمحنا .. مِن ملحنا .. مِن جرحنا
من كل شيء، واخرجوا
من مفردات الذاكرة[296]

ক্ষয়িষ্ণু শব্দের মাঝে চলাচলকারীরা হে
তোমাদের নামধাম নিয়ে চলে যাও
আমাদের সময়ের ভিতর থেকে তোমাদের মুহূর্তগুলো
প্রত্যাহার করে নাও এবং ফিরে যাও।
স্মৃতির ধুলোমাটি এবং সমুদ্রজীবীকার যা চাও নিয়ে যাও
ছবিগুলোর যা চাও নিয়ে যাও, যেন চিনতে পারো
তোমরা কখনো জানবে না...
কিভাবে আকাশে আমাদের ভূমির একটি পাথর নির্মিত হয়

ক্ষয়িষ্ণু শব্দের মাঝে চলাচলকারীরা হে
তোমাদের আছে তরবারি—আমাদের আছে রক্ত
তোমাদের আছে ধাতব স্টিল আগুন—আমাদের আছে মাংসপিণ্ড
তোমাদের আছে ট্যাঙ্ক—আমাদের আছে পাথর

২৯৬. দারভীশ, মাহমুদ, *আবিরুনা ফী কালামিন আবির*

তোমাদের আছে গ্যাস বোমা—আমাদের আছে বৃষ্টি
তবে বাতাসে অন্তরীক্ষে তোমাদের যাকিছু আছে আমাদেরও তাই আছে
সুতরাং আমাদের রক্তে বুঝে নাও তোমাদের হিস্যা, আর চলে যাও
এবং ঢুকে পড়ো নাচেভরপুর নাইটক্লাবে এবং ফিরে যাও...
এবং আমরা, আমাদের শহিদদের গোলাপ রক্ষা করা অনিবার্য
এবং আমরা, আমাদের মতো আমাদের বেঁচে থাকা অননিবার্য

ক্ষয়িষ্ণু শব্দের মাঝে চলাচলকারীরা হে
উত্যক্ত ধুলার মতো যেখানে ইচ্ছা চলে যাও
তবে ওড়ন্ত পতঙ্গের মতো আমাদের মাঝে চলাচল করোনা
আমাদের ভূমিতে আমাদের যা ইচ্ছা করার অধিকার আছে
আমাদের আছে গম আমরা যার যত্ন নিই প্রতিনিয়ত, যাতে পানি দিই
আমাদের শরীরের ঘাম থেকে।
আমাদের অধিকার আছে কিছু করার যা তোমাদের খুশির নয়, যেমনঃ
পাথর... লজ্জা...
সুতরাং যদি চাও অতীত নিয়ে চলে যাও প্রাচীন বাজারে
যদি চাও ফিরিয়ে আনো মাটির পাত্রে হুদহুদ পাখির হাড় কঙ্কাল
সুতরাং আমাদের অধিকার আছে কিছু করার যা তোমাদের খুশির নয়, যেমনঃ
আমাদের আছে ভবিষ্যৎ, আছে আমাদের ভূমিতে আমাদের যা ইচ্ছা করার অধিকার

ক্ষয়িষ্ণু শব্দের মাঝে চলাচলকারীরা হে
তোমাদের অলীক কল্পনাগুলো জমা করো পরিত্যক্ত গর্তের ভিতর এবং চলে যাও
এবং পবিত্র গোবৎসের বৈধতার জন্য কিংবা রিভলভারের সংগীতের সময় ঠিক
করার জন্য ফিরিয়ে নিয়ে আসো আবার ঘড়ির কাঁটা
অতএব আমাদের অধিকার আছে এমন কিছুর যা তোমাদের খুশির কারণ নয়
সুতরাং চলে যাও। আমাদের যাকিছু আছে বস্তুত তোমাদের তা নেইঃ আছে এমন
দেশ যেখানে নিয়ত রক্ত ঝরে, আছে এমন জাতি নিত্য যারা রক্তাক্ত হয়ে ওঠে
আছে এমন মাতৃভূমি স্মৃতি কিংবা বিস্মৃতির জন্য যে ভূমি তৈরি হয়ে আছে

ক্ষয়িষ্ণু শব্দের মাঝে চলাচলকারীরা হে
তোমাদের সময় হয়েছে চলে যাওয়ার
যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকো বসতি করো, কিন্তু
আমাদের মাঝে আর তোমরা থাকতে পারবে না
তোমাদের সময় হয়েছে চলে যাওয়ার

এবং তোমাদের যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে মরো, কিন্তু
আমাদের এখানে আর মরো না।
সুতরাং আমাদের ভূমিতে আছে আমাদের যা ইচ্ছা করার অধিকার
এখানে আছে আমাদের অতীত
আছে এখানে আমাদের প্রথম জীবনের কণ্ঠস্বর
এখানেই আমাদের বর্তমান এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ
এখানেই আমাদের ইহকাল... পরকাল
অতএব বের হয়ে যাও আমাদের ভূমি থেকে
আমাদের সমস্ত স্থলসীমা থেকে, আমাদের সমুদ্র থেকে
আমাদের শস্য থেকে, আমাদের লবণ থেকে, আমাদের ক্ষত থেকে
সবকিছু থেকে, এবং বের হয়ে যাও
ডায়রির প্রতিটি শব্দ থেকে

কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর ইজরাইলি সাংবাদিক এমোস কেনান, নাতান জ্যাকসহ অনেক কবি সাহিত্যিক দারভীশের রূঢ় সমালোচনা করেছেন। জায়োনিস্ট পত্রিকাগুলো তখন উঠে পড়ে লাগে। *জেরুজালেম পোস্ট* বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করেছিল। যার শিরোনাম করেছিল, *When the Moderate Turned Bitter*, এবং *Unrepentant Poet*; *হারেৎজ* দারভীশকে কটাক্ষ করে *Unrepentant Poet* শিরোনাম করে। হারেৎজে এক কলামিস্ট তার লেখায় মন্তব্য করেন, *যদি দারভীশ আমাদেরকেই এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়, তাহলে তো তাকেই প্রথমে বহিষ্কার করা ছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প থাকবে না* ("If Darwish wants to expel us from here, we won't be left with any choice but to expel him first.")।[২৯৭] ইজরাইলের হিব্রু ভাষাভিত্তিক প্রাচীন দৈনিক *হারেৎজের* সাংবাদিক হেদা বোশাস এ প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।[২৯৮] বোশাস কবিতাটি প্রকাশের ঘটনাকে *ইজরাইলের মুখে থাপ্পড়* হিসেবে মন্তব্য করেন।[২৯৯] সাইবেরিয়ান ইহুদি বংশদ্ভূত মার্কিন লেখক অ্যামিল অ্যালকেলি মন্তব্য করেন,

> That poetry has been turned into a lethal weapon may be the only sigh of comic relief and hope in an atmosphere where daily tragedies have taken on the sickening pall of life as usual: Acceptable reactions to Darwish's poem seem to conclude that after the bombs

---

[২৯৭]. অ্যালকেলি, অ্যামিল, *হু'জ আফ্র্যাইড অব মাহমুদ দারভীশ?* (শিকাগো: মিডল ইস্ট রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন প্রজেক্ট, ১৯৭১ খ্রি., ভিজিট: ৩ মার্চ ২০২২), https://merip.org/1988/09/whos-afraid of-mahmoud-darwish/
[২৯৮]. আবু ঈদ, মুনা। পৃ. ১৪০।
[২৯৯]. জর্জ ডি. মফেট, *ইজরাইলি লেফ্‌ট ফাইন্ডস ওয়ার্ডস লাইক স্টোনস ক্যান হার্ট* (যুক্তরাষ্ট্র: দি খ্রিস্টিয়ান সাইন্স মনিটর, ১৯৮৮ খ্রি.), https://www.csmonitor.com/1988/0405/olect.html

and guns and stones, the natives have now had the audacity to attack "us" with words.[300]

কবিতাটিকে একটি ভয়ানক মারণাস্ত্রে রূপ দেয়া হয়েছে। যেটি এমন কোনো পরিস্থিতিতে আশা আর কৌতুকময় স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস হতে পারে যেখানে স্বভাবতই ক্লান্তিকর জীবনের উপর ভর করে আছে প্রতিদিনের ট্রাজেডি: দারভীশের কবিতার গ্রহণযোগ্য প্রতিক্রিয়াগুলো দেখে মনে হয়, পাথর, বন্দুক আর বোমার পর স্থানীয়দের এখন স্পর্ধা তৈরি হবে আমাদেরকে ভাষা দিয়ে হামলা করার।

বোশাস আরো বলেন,

This time he has written an unequivocally political document – a challenge to our existence here.[৩০১]

এ মুহূর্তে তিনি যা লিখেছেন এটি আমাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটি দ্ব্যর্থহীন রাজনৈতিক দলিল– একটি চ্যালেঞ্জ।

কবিতার প্রতিক্রিয়া এতদূর গড়িয়েছিল যে, ইৎরাইলের নেসেটে দারভীশ এবং তার *আব্রিনা ফী কালামিন আবিরিন* নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হয়। শেষপর্যন্ত এটি ফিলিস্তিনের সাথে ইৎরাইলের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর টানাপোড়েন শুরু হয়। চাপ তৈরি হয় পিএলও'র উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের উপর। পিএলও'র সাথে আলোচনার প্রস্তাবও আসে। যদিও প্রশাসন এবং উচ্চ পর্যায়ের নেতারা পিএলও'র সাথে কোনো প্রকার সংলাপকে নাকচ করে দেন। তাদের বক্তব্য ছিল দারভীশ ইচ্ছা করে এটি করেছে।[৩০২] কবিতার বিষয়টি তখন পিএলও'র জন্য সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে ফিলিস্তিন-ইজরাইল এর রাজনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকে। সময়টি ছিল মূলত ইজরাইল-ফিলিস্তিন এর সংকট নিরসনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা চলমান শান্তি উদ্যোগের প্রাথমিক দিককার পর্যায়। যেটা পিএলও'র জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু কবিতার ইস্যুটি তাতে ফিলিস্তিন-ইজরাইল সম্পর্কে আস্থার সংকট তৈরির কারণ হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক *দি খ্রিস্টান সাইন্স মনিটর* এর কূটনৈতিক সাংবাদিক ও গবেষক জর্জ ডি. মফেট দারভীশের কবিতার ইস্যুকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হওয়া বিতর্ক ও

৩০০. অ্যালকেলি, অ্যামিল, *হু'জ আফ্র্যাইড অব মাহমুদ দারভীশ?*

৩০১. আবু ঈদ, মুনা। পৃ. ১৪০।

৩০২. জর্জ ডি. মফেট, ইজরাইলি লেফট ফাইন্ডস ওয়ার্ডস লাইক স্টোনস ক্যান হার্ট (দি খ্রিস্টিয়ান সাইন্স মনিটর, ৫ এপ্রিল ১৯৮৮, ভিজিট: ৩ মার্চ ২০২২), https://www.csmonitor.com/1988/0405/olect.html

প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে দুই দেশের কূটনৈতিক পর্যায়ের আপাতকালীন সংকট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

> A poem written by a Palestinian has produced a crisis of faith on the Israeli left. In conjunction with four months of unrest, the poem is also helping weaken public support for the idea of negotiating the future of the occupied territories with Arab leaders, several observers say. This shift could complicate the current peace initiative of United States Secretary of State George Shultz, who met here yesterday with top Israeli leaders.[303]
>
> একজন ফিলিস্তিনীর লেখা একটি কবিতা ইজরাইলের বামাদের কাছে আস্থার সংকট সৃষ্টি করেছে। কয়েকজন পর্যবেক্ষকের মনে করেন, চারমাস ধরে চলা বিবদমান অস্থিরতার সাথে মিলিয়ে দেখলে আরব নেতাদের সাথে অধিকৃত অঞ্চলের/সীমানার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার ধারণার প্রতি জনসমর্থনকে দুর্বল করতে সহায়ক হয়ে উঠবে এই কবিতা। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব জর্জ শুলৎজ– যিনি গতকাল ইজরাইলের শীর্ষ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন– তার নেয়া চলমান শান্তি উদ্যোগে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে কবিতাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এ পরিবর্তন।

পরিস্থিতির উত্তেজনা দেখে কবি শঙ্কিত হয়ে পড়েননি অবশ্য। তবে এক পর্যায়ে মন্তব্য করেছেন। ১৯৮৮ এর মার্চের ২২ তারিখে ফিলিস্তিনের কবি এবং দারভীশ তার বন্ধু সামিহ আল কাসিমকে লেখা এক চিটিতে এ মন্তব্য করেন। কবি বলেন,

> أعلن الاسرائيليون الرسميون الحرب على القصيدة التي لم تكتب بعد، وعلى القصيدة التي كتبت، ويشرح انهم يفّسرون هذه القصيدة وكأنهم حفروا فيها بحرا ليشيروا انها، مقبرة لليهود. ويوضح أن جلاءهم عن أرضنا المحتلة ليس دعوة لرميهم في البحر. انشغل الرأي العام الاسرائيلي والاعلام والصحافة بهذه القصيدة. ويقول، هل هم يخافون من القصيدة حقا؟[304]

৩০৩. প্রাগুক্ত।

৩০৪. দারভীশ, মাহমুদ–সামীহ আল কাসিম, *আল রাসাইল* (বৈরুত: দার আল আওদাহ, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৮১।

ইজরাইলের সরকারী কর্মকর্তারা এমন কবিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে যেটি এখনো লেখা হয়নি। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারা একটি কবিতার বিরুদ্ধে যেটি ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে। ব্যাখ্যা দিয়ে তারা কবিতাটির ভাষ্যও তৈরি করছে যেন তারা এর ভিতর একটি আস্ত সমুদ্র খনন করে নিয়েছে যাতে তারা ইঙ্গিত করছে এই কবিতা মূলত ইহুদিদের কবর। স্পষ্ট করে বলা হয় যে, আমাদের দখলকৃত ভূমি থেকে উচ্ছেদের ঘটনা সমুদ্রে তাদের নিক্ষেপের প্ররোচনা নয়। ইজরাইলের সাধারণ জনগণের মতামত, গণমাধ্যম কবিতাটি আগেই পাঠ করেছে। এবং ইজরাইল বলছে, কবিতাটি নিয়ে তারা কি আসলেই আতঙ্কে আছে?

১৯৯৬ সালে কবি মোহাম্মদ হামজা ঘানাইমের সাথে এক সাক্ষাৎকারে দারভীশ কবিতাটি সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে দারভীশ বলেন,

> I wrote this poem out of a great anger after seeing on French television how Israeli soldiers were using stones to break young
> Palestinians' bones [. . .] I wrote the poem as a kind of stone that I was aiming, not against Israeli Jews but against the occupiers. It is a poem of the Intifada, and it does not reflect my private voice, but the voice of the angry nation defying the occupation, and it is only natural for them to ask the occupier to leave.[৩০৫]

> ফ্রান্সের একটি টেলিভিশনে কিভাবে ইজরাইলি সেনারা তরুণ ফিলিস্তিনীদের হাড় ভাঙতে পাথর ব্যবহার করছিল এমন দৃশ্য দেখার পর আমি তীব্র ক্ষোভে এ কবিতা লিখছিলাম। কবিতাটি লিখছিলাম একটি পাথর হিসেবে যাতে আমি লক্ষ্য স্থির করি ইজরাইলি ইহুদিদের বিরুদ্ধে নয় বরং দখলদারদের বিরুদ্ধে। এটিই ইন্তিফাদার কবিতা যা আমার ব্যক্তির কণ্ঠকে নয় বরং দখলদারিত্বকে তুচ্ছ করা বিক্ষুব্ধ জাতির কণ্ঠকে প্রতিফলিত করে। আর দখলদারকে ছেড়ে যেতে বলার এটাই একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা।

এ ধরনের কবিতা দারভীশ নতুন লিখেছেন তা নয়। এমন আরো অনেক কবিতাই তিনি লিখেছেন যেখানে ফিলিস্তিনের মাটি ও সীমানা ছেড়ে দিতে ইজরাইলকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ইজরাইলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন–বিদ্রোহ করেছেন কবিতার ভাষায়–এমন বহু কবিতা শুরু থেকেই

---

৩০৫. আবু ঈদ, মুনা, পৃ. ১৪১-১৪২।

লিখে গেছেন দারভীশ। জায়োনিস্টদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে রচনা করেছেন পঙক্তির পর পঙক্তি। যেমন, বিত্বকাতুন হুবিয়্যাহ। লিখেছেন আনোয়ার সাদাতের শান্তি উদ্যোগে কড়া সমালোচনায় 'আল আরদ' কবিতা–যেটি ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির বিরুদ্ধে লেখা আলোচিত কবিতা। আবিরুনা ফী কালামিন আরাব এর স্পিরিট আল আরদের প্রায় কাছাকাছি এবং অভিন্ন। এ কবিতায়ও দারভীশ ইজরাইলীদেরকে ফিলিস্তিনের মাটি ছেড়ে বের হয়ে যেতে বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইজরাইল এর আগে এতোটা কড়া অবস্থান নেয়নি কেন? ইজরাইলের গণমাধ্যমগুলো থেকে শুরু করে তাদের বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক সমাজ কেন আগে এমন জোরালো সমালোচনা করেনি? যদিও দারভীশকে কবিতা লেখার কারণে বারবার কারারুদ্ধ করেছিল ইজরাইল। কিন্তু এতোটা সমালোচনার তোপে পড়েননি। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্য দিয়ে ইজরাইলের সাথে শান্তি আলোচনার যে প্রচেষ্টা ও উদ্যোগগুলো শুরু হয় তার ফলেই বস্তুত ইজরাইলের ভাবভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। তাদের দিক থেকে বিষয়টি এমন হয় যে, যেহেতু শান্তি শুরু হয়েছে, কিংবা যখন শান্তি বা স্থিতিশীলতাই কাম্য তাহলে এমন বিদ্রোহী অবস্থান কেন নিতে হবে? ইজরাইলের এমন মনোভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটেছে দারভীশের আবিরুনা ফী কালামিন আবিরিন' কবিতার প্রতিক্রিয়ায়। কিন্তু ক্যাম্প ডেভিড এর মতো শান্তিচুক্তি সংঘটিত হওয়ার পরও ইজরাইলের দখলদারিত্ব থেমে থাকেনি। থেমে থাকেনি ফিলিস্তিনীদের উপর জুলুম নিপীড়ন। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার মাত্র কয়েক বছরের মাথায় শাবরা শাতিল আরবের মতো ভয়াবহ গণহত্যা চালায় ইজরাইল। এমনকি এই হত্যাকাণ্ড চালানোর পরও ইজরাইল থেমে যায়নি। তারা তখন পিএলও'কে তাড়িয়ে দেয়। পিএলও তখন তিউনিসিয়ায় তাদের সদর দপ্তর স্থানান্তর করে। কাজে এমন শান্তি উদ্যোগগুলোর অর্থ নিয়ে ফিলিস্তিনের কি করার থাকে?

অতএব দারভীশের কাছে শান্তি ব্যাপারটি শেষপর্যন্ত ফিলিস্তিনীদের আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে রাজনৈতিক হয়ে উঠতে পারেনি। গণ-প্রতিনিধিত্বশীল রাজনীতির বিবেচনায় শান্তি নাকি সশস্ত্র লড়াই? এই প্রশ্নের মীমাংসা খুব সহজ হয়ে আসেনি দারভীশের কাছে। একইসাথে দারভীশ কি করে শক্ত অবস্থান থেকে ক্রমাগত শান্তির দিকে মুখ ফেরাচ্ছিলেন তা নিয়ে যে প্রশ্ন তৈরি হয় তারও সরাসরি এবং এককথায় জবাব দেয়া সম্ভব না। একটি দ্বৈত এবং পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান তাকে সবসময় রক্ষা করে যেতে দেখা যায়। যেহেতু যুদ্ধই একমাত্র ফিলিস্তিন সংকটের সমাধান–এমন নীতি ছিল মৌলিক এবং প্রাথমিক। ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতগুলো বিশ্লেষণ করেও সশস্ত্র হয়ে ওঠার নৈর্ব্যক্তিক অনিবার্যতা ন্যায্য হিসেবে বিচার করা যায়। এর বাইরে দারভীশের পক্ষে ফিলিস্তিনীদের জন্য সশস্ত্রতার নীতি অবলম্বন করার আর কি কারণ থাকতে পারে। যুদ্ধের মধ্যদিয়ে যাওয়াটাই ছিল ফিলিস্তিনীদের জন্য চলমান ইতিহাসের প্রকৃতি।[৩০৬] কিন্তু রাজনৈতিক এবং অন্য যে কারণেই হোক যুদ্ধ থেকে শান্তি আবার কখনো যুদ্ধ এভাবে দারভীশের অবস্থান পরিবর্তনের বিষয়টি তার সম্পর্কে স্ববিরোধিতার অভিযোগ হয়ে আসে। একই সময়ে দ্বৈত অবস্থানের ঘটনা যুগপৎভাবে ঘটেছে দারভীশের মধ্যে। যেমন, দারভীশ আনোয়ার সাদাতের শান্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে পরে আবার ইজরাইলের সাথে শান্তি স্থাপনের

[৩০৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *বিদাআন আইয়্যুহা আল হারব বিদাআন আইয়্যুহা আল সালাম* (বৈরুত: দার আল আহলিয়্যাহ লি আল নাশার ওয়া আল তাউজি', ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৩২-৩৬।

ঘোরতর বিরোধিতাও করেন। ১৯৭৭ সালে জেরুজালেম সফর করেন সাদাত শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে। কিন্তু তার এ সফর এবং শান্তি উদ্যোগের চেষ্টাকে নিতে পারেনি ফিলিস্তিন এবং মাহমুদ দারভীশ। দারভীশ মনে করেন, সাদাতের এ শান্তি উদ্যোগ ছিল জায়োনিস্টদের কাছে শস্তা আত্মসমর্পণ।[৩০৭] দারভীশ মনে করেন, এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আনোয়ার সাদাতই প্রথম আরব ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রথম ইজরাইলকে স্বীকৃতি দেয়।[৩০৮] দারভীশ সাদাতকে 'লিটল ফারাউ' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আনোয়ার সাদাত তার আর্মির একজন সিপাহী কর্তৃক নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় দারভীশ বলেন, একজন ডিক্টেটরের ক্ষমতার মসনদ থেকে পড়ে এক সিপাহী পায়ের সামনে মুখথুবড়ে পড়া আর টেলিভিশনের পর্দার মুখোমুখী হওয়া ছিল অনিবার্য।[৩০৯]

১৯৭৭ এর জানুয়ারিতে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রচেষ্টা শুরু হয়। উদ্যোগ নেয়ার ৮ মাস পর নভেম্বরে আনোয়ার সাদাত ইজরাইল সফর করেন। এই পুরো প্রচেষ্টার সমালোচনা করেন দারভীশ। গদ্যে এবং পদ্যে সমানতালে লিখেন এহেন শান্তির বিরুদ্ধে। দারভীশ মনে করতেন, এ উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিন এবং তার জনগণের পক্ষে সত্যিকার অর্থে কোনো কাজে আসবে না। আনোয়ার সাদাতের মধ্যস্থতায় ঘটতে যাওয়া এই শান্তি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অবস্থান প্রকাশ করতে গিয়ে দারভীশ তার বিখ্যাত কবিতা 'আল আরদ' লিখেন। তার গ'দ্যগ্রন্থ 'ফী ওয়াছফি হালাতিনা'য় তীব্র সমালোচনা করে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ও আনোয়ার সাদাতের বিরুদ্ধে। আল আরদ কবিতায় কবি লিখেন,

أنا الأرضُ
والأرضُ أنتِ
خديجةُ ! لا تغلقي الباب
لا تدخلي في الغياب
سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل
سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل
سنطردهم من هواء الجليل.
سنطردهم من فضاء النخيل.[310]

আমিই ভূমি
এবং ভূমি তুমিও
খাদিজা! বন্ধ করোনা দরোজা
হারায় যেওনা অদৃশ্যে
আমরা অচিরেই তাদের তাড়িয়ে দেবো ফুলদানি থেকে

৩০৭. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী ওয়াছফি হালাতিনা* (বৈরুত; দার আল কালিমাহ, ১৯৮৭ খ্রি,), পৃ. ২৪।
৩০৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ২১।
৩০৯. আবু ঈদ, মুনা। পৃ. ১৪৪।
৩১০. দারভীশ, মাহমুদ, আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২, পৃ. ২৮৬।

কাপড় শুকানোর রশি থেকে, এই দীর্ঘ পথের সমূহ পাথর থেকে
আমরা তাদের তাড়িয়ে দেবো, তাড়িয়ে দেবো গ্যালিলির বাতাস থেকে
খেজুরের আকাশ থেকে অচিরেই আমরা তাদের বের করে দেবো।

ফি ওয়াছফি হালাতিনায় দারভীশ আনোয়ার সাদাতের রূঢ় সমালোচনা করেন। কটাক্ষ করে দারভীশ তাকে নয়া ফেরআউন হিসেবে অভিহীত করেন। আরো একটু অগ্রসর হয়ে দারভীশ আক্ষেপ করেন। এবং আনোয়ার সাদাতকে ক্ষুদ্র ফেরআউন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দারভীশ বলেন,

> الذي قال إن إسرائيل لن تشتري الصلح بالرمل، أم الذي قال إن الفرعون الصغيرلن يرتكب النصف الأخر من الخيانة؟ غدا نعرف، ولكن الحاكم المصري يستولي علي الجمعة ويصلي. والحاكم الإسرائيلي يستولي علي السبت ويصلي. والحاكم الأميركي يستولي علي الأحد ويصلي. ولا أحد يسأل لماذا يؤمن القتلة بالله![৩১১]

> ইজরাইল কখনো সমঝোতা চুক্তি মাটির দরে বিক্রি করে দেবেনা। ছোট ফেরাউন (আনোয়ার সাদাত) কখনো কি বিশ্বাসঘাতকতার আর বাকি অর্ধেকটা করবেনা? আমরা হয়তো আগামীতে জানতে পারবো। অথচ এই মিশরের প্রেসিডেন্ট জুমা নামাজের অভিভাকত্ব পালন করেন, নামাজ পড়েন। ইজরাইলের প্রেসিডেন্টও শনিবারের অভিভাবকত্ব পালন করেন আবার প্রার্থনাও করেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টও রোববারের দায়িত্ব পালন করেন, প্রার্থনা করেন। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করেননা কেন হত্যাকারীরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে?

ইজরাইলের সাথে সশস্ত্র পন্থার বাইরে শুধু আলোচনা সংলাপের মাধ্যমে যে শান্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোগ শুরু হয় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে দারভীশ মনে করেন, এ চুক্তি ও সমঝোতা ফিলিস্তিনকে ক্রমাগত ফিলিস্তিনহীনতার দিকে নিয়ে যাবে। দারভীশ তাই মনে করেন, এ চুক্তি প্রকারান্তরে ফিলিস্তিনকে যুদ্ধের দিকেই ঠেলে দিয়েছে। শান্তির দিকে নয়। দারভীশ বলেন,

> فلم يطرح أمامنا إلا الحرب. لقد هتك هذا الطراز من التسويات. هتك الطريق إلي سلام بلا سلاح وبلا عدل وبلا فلسطين.[৩১২]

---

[৩১১] দারভীশ, মাহমুদ, *ফী ওয়াছফি হালাতিনা*, পৃ. ২৬
[৩১২]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯।

> এ চুক্তি আমাদের সামনে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। সাম্যের নামে এই হলো নীতি যা এ চুক্তি উন্মোচন করে দিয়েছে। আর শান্তির পথে এ নীতি হলো অস্ত্রবিহীন, ইনসাফবিহীন, ফিলিস্তিনবিহীন।

যুদ্ধই অনিবার্য। কিন্তু যে যুদ্ধ অনিবার্য তা ফিলিস্তিনের তরফে নয়। ফিলিস্তিনীদের উপর সে যুদ্ধ শুরু করা হবে ক্যাম্প ডেভিডের নামে। ক্যাম্প ডেভিডের অসিলায়। ফলে যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না। শান্তি আসছে না। সমঝোতার মাধ্যমে মিশর জর্ডানসহ আরব দেশগুলো যেভাবে যুক্ত হয়েছে তাতে নিজেদের স্বার্থই এ চুক্তির প্রক্রিয়ায় বড় হয়ে উঠেছে। মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার আল সাদাত ছিল এ উদ্যোগের মূল। ফলে এ সমঝোতা প্রচেষ্টায় মিশর ছিল প্রধান পক্ষ। কিন্তু শেষপর্যন্ত মিশরসহ আরব দেশগুলো তাদের দাবি আদায় করতে পারছে কিনা বলা মুশকিল। তবে ইজরাইল তার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এ চুক্তির মধ্যদিয়ে। এ চুক্তি প্রচেষ্টা ফিলিস্তিনীদের জন্য ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির দ্বিতীয় মূলনীতি ছিল, ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি। কিন্তু দেখা যায়, যাদের স্বীকৃতিকে চুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে সেই ফিলিস্তিনীদের সাথে কোনোরকম পরামর্শ করা হয়নি।[৩১৩] স্বাক্ষরিত হওয়ার আগ মুহূর্তে ফিলিস্তিন এ চুক্তি বর্জন করে। অবশ্য জাতিসংঘও এর নিন্দা জানিয়েছিল। সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে দারভীশ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির সমালোচনা করেন। সমঝোতা প্রক্রিয়ার ঘোষণা আসার সময় দারভীশ স্বাগত জানিয়েছিল–কিন্তু শেষ পর্যন্ত দারভীশ চুক্তির বিরোধিতা করেন। দারভীশ মনে করেন, ইজরাইলের সাথে শান্তি শুধু আলোচনা আর সমঝোতামূলক সংলাপের মাধ্যমে সম্ভব নয়। একমাত্র শান্তি সম্ভব যুদ্ধের মাধ্যমে। দারভীশ বলেন,

> فاما ان يتحول العرب الي حرس للاحتلال, واما أن يخوضوا الحرب حتي النهاية. لقد أعلنت حرب ديفيد علي من يرفض الاستسلام, و علي من يحلم بالوطن, وعلي من يتحرر بالثورة. وعاد الثلاثة من كامب ديفيد بحلف جديد. وبوعد سناء وبالحرب. أما الارض المحتلة فستبقي محتلة. والقدس في الرسائل فهل تغير شيئ. بالحرب وحدها نستطيع السير الي السلام. وبتحرير فلسطين نجد الفارق بين الاستسلام والسلام. والذين مازالوا يحلمون بامكانية احلال السلام تحت حراب الاحتلال, محكومون بالسير الي واشنطن.[৩১৪]

আরবদেরকে খোদ দখলদারিত্ব রক্ষা করে যেতে হবে না হয় শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যুদ্ধই চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্য যারা আত্মসমর্পণকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা দেশের স্বপ্ন দেখে এবং যারা বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা চায় তাদের বিরুদ্ধেই মূলত

---

[৩১৩]. *ডিকশনারি অব দি ইজরাইলি-পালেস্টাইনিয়ান কনফ্লিক্ট: কালচার, হিস্ট্রি এন্ড পলিটিক্স: এ টু জেড*—সম্পাদকমণ্ডলী (যুক্তরাষ্ট্র: থমসন গ্যাল, ভলিয়ম-১,২, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮৮।

[৩১৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী ওয়াছফি হালাতিনা*, পৃ. ৩০।

> ক্যাম্প ডেভিড যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন সমঝোতা, সিনাই উপত্যকা আর যুদ্ধ–এই তিনই হলো ক্যাম্প ডেভিডের ফলাফল। কিন্তু দখলকৃত ভূমি দখলকৃতই রয়ে যাবে। এবং আল কুদুসও শুধু চুক্তিপত্রে থাকবে। তাহলে কিসের পরিবর্তন হবে? একমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা শান্তির পথে যাত্রা করতে পারি। ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করার স্বার্থে আমরা শান্তি আর আত্মসমর্পণের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাই। কিন্তু যারা দখলদারিত্বের বেয়নেটের নিচে শান্তি সমাধানের সম্ভাবনার স্বপ্নে বিভোর তারা মূলত ওয়াশিংটনের পথ আঁকড়ে আছেন।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির শর্ত ছিল, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো তাদের সীমান্ত প্রশ্নে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। তবে পাঁচ বছরের মাথায় মিশর জর্ডান ও ফিলিস্তিন ইজরাইলের সাথে তাদের নিজ নিজ সীমান্ত নিয়ে আলোচনায় বসবে। পরবর্তীতে দেখা যায়, মাত্র কয়েক বছর পরই ফিলিস্তিনীদের উপর লেবাননের শাবরা শাতিল শরণার্থী শিবিরে নির্মম হামলা চালায় ইজরাইল। এ হামলার মধ্যদিয়ে ধারণা করা হয়, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। সবচেয়ে প্রভাব পড়ে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে। ফিলিস্তিনী সমাজের সর্বস্তরে জায়োনিজম যেভাবে সর্বজনীন শত্রুতার একটি ট্যাবু বা প্রতীক হিসেবে জায়মান ছিল সেই ট্যাবু ভেঙ্গে যায় এ চুক্তির ঘটনার মধ্য দিয়ে।[৩১৫] একদিকে যেমন জায়োনিজম সম্পর্কে রসহ্যময়তা ছিল এবং একটি অপরিহার্য শত্রুতা ছিল তার অবসান হয়েছে। অর্থাৎ ইজরাইলী মাত্রই জায়োনিস্ট শত্রু–এরকম একটি সামাজিক মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটে গেছে। এর বড় কারণ ছিল, দীর্ঘ সময়ের অস্থিতিশীল অচলাবস্থার পর দুই দেশের মধ্যে ইতিপূর্বে এধরনের কোনো আলোচনার ঘটনা ঘটেনি। ফলে এ চুক্তির প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনে যেভাবে রাজনৈতিক যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটে এবং গণমাধ্যমের প্রচারণা চলে তাতে করে ফিলিস্তিনী সমাজে একধরনের উদার অবস্থার সূচনা হয়। এর যেমন ইতিবাচক দিক আছে তেমনি আছে নেতিবাচক দিকও। তবে সবথেকে বড় বিষয় হলো, এ চুক্তির ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে ফিলিস্তিনের কোনোরকম ইতিবাচক অর্জন সম্ভব হয়নি। যাইহোক, চুক্তির ঘটনায় দারভীশের চিন্তায় ফিলিস্তিনের শান্তি অর্জনের পথে কোন ধরনের নীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তার একটি নির্দেশনা পাওয়া যায়। দারভীশ মনে করেন, ফিলিস্তিনের শান্তি অর্জন এবং অধিকার আদায়ের একমাত্র উপায় সশস্ত্র সংগ্রাম।

১৯৭৪ এর আগ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় এবং মুক্তির প্রশ্নে দারভীশের অবস্থান ছিল অনমনীয়, কিন্তু ৭৪ পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বদলে যায় দারভীশের চিন্তা প্রণালী।[৩১৬] সশস্ত্রতা কিংবা অহিংসতা–এ দুই নীতিকে কেন্দ্র করে দারভীশের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ৭৪ পর দেখা যায়, শান্তি প্রশ্নে দারভীশ বাহ্যত সহিংসতার পথ থেকে অহিংসতার দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ছিলেন। জাতীয় কোনো সিদ্ধান্তের সময় দেখা যায়, প্রথমে তিনি সমর্থন ব্যক্ত করছেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার

---

[৩১৫]. এডওয়ার্ড সাইদ, *দি অ্যান্ড অব দি পিস প্রসেস: অসলো এন্ড আফটার* (নিউইয়র্ক: ভিনটেজ বুকস, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৫৭।
[৩১৬]. আবু ঈদ, মুনা। পৃ. ১৪৪।

বিরোধিতা করছেন। এই দ্বিধান্বিত অবস্থান তার ব্যক্তিত্বের সাথে অনেকখানি একীভূত ছিল। ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার ঘোষণায় ইজরাইল প্রশ্নে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়ে দারভীশের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। যেটি আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের জাতীয় সম্মেলনের আগেই উপস্থাপন করা হয়েছিল। স্বাধীনতার ঘোষণার ওই দলীলে পিএলও ফিলিস্তিনের সংকট সমাধানের অংশ হিসেবে জাতিসংঘ-প্রস্তাবিত ১৯৪৭ এর পার্টিশন প্লান গ্রহণ করে। এই দলিলের মধ্য দিয়ে শান্তি প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের একটি রাজনৈতিক উল্লম্ফন ঘটে। মানে, ম্যান্ডেটরি শাসনামলে দুই জাতির এক রাষ্ট্র সংক্রান্ত যে প্রস্তাব ছিল তার পরিবর্তে এই দলিলে দুই-রাষ্ট্র সমাধানের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল কমিটি আহবান করা হয়। ইতিমধ্যে যেহেতু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি হয়ে গেছে এবং সেটি প্রণয়ন করেছেন মাহমুদ দারভীশ ফলে তার পক্ষে ভোট দেয়া বা সমর্থন প্রকাশ করা বা না করার বিষয়টি নিয়ে কিছুটা বিব্রতকর অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কারণ দারভীশের পাশাপাশি হুরানিও দলিলের খসড়া তৈরি করেছেন। অপরদিকে দারভীশ খসড়া প্রণয়ন করে আবার তার পক্ষে সমর্থন দিতে রাজি নয় এমন অবস্থা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

আব্দুল্লাহ হুর্‌রানি (১৯৮৭-১৯৯৬) স্বাধীনতার খসড়া তৈরি করলেও হুরানি মনে করতেন, দারভীশই স্বাধীনতার দলিলের খসড়া প্রণয়ন করেছেন। এবং দলিলে অন্তর্ভুক্ত নীতিমালা ও গঠনতন্ত্রের সাথেও তার ঐক্যমত ছিল। ফলে আলোচনায় খসড়া প্রস্তাব পাশে সমর্থন দেয়ার ক্ষেত্রে দারভীশের থাকাটা কেন উচিৎ হবে না? অনেকেই এই খসড়া দলিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। পপুলার ফ্রন্ট ফর লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন এর প্রধান জর্জ হাবাশও দারভিশের দলিলের পক্ষে ভোট দেন। আবার কেউ কেউ হুরানির দলিলকে সমর্থন করেন। ফিলিস্তিনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক রাশিদ খালিদি মনে করেন, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়নে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাহমুদ দারভীশ এবং এডওয়ার্ড সাঈদসহ আরো কয়েকজন। কিন্তু ১৯৭৯ থেকে শুরু করে পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ের প্রায় সবকটি আলোচনার উদ্যোগে দারভীশের বিরোধিতা ছিল। যেটি বরাবরই শান্তি আলোচনার বিপরীতে ছিল তার অবস্থান। ফলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের নীতিমালা ও প্রস্তাবনার সাথে দারভীশের অবস্থান সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। যেহেতু তিনি একদিকে ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন করছেন অপরদিকে যখন সেই ঘোষণাপত্রের খসড়ার অনুমোদনের প্রয়োজন হয় তখন তিনি বিরত থাকছেন–এ অবস্থাকে স্ববিরোধিতামূলক এবং সাংঘর্ষিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও এটি ছিল দারভীশের জন্য অস্বস্তিকর। ফিলিস্তিনের এমন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে দারভীশের অবস্থান সম্পর্কে ফিলিস্তিন বিষয়ক বিশ্লেষক মুনা আবু ঈদ মনে করেন, যদি এই ঘোষণাপত্রের প্রণয়নকারী দারভীশই হয়ে থাকেন, তবে দারভীশের পূর্বাপর অবস্থান স্ববিরোধী যেটি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিশেষত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রশ্নে এই অবস্থান ঘোরতর সাংঘর্ষিক। স্বাধীনতার ঘোষণায় পরিষ্কারভাবে ইজরাইলের সাথে শান্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দারভীশ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও মুক্তি আলোচনা-সংলাপ ও সহিংস উপায়ে সম্ভব মনে করেন না।[৩১৭]

---

৩১৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪৫-১৫৫।

১৯৮১ সালের ২৫ নভেম্বর মরোক্কোর ফেজ শহরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১২তম শান্তি আলোচনা। কোনো কারণে ওই তারিখে সম্মেলনটি স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালের ৬-৯ সেপ্টেম্বর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দারভীশ এই সম্মেলনের শান্তি পরিকল্পনা[৩১৮] এবং একইসাথে ১৯৪৭ সালের জাতিসংঘের পার্টিশান প্লান (দুই রাষ্ট্র বিভাজন পরিকল্পনা) এর বিরোধিতা করেন। যেখানে ১৯৬৭ সালে ইজরাইল ফিলিস্তিনের যে সীমানা দখল করে নিয়েছিল তাতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা হয়। এমনকি তিউনিসিয়ায় যখন পিএলও তাদের সদর দপ্তর স্থানান্তর করেছিল এবং সেখান থেকে পার্টির কার্যক্রম শুরু করেছিল সেসময় ফিলিস্তিনের জাতীয় কাউন্সিল ইজরাইলের পাশে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। এবং দারভীশ রাষ্ট্র সম্পর্কিত সেসব চিন্তাভাবনার বিরোধিতা করেছিল। বিরোধিতা করে বিখ্যাত কবিতা *মাদিহ আজজিল আল আলী* রচনা করেন।

هل يعرف البوليسُ أين ستحبل الأرضُ الصغيرةُ بالرياح
المُقْبِلَهْ؟
ماذا تريدُ؟
سيادةً فوق الرَمَادِ؟
وأنت سَيِّدُ رُوحِنَا يا سَيِّد الكينونّةِ المتحوِّلّهْ
فاذهب....
فليسَ لك المكانُ ولا العروش / المزبَلَهْ
حُرِّيَّةُ التكوين أنتَ
وخالقُ الطرقات أنتَ
وأنت عكسُ المرحلَهْ
واذهبْ فقيراً كالصلاةِ
وحافياً كالنهر في درب الحصى
ومُؤَجَّلاً كقرنفُلَهْ
لا لست آدم كي أقول خرجتَ من بيروت أو عَمَّانَ أو
يافا, وأنت المسألَهْ
فاذهب إليكَ ' فأَنَتَ أوسعُ من بلاد الناسِ ' أوسعُ من فضاء
المقصلَهْ
مستسلماً لصواب قلبكَ
تخلع المدنَ الكبيرةَ والسماءَ المُسْدَلَهْ
وتمدُّ أرضاً تحت راحتك الصغيرة ,
خيمةً

[৩১৮]. আবু ঈদ, মুনা। পৃ. ১৪৫।

أو فكرةً
أو سنبلَهْ
كَمْ من نبيٍّ فيك جَرَّبَ
كَمْ تعذَّب كَي يُرَتِّبَ هيكَلَهْ
عبثاً تحاول يا أبي مُلْكَاً ومَمْلَكَةً
فَسِرْ للجُلْجُلَهْ
واصْعَدْ معي
لِنُعيْدَ للروح المُشَرَّد أوَّلَهْ
ماذا تُريد , وأنت سَيِّدُ روحنا
يا سَيِّدَ الكينونة المتحوِّلَهْ؟
يا سَيِّدَ الجمرهْ
يا سَيِّدَ الشُّعْلَهْ
ما أوسع الثورة
ما أضيقَ الرحلة
ما أكبَرَ الفكرة
ما أصغَرَ الدولة!.....[319]

পুলিশ কি জানে, কোথায় এই ছোট্ট ভূমি পরবর্তী বাতাসে মুড়িয়ে যাবে?
কি চাও?
বালির উপর কর্তৃত্ব?
তুমিই তো আমাদের আত্মার নেতা–রূপান্তরশীল সত্তার নেতা হে?
অতএব যাও...
এই স্থান তোমার জন্য নয়, না এই তুচ্ছ সিংহাসন
সৃষ্টির স্বাধীনতা তুমি
পথসমূহের স্রষ্টা তুমি
সফরের বিপরীত তুমি
এবং চলে যাও নামাজের মতো নিঃসঙ্গ
কতো সংকীর্ণ এই ভ্রমণ
প্রস্তরিত পথে নদীর মতো বেষ্টিত হয়ে
কর্নফুলের মতো স্থির হয়ে
না, আমি আদম নই যে বলে যাবো
আমি বের হয়ে গেলাম বৈরুত, আম্মান এবং ইয়াফা থেকে
তুমিই প্রশ্ন,

৩১৯. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, পৃ. ৩৯০।

অতএব আমি যাবো তোমার কাছে, তুমি
মানুষের শহরগুলোর চেয়ে অনেক বিস্তৃত উদার,
তুমি বিশাল গিলোটিনের আকাশের চেয়ে।
হৃদয়ের ন্যায্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করে
মুক্ত করে দাও বড় বড় শহর এবং ঝুলন্ত আকাশ
তোমার ছোট্ট মুষ্ঠিতে টেনে ধরো এই ভূমি
তাঁবু
কিংবা চিন্তা
কিংবা গমের শীষ
কতো নবী তোমার ভিতর লড়াই চালিয়ে গেছে
কতো টর্চার সয়ে যেতে হয় কতো নির্যাতন যেন
উদ্ধার করা যায় মন্দির
বাবা, তুমি বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছো রাজ এবং রাজ্যের জন্য
সুতরাং তুমি বেরিয়ে পড়ো গলগোঠার[৩২০] জন্য
আরোহন করো আমার সাথে
যেন তাড়িত আত্মার জন্য ফিরিয়ে আনি তার আদি স্থান
কি চাও
তুমিই আমাদের আত্মার নেতা
রূপান্তরশীল সত্তার সর্দার হে
হে জ্বলন্ত অঙ্গারঅলা
হে আলোকিত প্রদীপঅলা
কি বিশাল বিপ্লব
কি সংকীর্ণ এই ভ্রমণ
কি মহান চিন্তা
কতো ক্ষুদ্র এই রাষ্ট্র!

কবিতাটি দারভীশ যে সময় ও প্রেক্ষাপটে লিখেছেন তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে। এ কবিতায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার আন্দোলনের ধারায় যে শান্তি আলোচনা এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা ও প্রবণতা দেখা যায় দারভীশ তার বিপরীত অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছেন প্রতীক, রূপক ও ইঙ্গিতময় শব্দ ও বাক্যের বুননে। ১৯৮৩ সালে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ সালে লেবাননের বৈরুতে ফিলিস্তিনীদের আশ্রয় শিবির–শাবরা শাতিলায় ইজরাইলী গণহত্যার পর

[৩২০]. জেরুজালেমের প্রাচীরের বাইরে লাগোয়া একটি ঐতিহাসিক স্থান গোলগোঠা। ক্যালবেরিও বলা হয়। এই স্থানেই যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। ব্রিটানিকা অনলাইন। (ভিজিট: ২৭ এপ্রিল, ২০২৩), https://www.britannica.com/place/Golgotha

শান্তি প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়। মূলত আরব লীগের নেতৃত্বে এ শান্তি উদ্যোগ শুরু হয়।[৩২১] কবি শাবরা শাতিলার রক্তের দাগ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই শুরু হওয়া এ শান্তি প্রচেষ্টা মেনে নিতে পারেন নি। কবির বিরোধিতা আর প্রতিবাদের পরম আখ্যানে সমৃদ্ধ হয়েছে এ কবিতা। কবিতাটির নামকরণ থেকে শুরু করে বাক্যবিন্যাস, শব্দ চয়নসহ সর্বত্র ঈষৎ বিমূর্ত ভঙ্গির বিস্তার লক্ষ করা যায়। অপরাপর কবিতাগুলোতে দারভীশ যতোটা স্পষ্ট এখানে কবি এতো মুক্ত খোলাখুলি নন। কিন্তু তিনি লিখেছেন তার রাজনৈতিক অবস্থান। কবিতাময় বয়ান বিস্তৃত করেছেন একটি দেশের ঐতিহাসিক দলিলের। এ বয়ান ও গদ্য এতোটাই কাব্যময় যে যাতে কবির আবেগ ও সংবেনদশীলতা রাজনৈতিক হয়েও নান্দনিক সৌন্দর্যের বিভা ছড়িয়ে যায় অনায়াসে। তাতে কবির বুদ্ধিবৃত্তিক অভিমান ও মনোভাব অপ্রতিরোধ্য শিল্পময় হয়ে উঠেছে এ কবিতায়। কবি লিখেছেন কবিতা। যেখানে রয়ে গেছে তার সমকালের ইতিহাস। ইতিহাসের পর্যালোচনা। সময়ের নিদারুণ দলিল। তার রাষ্ট্র এবং সেই বিবদমান রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে শান্তি ও অহিংস নীতির কথা বলে যে নানা উদ্যোগ শুরু হয় তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু তিনি কবিতার ভাষায় প্রাচীন ইতিহাসের নজিরকে যেভাবে বাঙময় করে তুলেছেন তার অর্থ কবি করে স্থির করে রাখতে চান? দারভীশ বলেন,

فرغتُ من شَغَفي ومن لهفي على
الأحياء. أفرغتُ انفجاري
من ضحاياك , استندتُ على جدارٍ ساقطٍ
في شارع الزلزالِ ,
أَجْمَعُ صورتي من أجل موتكَ'
خُذْ بقاياكَ, اتخذني ساعداً في حضرة
الأطلالِ.خُذْ قاموسَ
ناري
وانتصرْ
في وردةٍ تُرمى عليكَ من الدموع
ومن رغيفٍ يابسٍ, حافٍ, وعارِ
وانتصرْ في آخر التاريخ...
لا تاريخَ إلا ما يؤرِّخه رحيلُكَ في
انهياري[৩২২]

আমি মুক্ত আমার আবেগ থেকে, জীবীতদের উপর
আমার দীর্ঘশ্বাস থেকে।
তোমার হত্যাকাণ্ডগুলো নিয়ে আমার উদারতাকে
মুক্ত করে দিয়েছি।
কম্পমান সড়কে ভেঙ্গে পড়া দেয়ালের সাথে ঠেস
দিয়েছি। তোমার মৃত্যুর
ক্ষণ থেকে আমি আমার ছুরত সঞ্চয় করি।
তোমার বাকি ধ্বংসাবশেষগুলো আঁকড়ে ধরো;
উঁচু পর্বতগুলোর উপস্থিতির মধ্যে সহযোগীর মতো
আমার হাত ধরো। ধরো আমার অগ্নিমাখা
অভিধান
আর প্রতিশোধ গ্রহণ করো
তোমার উপর অশ্রু এবং খোলা শুকনো রুটি
বর্ষণরত গোলাপের ভিতর
প্রতিশোধ গ্রহণ করো ইতিহাসের শেষলগ্নে
ইতিহাস তাই যা আমার ধ্বংসের মাঝে তোমার
অভিযাত্রা ঠিক করে দেয়

---

৩২১. *দি ইজরাইলি-প্যালেস্টাইনিয়ান কনফ্লিক্ট: অ্যান ইন্টারঅ্যাক্টিভ ড্যাটাবেজ, টুয়েলভথ আরব লীগ সামিট ইন ফেজ– প্ল্যান ফর প্যালেস্টাইনিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স (১৯৮২)* (ভিজিট: ৩ মার্চ ২০২২), https://ecf.org.il/issues/issue/157

৩২২. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২ (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, ২০০৫ খ্রি.)*, পৃ. ৩৩৪।

স্বাধীনতার ঘোষণার খসড়া এবং এ খসড়ার উপর ভিত্তি করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের গঠন এবং একইসাথে ইজরাইলের সাথে বিরোধ কমিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আলোচনা এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে দারভীশের অবস্থান পূর্বাপর একইরকম ছিল না। ফলে তার দ্বিধান্বিত অবস্থান ঠিক কি বেঠিক সেই প্রশ্নের আগের প্রশ্ন হলো কেন তিনি তা এড়িয়ে যাচ্ছেন, কিংবা এই খসড়া নিয়ে কেন তিনি ইতিবাচক মনোভাব দেখাননি এই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে। একটি রাষ্ট্রের সবথেকে জরুরি মুহূর্তে নিজের সক্রিয়তা ও কার্যকর ভূমিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখাটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে কি নিজের রচিত খসড়া ঘোষণায় নিজেরই আস্থা নেই? তবে কেন তিনি এটি করতে গেলেন। দারভীশ শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে চুপ থাকতে পারেননি। দারভীশ বলেন, সে সময় এই ঘোষণা গ্রহণ করা হয়েছিল।

> At the time this declaration was adopted, it made no significant impact. The New York Times called it “symbolic” and “of no concrete significance”.[৩২৩]
>
> এ ঘোষণা সে সময় তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তৈরি করেনি। যদিও নিউ ইয়র্ক টাইমস এটাকে ‘প্রতীকী’ বললেও ‘ কোনো বাস্তব গুরুত্ব নেই’ বলে চিহ্নিত করে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন ও মন্তব্য থেকে বোঝা যায় তৎকালীন মার্কিন প্রশাসনও ভালোভাবে গ্রহণ করেনি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার ঘোষণা।[৩২৪] তবে দারভীশ তার আপোশহীন ও কঠোর মনোভাব ক্রমাগত দেখিয়েছেন সবসময়। *আবীরুনা ফী কালামিন আবিরিন কবিতায়ও* একই উচ্চারণ শোনা যায়:

...كيف يبني حجرٌ من أرضنا سقف السماءْ
أيها المارُّون بين الكلمات العابرة
منكم السيف – ومنَّا دمنا
منكم الفولاذ والنار- ومنَّـا لحمنا
منكم دبابة أخرى- ومنا حجرُ
منكم قنبلة الغاز- ومنا المطرُ
وعلينا ما عليكم من سماء وهواء
فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا
وادخلوا حفل عشاء راقصٍ.. وانصرفوا

---

[৩২৩]. আর রাইট, অলিভার, *অ্যাপেনডিক্স সি, অ্যানেক্স ২৯– প্যালেস্টাইনিয়ান ডিক্লারেশন অব ইনডিপেন্ডেন্স বাই দি প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিল নভেম্বর ১৫, ১৯৮৮, ইনফ্ল্যামেটরি এন্ড কনসিলিয়েটরি রেটরিক ইন দ্য অ্যারাব-ইজরাইলি-কনফ্লিক্ট: আ কনটেন্ট অ্যানালাইসিস অব হাউ থ্রি নিউজপ্যাপারস কভার্ড টু প্রোভোক্যাটিভ ইভেন্টস* (সিকাগো: গ্রাজুয়েট স্কুল, সাউদার্ন ইলিনইস ইউনিভার্সিটি কার্বোনডেল, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪০৯।
[৩২৪]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০৯।

وعلينا، نحن، أن نحرس ورد الشهداءْ.
و علينا، نحن، أن نحيا كما نحن نشاء[325]

১৯৮৮ সালের নভেম্বরে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে দারভীশও পাল্টে নিয়েছিলেন নিজেকে। এ সময় প্রথম ইন্তিফাদা সংঘটিত হয়। পরিস্থিতির নিবিড় দাবিতে দখলকৃত সীমানায় ফিলিস্তিনীদের কষ্ট যন্ত্রনা লাঘবের উদ্দেশ্যে সমাধান জরুরি হয়ে ওঠে। এরকম পরিস্থিতিতে দারভীশও তার অবস্থান পরিবর্তন করেন। দারভিশের মাঝে বিপুল সাংঘর্ষিক এবং স্ববিরোধিতামূলক অবস্থান বিরাজমান রয়েছে। শান্তি-অহিংস নাকি সহিংস উপায়ে মুক্তি? এই প্রশ্নে দারভিশ বারবার নিজের সাথে বোঝাপড়া করেছেন। বারবার নিজেকে ভেঙ্গেছেন। কখনো অহিংসতার পথে। কখনো সহিংসতার পথে মুক্তির বারতা শুনিয়েছেন। তবে যতোবারই তিনি মুক্তির বার্তা দিতে গিয়েছেন ততোবারই তাকে শান্তি প্রক্রিয়ার বিষয়টির মুখোমুখি হতে হয়েছে। ১৯৮৮ সালে যখন প্রথম অভ্যুত্থান তথা ইন্তেফাদা সংঘটিত হয়েছে তখন আবার তিনি যুদ্ধ বিরতি তথা শান্তির পথ অনুসরণ করছেন। ইন্তিফাদা শেষ হওয়ার আগেই এরমধ্যেই তিনি তার আলোচিত কবিতা *‘হুদনা মা’আল মোগল আমামা গবাতিন সিনদিয়ান’* লিখেছেন। ১৯৯০ সালে এটি প্রকাশিত হয় ‘আরা মা উরিদু’ কাব্যগ্রন্থে। যেখানে কবি মোগলদের সাথে তথা তার শত্রুর সাথে যুদ্ধবিরতির কথা বলছেন। শান্তি ও অহিংসতার কথা ব্যক্ত করেছেন। দারভীশ প্রসঙ্গ টেনে বলেন,

ليت أَعداءَنا يأخذون مقاعدنا في الأساطير ' كي يعلموا كم نُحبُّ
الرصيفَ الذي يكرهون..ويا ليتهم يأخذونْ
ما لنا من نُحاس وبرْق...لنأخذ منهم حرير الضجرْ
ليت أعداءنا يقرءون رسائلنا مرتين , ثلاثاً .. ليعتذروا للفراشة عن لعبة
النار...[326]

হায়, পৌরাণিক আখ্যানের ভিতরও আমাদের থাকার জায়গাগুলো ছিনিয়ে
নিতো আমাদের শত্রুরা যেন তারা
জানে তাদের ঘৃণা সত্ত্বেও আমরা কতোটা ভালোবাসি ফুটপাথ...
হায় তারা ছিনিয়ে নিতো আমাদের যা কিছু তামা ও বিদ্যুৎ... যেন তাদের
কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করি বিরক্তির রেশমী কাপড়
হায় আমাদের শত্রুরা যদি পড়তো আমাদের চিঠিগুলো দুবার... তিনবার...
যেন তারা আগুনের খেলা থেকে প্রজাপতিদের জন্য দুঃখ করে

৩২৫. দারভীশ, মাহমুদ, *আবিরুনা ফী কালামিন আবিরিন।*
৩২৬. প্রাগুক্ত।

কিংবা...

في غابة السنديانْ
كم أردنا السلامَ لسيدنا في الأعالي
..لسيدنا في الكُتُبْ
كم أَردنا السلام لغازلة الصوف ..
للطفل قرب المغارةْ لِهُواة الحياة
لأولاد أعدائنا في مخابئهمْ.. للمَغُولْ
عندما يذهبون إِلى ليل زوجاتهم ,
عندما يرحلونْ عن بِراعم أزهارنا الآن
.. عَنَّا ,
وعن ورق السنديانْ[327]

ওক গাছের বনে
উঁচুতে... বইপত্রে আমাদের নেতার জন্য কতো শান্তি চেয়েছিলাম
কতো শান্তি চেয়েছিলাম রেশমী কারিগরের জন্য... জীবনের মায়া ত্যাগের বিনিময়ে গুহামুখে পড়ন্ত শিশুর জন্য... গোপনে শত্রুর সন্তানের জন্য...
মোগলদের জন্য... যখন তারা তাদের স্ত্রীদের রাতের কাছে যাচ্ছিল
যখন তারা আমাদের ফুলকলি... ওক গাছের পত্র এবং আমাদের ছেড়ে
চলে যাচ্ছিল...

দেখা যাচ্ছে, দারভীশ শান্তির কথা বলছেন–এবং এই শান্তির কথা বলেছেন আরব ভূখণ্ড আক্রমণ করতে আসা তাতার চেঙ্গিস ও হালাকু খানদের ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে। ফলে যাদের সাথে শান্তি বা যুদ্ধবিরতির কথা বলেছেন সেই মোগলদের নজির এনে–প্রতীকী তুলনা টেনে কবি বস্তুত কাদের বোঝাতে চেয়েছেন? বিষয়টি নিয়ে সে সময়ে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক হয় রাজনীতিবিদ ও সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে।[৩২৮] দারভীশ সেই বিতর্কে শামিল হয়েছেন আত্মপক্ষ সমর্থন করে। অর্থাৎ দারভীশ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে যেই মোগলদের কথা বলছেন তারা সেই মোগলই–তাদেরকে ইজরাইলের প্রতীক বা রূপক হিসেবে গ্রহণ করার কিছু নাই। সমালোচকরা বলতে চেয়েছেন, যদি তাই হয় তাহলে তো এই ঘটনা কবিতায় কোনো বিশেষ অর্থ তৈরি করে না এবং এর বিশেষ কারণও নেই। এবং তাতে ইজরাইলকে বোঝানো না হলে এর আসলে কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য নাই কবিতা হিসেবে। ফিলিস্তিনের সমসাম্প্রতিক প্রেক্ষিত ও পরিস্থিতির সাথে এই কবিতা এবং তাতে প্রয়োগ করা মোগলদের সাথে যুদ্ধ বিরতির বিষয়টি মূলত ইজরাইলের সাথে বিরতি–এমন ব্যাখ্যার সাথে এ কবিতার সংশ্লিষ্টতা নেই কিংবা কবির কোনোরকম উদ্দেশ্য নেই–দারভীশের এমন দাবিকে সমালোচকরা মেনে নেননি বিধায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

দারভীশ আক্রমণকারী ঐতিহাসিক চরিত্র মোগলদের উদাহরণ টেনে এনে যাদের বোঝাতে চেয়েছেন কবিতায় তিনি তা অস্বীকার করেছেন। তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটা নিয়েই ইতিহাস। অন্যকিছু

---

৩২৭. দারভীশ, মাহমুদ, *আরা মা উরীদু, আদ দীওয়ান, আল আ'মালুল উ'লা-৩* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লিল কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২০৩।

৩২৮. ড. আদিল আল উছতাহ, *জাওয়াহিরু ছালাবিয়্যাহ ফী মাসীরাতি মাহমুদ দারভীশ আশ শি'রিয়্যাহ ওয়া আবহাসিন উখরা* (নাবলুস: মানসুরাত আদ দার আল ওয়াত্বিনিয়্যাহ লিত তারজামাহ ওয়াত ত্ববা' ওয়ান নাশর ওয়াত তাওজী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২।

নয়। অন্যকোনো অর্থের বা ইঙ্গিতের প্রয়োজন হৈন।[৩২৯] দারভীশ মনে করেন, ইতিহাসের দাবি এবং তার সত্য কবিতায় যে প্রয়িয়াক্র গড়ে উঠতে পারে তার বিচিত্র অর্থোৎপাদন হতে পারে। এ কবিতায় তাই হয়েছে। তাতে যেমন শিল্পের ক্ষতি সাধন হয়নি তেমনি রাজনীতির। দারভীশ বলেন,

وبصراحة أقول إنني لا أشكو من القارئ، وإنما الناقد الذي يسلط الضوء علي قطعة فسيفساء واحدة في عمارة هاءئلة، واستشهد هنا بمثال من الحاضر القريب. لقد ركز البعض علي عبارة معاهدة الصلح في قصيدة "أحد عشر كوكبا علي أخر المشهد الأندلسي" و أولي تلك المعاهدة المتصلة بسقوط غرناطة معتبرا إياها موقفا مني ضد مفاوضات السلام، لقد ألمني ذالك كثيرا، إذ لا يمكن لي أن أتعامل مع المفاوضات من خلال الكتابة عن غرناطة، ولست بحاجة لتوظيف كل تاريخي وبرنامجي الجمال للتعبير عن تحفظ ما أستطيع تسجيله في مقال أو ندوة أو اجتماع.... . ولو كنت أعرف أن هذه العبارة سوف تسترق اهتمام القارئ، أو المراقب الصحفي والمجتمع السياسي العربي إلي هذا الحد لكنت تخليت عنها. وسأمسح لنفسي في أية طبعة جديدة بتغييرها، ليس تنصلا من المدلول، ولكن حرصا مني علي ابقاء القارئ، في الحقل الجمالي والتارخي والثقافي للقصيدة بأسرها وليس بعبارة واحدة سمح التأويل بتحويلها إلي لافتة أو شعار.[৩৩০]

> আমি পরিষ্কার করে বলি, পাঠকের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। বরং কোনো কোনো সমালোচক আছে এমন যারা বিপুল দালান কোঠার ভিতর এক টুকরো ফসফরাসের আলোকেই বেশি ফোকাস করে। আমি অতি সম্প্রতি একটি উদাহরণ দিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছি। কেউ কেউ আবার আহাদা আশারা কাওকাবা আলা আখিল আল আন্দালুসি কবিতার 'মুআহাদাহ আল ছুলাহ' অংশের উপর তাদের সমস্ত দৃষ্টি কেন্দ্রিভূত করেছে। গ্রানাডার পতনের সাথে সম্পর্কিত প্রথম ওই চুক্তিতে যাকিছু বিবেচনা করা হয় তাতে আমার অবস্থান ছিল শান্তি প্রস্তাবের বিপরীতে। এটি আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে; কারণ চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করার সময় গ্রানাডার প্রস্তাবগুলোর সাথে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটি বক্তব্যে, সেমিনারে, সম্মেলনে আমি যাকিছু তুলে আনতে পারি তা রক্ষার বিষয়টি প্রকাশের জন্য ইতিহাস এবং সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সবকিছু একজায়গায় সন্নিবেশ করার প্রয়োজন আমার নেই... আমি যদি জানতাম এধরনের ভাষ্য পাঠকের গুরুত্ব, সংবাদপত্র এবং আরবের রাজনৈতিক সমাজের পর্যবেক্ষণগুলোকে একটি প্রান্তে ঠেলে দিতে পারে তাহলে আমি নিজেকে তা থেকে মুক্ত রাখতাম। তবে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যায় নিজেকে আমি একটি সুযোগ দিতেই পারি। তবে বক্তব্যের অর্থকে পরিহার করা নয় বরং কবিতাটির ভিতরে যে সাংস্কৃতিক,

---

৩২৯. ড. আদিল আল উছতাহ, *জাওয়াহিরু ছালাবিয়্যাহ ফী মাসীরাতি মাহমুদ দারভীশ আশ শি'রিয়্যাহ ওয়া আবহাসিন উখরা* (নাবলুস: মানসুরাত আল দার আল ওয়াত্বিনিয়্যাহ লি আল তারজামাহ ওয়া আল ত্ববা' ওয়া আল নাশর ওয়া আল তাওজী', ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২।

৩৩০. প্রাগুক্ত। পৃ. ২।

ঐতিহাসিক ও শিল্প-সৌন্দর্য্যতত্ত্বের পটভূমি রয়েছে তাতে পাঠককে ধরে রাখার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ আছে।

দারভীশের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার ধরন–এবং চলমান রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে তার অবস্থান বিচার করলে একইসাথে কবিতার পঙক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে এতে ইজরাইলের বিষয়টি পরিষ্কার বোধগম্য হয়ে ওঠে। বর্তমানকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে কোনো কৃতিত্ব তৈরি হয় না। দারভীশের এমন অবস্থান নেয়ার পেছনে হয়ত এমন কারণ থাকতে পারে যাতে পুনরায় কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি না হয়। ফিলিস্তিনের বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এবং দারভীশ বিশ্লেষক ড. আদিল আল আসতাহ এই বিতর্কে শামিল হন। আদিল আসত্বাহ দারভীশের রাজনৈতিক অবস্থান–তথা তার অহিংস নীতির বাইরে গিয়ে সশস্ত্রনীতির প্রতি সমর্থনকে সামনে নিয়ে এসে কবিতাটির ব্যাখ্যায় দারভীশের 'মোগলদের' সাথে যুদ্ধবিরতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা করেন। উদাহরণ হিসেবে আদিল আসতাহ বৈরুত থেকে বের হয়ে আসা, স্বাধীনতার ঘোষণা ও ইন্তিফাদার ঘটনায় দারভীশের অবস্থানের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।[৩৩১] মোটকথা কবিতাটি থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, দারভীশ তার কঠোর মনোভাব থেকে সরে এসে শান্তির পথে আকস্মিকভাবে পদক্ষেপ দিলেন।

কবিতায় প্রতীয়মান হয় যে, দারভীশ যখন কঠোর অবস্থানে ছিলেন তখন যে আর্গুমেনট কবি *আবীরুনা ফী কালামিন আবিরিন* কবিতায় দেখিয়েছেন, একই যুক্তি ও শর্তের কথা বলেছেন এই কবিতায়। তবে তা বলেছেন শান্তি স্থাপনের নিমিত্তে। তখন *আবিরুনা ফী কালামিন আবির–এ* শত্রুর সাথে প্রথম শর্ত ছিল আগে 'আমাদের ভূমি ত্যাগ করে চলে যাও'।[৩৩২] এখন যুক্তি হলো, আগে যুদ্ধবিরতিতে আসো তারপর অন্যকিছু। যদি সময়ের প্রেক্ষিত বা বর্তমানকে ধারণ করার বিষয়টি গৌণ হয়ে যায় তবে দারভীশ কেন বৈরুত থেকে বের হয়ে আসার পর কবিতাটি লিখলেন না? কেন তিনি ইন্তিফাদার পরে ঠিক এই সময়েই লিখলেন? এখন যখন দারভীশ ইন্তিফাদার অবব্যহিত পরে ১৯৯০ সালে যুদ্ধবিরতি কিংবা শান্তির কথা বলছেন, তার ঠিক এক বছরের মাথায় ১৯৯১ সালে মাদ্রিদ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শান্তি প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেন।

১৯৮৯ সালের দিকেও দারভীশের প্রকাশিত বইয়ের সংকলনগুলো যথেষ্ট সহজলভ্য ছিল। দুর্লভ ছিলনা অবশ্য। এতো বিপুল ছিল যে সেসব কবিতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল অনেক গভীর। কিন্তু তা ছাড়িয়ে গেছে আবিরুনা ফী কালামিন আবির। মাত্র একটি কবিতা। যেটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৮ সালে। এই সময়গুলো ছিল ইন্তেফাদার। খুবই উত্তেজনার সময়। চলমান ইন্তেফাদা থেকে কবিতাটি যেমন প্রভাবিত হয়েছিল তেমনি এর প্রভাবও ছিল অসামান্য। এই কবিতা এতো বেশি ছড়িয়ে পড়ার কারণ ছিল, স্থানীয় বহু আঞ্চলিক ভাষাতে এর সংস্করণ ছড়িয়ে পড়ে। যেকারণে

[৩৩১]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩-১৭।
[৩৩২].

একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত কবিতাটির আবেদন মানুষকে প্রচণ্ডরকম নাড়িয়ে দেয়। ইজরাইলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনোভাব অত্যন্ত সচেতন, পরিষ্কার ও সতর্ক হয়ে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ করে দারভীশের বিপরীত ভঙ্গিতে লেখা শুরু করে দেয়ার কারণটি কিছুটা কৌতূহল সৃষ্টি করে সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে। আদিল আসতা দারভীশের অবস্থান সম্পর্কে মনে করেন, উত্তেজনাকর ভাষা পরিহার করে তিনি নরম ভাষার দিকে আকস্মিক ঝুঁকে পড়লেন। অর্থাৎ আবিরুনা ফী কালামিন আবির– এ যে কঠোর ভাষাভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন মোঘল বিষয়ক ঐতিহাসিক কবিতার বয়ানে। কারন সাধারণ কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব না ঠিক কি এমন রহস্য আছে এই কবিতায় যার জন্য কবি এবং তার মোঘলের সাথে যুদ্ধবিরতি বিষয়ক কবিতা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হবে, গবেষণা করে বের করতে হবে ঠিক এর অন্তর্নিহিত রহস্য কী? আদিল আসতা এখানে কয়েকটি কারণ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, দারভীশ ফিলিস্তিন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর একধরনের হতাশা কাজ করতে পারে তার ভিতর। কবি নিজেই তার নৈরাশ্যজনক অস্থির অবস্থা টের পান– যেটি তার একটি কবিতায় প্রবলভাবে অনুভব করা যায়। *তায়াম্মুলাতুন সারীআহ ফী মাদীনাতিন কাদীমাতিন জামীলাহ আল সাহিল আল বাহর আল আবাইয়াদ আল মুতাওসসাত*– ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী এক সুন্দর প্রাচীন নগরীতে বসে কিছু তড়িৎ ভাবনা শীর্ষক কবিতায় দারভীশের এমন অস্থিরতার বর্ণনা উঠে এসেছে সুস্পষ্টভাবে। আদিল মনে করেন, ফিলিস্তিনে যে নিরাময় অযোগ্য সীমাহীন ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকেই হয়ত তার উৎপত্তি। একইসাথে এই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ ফিলিস্তিনীদের মাঝে
যে বিপ্লব ও ইন্তেফাদার ঘটনা ঘটেছে তার রেশ ধরে রাখার জন্য পাঠকের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেছেন কবি।[৩৩৩]

আরা মা উরীদু– কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় শান্তি এবং যুদ্ধ যুগলবন্দি হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। কবি যুদ্ধ এবং শান্তি এই দুই অবস্থানই সমান্তরালভাবে গ্রহণ করেছেন। আবার রাষ্ট্র প্রশ্নেও কবি দুই অবস্থান নিয়েছেন, দ্বিরাষ্ট্র সমাধান আবার এক রাষ্ট্র সমাধানও। ইজরাইলে থাকা না থাকা কিংবা ছেড়ে আসা নিয়েও দারভীশের মধ্যে একধরনের দ্বিধা ছিল। এ নিয়ে মানে ইজরাইল ছেড়ে আসা নিয়েও তার দুঃখ ছিল। আবার কোনো দুঃখও ছিল না। একধরনের অভিমিষা ছিল। ইজরাইলের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তার যুক্ত থাকার বিষয়টি তাকে হয়ত এধরনের মানসিক ধন্দে ফেলে দিয়েছিল।[৩৩৪]

মাদ্রিদ শান্তি আলোচনা

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের ৩০ অক্টোবরে স্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হয় ইজরাইল-ফিলিস্তিন বিষয়ক শান্তি আলোচনা। দারভিশ আগেই এই শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেন। দারভিশ মনে করেন, এ উদ্যোগের মধ্যদিয়ে মূলত আরব জাতিবাদ বা আরব জাতির ক্ষমতার মৃত্যু ঘটে। মাদ্রিদের সম্মেলনে দারভিশ নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের পরের বছরই এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে

[৩৩৩]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০।
[৩৩৪]. [৩৩৪]. মাহমুদ দারভীশ ওয়া সামীহ আল ক্বাসিম। *আল রাসাইল, দার আওদাহ।* বৈরুত। ১৯৯০। পৃ. ৩৮।

প্রতিফলিত হয়েছে তার কাব্যগ্রন্থ *'আহাদা আশারা কাওকাবা আ'লা আল মাসহাদ আল আন্দালুসিয়'ায়*। এতে এগারোটি কবিতা রয়েছে। বইটির দ্বিতীয় কবিতা *'কাইফা আকতুবু ফাওকা আল সাহাব'*। যাতে শান্তি আলোচনা বিরুদ্ধে সমালোচনা ফুটে উঠেছে। যারা শান্তি আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন কিংবা তাতে সমর্থন জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা এবং সমালোচনা লক্ষ করার মতো, যেখানে কবির বিরোধিতামূলক অবস্থানও স্পষ্ট। কবি বলেন,

كَيْفَ أَكْتُبُ فَوْقَ السَّحابِ وَصِيَّةَ أَهْلي؟
وَأَهْلي
يَتْرُكونَ الزَّمانَ كَما يَتْرُكونَ مَعاطِفَهُمْ في الْبُيوتِ وَأَهْلي
كُلَّما شَيَّدوا قَلْعَةً هَدَموها لِكَيْ يَرْفَعوا فَوْقَها
خَيْمَةً لِلْحَنينِ إِلى أَوَّلِ النَّخْل . أَهْلي
يَخُونونَ أَهْلي
في حُروبِ الدِّفاع عَنِ الْمِلْح[335]

মেঘের উপরে কিকরে আমি আপনজনের প্রতি উপদেশ লিখি? আমার আপনজন যারা ছেড়ে গেছে সময় যেমন তারা চলে যায় ছেড়ে বাড়িঘরের মায়া এবং আমার আপনজন
যারা দূর্গ বানিয়ে আবার ভেঙ্গে ফেলেছিল যেন তার উপর
স্মৃতির প্রথম খেঁজুরের তাঁবু তুলে দেয়। আমার আপনজন
নিমক রক্ষার যুদ্ধে যারা আপনজনের সাথে নিমকহারামী করে।

যারা শান্তি প্রচেষ্টায় যুক্ত তারা কবির আপনজন। স্বদেশী–একই পরিবারের পরিজনের মতো। যারা নিজেরা মিলে যে দূর্গসম সৌধ নির্মাণ করেছেন সেই সৌধই তাদেরই কেউ কেউ ভেঙ্গে দিয়েছেন। কবি তাদের 'আহল' আপনজন বলে সম্বোধন করেছেন। কবি তাই বলেন, *'আমার পরিবার নিমক (স্বার্থ) রক্ষার যুদ্ধে আপন পরিবারেরই বিশ্বাস ভঙ্গ করে'*। প্রথম কবিতায় কবি কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা দিয়ে শুরু করেন। তবে এ ভর্ৎসনা ভারি তীর্যক এবং ছোঁচালু। *'ফী আল মাছা আল আখীর আলা হাজা আল আরদি'* কবিতায় কবি বলেন,

شايُنا أَخْضَرٌ ساخِنٌ فاشْرَبوه ، وَفُستُقُنا طَازَجٌ فَكُلوه
والأَسِرَّةُ خَضْراءُ مِنْ خَشَبِ الأَرْزِ ، فَاسْتَسْلِموا لِلنُعاسْ
بَعْدَ هذا الْحِصارِ الطَّويلِ ، وَنَاموا على ريشِ أَحْلامِنا
المُلاءاتُ جاهِزَةٌ ، وَالعُطورُ على الْبابِ جاهِزَةٌ ، وَالمرايا كَثيرة

আমাদের সবুজ চা উষ্ণ কড়া অতএব পান করো। আমাদের পেস্তা বাদাম তাজা সুতরাং খাও। এবং বিছানাগুলোও সিডার কাঠ গাছের মতো সবুজ কোমল। ফলে এই দীর্ঘ অবরোধের পর একটু ঘুমের জন্য তাতে অনায়াসে এলিয়ে নাও। আমাদের স্বপ্নের পালক বেয়ে তারা ঠিক ঠিক ঘুমিয়ে পড়েছিল;

৩৩৫. দারভীশ, মাহমুদ, *আদ দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উ'লা*-৩, পৃ. ২৭৩।

فَادخُلو ها لِنَخْرُجَ مِنْها تَماما[৩৩৬]

চাদরগুলো সাজানো, দরোজায় সুগন্ধি ছড়ানো, রয়েছে আয়নাও অনেক। অতএব প্রবেশ করো যাতে এখান থেকে আমরা পুরোপুরি বের হয়ে যাই।

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর নির্মাণপ্রযুক্তি আরবী কবিতার ক্ল্যাসিক্যাল কাঠামো অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন আরবী কবিতার রূপক ও প্রতীক যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল তদরূপ এই কবিতাগুলোতে প্রয়োগ করেছেন দারভীশ। দারভীশ এ কবিতাগুলোতে প্রাচীন কাব্যরীতিকে অনুসরণ করেছেন বিমূর্ত কবিতার মতো রহস্যময়তার চাদরে বর্তমানকে অর্থময় করে তুলতে। এটি হয়ত একটি কারণ হতে পারে। রাজনৈতিক কবিতা যতোটা সরাসরি, স্পষ্ট হয়ে থাকে এ কবিতা রাজনৈতিক বিষয়ঘনিষ্ট হয়েও তা নয়। ইতিহাস পর্যালোচনার সারসত্য যে আবরণে দারভীশ হাজির করেছেন তার কাব্যনৈপুণ্য অতুলনীয়। দারভীশ বলেন,

لِلْحَقيقَةِ وَجْهانِ وَالثَّلْجُ أَسْوَدُ فَوْقَ مَدينَتِنا
لَمْ نَعُدْ قادِرينَ على الْيَأْسِ أَكْثَرَ مِمّا يَئِسْنا,
وَالنِّهايَةُ تَمْشي إلى
السّورِ واثِقَةً مِنْ خُطاها
فَوْقَ الْبَلاطِ الْمُبَلَّلِ بِالدّمْعِ, واثِقَةً مِنْ
خُطاها
مَنْ سَيُنْزِلُ أَعْلامَنا: نَحْنُ, أَمْ هُمْ ؟ وَمَنْ
سَوْفَ يَتْلو عَلَيْنا "مُعاهَدَةَ اليأس" يا مَلِكَ
الاحْتِضار؟[৩৩৭]

সত্যের আছে দুই মুখ। আমাদের শহরের উপর
ঢেকে আছে বরফ কালো।
যতোটা হতাশ তার চাইতে আমরা আর বেশি হতাশ হতে পারিনি। সমাপ্তি তার নিজের ভুলের প্রতি আস্থাশীল হয়ে অশ্রুভেজা প্রাসাদের উপর দিয়ে
দেয়ালগুলোর দিকে যাচ্ছে, নিজের ভুলের উপর আস্থাশীল হয়ে
কারা তবে নামায় আমাদের পতাকা: আমরা না তারা? কারা তবে আমাদের সামানে তাড়াহুড়ো পাঠ করছে (শান্তিচুক্তি), হে মৃত্যুর রাজা!

কবিতাটির ১৫ তম পঙক্তিতে এসে কবি এই শান্তি আলোচনা সম্পর্কে তার কঠোর অবস্থান আরো আত্মবিশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করেন। যেন কবি তার জাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই শান্তি আমাদের কোনো কাজে আসবে না। এই শান্তি প্রক্রিয়া মুষ্ঠিভরা ধুলার মতো আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে (*...إنَّ هذا السَّلام سَيَتْرُكُنا حُفْنَةً مِنْ غُبار*)।[338] এমনকি এ কবিতাগুলোতে আরব জাতির বা আরব জাতিয়তাবাদ কেন্দ্রিক ক্ষমতা চর্চার সর্বশেষ পরিণতিকে রূপকায়িত করেছেন কবি দারভিশ। ১৯৪৮ এরপর আরব জাতি আরো তিনটি যুদ্ধে ইজরাইলের সাথে লড়েছে ফিলিস্তিনকে

---

[৩৩৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী আল মাছা আল আখীর আলা হাজিহি আল আরদি*, *আল দীওয়ান*, *আল আ'মালুল উ'লা-৩* (বৈরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লিল কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৭১।
[৩৩৭]. দারভীশ, মাহমুদ, *লি আল হাকীকাতি ওয়াজহান ওয়া আল ছালজু আসওয়াদ*, *আহাদা আশারা কাওকাবা* (বৈরুত: দার আল জাদীদ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৩।
[৩৩৮]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩।

কেন্দ্র করে। যুদ্ধ, সংগ্রাম আর রাজনৈতিক নানা গতিশীলতার মধ্যেও 'আরব' নামের একটি মৌল উপাদান বীজের মতো সবসময় ভিতর থেকে উদ্ভেদ করে করে উঠতো বিভিন্ন উপলক্ষে, নানা ঘটনায়। কিন্তু বহু ঘাত-প্রতিঘাত, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের রাজনীতির কূটচালের মধ্যে সেই বীজটুকুরও ধ্বংস নিশ্চিত হয়ে যায় এক সময়। আর এই নিশ্চয়তা ঘটে নিজেদেরই হাতে। *'আনা ওয়াহিদ মিন মুলুক আল নিহায়াহ'* কবিতায় কবি এমনই অভিব্যক্তি কাব্যময় প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ব্যক্ত করেন। কবি বলেন,

لا أَتلَفَّتُ خَلْفي لِئَلا
أَتَذَكَّرَ أَنّي مَرَرْتُ على الأَرْضِ, لا
هد أَرْضَ في
وءاً هذهِ الأَرْضِ مُنْذُ تَكَسَّرَ حَوْلي الزَّمانُ
، الشَظايا
هد لَمْ أَكُنْ عَاشِقاً كَيْ أُصَدِّقَ أَنَّ الْمِياهَ مَرايا
وءاً مِثْلَما قُلْتُ لِلأَصْدِقاءِ الْقُدامى, ولا حُبَّ
، يَشْفَعُ لي
فإن مُذْ قَبِلْتُ ((مُعاهَدَةَ الصُّلْح)) لَمْ يَبْقَ لي
الج حاضِرٌ
نود كَيْ أَمُرَّ غَداً قُرْبَ أَمْسي. سَتَرْفَعُ قَشْتالَةُ
ير تاجَها فَوْقَ مِئْذَنَةِ اللهِ. أَسْمَعُ خَشْخَشَةً
يدو لِلْمَفاتيح في
ن بابِ تاريخنا الذَّهَبِيّ, وَداعاً لِتاريخنا,
في هَلْ أَنا
هذه مَنْ سَيُغْلِقُ باب السَّماءِ الأخيرَ؟ أَنا زَفْرَةُ
الـ الْعَرَبِيِّ الأَخيرَة[339]
سا
عة الاستماع إلى الأغنيات
التي استمع الشهداء إليها، وظلّت
كرائحة البنّ في دمهم... طازجة

هدنة، هدنة لاختبار التعاليم:
هل تصلح الطائرات محاريث ؟
قلنا لهم: هدنة، هدنة لامتحان النوايا،
فقد يتسرب شيء من السلم للنفس!

পিছনে তাকাই না আমি যেন মনে হয় না যে
অমি এই ভূমির উপর দিয়ে চলে গেলাম।
যখন আমার চারপাশে টুকরো টুকরো ভেঙ্গে
পড়ে সময় তখন আর এই ভূমির উপর
কোনো ভূমি নেই। পুরোনো বন্ধুদের যেমন
বলি, আমি প্রেমিক নই যে বিশ্বাস করি
পানিই আয়না, কোনো ভালোবাসাই আমায়
বাসে না যখন গ্রহণ করি শান্তিচুক্তি। আমার
আর কোনো বর্তমান বাকি রইলনা যেন
সন্ধ্যার কাছাকাছি একটা ভবিষ্যতও পার
হতে পারি। আল্লাহর মিনারের উপর
কিশতাল তার মুকুট উচ্চকিত করবে
অচিরেই। আমি শুনতে পাই আমাদের
সোনালী ইতিহাসের দরোজার মুখে
চাবিসমূহের ঝনঝন শব্দ। বিদায় আমাদের
ইতিহাস! আমি কি সেই ব্যক্তি যে আকাশের
শেষ দরোজা বন্ধ করে দেবে শিগ্রই।

৩৩৯. প্রাগুক্ত। পৃ. ৯।

عندئذ نتبارى على حبِّ أشيائنا
بوسائل شعرية.
فأجابوا: ألا تعلمون بأن السلام مع النفس
يفتح أبواب قلعتنا
لمقام الحجاز أو النهوند؟
قلنا: وماذا؟... وبعد؟[340]

ধীরে ধীরে আসছে সৈনিকেরা। শহীদেরা যে গান শুনতো
এই মুহূর্তে তারাও শুনতে চায় সেসব গান। তারা এতোটা জীবন্ত
যেন তারা রক্তাক্ত দেহের ভিতর তাজা কফির ঘ্রাণের মতো
যুদ্ধবিরতি, কোন শিক্ষা দেয়ার জন্য পরীক্ষার জন্য যুদ্ধবিরতি:
বিমানগুলো কি তবে লাঙ্গলের কাজ করবে?
আমরা তাদের বললাম: যুদ্ধবিরতি—ইচ্ছাগুলো তলিয়ে দেখার জন্য যুদ্ধবিরতি।
তাহলে শান্তির কিছু একটা নিজস্বার্থে হয়তো লিক হয়ে যেতে পারে!
তখন আমরাও কবিতার মাধ্যমে
আমাদের বিষয় ভালোবাসার জন্য প্রতিযোগিত করবো
তারা জবাব দিলো: তোমরা কি জানোনা শান্তি থাকে নিজের সাথে
যে শান্তি খুলে দেবে হিজাজ কিংবা নাহওয়ান্দের জন্য
আমাদের দূর্গের দরোজাগুলো
আমরা বললাম: কি?... এরপর?...

أرى خيمة في مهب الجهات:
الجنوب عصي على الريح،
والشرق غرب تصوّف،
والغرب هدنة قتلى يسكّون نقد السلام.
فليس بجغرافيا أو جهة
إنه مجمع الآلهة!
يقول لها: انتظريني على حافة الهاوية
تقول : تعال.. تعال! أنا الهاوية[341]

আমি দেখি চতুর্দিক থেকে আসা ঝড়ের মুখে একটি তাবু:
বাতাসের উপর দক্ষিণ প্রান্ত যেন আমার লাঠি
এবং প্রাচ্য যেন আধ্যাত্মবাদের এক পশ্চিম

---

৩৪০. দারভীশ, মাহমুদ, *হালাতু হিছার* (), পৃ. ৮৬-৮৭।
৩৪১. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০।

বস্তুত পশ্চিম মানে খুন হওয়া সেসব মানুষদের যুদ্ধবিরতি
যারা চুপ থাকে শান্তির সমালোচনায়
বস্তুত পশ্চিম হলো বিবিধ ঈশ্বরের সমষ্টি
পশ্চিম বরং ঈশ্বরদের বলে: অপেক্ষা করো নরকের কিনারে এসে
ঈশ্বর জবাব দিয়ে বলে, আসো... আসো... আমিই স্বয়ং নরক হাবিয়া!

আহাদা আশারা কাওকাবা এই আলোচনায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে আসে। দারভীশ এখানে ইতিহাস এবং ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গকে যেমন পরিপূর্ণ কাব্য করে তুলেছেন তেমনি কবিতার মধ্যদিয়ে ইতিহাসের নানা বিষয়কে সাপেক্ষ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন চলমান রাষ্ট্র–রাজনীতি ও শত্রু-মিত্রের ভেদজ্ঞান বোঝার জন্য। বিশেষত এখানে জাতি এবং তার শত্রুরাষ্ট্র– এই দুটি বিষয় আহাদা আশারা কাওকাবায় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। ফিলিস্তিনের চলমান দ্বন্দ্বগুলো বিভিন্ন দিক থেকে বোঝার ব্যাপার রয়েছে। কারণ রাজনীতিকে সবসময় ব্যবহারিক রাজনীতির বিবিধ টানাপোড়েন এবং সংঘাতময় বিভিন্ন সম্পর্কগুলো থেকেও বোঝা যায়না। রাজনীতি এমন একটি ক্ষেত্র যাতে অনেকগুলো দৃষ্টি এসে পুঞ্জিভূত হয়। এতে একাধারে রয়েছে সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ঘটনাবলি ও বিষয়-আশয়। অপরদিকে রয়েছে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, যুদ্ধ-সংঘাত এবং অর্থনীতির নানাবিধ সম্পর্কসূত্র। একইসাথে রয়েছে ক্ষমতা, ক্ষমতা চর্চা, উত্থান ও পতনের বয়ান।[৩৪২] এসবকিছু মিলিয়ে রাজনীতি। যেকারণে রাজনৈতিক বিষয়গুলো বোঝার জন্য ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয়। আহাদা আশারায় দারভীশ প্রধানত ঐতিহাসিকভাবে শত্রু-মিত্রের সম্পর্কগুলো কিভাবে বর্তমান সময়কে প্রভাবিত করছে তার বিচিত্র কাব্যিক আখ্যান নির্মাণ করেছেন। দারভীশ এখানে গ্রানাডা, স্পেন, রেড ইন্ডিয়ান, উপনিবেশায়ন, কানআন, বনি-ইজরাইলের উত্থানের কাহিনী, নবী ইউসুফ এবং অপরাপর ভাতৃদ্বয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব ও তুলনা পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যদিয়ে বর্তমান ফিলিস্তিনের সামগ্রিক চালচিত্র বোঝার নিরিখে তুলে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন।

[৩৪২]. *ক্বিরাআতুন ফী 'আহাদা আশারা কাওকাবান' লি আল শায়ির মাহমুদ দারভীশ: ক্বাদিয়্যাতু ফিলিস্তীন শাকালাত হুদুরান মুওয়াজিয়ান লিমাআসাতি আন্দালুস, (২ এপ্রিল, ২০১০ খ্রি.), যঃঃঢ়ং://ররর.ধষশযধষবববল./ملحق/قراءة-في-أحد-عشر-كوكبا-للشاعر-محمود-درويش*

৪.৪: অসলো চুক্তি: ফিলিস্তিনের বদলে যাওয়া এবং দারভীশের ভিন্ন অভিযাত্রা

[১৯৯৩ সালে নরওয়ের অসলোতে প্রথমবারের মতো মুখোমুখি আলোচনায় বসে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন।আলোচনার পরবর্তী ধাপে এ দু'দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যা অসলো চুক্তি নামে পরিচিত।চুক্তির মূল বক্তব্যে বলা হয় যে, পশ্চিম তীর থেকে সকল সৈন্য প্রত্যাহার করবে ইসরায়েল।পাঁচ বছরের জন্য ফিলিস্তিনকে একটি অন্তবর্র্তীকালীন সরকার গঠনের অনুমতিও দেয় এ চুক্তি।]

আরবী কবিতার প্রকৃতি নৃগোষ্ঠী হিসেবে আরব জাতির সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আদি প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে আছে। দুটি আলাদা হয়েও অভিন্ন সত্তার পরিচায়ক। যেকারণে কবিতাকে সাংস্কৃতিকভাবে আরব জাতির রেজিস্ট্রার বলা হয় (আল শি'রু দিওয়ান আল আরাব)। আরব জাতির পরিচয়ের চিহ্ন হয়ে ওঠে কবিতা। ফলে কবিতা আরব জীবনে নিছক শিল্পকলার একটি অংশ হয়ে থাকেনি। তাদের জীবন প্রক্রিয়া বিশেষত রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। কবিতা যেভাবে আরব ইতিহাসের মূল থেকে উদ্ভূত হয়ে তাদের সার্বিক জীবন প্রক্রিয়ার সাথে যেমন মিশে একাকার হয়ে গেছে তেমনি রাজনীতি ও সমাজকে প্রভাবিত করেছে তীব্রভাবে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে ফিলিস্তিনের প্রেক্ষাপটে মাহমুদ দারভীশ ছিল তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ।

তার ব্যক্তিত্ব প্রথম থেকেই রাজনৈতিক। ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় বিষয়াদির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তার সর্বজন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। তিনি হঠাৎ করে প্রতিরোধের কবি হয়ে ওঠেননি। রাজনীতিতে দারভীশ শৈশব থেকে যুক্ত থেকেছেন। একপর্যায়ে তিনি পিএলও'র রাজনীতির সাথে জড়িত হন। পরবর্তীকালে তিনি দলটির কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিজের অবস্থান নিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯৮৮ সালে তিনি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তৃণমূল থেকে শুরু করে এভাবে যে বেড়ে ওঠা যা তার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমমনি কবিতার ওপর প্রবল নিয়ন্ত্রণ সঞ্চার করতে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন তিনি। কবিতা আর গদ্যকে তিনি সমাজ, রাষ্ট্র ও ফিলিস্তিনের চলমান চালচিত্রের জীবন্ত সাক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কবিতার প্রকৃতি কিংবা শিল্পের দাবি অক্ষুণ্ন রেখে ফিলিস্তিনী রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ, সত্যমিথ্যা কিংবা জনমানসের সর্বজনীনতাকে তার কাব্যিক ভাষায় বাজ্ময় করে তোলেন। ফলে দেখা যায়, লিপ্তধারার কবি হিসেবে দারভীশ রাজনীতি থেকে, তার ব্যক্তি ও সমাজের বহমান ইতিহাস থেকে কবিতাকে বিচ্ছিন্ন করতে যাননি। সবকিছুর মধ্যে কবিতা হয়ে ওঠে তার উচ্চারিত প্রবল কণ্ঠ। তার ইতিহাসের পরিচয় হিসেবে সত্তা হিসেবে কবিতার দাবি এবং কবিতার কাজকে নির্ধারণ করে দেন দারভীশ। ঐতিহাসিক দিকে থেকে এটি ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ। যেকারণে দারভীশকে 'বিত্বকাতুন হুবিয়্যাহ' (পরিচয়পত্র) সৃষ্টি করতে হয়েছে। যেখানে তিনি 'সাজ্জিল আনা আরাবিয়ুন' লিখে ."الشـــعر ديوان العرب এর সাথে তার জাতিগত ঐতিহাসিকতা ঘোষণা করেন। 'লিখে

রাখো আমি আমি একজন আরব' এই বক্তব্যই হয়ে ওঠে দারভীশের অন্যতম সিগনেচার। এ বক্তব্য নিছক জনতুষ্টিবাদি (পপুলিস্ট) কাব্যিকতার মধ্যে পর্যবসিত করা যায় না। এটি তার সত্তাগত। এটিই তার অন্টোলজি। শুধু জাতিবাদির দিক থেকে নয়, এমনকি এটি তার ঐতিহাসিক সত্তারও সংজ্ঞায়ন। দারভীশ যে কালে যে প্রেক্ষিতে এ উচ্চারণ তুলছিলেন তখন এটিই ছিল তার শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত। এরপর কবি তার পরিচয়ের সারসত্য সময়মতো এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উচ্চারণ করে গেছেন। জাতীয় জীবনের অনেক বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন। রাজনীতির সত্যাসত্য কবিতার ভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন। উন্মোচন করেছেন জাতীয় রাজনীতিতে শত্রুমিত্রের ভেদ। ১৯৬৪, ১৯৬৯, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৭, ১৯৮১. ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৪। এ সময়কালগুলো শুধু কিছু তারিখ-সন নয়, এগুলো ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিলও নিশ্চয়ই। ১৯৭৬-এ লেবাননের তাল-আল-জা'তারে যে গণহত্যা চালিয়েছিল ইজরাইল তারই আখ্যান রচিত হয়েছে আহমাদ আল জা'তারে। শাবরা শাতিলায় ফিলিস্তিনের আশ্রয় শিবিরে যে গণহত্যা সংঘটিত করে জায়োনিস্ট শাসন তার মহাকাব্যিক ভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন কবি তার অনবদ্য সৃষ্টি 'মাদীহ আল জিল আ'লী'তে। তেমনি *বৈরুত* কাব্যগ্রন্থে। কাসীদা আল আরদ... আবিরুনা ফী কালামিন আবিরিন লিখে .... ওই সময়ের ইজরাইল-ফিলিস্তিন আলোচনার নেপথ্য চক্রান্তে আঘাত করেন। একই প্রত্যাঘাত করেন ১৯৯০ সালে আরা মা উরীদ কাব্যগ্রন্থে। ১৯৯২ সনে মাদ্রিদ শান্তি আলোচনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে লিখেন আলোচিত কবিতা 'আহাদা আশারা কাওকাবা'। ১৯৯৬ সালে মাআ ইমরাউল কায়স.... লিখে অসলো শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে ফিলিস্তিনী রাজনীতিতে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকার সত্য উন্মোচন করেন কবি।

মাদরিদ সম্মেলনের দুই বছরের পর অনুষ্ঠিত হয় অসলো শান্তি চুক্তি যেটি 'অসলো অ্যাকর্ড' নামে বিখ্যাত। দারভীশ এই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন। এমনকি বিরোধিতা করে এক পর্যায়ে এই চুক্তির প্রতিবাদস্বরূপ পিএলও থেকেও ইস্তফা দেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নেই দারভীশ পদত্যাগ করেন। অসলো চুক্তির সমালোচনা করে দারভীশ রচনা করেন বিখ্যাত কবিতা 'খিলাফ, গায়রা লুগাবিয়ুন মাআ ইমরাউল কায়স'। কবিতাটি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।

দারভীশ সম্পর্কে বেশকিছু রিজার্ভেশন থাকতে পারে যে, তিনি প্রতিরোধের কবি হিসেবে শুরু থেকেই অভিষিক্ত–ফলে কোনো না কোনো ইস্যুতে তিনি সোচ্চার হবেন। তার একটা অবস্থান থাকবে। দারভীশ কবি হিসেবে যেমন সমাদৃত তেমনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে দারভীশের বুদ্ধিজীবীতামূলক তৎপরতাও ছিল। সংবাদপত্রে কাজ করার সুবাদে এক্ষেত্রে তার সক্রিয়তা ছিল লক্ষণীয়। কবি হিসেবে যেমন বিদ্রোহী ও প্রতিরোধকামী ব্যক্তিত্ব ছিল তেমনি বুদ্ধিজীবী হিসেবেও ক্ষমতার প্রক্রিয়াগুলোর সামনে সত্য উচ্চারণের প্রবল প্রতিবাদী অবস্থান ছিল। অসলো চুক্তির ক্ষেত্রে তার এ অবস্থান পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এ চুক্তিকে কেন্দ্র করে পিএলও'র সাথে যে তিক্ততা ও বিরোধিতা তা আগের মতোই ছিল। চুক্তির পরও রাজনৈতিক বিষয়ে দারভীশের স্বাধীন অবস্থান ছিল। দলীয় প্রক্রিয়া

থেকে নিজেকে আলাদা করেও তার বিরোধী ভূমিকা ছিল। তবে অসলোর ঘটনা যে পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছিল তার সাথে পূর্বাপর ঘটনাগুলোর মিল যেমনই হোক চুক্তির প্রভাব ছিল ব্যাপক। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক এ ঘটনাকে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই মোড় শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘটে যায়নি, দারভীশের জীবনেও ঘটে যায়। তার কবিতা ও চিন্তাধারায় নতুন ধরনের অভিযাত্রার সূচনা ঘটে। তৈরি হয় তেমনি দারভীশের কবিতার ভাষা ও কাঠামোয় নতুন বাঁকবদল।

তার দ্বৈত অবস্থানকে ঘিরে যে বিতর্ক চলে আসছিল অসলো চুক্তির ঘটনায় তার দৃষ্টান্ত নতুনভাবে দৃশ্যমান হয়। *খিলাফ, গায়রা লুগাবিয়িন মাআ ইমরাইল কায়স*–রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্ক সৃষ্টি করে যেমন তেমিন সাহিত্যিক মহলেও। দারভীশ এ কবিতায় উপমা সৃষ্টি করতে ইমরুল কায়স'র মতো একজন ব্যক্তিত্বকে বেছে নিলেন। কবিতার কৌশলগত দিক থেকে এটি জরুরি হয়ে পড়েছিল হয়ত। কিন্তু ভাষাকৌশলের দিক থেকে এ চয়েস এবং নির্ধারণ জরুরি হয়ে পড়েছিল তা নয়, বরং কবিতার কাঠামোও হয়ত তাকে তা করতে সুযোগ তৈরি করে দেয়। অসলো চুক্তির বিরোধিতার যে কাব্যিক উপাখ্যান নির্মাণ করতে হয়েছিল তাতে মূল উপাদান হয়ে আসে ইমরুল কায়েস। প্রাক আরব-ইসলামিক যুগের জাহিলী কবি ইমরুল কায়স। কবি হিসেবে সমকালে ইমরুল কায়েসের কোনো তুলনা ছিল না। অসাধারণ কাব্যখ্যাতি নিয়ে আরবী কবিতার ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছেন এই জাহেলি কবি। কিন্তু দারভীশ এই সময়ে এসে কেন ইমরুউল কায়েসকে তার কবিতার শিরোনাম করলেন? এই রহস্যের জট খুলতে সমালোচকদের কসরতের অন্ত নেই। অসলো চুক্তির প্রতিবাদ করে দারভীশ পিএলও থেকে পদত্যাগ করার পর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লিমাজা তারাকতু আল হিছান ওয়াহিদা'– যেখানে 'খিলাফ, গায়রা লুগাবিয়ুন মাআ ইমরাইল কায়স' রয়েছে। কবিতাটির সাথে চুক্তির কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় সৃষ্টি হয় সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে। রাজনৈতিক সম্পর্কের জায়গাগুলোতে পেছনের নানা ঘটনায় দারভীশের অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কারণে এ সন্দেহ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয় বোদ্ধা মহলে। নানা বিতর্কের মুখে পড়ে দারভীশের কবি ব্যক্তিত্ব।

আগের প্রকাশিত সমস্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতার বইটি একেবারে আলাদা। স্বতন্ত্র। কাব্যগ্রন্থ হিসেবে *লিমাজা তারকাতু আল হিছান ওয়াহিদা*'র ভিন্ন ধাঁচের বিষয়ানুষঙ্গ, ভাষাসংশ্লেষ ও নতুনতরো কাঠামোর কারণে দারভীশের কবিতার প্ররিভ্রমণে নতুন অভিষেক ঘটে। নিচে পুরো কবিতাটি তুলে ধরা হলো,

তারা বন্ধ করে দিল দৃশ্যপট
অন্যের দ্বারে ফিরে যাওয়ার অবকাশ রেখে
খর্ব করে। হাসতে হাসতে আমরা প্রবেশ করলাম
সিনেমার পর্দায়
পর্দায় আমাদের যেমন থাকার কথা
আমরা তৈরি করলাম এমন বাক্য
আগেই যা আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল
শহীদদের শেষ সুযোগের জন্য দুঃখ
অতঃপর আমরা ঝুঁকে পড়লাম
ভিন্নপথের যাত্রীদের কাছে সঁপে দিই
আমাদের নামগুলো
আর আমরা ফিরে আসি ভবিষ্যতের কাছে
খর্ব হয়ে নিঃস্ব হয়ে
তারা বন্ধ করে দিল দৃশ্যপট
তারা জয় করল
আমাদের সমস্ত অতীত হিসেব করে গেল তারা
ক্ষমা করে দিল ভিকটিমের ভুলত্রুটি
যখন তার হৃদয়ের কথাগুলোর জন্য
দুঃখ প্রকাশ করল
তারা বদলে দিল সময়ের ঘণ্টা
তারা জয় করে নিল...
যখন তারা আমাদের চূড়ান্ত দৃশ্যের কাছে নিয়ে গেল
আমরা পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম
আমাদের পর সময়ের ভিতর থেকে বাগানের উপর দিয়ে
উঁকি মারছে শাদা ধোঁয়া। আর ময়ূরগুলো
স্বতন্ত্রশব্দসমূহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য
সিজারের পত্রের পাশে ছড়িয়ে দেয় রঙ্গিন ডানা
যে শব্দসম্ভার ইতিমধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

غلقوا المشهد
تاركين لنا فسحة للرجوع إلى غيرنا
ناقصين. صعدنا على شاشة السينما
باسمين, كما ينبغي أن نكون على
شاشة السينما, وارتجلنا كلاما أعد
لنا سلفاً، آسفين على فرصة
الشهداء الأخيرة. ثم انحنينا نسلم
أسماءنا للمشاة على الجانبين.
وعدنا
إلى غدنا ناقصين...
أغلقوا المشهد
انتصروا
عبروا أمسنا كله,
غفروا
للضحية أخطاءها عندما اعتذرت
عن كلام سيخطر في بالها,
غيروا جرس الوقت
وانتصروا...
عندما أوصلونا إلى الفصل قبل
الأخير
التفتنا إلى الخلف: كان الدخان
يطل من الوقت أبيض فوق الحدائق
من بعدنا. والطواويس تنشر
مروحة
اللون حول رسالة قيصر للتائبين
عن المفردات التي اهترأت. مثلاً:
وصف حريةٍ لم تجد خبزها. وصف
خبز بلا ملح حريةٍ. أو مديح حمام
يطير بعيداً عن السوق...
كانت رسالة قيصر شمبانيا للدخان
الذي يتصاعد من شرفة الوقت
أبيض ..

যেমন স্বাধীনতার ভাষ্য রুটিবিহীন
তেমনি রুটির ভাষ্য স্বাধীনতার স্বাদবিহীন। কিংবা
কবুতরের স্তবগাথা উড়ছে বাজার থেকে দূরে কোথাও
সিজারের পত্র ছিল মূলত সেই ধোঁয়ার জন্য শ্যাম্পেনের
মতো
সময়ের বেলকনি থেকে যা উঠছে
শাদা শাদা...

বন্ধ করে দিয়েছে তারা মঞ্চের পর্দা
ছিনিয়ে এনেছে তারা বিজয়
ছবি তুলেছে তারা ইচ্ছামতো আমাদের আকাশের
নক্ষত্রের... নক্ষত্রের
ছবি তুলেছে তারা ইচ্ছামতো আমাদের নদীর
মেঘের ... মেঘের
বদলে ফেলেছে তারা সময়ের ঘণ্টা
ছিনিয়ে এনেছে তারা বিজয়

রঙ্গিন ফিতার ভূমিকা নিয়ে আমরা খেয়াল করলাম
উত্তরের নক্ষত্র দক্ষিণের তাঁবু কোনো কিছুই আমরা
পাইনি।
বস্তুত আমরা কখনোই চিনিনি আমাদের কণ্ঠ
সেদিন মাইক্রোফোনগুলোতে কথা বলেনি আমাদের
রক্ত,
ভাষা যখন তার ভূমিকা পাল্টে ফেলেছিল সেদিন
আমরা নির্ভর করেছিলাম এমনই ভাষার উপর যা
নিজেই তার বুক ভেঙ্গে
খানখান করে দিয়েছিল। কেউ তখনো ইমরুল
কায়েসকে বলেনি:
আপনি আমাদের সাথে নিজের সাথে কি করেছেন?
সুতরাং যাও সিজারের পথ ধরে–
যাও সময়ের ভিতর উঁকি মারা কালো ধোঁয়ার পিছে
পিছে। যাও সিজারের পথ ধরে একা একা শুধু একা
আর আমাদের জন্য রেখে যেও তোমার ভাষা।

أغلقوا المشهد
انتصروا
صوروا ما يريدونه من سماواتنا
نجمةً .. نجمةً
صوروا ما يريدونه من نهاراتنا
غيمةً غيمةً,
غيروا جرس الوقت
وانتصروا ...

إلتفتنا إلى دورنا في الشريط
الملون،
لكننا لم نجد نجمة للشمال ولا خيمة
للجنوب. ولم نتعرف على صوتنا
أبداً.
لم يكن دمنا يتكلم في الميكروفونات
في
ذلك اليوم, يوم اتكأنا على لغةٍ
بعثرت قلبها

عندما غيرت دربها. لم
يقل أحد لامرئ القيس: ماذا صنعت
بنا وبنفسك؟, فاذهب على درب
قيصر' خلف دخان يطل من
الوقت أسود. واذهب على درب
قيصر, وحدك, وحدك, وحدك
واترك لنا, ههنا, لغتك![343]

৩৪৩. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদান* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৫১।

কবিতাটির অন্তত দু জায়গায় ‘ইমরুল কায়স’র নাম এসেছে। ঠিক এই নামকরণ বা নামোল্লেখকে কেন্দ্র করেই বিতর্কের সূত্রপাত। বিতর্ক এই কারণে যে, দারভীশ অসলো চুক্তির বিরোধিতা করেছেন–এটা প্রায় সবার কাছে বিহিত–কিন্তু সেই বিরোধিতা তিনি কবিতার ভাষায়ও করেছেন–পিএলও’র সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব এবং ফিলিস্তিনের কর্ণধার ইয়াসির আরাফাতের সমালোচনা করতে গিয়ে দারভীশ তাকে ইমরুল কায়েসের সাথে তুলনা করেছেন। তবে ইমরুল কায়েসের সাথে ইয়াসির আরাফাতের তুলনা কিংবা ইমরুল কায়েসকে দিয়ে ইয়াসির আরাফাতকে বোঝানোর নেপথ্যে কি ধরনের পটভূমি কাজ করেছে এটি ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নান্দনিক দিক থেকে বা কবিতার শৈল্পিক পরিপ্রেক্ষিত বিচারে ইমরুল কায়েস এবং তার সময় ও দেশকাল কিভাবে ইয়াসির আরাফাত ও ফিলিস্তিনের সাথে বিচারের বিষয় হয়ে ওঠলো তার আলোচনা সেকারণে জরুরি। উদ্ধৃত কবিতাটির অভ্যন্তরে ঢুকার আগে তাই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইমরুল কায়েসকে জানা দরকার।

ইমরুল কায়েস আরব দুনিয়ার বিখ্যাত কবি। ইসলাম-পূর্ব প্রাচীন আরবী ভাষায় অত্যন্ত শক্তিমান ও প্রভাব বিস্তারী কবি ছিলেন তিনি। বিশেষত ঐতিহাসিকভাবে আলোচিত সাব’আ মুআল্লাকা বা সপ্ত ঝুলন্ত কাব্যের প্রধান রচয়িতা ছিলেন ইমরুল কায়েস। ইমরুল কায়েস যে মুআল্লাকার জন্য প্রসিদ্ধ তা ছিল মূলত একটি বিরহকাব্য (ট্রাজিডিক পোয়েট্রি)। স্বাভাবিক ও প্রাথমিক পঠনে মনে হবে এটি প্রেমের সম্পর্কে বিচ্ছেদে নিপতিত একজন ট্রাজিক প্রেমিক কবির কাব্যিক আখ্যান। মোটকথা যার অন্তরালে রয়েছে গভীরতম বিচ্ছেদের দহন। যেখানে কবি তার প্রেমিকার বর্ণনা দিয়েছেন বিচিত্র ভাষায়, তার দেহবল্লরীর কৌমার্যপূর্ণ ভূতপূর্ব উপমার সৌকর্যে এমনভাবে গেঁথেছেন আপন কবিতার ভুবন–যার অন্তস্থল দিয়ে একই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে গেছে বিরহনন্দিত হারানো সুর ও বেদনাার করুণাচল। কিন্তু বস্তুতপক্ষে কি ঘটে গিয়েছিল কবির নিদারুণ বাস্তব জীবনে? ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষকদের মতে, ইমরুল কায়েসের জীবনের অন্তরাল নিয়ে বিপুল জনশ্রুতি আছে–যা বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়। কবির মুআল্লাকা সৃষ্টির পটভূমি ছিল আপন গ্রোত্রের কর্তৃত্ব হারানোর অন্তর্যন্ত্রণা। ইমরুল কায়েসের গোত্র ছিল ‘কিন্দা’। তার বাবা ছিলেন ওই গোত্রের সর্বশেষ রাজা বা গোত্রপ্রধান। কিন্দার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ‘বনু আব্বাস’ গোত্র। দুই গোত্রের মধ্যে বহুকালের উত্তেজনাপূর্ণ শত্রুতা ছিল। একসময় শত্রুতামূলক সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠলে বনু আব্বাসের সাথে কিন্দার যুদ্ধ লেগে যায়। তাতে ইমরুল কায়েসের বাবা নিহত হন। এবং নিজ গোত্রের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বনু আব্বাসের হাতে। প্রাচীন আরবের প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধে হেরে গেলে পুনরায় কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে প্রতিশোধ যুদ্ধে জয়ী হতে হয়। ফলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের ঘোষণা দেন কবি ইমরুল কায়েস। পুত্রের কাঁধে অনেক দায়। একদিকে বাবার খুনের বদলা নেয়ার দায় অপরদিকে হারানো গোত্র এবং তার কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের দায় কবিকে অস্থির করে তুলেছিল। ইমরুল কায়েসের সবই ছিল–তার বাবার গড়া বৈষয়িক প্রাচুর্য, সৈন্যবাহিনী, জনশক্তি সবকিছু ছিল–কিন্তু তাদের সংগঠিত করার মতো মনোবল বা নেতৃত্বের গুণাবলী ছিল না। তার বন্ধু-আপনজনদের অনেকে তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, পিতৃহত্যার বদলায় বনু আব্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অন্যান্য গোত্রপ্রধানদের কাছে যেতে–তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং একপর্যায়ে সহযোগিতা নেয়ার অনুরোধ জানাতে। কবি

হয়ত চেষ্টা করেছিলেন। শেষপর্যন্ত সক্ষম হননি। তার কবিসুলভ ভবঘুরে ব্যক্তিত্বের কারণে হয়ত তাকে দায়গ্রস্থ হয়েই থাকতে হয়েছে। যেকারণে তার নামের সাথে ভবঘুরে রাজা উপাধীও যুক্ত হয়ে যায়। যাকে বলা হতো 'আল মালিক আল দ্বালীল'। ঠিক এ সময়ে ইমরুল কায়েসের সামনে একটি বড় সুযোগ আসে রোমান সাম্রাজ্য বাইজান্টাইনের তরফে। সুযোগ নিয়ে কবি বনু আব্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে আরব উপদ্বীপ পাড়ি দিয়ে তৎকালীন বাইজান্টাইন শাসক জাস্টিনিয়ানের (জুলিয়াস সিজার) শরণাপন্ন হন। অবশ্য সিজারই ইমরুল কায়েসকে তার সাথে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এ আমন্ত্রণের পিছনে আঞ্চলিক রাজনীতিতে সিজারের কৌশলগত প্রভাব তৈরির কোনো পরিকল্পনা ছিল বলা যায়।[৩৪৪] পুরো সফরে তাকে সঙ্গ দেন বন্ধু কবি আমর বিন কামিয়া (قميئة بن عمرو)। আমর বিন কামিয়া (মৃত্যু ৫৩৮) জাহিলী যুগের অন্যতম খ্যাতিমান কবি।[৩৪৫] সিজারের দরবারে উপস্থিত হলে এ সময় তাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দেয়া হয়। সিজার তাকে সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। সাথে তাকে বিশাল সৈন্যবাহিনীর একটি বহরও প্রদান করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিশোধ নিতে পারেননি কবি। উপরন্তু খোদ সিজারের ষড়যন্ত্রের শিকার হন ইমরুল কায়েস।

নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশে দরবার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর পথিমধ্যে সিজারের একজন বিশেষ দূত এসে সাক্ষাৎ করেন। এবং ইমরুল কায়েসকে সিজারের পক্ষ থেকে একটি চিঠি এবং একটি স্বর্ণখচিত জরিদার কারুকাজ করা আলখেল্লা উপহার হিসেবে তুলে দিয়ে ফিরে যান ওই বিশেষ দূত। আলখেল্লাটি পরার সাথে সাথে কবির পুরো শরীরের ত্বকজুড়ে ফোসকা দেখা দেয়। এতে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধারণা করা হয়, আলখেল্লাটিতে বিশেষধরনের বিষ মেশানো ছিল। বিষের যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ইমরুল কায়েস। (যেকারণে তাকে 'জুল কুরুহ' বা বিষঅলা উপাধীও দেয়া হয়) এটি ছিল ইমরুল কায়েসের জীবনের শেষদিনগুলোর বাস্তবতা। ইমরুল কায়েস তার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি বনু আব্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেননি, আবার যখন সিজার তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কেন তিনি তার সহযোগিতা নিতে কনস্টান্টিনোপল ভ্রমণ করেন। অপরদিকে সিজার কেন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন–সিজারের কোনো রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল কিনা–এসব বিষয়ের সাথে দারভীশের এই কবিতার নেপথ্য সম্পর্ক রয়েছে।

কবিতাটিতে ইমরুল কায়স প্রেসিডেন্ট আরাফাতের রূপক। অর্থাৎ আরাফাত ইমরুল কায়সের মধ্যে ভর করে প্রকাশিত নাকি ইমরুল কায়েস আরাফাতের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক আবর্তনচক্রে এসে প্রকাশিত-এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অদ্ভুত বটে। কিন্তু কেন আরাফাতের নাম সরাসরি প্রকাশ না করে ইমরুল কায়সের নাম নিলেন দারভীশ? বিষয়টি খোলাসা করেছেন দারভীশ বিশেষজ্ঞ

[৩৪৪]. মুমাইজ, ইবরাহিম, *ইমরু আল কায়স এন্ড বায়জেন্টাইয়াম* (নেদারল্যান্ড: জার্নাল অব অ্যারাবিক লিটারেচার, ব্রিল, ভলিয়ম-৩৬, ইস্যু-২, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৩৬।
[৩৪৫]. আলী ইয়াহইয়া আল উধারি, আব্দুল্লাহ, *জাহিলি পোয়েট্রি বিফোর ইমরু আল কায়স* (মিশিগান: প্রোকোয়েস্ট, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৯৫।

খ্যাতিমান ফিলিস্তিনী সাহিত্য সমালোচক আদেল আসতাহ। আল আসতাহ মনে করেন, আরাফাতের সাথে দারভীশের বেশ ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল কিন্তু তারপরও চুক্তির বিরোধিতা করায় তার সতীর্থ এবং পিএলও'র প্রতিনিধিদের দ্বারা লাঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় সরাসরি আরাফাতের নামোল্লেখ করেননি তিনি।

'কিন্দা' তৎকালীন প্রাচীন দক্ষিণ আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোত্র। কিন্তু অপর প্রভাবশালী গোত্র বনু আব্বাসের হাতে কিন্দা এক সময় বেহাত হয়ে যায়। এখানে কিন্দা যেমন বেদখল হয়ে যায় এবং দখলকৃত সে ভূমি বা গোত্রের পুনরুদ্ধারের ভার নিতে হয়েছিল ইমরুল কায়েসকে। এ পর্যন্ত কিন্দার সাথে ফিলিস্তিনের একটি ঐতিহাসিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্দা রাজনৈতিকভাবে যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে তেমনি ফিলিস্তিনকেও তাই করতে হচ্ছে। একইসাথে দখলকৃত ভূমি বা কিন্দার পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব যেমন তার জনগণকে নিতে হয়েছে বা কোনো একজন জনপ্রতিনিধিকে (ইমরুল কায়েসকে) নিতে হয়েছে তেমনি ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে নিতে হয়েছে ইয়াসির আরাফাতকে। এখানেও একটি মিল লক্ষ করা যায়। অপরদিকে কিন্দার নেতৃত্ব ফিরে পেতে ইমরুল কায়েস যেমন কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং একপর্যায়ে বিদেশী শক্তির সাহায্যের শরণাপন্ন হন তেমনি ইয়াসির আরাফাতও বিদেশী শক্তির আশ্রয় নিয়ে ইজরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি করে নিজ দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হন। বিদেশী শক্তির সহযোগিতা নিয়ে আপন গোত্র ও তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে যেমন ইমরুল কায়েস ব্যর্থ হয়েছিলেন, ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তেমনি ইয়াসির আরাফাতও সফলতার দ্বারে পৌঁছাতে পারেননি। আরাফাতকেও নানা চক্রান্তের মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছে। দারভীশ এ কবিতা লেখার অনেক পরে যদিও ইয়াসির আরাফাত মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু অদ্ভুতভাবে ইমরুল কায়েসের মৃত্যুর ঘটনার সাথেও ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর ঘটনার মিল রয়েছে। ইমরুল কায়েসকে যেমন বিদেশী শক্তি (বায়জান্টাইন শাসক সিজার) কর্তৃক বিশেষ ধরনের বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করা হয় তেমনি ইয়াসির আরাফাতকেও হত্যা করা হয় উচ্চমাত্রার তেজষ্ক্রিয় পদার্থ পোলোনিয়ামের সাহায্যে।[৩৪৬] অবশ্য আরাফাতের মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে তারপরও খুব সরলভাবে বলা যায় না যে, তার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। মোটকথা, ইমরুল কায়েসের সাথে ইয়াসির আরাফাতের তুলনার মধ্যদিয়ে বস্তুত দারভীশ অত্যন্ত কার্যকর রূপক কবিতার দৃষ্টান্ত নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন নিসন্দেহে। উপরন্তু কবিতার বিশ্লেষণে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, দারভীশ ইয়াসির আরাফাতকে নিছক একজন ব্যক্তির মধ্যে পর্যবসিত করেননি বরং ইমরুল কায়েসকে কবিতার ভাষায় একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে হাজির করে পুরো ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনার দরোজা উন্মোচন করে দিয়েছেন।

কবিতাটির পাঠ বা বোঝাবুঝি বিভিন্নভাবে হতে পারে। সাধারণত কবিতার শৈল্পিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবিতার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু একরৈখিক নান্দনিক বিচারের জন্য এ কবিতা ঠিক তেমন

[৩৪৬]. *প্যালেস্টাইনিয়ান লিডার আরাফাত ওয়াজ মারডার্ড উইথ পোলোনিয়াম* (লন্ডন: রয়টার্স, নভেম্বর ৬, ২০১৩ ইংরেজি), যঃঃঢ়ং://ïïï.ৎবঁঃবৎং.পড়স/ধৎঃরপষব/ং-ঢ়ধষবংঃরহরধহং ধৎধভধঃ-রফটঝইজঊ৯অ৫০ঝ৫২০১৩১১০৬, ইয়াসির আরাফাত মে হেভ বিন পয়জনড উইথ পোলোনিয়ম, (লন্ডন: বিবিসি, নভেম্বর ৬, ২০১৩ ইংরেজি), যঃঃঢ়ং://ïïï.ননপ.পড়স/হবংি/ড়িৎষফ-সরফফষব-বধংঃ-২৪৮৩৮০৬১

যথোপযুক্ত নয়। তার মানে এ নয় যে, কবিতাটির শিল্পমূল্য ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। কবিতা যেমন নানান রকম তেমনি তার দেখার ও ব্যাখ্যা করার শৈলীও বিবিধ। যেহেতু কবিতাটিতে ইমরুল কায়েস এবং সিজার এর নামোল্লেখ রয়েছে ফলে তার ঐতিহাসিকতা বলাবাহুল্য একইসাথে এর একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত স্বাভাবিকভাবে হাজির। সাম্প্রতিকতায় ফিলিস্তিন প্রশ্ন কিভাবে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে উপস্থিত তার একটি গণবোঝাবুঝি ইতিমধ্যে বিদ্যমান। ফলে পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয় না কিভাবে কবিতাটিতে প্রবেশ করতে হবে। যেখানে আমেরিকার হোয়াইট হাউসে বসে অসলো চুক্তি সংঘটিত হয়েছে তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে কবিতাটি কিভাবে সূত্র হিসেবে কাজ করে পাঠকের জন্য এটি বরং একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে ওঠে। একইভাবে ইমরুল কায়েস, তার দেশ-গোত্র এবং সিজারের মধ্যকার সম্পর্ক ও ভূমিকা কিভাবে ফিলিস্তিনী বাস্তবতার সাথে বর্তমান হয়ে ওঠতে পারে অসলো চুক্তির রঙ্গমঞ্চে তার একটি সেতুবন্ধও উদ্ধার করা যায় কবিতাটিতে। কবিতাটি এমনভাবে শুরু করা হয়েছে যেন সত্যি সত্যি একটি 'নাট্যমঞ্চ' কল্পনায় ভেসে ওঠে। বিমূর্তভঙ্গিতে মূর্তমান করে তোলা হয়েছে একটি মঞ্চ। দৃশ্যের পর দৃশ্য। কিন্তু কোনো নাম নেই মঞ্চটির। দৃশ্যগুলো প্রদর্শিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মঞ্চটির দৃশ্যপটেও পর্দা পড়ে যায়। বন্ধ করতে হয় তার পর্দা। সেই দৃশ্যপটে মঞ্চায়িত হয় বিজয়ী এবং বিজিতের ঐতিহাসিকতা। ক্ষমতা কিভাবে তৈরি হয় এবং তা তৈরির প্রকৌশলগুলো কিভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে–প্রভাবিত করে বিজিতের যাবতীয় পদক্ষেপগুলোতে। যেহেতু সেই মঞ্চে দৃশ্যপটের পর্দা যারা টেনে ধরেন তারা মূলত বিজয়ী। পুরো দৃশ্যপট নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই। 'তারা বন্ধ করে দিল দৃশ্যপট/তারা জয় করল/পার হয়ে গেলো আমাদের সমস্ত অতীত/ক্ষমা করে দিল বিজিতের ভুলত্রুটি/যখন তার হৃদয়ের কথাগুলোর জন্য/
দুঃখ প্রকাশ করল/তারা বদলে দিল সময়ের ঘণ্টা/জয়লাভ করল তারা...

প্রথম পাঠে কবিতাটিতে অবস্থানগত রূপক বা দৃশ্যপটের সাজুয্য ধরা পড়ে। একটি বাইজান্টাইনের সিজারের রাজদরবার। অপরটি হোয়াইট হাউজ–যেখানে অসলো চুক্তির অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ইমরুর কায়েস যেখানে একজন কবি ছিলেন না, ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যদিও তিনি শেষপর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে ভুল করেছেন। একই ঘটনার আবর্তন ঘটে ইয়াসির আরাফাতের ব্যাপারেও। অপরদিকে বাইজান্টাইন সফরে ইমরুল কায়েসের সফরসঙ্গী বন্ধু কবি আমর বিন ক্বামিয়া স্বেচ্ছায় ইমরুল কায়েসকে সঙ্গ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু হোয়াইট হাউসে যাওয়ার সময় মাহমুদ দারভীশ ইয়াসির আরাফাতের সাথে যেতে রাজি ছিলেন না। এখানে এসে দুটো ঘটনার অর্থ ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়–যা এখানে নতুনতর অর্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কাব্যিক দিক বিবেচনায় এখানে মিল না থাকলেও বস্তুত এই ভিন্নতাই কবিতাটির মৌলিক তাৎপর্য। পুরো কবিতাটির যে নির্মাণগত ভিত্তি ও অর্থগত অনিবার্যতা এই ভিন্নতা ও বিরোধ না থাকলে তার কোনো মূল্য অভিযোজিত হয় না। কবিতাটির সৃষ্টিই হয়েছে বিরোধাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি উস্কে দেয়ার নিমিত্তে। যেখানে আমর বিন কামিয়া রাজি থাকলেও দারভীশ শুধু চুক্তির বিরোধিতাই করেননি বরং প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি পিএলও থেকে পদত্যাগও করেন।[৩৪৭] কবিতার এক পঙক্তিতে এই প্রতিবাদও

[৩৪৭]. শ্লাইম, আভি, *দি আয়রন ওয়াল ইজরাইল এন্ড দি আরব ওয়ার্ল্ড* (নিউ ইয়র্ক-লন্ডন: ডব্লিউ ডব্লিউ নরটন এন্ড কোম্পানি, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৬০০।

জারিত হয়েছে। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে দারভীশ মূলত প্রতিবাদী উচ্চারণ করলেন। "আমাদের রক্ত সেদিন মাইক্রোফোনে কথা বলেনি, সেদিন আমরা এমন এক ভাষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম যার আত্মা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যখন ভাষার রাস্তাই বদলে গিয়েছিল। তখন ইমরুল কায়েসকে কেউ বলে দেয়নি: আমাদের সাথে এমনকি তোমার নিজের সাথে তুমি কি করেছিলে?"

'আমাদের রক্ত', 'কথা বলা', 'ভাষার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া', 'ভাষার আত্মা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া', 'ভাষার রাস্তা বদলে যাওয়া' বিষয়গুলো ইংগিতপূর্ণ যা দারভীশের অবস্থান বোঝার জন্য বিশদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। প্রথমত, 'তখন ইমরুল কায়েসকে কেউ বলে দেয়নি: আমাদের সাথে এমনকি তোমার নিজের সাথে তুমি কি করেছিলে?"– এ পঙ্কতি দুটিতে অসলো চুক্তির বিরোধিতা ইংগিতময় হয়ে উঠেছে। সিজারের রাজদরবারে ইমরুল কায়েসের সফরসঙ্গী ছিল আমর বিন কামিয়া। রাজদরবারে গিয়ে চুক্তি করা এবং সেখান থেকে ফিরে আসা–এ ঘটনায় ইমরুল কায়েস কিন্দার পক্ষে কি স্বার্থ, কি ন্যায্যতা বিধান করেছিলেন? ইমরুল কায়েস ফিরে এসেছেন ঠিক কিন্তু যা নিয়ে আসলেন এবং যা করে আসলেন তা তার জাতির জন্য এমনকি তার নিজের জন্যও কোনো কাজে আসেনি। ফলে দারভীশকে প্রশ্ন ছুঁড়তে হয়েছে। যে ঘটনা দিয়ে তিনি অসলো চুক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাতে তিনি একই বক্তব্য–একই প্রশ্ন ইয়াসির আরাফাতের দিকে নিক্ষেপ করলেন। 'আমাদের সাথে এমনকি তোমার নিজের সাথে তুমি কি করেছিলে?" যখন তুমি আর তোমার জনগোষ্ঠীর পথ আলাদা করে নিয়েছো তখন তোমাকে তোমার পথই বেছে নিতে হবে। ফলে 'যাও কায়সারের (সিজার) পথ ধরে যাও– এমন ধোঁয়ার পিছে পিছে যা উঁকি মারে সময়ের ভেতর থেকে কালো কালো। এবং যাও সিজারের পথ ধরে একা একা একা। তবে আমাদের জন্য ওখানে রেখে যাও আমাদের ভাষা!'

فاذهب على درب
قيصر' خلف دخان يطل من
الوقت أسود. واذهب على درب
قيصر, وحدك, وحدك, وحدك
واترك لنا, ههنا, لغتك!

এখানে ভাষার প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কবিতাটিতে শেষপর্যন্ত যে বিষয়টি দারভীশ প্রশ্নে সবধরনের বিতর্ক ছাড়িয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল তা ছিল ভাষার প্রশ্ন। কারণ ইমরুল কায়েস সিজারের দরবারের উদ্দেশে যখন যাত্রা শুরু করেছিলেন তখন আমর বিন কামিয়া ইমরুল কায়েসকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। কিন্ত আমর যখন বুঝতে পারলেন ইমরুল কায়েস তার শক্তি সামর্থ এবং জাতির সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সিজারের সহযোগিতা ও সমর্থন চাচ্ছেন তখন তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন।[৩৪৮] এরপর তিনি বললেন, যেহেতু সিজারের পথই যখন তোমার ভরসা তবে তুমি আমাদের ভাষাটা রেখে যাও। এ বক্তব্যটা ছিল টার্নিং পয়েন্ট। মোড় ঘুরিয়ে দেয়া এক প্রবল সত্য। দারভীশ যখন অসলো চুক্তির বিরোধিতা করছেন, ইয়াসির আরাফাতের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করছেন, তখন

৩৪৮

তাকে 'ভাষা রেখে যাওয়ার' কথা বলার অর্থ– শুধু জনগণের ভাষার পক্ষে কিংবা জনগণের পক্ষে কথা বলার দাবি তোলা। কবিতার দিক থেকে অসলো চুক্তির ব্যাখ্যা কেমন হতে পারে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন সিনান অ্যান্তোন। এ প্রসঙ্গে সিনান অ্যান্তোন মনে করেন, এই ভাষার মানে যে ভাষায় নিজের জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষার কথা বলা যায়। এর আরেক অর্থ হলো, জনগণের ভাষায় কথা বলার দাবি জানিয়ে দলীয় রাজনীতি থেকে প্রস্থানের ঘোষণা দেয়া।[৩৪৯] কিন্তু পার্টির মতাদর্শগত অবস্থানের বাইরে গিয়েও এটিও একধরনের রাজনৈতিক অবস্থান। কবিতা আর রাজনীতি দৃশ্যত এক নয়–দলীয় কিংবা মতাদর্শগত রাজনীতির সীমার ভেতরে কিন্তু একটি সর্বজনীন সত্যকে মোকাবেলা করার জন্য শেষপর্যন্ত একটি অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব–এ সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠতে পারে কেবল জনগণ নামক একটি সামষ্টিক বর্গের মধ্যে।

ইমরুল কায়েস একদিকে কবি অপরদিকে রাজনীতিক এই দুই আত্মপরিচয় এবং দুইয়ের ভূমিকাকে যুগপৎভাবে একজায়গায় রেখে চর্চা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সক্ষম হতে পারেননি। দারভীশ এই দুই আত্মপরিচয়ের একটি সত্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন–যেকারণে ঐতিহাসিকভাবে তিনি কবি কিংবা শিল্পসত্তাকে একদিকে এবং রাজনীতিকে অপরদিকে রেখে দুইয়ের ভিন্ন ভূমিকা ও সক্রিয়তাকে একইদিকে প্রবাহিত করতে সক্ষম হন। "আমি ভাগ করে দেখি নিজেকে দুইয়ে–একদিকে আমি আরদিকে আমার নাম"[৩৫০]। ইতিমধ্যে তার প্রবল দৃষ্টান্ত দারভীশ অসলো চুক্তির মধ্যদিয়ে রেখে যান। এ পর্যন্ত অসলো চুক্তির পটভূমিকে কেন্দ্র করে দারভীশের কবিতা এবং কবিতার শরীরী কাঠামোয় কিভাবে ফিলিস্তিনের একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ ঘটনার রাজনৈতিক ভাষা অর্থময় হয়ে ওঠে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হল। কিন্তু অসলো চুক্তি পরবর্তীকালে দারভীশ এ কবিতার জন্য ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন। রাজনীতি থেকে ইস্তফা এবং চুক্তিকে কেন্দ্র করে কবিতা–এই দুই ভূমিকা বিতর্কের চূড়ান্তে নিয়ে যায় তাকে। অসলো চুক্তির প্রায় এক দশক পর ২০০০-২০০৫ সালে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় দারভীশ তীব্র সমালোচনার মুখোমুখী হন। ইন্তিফাদা এবং ইন্তিফাদায় শামিল হওয়া শহিদদের যথেষ্ট প্রশংসা না করাও ছিল এরকম বিতর্কের একটি অনুষঙ্গ।[৩৫১] মূলত পার্টি পলিটিক্সের যে কাঠামোবদ্ধ রাজনীতি তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে পাঠক কিংবা অন্য অনুসারীদের জন্য দারভীশকে বুঝতে পারার একটা সংকট বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে সমালোচনার বাস্তবতাও ছিল দারভীশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিতর্ক বরং দারভীশের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানকে আরো সচেতন করার একটা সহায়ক উপায় হিসেবে গড়ে ওঠে। বিতর্কের প্রধান কারণ ছিল পুরনো ইস্যু–তথা বারবার অবস্থান পরিবর্তন কিংবা একই অবস্থানে অনড় না থাকা।

---

[৩৪৯]. অ্যান্তোন, সিনান, *মাহমুদ দারভীশ'স অ্যালেগরিক্যাল ক্রিটিক অফ ওসলো* (জ্বরুত: জার্নাল অব প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, ইনস্টিটিউট ফর প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, ভলিয়ম-৩১, সংখ্যা: ২, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৬৬-৭৭।

[৩৫০]. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতুল হিছানা ওয়াহিদা*, পৃ. ১৫৭, *জিদারিয়্যাহ* (জ্বরুত: রিয়াদ আল-রাঈস লিল কুতুব ওয়া আল-নাশর, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৭২।

[৩৫১]. আবু ঈদ, মুনা, পৃ. ১৫৩।

যাইহোক, ফিলিস্তিনের মুক্তি কিভাবে সম্ভব? একবাক্যে এটি লিখে দেয়া সম্ভব না হলেও এ নিয়ে তর্কবিতর্ক ও সংঘাতের শেষ নেই। পিএলও'র পররাষ্ট্রনীতির ইস্যু বিশেষত ইজরাইল প্রশ্নে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে যখনই কোনো চিন্তাভাবনা কিংবা প্রচেষ্টা লক্ষ করা যেত তখন দারভীশ দৃশ্যত এর বিরোধিতা করতেন কিংবা বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে নীরবতা পালন করতেন, প্রত্যক্ষভাবে এ অবস্থানকে আপাত সাংঘর্ষিক এবং পরস্পরবিরোধী মনে হয়। কিন্তু বিষয়টি খুব সরলভাবে দেখা যায়না। দারভীশ বিষয়টি নিজেই জটিলভাবে দেখতেন। শুধু শান্তির পথে হেঁটে মুক্তির সম্ভাবনায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। কারণ মুক্তির প্রক্রিয়া-নীতি এবং বাস্তবতায় সাধারণত ইজরাইল প্রশ্নে এবং ইজরাইলের সাথে কোনো প্রকার শান্তি-আলোচনার পথে না হেঁটে শুধু যুদ্ধ ও লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে মুক্তির পথ তরান্বিত করার অবস্থান পোষণ করতেন দারভীশ।

৪.৫: মুক্তির সম্ভাবনা, চলমান বিতর্ক এবং দারভীশ

ফিলিস্তিনের চলমান পরিস্থিতির জটিলতা নিরসনে শান্তির পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্টের জনমত লক্ষণীয়। শান্তির প্রক্রিয়া কি হবে তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। রয়েছে বিবিধ রাজনৈতিক মতাদর্শিক বয়ান ও বিতর্ক। কিন্তু *শান্তি* বিষয়টি কিভাবে সূত্রপাত হয় এবং কিভাবে তা ক্রমাগত জটিলভাবে সংগঠিত হতে থাকে তার একটি ঐতিহাসিক দিক রয়েছে।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পটভূমি রচনার মধ্যদিয়ে প্রথম ফিলিস্তিনে শান্তি আলোচনার ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার আগে থেকে যেখানে সশস্ত্র উপায়ে মুক্তির পথ সুগম করার পন্থা বেছে নিয়েছিল ফিলিস্তিন এ ঘটনায় তা একেবারে থমকে যায়নি। ক্যাম্প ডেভিডের ফলে ফিলিস্তিনে দুটি বয়ান ঐতিহাসিকভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। একটি আলোচনা সমঝোতায় কিংবা শান্তি প্রক্রিয়ায় মুক্তির পথ দ্রুততরোকরণ। অপরটি সশস্ত্র উপায়ে। মোটকথা ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক শ্রেণি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এই দুই ধারার রাজনীতি প্রকট হতে থাকলেও শেষাবধি শান্তির প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একইসাথে সশস্ত্র ধারার বয়ানেও পরিবর্তন আসে। নব্বই পরবর্তী সময়ে প্রতিরোধের ধারণা প্রকট হতে থাকে। বামধারার সাবেক সশস্ত্র রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি ইসলামি ধারার উত্থান ঘটে। যাদের মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে হামাসের মতো রাজনৈতিক ইসলাম। ইজরাইল প্রশ্নে যাদের নীতি ছিল প্রতিরোধ।[৩৫২] এছাড়া ইজরাইল ও ফিলিস্তিনের সংঘাত নিরসনে যেসব প্রক্রিয়ার ধারণা চলমান রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতি। অপরটি প্রতিরোধ। সশস্ত্রতায় কিছুটা পরিবর্তিত এবং নমনীয় হয়ে রূপান্তরিত হয় প্রতিরোধের ধারণা। প্রতিরোধের ধারণা পুরনো হলেও তার বাস্তবতা সক্রিয় রয়েছে। যাইহোক, শান্তি প্রক্রিয়া এবং দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা মূলত শান্তি বা সমঝোতার ধারণা। এর পাশাপাশি রয়েছে উদারনৈতিক শান্তির

[৩৫২]. হামাদেহ, জয়সে, *দি কনস্ট্রাকশন অব প্যালেস্টাইনিয়ান আইডেন্টিটি: হামাস এন্ড ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম* (মন্ট্রিল: ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ, ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৫৪-৫৮। ডানিং, ট্রিস্টান, হামাস, *জিহাদ এন্ড পলিটিক্যাল লেজিটিম্যাসি: রিইন্টারপ্রেটিং রেজিসট্যান্স ইন প্যালেস্টাইন* (লন্ডন: রুটলেজ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১-১৭।

ধারণা। যেটি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদারনৈতিকতাবাদের সম্পর্কিত। ব্যক্তির স্বাধীনতা, আইনি সমতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র, সুশাসন, বাজার অর্থনীতি, মুক্তবাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় বাস্তবতাকে সামনে রেখে উদারনৈতিক শান্তির প্রক্রিয়াগুলো কাজ করে। বিশেষত ফিলিস্তিনে উদারনৈতিক শান্তির প্রক্রিয়াগুলো কাজ শুরু করে নব্বই দশকে। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের যেসব পক্ষ মধ্যপ্রাচ্য এবং ফিলিস্তিনে শান্তি প্রচেষ্টা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় রয়েছে তাদের মাঝে উদারনৈতিক শান্তির ধারণা ও নীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[৩৫৩]

যাইহোক, ইজরাইল এবং ফিলিস্তিন প্রশ্নে শান্তি এবং মুক্তি সম্পর্কে ফিলিস্তিনের জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর মধ্যে যেসব ধারণা গড়ে ওঠে তার মধ্যে দারভীশের অবস্থান কিভাবে নির্ণীত হতে পারে? ইজরাইলের সাথে সংলাপ, শান্তি আলোচনা, দুইরাষ্ট্রনীতি—কোনোটাই দারভীশ অস্বীকার করেননি। বরং প্রয়োজন ও বাস্তবতার দাবিতে সবকিছু করতে চেয়েছেন তিনি। তার কাছে মূল প্রশ্ন ছিল বাস্তবতা, স্বার্থের অনুকূল পরিস্থিতি এবং মতাদর্শ কিংবা একটি অভিযাত্রার নীতি ও দিকদর্শন। অল্পকথায় শান্তি প্রশ্নে তার মূলবক্তব্য হল, শান্তি-সমঝোতা চলতে পারে, তবে নতজানু নীতি নয়, আত্মসমর্পণ নয়। কিন্তু বাস্তবতা-প্রয়োজন আর নীতি, আদর্শের মধ্যে কিভাবে সংঘর্ষ এড়িয়ে যুগপৎ অবস্থান গ্রহণ করা যায়? দারভীশ মনে করেন, যেকোনো ধরনের প্রচেষ্টায়—সেটা শান্তি আলোচনা হোক আর যাই হোক মূল বিষয়টি হলো তাতে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এবং জাতীয় গণচৈতন্যের প্রতিফলন থাকাটা জরুরি কিংবা জনস্বার্থ এবং জাতীয় অবস্থার বিপরীত কিছু থাকার সুযোগ থাকা যাবে না। ফিলিস্তিনের মুক্তি এবং জাতীয় আত্মমর্যাদা এই দুই নীতি কোনোভাবে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নাই। প্রকৃতপক্ষে এর সাথে ফিলিস্তিনের গণঅধিকার জড়িয়ে আছে। আছে এর সাথে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রশ্ন। অপরদিকে দারভীশ দুই রাষ্ট্র সমাধানের পক্ষেও সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। যেটাকে তিনি বাস্তব এবং প্রয়োজন মনে করেন। পরিস্থিতির অভিমুখ বিবেচনায় নিয়ে এর বিকল্প কি হতে পারে? দারভীশ মনে করেন, ফিলিস্তিনের জাতীয় চেতনা এবং তার অধিকারগুলোর সংরক্ষণ এবং নিশ্চিতির সম্ভাবনা যতোক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার না হবে ততোক্ষণ কোনো প্রচেষ্টা উদ্যোগে কাজ দেবে না।

তবে বাস্তবতা, প্রয়োজন আর নীতি, আদর্শের মধ্যে কিভাবে সংঘর্ষ এড়িয়ে যুগপৎ অবস্থান গ্রহণ করা যায়? দারভীশ মনে করেন, যেকোনো ধরনের প্রচেষ্টায়—সেটা শান্তি আলোচনা হোক আর যাই হোক—তাতে দুটি দেশের মধ্যে ইতিবাচক আলোচনার সম্ভাবনা নিশ্চিত হবে এটা বোঝার উপায় বোধগম্য নয়। খুব নিকট অতীতে ফিলিস্তিন-ইজরাইলের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এমন সহাবস্থান ও সংলাপও বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে তাতে আলোচনা এবং সমঝোতা ছাড়া দুটি সমাজের একসাথে সহাবস্থান করা অসম্ভব। তদুপরি দারভীশ ইজরাইলের সাথে আলোচনায় যেতে প্রস্তুত। তিনি বলেন,

---

৩৫৩. খুরি, নাদিম, *ন্যাশনাল ন্যারেটিভস এন্ড দ্য অসলো পিস প্রসেস: হাউ পিসবিল্ডিং প্যারাডাইমস অ্যাড্রেস কনফ্লিক্টস ওভার হিস্ট্রি*, (ওসলো: আসেন, জার্নাল অব দি অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব অ্যাথনেসিটি এন্ড ন্যাশনালিজম, মার্চ ২০১৬ খ্রি), ন্যাশন এন্ড ন্যাশনালিজম সংখ্যা, এনএএনএ- ১২১৬৬, পৃ. ১-১৯।

من حيث المبدأ لا نستطيع أن نرفض أي حوار يفيد تطوير وعي الأخربحقوقنا. هذا مبدأ. أما لو كنت قادرا أنا شخصيا أو قابلا للدخول في هذا الحوار، هذا سؤال أخر.[৩৫৪]

নীতিগতভাবে আমরা কোনো ধরনের সংলাপকেই প্রত্যাখ্যান করতে পারিনা যেটা আমাদের অধিকার সম্পর্কে অপরপক্ষের সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে। এটাই আমাদের নীতি। ব্যক্তিগতভাবে যদি আমি সক্ষম হতাম তবে এ ধরনের আলোচনায় অংশ নিতাম। এটা অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন।

অপরদিকে তিনি দুই রাষ্ট্র সমাধানের পক্ষেও সমর্থন ব্যক্ত করেন। যেটাকে তিনি বাস্তব এবং প্রয়োজন মনে করেন। পরিস্থিতির অভিমুখ বিবেচনায় নিয়ে এর বিকল্প কি হতে পারে? দারভীশ মনে করেন, ফিলিস্তিনের জাতীয় চেতনা এবং তার অধিকারগুলোর সংরক্ষণ এবং নিশ্চিতির সম্ভাবনা যতোক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার না হবে ততোক্ষণ কোনো প্রচেষ্টা কিংবা উদ্যোগে কাজ দেবে না।

من لا يريد فلسطين كلها؟ السؤال: هل هذا ممكن؟ المشكلة ليست رغباتي، المشكلة في الواقع وعلاقتي بموازين القوى وعلاقتي بالممكن. هناك وقائع جديدة على أرض فلسطين، وهناك مشروع إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من فلسطين، وبالتالي يجب أن أكون عاقلاً وعقلانيا وحكيماًولا أطالب بكثيرٍ يمنعني من القليل[355]

কে চায়না পুরো ফিলিস্তিন? প্রশ্ন হলো এটা কি সম্ভব? সমস্যাটা আমার আগ্রহ নয়। সমস্যা হলো বাস্তবতায়। ক্ষমতার ভারসাম্যের সাথে এর সম্পর্ক। সম্পর্ক সম্ভাবনার সাথে। ফিলিস্তিনের মাটিতে এখন নতুন ধরনের পরিস্থিতি। ফিলিস্তিনে যাকিছু টিকে আছে তা রক্ষা করা সম্ভব এমন পরিকল্পনাও আছে। ফলে এর জন্য আমাকে বাস্তব-যৌক্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুকৌশলী হয়ে উঠতে হবে। এর জন্য তো আমাকে কৈফিয়তও চাওয়া হবে না কিসে আমাকে বাধা দেয়।

ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিরসন কিংবা মুক্তির সম্ভাবনা আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। দারভীশ এমনটি প্রত্যাশাও করেন। কিন্তু পরিস্থিতি যে অবস্থায় রূপান্তরিত

[৩৫৪]. খুরি, জিয়েল, *হিওয়ার মা'আ মাহমুদ দারভীশ: আন আল সিয়াসাহ ওয়া আল শি'র ওয়া তাজরিবাহ আল মাওত*, (বৈরুত, মাজাল্লাহ আল দিরাসাত আল ফিলিস্তীনিয়্যাহ, মুআসসাসাহ আল দিরাসাত আল ফিলিস্তীনিয়্যাহ, ভলিয়ম-১২, সংখ্যা-৪৮, ২০০১), পৃ. ১১
[৩৫৫]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫।

হয়েছে তাতে শান্তি এবং মুক্তির সম্ভাবনা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। দারভীশ মনে করেন, ইজরাইল পুরো পরিস্থিতিতে তার স্বার্থের বাইরে ফিলিস্তিন ইস্যুতে কোনোরকম ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করতে রাজি নয়। যাতে শান্তির প্রক্রিয়াগুলো সত্যিকার অর্থে কাজ করতে পারে। বরং শান্তির সম্ভাবনা এবং তার পন্থাগুলো ধ্বংস করার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরাইল। দারভীশ বলেন,

> أنا أعتقد أن السلام يبتعد، ليس السلام فقط بل التسوية أيضاً تبتعد، والمفاوضات تبتعد. أنا أخشى أن الإسرائيليين يعملون على جعل كل إمكانات السلام مستحيلة. أخطر شيء هو ألاّ يترك الأعداء المتحاربون شيئاً من الثقة بينهم في أثناء الحرب كما قال الفيلسوف ْ كانت، لأن عدم ترك أي شيء من الثقة ّ يحول الحرب إلى حرب إبادة،ويجعل السلام مستحيلاً. أخشى أن شارون يتعطش إلى الانتقام من الشعب الفلسطيني، وأخشى أن يوصلنا إلى نقطة اللاعودة، ويوصلنا إلى نقطة نكتشف فيها أن السلام مستحيل.[356]

> আমি বিশ্বাস করি, শান্তি সুদূর পরাহত। শুধু শান্তি নয়, এমনকি সাম্য-সংহতিও অনেক দূরের। সমঝোতা প্রস্তাবগুলোও দূরের। আমি বরং আশঙ্কা করি, শান্তির সকল সম্ভাবনা অসম্ভব করে তুলতে ইজরাইল কাজ করে যাচ্ছে। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় হলো, যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষ তাদের মধ্যে আস্থার কোনো কিছুই আর বাকি রাখছেনা। দার্শনিকরা যেমন বলতেন; কারণ কোনো প্রকার আস্থা না রাখাটা যুদ্ধকে আরো ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া হয় এবং শান্তিকে অসম্ভব করে তোলা হয়। আমি আশঙ্কা করি, ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি শ্যারন প্রতিশোধের পিপাসায় কাতর হয়ে আছে। আমার ভয় হয়, আমাদেরকে এমন একটি পয়েন্টে তিনি ঠেলে দেবেন যেখান থেকে আর ফেরা যায় না। এমন একটি জায়গায় ঠেলে দেবেন যেখানে গিয়ে আমরা আবিষ্কার করবো, শান্তি আর সম্ভব নয়।

তবে এসব বিতর্কের মধ্যে দারভীশের অবস্থানকে ন্যায্য মনে করেছেন এডওয়ার্ড সাঈদ। সাঈদ মাদ্রিদ সম্মেলন এবং তৎপরবর্তী অসলো চুক্তি প্রশ্নে দারভীশের অবস্থান প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেছেন। সাঈদ মাদ্রিদ সম্মেলন এবং তৎপরবর্তী অসলো চুক্তির সাথে সম্পর্কিত করে দারভীশের মূল্যায়ন করেছেন। দারভীশ তার আহাদা আশারা কাওকাবান কাব্যগ্রন্থে যে পটভূমি নির্মাণ করেছেন তাতে জড়িয়ে ফিলিস্তিনের সমকালীন রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতির নানান প্রশ্ন। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ফিলিস্তিনের রাজনীতি প্রশ্নে দারভীশের অবস্থান। যেসময় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে– ১৯৯২ সালে ততোক্ষণে তিনি স্পেন গমন করেন। এটি ছিল তার প্রথম স্পেন সফর। সেসময় ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক গতিবিধিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটে যায় পিএলও'র

---

৩৫৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬।

যুক্তরাষ্ট্র-বলয়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার ঘটনায়। ইজরাইলের সাথে সংঘাত এড়িয়ে শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সহাবস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ সম্পর্কিত হওয়ার পথে হাঁটা শুরু করে পিএলও। এর আগেও পিএলও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেনি। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির ঘটনায় প্রথম এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সেসময়ের উদ্যোগের সাথে রাশিয়াও সম্পৃক্ত হয়। ৯১ এর অক্টোবরে স্পেনের মাদ্রিদে শান্তি আলোচনা সম্পন্ন হয়। এর মাদ্রিদের পর অসলো চুক্তিও সম্পন্ন হয়। কিন্তু দারভীশ পিএলও'র যেকোনো শান্তি প্রক্রিয়ার বিরোধী ছিলেন। একেবারে শুরু থেকেই। *আহাদা আশারা কাওবান আলা আখিরিল মাশাহাদিল আন্দালুসি-এ* দারভীশ ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় কবিতার উপস্থাপন ঘটিয়েছেন– যেখানে তিনি তার রাজনৈতিক বোঝাবুঝি তুলে ধরেছেন। কবিতাটিতে দারভীশ আন্দালুসিয়া তথা স্পেনের প্রসঙ্গ টেনেছেন। যেখানে কবি ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক নিয়তিকে আন্দালুসিয়ার ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। যেখানে বস্তুত ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে যে পরমশক্তি বা স্পিরিট ছিল তার পরাজয় কিংবা দুর্বল হয়ে আসার বিষয়টি উঠে এসেছে বলে দারভীশের কবিতা পাঠ থেকে মন্তব্য করেন সাঈদ। সাঈদ মনে করেন, দারভীশের কবিতায় এটি যেমন রূপক আকারে প্রকাশিত তেমনি বাস্তবেও প্রকাশিত। ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এমন রূপান্তরই ঘটেছে। *আহাদা আশারা*'র ধারণাটি পবিত্র কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এর সাথে আন্দালুসিয়ার সম্পর্ক তৈরি করে ফিলিস্তিনের সমকালীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিগঠনকে তুলে আনা হয়েছে। কবিতাটিতে ইজরাইলকে এগারো নক্ষত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দারভীশ যেখানে পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যদবাণী করে রেখেছিলেন– ফিলিস্তিনের পতন হবে। অর্থাৎ একটি ঘটনা কিংবা একটি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনের নিজের স্বার্থ লুণ্ঠিত হবে এমন একটি ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন আহাদা আশারা কাওকাবায়। কাব্যিকভাবে। এবং কবিতাটি বের হবার বছরখানিক পর পিএলও-ইজরাইলের মধ্যে সেই ঘটনাই ঘটে ওয়াশিংটনের মধ্যস্থতায়। যেটি অসলো চুক্তি নামে বিখ্যাত।[৩৫৭]

মোটকথা দারভীশের কাছে মনে হয়েছে মুক্তি এবং স্বাধীনতা সুদূর পরাহত। শান্তিও যেখানে অসম্ভব। দারভীশ এসব বিষয় নিয়ে অনেক দিন ধরে বলে আসছিলেন বিভিন্ন মাধ্যমে। নানান পরিস্থিতিতে তিনি তাই বিপরীত অবস্থান নিয়েছিলেন জাতীয় রাজনীতির প্রবল বলয়ের মধ্যে থেকেও। একটি কবিতায় স্বাধীনতা-মুক্তি এবং শান্তি কতোটা কাছের এবং কতোটা দূরের– নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে। কবি বলেন,

بعد ليلك , ليل الشتاء الأخير
أقام الجنودُ معسكرهم في مكان بعيد
وحطَّ على شرفتي قمر أبيض
وجلست وحُرّيتي صامتين نُحَدِّقُ في ليلنا

[৩৫৭]. সাঈদ, এডওয়ার্ড, *অন মাহমুদ দারভীশ*, (গ্র্যান্ড স্ট্রিট: যুক্তরাষ্ট্র, ভলিয়ম: ৪৮, অবলিভিয়ন: উইন্টার সংখ্যা, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১১২-১১৫।

مَنْ أَنا ؟ مَنْ أنا بعد لَيْلِكِ
لَيلِ الشتاءِ الأَخير؟[৩৫৮]

তোমার রাত্রির পর, শীতের শেষ রজনীতে
সৈনিকরা তাদের ঘাঁটি পেতেছে দূরের স্থানে
যখন আমার বেলকনিতে নেমে আসে শুভ্র চাঁদ
আমি বসে থাকলাম। আর আমার স্বাধীনতা।
আমরা নীরবে রাতভর তাকিয়ে থাকলাম।

৪.৬: দ্ব্যার্থবোধকতা, দুধারী অবস্থা এবং নতুন সম্ভাবনা

স্বাধীনতা এবং শান্তি প্রশ্নে জাতীয় রাজনীতিতে যে কাঠামোগত অবস্থান তৈরি হয়েছে এবং একইসাথে জাতীয় স্বার্থগত যেসব নীতি অনুসরণীয় ছিল তার বাইরে গিয়ে যখন নতুন ধরনের পরিস্থিতি ও প্রবণতা সৃষ্টি হয় দারভীশ তখন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি পরবর্তী সময়ে দারভীশকে প্রায়ই ইজরাইল প্রশ্নে জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলোতে বিপরীত অবস্থান নিতে দেখা যায়। কখনো পক্ষে আবার কখনো বিপক্ষেও তাকে দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে বিষয়গুলো সংশয় সৃষ্টি করে। ফলে প্রশ্ন দেখা দেয়, দারভীশের মধ্যে কেন এই দুইরকম অবস্থান দেখা যায়? কবিতার পঙ্কতিমালা থেকে কবি কিভাবে রাজনীতিতে এভাবে নিজের অবস্থানকে বিপরীতমুখী আবার কখনো সমার্থক করে তুলেছেন? কেন তাকে এমনটি করতে হয়েছে?

মুনা আবু ঈদ দারভীশের এ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন। মুনা মনে করেন, দারভীশের মনস্তাত্ত্বিক বেড়ে ওঠাটা কবিতায় ও রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। কবিতার প্রকৃতি এখানে মনস্তাত্ত্বিকভাবে কাজ করতে পারে। দারভীশ নিজেও বিষয়টি কখনো কখনো বিভিন্ন কবিতায় ইশারা দিয়ে গেছেন। দারভীশ তার *لماذا تركت الحصان وحيدا (1995)*—কাব্যগ্রন্থে বলেন, *أري نفسي تنشق إلي إثنين: أنا و إسمي* (আমি দেখি আমার সত্তা বিদীর্ণ হয়ে আছে দুইয়ে: আমি এবং আমার নামে)। দুধারী অবস্থা তাকে দুদিকে টেনে ধরে রাখে যেটা তার জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। জিদারিয়্যায় তিনি বলেন, *torn between rhyme and Caesar*—এখানে কবি কবিতা, শিল্প-সাহিত্য এবং রাজনীতির মধ্যে নিজের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। *সারির আল গিয়াব, ফী হাদরা আল গিয়াব*—এ কবি একবার নিজেকে গায়েব বলছেন একইসাথে বলেছেন হাজের। নিজের সত্তার দুইরকম চরিত্রয়াণও ঘটিয়েছেন এখানে। একদিকে বলেছেন *আল কামাল* অপরদিকে বলেছেন *আল নুকছান*। পূর্ণতা এবং অপূর্ণতা। কোথাও নিজেকে বলেছেন *আল হাই* (জীবন্ত), আবার কোথাও বলেছেন *আল মাইয়্যেত* (মৃত)। *ফী হাদরাহ আল গিয়াব*—এ নিজেকে সত্তাবে উন্মোচন করেন অন্যভাবে। যেখানে নিজেকে একইরকম দেখতে পাননি। দেখেছেন *ওয়াহিদ ফী ইছনাইন এবং ইছনান ফী ওয়াহিদ*—মানে *দুই'র*

---

৩৫৮. দারভীশ, মাহমুদ, *সারীর আল গারীবাহ* (), পৃ. ১৯-২০।

ভিতর এক এবং এক'র ভিতর দুই।[৩৫৯] এ বক্তব্যগুলো থেকে বোঝা যায়, দৃশ্যত কবির ভিতরে এক ধরনের দ্বিধা ছিল। ছিল সংশয়। কবি তার দ্বিধা নিয়ে নতুন অর্থ দিতে চেয়েছেন।

তবে এ দ্বিধা দারভীশের কবিতাকে যতোটা অর্থময় বৈচিত্র্য দিয়েছে তার চেয়ে রাজনীতিতে তার ব্যক্তিত্বকে সুনির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন সময়ে দেখ গেছে দারভীশ দলীয় সিদ্ধান্তগুলোর বিরোধিতা করেছেন। পিএলও'র প্রধান ইয়াসির আরাফাতের বিরোধিতা করেছেন। কুয়েতে ইরাকের হামলায় পিএলও'র সমর্থন ছিল সাদ্দামের প্রতি। ইরাকের প্রতি। কিন্তু দারভীশের অবস্থান ছিল বিরোধী। দারভীশ কুয়েত আক্রমণ সমর্থন করেননি। সাদ্দামের বিরোধিতা করেছেন।[৩৬০] ইয়াসির আরাফাত কিংবা পিএলও'র অবস্থান ইরাকের পক্ষে থাকার কারণ ছিল খুব সহজ সরল। কারণ ইরাক এবং প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেইন ইজরাইলবিরোধী ছিলেন।[৩৬১] দারভীশ কিঞ্চিত জটিলভাবে দেখেছেন। সরলভাবে দেখেননি। কারণ ইরাক কিংবা সাদ্দাম হুসেইন ইজরাইলবিরোধী হলেও সেসময় কুয়েতে চার লক্ষাধিক ফিলিস্তিনী অবস্থান করছিলেন। যারা ইজরাইলের উচ্ছেদের শিকার হয়ে বিভিন্ন সময়ে কুয়েতে অবস্থান নিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। হামলা হলে ফিলিস্তিনের পক্ষে সামর্থ ও সঙ্গতি খুব স্বাভাবিক ছিলনা তাদের সামাল দেয়ার মতো। এছাড়া রাজনৈতিক বাস্তবতায় ফিলিস্তিনের পক্ষাবলম্বন করার মতো অবস্থা ছিলনা বলে বিবিধ বাস্তব কারণে ইরাকের কুয়েত আক্রমণে সমর্থন জানানো ঠিক মনে করেননি দারভীশ হয়তো। যদিও দারভীশের জীবৎকালীন সময়ে ফিলিস্তিনকে ইরাকের আক্রমণে সমর্থন জানানোর কারণে কুয়েতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছিল।[৩৬২] অপরদিকে ইহুদী প্রশ্নেও দারভীশ পিএলও'র সাথে ভিন্নতা পোষণ করতেন। কারণ ইহুদির সাথে সম্পর্ক আর ইজরাইলি জায়োনিস্ট কিংবা জায়োনিস্ট রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক এক মনে করেন না দারভিশ। দারভীশ মনে করতেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইজরাইলের সাধারণ জনগণের সাথে ফিলিস্তিনের সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন আছে। তবে ইজরাইলের রাজনৈতিক শ্রেণির (পলিটিক্যাল ক্লাস) সাথে সম্পর্ক হবে সরাসরি রাজনৈতিক এবং শত্রুতামূলক। কারণ দারভীশ মনে করেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুই জনগোষ্ঠীর মাঝে সামাকিজ স্তরে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শান্তির জন্য দুইদেশের জনগণের মাঝে সংলাপে অসম্মতি নেই দারভীশের। তদুপরি দারভীশ রাষ্ট্র হিসেবে চাইতেন ম্যান্ডেটরি ফিলিস্তিন। কিংবা ১৯৬৭ এর দখলকৃত ভূমি।[৩৬৩] ১৯৬০ এর দশকে ফিলিস্তিনে যে আবু লেইদ যে সেকুলার রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছিলেন যেখানে ইহুদিদেরও বসবাসের সুযোগ এবং সম্মতি রয়েছে ধারণাগতভাবে দারভীশ কি এমন রাষ্ট্রধারণাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন? তবে আবু লেইদের সেকুলার রাষ্ট্রধারণার পক্ষে দারভীশের সমর্থন কিংবা ইতিবাচক

---

৩৫৯. আবু ঈদ, মুনা, পৃ. ১১১।

৩৬০. প্রাগুক্ত। পৃ. ৭২।

৩৬১. ব্র্যান্ডস, হাল এবং ডেভিড পালকি, *হোয়াই ডিড সাদ্দাম ওয়ান্ট বোম্ব? দি ইজরাইল ফ্যাক্টর এন্ড দি ইরাকি নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম* (ফরেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, অগাস্ট, ২০১১, ভিজিট: ২৮ এপ্রিল, ২০২৩), https://www.fpri.org/article/2011/08/why-did-saddam-want-the-bomb-the-israel-factor-and-the-iraqi-nuclear-

৩৬২. *আব্বাস: প্যালিস্টাইনিয়ানস সরি ফর ব্যাকিং সাদ্দাম* (এনবিসি নিউজ, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৪, ভিজিট: ২৮ এপ্রিল, ২০২৩), https://www.nbcnews.com/id/wbna6701670

৩৬৩. আবু ঈদ, মুনা। পৃ. ১৪৯-১৫০।

অবস্থান নিয়ে যথেষ্ট ধারণা ও সন্দেহের সুযোগ রয়েছে।[৩৬৪] নাগরিক হিসেবে জু আর ইজরাইলি রাষ্ট্র এই দুইয়ের মধ্যে দারভীশ যে ফারাক করেন তার তাৎপর্য হলো, নাগরিক এবং সেকুলার রাষ্ট্রের আইডিয়া, যেটা পিএলও ১৯৭১ সালে অষ্টম কনভেনশনে এডপ্ট করে। অপরদিকে আছে দ্বিজাতি রাষ্ট্র বিষয়ক প্রস্তাবনার।

কিন্তু এই ডুয়ালিটি—এই দ্বৈততা কেন রক্ষা করতে গেলেন দারভীশ তার কবিতায় এবং চিন্তায়? এর জন্য দারভীশকে রাজনীতিক হিসেবে দেখার চেয়ে কবি হিসেবে দেখার মাধ্যমে বিষয়টির একটি সমাধান করা যায়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বৈত স্বভাব থাকবেনা বিষয়টি এমন নয়। যেকোনো ব্যক্তির মধ্যেই এমন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। সেকারণে রাজনীতিক হিসেবে দারভীশ যখন বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করেন তখন তারও ব্যাখ্যা থাকতে পারে। থাকাটাই সঙ্গত। পিএলও'র সাথে দারভীশ যে পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক পথচলা শুরু করেছিলেন তার সূচনা ইতিবাচক হওয়ার কারণেই নিশ্চয়ই দারভীশ পিএলও'র সাথে যোগ দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দারভীশ যতোক্ষণ পিএলওকে গণশক্তির দিক থেকে দেখতে পেয়েছেন ঠিক ততোক্ষণ তার পিএলও'র সাথে পথচলতে সমস্যা হয়নি। পিএলও যখনই তার রাজনৈতিক গতিপথ পরিবর্তন করতে শুরু করে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্যদিয়ে সেসময় থেকেই পিএলও'র সাথে দারভীশের থাকাটা মসৃণ হয়নি। দারভীশ বরাবারই পিএলও'র প্রতিটি অবস্থানকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। পিপল'স পাওয়ার বা গণশক্তি এবং গণমুখী রাজনীতির দিক থেকে দারভীশ তার রাজনীতির ভিত এবং মানদণ্ড তৈরি করে নিয়েছিলেন। যেকারণে পিএলও যখন জনগণের দাবি ও ইচ্ছার বিপরীতে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন দারভীশ তার মানদণ্ড অনুসারে বিরোধিতা করেছেন। এ বিরোধিতা পিএলও'র সাথে সাংঘর্ষিক ছিল দলীয় কারণে– নীতিগত কারণে। কিন্তু যখন পিএলও'র সাথেই থেকে গেছেন বিরোধিতা সত্ত্বেও সেটাকে স্ববিরোধ বলা যায়না। যাইহোক, বস্তুত দারভীশ যে বুদ্ধিবৃত্তিক সততা ও নীতি ধারণ করতেন তার সাথে এটাকে স্ববিরোধ বলা যায়না গণমুখী চারিত্র্যের কারণে। তবে দ্বৈততা কিংবা দ্ব্যর্থবোধকতা গ্রহণযোগ্য একটি বিষয়। কবিতায় খুব অল্পকথায় যে ব্যাপক এবং গভীর অর্থবোধকতা সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে, রয়েছে বিবিধ অর্থোৎপাদনের সম্ভাবনা—এর জন্য কবিতার অন্তর্গত কিছু স্বয়ম্ভু স্বভাব রয়েছে। কবিতার কিছু নিয়ম ও প্রকৃতি রয়েছে– যেটি কবিকেই অর্জন করে নিতে হয়–কবিকে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। কবিকে কাব্যিক নিয়মে, ভাষাগত ভঙ্গিতে রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প, কল্পচিত্র, উপমা-প্রতিউপমার মতো কবিতার বিবিধ ভাষাগত আশ্রয়-প্রশ্রয়ের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থোৎপাদনের পথ সৃষ্টি করতে হয়। এটি কবি ও কবিতার সাথে কবির যাপনপ্রক্রিয়ার অন্তর্গত নিয়মেরই অংশ। যেসব উপায়ে দারভীশের কবিতার ভিতর তার নিজস্ব *hermeneutics* কিংবা কবিতার ভাষা, ডিসকোর্স, বলার ও প্রকাশের স্বতন্ত্র ভঙ্গি তৈরি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো

[৩৬৪]. আবরাশ, ইবরাহীম, *আল দাওলাহ আল ফিলাসত্বীনিয়্যাহ ফি আল মাওয়াছীক আল ওয়াত্বানিয়্যাহ*, *সাক্ষাৎকারের বিষয়: আল দাওলাহ আল দিমাকরাত্বিয়্যা আল আলমানিয়্যাহ ফী ফিলাসত্বীন* (আল হিওয়ার, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০০৮), ভিজিট: এপ্রিল ২৮, ২০২৩, https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125768

দ্বর্থবোধকতা। কবিতার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কবিতা কিংবা যেকোনো টেক্সট'র অর্থ, ব্যাখ্যা ও তফসিরের ভিন্নতার জন্য দ্ব্যর্থবোধকতা একটি স্বাভাবিক ও পরিচিত পরিভাষা। যেকারণে দেখা যায়, দ্বিধা নয় বরং দ্ব্যর্থবোধক বাক্যে সমৃদ্ধ দারভীশের কবিতা। কবি পরিচয়ের বাইরে বুদ্ধিজীবীর কাজের মধ্যে এই দ্ব্যর্থবোধকতা কিংবা দ্বৈততা থাকতে পারে। দ্ব্যর্থবোধকতা বস্তুত জ্ঞানতাত্ত্বিক একটি প্রপঞ্চও বটে।[৩৬৫] দারভীশ বলেন,

لِيَ خَلْفَ السَّماءِ سَماءٌ لأَرْجِعَ ، لكنَّني
لَا أَزالُ أُلَمِّعُ مَعْدَنَ هذا الْمَكان ، وَأَحْيا
ساعَةً تُبصِرُ الْغَيْبَ . وأَعرِفُ أَنَّ الزَّمان
لا يُحالِفُني مَرَّتَيْن ، وَأَعرِفُ أَنّي سأَخرُجُ مِنْ
رايَتي طائِراً لا يَحِطُّ على شَجَرٍ فِي الْحَديقَةْ
سَوفَ يَهْبطُ بَعْضَ الْكَلام عَنِ الْحُبِّ في
شِعْرِ لوركا الّذي سَوفَ يَسْكُنُ غُرفَةَ نَوْمي
وَيَرى ما رَأيتُ مِنَ الْقَمَرِ الْبَدَوِيِّ . سَأَخْرُجُ مِنْ
شَجَرِ اللَّوْزِ قُطناً على زَبَدِ[366] .

আকাশের আড়ালে আছে আমার এক আকাশ ফিরে যাওয়ার,
অথচ তবু আমি সারাক্ষণ পলিশ করতে থাকি এই স্থানটির ধাতবগুলো
আমি বেঁচে আছি মুহূর্তকাল তুমি দেখছো যা দেখা যায়না তবু আমি জানি
সময় আমাকে দুবার দিব্যি দেবেনা, আমি জানি পতাকার ভিতর থেকে
আমি বের হয়ে যাবো পাখি হয়ে যে বসবে বাগানের বৃক্ষের উপর
হয়তো সে ভালোবাসার কতিপয় বাক্য হয়ে নেমে আসবে লোরকার কবিতায়
যিনি থাকেন আমার ঘুমঘরে এবং দেখেন আমি যাকিছু দেখি বেদুইন চাঁদের।
আমি বের হয়ে যাবো বাদাম গাছের ভিতর থেকে
মাখনের উপর সুতার মতো কিঞ্চিত।

এখানে দারভীশের আহাদা আশারা কাওকাবান কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার কয়েকটি পঙক্তি। এখানে দেখা যায় কবি একধরনের দ্বিধার মধ্যে আছেন। একধরনের দ্বৈততার মায়ায় তাকে আটকে থাকতে হয়। এখান থেকে বের হয়ে যাবেন, আবার এখানেই তিনি থেকে যাচ্ছেন। যিনি এখানে—এই ভূখণ্ড ফিলিস্তিনে থাকবেননা বলছেন, বের হয়ে যাবেন—এই মাটির উপর যে আকাশ দৃশ্যত দেখা যায় তার অন্তরালে অন্য এক আকাশে চলে যাবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাকে বলতে হচ্ছে তিনি এই মাটিকে প্রতিপালন করছেন, পরিমার্জন করছেন—অর্থাৎ এখানে তিনি থেকে যাচ্ছেন। এই দ্বৈততা

---

৩৬৫. আওয়াদ ইবরাহীম, আব্দুল সাত্তার, *অ্যাম্বিগুইটি ইন পোয়েট্রি: ডেফিনিশন, ফাংশন এন্ড অ্যালিমেন্টস* (ইরাকি একাডেমিক সাইন্টিফিক জার্নালস, সংখ্যা: ৭২, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৮০১-৮১১।
৩৬৬. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-৩*, পৃ. ২৭৫।

একধরনের দ্ব্যর্থবোধকতা। কবিতার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে দ্ব্যর্থবোধক বাক্যের মহিমা অসাধারণ। পাঠককে যথেষ্ট মায়া ও রহস্যের ঘোরে সহসা আটকে ফেলা যায়। দারভীশের জিদারিয়া কাব্যগ্রন্থে দেখা যায়, কবির নিজের সত্তাকে নিজের উপস্থাপনকে স্ববিরোধাত্মক করে তুলছেন। এর মধ্যদিয়ে কবি কোনো সত্য বলতে আকুল হয়ে আছেন হয়তো যা অনুধাবন করার জন্য কবির চেয়ে পাঠক আরো বেশি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কবি যেমন বলেন,

১.
والَّلا شيء أَبيضُ في
سماء المُطْلَق البيضاءِ . كُنْتُ ، ولم
أَكُنْ.[367]

এবং না-বস্তু শাদা নিরেট শাদা আকাশের ভিতর।
আমি ছিলাম। আমি ছিলাম না।

২.
أَين ((أَيْني)) الآن ؟ أَين مدينةُ
الموتى ، وأَين أَنا ؟ فلا عَدَمٌ
هنا في اللا هنا ... في اللازمان ،
ولا وُجُود[368]

'কোথায়' এখন কোথায়, কোথায় মৃতদের নগরী
কোথায় আমি? কিছুই নেই
এইখানে না-এখানে... না-সময়ে কিছু নেই।
নাই কোনো অস্তিত্ব।

প্রথম উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, *في سماء المُطْلَق البيضاء* বাক্যাংশটি মূলত বস্তু, কিন্তু তার বিপরীতেই বলা হয়েছে লাশাই বা না-বস্তু। বস্তু এবং না-বস্তু—দুটি বিপরীত বর্গ এখানে একসাথে এক জায়গায় ব্যক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে কবি যাকে না-বস্তু বলেছেন তার গুণবাচক শব্দ *আবইয়াদ* (أَبيضُ) বা *শাদা* বলেছেন, অথচ শাদা বস্তুত আকার সর্বস্ব– যার বস্তুবাচকতা অবশ্যম্ভাবী। ফলে যা না-বস্তু তা একইসাথে বস্তু—হওয়াটা স্ববিরোধী। যেকারণে এখানে দ্ব্যর্থবোধক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতেও একই প্রশ্ন। যেখানে *এখানে* এবং *না-এখানে* মূলত সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। দারভীশের কবিতায় এধরনের উপস্থাপন তার বহু কবিতায় পাওয়া যাবে হয়তো। কিন্তু এর মধ্যদিয়ে যে দ্ব্যর্থবোধক ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি হয় তার মধ্যদিয়ে বস্তুত নতুন অর্থের সম্ভাবনা তৈরি হয়। দারভীশ নিজেই তার একটি জবাব দিয়েছেন। দারভীশ বলেন,

وجلستُ خلف الباب أَنظُرُ :
هل أَنا هُوَ ؟

---

৩৬৭. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ*, ২০০০, পৃ. ১।
৩৬৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ২।

هذه لُغَتي . وهذا الصوت وَخْزُ دمي
ولكن المؤلِّف آخَرٌ...
أَنا لستُ مني إن أَتيتُ ولم أَصِلْ
أَنا لستُ منِّي إن نَطَقْتُ ولم أَقُلْ
أَنا مَنْ تَقُولُ له الحُروفُ الغامضاتُ :
اكتُبْ تَكُنْ !
واقرأْ تَجِدْ ![369]
وإذا أَردْتَ القَوْلَ فافعلْ ، يَتَّحِدْ
ضدَّاكَ في المعنى ...
وباطِنُكَ الشفيفُ هُوَ القصيدُ

আমি দরোজাটির পেছনে বসলাম আর দৃষ্টি খুলি:
আমি কি সেই?
এই আমার ভাষা। এই আমার কণ্ঠ, আমার রক্তের দংশন।
কিন্তু তার লেখক অন্য একজন........
আমি আমার মধ্যে নই। যদি আমি আসি, অথচ পৌঁছাই না।
আমি আমার মধ্যে নই। যদি আমি ব্যক্ত করি, অথচ বলি না
আমি সেই সত্ত্বার নাম। পর্দাবৃত হরফেরা যাকে বলে দেয়
লিখো, হয়ে যাবে!
পড়ো, দেখতে পাবে।
যখন বলতে চাও, অতঃপর করে ফেলো, তোমার বিপরীতরা
এক হয়ে যাবে অর্থের ভেতর
বস্তুত তোমার আলোকভেদী বাতেনই সেই কাব্য।

এই কবিতাংশটিতেও দেখা যায় বিপরীতমুখী এবং স্ববিরোধী বাগার্থ একইসাথে একই জায়গায় অবস্থান করছে। *আমি আমার মধ্যে নই। যদি আমি আসি, অথচ পৌঁছাই না।/আমি আমার মধ্যে নই। যদি আমি ব্যক্ত করি, অথচ বলি না*—এখানে যথেষ্ট স্ববিরোধাত্মক অবস্থা অনুভব করা যায়। কিন্তু তাতে যে দ্ব্যর্থবোধকতা এবং রহস্যময়তা সৃষ্টি হয়—তা কেন সৃষ্টি হয় কিংবা দারভীশের কবি সত্তা কেন এমন পরিস্থিতির জন্ম দেয় তার একটি সদর্থক জবাব রয়েছে স্তবকটির শেষ বাক্যে। যাতে কবি শুধু সেই দ্ব্যর্থবোধক অবস্থার মধ্যে নতুন কাব্যের জন্ম হবে বলে বলেননি বরং এর মধ্যদিয়ে নতুন অর্থ ও নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে বলে কবি ইশারা দিয়ে রেখেছেন।

---

৩৬৯. প্রাগুক্ত। পৃ. ৯।

দ্ব্যর্থবোধকতা কিংবা বিপরীতমুখী বর্গ হিসেবে মুক্তি এবং শান্তি শব্দদুটিকেও পাঠ করা যায়। কারণ পুরো আলোচনার মূল প্রাসঙ্গিকতা ছিল বস্তুত মুক্তি–স্বাধীনতা–লড়াই-সংগ্রাম অপরদিকে শান্তি (সমঝোতা)। কারণ এই দুই বিপরীত বর্গ নিয়ে দারভীশের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ডিলেমা ছিল। বিভিন্ন সময়ে তার অবস্থান ছিল পিএলও'র সাথে বিপরীতমুখী। সেকারণে শান্তি-সমঝোতা এবং বিপরীতে মুক্তি ও স্বাধীনতা কিভাবে সম্ভব এবং তার সম্ভাবনা ও নয়া অর্থ কিভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠতে পারে তার হদিস দারভীশের দ্ব্যর্থবোধক চিন্তার নজির থেকে বাস্তব ইশারা এবং নির্দেশনা গ্রহণ করা সম্ভব। মোটকথা, দারভীশের চিন্তায় এবং কবিতায় মুক্তির বিষয়টি যতোটা না শান্তির সমার্থক তার চেয়ে কার্যত শান্তিই মুক্তির সমার্থক হয়ে ওঠে। শান্তি এবং মুক্তির যে রাজনৈতিকতা কিংবা ঐতিহাসিকতা ছিল কখনো কখনো তা শুধু একটি চিন্তা ছাড়া কিংবা শিল্প-কবিতা ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠেনি। তখনকার সময়ে ফিলিস্তিনের বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতিগুলোর এর বেশি কিছু হয়ে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

পিএলও তার জাতীয় নীতি এবং জনমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে চলা শুরু করার পর যখন ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক অবস্থার চালচিত্র বদলে যায় তখন মুক্তির চেয়ে 'শান্তি' কথাটা আরো বেশি জরুরি হয়ে ওঠে। কারণ মুক্তি কথটার সাথে যে ব্যবহারিক যুদ্ধ ও সশস্ত্র লড়াইয়ের সঙ্গতি অনিবার্য ছিল তা থেকে থেকে ইতিমধ্যে দেশটির জাতীয় নেতৃত্ব সরাসরি শান্তির পথে হাঁটা শুরু করে দেয়। অর্থাৎ সহিংস উপায়ের পথ এড়িয়ে অহিংস পন্থাই যখন কৌশলগত নীতি হয়ে ওঠে একটি জাতিকে মুক্তির পথে এগিয়ে নেয়ার তখন তার সাথে সাথে আর সব জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট নীতিগুলো উপেক্ষিত হয়ে যায় না। কিন্তু সহিংস পন্থার সরলতার চেয়ে কূটনীতির নানান জটিল সমিকরণ আর তার বাতাবরণে রহস্যজনকভাবে সেসব জাতীয়নীতি কিংবা শান্তির মধ্য দিয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার নীতির সলীল সমাধীই ফিলিস্তিনের নিয়তি হয়ে ওঠে। মোটকথা, অহিংস পন্থাই শেষপর্যন্ত দারভীশের চিন্তার ভীত হলেও তার মধ্যেও প্রতিরোধ আর অধিকার আদায়ের বারুদ সর্বদা তৈরি ছিল। দারভীশের জন্য এর ঐতিহাসিক কারণ ছিল ২০০০ সালে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা এবং ২০০৬ সালে গাজার ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যদিয়ে হামাসের আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠার ঘটনা। এবং তার বিপরীতে কিংবা একই সমান্তরালে পিএলও'র কার্যকর সক্রিয়তা দৃশ্য থেকে ক্রমাগত ম্রীয়মান হয়ে যাওয়ায় দারভীশ তার রাজনৈকিতাকে এভাবেই পাঠ করেছেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে দারভীশ মনে করতেন, ইজরাইল এবং হামাসকে একের পর এক ক্রমাগত শান্তির পথেই যেতে হবে।[৩৭০]

দারভীশ মনে করেন, ইজরাইল যে দখলদারিত্ব অব্যাহত রেখেছে তাতে আরবদের অবস্থার রূপান্তর ঘটে গেছে। তারা এখন আর এসব নিয়ে আগ্রহী নয়। শেষপর্যন্ত যুদ্ধ এবং সংঘাত লেগেই থাকুক তাতেই বরং তাদের আগ্রহ। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি বস্তুত এমন পরিণতিই নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই চুক্তি বরং উল্টো যারা আরবদের ইজরাইলের কাছে আত্মসমর্পণের সমালোচনা করেছে, আত্মসমর্পণ এবং নতজানু হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যারা দেশের– এবং

---

৩৭০. পৃ. ১৩৯

নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও মুক্তির সম্ভাবনা খুঁজে বেড়ান তাদের বিরুদ্ধে এই চুক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। ত্রিপক্ষীয় এই চুক্তি নতুন করে বরং সিনাই উপত্যকা আত্মসাৎ করে নিয়ে যাবে। এবং এই অধিকৃত ভূমি– এই দখলকৃত ভূখণ্ড দখলকৃতই থেকে যাবে আজীবন। এবং আল কুদস থাকবে বস্তুত কাগজে কলমে–চুক্তিনামায়। বাস্তবে কোনো পরিবর্তন হবেনা।[৩৭১]

এই শান্তিচুক্তির পর দারভীশ ইজরাইল এবং পশ্চিমাশক্তির প্রস্তাবিত শান্তি আর ফিলিস্তিনীদের লড়াইয়ের একটি পটভূমি কল্পনা করেছেন তার কবিতায়। উরিদু মা উরিদ কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি রুবাইয়্যাত রয়েছে তাতে দারভীশ এমন কল্পনা করেন। দারভীশ বলেন,

৫
أرى ما أريدُ من السلْم... إني أرى":
غزالاً وعشباً، وجدول ماءٍ... فأغمض عينيّ
هذا الغزال ينامُ على ساعديّ
وصيَّادُهُ نائم، قُرْبَ أولادِهِ في مكانٍ قصيّ

৬
أرى ما أريدُ من الحرب... إني أرى"
سواعدَ أجدادنا تعصرُ النبع في حَجَر أخضرا
: وآباءنا يَرثُون المياه ولا يورثون، فأُغمض عيني
"إنَّ البلادَ التي بين كفيَّ من صُنْع كَفّيّ[372]

৫.
শান্তির যাকিছু চাই আমি দেখি... দেখি
একটি হরিণ, ঘাস এবং পানির নালা...অতপর চোখ বুজে
হরিণটি ঘুমিয়ে আছে দেখি আমার বাহুজুড়ে
শিকারীও তার বাছুরদের কাছাকাছি ঘুমিয়ে
৬.
যুদ্ধের যাকিছু চাই আমি দেখি... দেখি
সবুজ পাথর নিঙড়ে ঝর্ণা বহায় পূর্বপুরুষের হাত:
আমাদের পিতৃপুরুষ সেই পানির উত্তরাধিকারী। অথচ তা

[৩৭১]. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী ওয়াছফি হালাতিনা*, পৃ. ৩০।
[৩৭২]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-৩*, ২০০৫, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

দেয়া হয়না তাদের। চোখ বুজে দেখি রাষ্ট্র টলটলায়মান আমার হাতে

সাধারণভাবে উল্লেখিত দুটি রুবাইয়্যাত বা চৌপদী'র পঙক্তিমালায় পরম্পরবিরোধী যুদ্ধ ও শান্তির একটি স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে। এই দুটি চৌপদীতে ফিলিস্তিনের প্রকৃত চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মূলত। একইসাথে দারভীশ যেধরনের শান্তি কামনা করেন তারও একটি স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এখানে।

শান্তি নাকি সহিংসতা কিভাবে ফিলিস্তিনের মুক্তি সম্ভব এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবু ঐতিহাসিক কারণে যেসব জাতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা নতুন সম্ভাবনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিসন্দেহে। যেখানে মাহমুদ দারভীশের নাম সবসময় ব্যাপকভাবে উপস্থিত হবে। কারণ সব নেতিবাচক ফলাফল নিয়ে বিতর্ক হওয়ার যে অবকাশ তৈরি হয়েছে ঐতিহাকিভাবে তার মধ্যেও ইতিবাচক কিছু খুঁজে নিতে হয়। ফলে সবকিছুর পরে ফিলিস্তিনের সবথেকে বড় অর্জন হলো দেশটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। যেটি জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। এবং এই ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেছিলেন কবি মাহমুদ দারভীশ। রাশিদ খালিদি দারভীশকে স্মরণ করতে গিয়ে এক নিবন্ধে বলেন,

> The declaration deserves greater attention than it has received. It documents significant political evolution inasmuch as this call on behalf of the highest Palestinian representative body for a two-state solution—which would have given Israel the lion's share of Palestine—was produced only four decades after the earthquake that shattered the country's Arab society and turned the majority of Palestinians into penniless refugees. While intellectual and political leaders who earlier elaborated the broad principles that this document incarnates received most of the credit for it, its form, a large part of its content, and its vision flowed from the pen of Mahmud Darwish. For this feat alone, he will deserve to be remembered as one of the fathers of his country, if and when

> Palestine ever sees the light of day as an independent state.[373]

ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হওয়ার চেয়ে বেশি মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য। এই ঘোষণাপত্র বস্তুত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রমাণ সংরক্ষণ করে যেখানে ফিলিস্তিনের সর্বোচ্চ সংস্থা কর্তৃক যে আহবান এসেছিল দুই-রাষ্ট্র সমাধানমূলক নথির জন্য—যাতে ফিলিস্তিনের সিংহভাগ ইজরাইলকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে—সেই ঘোষণাপত্র নাকবা সংঘটিত হওয়ার পর চল্লিশ বছর ধরে প্রণয়ন করা হয়েছিল। যে নাকবা দেশের সমস্ত আরব সমাজকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল এবং ফিলিস্তিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে নিঃস্ব শরণার্থীতে ঠেলে দিয়েছিল। যদিও বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ—আগেই যারা বিস্তারিত নীতিমালার বিবরণ দিয়েছিলেন যা এই ঘোষণাপত্রের নথিতে রয়েছে—তারা এর বেশিরভাগ কৃতিত্ব পেয়েছেন। কিন্তু এর কাঠামো, বিষয়বস্তুর বৃহদাংশ, এর ভিশন-ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি মাহমুদ দারভীশের কলম থেকে প্রবাহিত হয়েছিল। এই একক কৃতিত্বের জন্য যখন ফিলিস্তিন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দিনের আলো দেখতে পাবে তখন তিনিই তার দেশের অন্যতম জনক হিসেবে স্মরণযোগ্য হবেন।

৪.৭: স্বাধীনতা কিংবা মুক্তির রূপকল্প : চিন্তা, বিপ্লব ও রাষ্ট্র

মাহমুদ দারভীশের জীবন বহুবিচিত্র ঘটনার মধ্যদিয়ে এগিয়ে যায়। রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক রাজনীতি ছিল তার প্রধান উপলক্ষ। বিপ্লব, স্বাধীনতা কিংবা রাষ্ট্রগঠন ছিল তার সক্রিয়তার সবচেয়ে জটিল এবং আত্মমগ্নজাত তৎপরতা। স্বাধীনতা এবং মুক্তির অন্যতম উপায় ছিল বিপ্লব। যেখানে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ লক্ষ্য। দারভীশের কবিতার নিবিড় পাঠে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে—যাতে এসব বিষয় বস্তুত *রিহলাহ'র* ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে। এ এর প্রধান দুটি দিক রাজনীতি, শিল্প কিংবা নান্দনিকতা। *আল রিহলাহ'*র একশব্দে বাংলারূপ কি হতে পারে তার যুৎসই শব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে ধারণাগত এবং তত্ত্বগত কারণে এর সঠিক ইংরেজি শব্দ *নমেডলজি (Nomadology)* কিংবা নমেডিজম (Nomadism)।

---

৩৭৩. খালিদী, রাশিদ, *রিমেম্বারিং মাহমুদ দারভীশ (১৯৪১-২০০৮)* (বৈরুত: *জার্নাল অব প্যালেস্টাইন স্টাডিজ*, ভলিউম: ৩৮, শরৎকালীন সংখ্যা-১, অক্টোবর-১, ২০০৮), পৃ. ৭৬।

ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং নাকবা পরবর্তী ফিলিস্তিনের প্রতিটি জাতীয় ঘটনা কিংবা ইস্যুর সাথে দারভীশ নিজেকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তার ধ্যান-জ্ঞান কবিতা কিংবা দর্শন সবই ছিল ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, জাতিগঠন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে লড়াই-সংগ্রাম ও প্রতিরোধের যে দীর্ঘ ইতিহাস তাতে দারভীশ নিজেকে সেই ইতিহাসের একজন অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে দায়বদ্ধ করেন। ফিলিস্তিনের জাতীয় রাজনৈতিক প্লাটফর্ম পিএলও দেশটিকে যে স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল দারভীশের মিশন এবং ভিশন তার চেয়েও আরো বেশি গণআকাঙ্ক্ষাজাত এবং সুদূরপ্রসারী; এটি ছিল তার জটিল *রিহলাহ* কিংবা দীর্ঘ ও বিচিত্র পরিভ্রমণ। ফিলিস্তিনের বিপ্লব ও গণমুক্তির স্বপ্ন হয়ে ওঠে এই *রিহলাহ'র* পরম অভিষ্ঠ লক্ষ্য। কিন্তু ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক অবস্থা এবং গতিপ্রকৃতি যেভাবে সক্রিয় ছিল তাতে দারভীশের অবস্থান এবং সক্রিয়তা সবসময় একই মেজাজ এবং একই চিন্তায় অগ্রসর হয়নি। দারভীশ নিজেকে বদলে নিয়েছেন। এই বদলে নেয়ার একটি সাধারণ মানদণ্ড হয়ে ওঠে দেশ-জাতির সাধারণ আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ। বস্তুত দারভীশের একই অবস্থানে জেঁকে থাকার চেয়ে নিজেকে বদলে নেয়ার ঘটনার মধ্যেই *রিহলার* সারার্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে।

মোটকথা এই *রিহলাহ'র* বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দিক থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা সম্ভব। ফিলিস্তিনের দীর আল জাইত ইউনিভার্সিটির দর্শন, সংস্কৃতি ও আরবী অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক আব্দুর রহমান আল শায়খ দারভীশের দীর্ঘ-জটিল-বিচিত্র এই পথ-পরিক্রমাকে তত্ত্বগত বিশ্লেষণে '*আল রিহলাহ*' হিসেবে শনাক্ত করেন। দারভীশ তার বিখ্যাত *মাদীহ আল জিল আল আলী* কাব্যগ্রন্থে নিজের এই পরিভ্রমণকে *আল রিহলাহ* হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও রিহলাকে যেমন আল শায়খ নমেডলজি হিসেবে অভিহীত করেছেন তেমনি হিজরত শব্দটিও নমেডলজির সমার্থক হিসেবে বিবেচনায় রেখেছেন। দারভীশের যে বক্তব্য থেকে আল শায়খ রিহলা কিংবা নমেডলজি সম্পর্কিত ধারণার তত্ত্বায়ণ করার চেষ্টা করেছেন তার নিচে তুলে ধরা হলো...

عادوا وما عادوا
لبداية الرحلةْ
والعمرُ أَولادُ
هربوا من القُبْلَهْ.
لا ' ليس لي منفى
لأقول : لي وطنُ
الله، يا زَمَنُ....![৩৭৪]

তারা ফিরে এসেছে অথচ তারা আসেনি ফিরে
শুরু করার জন্য এই ভ্রমণ
যখন সন্তানের মতো যেন জীবন
সমুখ থেকে পালিয়ে গেছে যারা

---

৩৭৪. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, ২০০৫, পৃ. ৩৭৩।

না, আমার কোনো নির্বাসন নেই
যেন বলতে পারি: আমারও আছে দেশ
হায় আল্লাহ– হে সময়…!

দারভীশের এই বক্তব্যই বস্তুত আল শায়খের বিশ্লেষণের মূল উপজীব্য। আল শায়খ পরিভ্রমণগত মহাকাব্যিক এই অভিজ্ঞতাকে একটি তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে দারভীশের *রিহলাকে* বাহ্যত তিন ধাপে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, আল ইসতিআদাহ (الاستعادة বা পুনরুদ্ধার), দ্বিতীয়ত, আল মুওয়াক্কাতিয়্যাহ (الموقتية) বা সময়, তৃতীয়ত, আল ইনতিজার (الانتظار) বা অপেক্ষা। অভ্যন্তরীণ দিক থেকেও এর তিনটি স্তর রয়েছে। আল মুহাওয়ালা, আল কাওকাবাহ, আল তিরহাল।[৩৭৫] অর্থাৎ দারভীশের জীবনে তার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডগুলো কিভাবে ঘটেছে তার একটি সূত্রায়ণ করা যায় এর মাধ্যমে। তবে *রিহলাহ*কে স্থানিক ও রাজনৈতিক– এই দুইভাবে ভাগ করা যায়। স্থানিক তিনরকম: দখলকৃত ভূমি, নির্বাসন এবং মাতৃভূমির ঐতিহাসিক পটভূমিগত পরিসর। রাজনৈতিকও তিনরকম: সংস্কৃতি। দ্বিতীয়ত ইজরাইলের বামপন্থী রাজনীতি বা কমুনিস্ট পার্টির সক্রিয়তা। তৃতীয়ত, আরব জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের সাথে পিএলও'র সম্পর্কিত হওয়া। সৌন্দর্য বা নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকেও দুইভাবে ভাগ করা যায়। প্রতিরোধের কবি। দ্বিতীয়ত, সর্বজনীন কবি।

ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে দারভীশের যে *রিহলা* তার ভিত্তি হলো চিন্তা (থট) এবং ধারণা (আইডিয়া)। দারভীশ চিন্তাকে তার *রিহলার* মূল উপজীব্য করে তুলেছেন। দারভীশ এখানে যেটাকে *আল ফিকর* বলছেন সেটা আদতে থিংকিং নয়– বরং *আইডিয়া*। আল শায়খ দারভীশ যেটাকে আল ফিকর বলেছেন তার ব্যাখ্যা হিসেবে ইংরেজি *idea* শব্দটি গ্রহণ করেছেন।[৩৭৬] চিন্তা বা ধারণা মানে বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রাথমিক ক্ষেত্র– চিন্তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো যেকোনো বিষয় ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় পূর্বানুমান (প্রিজুডিস) কিংবা বিদ্যমান তফসীর ও ব্যাখ্যাব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের কাণ্ডজ্ঞানজাত চিন্তা দিয়ে আপন ব্যাখ্যা কিংবা বয়ান হাজির করা। ফিলিস্তিনের কর্তাসত্তার যে ঐতিহাসিকতা কিংবা ফিলিস্তিনী জাতি হয়ে ওঠার যে ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে তাতে যেমন চিন্তা ও প্রজ্ঞা রয়ে গেছে তেমনি ফিলিস্তিনকে ক্রমাগত বর্তমান করে তোলার ধারণাও রয়েছে। চিন্তার এ প্রক্রিয়াকে পুনরুদ্ধার করার নামই হলো আল ইসতিআদ। আল শায়খের মতে, আল ইসতিআদ (পুনরুদ্ধার), আল কাওকাবাহ (কনস্টেলেশন) এবং আল রিহলাহ (নমেডিজম) কিংবা হিজরতের অপর নাম– যথাক্রমে চিন্তা, বিপ্লব এবং রাষ্ট্র। আল শায়খ এখানে *রিহলাকে* অন্যতরো অর্থে উপস্থাপন করেন। পশ্চিমা দার্শনিক জিল দেলুজের বিখ্যাত তত্ত্ব *নমেডোলজি*'র ধারণার সাথে আত্মীকরণ করে রিহলার তফসির করেন আল শায়খ। মোটকথা রিহলাহ

[৩৭৫]. আল শায়খ, আবদ আল রহমান, *মুতালাজিমাতু দারভীশ: আল ফিকরাহ, আল ছাওরাহ, আল দাওলাহ*, মাজাল্লাহ আল দিরাসাত আল ফালাসত্বিনিয়্যাহ (বৈরুত: ইনস্টিটিউট অফ পালেস্টাইন স্টাডিজ, শীতকালীন সংখ্যা-১২৫, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ১৪৮-১৫২।
[৩৭৬]. প্রাগুক্ত।

মানেই এখানে নমেডিজম কিংবা রিহলা কিভাবে নমেডিজমের ধারণাকে আত্মীকরণ করে বিশ্লেষিত হতে পারে তার নমুনা তুলে ধরেন আল শায়খ।

অপরদিকে, আল মুওয়াক্কাতিয়্যাহ বা বিপ্লব একই সার্কেলের দ্বিতীয় বুনন। অর্থাৎ চিন্তা ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়। চিন্তা বস্তুত বিপ্লবের পূর্ব শর্ত। মুওয়াক্কাতিয়্যাহ শব্দটি এসেছে অক্ত () থেকে। সময় সংক্রান্ত বিষয় আশয়, ঘড়ি কিংবা টাইম মেশিন ইত্যাদি এর অর্থ। কিন্তু আল মুয়াক্কাতিয়্যাহ বলতে কেন বিপ্লব বোঝানো হয়? আল শায়খের বিশ্লেষণে দেখা যায়, আল মুয়াক্কাতিয়্যাহ বলতে যা বোঝানো সম্ভব তা অনেক বেশি সময়ের কনটেক্সটের সাথে সম্পৃক্ত। এই কনটেক্সট ইতিহাসের বিশেষ পরিস্থিতি কিংবা নানাবিধ ঘটনার পটভূমি ও লক্ষণকে কেন্দ্র করে যে ফলাফল কিংবা প্রবণতা তৈরি হয় সেই বিশেষ অবস্থার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণমূলক ধারণার নাম আল মুয়াক্কাতিয়্যাহ। যেহেতু ইতিহাসের এমন বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি এবং ঘটনাগুলো যে ফলাফল কিংবা দিকনির্দেশনা ঘটিয়ে দেয় তাতে বৈপ্লবিক শর্ত বিদ্যমান থাকে, ফলে এর সাথে বিপ্লব এবং সেই বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিত এক এবং অভিন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু ফিলিস্তিনের সেই বিশেষ প্রেক্ষিতগুলোর পটভূমি কিংবা কার্যকারণজাত অবস্থার একটি সাধারণ লক্ষণ রয়ে গেছে– তার নাম হলো জায়োনিস্ট বনাম ফিলিস্তিন। এটি বস্তুত ফিলিস্তিনের সাধারণ দ্বন্দ্ব। পিএলও এবং জায়োনিস্ট ইজরাইলের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে এই দ্বন্দ্ব বিবদমান। ফিলিস্তিনের চলমান ইতিহাস বিচার করলে দেখা যায়, তাতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত নানাবিধ জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট দরকাষকষির মধ্যদিয়ে যে ঘটনা কিংবা ঘটনাসমূহের জন্ম হয় তাতে সেইসব ঘটনাই মুখ্যদ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে। যে দ্বন্দ্ব থেকে ছোট ছোট বিপ্লবের সূচনা ঘটতে পারে। কাজে যেসব দ্বন্দ্বের ফলে যে প্রেক্ষিতগুলো নৈর্ব্যক্তিকভাবে গড়ে ওঠে তার মাধ্যমেই বৈপ্লবিক চিন্তা গড়ে ওঠে। কিন্তু ফিলিস্তিন যখন চিন্তা করে তখন খোদ চিন্তা কিংবা বিপ্লব নিজেই একটি সমস্যা হয়ে ওঠে। জায়োনিস্ট মতাদর্শের দিক থেকে এটি একটি চ্যালেঞ্জ— মানে শুধু ফিলিস্তিন কোনো সমস্যা নয়। যখনই ফিলিস্তিনের সাথে চিন্তার প্রকৃতি যুক্ত হয় বস্তুত তখনই *ফিলিস্তিন* একটি বিষয় আকারে উপস্থিত হয়। ফলে ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে চিন্তা খোদ একটি প্রতিরোধমূলক ক্যাটাগরি হয়ে ওঠে ইজরাইলভিত্তিক চিন্তাচর্চার কাঠামোগুলোতে। কাজে চিন্তাবিহীন (মতাদর্শ) ফিলিস্তিন ইজরাইলের জন্য কোনো সমস্যা নয়। স্বাধীন চিন্তাসম্পন্ন ফিলিস্তিন কিংবা ফিলিস্তিনচিন্তা জায়োনিস্ট জ্ঞানপ্রক্রিয়াগুলোর কাছে বরাবরই একটি রাজনৈতিক ইস্যু— রাজনৈতিকভাবে কিংবা হানাদারি প্রক্রিয়ায় মোকাবেলার বিষয়।

তবে ফিলিস্তিন-চিন্তার কারণে ইজরাইলের জন্য সমস্যায়িত হয়ে উঠলেও ফিলিস্তিন তার চিন্তার সংকট উৎরিয়ে যেতে পারেনি। লেবানন বংশোদ্ভুত আমেরিকান অধ্যাপক ড. ইলিয়াস খুরি ফিলিস্তিনী চিন্তার সংকট চিহ্নিত করেন। আল খুরি মনে করেন, এর প্রধান কারণ ফিলিস্তিনে যুগপৎভাবে চিন্তার রূপান্তর (ফিকরুত তা'বিল) ঘটেনি।[৩৭৭] মূলত ইজরাইল তার জায়োনিস্ট চিন্তাকে বাস্তবতার (প্র্যাগম্যাটিক)

[৩৭৭]. আল খুরি, ইলইয়াস, *আল হাজীমাহ ওয়া আল নাকবাহ আল মুসতামির্‌রাহ* (বৈরুত: মাজাল্লাহ আল দিরাসাত আল ফালাসত্বিনিয়্যাহ ইনস্টিটিউট অফ পালেস্টাইন স্টাডিজ, গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা-১১১, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ২৫-২৬।

দাবিতে পরিবর্তন করে এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এর প্রধান কারণ তাদের চিন্তার প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের বিষয়টি সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে। পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির সমান্তরাল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে ইজরাইল তার পুরোনো আদর্শবাদ কিংবা ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আটকে থাকেনি। বরং ধর্মতত্ত্বের সীমাকে বিবেচনায় নিয়েও ইজরাইল তার চিন্তার প্রবণতাকে স্বাধীন রাখতে সক্ষম হয়েছে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলোকে সবসময় রাজনৈতিক বিবেচনায় গ্রহণ করার কারণে। একইসাথে তারা ধর্মতত্ত্ব কিংবা তাদের বিশ্বাসব্যবস্থার যে পৌরাণিক ডিসকোর্স সেটাকে তারা ইতিহাসে বদলে নিয়েছে। ইতিহাসে বদলে নেয়ার অর্থ—চলমান কিংবা বিবদমান ঘটনাবলীর মধ্যেই চিন্তার নির্দেশনা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া সবসময় হাজির রাখা। যাতে যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা পরিস্থিতির মধ্যেই সম্ভব করার সামর্থ অর্জন করা যায়। অপরদিকে ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনগুলো ফিলিস্তিন জাতির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে গতিশীল কোনো চিন্তার প্রক্রিয়া হাজির করতে পারেনি। এর ফলে ফিলিস্তিনচিন্তা ফিলিস্তিনের উপস্থিতি (আল হুদুর আল ফিলিস্তিনী) এবং জায়োনিস্ট রূপান্তরপ্রক্রিয়ার (আল তা'বিল আল ছহইয়ুনিইয়্যি) মধ্যে একটি সংঘাত হয়ে আছে মাত্র। কিন্তু বেশিদূর তা আগাতে পারে না। আবদুর রহমান আল শায়খ মনে করেন, এর প্রধান কারণ হলো—হাজির বা বর্তমান থাকার শরিয়া বা নীতি থাকবে, একইসাথে প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও টিকে থাকতে হবে। কিন্তু এই প্রতিরোধ এবং টিকে থাকার মধ্যে *তা'বিল* এবং *গিয়াব* এর কোনো নীতি নাই—চিন্তাসূত্র নাই। যেকারণে মাহমুদ দারভীশ মনে করতেন, যে নাকবা থেকে মুক্তির চিন্তা, যুক্তি কিংবা প্রশ্নের ধারা গড়ে উঠেছে তা একটি জাতির স্বাধীনতার জন্য যে সামগ্রিক বয়ান পরিগঠনের প্রধান উপায় হয়ে ওঠার কথা ছিল তা শেষ পর্যন্ত নিছক 'আবেগময় স্মৃতি' ছাড়া আর কিছুই হয়ে উঠতে পারেনি।[৩৭৮] নাকবা—যেখান থেকে ভৌগলিকতা নির্মাণের চিন্তাপ্রকল্প গড়ে ওঠার কথা—বৈপ্লবিক মুহূর্ত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠার কথা—তা আর হয়ে উঠেনি। কার্যত ফিলিস্তিন এরপরে বারবার নতুন ধরনের নাকবার মুখোমুখী হয়েছে। **১৯৪৮** এর পর **১৯৫৮, ১৯৬৭, ১৯৭৯, ১৯৮২, ১৯৮৮, ১৯৯৩-** সময়কালগুলো ছিল বস্তুত একেকটি বিপর্যয়ের নির্ধারক ঘটনা। ইলিয়াস খুরি এ অবস্থাকে চলমান নাকবা হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩৭৯]

তৃতীয়ত, আল ইনতিজার। অপেক্ষা। অপেক্ষা মানে শেষ অবস্থা আবার একইসাথে এর অর্থ সার্বক্ষণিকতা। এমন অপেক্ষা বলতে রাষ্ট্রকে বোঝানো হয়েছে। আল শায়খ মনে করেন, অপেক্ষা এবং সার্বক্ষণিকতা'র অর্থই হলো বিপ্লব এবং রাষ্ট্রের অনিবার্যতা। অপেক্ষা বলার কারণ, যেহেতু চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত লড়াই-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তার জন্য ক্রমাগত অপেক্ষা করে যাওয়া। অপেক্ষা বস্তুত চিন্তাচর্চা একইসাথে লড়াই-সংগ্রামের অন্য নাম। কাজে অপেক্ষা বস্তুত ফিলিস্তিনে যে বিপ্লবী ধারার জন্ম হয়েছে তারই চিন্তাগত, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নীতি ও প্রক্রিয়ার অংশ। একটি অভিযাত্রাকে তার গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা সবথেকে মৌলিক একটি বিষয়। যেকারণে অপেক্ষা যেমন চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বিবেচ্য তেমনি বাস্তবতার জন্য

---

[৩৭৮]. আল শায়খ, আবদ আল রহমান, *মুতালাজিমাতু দারভীশ: আল ফিকরাহ, আল ছাওরাহ, আল দাওলাহ*, পৃ. ১৪৯।

[৩৭৯]. আল খুরি, ইলইয়াস, *আল হাজীমাহ ওয়া আল নাকবাহ আল মুসতামিররাহ*, পৃ. ২৫-৩০।

আরো বেশি জরুরি প্রশ্ন। দারভীশের চিন্তা ও কাব্য তৎপরতায় এসব চিন্তাগত বিষয়গুলো বোঝার জন্য ক্যাটাগরি আকারে পাঠ করার সুবিধা হলো, পুরো প্রক্রিয়াকে সহজভাবে আত্মস্থ করতে পারা। ফিলিস্তিনকে তার স্বাভাবিক ইতিহাসের গতির মধ্যে নিয়ে আসতে পারাটা ছিল দারভীশের জন্য একটি বড়ধরনের লড়াই। এই লড়াইয়ের অন্য নাম হলো মূলত *রিহলা*। রিহলা শব্দবন্ধ দিয়ে দারভীশের ফিলিস্তিনকে তার স্বাধীন ও স্বয়ম্ভু ইতিহাসে পুনরায় প্রতিষ্ঠা, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নির্মাণ, তার ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার, জাতি ও জনগোষ্ঠী আকারে মুক্তির পথ সুগম করা—সবকিছুকে একসাথে একশব্দে বোঝা ও প্রকাশযোগ্য করে তোলার জন্য এই বিশেষ বর্গ জরুরি হয়ে উঠেছে।

অর্থাৎ এক কথায় দারভীশের পুরো মিশনকে যখন *রিহলা* নামক বর্গের ভিতর নিয়ে আসা যায় তখন একইসাথে রিহলার ভিতরগত কিছু সাবক্যাটাগরিও তৈরি হয়—যাতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সামগ্রিক বিষয়টি ভালোভাবে ধরা যায়। যেমন, অভ্যন্তরীণ দিক থেকে দারভীশের *রিহলার* তিনটি অবস্থা বা ধাপ রয়েছে। ধাপ কথাটি এ কারণেই বলতে হয়, কারণ তাতে যেমন রিহলা সরলরৈখিকভাবে এগিয়ে যায় তেমনি জটিলভাবেও কাজ করে। ধাপ—এমন একটি অবস্থা যাতে রিহলাকে স্তরে স্তরে সমুখে নিয়ে যাওয়া যায় আবার একইবস্তু হওয়ায় পর্যায়-পর্যায়ে তা আবর্তনও করতে পারে। মানে তা ঘুরে ঘুরে আবার আসতে পারে। ফলে রিহলার যেমন লিনিয়ার এবং হরাইজন্টাল চরিত্র রয়েছে তেমনি রয়েছে ভার্টিক্যালিটি। তবে রিহলার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো ভার্টিক্যালিটি এবং চক্রাকার বা আবর্তনমূলক স্বভাব। বিষয়টি বোঝার জন্য রিহলার অভ্যন্তরীণ তিনটি ধারণাও বোঝা দরকার। যেমন- আল মুআওয়াদাহ (রিপিটিশন), আল কাওকাবাহ (কনস্টেলেশন), আল তিরহাল (নম্যাডেজিম)। এখানেও আল *মুআওয়াদাহ* বলতে চিন্তা (আইডিয়া), *আল কাওকাবাহ* বলতে বিপ্লব এবং আল *তিরহাল* বলতে রাষ্ট্রকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু চিন্তা-বিপ্লব-রাষ্ট্র এই তিনটি বাহির এবং ভিতর উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান। ভিতর এবং বাহির- উভয় অবস্থায় এটি পৌনপুনিকভাবে ঘটমান। এই পৌনপুনিকতা দারভীশের প্রায় সবক্ষেত্রেই রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই এই পুনরাবৃত্তির উদাহরণ পাওয়া সম্ভব। কোনো শব্দের শুধু একাধিক উল্লেখ নয় বরং বিভিন্ন সময়ে বিবিধ পরিপ্রেক্ষিতে একই ধারণার পুনরাবৃত্তির ফলে পৌনপুনিকতা একটি ধারণা হয়ে ওঠে দারভীশের কবিতায়। যেকারণে দারভীশের চিন্তার অগ্রধারা বিশ্লেষণের জন্য আল মুআওয়াদাহ বা পুনরাবৃত্তিমূলক ক্যাটাগরি বা পরিভাষার উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু কোনো শব্দ একাধিক বর্ণিত হলেই তাকে ধারণাগতভাবে রিপিটিশন হিসেবে সবসময় বোঝানো যায়না। একটি শব্দের পুনরাবৃত্তিতে শৈল্পিক গুরুত্বারোপ ঘটতে পারে যেমন তেমনি আবার কোনো কোনো প্রেক্ষিতে পুনরাবৃত্তি নেতিবাচক হিসেবেও বিবেচ্য হতে পারে। মোটকথা, একটি ধারণা হিসেবে পৌনপুনিকতা আর কোনো শব্দের নিছক পুনরাবৃত্তি এক বস্তু নয়। দুটি ভিন্ন বিষয়।

আল মুআওয়াদাহ মানে, যা পুনঃপুনঃ ঘটমান। ফরাসি দার্শনিক জিল দেলুজের (১৯২৫-১৯৯৫) মতে, রিপিটিশন যা জেনেরালিটির (সাধারণ) বিপরীতে একটি দার্শনিক ক্যাটাগরি। পারস্পরিক সম্পর্কের দিক থেকে দুটি ক্যাটাগরিই আলাদা। ভিন্ন পরিভাষা। রিপিটিশন- (তাকরার) মানে, যা

কোনো শৃঙ্খলার বা নিয়মচক্রের অভ্যন্তরীণ শর্তসমূহের মাধ্যমে আরোপিত হয়। অর্থাৎ কোনো একটি জিনিস যেটি কাঠামো হতে পারে, প্রক্রিয়া হতে পারে– যাই হোক না কেন– তার অন্তর্গত সত্তার জন্য যখন তা সম্ভব হয়ে ওঠে। এতে তখন তার পরিচয়ের প্রকাশ ঘটে তার বিশেষ ক্যাটাগরির ফলে কিংবা তার অভ্যন্তরীণ প্রকরণের কারণে। বস্তুত এটি হয়ে ওঠে জ্ঞানের একটি চক্রাকার যুক্তিব্যবস্থা (আত তা'রীফাত আদ দায়িরিয়্যাহ)। সাধারণ অর্থে, এর যুক্তিব্যবস্থার সূত্র এক ধরনের সংশয় সৃষ্টি করে। যেমন যখন বলা হয়, এখানে যে দুটি জিনিস আছে তা পানির দুটি ফোঁটার মতো। কিংবা যখন আমরা বলি, এখানে একমাত্র সাধারণ বিজ্ঞানই বিদ্যমান– মানে এখানে এমন এক বিজ্ঞান সক্রিয় যা পৌণপুণিকভাবে ঘটে চলেছে। ফলে বারবার যা ঘটছে– ঘটনার মুহূর্তের কারণ ও প্রেক্ষিতের ফলে এটি সবসময় এক নয়। সদৃশ্য থাকতে পারে। অর্থাৎ সদৃশ্য আর রিপিটিশন এক নয়। সাধারণত রিপিটিশন ন্যাচারাল ল' কিংবা প্রাকৃতিক নিয়মের আলোচিত একটি ধারণামূলক ক্যাটাগরি। অপরদিকে রিকারশন– গাণিতিক যুক্তির একটি নিয়ম বা প্রক্রিয়া। রিকারশন এবং রিপিটিশন প্রায় একই ধারণার দুটি শব্দ। রিপিটিশন কী তা বোঝার সুবিধার জন্য জেনেরালিটির আলোচনা প্রাসঙ্গিক। তেমনি জেনেরালিটি কী তা বোঝার জন্য পার্টিকুলারের (বিশেষ) আলোচনাও জরুরি হতে পারে। যেখানে দেখা যায়, জেনেরালিটির মধ্যে যে সাইকেল বা চক্র কিংবা সমরূপ ও সদৃশ্যরূপগুলো দেখা যায় তাতে প্রতিটাই পরস্পরে নিজেদের বদলে নিতে পারে। ফলে অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন, জেনেরালিটি আর পার্টিকুলারিটি একটি আরেকটির বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। কারণ পার্টিকুলার কিংবা জেনেরালিটি একটি আরেকটির জায়গা গ্রহণ করে নিতে পারে। কিন্তু রিপিটিশন বিষয়টি এমন নয়। এটি বদল বা বিনিময়যোগ্য নয়। রূপান্তরযোগ্য নয়। রিপিটিশন সবসময় এক– অনন্য। সদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তারা ভিন্ন। একটি আরেকটির বিকল্প নয়। সমরূপ নয়। একটি চক্রের বা বৃত্তের প্রতিটি ধাপ- যা পুনঃপুনঃ ঘটমান হয়েও তারা– পরস্পর আলাদা। একটি আরেকটির সমরূপ এবং বিকল্প নয়। সদৃশ্য থাকতে পারে বিধায় তাদের সার্কুলার বা চক্রাকার বলা হয়। কিন্তু তারা প্রতিটি আলাদা সত্য। আলাদা বাস্তবতা। আলাদা সত্তা। কারণ যখন বদল বা বিনিময় জেনেরালিটির কারেকশন হয় তখন কোনটি চুরিলব্ধ জিনিস আর কোনটি উপহারের জিনিস তাতে বুঝতে সমস্যা তৈরি হয়। দুটিকে একই মনে হতে পারে। কিন্তু রিপিটিশনের ক্ষেত্রে কারেকশন সম্ভব নয়– যাতে দৃশ্যত এক বস্তু হওয়া সত্ত্বেও চুরির জিনিস আর শ্রমনির্ভর অর্জিত বা উপহারের জিনিসের ক্ষেত্রে কারেকশন করে বলা যাবে না– একই জিনিস। অর্থাৎ রিপিটিশন এখানে দুটি জিনিসের মধ্যে তারতম্য এবং পার্থক্য করার কথা বলবে।[৩৮০]

তাকরার বা রিপিটিশন এর ধারণা সম্পর্কে আরবী কবিতা ও ভাষার ইতিহাস-ঐহিত্যে বিপুল ও সমৃদ্ধ দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাকরার এর শৈল্পিক ও সৌন্দর্যগত দিকগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ একইসাথে এর রয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক ও অর্থগত গভীরতার বিচিত্র মাত্রা। দারভীশের কবিতায় এ ধরনের পুনারাবৃত্তির বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন আলজেরিয়ার ওরান ইউনিভার্সিটির আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের গবেষক আলী বুলাম। আল বুলাম বিশেষভাবে *মাদীহ আল জিল আল আলী* কাব্যগ্রন্থে বিধৃত পুনরাবৃত্তি বিষয়ে

[৩৮০]. দেলুজ, জিল, *ডিফারেন্স এন্ড রিপেটিশন*, *পল প্যাটন কর্তৃক ফরাসি থেকে ইংরেজি অনুবাদ* (কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১-৬৫।

বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণত এর সৌন্দর্য ও শৈল্পিক তাৎপর্য কি তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন বুলাম।[৩৮১] একইসাথে তিনি তাকরারের ফলে যেমন একটি গীতল আবেদন সৃষ্টি করা যায় তেমনি একটি কথার একাধিক উল্লেখের কারণে এর অন্তর্গত অর্থের বৈচিত্র্যও ঘটানো যায়। যেখানে চিন্তা, রিহলা, রাষ্ট্র ও বিপ্লবের কথা পুনরাবৃত্তি হয়েছে বারবার। বিশেষত *বাহ্‌র* শব্দটি অনেকবার উল্লেখ করেছেন দারভীশ। আরবী কবিতার যে বহু প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে তাতে তাল-মাত্রা ছন্দময় কবিতার অপর নাম বুহুর বা বাহ্‌র নামেও প্রসিদ্ধ।[৩৮২] দারভীশের কবিতা এবং কবিতাবাহিত যে চিন্তা ও ভাবনার স্বরূপ অনুভব করা যায় তার সাথে এ আলোচনায় পৌনপুনিকতার ধারণা অনুধাবন করা যায়। একটি কবিতার কয়েকটি পঙক্তির দিকে নজর দেয়া যাক...

بحرٌ لأيلولَ الجديدِ. خريفُنا يدنو من الأبوابِ...
بحرٌ للنشيدِ المرِّ. هيَّأنا لبيروتَ القصيدةَ كُلَّها.
بحرٌ لمنتصفِ النهارِ
بحرٌ لراياتِ الحمامِ, لظِلِّنا ' لسلاحنا الفرديِّ
بحرٌ ' للزمانِ المستعارِ
ليديكَ, كمْ من موجةٍ سرقتْ يديكَ
من الإشارةِ وانتظاري
ضَعْ شكلنا للبحرِ. ضَعْ كيسَ العواصفِ عند أول صخرةٍ
واحملْ فراغَكَ...وانكساري
....واستطاعَ القلبُ أن يرمي لنافذةٍ تحيَّتَهُ الأخيرةَ,
واستطاع القلبُ أن يعوي, وأن يَعدَ البراري
بالبكاء الحُرِّ...
بَحْرٌ جاهزٌ من أجلنا[৩৮৩]

সমুদ্র নতুন সেপ্টেম্বরের বিপরীত। দরোজার কাছেই আমাদের সমূহ শরৎ
সমুদ্র, তিক্ত সঙ্গীতের বিপরীত। বৈরুতের জন্য আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি সব কবিতা।
সমুদ্র, মধ্যরাতের বিপরীত।
সমুদ্র, কবুতর-বাহিনীর বিপরীত।
সমুদ্র, আমাদের ছায়ার বিপরীত
সমুদ্র, আমাদের ব্যক্তিগত অস্ত্রের বিপরীত
সমুদ্র, রূপকময় সময়ের বিপরীত
তোমার হাতের বিপরীত

---

৩৮১. বুলাম, আলী, *জামালিয়্যাতু আল তাকরার ওয়া আলিয়াতুহু ফী আল তামাসুক আল নাস্‌সী*, *কাসীদাতু মাদীহ আল জিল আল আলী লি আল শায়ির মাহমুদ দারভীশ উনমুজাযান* (আলজেরিয়া: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ওরান ইউনিভার্সিটি, ২০১৬-২০১৭, খ্রি.), পৃ. ৯১-১৫৩।

৩৮২. মাসালহাহ, নূর, *প্যালেস্টাইন: আ ফোর থাওজ্যান্ড ইয়ার হিস্ট্রি* (যুক্তরাজ্য: জেড বুকস, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২৪২।

৩৮৩. মাহমুদ দারভীশ. আদ্দীওয়ান. আল আ'মালুল উলা-২. ২০০৫. পৃ. ৩৩৩, ৩৩৪.

কতো তরঙ্গ লুট করে নিয়ে গেছে তোমার হাত
ইংগিতে, অপেক্ষায়,
সমুদ্রের জন্য গঠন করো আমাদের রূপ।
আদিম পাথরের কাছে স্থাপন করো ঝড়ের বাস্কেট।
বয়ে যাও তোমার শূন্যতা এবং আমার ভাঙ্গন।
জানালার কাছে এসে হৃদয়ই পাঠাতে পারে শেষ অভিবাদন।
হৃদয়ই কেবল পারে কাঁদতে
স্বাধীনভাবে কেঁদে কেঁদে অঙ্গিকার করতে পারে হৃদয়

আমাদের জন্য প্রস্তুত সমুদ্র।

কিংবা...

البحرُ دهشتنا , هشاشتُنا
وغربتُنا ولعبتُنا
والبحرُ صُورَتُنَا
ومَنْ لا بَرَّ لَهْ
ولا بَحْرَ لَهْ...

..... بَحْرٌ أمامكَ' فيكَ ' بحر من ورائكَ.
فوق هذا البحر بَحْرٌ ' تحتهُ بَحْرٌ
وأنتَ نشيدُ هذا البحرِ...[384]

সমুদ্র আমাদের বিস্ময়,
আমাদের ভঙ্গুরতা
আমাদের অচেনা আমাদের খেলা
সমুদ্র আমাদের রূপ-ছবি
এবং যার স্থল নেই
তার সমুদ্রও নেই...

...সমুদ্র আমাদের সমুখে, আমাদের ভিতরে, সমুদ্র
তোমার পিছনে-আড়ালে এমন সমুদ্রের উপরে সমুদ্র, নিচে সমুদ্র
এবং সংগীত তুমি এই সমুদ্রের।

---

৩৮৪. দারভীম, মাহমুদ, *আল দিওয়ান. আল আ'মালুল উলা-২.* ২০০৫. পৃ. ৩৮৩।

এখানে দেখা যাচ্ছে *বাহর* বা সমুদ্র শব্দটি বারবার এসেছে। বারবার উল্লেখের ফলে *বাহর* যেখানে নিছক সমুদ্র অর্থের মধ্যে আটকে থাকেনি। বাহর যেখানে পুরো ফিলিস্তিনের সামগ্রিক চিত্র হয়ে উঠেছে। বাহর—যেখানে দারভীশ তার মিশন ও অভিযাত্রাকে সামগ্রিক দিক থেকে রিহলা অভিহিত করেছেন—মূলত তাই হয়ে উঠেছে *বাহর*। আর এটি হয়েছে মূলত রিপিটিশন বা বারবার উল্লেখের কারণে। ফিলিস্তিনের সামাজিক স্মৃতি এবং মধ্যযুগীয় আরব ইসলামিক সংস্কৃতির নানা উপাদানে বাহ্‌র শব্দের বিপুল ব্যবহার রয়েছে—যা কেবল ফিলিস্তিনের পরিচয়কে উপস্থাপন করার জন্য যথেষ্ট। দারভীশ এটাকে ফিলিস্তিনের সমকালীন প্রেক্ষিতের সাথে মিলিয়ে কবিতাটিতে এমন একটি ডিকশনে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন যাতে ফিলিস্তিনের পরিচয়ই নয় কেবল রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের সামগ্রিক রূপ উন্মোচিত হয়েছে 'বাহ্‌র' শব্দের রূপকের মধ্যদিয়ে। যা বাহ্‌র এর চিরায়ত অর্থ ও আবেদন। কিন্তু দারভীশ এই অর্থকে পাল্টে দিয়েছেন। একদিকে প্রথমত দারভীশ বাহ্‌র শব্দকে ইজরাইলের রূপক হিসিবে নির্মাণ করেন তার কবিতায়। উপরের উদ্ধৃতাংশটিতে যে বারবার সমুদ্র শব্দটি এসেছে এটি বস্তুত ইজরাইলের রূপক। আবার দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দেখা যায় একই শব্দ বাহরকে ইতিবাচক হিসেবেই শুধু গ্রহণ করেননি আত্মারূপে সাকার রূপে প্রতিকায়িত করে আত্মপরিচয়ের নিবিড় অনুষঙ্গ হিসেবে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দেখা যায় পুনরুক্তি দারীভশের কবিতায় নতুন অর্থোৎপাদনের দিকে সমৃদ্ধ ইংগিত বহন করতে সক্ষম।

রিহলা এবং রিপিটিশন বোঝার জন্য আরো কয়েকটি কবিতা পাঠ করা যায়। দারভীশ বলেন,

نحن البدايةُ والبدايةُ والبدايةُ . كم سَنَهْ
وأَنا التَوَازُنُ بين ما يجبُ ؟
كُنَّا هناكَ ومن هنا ستهاجر العَرَبُ
لعقيدةٍ أُخرى . وتغتربُ
قَصَبٌ هياكلنا
وعروشنا قَصَبُ
في كُلِّ مئذَنَةٍ
حاوٍ , ومغتصبُ
يدعو لأندلس
إنّ حُوصرتْ حَلَبُ
وأَنا التوازُنُ بين مَنْ جاءوا ومن ذهبوا
وأَنا التوازُنُ بين مَنْ سَلَبُوا وَمَنْ سُلِبوا
وأَنا التوازُنُ بين من صَمَدُوا وَمَنْ هربوا
وأَنا التوازُنُ بين ما يَجِبُ:

يجبُ الذهابُ إل اليسارْ
يجبُ التوغُّلُ في اليمين
يجبُ التمترسُ في الوسطْ
يجبُ الدفاعُ عن الغلطْ
يجبُ التشكُ بالمسارْ
يجبُ الخروج من اليقينْ
يجبُ انهيارُ الأنظمةْ
يجب انتظارُ المحكمةْ
...وأنا أُحبك , سوف أحتاج الحقيقةَ عندما أَحتاج تصليح
الخرائط والخططْ
أَحتاجُ ما يجبُ
يجبُ الذي يجبُ
أَدعو لأندلسٍ
إن حُوصرتْ حلَبُ[385]

আমরাই সূচনা এবং সূচনা এবং সূচনা। কতো কাল...
এবং যাকিছু অবশ্যম্ভাবী তার মাঝে আমিই ভারসাম্য
আমরা ছিলাম ওখানে এবং অন্যকোনো বিশ্বাসে ওখান থেকে
শিঘ্রই হিজরত করে আসবে আরব
আমাদের কাঠামোগুলোর খুঁটিও দেশত্যাগ করে যাবে
আমাদের সিংহাসনগুলো যখন মিনারে মিনারে বাঁশের মতো
বেষ্টন করে আছে।
একজন ধর্ষক তখন স্পেনকে ডেকে ওঠবে
যদি আলেপ্পো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তবে
যারা চলে গেছে এবং যারা আসবে তাদের মধ্যে আমিই ভারসাম্য
যারা লুট করেছে এবং যারা লুণ্ঠিত হয়েছে আমি তাদের মাঝে ভারসাম্য
যারা পালিয়ে গেছে এবং যারা অটল রয়ে গেছে আমি তাদের মাঝে ভারসাম্য
এবং যাকিছু অবশ্যম্ভাবী আমি তার মাঝে ভারসাম্য:
বাম দিকে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী
ডান দিকে ঘুরা অবশ্যম্ভাবী
মাঝখানে ঢুকে পড়া অবশ্যম্ভাবী
ভুল রক্ষা করা অবশ্যম্ভাবী
চলায় সন্দেহ অবশ্যম্ভাবী

---

৩৮৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।

নিশ্চিত বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী
ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া অবশ্যম্ভাবী
ন্যায়বিচারের অপেক্ষা অবশ্যম্ভাবী
ভালোবাসী আমি তোমায়...
যখন মানচিত্র এবং পরিকল্পনাগুলোর সমাধান জরুরি
তখন প্রয়োজন আমার সত্যের
আমার জরুরি তাই যাকিছু অবশ্যম্ভাবী
অবশ্যম্ভাবী যাকিছু অবশ্যম্ভাবী
আমি স্পেনকে ডেকে বলবো...
যখন আলেপ্পো অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে।

এই পঙক্তিগুলোতে ফিলিস্তিনকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রাক পরিস্থিতিতে তৈরি হওয়া জটিল ফাসাদের সারাংশ উঠে এসেছে। যেখানে দাঁড়িয়ে কবি ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে গড়ার বিপ্লবী মুহূর্তের স্বরূপ অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন। যখন গৃহবিবাদ সংঘটিত হয়—বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রতিটি মূল কাঠামো ও খুঁটি নড়বড়ে হয়ে ওঠে—তখন মূলত চূড়ান্ত ফাসাদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। একদিকে শত্রুপক্ষের শত্রুতার বয়ান, লুণ্ঠণকারী, হানাদার জায়োনিস্টদের বিচিত্র তৎপরতার কথা অপরদিকে যারা নয়া রাষ্ট্রগঠনের দায় নিয়ে সক্রিয় সেইসব অভ্যন্তরীণ পক্ষগুলোর পারস্পরিক বিবাদ উঠে এসেছে এখানে। এ অবস্থায় একদিকে এক ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের বিশেষ অবস্থার ভাষ্য তুলে আনা হয়েছে। লেবাননের শাবরা-শাতিলায় ফিলিস্তিনীদের ওপর ইজরাইলিদের হামলা ও গণহত্যা পরবর্তী পরিস্থিতির দিকে ইংগিত দিয়েছেন দারভীশ। অপরদিকে এই অবস্থায় দারভীশ নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের বিপ্লবী প্রকল্পের নতুন সত্য ও নতুন অর্থ উন্মোচন করে আনেন।

বিপ্লব-রিহলা-চিন্তা-রাষ্ট্র'র এই চতুর্মাত্রিকতা এই সামগ্রিকতাকে আরো বেশি পরিপূর্ণতা দিয়েছে। যেখানে বস্তুত ফিলিস্তিনের যে ঐতিহাসিকতা বিরাজমান তার সামগ্রিক বয়ানের একটি গতিশীল রূপ এই চতুর্মাত্রিকতা কিংবা এর চক্রাকার কাঠামো। ইতিহাস ও সময়ের ধারণায় এই চক্ররূপ গুরুত্বপূর্ণ। দারভীশের সময়ের ধারণা এবং ফিলিস্তিন-চিন্তা পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে এই কবিতায়। ইতিহাসের এই চক্ররূপ কিভাবে কাজ করে কিংবা তা কিভাবে বোধগম্য হয়ে উঠতে পারে তার একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন বুশ দার্শনিক ও লিটারেরি তাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন (১৮৯২-১৯৪০)। বিশ্বজগাতিক যে সময়ের ধারণা কিংবা ইতিহাস তার তুলনায় বেঞ্জামিন মানুষের ইতিহাসকে ছোট করে এনেছেন সময়ের ধারণাকে আরো বেশি স্পষ্ট করে তোলার জন্য। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ– সাধারণ দৃষ্টিতে সময়ের এই পর্যায়গুলো সরলরৈখিকভাবে (লিনিয়ারলি) যেভাবে বোঝায় যায় তা প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে না।

যাইহোক, ধারণা করা হয়, লেখা-পাঠ-কিংবা চিন্তা যেগুলো সাহিত্য এবং শিল্পের নিবিড় অনুষঙ্গ— এসব বিষয়ে *কনস্টেলেশন* বেঞ্জামিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলাপ। চিন্তা করার কিংবা পাঠ করার ভিন্নধর্মী চিন্তাপদ্ধতি। চিন্তার ভিতরে অনেক ধরনের সৃজনশীল আইডিয়া এবং ধারণা কাজ করে। যে ধারণাগুলো একটি বাহ্যিক আকার (কনফিগারেশন) হিসেবে চিন্তাকে হাজির করে। অথচ চিন্তা যেখানে ধারণাগুলোর ঘটনা হিসেবে পুঞ্জিভূত হয় না। অর্থাৎ ধারণাগুলো তখন ফেনোমেনা () বা ঘটনা হিসেবে চিন্তার ভিতরে থাকে না। যেকারণে দেখা যায়, আইডিয়া, ধারণা-মতাদর্শ আর চিন্তা এক নয়। চিন্তা—একদিকে ধারণা-মতাদর্শ কিংবা আরেকদিকে মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড। চিন্তার যেমন স্বতসিদ্ধ বা ফিতরাতগত ব্যাপার থাকেযা কোনো কাঠামোবদ্ধ বা পদ্ধতিগত (সিস্টেমেটিক) ব্যবস্থা থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করে। যেখানে ঘটনার একটি নৈর্ব্যক্তিক এবং প্রাকৃতিক অবজেক্ট হিসেবে কার্যকর থাকে চিন্তা। সহজভাবে বিষয়টি কিভাবে বোঝা সম্ভব? বেঞ্জামিন এ অবস্থা বোঝাবার জন্য আইডিয়া বা ধারণাগুলোকে রাতের আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সাথে তুলনা করে বুঝাতে চেয়েছেন। এক কথায় বেঞ্জামিন এ ধারণাকে *কনস্টেলেশন* হিসেবে চিহ্নিত করেন।

কনস্টেলেশন বেঞ্জামিনের বিশ্লেষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরি—যা দিয়ে দর্শনের বিবদমান ধারণা ও মতাদর্শিক ব্যবস্থাগুলোর পর্যালোচনা একইসাথে এর বাইরে কিভাবে চিন্তা করা যায় তার ডিসকোর্স হাজির করেন। কনস্টেলেশন শব্দের প্রথাগত অর্থ তারকারাজি বা জ্যোতিষ্কমণ্ডল। কনস্টেলেশন মাত্রই শুধু তারকারাজির অবস্থানগত প্যাটার্ন বা কাঠামোকেই বোঝায় না, বরং কোনো চিন্তা, বস্তু বা ব্যক্তির সামষ্টিক একককেও নির্দেশ করে (গ্রুপ অব থিংকিং, থিংগস অর পিপল)।[৩৮৬] সেকারণে কনস্টেলেশন শব্দটির সাধারণত দুটি অর্থ কাজ করে বা দুইভাবে বোঝা সম্ভব। প্রথমত, কনস্টেলেশন'র একটি অবস্থানগত প্রাকৃতিক ব্যাপার রয়েছে যাতে– রাতের আকাশে তারাগুলোর একটি নিয়মিত বা প্রাকৃতিক কাঠামো ও ধরন কি তা বোঝা যায়। অপরদিকে, এই তারকাগুলো একজন চিন্তক কিবা একজন দর্শকের নজরে কিভাবে হাজির হয়– ধরা দেয়– এবং তার প্রকাশগুলো কেমন তা দিয়ে বোঝা যায়। এই ধাপে এসে নক্ষত্রগুলোর যে চিত্র একজন ভাবুক দর্শক আঁকেন বা প্রকাশ করেন সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের নক্ষত্ররাজির রূপ আর প্রাকৃতিক তারাগুলোর রূপ এক নয়। এখানে দেখা যায়, একজন ভাবুক দর্শক কোনো তারকার রূপ দেখার পর পঞ্চভূজাকৃতির একটি রেখা এঁকে বললেন এটি একটি নক্ষত্র। ত্রিভূজাকৃতির একটি চিত্র এঁকে বললেন এটি আরেকটি নক্ষত্র। কিংবা সপ্তকোণাকৃতির একটি রেখাচিত্র এঁকে বললেন এটি সপ্তর্ষীমণ্ডল– ইত্যাদি। এখানে দেখা যায়, প্রথমটি ন্যাচারাল। দ্বিতীয়টি মানুষের সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞের ফলাফল। তৃতীয়ত, আবার উভয় অবস্থাই (ডুয়াল প্যাটার্ন)– মানে, এর প্রাকৃতিক প্যাটার্ন এবং সৃজনশীল বা উদ্ভাবিত প্যাটার্ন উভয়টিই একজন দর্শক কিংবা ভাবুকের চোখে এবং খেয়ালে উদয় হতে পারে। বস্তুত বেঞ্জামিন এই ক্যাটাগরির মাধ্যমে মানুষ কিভাবে চিন্তা করে কিংবা চিন্তা করতে সক্ষম তা বোঝতে চেয়েছেন। পশ্চিমা দর্শনের ধারাবাহিকতা যেভাবে একটি যুক্তিভিত্তিক কিংবা গাণিতিক পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে গতিশীল

---

[৩৮৬]. চেঙ, ভেনেস, *দি কনসেপ্ট অব কনস্টেলেশন* (অ্যাকাডেমিয়া, চাইনিজ ইউনিভার্সিটি অব হংকং), পৃ. ১-৬। ভিজিট: এপ্রিল ২৮, ২০২২, (56) The concept of constellation | Vennes Cheng - Academia.edu

রয়েছে বেঞ্জামিন মনে করেন, চিন্তা সবসময় এভাবে পদ্ধতিগত উপায়ে কাজ করে না। এখানে বেঞ্জামিনের কনস্টেলেশন থিওরি বা কনসেপ্ট বিশ্লেষণ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং বেঞ্জামিন চিন্তা করার যে প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়েছেন তা কিভাবে কবিতায় কাজ করে তা বোঝাটা জরুরি। আব্দুর রহমান আল শায়খ বেঞ্জামিনের *কন্সটেলেশন* এর মধ্যদিয়ে বরং আইডিয়া বা ধারণা কিভাবে সময়ের ধারণার মধ্যে হাজির তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। একইসাথে হালের রাজনৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতগুলো কি করে কবিতার অন্তর্বাহিত নার্ভ থেকে বিচিত্র অর্থ ও ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারে। বেঞ্জামিনের নক্ষত্রপুঞ্জের ধারণার মধ্যদিয়ে এখানে যে সময়ের চক্র দেখানো হয়, যাতে বর্তমানের সক্রিয়তা, অতীতের ভুল এবং ভবিষ্যতের মুক্তি—সময়ের এই ত্রিধাপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে স্মৃতি সদা বর্তমানই থাকে।[৩৮৭] জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি ইহুদিদের ক্ষেত্রে বেঞ্জামিন এই বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রেও এই বিশ্লেষণ হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলেও তা একইভাবে ঘটে না। বিষয়টি *জপমালা*র সাথে তুলনা করে বোঝা যেতে পারে। যেখানে *জপমালা*র প্রতিটি দানা বা গুটির আলাদা সুতার বুনন রয়েছে। যা আবর্তিত তৃণলতার মতো। কিন্তু একই দানায় বারবার আসলেও প্রতিবারই তার স্মৃতি-ভাব এবং তাকে ঘিরে চিন্তার ধরন একইরকম হওয়া সম্ভব নয়। স্মৃতি বা ইতিহাস দাবি করার মতো ব্যাপারও। জপমালার দানা এবং নক্ষত্রপুঞ্জের উপমা প্রায় কাছাকাছি। যেখানে কালক্রমিক পরিস্থিতিগুলো নক্ষত্রপুঞ্জের মতো যাতে প্রতিটি নক্ষত্রেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা। যে স্মৃতি-ইতিহাস-পরিস্থিতি মানুষের নিজস্ব। জপমালার প্রতিটি দানার মতো। যেখানে প্রতিটি দানা গোনার অভিজ্ঞতা হলো ইতিহাসের প্রতিক্রিয়া এবং সংবেদনশীলতার মধ্যদিয়ে যাওয়া। প্রতিটি দানা পার হওয়ার মানে হলো ইতিহাসের একটি ধাপকে টপকে যাওয়ার মতো। কিন্তু এই একই দানার পুনরায় ফিরে আসা এবং সেই দানা বা ধাপকে পুনরায় টপকে যাওয়ার বিষয়টি নতুন অর্থোৎপাদনের কিংবা ভাবুকতার। বিষয়টি আসলে কি?

> It's not that what is past casts its light on what is present, or what is present its light on what is past; rather, image is that wherein what has been comes together in a flash with the now to form a constellation. In other words, image is dialectics at a standstill. For while the relation of the present to the past is a purely temporal, continuous one, the relation of what-has-been to the now is dialectical: is not progression but inlage, suddenly emergent. -Only dialectical images are genuine images (that is, not

---

৩৮৭. আল শায়খ, আব্দুর রহমান,

> archaic) ; and the place where one encounters them is language.[388]
>
> এমন নয় যে, যেটা অতীত সেটা যা বর্তমান তার উপর আলো ফেলে কিংবা যেটা বর্তমান সেটা যা অতীত তার উপর আলো ফেলে। বরং ইমেজ হলো তাই, যেখানে যেটা ঘটে গেছে সেটা একত্র হয়ে এখন একটি নক্ষত্রমণ্ডল (কনস্টেলেশন) গঠন করে। অন্য কথায়, ইমেজ হলো একটি স্থিরাবস্থার মধ্যে ঘটমান দ্বান্দ্বিক অবস্থা। যেহেতু, অতীতের সাথে বর্তমানের সম্পর্কটি সম্পূর্ণ সাময়িক এবং একইভাবে ধারাবাহিকও। যেটা ঘটে গেছে এখনকার সাথে তার সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক: এই সম্পর্কটা অগ্রগতির নয়। বরং অন্তর্নিহিত। আবার আকস্মিকভাবে এটি উত্থানময়ও বটে। ফলে শুধু দ্বান্দ্বিক ইমেজগুলোই আসল ইমেজ (যেটি পুরনো ও সেকেলে নয়)। আর যে জায়গাটায় কেউ এসবকিছুর মুখোমুখি হয় সে জায়গাটা হলো– ভাষা।

ফিলিস্তিনের অভিজ্ঞতাগুলো দারভীশের জীবনে এভাবেই ঘটে চলেছিল। কিংবা পুরো ফিলিস্তিনের চালচিত্র এভাবেই ঘটে চলেছে। দারভীশের রিহলা বা তার মিশন ও অভিযাত্রার পুরো চিত্র বেঞ্জামিনের কনস্টেলেশনের ধারণা, দেলুজের রিপিটিশনের ধারণা যেটি নক্ষত্রপুঞ্জ এবং তসবিমালার উপমার ভিতর দিয়ে স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বেঞ্জামিনের কনস্টেলেশন—জ্যোতিষ্কমণ্ডল, নক্ষত্রচক্র, জপমালা বা তসবিহদানা কিংবা ফিলিস্তিনের ইতিহাসকে নতুন চিন্তায় কিভাবে ধারণ করা যায় তার একটি অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে দারভীশের এই পঙক্তিগুলোতে...

لم تكن لنا حاجة للأساطير إلا لتف سر العلاقة بين القمر
والدورة الشهرية، وبين الشمس ودورة الفصول، وإضفاء
السحر على الكلام في ليالي الشتاء الطويلة، وتدريب
الوحوش على طاعة النغم[389]

আমাদের নেই প্রয়োজন পুরাণের-মিথের,
কেবল প্রয়োজন চাঁদ ও মাসিক চক্র–সূর্য ও ঋতুচক্রের
সম্পর্কের রহস্য উন্মোচনের আর
শীতের দীর্ঘ রজনীতে কথা বলার মোহনীয় যাদু যোগ করার
এবং সেসব প্রাণীদের শিক্ষণের যাতে তারা
অনুসরণ করে সুর।

---

৩৮৮. বেঞ্জামিন, ওয়াল্টার, *দি্য আর্কেডিজ প্রজেক্ট* (লন্ডন: হার্ভাড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৪৬২।

৩৮৯. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী হাদরাহ আল গিয়াব* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

كم سَنَهْ
أغريتني بالمشي نحو بلاديَ الأولى
وبالطيران تحت سمائيَ الأولى
وباسمك كنتُ أَرفعُ خميتي للهاربين من التجارة والدعارة
والحضارة كَمْ سَنَهْ
كُنَا نَرُشُّ على ضحايانا كلام البرقِ:
بعد هُنَيْهَةٍ سنكون ما كنا وما سنكونُ
إمَّا أن نكون نهارك العالي
وإمَّا أن نعود إلى البحيرات القديمة كَمْ سَنَهْ
لم تسمعيني جَيِّداً لم تردعيني جيداً لم تحرميني من فواكهكِ
الجميلةِ لم تقولي : حين يبتسم المخيَمُ تعبس المدن الكبيرة
كم سَنَهْ
قلنا معاً: أنا لا أَشاءُ , ولا تشائين. اتفقنا كُلُّنا في البحر
ماءٌ . كم سَنَهْ
كانت تُنَظِّمنا يَدُ الفوضى:
تعبنا من نظامِ الغازِ,
من مطرِ الأنابيب الرتيبِ ,
ومن صعودِ الكهرباء إلى الغُرَفْ...
حريتي فوضاي. إني أَعترفْ
وسأعترفْ
بجميع أَخطائي , وما اقترفَ الفؤادُ من الأَماني
ليس من حَقِّ العصافير الغناءُ على سرير النائمين ,
والإيديولوجيا مهنة البوليس في الدول القويةِ :
من نظام الرقِّ في روما
إلى مَنْع الكحولِ وآفةِ الأحزاب في المُدُن الحديثةِ
كَمْ سَنَهْ[390]

কতো বছর,
প্রথম স্বদেশে হেঁটে যেতে তুমি প্ররোচিত করেছিলে
প্রথম আকাশের নিচে বিমানে উড়ে যেতে

৩৯০. দারভীশ, মাহমুদ, আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২, ২০০৫, পৃ. ৩৫৪।

তোমার নামে কতো যে ঘোমটা তুলে রাখতাম– ব্যবসা,
পতীতাবৃত্তি আর সভ্যতা থেকে পলায়নকারীদের জন্য
কতো বছর,
আমাদের হত্যাকাণ্ডগুলোর ওপর
ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতাম বজ্রোন্মত্ত ভাষা;
কিছুক্ষণ পর আমরা যা ছিলাম তাই হয়ে যাবো
এবং শিগগির আমরা হয়ে যাবো
আমরা হয়তো হয়ে যাবো তোমার ঊর্ধ্ব দিন
হয়তো আমরা ফিরে আসবো প্রাচীন হ্রদের কাছে
কতো যে বছর
ঠিকমতো আমার কথাই শুনতে না, জবাব দিতে না
ভালো করে আমার চোখের, হয়তো তোমার সুন্দর সুন্দর ফল থেকে
আমাকে ঠিক বঞ্চিত করতে
বলতে না:
যখন হাসবে তাঁবু তখন বড় শহরগুলো ভ্রুকুটি করবে
কতো বছর!
আমরা একসাথে বলতাম:
আমি এবং আমরা কিছুই চাই না, সমুদ্রে আমাদের সবাইকে এক করেছে
পানি। কতো বছর!
বিশৃঙ্খলার হাত সংগঠিত করেছিল আমাদের:
গ্যাস ব্যবস্থা, একঘেঁয়ে পাইপের বৃষ্টি, রুমে রুমে বিদ্যুতের আরোহনে
ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা।
আমার স্বাধীনতা মানে নৈরাজ্য
আমি জানি, আমি স্বীকার করি আমার আসমস্ত ভুল
হৃদয় তৈরি করে যে আশাবাদ
তাতে চড়ুইদের অধিকার নেই নিদ্রায় শায়িতদের বিছানায় গান গাওয়া
শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোয় আদর্শবাদ বস্তুত পুলিশের পেশাগত দায়:
যেমন রোমের দাশব্যবস্থা, আধুনিক শহরগুলোর
অ্যালকোহল নিষিদ্ধকরণ এবং পার্টির কুপ্রভাব

কিংবা...

نامي قليلا
الطائراتُ تطيرُ، والأشجارُ تهوي،
والمباني تخبز السُكّانَ ' فاختبئي بأُغنيتي الأخيرةِ، أو بطلقتيَ

الأخيرةِ، يا ابنتي
وتوسّديني كنتُ فحماً أَم نخيلا
نامي قليلا
وتَفَقَّدي أزهارَ جسمكِ،
هل أُصيبتْ؟
واتركي كفِّي, وكأسَيْ شاينا, ودعي الغَسيلا
نامي قليلا
لو أَستطيع أَعدتُ ترتيب الطبيعةِ:
ههنا صفصافةٌ... وهناك قلبي
ههنا قَمَرُ التردُّد
ههنا عصفورةٌ للانتباهِ
هناكَ نافذةٌ تعلِمكِ الهديلَ
وشارعٌ يرجوكِ أن تَبْقَي قليلا
نامي قليلا[391]

একটু ঘুমিয়ে নাও
বিমানগুলো ওড়ছে, নুয়ে পড়ছে বৃক্ষরা
ভবনগুলো কাঁপিয়ে তুলছে তার অধিবাসীদের
অতএব বৎস্য, লুকিয়ে যাও আমার অন্তিম গানে কিংবা শেষ বুলেটে
বালিশে লুকাও আমায়, আমি তো কেবল একটুকরা অঙ্গার কিংবা
খর্জুর বৃক্ষ।
একটু ঘুমিয়ে নাও
খুঁজে দেখো তোমার শরীরের সমূহ ফুল
তারা কি পেয়েছে ঘাত?
ছেড়ে দাও আমার হাত, চায়ের পেয়ালা
ছেড়ে দাও ওয়াশিং মেশিন
একটু ঘুমিয়ে নাও
যদি পারতাম ফিরিয়ে আনতে
প্রকৃতির বিন্যাস:
এখানে উইলো বৃক্ষের সারি– এখানে আমার হৃদয়
পুনপুন চাঁদ এখানে
এখানে ধ্যানের পাখি চড়ুই
এখানে আছে জানালা এমন তোমাকে জানান দেয়
বাকুম বাকুম কবুতরের ডাক

---

৩৯১. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৪৬।

এখানে আছে সড়ক– দয়া করে একটুখানি থামো
খানিক নাও ঘুমিয়ে।

কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে পাঠ করা হলো। কিছুটা দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলো। বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতা পরিষ্কার করে তোলার জন্য উদ্ধৃতির দৈর্ঘ্য জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রথম পঙক্তিগুলো লক্ষ করার মতো। শুধু পুরাণ কিংবা ইতিহাসের সত্যচিহ্নগুলোবু পাঠই যথেষ্ট নয় বরং তার সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা কেন জরুরি হয়ে পড়ে কবির উপলব্ধিতে তা ধরা পড়ে। একটি নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর দূরপ্রাচীনতা এবং তার সাড়ম্বর ইতিহাস থাকার পরও তার বেদখল হয়ে যাওয়া সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার পতিত দশার কারণগুলো নির্ণয় করা অপরিহার্য। মিথ কিংবা ইতিহাস দিয়ে যতদূর যাওয়া যায় তার সত্যাসত্যের অভিজ্ঞান লাভ করা যায় পুরাণের রূপক এবং প্রতীকী নিয়মগুলোর ব্যাখ্যার মধ্যদিয়ে। একটি নয়া জাতিগঠনের ডিসকোর্স গড়ে তোলার প্রস্তুতির মুহূর্তে পুরাণের আশ্রয় ও এর কন্টেক্টচুয়ালাইজড ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধু তা দিয়ে খুব বেশি গভীরে যাওয়া যায় না—পুরাণকে কন্টেক্টচুয়ালাইজ করার মাধ্যমে ডিসকোর্সকে লম্বালম্বিভাবে এগিয়ে নেয়া যায় বটে। কিন্তু গভীরতার জন্য দরকার চিন্তাশীল অবলোকন। চাঁদ এবং মাসিক চক্র– কিংবা সূর্য ও ঋতুচক্রের রহস্যময়তা পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন দারভীশ। এই সম্পর্কগুলো শুধু পর্যবেক্ষণ কিংবা অবলোকনের নয়– এর মধ্যদিয়ে নতুন সত্য অথবা কোনো রহস্য উন্মোচন করতে বলার মধ্যদিয়ে বরং আসলে তিনি চিন্তা ও দেখার অনুলীলনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। বেঞ্জামিন যেমন কনস্টেলেশনের কথা বলেছেন, দেলুজ যেমন রিপিটিশনের কথা বলেছেন এসবকিছুর একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পরিষ্কার করে তোলা যায় এখানে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির পঙক্তিগুলোতে ফিলিস্তিনকেন্দ্রিক একটি সময়ের স্মৃতিকাতরতার কথা উঠে এসেছে। এই স্মৃতিকাতর বর্ণনার মাধ্যমে একইসাথে ফিলিস্তিনের সমকালীন দুরবস্থার চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি তা থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ার কথাও উঠে এসেছে। কতো বছর!/বিশৃঙ্খলার হাত সংগঠিত করেছিল আমাদের:/
গ্যাস ব্যবস্থা, একঘেঁয়ে পাইপের বৃষ্টি, রুমে রুমে বিদ্যুতের আরোহনে/ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা।/আমার স্বাধীনতা মানে নৈরাজ্য/– এ চিত্রগুলো বিশেষকিছু নয়। কিন্তু বিশেষ হলো এর কাব্যিক মূল্য। এ কারণে যে, এখানে যেমন নেতি আছে তেমনি আছে ইতি। একটি দুরবস্থা কিভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ্য করতে পারে তার কবিতাগত বর্ণনার মূল্য অনুধাবন করা যায় এখানে। তাই কবি বলেছেন, ‘আমি জানি, আমি স্বীকার করি আমার আসমস্ত ভুল/
হৃদয় তৈরি করে যে আশাবাদ/ তাতে চড়ুইদের অধিকার নেই নিদ্রায় শায়িতদের বিছানায় গান গাওয়া/।
এই পঙক্তিগুলোও বিশেষ হয়ে আছে। প্রসঙ্গত, কবি কিঞ্চিৎ ইজরাইলের দিকে মৃদুভাবে আঙুল তুলেছেন কবিতার ভাষায়। যেখানে কবি সবসময় চড়ুইকে ফিলিস্তিনী জনগণের রূপক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এখানে দেখা যায় সেই রূপক ভেঙে ফেলেছেন কবি। খোদ সেই চড়ুই হয়ে

উঠেছে দখলদার। উপনিবেশী হানাদার– যাকে তিনি হালকা করে ধমক দিয়েছেন। বস্তুত দারভীশের এই কবিতাংশটি থেকে যে বিষয়টির কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, তা হলো, কোনো একটি বিষয় বা বস্তুকে মানুষ সবসময় একইভাবে একইঅর্থে দেখে না। চড়ুইকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা চড়ু ই যেভাবে ফিলিস্তিনের সংস্কৃতিতে বিধৃত হয়ে আসছে– এমনকি দারভীশের 'আছাফিরু বিলা আজনিহা' (ডানাবিহীন চড়ুই) প্রথম কাব্যগ্রন্থে চড়ুইকে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর রূপক হিসেবে দেখানো হয়েছে– কবি নিজেই সেই রূপক সেই দৃষ্টান্ত পাল্টে দিয়েছেন। এ বিষয়টিও যেমন বেঞ্জামিনের কনস্টেলেশন দিয়ে বোঝা যায় তেমনি দেলুজের রিপিটিশন দিয়েও বোঝা সম্ভব।

তৃতীয় উদ্ধৃতির পঙক্তিগুলোতেও একইভাবে চিন্তা ও মগ্নতার দিকে নিয়ে গেছেন কবি। প্রকৃতির বিন্যাস এবং পুনঃপুন চাঁদ– চন্দ্রচক্র বা চাঁদের আবর্তনকে ঘিরে কবির দেখার ও উপলব্ধির জগত ধরা দেয় এই কবিতাংশটিতে। নিপীড়িত ফিলিস্তিনের কথা বলতে বলতে কবি তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর উপায়গুলো কি হতে পারে বাতলে দিতে চান। বারবার ঘুমানোর কথা বলে কবি ঈষৎ সাবধান হওয়ার কথা বলছেন। বিষয়দুনিয়ার অপরাপর ব্যস্ততাগুলো এড়িয়ে তার মধ্যেই থেমে থেমে কিছুটা ভাবার অবকাশ নিতে বলছেন কবি। কবিতা কি করে চিন্তার উপায় হিসেবে কিংবা একটি জাতির গড়ে ওঠার বাহন কিংবা নির্দেশক হয়ে উঠতে পারে দারভীশ তার নজির রাখার কোশেশ করেছেন। যাইহোক, দারভীশ এর মধ্যদিয়ে বস্তুত চিন্তা ও ভাবনার অপরিহার্যতা একটি জাতিগঠনের প্রারম্ভকালে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ সেদিকে নানাভাবে নানান দৃষ্টান্ত হাজির করে বুঝিয়ে দিতে চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

দারভীশের বিপ্লব-ধারণা-রিহলা-রাষ্ট্র বিষয়ে যে আলোচনা চলমান তা নোমেডিজমের মাধ্যমেও বোঝা সম্ভব। জিল দেলুজ নম্যাডিজমের মাধ্যমে যে চিন্তা-পদ্ধতির কথা বয়ান করেছেন—দারভীশের রিহলা বা তিরহালের সাথে এর সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। দেলুজের প্রস্তাবিত মডেলে রয়েছে নমেডিজমের ধারণা। নমেডিজম মানে, এক জায়গায় সবসময় বাস না করা। ঘোরাঘুরি করা, স্থানান্তরিত হওয়া, নির্বাসিত হওয়া, এক স্থান থেকে অপর স্থানে ভ্রমণ করা, একটি অবস্থা থেকে কিংবা একটি অবস্থা ত্যাগ করে অপর অবস্থায় নিজেকে যুক্ত করা, ইত্যাদি। কোনো জায়গায়–কোনো বিষয়ে– কিংবা কোনো বস্তু বা চিন্তায় স্থির না থাকা। কিন্তু এই ঘোরাঘুরি কিংবা যাযাবরপনার সাথে নোমেডিজমের কী সম্পর্ক? জিল দেলুজ নোমেডিজম বলতে কি বুঝিয়েছেন আভিধানিক অর্থের সাথে কিঞ্চিত মিল নিশ্চয়ই রয়েছে। কারণ, একটি অবস্থার অবসান ঘটিয়ে অন্যতরো অবস্থায় ফিরে আসা। একটি ধারণা থেকে বেরিয়ে অপর কোনো চিন্তায় মগ্ন হওয়া। একটি অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে অপর একটি অবস্থায় অবগাহন করা। যা বস্তুত নমেডোলজির নামান্তর।

দেলুজের চিন্তার বিস্তার ও ধরন অনুযায়ী, এক কথায় কিংবা খুব সংক্ষেপে নমেডিজম কি তা তুলে ধরা কঠিন। দেলুজ বস্তুত বিদ্যমান রাষ্ট্রের পর্যালোচনা করতে গিয়ে নমেডিজম শব্দের অবতারণা করেছেন। নমেডিজম কিংবা নমেডোলজির ধারণায় প্রথমত টেরিটোরি কিংবা টেরিটোরিয়ালাইজেশন এবং সেই রাষ্ট্রের ভিতরে থেকে একইভাবে তার বিপরীতে ওয়ার মেশিন কিংবা

ডিটেরিটোরিয়ালাইজেশনের মতো কিছু ক্যাটাগরির মুখোমুখি হতে হয়। টেরিটোরি–এমন একটি স্থান বা পরিসরের চিত্র যা আইন, আইনি কাঠামো কিংবা বিদ্যমান নানা মতাদর্শিক ধারণা দিয়ে নির্ধারিত। টেরিটরি মানে একটি সীমায়িত পরিসর–যার স্থিতিশীল এবং নির্ধারিত সীমান্ত রয়েছে– এই সীমান্ত নির্ধারণ বা নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার মানে বাইরের বা অপর সীমানা থেকে ভিতরের বা নিজের সীমানাকে আলাদা করে ফেলা। বস্তুত টেরিটরি আইন–শৃঙ্খলা কিংবা ক্ষমতা উৎপাদনকারী একটি উপায় (মেশিন বা ডিভাইস) যা আরো কতোগুলো উপাদান নিয়ে (প্রপার্টিজ) কাজ করে। টেরিটরি যখন তার বর্ডার দাবি করে কিংবা নির্ধারণ করে নেয় তখন তার পাল্টা সীমানাও থাকে। কিন্তু সীমানা দাবি করার অর্থ হলো, আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করা। ফলে টেরিটরির যে যৌক্তিক কাঠামো তা কতগুলো চিহ্ন কিংবা চিহ্নব্যবস্থা নিয়ে গড়ে ওঠে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা হয়ে ওঠে যা অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং বহির্করণের একটি নির্ণায়ক হাতিয়ার হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে সক্ষম। অর্থাৎ চিহ্নিতকরণের একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া (ডায়ালেক্ট অফ রিকগনিশন) হিসেবে কাজ করে। ভূরাজনৈতিক যে পরিসরের জন্ম দেয় এমন টেরিটরি তাতে আইন, বিচার ও শৃঙ্খলাজনিত এসেনসিয়াল ক্ষেত্রও চিহ্নিত হয়ে ওঠে। একইভাবে ভ্রূণতাত্ত্বিকতা কিংবা জৈব-রাজনৈতিকতার কারণে এটি এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলে যা তার সম্পত্তির অধিকার কিংবা স্বত্বের আইনি প্রক্রিয়াও তৈরি করে। এমনকি এটি নৈতিকতার ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে তোলে যা তার ব্যক্তির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। যেটি মূলত (স্মুথ স্পেস) বা অবাধ ও মুক্ত পরিসরের বিপরীত। সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এক ভূখণ্ড– যেখানে নাগরিকতার সার্বিক তৎপরতা আইনানুগ। যেখানে তার দূরত্ব, বিচলন, পরিভ্রমণসহ সকল কার্যক্রম, আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা দৃশ্যত নির্ধারিত ও স্থিরকৃত। যেখানে একজন নাগিরক তার বিদ্যমান রাষ্ট্রের সীমান্ত অতিক্রম করে বিশ্বের যেকোনো ভূখণ্ডেই চলে যেতে পারে–ঘুরে আসতে পারে–এমনকি অপর কোনো রাষ্ট্রে অভিবাসিতও হতে পারে। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই যতোক্ষণ না রাষ্ট্রের নির্দেশিত বৈধতার সীমারেখা কিংবা আইনি কাঠামোর কোনো ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম ঘটে।

উপরের আলোচনায় রাষ্ট্রের ক্ষমতার মর্মগত, ধারণাগত ও ব্যবহারিক চরিত্র বা সক্রিয়তার কথা দেলুজ তুলে ধরেছেন। এভাবে তুলে ধরার মধ্যদিয়ে দেলুজ রাষ্ট্রসম্পর্কিত বোঝাবুঝিগুলোর সারাংশ কি তা বয়ান করেন। রাষ্ট্র এবং ক্ষমতা সম্পর্কিত দর্শনের কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত যে বোঝাবুঝি-পর্যালোচনার ধারা ক্রমবিকশিত হয়েছে এভাবে দেখাটা বস্তুত তারই অংশ মাত্র। যেটি বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলোর স্বরূপ। দার্শনিক দিক থেকে রাষ্ট্র সম্পর্কিত এমন বোঝাবুঝিতে দেলুজ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। দেলুজ মনে করেন, অন্যভাবেও রাষ্ট্রকে দেখা যেতে পারে। হতে পারে নাগরিকতার ভিন্ন বয়ান ভিন্ন পর্যালোচনা– যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামো, আইনি প্রক্রিয়া ও বৈধতার সীমারেখাগুলোর মধ্যে না গিয়ে না অনুসরণ করে নাগরিকতার একটি প্রকাশ ও উন্মেষ ঘটতে পারে। কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের আইনি কাঠামো ও ক্ষমতার প্রক্রিয়াগুলোর অনুসরণ না করে সীমানা অতিক্রম করে চলে যেতে পারে। তার আইন ভঙ্গ করে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। ফলে যেহেতু রাষ্ট্রের বিবিধ ভাগ-বিভাজন, সীমা-পরিসীমাজনিত পরিসরগুলো বৈষম্যমূলক আইন ও ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত– এই

জায়গাগুলোকে লঙ্ঘন করা কিংবা চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব।[৩৯২] এই লঙ্ঘন এবং চ্যালেঞ্জের মধ্যদিয়ে ডিটেরিটোরিয়ালাইজেশনের ঘটনা ঘটে। রাষ্ট্র এবং তার টেরিটোরির অবসান ঘটে যায়। এটি একটি সীমান্তের বিসীমান্তকরণের ঘটনা। একটি আইনি ও ক্ষমতার পরিবর্তনের ঘটনা। সেকারণেই দেলুজ এ অবস্থাকে নমেডিজম হিসেবে দেখছেন। একইসাথে যে প্রক্রিয়াগুলো কিংবা যারা এমন টেরিটোরি, আইন ও ক্ষমতা-কাঠামোগুলো চ্যালেঞ্জ করে কিংবা প্রতিরোধ গড়ে তোলে দেলুজ তাদের ওয়ার মেশিন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩৯৩] অন্যঅর্থে, টেরিটরির বিপরীতে কিংবা মুখোমুখি হয়ে বিদ্যমান টেরিটোরি ভাঙার এই যে প্রক্রিয়া কিংবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব তা মূলত তার কর্তাসত্তা (সাবজেক্টিভিটি) নির্ণয় করার মাধ্যমেই তৈরি হয়।[৩৯৪] এই কর্তাসত্তারই উদ্বোধন ঘটে একজন নোমেডের ভিতর। দেলুজ বলেন,

> Even among the gods, each has his domain, his category, his attributes, and all distribute limits and lots to mortals in accordance with destiny. Then there is a completely other distribution which must be called nomadic, a nomad nomos, without property, enclosure or measure.[395]
>
> এমনকি দেবতাদের মধ্যে যেখানে প্রত্যেকের তার নিজের ডোমেইন থাকে, ক্যাটাগরি থাকে, বিশেষ গুন-চারিত্র্য থাকে–এসব সীমাগুলোকে ভাগ করে দেয় এবং নিয়তি অনুযায়ী ভাগগুলোর অবসানও আছে। ফলে পুরোপুরি ভিন্নরকম একটি ভাগ-বণ্টনও রয়েছে যেটাকে অবশ্যই নমেডিক বলতে হবে– যা সম্পত্তিবিহীন– (সম্পত্তি মানে যা আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত কিংবা পরিমাপ করা যায়) একজন নোমেড।

দেলুজ তার ডিফারেন্স এন্ড রিপিটিশন গ্রন্থে দেখান, ডোমেইন– বা মালিকানা স্বত্বের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় টেরিটরি। টেরিটরির কারণে তৈরি হয় বিপরীত সাবজেক্টিভিটি।[৩৯৬] কোরণে দেলুজ মনে করেন,

---

[৩৯২]. বি ইয়ং, ইউজিন, গ্যারি জেনেস্কো এবং জ্যানেল ওয়াটসন, *দি দেলুজ এন্ড গোয়াত্তারি ডিকশনারি* (লন্ডন: ব্লুমসবিউরি, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৪।
[৩৯৩]. দেলুজ, জিলস, ফেলিক্স গুয়াত্তারি, *আ থাওজ্যান্ড প্ল্যাটিয়াস: ক্যাপিটালিজ এন্ড সিজোফ্রেনিয়া* (মিনেসোটা: ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা প্রেস, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ.৩৫১-৪২২।
[৩৯৪]. অরোরা, সাইমন, *টেরিটোরি এন্ড সাবজেক্টিভিটি: দি ফিলসফিক্যাল নম্যাডিজম অব দেলুজ এন্ড গুয়াত্তারি* (মিনেরবা, অ্যান ওপেন একসেস জার্নাল অব ফিলোসফি, জানুয়ারি-১৮, নভেম্বর ২০১৪), পৃ. ১-২৬। (ভিজিট: এপ্রিল-৩০, ২০২৩), Minerva: Online Journal of Philosophy (Current Volume) (ul.ie)
[৩৯৫]. দেলুজ, জিলস, *ডিফারেন্স এন্ড রিপিটিশন*, ৩৬
[৩৯৬]. দেলুজ, জিলস, *ডিফারেন্স এন্ড রিপিটিশন*, ৫৪।

> The territory is first of all the critical distance between two beings of the same species: Mark your distance. What is mine is first of all my distance; I possess only distances. Don't anybody touch me, I growl if anyone enters my territory, I put up placards. Critical distance is a relation based on matters of expression. It is a question of keeping at a distance the forces of chaos knocking at the door.[397]

> টেরিটোরি হলো প্রথমত একই প্রজাতির দুটি সত্তার মাঝে বিদ্যমান সূক্ষ্ম/ক্রিটিক্যাল দূরত্ব: আপনি আপনার দূরত্ব চিহ্নিত করুন– যেটি আমার সেটিই আমার সবধরনের দূরত্বের প্রথম দূরত্ব। আমি শুধু আমার দূরত্বের অধিকার রক্ষা করি। কেউ আমাকে ছোঁবে না। যদি কেউ আমার সীমানায় প্রবেশ করে তবে রাগে চিৎকার দেবো এবং পতাকা উঠাবো। ক্রিটিক্যাল দূরত্ব হলো একটি সম্পর্ক– যেটি অভিব্যক্তি প্রকাশের বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে। এটি হলো বিবাদ সৃষ্টিকারী যে শক্তিগুলো দরোজায় কড়া নাড়বে এমন শক্তিগুলোকে একটি নির্ধারিত দূরত্বে ধরে রাখা।

এই স্বত্ব ব্যাপারটি তৈরি হয় সাবজেক্টিভিটির ফলাফল হিসেবে– যেখানে ডোমেইনের কারণে তার ক্ষমতা থাকতে হবে কিংবা ক্ষমতা ব্যাপারটি অপরিহার্য। যার প্রধান প্রবণতা হলো টেরিটরির সীমানা এবং প্রপার্টি রক্ষা করা। দ্বিতীয় প্রবণতা হলো যথা সম্ভব সীমানার সম্প্রসারণ। কাজে যখন টেরিটরির ধারণা সাবজেক্টিভিটির ফলে তাতে দুটি সত্তা নৈর্ব্যক্তিকভাবে তৈরি হবে– একটি, আত্মরক্ষামূলক এবং প্রতিরক্ষামূলক। দ্বিতীয়টি, আক্রমণাত্মক। কাজে টেরিটরির ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি সেকারণে নম্যাডিক ইস্যু।[৩৯৮]

> It is to fabricate a beneficent God to explain geological movements. In a book, as in all things, there are lines of articulation or segmentarity, strata and territories; but also lines of flight, movements of deterritorialization and destratification.[399]

---

৩৯৭. দেলুজ, জিলস, ফেলিক্স গুয়াত্তারি-১৯৮৭, পৃ. ৩১৯।
৩৯৮. অরোরা, ১-২৬
৩৯৯. জিল দেলুজ, গোয়াত্তারি-১৯৮৭, পৃ. ৩।

ভূতাত্ত্বিক গতিবিধিগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য একজন কল্যাণময় ঈশ্বরকে গড়ে তুলতে হয়। একটি বইয়ে সবকিছুর মতোই আর্টিকুলেশন কিংবা সেগমেন্টারিটির রূপরেখা, স্তর এবং সীমান্ত রয়েছে। এমনকি উড্ডয়নের পথরেখা, ডিটেরিটোরিয়ালাইজেশন এবং আবহাওয়ার পরিমিশ্রণগত পরিবর্তন ও গতিপথও রয়েছে।

বলপ্রয়োগমূলক ক্ষমতার সামনে মাথা নত না করে সমুখ জায়গাগুলোতে সামনে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই চালিয়ে যাওয়াই হলো ওয়ার মেশিন কিংবা নমেডিজম। নম্যাডিজম যেখানে চিন্তার এমন এক উপায় যা রাষ্ট্র ও ক্ষমতা সম্পর্কিত আইনি বা বৈধতা-অবৈধতার সীমা-পরিসীমাগুলোর ব্যাপারে সজাগ করে তোলে। যাতে নম্যাডিক কর্তাসত্তাকে নেতৃত্বের জন্য গড়ে তোলে। দারভীশের নিচের কথাগুলো এ প্রসঙ্গে ভাবা যাক...

كَمْ كنا نحبُ الأزرقَ الكحليَّ لولا ظلنا المكسور فوق البحرِ,
كَمْ كن نُعِدُّ لشهرِ أيلولَ الولائمَ
عَمَّ تبحث يا فتيَّ في زورق الأوديةِ المكسورِ ؟
عن جيشٍ يحاربني ويهزمني فانطق بالحقيقةِ ثم أسأل : هل أكونُ مدينةَ الشعراء يوماً؟
عَمَّ تبحث يا فتىً في زورق الأوديسةِ المكسورِ؟
عن جيش أُحاربهُ وأهزمهُ,
وعن جُزُرٍ تُسمِّيها فتوحاتي , وأسأل : هل تكون مدينةُ الشعراء
وَهْمَا؟
عَمَّ تبحث يا فتيِّ في زورق الأوديسةِ المكسور عَمَّ؟
عن موجةٍ ضيعتها في البحرِ
عن خاتَمْ لأُسيِّجَ العالمْ بحجود أُغنيتي
وهل يجدُ المهاجر موجةً ؟
يجد المهاجر موجةً غرقتْ ويُرجعها مَعَهْ
بحر لتسكن ’ أم تضيعْ
بحلا لأيلولَ الجديدِ أم الرجوع إلى الفصول الأربعَهْ
بحر أمامك, فيك بحرٌ من ورائكَ
تفتح الموجَ القديمَ : وُلدتُ قرب البحر من أمٍّ فلسطينينةٍ وأبٍ
أراميِّ . ومن أمٍّ فلسطينيةٍ وأبٍ عروبيِّ . ومن أمٍّ
ويُحررون جمالهم مني...
أنا الحجر الذي شدَّ البحار إلى قُرون اليابسهْ
وأنا نبيُّ الأنبياءِ
وشاعرُ الشعراءِ

منذ رسائل المصريِّ في الوادي إلى أشلاء طفل في شاتيلا
أنا أوَّلُ القتلى وآخر مَنْ يموتْ
إنجيلُ أعدائي وتوراةُ الوصايا اليائسهْ
كُتِبَتْ على جسدي
أنا ألفٌ ' وباءٌ في كتاب الرسم '
يشبهني ويقتلني سوايْ
كُلُّ الشعوب تعوَّدَتْ أن تدفن الموتى بأضلاعي
وتبني معبداً فيها
وترحلُ عن ثرايْ
وأنا أضيقُ أمام مملكتي
وَتَتَّسِعُ الممالك فيَّ,
يسكنني ويقتلني تزوَّجت أمي,
وأمي لم تكن إلاّ لأمي
خصرها بحرٌ ذراعاها سحابٌ يابسٌ
ونُعَاسُها مطرٌ ونايْ
وأنا أفيض أمام أغنيتي
وتحبسني خناجرها
يؤاخيني ويقتلني سوايْ
....وأنا نشيدُ البحرِ.[400]

আমরা কতো যে ভালোবাসতাম আকাশী রঙ, যদি সমুদ্রের উপর আমাদের ভঙ্গুর ছায়া না থাকতো
সেপ্টেম্বরের উৎসবগুলোর জন্য আমাদের ছিলো কতো যে আয়োজন
বৎস্য, এই ভগ্ন উপত্যকার নৌযানগুলোতে কতোটা খুঁজে বেড়াও–
এমন সৈনিক আমার সাথে যে যুদ্ধ করে আমাকে পরাজিত করে? আমি সত্যের সাথে কথা বলি–প্রশ্ন করি,
একদিন কি সত্যি আমি কবিদের শহর হয়ে ওঠবো?
তুমি কি হে বৎস্য সন্ধান করে দ্যাখো সেই যোদ্ধা ওডেসির ভাঙা নৌকায়
যার সাথে আমি লড়াই করি– যাকে পরাজিত করি
সেই দীপপুঞ্জ যার নাম দিয়েছিলে আমার বিজয়গাথা–প্রশ্ন করি তবে,
তুমি হতে পারো একদিন কবিদের শহর?
এবং তারা?

৪০০. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান. আল আ'মালুল উলা*-২. ২০০৫. পৃ. ৩৮৪।

তুমি কী খুঁজে বেড়াও ওডেসির ভাঙা নৌকায় হে কিশোরী– কী খোঁজো?
সেই তরঙ্গ আমি হারিয়েছি যা সমুদ্রে?
সেই আংটি পুরো বিশ্ব যাতে ঘিরে ফেলি আমার গানের অস্বীকারে
মোহাজির কি খুঁজে পায় সেই তরঙ্গ
মোহাজির খুঁজে পায় ডুবে যাওয়া সেই তরঙ্গ– উদ্ধার করে নিয়ে আসে মোহাজির
সমুদ্র কি তাই যাতে সঙ্গে নিয়ে বসত করো নাকি তাহায় তুমি হারিয়ে যাও?
নতুন সেপ্টেম্বরে অবসান হবে নয়তবা ফিরে যেতে হবে চার ঋতুর কাছে
সমুদ্র তোমার সমুখে– তোমার ভিতরে সমুদ্র– সমুদ্র তোমার আড়ালে
তুমি খুলে দাও প্রাচীন তরঙ্গ–
আমি তো জন্মেছি ফিলিস্তিনী মায়ের সাগরের কোলে আরামী বাবার ঔরসে
ফিলিস্তিনের পিতা এবং মায়ের জঠরে– জননীর কোলে...
তারা আমার কাছ থেকে তাদের সৌন্দর্য্য মুক্ত করে নেয়...
আমি সেই পাথর শুষ্কতার কালে কালে যা সমুদ্রসমূহ বেঁধে দিয়েছিল...
এবং আমি নবীদের নবী
এবং কবিদের কবি
আল ওয়াদি'র মিশরীয় পত্রাবলী থেকে শাতিলার পঙ্গু শিশু পর্যন্ত
আমিই প্রথম নিহত এবং আমিই শেষ মৃত
শত্রুর বাইবেল আর হতাশার উপদেশভরা তাওরাত
লেখা হয়ে গেছে আমার দেহে
অংকনের বইয়ে আমি এক 'আলিফ' এবং 'বা'
আমার অপর আমাকে তুলনা করে আমাকে হত্যা করে
প্রতিটি জাতিই পাঁজরসহ মৃতদের কবর দিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে
আর তারা তাতে গড়ে তোলে উপাসনার মন্দির
এবং তারা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে মুখ ফিরায়ে নেয়
আমার রাজ-ক্ষমতার সমুখে আমি বেশ সংকীর্ণ হয়ে আছি
অথচ আমার মধ্যে সমস্ত রাজ সাম্রাজ্য প্রসারিত
আমাকে শান্তি দেয় আমাকে হত্যা করে–আমার মা বিয়ে করে
এবং আমার মা কিছু হয়ে ওঠেনি–মা শুধু মায়ের জন্যই
তার মুক্ত হাতে বাঁধা তার কোমর যেন একখণ্ড মেঘ
তার ঘুম যেন বৃষ্টিবিন্দু শিশির কণা
এবং আমি নিজের সংগীতের সামনে সয়লাব হয়ে যাই
আমাকে যেন বেঁধে ফেলে তার খঞ্জর
আমার অপর আমাকে ভাই বানায় আর আমাকে খুন করে ফেরে
বস্তুত আমি সমুদ্র-সংগীত...

কবিতার এই পঙক্তিগুলোতে একটি জনপদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যে জনপদের প্রাচীনতা কালের কোনো এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়নি। অর্থাৎ তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়নি সময়ের গহবরে। বরং তা আরো বিকশিত এবং উন্নত– যেখানে সেই জনপদটি তার বয়সের হিসাবটি ভুলে যায়নি। নিজের টিকে যাওয়ার সাথে সাথে প্রাচীনতার চিহ্নগুলো মুছে যায়নি। এই জনপদের ভাষ্য দারভীশ এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন কোনো পৌরাণিক শহরের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। বস্তুত দারভীশ ফিলিস্তিনের কথাই তুলে ধরছেন। যেখানে তিনি এবং তার সাথী সেই ঐতিহাসিক সীমান্তরেখার সাক্ষ্য দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হচ্ছেন না, বরং তিনি যেহেতু সেই জনপদেরই অধিবাসী– তাই তার প্রাচীনতার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন পুরাণগাথার ধরন অনুসরণ করে। এই পুরাণ নিছক পুরাণই নয়, ইতিহাস মূলত। যে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার বর্ণনায়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও বাঁকগুলোর দিকে দারভীশ ইংগিত করে গেছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে ফিলিস্তিন এবং তার সীমান্ত– তার হাল অবস্থার দীর্ঘশ্বাসও প্রতিধ্বনিত হয় এই পঙক্তিমালায়। যেখানে কবি মূলত প্রতীকী অর্থে ফিলিস্তিনের মানুষের একক– যার স্বরূপে–প্রযত্নে ফিলিস্তিন প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা নিজভূমে নেই। নিজভূমিতেই তারা পরবাসী। অপর কোনো কর্তৃপক্ষ তাদের শাসন করছে। তারা সেই কর্তৃপক্ষের টেরিটোরিতে (বস্তুত নিজের সীমানা) জোরপূর্বক বাধ্যগত নাগরিক। আর সেই বাধ্যগত নাগরিক কি করে অবাধ্য হয়ে ওঠে কিংবা তাকে হয়ে উঠতে হয় তারই বর্ণনায় সিক্ত হয়ে উঠেছে পঙক্তিগুলো। এই অবাধ্য হয়ে ওঠা প্রতিভাত হয় একজন অনুসিদ্ধৎস্যু নাগরিকের চৈতন্যে– যিনি ইতিহাস-পুরাণ-বাস্তবতা-লোকগাথার অবগাহন–সমুদ্র অভিযাত্রা– পরিভ্রমণ ও হিজরতের মধ্যদিয়ে লড়াইয়ের মানস খুঁজে পান। যিনি ক্ষমতার প্রকৃত সত্য কোথায় কিভাবে বেদখল হয়ে গেছে তার হাকিকত সন্ধান করে নিজের ভবিষ্য ও সম্ভাবনা খুঁজতে গিয়ে ক্ষমতা ও কতৃত্বের অবাধ্য হয়ে ওঠেন। বস্তুত তিনি তবে একজন নোমেড। যেখানে দেলুজের 'ওয়ার মেশিনের' চৈতন্য অবাধ্য নাগরিকতার মধ্যদিয়ে জারিত হওয়ার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। একইসাথে ডিটেরিটোরিয়ালাইজেশনের প্ররোচনার ভিন্ন দৃষ্টান্ত এখানে উপলব্ধি করা সম্ভব।

তবে একই অবাধ্যতা সবসময় একইভাবে প্রকাশ নাও হতে পারে। একই জাগৃতি ভিন্নভাবেও ঘটে যেতে পারে। এই ভিন্নতা শুধু রোমান্টিক চিন্তার কারণে নাকি রোমান্টিক কাব্যভঙ্গির আশ্রয়ে জারিত হয়ে ওঠা নতুনতরো নোমেডিক চৈতন্যর ফল? যে নোমেডিক মানস কেবল শত্রুসীমানা ভেঙ্গে দেয়ার প্রাকপ্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য। কবির ভাষায় আরো একটু অবগাহন করা যাক...

والبحرُ أبيضُ
هذه سُفني الأخيرةْ
ترسو دمع المدينة , وهي ترفع رايتي,
لا رايةٌ بيضاء في بيروت
شكراً للذي يحمي المدينة من رحيلي

لِلَّتي مَدَّتْ ضفيرتها لتحملني إلى سفني الأخيرهْ
أين تذهبُ ؟
ليس لي بابٌ لأفتحَهُ لفارسيَ الأخيرْ
والسبتُ أسودٌ ,
ليس لي قلبٌ لأخلعَهُ على قدميكَ يا ولدي الصغيرْ
أنا لا أودِّع ' بل أُوزِّع هذه الدنيا
على الزَّبد الأخيرْ
وأين تذهبُ ؟
أينما حَطَّتْ طيورٌ البحرِ الكبيرْ[401]

এবং সমুদ্র শাদা
এ আমার শেষ জাহাজ
নোঙর করবে এই শহরের অশ্রুতে– উত্তলন করবে আমার পতাকা
বৈরুতে কোনো শাদা পতাকা নেই,
যারা আমার শেষযাত্রা থেকে এই শহরকে রক্ষা করেছে ধন্যবাদ তাদের
যে নারী তার বেণী প্রসারিত করেছিল আমাকে শেষ জাহাজে নিয়ে যেতে
ধন্যবাদ তাকে
কোথায় যাবে
আমার জন্য কোনো দরোজা নেই যা আমি খুলে দেবো আমার শেষ বীরপুরুষের জন্য
শনিবার কালো
আমার নেই কোনো হৃদয় যা খুলে দেবো তোমার পদতলে হে বৎস্য!
আমি বিদায় নেবো না, বরং শেষ ফেনার উপর বিতরণ করে দেবো এই পৃথিবী
কোথায় যাবে?
যেখানে এই মহাসমুদ্রের পাখিরা নেমে এসেছে?

এমন কোমল কল্পনাপ্রবণ কিংবা রোমান্টিক মননশীলতা থেকে আরো অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন কবি। এই তাগুতি সীমানা ভাঙতে আর কোনো বিকল্প নেই হয়তো। নিছক কাব্য-অভিযাত্রা নয় যেন, সত্যিকার অর্থেই একটি পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করে ফেলবেন একজন নোমেডিক কবি। ইজরাইল কর্তৃক যবরদখল করা একটি জনপদ–একটি রাষ্ট্র– যেটার বিপরীতে নিজস্ব রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য তার ক্ষমতার সীমানায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া অন্যকোনো উপায় নেই। মূলত দেলুজের ধারণার আশ্রয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইজরাইল কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া ক্ষমতার বলয়ে বাস করাটা একটি

---

[৪০১]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৮২-৩৮৩।

নোমেডিক ক্ষেত্র– যেখানে ইজরাইলের ক্ষমতা-কাঠামোর বিরুদ্ধে ওয়ার মেশিন গড়ে তোলাটা একটি অনিবার্যতা।

لا شيء يطلعُ من مرايا البحرِ في هذا الحصارِ,
عليكَ أن تجدَ الجسدْ
في فكرة أُخرى' وأن تجد البلدْ
في جُثَّةٍ أخرى, وأن تجد انفجاري
في مكانِ الانفجار...
أينما وَلَّيْتَ وجهكَ:
كلُّ شيء قابلٌ للانفجارِ,
الآن بحرْ,
الآن بحرٌ كُلُّهُ بحرٌ'
وَمَنْ لا بَرَّلَهْ
لا بحرَ لَهْ
والبحر صورتُنا
فلا تذهبْ تماما
هي هجرةٌ أخرى , فلا تذهبْ تماما
في ماتفتَّحَ من ربيع الأرضِ , في ما فجَّر الطيرانُ فينا
من ينابيع . ولا تذهبْ تماما
في شظايانا لتبحث عن نبيٍّ فيكَ ناما.
هي هجرةٌ أُخرى إلى ما لستُ أَعرفُ...[402]

এমন অবরোধে সমুদ্রের আয়নাগুলোতে আর কিছুই নাই যে– ভেসে উঠবে
তোমার উচিত অন্যকোনো চিন্তায় দেহকে খুঁজে পাওয়া
তোমার উচিত অন্যকোনো লাশের ভিতর দেশটাকে খুঁজে দেখা
তোমার উচিত ঠিক বিস্ফোরণের জায়গায় আমার বিস্ফোরিত হওয়াকে খুঁজে নেয়া
যেদিকেই তুমি মুখ ফেরাবে দেখবে:
সবকিছুই এখন বিস্ফোরণের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে
এখন সমুদ্র
এখন সমুদ্র তার পুরোটা জুড়েই সমুদ্র
এবং যার স্থলদেশ নেই

৪০২. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।

বস্তত তার জলদেশ–সমুদ্রও নেই
সমুদ্র আমাদের রূপ আমাদের আকার
অতএব একেবারে যেও না চলে
এই হলো অন্য এক চলে যাওয়া অন্য এক হিজরত
ফলে একেবারে যেও না চলে পৃথিবীর বসন্তে যাকিছু খুলে গেছে
ফুটে গেছে– আমাদের ভিতর যাকিছু ঝর্নাধারার–
ভোর হয়েছে বিমানের– তার ভিতর, একদম যেও না চলে
আমাদের খণ্ড খণ্ড টুকরাগুলোর ভিতর– যেন খুঁজে পাও
এক নবীর– যিনি ঘুমিয়ে আছেন আমাদের ভিতর

এটি অন্য এক হিজরত আমার যাকিছু অজানা তার দিকে

এই পঙক্তিগুলোতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা কিংবা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বিপরীতে নতুনতরো ক্ষমতা কি করে গড়ে ওঠে তার পর্যালোচনায় দেলুজ যে নমেডোলোজি কিংবা ওয়ার মেশিনের যে ধারণার বিস্তার ঘটিয়েছেন তার একটি কাব্যিক রূপ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে এখানে। বিদ্যমান একটি চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় প্রবেশ করা– বিদ্যমান একটি সীমানা থেকে পরিসর থেকে অন্য একটি সীমানা গড়ে তোলা– বিদ্যমান একটি চিন্তা-একটি আইডিয়া-মতাদর্শ থেকে অপর কোনো আইডিয়া-মতাদর্শ কিংবা চিন্তায় ফিজিক্যালি অর্থাৎ বাস্তবিক অর্থে নিজেকে তালাশ করা– হাজির করা– এমন নিগূঢ় অভিব্যক্তির মধ্যদিয়ে কবিতাটিতে স্পষ্টত একটি নমেডিক চিন্তার অবতারণা ঘটেছে। অবশ্য দেলুজ যে সময়ে যে বাস্তবতায় পশ্চিমা জ্ঞান ও দর্শন চিন্তার বিচারের পদ্ধতিগত ধারার বিপরীতে নোমেডোলজির ধারণা ও তত্ত্ব যেভাবে হাজির করেছেন ঠিক হুবহু একইভাবে ফিলিস্তিনের প্রেক্ষাপটে তার তুলনামূলক পর্যালোচনা এমন হবে এমনটা ভাবা খুব কঠিন।

বলা বাহুল্য, যে সময়ে দারভীশের এই কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়কালটি ছিল ১৯৮৩। ফিলিস্তিন কিংবা আরব ফিলিস্তিন বস্তুত সেসময়ে ইজরাইলী কর্তৃত্বের মধ্যেই ফিলিস্তিনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হতো। মোটকথা তখনো পর্যন্ত ফিলিস্তিন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। ফলে দেলুজের এই তত্ত্বালোচনা বর্তমানের ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে নয় বরং এ আলোচনা সেসময়কার প্রেক্ষিত বিচারে ইসরাইলি কর্তৃত্বাধীন ফিলিস্তিন সম্পর্কিত দারভীশের কবিতার পর্যালোচনা। ফলে এ তত্ত্বালোচনা কতোটা বর্তমানে প্রয়োগযোগ্য এমন সংশয়ের জায়গা থেকে এই প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। দারভীশ বলেন,

هل يعرف البوليسُ أين ستحبل الأرضُ الصغيرةُ بالرياح المُقْبِلَهْ؟
ماذا تريدُ؟
سيادةً فوق الرَمَادِ؟
وأنت سَيِّدُ رُوحِنَا يا سَيِّدِ الكينونّةِ المتحوِّلّهْ
فاذهب....
فليسَ لك المكانُ ولا العروش / المزبَلَهْ
حُرّيَّةُ التكوين أنتَ
وخالقُ الطرقات أنتَ
وأنت عكسُ المرحلَهْ
واذهبْ فقيراً كالصلاةِ
وحافياً كالنهر في درب الحصى
ومُؤَجَّلاً كقرنفُلَهْ
لا' لست آدم كي أقول خرجتَ من بيروت أو عَمَّانَ أو يافا, وأنت المسألَهْ
فاذهب إليكَ ' فأنَتَ أوسعُ من بلاد الناسِ ' أوسعُ من فضاء المقصلَهْ
مستسلماً لصواب قلبكَ
تخلع المدنَ الكبيرةَ والسماءَ المُسْدَلَهْ
وتمدُّ أرضاً تحت راحتك الصغيرة ,
خيمةً
أو فكرةً
أو سنبلَهْ
كَمْ من نبيّ فيك جَرَّبَ
كَمْ تعذَّب كي يُرَتِّبَ هيكَلَهْ
عبثاً تحاول يا أبي مُلْكَاً ومَمْلَكَةً
فَسِرْ للجُلْجُلَهْ
واصْعَدْ معي
لِنُعيْدَ للروح المُشَرَّد أوَّلَهْ
ماذا تُريد , وأنت سَيِّدُ روحنا
يا سَيِّدَ الكينونة المتحوِّلَهْ؟
يا سَيِّدَ الجمرهْ
يا سَيِّدَ الشُّعْلَهْ
ما أوسع الثورة
ما أضيقَ الرحلة

ما أكبَرَ الفكرة
ما أصغَرَ الدولة!.....[403]

পুলিশ কি জানে, কোথায় এই ছোট্ট ভূমি পরবর্তী বাতাসে মুড়িয়ে যাবে?
কি চাও?
বালির উপর কর্তৃত্ব?
তুমিই তো আমাদের আত্মার নেতা–রূপান্তরশীল সত্তার নেতা হে?
অতএব যাও...
এই স্থান তোমার জন্য নয়, না এই তুচ্ছ সিংহাসন
সৃষ্টির স্বাধীনতা তুমি
পথসমূহের স্রষ্টা তুমি
সফরের বিপরীত তুমি
এবং চলে যাও নামাজের মতো নিঃসঙ্গ
কতো সংকীর্ণ এই ভ্রমণ
প্রস্তরিত পথে নদীর মতো বেষ্টিত হয়ে
কর্নফুলের মতো স্থির হয়ে
না, আমি আদম নই যে বলে যাবো
আমি বের হয়ে গেলাম বৈরুত, আম্মান এবং ইয়াফা থেকে
তুমিই প্রশ্ন,
অতএব আমি যাবো তোমার কাছে, তুমি
মানুষের শহরগুলোর চেয়ে অনেক বিস্তৃত উদার,
তুমি বিশাল গিলোটিনের আকাশের চেয়ে।
হৃদয়ের ন্যায্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করে
মুক্ত করে দাও বড় বড় শহর এবং ঝুলন্ত আকাশ
তোমার ছোট্ট মুষ্ঠিতে টেনে ধরো এই ভূমি
তাঁবু
কিংবা চিন্তা
কিংবা গমের শীষ
কতো নবী তোমার ভিতর লড়াই চালিয়ে গেছে
কতো টর্চার সয়ে যেতে হয় কতো নির্যাতন যেন
উদ্ধার করা যায় মন্দির
বাবা, তুমি বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছো রাজ এবং রাজ্যের জন্য

[৪০৩]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৯০-৩৯২।

সুতরাং তুমি বেরিয়ে পড়ো গলগোঠার[৪০৪] জন্য
আরোহন করো আমার সাথে
যেন তাড়িত আত্মার জন্য ফিরিয়ে আনি তার আদি স্থান
কি চাও
তুমিই আমাদের আত্মার নেতা
রূপান্তরশীল সত্তার সর্দার হে
হে জ্বলন্ত অঙ্গারঅলা
হে আলোকিত প্রদীপঅলা
কি বিশাল বিপ্লব
কি সংকীর্ণ এই ভ্রমণ
কি মহান চিন্তা
কতো ক্ষুদ্র এই রাষ্ট্র!

বিপ্লবের একটি সাধারণ অর্থ পরিবর্তন। বিপ্লব বা পরিবর্তনের শাশ্বত কোনো রূপরেখা নাই। ইতিহাসের নানা পর্বে এর বিভিন্ন রূপ আছে দেশকাল পাত্রভেদে। আরবী কবিতার ইতিহাসেও তেমনি বিভিন্ন সময়ে বাঁক বদলের ঘটনা ঘটেছে। যার কোনো আবহমান রূপ নাই। আরবের শিল্পকলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক হয়ে ওঠার কালপর্বেও কবিতার ক্ষেত্রে নানান ধারা তৈরি হয়। চলি-শের দশকের বাগদাদের কবি আব্দুল ওহাব আলবয়াতীর (১৯২৬-'৯৯) পর সিরিয়ার পঞ্চাশের কবি আদোনিছের হাতে আরবী কবিতার ধ্রুপদী নির্যাসে আধুনিক কবিতার কাঠামো নতুন রূপে গড়ে ওঠে। মুহাম্মদ আল মাগুত, নিজার কাবানী, ইউসুফ আল খালীল এ্যাদোনিসের কাব্য ধারায় উলে-খযোগ্য কবি সত্ত্বার নাম। কিন্তু ষাটের দশকে আবির্ভূত দারভীশ এই ধারায় প্রভাবিত হননি। বরং দারভীশ নিজেই এক প্রবল শক্তি হয়ে ওঠেন। এই শক্তি কোনো রহস্য নয়। মৃত্যুর নজরানা আর লড়াইয়ের প্রতিশ্রুত পথ থেকে গড়ে ওঠে এই শক্তি। দারভীশের এই শক্তির উত্থান ঔপনিবেশোত্তর এমন সময় ঘটলো যখন রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, আইন, ক্ষমতা, দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা ও শিল্প কলার পশ্চিমা কতৃর্ত্ব বিশ্বব্যাপী। ইউরোপ তথা পশ্চিমের আধুনিকতার সামগ্রিক জীবন ও জগত কাঠামো পৃথিবীর আর সকল অঞ্চলের একমাত্র মাপকাঠি ও একমাত্র আদর্শ হয়ে যায়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা আর সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ আধুনিকতার এই বানিয়ে দেয়া বৃত্তবন্দীতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি অপর বিশ্ব। এটি যে বৃত্ত, অথবা মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা আলো যার দ্বারা অন্যরা আলোকিত হচ্ছে তার কোনো টের পায়নি এখনো অনেক উপনিবেশিত মানুষ। এই আলোর মধ্যেই তারা ভবিষ্যত হাতড়ে বেড়ায়। এটি যে শাসন করছে, শোষণ করছে সেটা বোঝা দূরে থাক বরং তার মধ্যে যাপন করাকেই সে আধুনিক কিংবা কোনো বড়

[৪০৪]. জেরুজালেমের প্রাচীরের বাইরে লাগোয়া একটি ঐতিহাসিক স্থান গোলগোঠা। ক্যালবেরিও বলা হয়। এই স্থানেই যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। ব্রিটানিকা অনলাইন। (ভিজিট: ২৭ এপ্রিল, ২০২৩), https://www.britannica.com/place/Golgotha

কিছু জ্ঞান করে। এর বাইরে চিন্তা করা এখনো অলীক। অর্থাৎ যেখানে হীনমন্যতাই তার কথিত আধুনিক হয়ে ওঠার গোলামী মানসিকতা।[৪০৫]

রাজনৈতিক ক্ষমতা, বলপ্রয়োগ, নির্যাতন, যতোটা দৃশ্যমান ও কখনো কখনো বোধগম্য; সাম্রজ্যবাদের এই সাংস্কৃতিক বলপ্রয়োগটাও ততোটাই বিমূর্ত ও অনায়াসে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। দারভীশ তার শৈশবে স্বপরিবারে গৃহচ্যুত হবার পর রাজনৈতিক বঞ্চনা যেমন জীবন দিয়ে বুঝেছেন তেমনি কবিতায় মুখ খুলতে গিয়ে এই আধুনিকতার সংস্কৃতি, জ্ঞানের আধিপত্য ও লুকানো নির্যাতনটাও দ্রুত বুঝতে সক্ষম হন। ফলে তার থেকে যে কবিতা ও ভাষা নির্মিত হয় সেটি আর বিবদমান আধুনিক জ্ঞান, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও কবিতার ফলাফল হতে পারে না। সেটি বরং বিদ্যমান কাব্যতত্ত্ব, আঙ্গিক, ও শিল্পকাঠামোসহ সমূহ ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করার মধ্য দিয়ে নিজের হোয়ে ওঠা নিশ্চিত করে। এবং বিকাশের শর্ত তৈয়ার করে। পুরনো শব্দ, অর্থ, গতি ও রূপ ভেঙ্গে, বদলিয়ে নতুন বয়ান পেশ করে। নতুন তাৎপর্যে বাক্যকে হাজির করে। বইয়ের ভেতর থেকে অভিধানের ভেতর থেকে ছাপার অক্ষরের শব্দকে মুক্ত করে ভিন্ন বক্তব্য, অর্থে রূপান্তরিত করে। দারভীশ তাই বলেন– “আমার প্রেম! জেনো রাখো অভিধানের ভেতরে অক্ষররা নির্বোধ/ কেমন করে জীবন্ত হবে এই সব শব্দ/ কেমন করে অংকুরিত হবে...কেমন করে বড় হবে?/ আমরা এর খোরাক যোগাই স্মৃতিজ্ঞানের অশ্রুতে, রূপকে....চিনির মাদকতায়/ আমার জন্য অপরিহার্য সেই গোলাপকে প্রত্যাখ্যান করা/ যা আসে অভিধান থেকে, কিংবা কবিতার গ্রন্থ থেকে/ গোলাপ তো জাগ্রত হয় কৃষকের বাহুতে/ শ্রমিকের মুষ্ঠিতে/ গোলাপ ভেদ করে ওঠে লড়াকুর ক্ষতের উপর/ পাথরের কপালের উপর।”[৪০৬]

“আমি কবিতা লিখছি অর্থাৎ আমি এখন মরছি। আর যেনো কবিতার প্রথাবদ্ধ তত্ত্ব ও নিয়মরা বিদায় নিচ্ছে। যেনো খঞ্জর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেনো উন্মোচিত হচ্ছে প্রতীক: গণমানুষই সেই পাখি ও সুসংবদ্ধ নীতি ও ছন্দের নাম যাদের এখন নাম দেয়া হয় ‘হত্যাকারী’।”[৪০৭]

কী করে নতুন নিয়ম, নতুন কবিতা, নতুন সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে, কোন প্রক্রিয়ায় এবং কোন পাটাতনের উপর ভিত্তি করে তা নির্মিত হয় এ কয়েকটি লাইন তার একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ। একই ভাবে দারভীশের কবিতার আঙ্গিক, নন্দনশৈলী ও ভাব প্রকল্প কী রকম তারও একটি ইশারা পাওয়া যায় এখানে। ফলে দারভীশ পশ্চিমা আধুনিকতার চরিত্রের দিকে না গিয়ে তার কবিতার সেকড় সন্ধান করেছেন নিজের জনপদের গণমানুষের আন্ত সম্পর্কের ভেতরে। নিজের ঐতিহাসিকতা, ঐতিহ্য, ধর্ম ও লোকাচারের মধ্যে নতুন কবিতা বিনির্মাণের উপজীব্য তালাশ করেছেন। দারভীশ তাই নিজেকে

---

[৪০৫]. হোসেন, শাহাদাৎ, *মাহমুদ দারভীশের কবিতাঃ ভাব ও বিষয় অনুষঙ্গ*, পৃ. ২৩।

[৪০৬]. মাহমুদ দারভীশ. আদ্দীওয়ান. আল আ'মালুল উলা-১. ২০০৫, পৃ. ১৮৮.

[৪০৭]. ড, আদিল আসত্বহ, মাহমুদ দারভীশ: তাখলীছুশ শি'রি মিম্মা লাইসা শি'রা, ভিজিট: মে ২২, ২০২৩, عادل الأسطة - ديوان العرب (diwanalarab.com)

এমন জায়গায় অঙ্গীভূত করলেন যাতে জীবন, সমাজ, কবিতা ও ভাষা অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। দারভীশ তাতে কতোটুকু সফল হয়েছেন তার বিচার ব্যাখ্যা হতে পারে কিন্তু তিনি কাজটির ভিত্তি ও শর্ত ঠিক করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ আধুনিকতা খতমের আরম্ভটা করার চেষ্টা করেছেন। এখানেই তিনি সফল। নিসন্দেহে অন্তত আরবের প্রেক্ষাপটে। তবে বিশ্বপুঁজির অর্থে তার এই প্রয়াস নিতান্তই ইশারামূলক। দারভীশ নিজেও এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন এটি বৃহৎ অর্থে ব্যাপক জনের মধ্যে দানা বাঁধেনি। কিন্তু এই পথে হাঁটার ফলে তাকে রাজনৈতিক কবিদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে শিল্পশ্রেষ্ঠ নান্দনিক কবিদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। সমালোচকদের মধ্যে। তবে ২০০২'র ২৪ মার্চ রামাল-য় প্রায় তিন লাখ জনতা বেষ্টিত এক সম্মেলনে স্পেন ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক লেখক সংসদ কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া এবং এরপর একাধিকবার আন্তর্জাতিক নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের তালিকায় মনোনীত হবার পর দারভীশকে নতুন করে দেখবার ও ভাববার তীব্র ঝোঁক সৃষ্টি হয়। যদিও দারভীশ বিখ্যাত সাময়িকী "আলকারমিল"র একটি সংখ্যায় প্রকাশিত দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকারে নোবেল পুরস্কারের বিষয়টিকে অস্পষ্টভাবে অবজ্ঞা করেছেন। দারভীশকে এভাবে কারো কারো খারিজ করে দেয়ার আসল কারণ হোলো, সহজ করে সাধাসিধা ভাষায় কাব্য করেন দারভীশ। তার কবিতায় বাক্য বিন্যাসে বিমূর্তরূপ নেই। জটিলতা নেই। দুর্বোধ্য রহস্যময়তা নেই। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পে ঠাসা নান্দনিকতা ও অলংকারের প্রাধাণ্য নেই। কিংবা যাদুবাস্তবতার কুহক, পরাবাস্তবতার অলৌকিক মোহনিয়তা ও উত্তরাধুনিকতার অভিমুখ নেই তার কবিতায়। এমন কি নারী প্রেমের বায়োলোজিক্যাল শৈল্পিক অভিপ্রকাশ ও সৌন্দর্যের ক্ষুধাকাতরতা নেই। সেদিক থেকে রোমান্টিকতাও নেই। দারভীশের মধ্যে এগুলো নেই, কারণ তিনি তো এর বিরুদ্ধেই লড়েছেন। তাহলে খোদ এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপনের উপরই প্রশ্ন তৈরি হয়। কারণ যাতে তিনি বিশ্বাসই করেন না সমালোচনা ও অভিযোগের কৌশলে তার মধ্যে তা আরোপিত করার বা দেখতে পাওয়ার ইচ্ছা ও প্রয়াসই স্বয়ং অভিযুক্ত হয়ে ওঠে। দারভীশ যখন বলেন– "আমি কবিতা লিখছি অর্থাৎ আমি মরছি আর যেনো কবিতার প্রথাবদ্ধ তত্ত্ব, ও নীতি নিয়মরা বিদায় নিচ্ছে।" তাহলে অভিযুক্ত প্রশ্নগুলোই মূলত বিদায় নিচ্ছে। কারণ তিনি মরে মরে লড়াই করেছেন। কবিতা লিখেছেন। এই কবিতা, এই লড়াই, মৃত্যু– শিল্পকলা, কবিতা, সাহিত্যের তত্ত্ব ও নানা রূপ কাঠামোর বিরুদ্ধেও। জ্ঞান, মানুষ ও প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতা, কবিতার ভাষা, শিল্পরূপ ও ভাবের বিচ্ছিন্নতাসহ নানা বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন। জীবনে- কবিতায়- যে নিষ্প্রাণ, অনীতি, অধর্ম ও স্থবিরতা তৈরি হয় পুঁজি ও আধুনিকতার ফল হিসেবে কবি তা থেকে মুক্ত করে মানুষের স্পিরিট অর্থাৎ তার সপ্রাণ দিকটি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। ফিরিয়ে আনার কোশেশ করেন কবিতার সহজ প্রকাশভঙ্গির গভীর ভাবপ্রণোদনা। নতুন করে গড়ে তোলেন কবিতার দেহ। যেখানে কাব্যদেহ– রূপ, সৌন্দর্য, শিল্প, অর্থ, বিষয় ও চৈতন্য একাকার হয়ে পূর্ণ শারীরিকতায় নির্মিত হয়। এর মধ্যেই জীবনের সঞ্চার প্রবাহিত করেন। রূপ ও ভাবের রহস্যময়তা এই সহজ-সরল পথেই খুঁজে ফিরেন। এখানেই তার প্রেমের দিগন্ত ও অশেষ স্বপ্নময়তা বা রোমান্টিকতা। এর বাইরে আর কোনো রোমান্টিকতা নেই। মানুষ ও প্রকৃতির অভেদ সম্পর্কের গভীরে নিরন্তর নির্মোহ বিচরণ আর রক্তাক্ত লড়াইয়ের বাস্তবতায় নতুন জ্ঞান, ও ভবিষ্যতের সন্ধান করেন তিনি। ফলে তার কাছে

রাজনীতি, কবিতা, জীবন, জ্ঞান, ও ভাব অবিভাজ্য হয়ে ওঠে। এর কোনো বিভেদ তিনি মানেন না। ফলে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে রাজনৈতিক কবি কিংবা নিছক যুদ্ধ অর্থে বিপ-বীও বলা যায় না। আবার আধুনিক অর্থে বাস্তববর্জিত স্থুল রোমান্টিকও বলা যায় না। কারণ তিনি প্রেমের বয়ান বদলে দিয়েছেন। চাঁদ যে জোসনা রাতে ভালোবাসার, ভালোলাগার স্বপ্নময় প্রতীক ছিলো এতোদিন, তিনি তা পাল্টে দিয়েছেন। দারভীশ বললেন, এই চাঁদ থেকে আমাকে আড়াল করে নাও। চাঁদ থেকে সাবধান হবার কথা বলেছেন। এভাবে চাঁদ, বাতাশ, বৃষ্টি, সমুদ্র, রাত, সূর্য , ছায়া, ঝড়, আগুন, ক্রুশ, ধোঁয়া, ধুলি, ভূকম্পন, মেঘ, অন্ধকার ইত্যাদি নৈসর্গিক শব্দের চিরাচরিত অর্থ পাল্টে বেদনা, দুঃখ, ক্ষোভ আর শত্রু-বিদ্বেষের প্রতীকি অর্থে রূপান্তরিত করেন। শব্দের আভিধানিক অর্থ থেকে মুক্ত করে নতুন অর্থ উৎপাদন করেছেন। এমনকি ফুল ও প্রদীপ যে সত্য, নিস্পাপ ও নিস্কলুষ, স্বর্গীয় ভাবনার প্রতীক হিসেবে গণ্য হোত কবি তাকেও নির্ধারণ করলেন বিরহ, ক্ষোভ এবং শত্রুতার প্রতীকে। এই অর্থ বদলের নিয়ম, নীতি ও তত্ত্ব বদলের ঘটনায় যে বিষয়টা তিনি ইংগিত দিলেন তা হলো– ইতিহাসের কোনো আবহমান শাশ্বত রূপ নেই। নানা কালে নানা মুহূর্তে মানুষই তার সত্যাসত্য নির্ধারণ করেন। পুরনো কাঠামো, শক্তি, ক্ষমতা, অর্থ, বিধান ও গতিপ্রকৃতি পাল্টে নতুন রূপে সত্য হাজির করেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই। কোনো একরৈখিক নিয়মে ইতিহাস চলে না। নানা দ্বন্দ্ব তাতে বিদ্যমান থাকে। এটি কোনো পূর্বানুমান নয়, প্রতিমুহূর্তের বাস্তবতা তাই। কিন্তু এই রাজনীতি জ্ঞান, তৎপরতাই পরবর্তী নতুন ইতিহাসের শর্ত তৈরি করে। ফলে রাজনীতি থেকে কবিতার ব্যবচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব নয়। দারভীশ যেমন বলেন– "পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের কোনো লেখকেরই বলা সম্ভব নয় যে, আমি রাজনীতি থেকে মুক্ত। কারণ, রাজনীতি টিকে থাকার দ্বন্দ্ব, জীবনের দ্বন্দ্ব.... নানান দ্বন্দের নানা রূপের অন্যতম রূপ। এখানে রাজনীতি হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাহলে প্রশ্ন হোল, কবিতা কি রাজনৈতিক হোয়ে উঠছে, নাকি তার কর্তব্য আপন সত্ত্বার মধ্যে রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি বয়ে নিয়ে যাওয়া। কিংবা এখানে কি কবিতার টেক্সটের জন্য রাজনৈতিক বয়ান তৈরির সম্ভাবনা আছে? নাকি নাই? তবে যখন কবিতা ভোগবাদ, ধবংস, অন্যায়, জুলুমের অভিব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ সম্বোধনের প্রকাশ হয়ে ওঠে কবিতা তখন আমার জন্য অন্য কিছুর অর্থ তৈয়ার করে।"[৪০৮] মানে কবি যখন বুঝে ফেলেন কর্তৃত্বশীল শ্রেণী ও কাঠামোগুলোর শক্তি ও বলপ্রয়োগের গোড়ার চরিত্র ও রহস্য কী? তখন তার কর্তব্য হয়ে যায় নতুন শক্তি, নতুন অর্থ ও বিধানের সন্ধান করা, আর এই সন্ধানের ফলাফল প্রকাশ পায় ভাষায়, কবিতায় ভাব সাধনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই ভাবের আত্মপ্রকাশ কী করে ঘটে, কোথায় ঘটে এবং তার নাম কী দারভীশ সে সব বলে দিয়েছেন তার কবিতায়।

১

[৪০৮]. মাহমুদ দারভীশ: ভুলিদতু আলা দাফায়াত (আমার বার বার জন্ম হয়েছে)./ আব্দুহ ওয়াজিন. আল কারমেল. সংখ্যা- ৮৬, (শীতকালীন) ২০০৬. পৃ. ১০

৪.৮: আল দিকতাতুর: একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য কিংবা রাষ্ট্রগঠনের নতুন বয়ান ও মুক্তির প্রস্তাবনা

খিতাব আল দিকতাতুর আল মাওজুনাহ দারভীশের মৃত্যুর প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ। ইতালিতে অবস্থানকালে এটি রচনা করেন দারভীশ। ১৯৮৬'র আগস্ট থেকে ১৯৮৭'র জুলাই–এ সময়ে ইতালি থেকে প্রকাশিত 'আল ইয়াওম আল সাবি' সাময়িকীতে প্রায় নিয়মিত প্রকাশ হতো তার কবিতা। এ কবিতাগুলোরই মলাটবদ্ধ রূপ আদ দিকতাতুর। ধারণা করা হয়, জটিল রাজনৈতিক কারণে সে সময় বইটি বের হয়নি। দারভীশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত বইটি পাঠ করলে বোঝা যায়, এটি একটি 'পরিকল্পিত' সৃজনশীল কাজ। বইটি তার মৃত্যুর পর ২০১৩ সালে ফিলিস্তিনের হাইফা থেকে বের হয়। দিতেতুরা

মাহমুদ দারভীশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বইটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একসাথে বইটিতে তার রাজনৈতিক অবস্থান প্রকাশিত হয়েছে। নিছক রাজনৈতিক কারণেই বইটি গুরুত্বপূর্ণ এমন নয়, বরং কেমন ফিলিস্তিন তিনি প্রত্যাশা করতেন তারই প্রতিচ্ছবি এই কবিতা। মোটকথা, রাষ্ট্র হিসেবে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিন সম্পর্কিত একটি মতাদর্শিক বয়ানে ঋদ্ধ এই কাব্যগ্রন্থ। দারভীশ যে সময় ইতালিতে বসে কবিতাগুলো লিখেছিলেন সে সময়ের আরব রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ শাসন প্রক্রিয়া এবং নিজ দেশের জনগণের উপর বল-প্রয়োগ ও ক্ষমতা চর্চা বইটি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ইন্ধন হিসেবে হিসেবে কাজ করেছে।[৪০৯] ১৯৮০ সালে আনোয়ার সাদাতের আকস্মিক গুপ্তহত্যার পর মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতি যেমন জটিল হয়ে উঠেছিল তেমনি পরের দশকে সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও বেশ খারাপ ছিল। একইসময়ে লেবানন, জর্ডান এবং ইরাকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতি স্থিতিশীল ছিল না। সেসময়ের আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান ইজরাইল প্রশ্নে ফিলিস্তিনের জন্য যেমন অনুকূল ছিল না তেমনি তাদের নিজেদের জনগণের পক্ষেও এসব রাষ্ট্র এবং তাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো মোটেও ইতিবাচক ছিলনা। আঞ্চলিক রাজনীতির দুঃসহ অবস্থা দারভীশকে ভাবিয়েছে নতুন করে। কারণ ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর শাবরা শাতিলায় ইজরাইলের গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে ইজরাইলের বিরুদ্ধে সবথেকে সোচ্চার হওয়ার কথা ছিল মিশরের কিন্তু তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো তৎপরতা ছিল না। এসব কিছু বিবেচনা হিসেবে এসেছে দারভীশের দিকতেতোরায়– যেখানে রাষ্ট্র, জনগণ, রাজনীতি, স্বাধীনতাবোধ, মুক্তি, গণমাধ্যম, ধর্ম-সংস্কৃতি, মানবাধিকার, ন্যায় বিচার, যুদ্ধ-শান্তি, শত্রু-মিত্রের ধারণা, সম্পর্ক, ভাষা, পরিবেশসহ বহুবিচিত্র বিষয়ের পর্যালোচনা বিবৃত হয়েছে কবিতার ভাষায়। বিপুল বিষয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে দারভীশ হাজির হন এই কাব্যগ্রন্থে। একটি রাষ্ট্রে মানুষ এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কিত মৌলিক প্রায় সবকিছু উঠে এসেছে এই কাব্যগ্রন্থে। বস্তুত বইটিতে ফিলিস্তিনে কি ধরনের রাষ্ট্র-সমাজ গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কিত দারভীশের প্রস্তাবিত ডিসকোর্স

---

[৪০৯]. দারভীশের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাতার ভিত্তিক ইংরেজি দৈনিক 'দি পিনেনসোলা'র কর্তৃপক্ষীয় মতামত: *The dictator's speeches,* (কাতার: ২৮ আগ 2014 https://thepeninsulaqatar.com/article/28/08/2014/the-dictator-s-speeches)|

সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সামগ্রিক এই ডিসকোর্সের মধ্যদিয়ে দারভীশ ফিলিস্তিনী জনগণের মুক্তি এবং নয়া রাষ্ট্রগঠনের নতুন বয়ান নির্মাণের দলিল উপস্থাপন করেছেন।

প্রস্তাব ও পর্যালোচনা

বইটি পাঠশেষে দুটি বিষয় লক্ষ করা যায়। প্রথমত বিদ্যমান রাষ্ট্র, গণমাধ্যম এবং রাজনৈতিক শ্রেণির কাঠামো ও গতিপ্রকৃতির সমালোচনা-পর্যালোচনা। দ্বিতীয়ত, পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে যে ফলাফল কিংবা দারভীশ এর বিপরীতে কি বলতে চেয়েছেন তার হদিস তালাশ করা। যাতে নতুন কি প্রস্তাব করতে চেয়েছেন দারভীশ তার সত্য ও স্বরূপ বোঝা যায়। বইটিতে মোট ৮টি অংশ রয়েছে। এই অংশগুলোকে দারভীশ 'খিতাব' () হিসিবে শনাক্ত করেন। খিতাব এর বিবিধ অর্থ হতে পারে। তবে এখানে প্রস্তাবনা কথাটি সবথেকে যথাযথ মনে হয়। আটটি প্রস্তাবনা:

১. খিতাব আল জুলুস – প্রস্তাবনা-১: বৈঠক/অধিবেশন
২. খিতাব আল ধজার – প্রস্তাবনা-২: দ্রোহ-ক্ষোভ
৩. খিতাব আল সালাম – প্রস্তাবনা-৩: শান্তি
৪. খিতাব আল আমীর – প্রস্তাবনা-৪: শাসক
৫. খিতবা আল ক্ববার – প্রস্তাবনা-৫: কবর
৬. খিতাব আল ফিকরাহ– প্রস্তাবনা-৬: চিন্তা
৭. খিতাব আল নিসা – প্রস্তাবনা-৭: নারী
৮. খিতাব আল খিতাব – প্রস্তাবনা-৮: প্রস্তাবনার প্রস্তাব

প্রস্তাবনা-১ বৈঠক (খিতাব আল জুলুস)

খিতাব আল জুলুস—বলতে এখানে বোঝানো হয় রাষ্ট্রগঠনের প্রাকবৈঠকি বা প্রাক-অধিবেশন যেখানে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলনীতি, গঠনতন্ত্র, ধারণা, মতাদর্শ ইত্যাদি বিষয় পরিষ্কার করার জন্য মৌলিক আলোচনাগুলো তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ প্রস্তাবনা-১ বস্তুত রাষ্ট্রগঠনসংক্রান্ত রাজনীতির মূলবক্তব্য আলোচনা করে। ফলে প্রস্তাবনা-১-এ রাজনীতির মৌলিক বিষয় উঠে এসেছে। যাতে গণতান্ত্রিক নীতি-ধারণা, জনগণ, নির্বাচন প্রক্রিয়া, নাগরিকতা, পার্লামেন্ট জনগণ, মৌলিক মানবাধিকার, প্রতিরক্ষা-নিরাপত্তা, আদালত, ন্যায় বিচার, ধর্মীয় অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নারীসহ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। বইটির ৯ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ বিষয়ে কবিতার ভাষায় উঠে এসেছে রাষ্ট্রগঠনের প্রাক জরুরি আলোচনা। কয়েকটি দিক এখানে তুলে ধরা যাক...

বিপ্লবী গণশক্তির উত্থান

১-১

سأختار شعبي
سأختار أفراد شعبی ،
سأختاركم واحدا واحدا من سلالة
أمی ومن مذهبی،
سأختاركم كی تكونوا جديرين بی
إذن أوقفوا الآن تصفيقم كی تكونوا
جديرين بی وبحبی ،
سأختار شعبی سياجا لمملكتي ورصيفًا
لدربي[410]

আমি শিঘ্রই বেছে নেবো আমার জনগণ
আমি শিঘ্রই জনতার প্রতি সদস্যকে বেছে নেবো
আমার মায়ের বংশধারা এবং মতাদর্শ থেকে এক এক করে তোমাদের
আমি বেছে নেবো
আমি শিঘ্রই আমার যোগ্য হিসেবে তোমাদের বেছে নেবো
সুতরাং বন্ধ করো হাততালি, হয়ে ওঠো আমার যোগ্য এবং ভালোবাসার
আমার রাজ্যের রক্ষা-প্রাচীর আর প্লাটফর্ম হিসেবে আমি মনোনীতি করবো
আমার জনগণ।

১-২

سأختار من يستحق المرور أمام
مدائح فكری
. . ومن يستحق المرور أمام حدائق قصري
. قفوا أيها الناس حولی خاتم
. لنصلح سيرة حواء .. نصلح أحفـاد آدم
.. سأختار شعبا محبا وصلبًا وعذبا[411]

যারা আমার চিন্তার বাথানের সামনে চলতে সক্ষম আমি তাদের বেছে নেবো
যারা আমার প্রাসাদের বাগানগুলোর সামনে চলতে সক্ষম আমি তাদের বেছে নেবো

---

৪১০. দারভীশ, মাহমুদ, *খুতাব আল দিকতাতুর আল মাওজুনাহ*, ২০১৩ পৃ. ৯।
৪১১. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০।

অতএব আমার চারপাশে আংটির মতো ঘিরে সমবেত হও হে মানুষ
আমরা ঠিক করে দেবো হাওয়ার কাহিনী... ঠিক করে দেবো আদমসন্তানদের
এক প্রেমময় কঠোর শান্তিকামী জনতা
বেছে নেবো আমি অচিরেই।

এখানে আরবী *ইখতিয়ার* (اختيار) শব্দের অর্থ করা হয়েছে বেছে নেয়া বা মনোনয়ন। মনোনয়ন বাংলা ভাষায় নির্বাচনের প্রায় সমার্থক হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। মনোনয়ন এবং নির্বাচনের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য হলো বিশেষ এবং নির্বিশেষের পার্থক্য। মনোনয়ন—যেখানে ব্যক্তিবিশেষকে মনোনীতি করা হয় কোনো বিশেষ ব্যক্তির তরফে তার ইচ্ছামতো কোনোরকম গণতান্ত্রিক নিয়ম ও প্রক্রিয়া না মেনে। অপরদিকে নির্বাচন কোনো ব্যক্তির খেয়াল খুশির ব্যাপার নয়। যেখানে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে কাউকে একাধিক প্রতিযোগীর মধ্যথেকে নির্বাচন করা করা হয়। মনোনয়ন এবং নির্বাচন– এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য রয়েছে। তবে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য থাকলেও উভয়ের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ মিল রয়েছে তা হলো কাউকে ঠিক করা বা নির্ধারণ করা। মাহমুদ দারভীশ কবিতায় এখানে ইখতিয়ার শব্দটি সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে ইখতিয়ার এর অর্থ যে বেছে নেয়ার কথা বলা হয়েছে তাতে দারভীশ মূলত নির্ধারণ বা ঠিক করা অর্থে বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ যে রাষ্ট্র তিনি গঠন করতে চাচ্ছেন তার গঠন প্রক্রিয়া শুরু হবে মূলত বিপ্লবের মধ্যদিয়ে। বিপ্লবের জন্য প্রথমেই দরকার পুরো জনগোষ্ঠীর এমন সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা একটি বিশেষ চিন্তা ও মতাদর্শের সাথে একমত পোষণ করেন। একটি বিশেষ মতাদর্শকে যারা মেনে নিতে প্রস্তুত। যারা মেনে নিতে প্রস্তুত দারভীশ সেই অংশকেই নির্ধারণ করতে চাচ্ছেন। যাদেরকে দিয়ে তিনি একটি রাষ্ট্রগঠন করবেন। বিপ্লবের মুহূর্তে বিপ্লবী জনশক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। সেকারণে বিপ্লবের জন্য কেমন গণশক্তি তিনি কামনা করেন তারই বিশদ ইঙ্গিত এখানে বিধৃত হয়েছে।

বিপ্লবের জন্য যে গণশক্তির প্রয়োজন তা মূলত কেমন? দারভীশ মনে করেন, এই গণশক্তি হবে বিশুদ্ধ–নির্ভেজাল এই অর্থে যে, তাদের মধ্যে থাকবে অবিচল টিকে থাকার গুণ। আত্মিক ও বৈষয়িক দিক থেকে অসম্ভব শক্তির অধিকারী। যাদের তারুণ্য থাকবে দীর্ঘ। তারা মানুষের সর্বজনীনতার জন্য কাজ করবে। সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে তাদের সক্রিয়তা থাকবে। যাদের মধ্যদিয়ে মানুষের দারিদ্র্য অবস্থার অবসান হবে। মানুষের ক্ষুধা ও অভাব থেকে মুক্তি ঘটবে সেই গণশক্তির মধ্যদিয়ে। মানুষ তার সবথেকে প্রধান স্বভাব স্বাধীনতা ফিরে পাবে।[৪১২] সেই বিপ্লবী গণশক্তি হবে সবথেকে বিচক্ষণ, বুদ্ধিদীপ্ত। চিন্তাশীল। যাদের ভিতর থাকবে সফলতার বিশেষ শক্তি ও গুণাবলী। তারা মানুষের সঠিক নির্দেশক পন্থা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। যাদের ভিতর বিবেক, বোধশক্তি, ও মন-মননে রয়েছে মানুষের বৈষয়িকতা নিয়ন্ত্রণ, মানুষকে নেতৃত্ব দেয়ার শক্তি এবং মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব নীতি-নিয়ম-গঠনতন্ত্র-সংবিধান-আইনের প্রয়োজন রয়েছে তার সঠিক প্রণয়নশক্তি। কিন্তু

[৪১২]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০।

দারভীশ এমন গণশক্তি নির্ধারণ করবেন মানুষের হৃদয়ের বা বিবেকের নিয়ম ও প্রকৃতি মোতাবেক। সেই মানুষ যেমন তার দেশকে রক্ষা করবে তেমনি তার একটি নির্বাক জানোয়ার কুকুরকেও রক্ষা করবে। যাদের মধ্যে রয়েছে সামরিক, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাজ্ঞান; সাহিত্য-শিল্প-কবিতা-সংগীত-সৌন্দর্য্যবোধসম্পন্ন রুচি; যাদের মধ্যে রয়েছে ভালো শাসন ও নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা-সমালোচনা-পর্যালোচনা-সংশোধন-পরামর্শ-নির্দেশনার সঠিক চৈতন্য; যাদের মধ্যে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার অদম্য ইচ্ছা ও শক্তি। কিন্তু যাদের মধ্যে এসব গুণ-শক্তি অর্জন-গ্রহণ ও বিলিয়ে দেয়ার ব্যাপার নাই তাদের এই বিপ্লবী পন্থা থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত। দারভীশ তাদের বেছে নিতে আগ্রহী নন।[৪১৩]

নির্বাচন ও ন্যায় বিচার

১-৩

بأنى أنا الحاكم العادل
.. كرهت جميع الطغـاة
لأن الطغـاة يسـوسـون شـعبا من الجهلة[414]

আমি নিশ্চয়ই ন্যায় শাসক।
সীমালঙ্ঘনকারী সমস্ত তাগুতকে আমি ঘৃণা করি।
কারণ জালেম শাসকরা তৈরি করে এক জাহেল মূর্খ জাতি।

১-৪

. أنا .الحاكم الحر والعادل
.. وأنتم جماهيرى الحرة العادلة
سـننشـئ منذ انتخابى دولتنا الفاضلة
ولا سـجن بعد انتخابى ولاشـعر عن تعب
القافلة[415]

আমি ন্যায় ও স্বাধীন শাসক
এবং তোমরা ন্যায়ানুগ স্বাধীনতার গণমানুষ
নির্বাচনের মধ্যদিয়ে গড়ে তুলবো আমাদের কল্যাণময় রাষ্ট্র
আমার নির্বাচনের পর থাকবে না কোনো কারাগার,
থাকবে না কোনো কবিতা।

---

৪১৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ১১।
৪১৪. প্রাগুক্ত। প্র. ১২।
৪১৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫

নির্বাচন ও মনোনয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলা বাহুল্য। দারভীশ যেহেতু একটি সেকুলার মতাদর্শিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চান সেকারণে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তার কোনো অবস্থান থাকার কথা নয়। কিন্তু মনোনয়ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য জরুরি ক্যাটাগরি। বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রগঠনের জন্য নির্বাচন একটি স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক নিয়ম। দারভীশের কবিতায় তাই ব্যক্ত হয়েছে। নির্বাচনের মধ্যদিয়ে যেখানে তিনি গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণরাষ্ট্র করার প্রস্তাব করেন। যাতে মানুষের স্বাধীনতা, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কায়েমের ফলে যেখানে মানুষের সামাজিক অবস্থা এমন স্তরে উন্নীত হবে যেখানে কারাগারের আর প্রয়োজন হবেনা। এমনকি জুলুম নিপীড়ন না থাকার কারণে কোনো কবিকে তার বিরুদ্ধে কবিতা লেখারও প্রয়োজন হবেনা। তাই কবি বলেন, এমন রাষ্ট্রে কারাগার ও কবিতার প্রয়োজনও আর থাকবেনা।

এমন ন্যায়ানুগ সমাজের উত্থান হবে মূলত জ্ঞান, বিবেক ও চিন্তাশীলতার উপর ভর করে। কিন্তু তার জন্য জনগণের বিপুল সাড়া, বিপুল প্রশ্ন আসা অনিবার্য। যার জন্য জনতার নতুন পার্লামেন্ট গঠন জরুরি। নতুন নাগরিক সত্তা যার জন্য অনিবার্য। যে নতুন নাগরিক সত্তার মধ্যে অভিজাত-ধনিক শ্রেণি এবং গরিব-দরিদ্র, কৃষক-শ্রমিক, অসহায়-সর্বহারা এমনকি বিধবা নারীর মাঝে অসমতা ও বিভাজনের কোনো চেতনা থাকবেনা। যে নাগরিক সত্তার মাঝে নেতৃত্ব নির্বাচনে এসব বৈষম্য কোনোভাবে কাজ করবেনা। যেখানে জ্ঞানী, দার্শনিক সমাজ অতিশয় কমজানা মানুষের সাথে মিশে যাবে। কোনো বৈষম্যের কথা মাথায় রাখবেনা। যাতে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠবে গণমানুষের ভিতর থেকে যাতে কোনোরকম বিভাজিত সমাজের ধারণা ও আচরণ আর কাজ করেনা। যাতে জনগণ কোনো সংখ্যামাত্র নয়, বরং জনগণ মানেই জনশক্তি। যেখানে প্রতিটি মানুষই এক অপরের পরিপূরক।[৪১৬] কেউ কারো উপর প্রাধান্য বিস্তারের হীনসুযোগ নিতে পারেনা। দারভীশ মনে করেন, এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমই তিনি করতে চান তার জনগণকে নিয়ে।

অধিকার

মৌলিক মানবাধিকারের বাইরেও সাধারণ সব ব্যক্তি-অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের এখতিয়ার রয়েছে দারভীশ প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে। একটি স্বাধীন গণমানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র কেমন হওয়ার উচিৎ তার একটি পূর্ণচিত্র দারভীশ তার এ কাব্যে চিত্রিত করেছেন যথাযথভাবে। যেখানে মানবরচিত কোনো অসমতা ও বৈষম্যের অস্তিত্ব থাকবেনা। থাকবেনা, নিপীড়ন, জুলুম। এমন এক রাষ্ট্র নির্মাণ করা হবে যেখানে মানুষের হাতে ধরা দেবে অনন্ত সুখ আর সমৃদ্ধি। চারদিকে মানুষের জীবন সুখ, স্বাচ্ছন্দ, ভালোবাসা, দয়া-প্রেম ও মনুষ্যত্বের অপার্থিব দৃষ্টান্তে ভরে যাবে। যেন এক বেহশত তৈরি হবে মানুষের পৃথিবীতে।

---

[৪১৬]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১২।

سـمأمنحكم حق أن تتملوا ملامح وجهي في
.. كل عام جديد
سـأمنحكم كل حق تريدون حق البكاء على
موت قط شـريد
..وحق الكلام عن السـيرة النبوية فى كل عيد
وحق الذهاب إلى البحر فى كل يوم
.. تريدون
.. لكم أن تناموا كما تشـتهون
على أى جنب تريدون .. ناموا ،
لكم حق أن تحلموا برضاى وعطفى .. فلا
تفزعوا من أحد
سـأمنحكم حقكم فى الهواء.. وحقكم فى
الضياء
.. وحقكم فى الـغناء
سـأبنى لكم جنة فوق أرضى
كلوا ما تشـاؤون من طيباتى[417]

প্রতিটি নতুন বছরে আমি তোমাদের দেবো আমার অবয়ব পূর্ণ করার অধিকার
যারা মৃত্যুতে কান্নার অধিকার চাও তোমাদের সে অধিকার আমি দেবো
প্রতিটি ঈদে দেবো নবীর জীবন চরিত নিয়ে কথা বলার অধিকার
তোমরা যারা প্রতিদিন সমুদ্রে যেতে চাও দেবো তাদের অধিকার
যেভাবে যেদিকে যেমন করেই ঘুমাতে চাও দেবো ঘুমানোর অধিকার
তোমাদের অধিকার রয়েছে খুশি ও আবেগে থাকার
অতএব কাউকে ভয় পেয়ো না।
বাতাসে আলোয় থাকা তোমাদের সমস্ত অধিকার দেবো
অধিকার দেবো সংগীতের, গান গাওয়ার
এই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য গড়ে তুলবো এক বেহেশত
অতএব ইচ্ছামতো তোমরা সেখানে ভালো যাকিছু খাও-দাও।

---

৪১৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩।

৭-২

فحق الغضب
! وحق الرضا ، لى أنا الحاكم المنتخب
وحق الهوى والطرب
! لكم كلكم .فأنتم جماهير منتخبة[418]

সুতরাং আছে দ্রোহের অধিকার
খুশি ও সন্তুষ্টির অধিকার
আমার অধিকার আছে আমি নির্বাচিত শাসক
আছে তোমাদের সবার জন্য
প্রবল ইচ্ছা উত্তেজনা ও আনন্দের অধিকার
কারণ তোমরা নির্বাচিত জনগণ!

শাসনতন্ত্র ও রাজনৈতিক কাঠামো

মানুষের মধ্যে কোনো হিংসা, থাকবেনা, জিঘাংসা থাকবেনা। অন্যায় থাকবেনা। সমাজ এমনভাবে তৈরি হয়ে ওঠবে যেখানে হিংসার শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন হবেনা। মানুষকে বরং নিষেধ করা হবে শাস্তি আরোপ করতে। মানুষের মাঝে এনম নীতি ও রূহানিয়্যাতের প্রাণশক্তি ভরে উঠবে যেখানে রাজনীতি করতে দেখা যাাবেনা কাউকে। কোনো মানুষই যেন রাজনীতি করবেনা। ক্ষমতাচর্চা করতে আসবেনা কেউ। কারণ রাজনীতির মর্ম এমনভাবে গড়ে উঠবে যাতে মানুষের ফিতরাতের সাথে রাজনীতি একাকার হয়ে যাবে। রাজনীতির অর্থে তখন বিশেষ ধরনের রূপান্তর ঘটবে। যেখানে রাজনীতির মানে হয়ে উঠবে মানুষের মাঝে নৈসর্গিক সম্পর্কের সূত্র কিংবা মানদণ্ড। চলিত রাজনীতি বরং মানুষের জন্য কারাগার হয়ে যাবে। কবি তাই বলেন,

ولا تدخلوا فى السياسـة .إلا إذا صدر الأمر
عني...
لأن السياسة سجني[419]

রাজনীতিতে প্রবেশ করোনা। রাজনীতি কেবল তখনই সম্ভব
যখন আমার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে তা আপসেআপ।
কারণ রাজনীতি বস্তুত আমার কারাগার।

কিন্তু এমন রাষ্ট্র-সমাজের জন্য যে ন্যায়ভিত্তিক সমাজের প্রয়োজন তার শাসনপ্রক্রিয়া প্রথমেই গড়ে তুলতে হবে একটি প্রতিনিধিত্বশীল পরামর্শক পক্ষের মাধ্যমে।[৪২০] এই পরামর্শক বডির মাধ্যমে

---

৪১৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪।
৪১৯. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩।

সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এর মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্ভব হয়ে উঠবে। দারভীশ মনে করেন এতে করে সমাজে মানুষের সংখ্যারিষ্টের সত্য কিংবা গণতন্ত্রের সত্যকে মুক্ত করা সম্ভব। মানুষের মাঝে গ্রহণ-বর্জনের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা গড়ে উঠবে। যখন যে শাসনতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রত্যাখ্যান করতে চাইবে তার জন্য বিষয়টি সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু তার জন্য তাকে বিপ্লবী মতাদর্শের অনুকূলে গড়ে উঠতে হবে। দারভীশ মনে করেন, যে জনগোষ্ঠী বিপ্লবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। এবং একইসাথে বিপ্লবের মধ্যদিয়ে যখন রাষ্ট্র গঠন ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে তাকে বিদ্রোহ কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে হলে জনগণের বাইরে থেকে করতে হবে। যখন কারো বিদ্রোহ করার প্রয়োজন হয় তখন তার অর্থ হলো, সে ইতিমধ্যে বিপ্লব করা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর সে কার্যকর নয়। বর্তমান জনগণের সে আর অংশ থাকেনা। সে তখন অপর হয়ে ওঠে। সে চাইলে বের হয়ে যেতে পারে। জনগণ এক স্বাধীন সত্তার নাম।[৪২১]

এখানে দেখা যায়, দারভীশের নয়া রাষ্ট্রপ্রকল্প মূলত একটি মিশ্র ধারণার মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা একটি ধারণা। যেখানে একদিকে রয়েছে, মার্কসীয় অর্থে বিপ্লবী তত্ত্বের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রনির্মাণ, আবার একইসাথে সেই রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন। কারণ যখন দারভীশ বলেন, তিনি এমন সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করবেন, যেখানে কারাগার থাকবেনা, পুলিশী ব্যবস্থা থাকবেনা, আদালত থাকবেনা তখন এসব কথা বলার অর্থ হলো রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। অপরদিকে তিনি আধুনিক গণতান্ত্রিক এবং সেকুলার ব্যবস্থাও রাখতে চান। সংস্কার করা নতুন ধরনের পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা গড়তে চান। আবার বিপরীত দিকে, আরব-ইসলামি খেলাফত ব্যবস্থার ঐতিহ্যে যে শুরাতন্ত্র ছিল তাকেও আবার স্থান দিতে চান। এমন একটি মিশ্র ধারণার মধ্যদিয়ে দারভীশ তার নয়া রাষ্ট্রপ্রকল্প তুলে ধরেন তার আলোচিত কাব্যগ্রন্থ *আল দিকতেতোরায়*।

প্রস্তাবনা-২: ক্ষোভ-অসহিষ্ণুতা (খিতাব আল ধজার)

গণমাধ্যম ও ক্ষমতাকাঠামো: নতুন পরিবর্তনের প্রস্তাব

প্রস্তাবনা-২ অংশে দারভীশ বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্রের সমালোচনা করেছেন। প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি তার তীব্র অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে প্রস্তবান-২ অংশে। প্রথমে তিনি কি ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজ প্রত্যাশা করেন তার বয়ান উপস্থাপনের পর চলমান ক্ষমতা কাঠামো ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার এমন অবস্থান তুলে ধরেন। যেখানে তার ক্ষোভের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে চলমান ক্ষমতাকাঠামো। এর পরেই রয়েছে গণমাধ্যমের সমালোচনা। তবে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে কবির সমালোচনার ধার ছিল ভয়ানক। প্রচণ্ড ক্ষোভ উপচে দিয়েছেন খবরমাধ্যমের উপর। কবি বলেন,

ضجر
ضجر

[৪২০]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩।
[৪২১]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫।

ألا تشعرون ببعض الضجر!
فمن سنة لم أجد خبرا واحدًا عن بلادى
أما من خبر؟
نغير تقويمنا السنوى . . وننقش أقوالنا فى
الرخام
وندفنها فى الصحاري ليطلع منها المطر
على ما أشاء من الكائنات
وأحمل عاصمتى فوق سيارة الجيب ،
كى أتحاشى الضجر.. وما من خبر؟[422]

ক্ষোভ
ক্ষোভ
তোমরা কি অনুভব করতে পারো কিছু ক্ষোভ-অসন্তোষ!
একটি বছরে—পুরো একটি বছরে আমার দেশ নিয়ে
পাইনি একটি খবর
মাত্র একটি খবর!
আমরা পাল্টে দেবো বাৎসরিক ক্যালেন্ডার আর মার্বেল পাথরে
খোদাই করে আমাদের সমূহ বক্তব্য
দাফন করে দেবো মরুভূমির ভিতর যেন ওখান থেকে
সারা বিশ্বের প্রত্যাশিত সবকিছুর উপর ঝরে পড়ে বৃষ্টি...
এবং জিপ গাড়িতে বয়ে নিয়ে যাবো আমার এই রাজধানী
যেন এড়িয়ে যাই এইসব ক্ষোভ।

...তবে কি কোনো খবর নেই!

স্বাধীন গণমাধ্যম একটি রাষ্ট্রের মৌলিক ভিতগুলোর একটি। গণতান্ত্রিক এবং জবাবদিহিতামূলক গণভিত্তিক একটি রাষ্ট্রের জন্য মুক্ত গণমাধ্যম আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতা কাঠামোর অংশ হয়ে ওঠে যখন গণমাধ্যম তখন জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল একটি রাষ্ট্র সেখানে সত্যিকার অর্থে কার্যকর থাকেনা। কবি তাই গণমাধ্যমের প্রতি গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন,

---

৪২২. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৭।

وأكتب فى العام عشرين سطرا بلا خطأ
نحوى،
وتعرف يا شعب أني رسول المقدر
وألغي الزراعة ، ألغي الفكاهة ، ألغي
الصحافة
ألغى الخبر .وما من خبر؟.

কোনো খবর নাই!
ব্যাকরণগত ভুলছাড়াই বছরে আমি লিখি মাত্র বিশছত্র
তোমরা জানো হে জনগণ– আমি ভাগ্যদূত
কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করি এই কৃষি
প্রত্যাখ্যান করি গুজব-বিদ্রুপ
প্রত্যাখ্যান করি এই মিডিয়া এবং খবর। কোনো খবর নেই?

কবি আরো বলেন,

وأحرم نفسى من الكاميرا والصور
وما من خبر؟[423]

আমি নিষিদ্ধ করি আমাকে ক্যামেরা এবং পিকচার থেকে
কোনো খবর নেই!

বিপ্লবের জন্য এবং ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য সবথেকে বড় বাধা বিদ্যমান গণমাধ্যম। দারভীশ যে রাষ্ট্র নির্মাণ করতে চেয়েছেন তার জন্য প্রথম কাজ ছিল গণমাধ্যমের বিনির্মাণ ও পুনর্গঠন। কিন্তু এর জন্য প্রথমে তাকে বর্তমান ক্ষমতাকাঠামোর সাথে গণমাধ্যমকেও উপড়ে ফেলতে হবে। কারণ নতুন রাজনীতি বিনির্মাণের জন্য কয়েকটি বস্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব করেন দারভীশ। প্রথমত, একটি জাতির মনস্তাত্ত্বিক পাঠ ও নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয়ত, ভাষাগত নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বিন্যাস। তৃতীয়ত, সংস্কৃতির পুনর্বিন্যাস। ধর্মীয় আচার পালনের স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।[৪২৪] গণমাধ্যমের পাশাপাশি সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলোতেও কবি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কবি তাই বলেন,

وأغلق كل المسارح .. لا مسرح فى البلد
ولاسينما فى البلد
ولا مرقص فى البلد

৪২৩. প্রাগুক্ত। ১৯।
৪২৪. প্রাগুক্ত। পৃ. ২০-২১।

ولا بلد فى البلد
ولا نغمٌ آو وتر
وما من خبر؟[425]

কোনো খবর নেই!
আমি বন্ধ করে দেবো সবকটি নাট্যমঞ্চ–
দেশে থাকবেনা কোনো নাট্যমঞ্চ
থাকবেনা কোনো সিনেমা
থাকবেনা কোনো নর্তন কুর্দন
থাকবেনা কোনো সুর একতারা

কোনো খবর নেই!

বর্তমান রাজনৈতিক শ্রেণি এবং বিবদমান ক্ষমতা কাঠামোর বিপরীতে দারভীশ তার নতুন রাষ্ট্রপ্রকল্প উত্থাপন করেন। উত্থাপন করেন নতুন রাজনীতির প্রস্তাব। যেখানে বিবদমান ক্ষমতাকাঠামোর পরিবর্তনে রাজনৈতিক চৈতন্য, দেশাত্ববোধ সবথেকে জরুরি। তার সাথে অনিবার্যভাবে রয়েছে বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের মানসিকতা। রাজনৈতিক পবির্তনে দারভীশ সমাজের শ্রেণিগত ঐক্য ও সংহতির প্রস্তাব করেন। সমাজে সবথেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় শ্রেণি হিসেবে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহবান করেন দারভীশ। একইসাথে তিনি মুসলমানদেরকে নৈতিক জীবন ও আধ্যাত্ব চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন। ধর্মীয় বিধি বিধান ও আচার প্রতিপালনে যত্নশীল হতে গুরুত্বারোপ করেন। অপরদিকে মুসলমান সমাজকে তিনি সময়মতো বিক্ষুব্ধ হওয়ার ও অসন্তোষ প্রকাশের ব্যাপারেও পরামর্শ দান করেন। পাশাপাশি অসহিষ্ণুতা ও শান্তির পন্থা অনুসরণেরও প্রস্তাব করেন। দারভীশ মনে করেন, একজন নাগরিকের যেমন শান্ত এবং শান্তি ও নিরাপদে থাকাটা জরুরি। তেমনি জরুরি যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ।[৪২৬] বিবদনমান ক্ষমতাকাঠামোর সমালোচনা করে কবি নিজের নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কবি নিজেকে একটি জনশক্তির নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে অভিহীত করেন। যেকারণে তিনি গণশক্তির তরফে তিনি প্রস্তাব করে বলেন, নতুনধারা, নতুন সময় এবং নতুন জীবনব্যবস্থা ও আইন-সংবিধানের ক্ষমতা কেবল তারই হাতে। কবি যেখানে গণতান্ত্রিক দর্শন মতে জনগণের প্রতীক হয়ে ওঠেন। ফলে তিনি জনগণের হয়ে নতুন ধারা প্রস্তাবের কথা বলেন। কবি বলেন,

[৪২৫]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৯।
[৪২৬]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৯, ২৩, ২৪।

ومن واجبى أيها الشعب أن أتسلى
قليلا ، فمن يعيد إلى ساحة الموت
أمجادها؟
اخطئوا .. اخطئوا .. واسرقوا وافسقوا[427]

একটু প্রশান্তি দেয়াই আমার কাজ, জনতা হে!
অতএব কারা মৃত্যুর আঙ্গিনায় তার গৌরব ফিরিয়ে আনে?
তারা তো সব ভুলে গিয়েছিল, করেছিল লুটপাট
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব ছারখার করে দিয়ে তারা
মেতেছিল বিশৃঙ্খলা নৈরাজ্যে।

নয়া প্রস্তাব দিতে গিয়ে কবি বলেন,

وحيد أنا، أيها الشعب، أعمل وحدي
و وحدي أسن القوانين...وحدي أحول مجرى النـهر.
أفكر وحدي أقرر وحدي[428]

একমাত্র আমিই আমল করি কার্যকর করি জনতা হে!
আমিই কেবল প্রবর্তন করি আইনের ধারা, আমিই কেবল
বদলে নদীর গতিধারা
কেবল আমিই ভাবি চিন্তা করি...

কিন্তু সবকিছুর পরও দারভীশ মনে করেন বিপ্লবের জন্য সাধারণ চাহিদা হলো বিক্ষুব্ধ হতে পারা। ক্ষোভ প্রকাশের মন থাকা জরুরি একটি জাতির জন্য। একটি জাতির পরিবর্তনের জন্য সবথেকে বেশি জরুরি জনগণের এমন একটি অংশ যারা ক্ষমতার বিপরীতে প্রশ্ন করতে পারে। দারভীশ এমন একটি প্রশ্নকারী জনগোষ্ঠী তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করেন তার এ কবিতায়। ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক শর্ত হলো একটি বিক্ষুব্ধ মন। একটি অসন্তুষ্ট জাতীয় মানস। যে মনের থাকবে অভিযোগ করার ক্ষমতা। প্রশ্ন করার শক্তি। অস্বীকার করার শক্তি। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেন,

وأنسي همومي في الحكم، أنسي التشابه بيني
و بين الملوك القدامي، وأنسي العبر..
أما من فتي غاضب في البلد؟[৪২৯]

এবং আমি ভুলে যাই শাসনপ্রক্রিয়া নিয়ে আমার বিষণ্ণতার কথা

[৪২৭]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২১-২২।
[৪২৮]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২২-২৩।
[৪২৯]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২২।

ভুলে যাই আমি এবং পূর্ববর্তী রাজা-বাদশা-সম্রাটদের মাঝে তুলনার কথা
আমি ভুলে যাই সেসব উপদেশ ও শিক্ষা...
তবে কোথায় একটি রাষ্ট্রের সেসব বিক্ষুব্ধ তারুণ্য?

প্রস্তাবনা-৩: শান্তি (খিতাব আল সালাম)
প্রস্তাবনা-৩-এ কবি মাহমুদ দারভীশ শান্তি নিয়ে বিশদ আলোকপাত করেছেন। শান্তি একটি জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্য হতে পারে। কিন্তু সে লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া শান্তি বা নয়। বরং সেই লক্ষ্য বা শান্তি অর্জনের জন্য প্রক্রিয়া হলো প্রতিরোধ, যুদ্ধ, আন্দোলন, লড়াই-সংগ্রাম। কিন্তু প্রতিরোধ, লড়াই-সংগ্রাম থামিয়ে দেয়ার নামই মূলত হয়ে উঠেছে শান্তি উদ্যোগ। ফলে যে বিরতি বা যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টাগুলো চলে তাতে প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি আসেনা। শান্তি আরো কঠিন হয়ে ওঠে। যেকারণে ফিলিস্তিনীদের জীবনে জাতীয় রাজনীতিতে যে শান্তি নামক প্রচেষ্টাগুলোর অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে তাতে শান্তির সমালোচনা জরুরি হয়ে উঠেছে। সাধারণ ফিলিস্তিনী জনগণের কাছে শান্তির প্রতি কোনো আগ্রহ তৈরি করতে পারেনি বর্তমান ক্ষমতাকাঠামো। মানুষের জীবনে তাই শান্তি একটি প্রশ্ন হয়ে আছে।

দারভীশ শান্তির বিরোধী নয়। দারভীশ মনে করেন, শান্তি কখনো পন্থা হতে পারেনা। শান্তি যেহেতু অর্জনের একটি বিষয়, সেকারণে তা অর্জনের জন্য মানুষ যে সাধনাগুলো করে যায় তাই ফিলিস্তিনীদের করে যেতে হবে। ফিলিস্তিনের জন্য শান্তি অর্জনের প্রক্রিয়ায় সবথেকে প্রাথমিক কাজ হলো স্মৃতি রক্ষা। মানুষের স্বপ্ন, কল্পনা এবং চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করা। একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে ফিলিস্তিনকে মূলত একটি কল্পনার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। আর সেই কল্পনার নাম হলো জাতি হয়ে ওঠার কল্পনা। ফিলিস্তিন ঐতিহাসিকভাবে যেসব অর্জনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায় এবং এগিয়ে যাওয়ার পথে যেসব বাধা-প্রতিবন্ধকতা, ঘাত-প্রতিঘাত, বিপর্যয় ও ধ্বংসাবস্থার মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছিল সেসব স্মৃতি জাগিয়ে তোলার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিন পুনরায় তার জাতীয় চৈতন্য ফিরে পারে। একটি রাষ্ট্র নির্মাণের প্রাকশর্ত হিসেবে স্মৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দারভীশ মূলত একটি দেশের উপর যুদ্ধ এবং ইজরাইল ও জায়োনিস্টদের মতো একটি শত্রুপক্ষ অনন্তকালের জন্য চাপিয়ে দেয়ার পরিণতি হিসেবে ফিলিস্তিনের জাতিগঠন নিয়ে যে উদ্বিগ্নতার মধ্যে যেতে হয় তার গভীর উপলব্ধি হাজির করতে বেশি আগ্রহী। দারভীশ সেকারণে প্রথমে গণচৈতন্যের উপর জোর গুরুত্বারোপ করেন। দারভীশ বলেন,

.. وآن أوان الحقيقة ، فليرجع الوعى للوعى
لن أمهلك
سوى ساعتين ، لتنسى الزمان الذي أهملك
وإلا ، سأعلن إضراب زوجاتكم فى

المضاجع :
إما الصيام عن النوم ما بين أفخاذهن
وإما السلام .

أنا عودة الوعي ، لا وعي حولي ولا وعي
قبلي ولا وعي بعدي
عرفت التصدي
عرفت التحدي[430]

সত্যের সময় ঘনিয়ে আসছে, চৈতন্যের জন্য ফিরে আসুক চৈতন্য
আমি কখনো তোমাকে দুই ঘণ্টার বেশি সময় দেবো না, যেন তুমি ভুলে যাও সময়
যে সময় তোমাকে অবহেলা করেছিল।
না হয় তবে আমি বিছানায় তোমাদের স্ত্রীদের প্রহারের ঘোষণা দেবো
হয়তো তাদের উরুতে ঘুম থেকে বিরত থাকা অথবা শান্তি।

আমিই চৈতন্যের প্রত্যাবর্তন।
আমার চারপাশে কোনো চৈতন্য নেই। সামনে নেই কোনো চৈতন্য
পিছনেও নেই কোনো চৈতন্য
আমি জানি কেমন করে সামাল দিতে হয়
আমি জানি কেমন করে চ্যালেঞ্জ নিতে হয়।

দ্বিতীয়ত প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ। একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের টিকে থাকার জন্য প্রথম প্রয়োজন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করা। দ্বিতীয়ত, শত্রুর মোকাবেলায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা।[৪৩১] কিন্তু প্রতিরক্ষা কথাটি যেহেতু যুদ্ধকে পূর্বানুমান হিসেবে ধরে নেয়, একইসাথে শান্তি কথাটিও যুদ্ধকে পূর্বানুমান হিসেবে ধরে নেয়। ফলে যুদ্ধ ইস্যুটি আর রাখঢাক করে এড়িয়ে যাওয়া যায়না। কিন্তু দারভীশ এখানে সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধের কথা বলেননি। বরং তিনরকম যুদ্ধের কথা জাতিগঠন প্রশ্নে তিনি প্রস্তাব করেন। ভূমি নিয়ে একটি যুদ্ধ, রুটি বা খাদ্য সংস্থানের জন্য একটি যুদ্ধ আরো একটি যুদ্ধ চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির জন্য। এ তিন প্রকার যুদ্ধের কথা বলেছেন যেখানে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা তিনি সরাসরি বলেননি। দারভীশ বরং সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি জোর দিয়েছেন কৌশলগত নেতৃত্বের লড়াইয়ে। যুদ্ধ সহিংস হোক আর অহিংস হোক, ফিলিস্তিনকে যুদ্ধের মধ্যদিয়েই যেতে হবে এমন নিয়তিও তাদের নির্ধারণ হয়ে আছে বলে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন দারভীশ। যদি শান্তির কিছু ছিটেফোঁটা ফিলিস্তিনের ভাগ্যে লিখা হয়ে থাকে তবে তা কেবল প্রতিরোধ, আন্দোলন

[৪৩০]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৮।
[৪৩১] প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫।

আর লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমেই আসবে। কথিত শান্তির মাধ্যমে আসবে কিনা তাতে জোর সংশয় প্রকাশ করেন দারভীশ। দারভীশ বলেন,

لهذا ، سأطلب من شعبى الحر أن يتكيف
فورا ،
وأن يتصرف خير التصرف مع خطتى.
سأجنح للسلم إن جنحوا للحروب
سأجنح للغرب إن جنحوا للغروب
سنجنح للسلم مهما بنوا من حصون
ومهما أقاموا على أرضنا ..
ليعيش السلام[432] ..

حروب . . حروب . . حروب
أما من قيـادة
!لتوقف هذا العبث ؟
وتوقف إنتاج مستقبل غامض من جثث ؟
أفي الغاب نحن لنقتل جيراننا الباحثين على
أرضنا عن وسادة ؟.
وما الحرب يا شعب إلا غرائز أولى، خلاف
صغير
على الأرض ، ما الأرض إلا رمال على الرمل
هل دمكم أيها الناس أرخص من حفنة
الرمل ؟[433].

তাই আমি চাই, আমার স্বাধীন জনগোষ্ঠী দ্রুত অ্যাডাপ্ট করে নেবে
আমার ইচ্ছার সাথে ভালো কিছু করবে
যদি তারা যুদ্ধমুখী হয় তবে আমি ঝুঁকবো শান্তির জন্য
যদি তারা অস্তগামী হয় তবে আমিও হবো অস্তগামী
তবে যখন তারা বানিয়েছিল দূর্গ আমি তাতে নুয়ে পড়বো শান্তির জন্য
কিন্তু যখন তারা আমাদের ভূমিতে বসতি স্থাপন করলো
শান্তি তবে দীর্ঘজীবী হোক...

---

৪৩২. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬।
৪৩৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬-২৭।

যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ...
তবে কি নেতৃত্ব নেই?
এমন অনর্থ বন্ধ করার জন্য
বন্ধ করার জন্য এমন
লাশের ভিতর থেকে উঠে আসা ঘোর ভবিষ্যৎ।
আমি কি তবে জঙ্গলের ভিতর হত্যা করবো আমাদের প্রতিবেশী?
তারা বস্তুত আমাদের ভূমিতে বালিশ সন্ধান করছিল
যুদ্ধ তবে আদিম স্বভাব ছাড়া কিছুই নয়—
ভূমি নিয়ে বিরোধ। ভূমি কি তবে? ভূমি তো
কেবল বালুর উপর বালু
তোমাদের রক্ত কি একমুঠো বালুর চেয়েও শস্তা?

তবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য জরুরি শক্তিশালী নেতৃত্ব। ফিলিস্তিন যে অবস্থার মধ্যে যাচ্ছে যেখানে জায়োনিস্টদের ভয়-সন্ত্রাসী পরিস্থিতি, নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, রাজনৈতিক সংকট তীব্রতরো সেখানে বরং শান্তি কার্যকর পন্থা হতে পারেনা। বাইরের যে শান্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে তার বিপরীতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট আরো জটিল। বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা, অভন্তরীণ বিদ্রোহ-কোন্দাল-সংঘাত বরং আরো বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে নিজেদের বৃহত্তর চেষ্টাগুলো। নস্যাৎ করে দিতে পারে শত্রু মোকাবেলার যাবতীয় প্রস্তুতি ও আয়োজন।[৪৩৪] এর ফলে নিজেদের নেতৃত্ব একটি বড়ধরনের সংকটে পড়ে যেতে পারে। এর জন্য নিজেদের রাজনৈতিকবোধ শক্তিশালী কার বিকল্প নাই। নিজেদে আরো সংগঠিত হওয়ার বিকল্প নাই। নিজেদের অভ্যন্তরীণ সামগ্রিক পরিস্থিতি জোরদার করার সাথে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিও সরাসরি সম্পর্কিত। যাইহোক, দারভীশ শান্তি-প্রস্তাবের শেষাংশে পশ্চিমা শক্তির তীব্র সমালোচনা করেন। একইসাথে কূটনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান প্রকাশ করেন। যারা বস্তুত ফিলিস্তিনের শান্তি নিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে মোটেই উদ্বিগ্ন নন বলে মনে করেন দারভীশ। দারভীশ মনে করেন, জাতীয় রাজনীতি নির্ধারণের জন্য শত্রুসম্পর্কিত জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুর বিপরীতে নিজেদের সুসংহত করার জন্য নিজের কর্তাসত্তা শক্তিশালী প্রাথমিক কাজ। দ্বিতীয়ত, নিজেদের রাজনৈতিক স্মৃতি এবং ইতিহাসের দিকে নজর ফেরানো জরুরি। যাতে পুনরায় ফিলিস্তিন তার জাতীয় আত্মচৈতন্য খুঁজে পায়।[৪৩৫]

---

[৪৩৪]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২-৩৩।
[৪৩৫]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৯-৩৩।

প্রস্তাবনা-৪: শাসক (খিতাব আল আমীর)

এ প্রস্তাবে একজন শাসকের মৌলিক চারিত্রিক গুণাবলী, ব্যক্তিত্ব এবং কর্তব্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শাসকের সাথে জনগণের সম্পর্ক, জনগণের সাথে শাসকের সম্পর্ক, যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, জাতিগঠন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরক্ষা, সমাজ-সংস্কার, উন্নয়ন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কবিতার পঙক্তি সাজিয়েছেন দারভীশ।

حبوا الأمير ، وخافوا الأمير
ولا تقنطوا من دهاء الأمير
فليست لنا غاية فى المسير
ولا هدف ، غير أن تستقر الأمور
على ما استقرت عليه : أمير على عرشه
.. وشعب على نعشه
أنا خنجر من حرير
أحب الرعية إن أخلصت[436]

শাসককে ভালোবাসো, ভয় করো শাসক।
তবে শাসকের চাতুর্যে হতাশ হয়ো না
এই জীবনযাত্রায় আমার কোনো গন্তব্য নেই
লক্ষ্য নেই, তবে সমূহ বিষয় যেভাবে স্থির হয়ে গেছে
আমি শুধু চাই তার প্রতিষ্ঠা:
শাসক থাকবে সিংহাসনে–জনগণ থাকবে ঘুমে শান্তিতে তন্দ্রায়...
কিন্তু আমি এক সিল্কি খঞ্জর
যদি তুমি নিষ্ঠাবান হও তবে ভালোবাসতে পারি এই স্বাধীন প্রজাতন্ত্র।

গণপ্রতিরক্ষা ও সৈনিকতা

যুদ্ধ–শান্তি এবং গণপ্রতিরক্ষার ধারণা এ প্রস্তাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। যুদ্ধ এখানে গণপ্রতিরক্ষামূলক ধারণার অন্তর্গত বিষয়। যেখানে রাষ্ট্রের যেমন বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী থাকবে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকও নিরাপত্তাকর্মী। প্রতিটি নাগরিকই যেখানে সৈনিক। রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ। সৈনিকতার এমন ধারণা এ প্রস্তাবে বেশ গুরুত্বের সাথে বিস্তারিত হয়েছে। দারভীশ মনে করেন, রাষ্ট্র এমনভাবে তৈরি করা জরুরি যাতে একটি সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সাধারণ সামরিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থাকে। এমনভাবে জনগণকে তৈরি করা জরুরি যাতে সৈনিকতার তাৎপর্য তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সৈনিকতার সাথে একজন নাগরিকের আত্মমর্যাদা

[৪৩৬]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৫।

রক্ষার বিষয় সরাসরি জড়িত একইসাথে সৈনিতকতা একজন নাগরিকের মনোবল শক্তিশালী রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপায়। সৈনিকতার ধারণায় বস্তুত রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর মাঝে বিভাজন মুক্ত করা সম্ভব। সাধারণ নাগরিক এবং সামরিক বাহিনীর মাঝে সংহতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। প্রতিরক্ষানীতিকে গণমুখী করার জন্য ইজরাইলের বিপরীতে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষানীতি সবথেকে জরুরি। দারভীশ মনে করেন, এর জন্য সবথেকে কার্যকর নীতি হবে গণপ্রতিরক্ষানীতি। যেখানে সামরিক বাহিনী এবং জনগণের মাঝে প্রতিরক্ষাগত একটি সাধারণ সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইজরাইলের বিপরীতে ব্যাপকভাবে গণশক্তি গড়ে তোলার জন্য দারভীশ বলেন, একটি তসবিহ যেভাবে মালাবদ্ধ করতে হয় তেমনি দেশের প্রতিটি নাগরিককে একেকটি দানার মতো একই সুতোয় বাঁধতে হবে। যেখানে শুধু নাগরিকই থাকবেনা। থাকবে সামরিক বাহিনীর প্রতিটি সদস্যও। সেনাবাহিনী এবং সাধারণ জনগণকে গণপ্রতিরক্ষানীতির এই সুতায় গেঁথে দারভীশ বস্তুত ফিলিস্তিনে নতুন এক রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাবনা হাজির করেন। ফিলিস্তিনে জাতীয় রাজনীতিতে পিএলওসহ মার্ক্সবাদী ধারা এবং ইসলামী ধারার কোনো রাজনৈতিক সংগঠন কিংবা কোনো বুদ্ধিজীবী বা রাজনীতি বিশ্লেষকের তরফে এমন প্রস্তাবের কথা জানা যায়নি। তবে চীনের মাওবাদী ধারায় এক ধরনের গণবাহিনীর ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া গণপ্রতিরক্ষার ধারণা মূলত আধুনিক পশ্চিমা রাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষাতত্ত্বেরই একটি ধারণা। তবে ইজরাইলে সাধারণ নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের রীতি জোরালোভাবে চলমান রয়েছে। দারভীশ হয়তো ইজরাইলের এমন পদক্ষেপ থেকে প্রতিরক্ষাকে গণপ্রতিরক্ষানীতিতে রূপান্তরিত করার চিন্তা করতে পারেন। গণপ্রতিরক্ষা নীতি ছাড়াও দারভীশ সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষার পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব করেন এমন নীতি ও নির্দেশনার যা স্থির নয়–অপরিবর্তনীয় নয়, আবহমান নয়, বরং যেকোনো পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে নীতি এবং আদর্শেরও পরিবর্তন করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। দারভীশ বলেন,

أنا صانع الجيش من كل جيش بلا أسلحة
جمعت الجنود كما تجمع المسبحة
لأبنى مجتمعًا للتحدي ومجتمعًا للتصدي
ومجتمعا يدمن المذبحة
أنا السيف والورد والمصلحة
وليس على ما أقول شهود
وليس على ما أريد قيود
وليست عقيدتنا صنما جامدا ، فاحذروا
نفاق الصديق .. وحاجته للتمدد خلف
الحدود[437]

৪৩৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৬।

আমি নিরস্ত্র সৈনিকতার কারিগর
আমি একসুতায় সংঘবদ্ধ করেছি তসবিমালার মতো সৈনিক
যেন গড়তে পারি চ্যালেঞ্জিং একটি সমাজ
পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম একটি সমাজ
হত্যাপাগল একটি সমাজ
আমি একইসাথে তরবারি গোলাপ এবং শান্তি-কল্যাণ
আমি যা বলি তার কোনো সাক্ষ্য নাই
আমি যা চাই তার কোনো প্রতিবন্ধক নাই
আমাদের আদর্শ কোনো স্থিরমূর্তি নয়
সাবধান হও নীতিবান বন্ধুর ভণ্ডামি কপটতা থেকে
যার কাজ সীমান্তের আড়ালে কপটতা বিস্তার।

দারভীশ প্রতিরক্ষা নীতিকে সামনে রেখে এমন একটি ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মধ্যে সংযোজিত করতে চান যাতে বিদ্যমান অবস্থার অবসান হয়ে নতুন ব্যবস্থার উত্থান ঘটে। যাতে নতুন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গড়ে ওঠে নতুন নতুন অর্থনৈতিক উদ্যোগ। যেখানে বিশেষ ধরনের কল্যাণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। দারভীশ বলেন,

فالشعب نصفان : جيش وباعه
ولا تعملوا في المصانع ، فهى ديون على دولة
تتنامى
رويدا رويدا على فائض الحرب من شهداء
ومن جثث في العراء ، وبترولنا دمكم
والصناعة إنتاج ما أنتجت حربنا من يتامى
نوظفكم في معارك لا تنتهى كى يعيشوا

জনগণ দুই প্রকার– সৈনিক এবং বিক্রেতা
তোমরা ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করো না
এসব ফ্যাক্টরি ক্রমবর্ধমান একটি রাষ্ট্রের দায় মাত্র
শহীদ আর খোলা রাস্তায় পড়ে থাকা লাশেদের
যুদ্ধলব্ধ লাভের উপর ধীরে ধীরে বাড়ছে এই রাষ্ট্র
তোমাদের রক্তই আমাদের পেট্রোল
এবং নিঃস্ব অসহায় মানুষদের যুদ্ধ যা তৈরি করে দিয়েছিল
তার পুনরুৎপদানই বস্তুত শিল্প-প্রযুক্তি
তাদের জীবনযৌবনের জন্য আমরা তোমাদেরকে প্রতিনিয়ত
এক অনিঃশেষ যুদ্ধে নিয়োজিত করি

তবে দারভীশ যে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রস্তাব করেন তার সাথে বিরোধাত্মকভাবে জড়িয়ে আছে যুদ্ধ এবং অস্ত্রের পুঁজি। সাম্রাজ্যবাদী এবং পরাশক্তির যে প্রতিযোগিতা কর্তৃত্বশীল রয়েছে সামরিক এবং প্রতিরক্ষা অর্থনীতির ক্ষেত্রে দারভীশ মনে করেন তার পেছনে রয়েছে যুদ্ধের বড়ধরনের ইন্ধন। দারভীশ সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি এবং যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ শক্তির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে। ফলে যুদ্ধের শিকার জনগোষ্ঠীগুলোই মূলত সামরিক অর্থনীতির পুঁজির পুঞ্জিভবন গড়ে তুলছে। ফলে এমন অবস্থায় একটি স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে তোলা অনেক জটিল এবং অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৪৩৮]

প্রস্তাবনা-৫: কবর (খিতাব আল কবর)

ক্ষমতার ধর্মতত্ত্ব এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কবর

কবর—বিশেষ ধরনের এক ধারণা আকারে বিস্তার লাভ করেছে এখানে। *কবর* আরব-ইসলামী ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে আছে। কবরকে ঘিরে যেমন ধর্মীয় আচার এবং বিধিবিধান রয়েছে তেমনি রয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে লালিত বিচিত্র পুরাণ ও লোকগাথা। কিন্তু দারভীশ এখানে ধর্মকে নানান দিক থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত দারভীশের কবিতায় কবর একটি রূপক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কবরের মধ্যদিয়ে দারভীশ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকাঠামো, কর্তৃত্ববাদী, রাজনৈতিক শ্রেণির বিচার করেছেন। ক্ষমতার পতন, কর্তৃত্ববাদী আভিজাত্য, প্রাচুর্যের অহং এবং তার উত্তরাধিকার ও স্মৃতি কিভাবে তলিয়ে যায়—কোথায় এবং কেন হারিয়ে যায়—তার একটি চিত্র এঁকেছেন এখানে। আধিপত্যবাদী এবং স্বৈরাচারী শাসকদের স্মৃতি কেন এক সময় আর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনা আকারে তা থেকে শিক্ষা কিংবা উপদেশ ছাড়া যাদের আর কোনো মূল্য নেই কিংবা কখনো কখনো একেবারে নামচিহ্নহীন হয়ে পড়ে তাদের সব কর্মকাণ্ড। তারা শাসন-কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতাকে এতোটাই পুজনীয় করে তোলেন যাতে একসসময় তারা তাকে চিরস্থায়ী এবং অমর মনে করতে শুরু করেন কিন্তু এক সময় এমন ক্ষমতার সত্য সত্যিকার অর্থে আর কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমন পতনদশাকেই দারভীশ ক্ষমতার কবর হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বাতিল ক্ষমতা, আধিপত্যবাদী ক্ষমতা একসময় এক সময় যাকে পতনের মুখোমুখী হতে হবে। ক্ষমতার সত্য কখনো অমর ও অক্ষয় হতে পারেনা। দারভীশ বলেন,

أعدوا لى القبر قصرا يطل على القصر
. من وجهة البحر، قصرا يدل الخلود عليَّ
يدفع أحلامكم صلوات ..إلى
فمن كان يعبر هذا البلد
ومن كان يعبر هذا الجسد

---

[৪৩৮]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৯।

فمن حقه أن يصدق أنى حى
وحى هو العرش حتى الأبد[439]

আমার কবরকে একটি প্রাসাদ করে তোলো
সমুদ্রের প্রান্ত থেকে যা উঁকি মারবে
একটি প্রাসাদ গড়ে তোলো যা আমার অমরত্বের প্রতীক হয়ে ওঠবে
আমার নাম-পরিচয়ের এক কঠিন মর্মর পাথরের পাহাড়সম উচ্চতা
তোমাদের স্বপ্নগুলো আমার কাছে নামাজ হয়ে ওঠবে
অতএব যারা এমন রাষ্ট্র ক্ষমতার পুজা করতো
তাদের এমন রাষ্ট্রই শেষপর্যন্ত নাই হয়ে গেছে
যারা এমন শরীর ও দেহের পুজা করে
তাদের সত্য হলো নিজেকে চিরঞ্জীব মনে করা
যেন সে খোদ নিজেই এক সিংহাসন চির অক্ষয় অবিনশ্বর

এছাড়া ফ্যাসিবাদ, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও শাসক এবং ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি ও জীবন প্রক্রিয়ার সমালোচনা করেন দারভীশ। যাদের ক্ষমতা বস্তুত বিশেষ ধরনের ধর্মতাত্ত্বিক বাসনার মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে। কারণ তাদের ক্ষমতার মানস ক্ষমতা ও কর্তৃত্ববাদ সম্পর্কিথ বিশেষ ধর্মতাত্ত্বিক সত্তা হয়ে ওঠে। কারণ তারা ধরে নিয়েছে, ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে হবে। ক্ষমতাকে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে ক্ষমতার কাঠামোতে অমরত্ব আরোপ করা আধিপত্যবাদী মতাদর্শের ধর্মতত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ ক্ষমতাসীন শ্রেণি মনে করে, ক্ষমতাকে আরো বেশি কার্যকর করার জন্য ক্ষমতার ধর্মতাত্ত্বিক ধারণায় পর্যবসিত করা জরুরি। ক্ষমতা যেহেতু আরোপ করার বিষয়, প্রয়োগ করার বিষয় সেকারণে তার মধ্যে খুব সহজে পুঁজার এসেন্স প্রবিষ্ট করা সম্ভব। ক্ষমতার প্রতিপালন এবং ক্ষমতার ধর্মতাত্ত্বিক হয়ে ওঠার এক জিনিস নয়। রাষ্ট্র এবং রাজনীতি যতোক্ষণ মানুষের জীবকে হাজির থাকে ততোক্ষণ ক্ষমতাও সক্রিয় থাকে। ফলে ক্ষমতা মাত্রই যার হাজির থাকা অনিবার্য। কিন্তু ক্ষমতা মাত্রই পুঁজার বিষয় নাও হতে পারে। তবে যখন তা ধর্মতাত্ত্বিক বাসনা ও গুণ নিয়ে হাজির হতে চায় তখনই তার বিলয় ঘনিয়ে আসতে থাকে। তার পরিণতি হলো কবর হয়ে ওঠা।

দারভীশ মনে করেন, রাষ্ট্রের সাথে ধর্মতত্ত্বের সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে পুঁজাগ্রহণের প্রবণতা পুরোপুরি বিদ্যমান। ফলে তা ক্ষমতা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ওঠে। কিন্তু রাষ্ট্রের বাইরেও ক্ষমতার পুঁজা নানাভাবে সামাজিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দেশ পূজা, শরীর পূজা ইত্যাদি

---

[৪৩৯]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৫।

আরো অনেক ধরনের পূজার ক্ষেত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে যখন খোদ ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপূজা কাঠামোগতভাবে বিকশিত হয়।[৪৪০] তবে ক্ষমতার এমন ধর্মতাত্ত্বিক সংস্কৃতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য জরুরি হলো ক্ষমতার কাঠামোকে পরিবর্তন করা। মানুষের মাঝে রূহানি এবং আধ্যাত্মিক চর্চার ধারা সৃষ্টি করা। ধর্মীয় ইবাদত চর্চা বাড়িয়ে তোলা। ইবাদতের স্থানকাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা। একইসাথে প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। রাষ্ট্র-ক্ষমতা এবং প্রকৃতির মাঝে পার্থক্যের অবসান ঘটানো। মানুষের জীবনকে প্রকৃতিঘনিষ্ট করে তোলা। প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ট করার পাশাপাশি মৃত্যুচিন্তা আরো নিবিড় করে তোলা। মোটকথা পূজাবিহীন একটি ক্ষমতাচর্চার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য মানুষের বিবেক, রূহানিয়্যাত, প্রকৃতিঘনিষ্টতা, মৃত্যুচিন্তা এবং ক্ষমতাকাঠামোর পুনর্গঠন, শত্রু মোকাবেলায় প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত করা জরুরি।[৪৪১]

প্রস্তাবনা-৬: চিন্তা (খিতাব আল ফিকরাহ)

ফিকরাহ—চিন্তা এবং আইডিয়া বা মতাদর্শে সমার্থক। প্রস্তাবের এ স্তরে দারভীশ মতাদর্শ, পার্টি, পার্টি-পলিটিক্স, বিপ্লব-বিপ্লবী চিন্তা, শ্রমিক শ্রেণি, শ্রেণি-সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, প্রোলেতারিয়েত, শ্রেণির বিলুপ্তি, রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ইত্যাদি মার্ক্সবাদী তত্ত্বের কাব্যরূপ দিয়েছেন। অপরদিকে, কৃষক শ্রেণির বিকাশ, শিল্পপুঁজির বিকাশ, শ্রমিক ও সর্বহারার বিপ্লব, শত্রুর ধারণা, বুর্জোয়া রাজনীতি ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সমালোচনা ও পর্যালোচনা করেন কবি দারভীশ। এছাড়া ইতিহাস বিনির্মাণের ধারণাও উপস্থাপন করেন কবি।[৪৪২]

প্রস্তাবনা-৭ নারী: (খিতাব আল নিসা)

নারী বিষয়ে এখানে বিবিধ পর্যালোচনা ও সমালোচনাসহ নিজের চিন্তাধারা তুলে ধরেন দারভীশ। একদিকে নারী সম্পর্কে ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কারের সমালোচনা করেন। অপরদিকে নারী সম্পর্কে ধর্ম- তথা ইসলামের প্রশংসাও করেন। নারীর সম্ভাবনাগুলোকে সামাজিক ও ধর্মীয় নানান বিধিবিধান ও রীতিনীতির মাধ্যমে অদৃশ্য করে দেয়া হয়েছে বলেন মন্তব্য করেন দারভীশ। তিনি মনে করেন, নারীর সৃষ্টিশীলতা, অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা বিভিন্নভাবে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। দারভীশ মনে করেন, একটি জাতিকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে নারীর অসম্ভব শক্তি রয়েছে। জাতিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নারীর অসামান্য শক্তি রয়েছে। একটি জাতিকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রের নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া কঠিন এবং অসম্ভব। নারীদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দেয়ার বিশেষ গুণ রয়েছে। ফলে নারীর সম্ভাবনা বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে। দারভীশ তাদের সীমাবদ্ধ না করতে, তাদের বিভিন্ন সম্ভাবনার পথে বর্জন না করতে এবং তাদের নিপীড়ন না করার আহবান জানান।[৪৪৩]

---

৪৪০. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৭-৪৮।
৪৪১. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৮-৫২।
৪৪২. প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৩-৬০।
৪৪৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ৬১-৬৮।

প্রস্তাবনা-৮: প্রস্তাবনার প্রস্তাব (খিতাব আল খিতাব)

ভাষার ক্ষমতা: নির্মাণ ও বিনির্মাণ

প্রস্তাবনার প্রস্তাবে ভাষাপ্রশ্ন মোকাবেলা করেছেন দারভীশ। দারভীশ মনে করেন, ভাষা বহুকারণে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের চিন্তার বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনুশীলন বস্তুত ভাষার মধ্যদিয়ে ঘটে। ভাষার কারণে মানুষের কথা বলার ধরন পরিবর্তন হয়ে যায়। বলার ধরন পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষের ক্ষমতা-সম্পর্কগুলোও বিভিন্নরকম হয়ে ওঠে। মানুষ তরবারির ভাষা বুঝতে পারে ভাষার কারণে। আবার তরবারির ক্ষমতা ভুলেও যেতে পারে ভাষার কারণে। ভাষার কারণে মানুষ শান্তির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। আবার শান্তির বিরোধিতা করে। শান্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ায় ভাষার কারণে। ভাষা যেমন আমাদের বাস্তবতাগুলো তৈরি করতে পারে তেমনি আমাদের বাস্তবতা এড়ানোর কিংবা বাস্তবতা থেকে পালিয়ে থাকার প্রবণতাও তৈরি করে ভাষা। ভাষা আমাদের ঘুমন্ত অবস্থা থেকে মুক্ত রাখতে পারে। জাগিয়ে তুলতে পারে আমাদের। শত্রুর সামনে, নিপীড়ক ক্ষমতার সামনে সত্য উচ্চারণের শক্তি তৈরি করতে পারে ভাষা।

সাধারণ মানুষের স্বপ্ন যখন বিশৃঙ্খল হয় ওঠে– নস্যাৎ হয়ে যায় তখন আমরা আসলে ঘুমে প্রবেশ করতে পারিনা। যখন ঘুমই হয়না তখন কিভাবে আমরা স্বপ্ন দেখবো? কিন্তু ভাষার মধ্যদিয়েই মানুষ স্বপ্ন দেখে। জেগে কিংবা না জেগে। ঘুমে নির্ঘুমে। মানুষ ভাষা থেকেই তার স্বপ্নের উপাদান গ্রহণ করে। ভাষা থেকেই মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের সূত্র তৈরি করে। আইন ও যুক্তি তৈরি করে ভাষা থেকে। বৈধতা এবং অবৈধতার সীমারেখা তৈরি করে মানুষ ভাষার মধ্যদিয়ে। দারভীশ বলেন,

: ومن لغتي تعرفون الحقيقة فى لفظتين .
حلال ، حرام
فلا تبحثوا فى القواميس عن لغةٍ لا تليق
بهذا المقام ،
.. فان زادت المفردات عن الألف عم الفساد
وساد الخراب ،
لأن الكلام الكثير غبار الذباب
وأن نظام الخطاب
.. خطاب النظام[444]

আমার ভাষা থেকে মাত্র দুটি শব্দে তোমরা জেনে নিতে পারো সত্য: হালাল, হারাম
তবে তোমরা ভাষার সন্ধান করোনা অভিধানের ভিতর। এ অবস্থার জন্য অভিধান যোগ্য নয়
যখন শব্দ হয়ে ওঠে হাজার হাজার তখন ফাসাদ বিশৃঙ্খলা ঘটে, খারাপের নেতৃত্ব আসে
কারণ অতিবাক্য মক্ষিকার ধুলাবালি মাত্র
প্রস্তাবের বিধান

---

৪৪৪. প্রাগুক্ত। প্র. ৭০।

বিধানের প্রস্তাব...

দারভীশ মনে করেন, ক্ষমতা গড়ে ওঠার সাধারণ ক্ষেত্র হলো ভাষা। ভাষার মধ্যে রয়েছে ক্ষমতার সম্পর্ক। মানুষের মধ্যে ভাষার কারণে যেসব পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে অন্যতম জুলুম নিপীড়নের ক্ষমতা। দারভীশ বলেন,

وفي لغتي قوتي. واقعي لغتي.[৪৪৫]/*এবং আমার ভাষায় রয়েছে আমার শক্তি। আমার বাস্তবতা আমার ভাষা।*/

ফিলিস্তিন যে বাস্তবতায় রয়েছে তা মূলত ইজরাইলের তৈরি করা বাস্তবতা। অর্থাৎ ফিলিস্তিনের বাস্তবতা কোনো না কোনোভাবে ইজরাইল ও জায়োনিস্টদের কাছে আটকে আছে। কিন্তু তার ভাষা ও বাস্তবতা গড়ে তুলছে ইজরাইল। দারভীশ মনে করেন, মানুষের সম্পর্কগুলোর পটভূমিতে রয়েছে ভাষা। ভাষা সামাজিকভাবে মানুষের অবস্থান নির্ধারণেও অবদান রাখে। দারভীশ তাই মনে করেন, মানুষের সম্পর্ক ও বাস্তবতা তৈরিতে ভাষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শত্রুর ভাষা যেমন ক্ষমতা-সম্পর্কের কারণে বোঝা সম্ভব, তেমনি তার অবস্থানও বোঝা যায় ভাষার মাধ্যমে। ভাষার মধ্যদিয়ে মানুষের ইতিহাস তৈরি হয়। মানুষের সামাজিক অবস্থান ও সম্পর্কগুলো নতুন করে গড়ে ওঠে। ফিলিস্তিনে ইজরাইলী দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে ফিলিস্তিনের যে ভাষা গড়ে উঠেছে দারভীশ তার পুনর্গঠনের প্রস্তাব করেন। রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিষয়াদি সম্পর্কিত হয়ে আছে ভাষার সাথে। ভাষাই যেন এখানে ফিলিস্তিনের রুটি ও খাদ্যব্যবস্থা নির্ধারণ করে। ভাষার কারণে কবি তার সাহসকে আকাশ পর্যন্ত ছাড়িয়ে যেতে দিতে পারে। ভাষার উপর নির্ভর করে নেতৃত্ব ও শান্তি শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে। কারণ ভাষার পুনর্বিন্যাসের সাথে ফিলিস্তিনের ক্ষমতা, বিপ্লব ও রাষ্ট্র নির্মাণের সামগ্রিক প্রক্রিয়া জড়িয়ে আছে।

৪.৯: মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা: অন্যতরো অর্থের সন্ধানে

রাজনৈতিক মুক্তি দারভীশের চিন্তা ও চর্চায় একটি মৌলিক দিক। ফিলিস্তিনের জাতিগত মুক্তি তার সারা জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত ছিল। কিন্তু বৈষয়িক মুক্তির উর্ধ্বে গিয়ে অন্যতরো এক মুক্তির বাণি উচ্চারিত হয় তার কবিতায়। যেখানে মুক্তিকে তিনি আরব-ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক সংস্কৃতি ও সূফী ঐতিহ্যের ভিতর দিয়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। তার স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল একদিকে ঐতিহাসিক অপরদিকে মানবাত্মার মুক্তি–যাকে মানুষের পরম মুক্তি কিংবা আধ্যাত্মিক মুক্তির দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। ঐতিহাসিক দিক থেকে দারভীশ ফিলিস্তিনের ভাষা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রোথিত উপনিবেশিক ধারাগুলো ভাঙতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ভাঙতে চেয়েছেন ভাষা-সাহিত্য-কবিতায় চেপে বসা উপনিবেশিক লিগ্যাসি। দারভীশ বিশ্বাস করেন, ভাষা ও কবিতার শক্তি অপরিসীম। কবিতার ভাষায় কিংবা মানুষের বাক ও ভাষায় প্রতিরোধ এবং

---

৪৪৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ৭১।

মুক্তির অসম্ভব শক্তি নিহিত রয়েছে।[৪৪৬] মানুষ যেখানে আটকে আছে তার নাম মূলত অধীনতা। এই অধীনতার অর্থ নানান দিক থেকে ব্যক্ত হয়। মানুষ যেখানে একদিকে নানান পরাশক্তির অধীন হয়ে আছে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধীনতার মধ্যে আটকে আছে। একইসাথে মানুষের নিজের মনের গভীরে যে পরাধীনতার মানস জেঁকে বসে আছে তার জটিল চাদরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মানুষের বিবেক ও পরম চৈতেন্যের শক্তি। দারভীশ সেকারণে ঐতিহাসিক মুক্তির বাসনা লালন করেন অপরদিকে মানুষের চিন্তার পরমমুক্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন। দারভীশের কবিতায় স্বাধীনতা কিংবা মুক্তি মূলত বোধগম্য হয়ে উঠেছে বিচিত্র প্রসঙ্গ অবতারণার মধ্যদিয়ে। দারভীশ কবিতার প্রাণ ও প্রকৃতি অক্ষুণ্ন রেখে কবিতাকে সহজাতভাবে রাজনীতি, অধিকারবোধ, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, আধ্যাত্মবোধ, পরমার্থিকতা, জ্ঞান-দর্শনচিন্তা, নন্দনতত্ত্ব ও সৌন্দর্যবোধের দিকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আধুনিক আরবী সাহিত্য সমালোচক, বুদ্ধিজীবী সুবহি হাদীদী মনে করেন, কবিতাকে এতোদিকে মেলে ধরার কিংবা তার কবিতায় এতো বিচিত্র প্রসঙ্গ উঠে আসার কারণ, তিনি ফিলিস্তিনের গণমানুষের সামষ্টিক চৈতন্য ও স্বপ্নকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৪৪৭] ফিলিস্তিনী মন ও মানসে যে দাসত্বসুলভ বাধার জগদ্দল খাড়া হয়ে আছে তা ভাঙার আহবান করেন তারভীশ ইতিহাস ও প্রত্নখচিত সমৃদ্ধির দিকে ইঙ্গিত করার মধ্যদিয়ে। দারভীশ বলেন,

لا بدَّ لي أن أرفض الموت ,
وإن كانت أساطير تموت
إنني أبحث في الأنقاض عن ضوء, وعن شعر جديد
آه.. هل أدركت قبل اليوم
أن الحرف في القاموس , يا حبي , بليد
كيف تنمو؟ .. كيف تكبر؟[৪৪৮]

মৃত্যুকে প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য অপরিহার্য
যদিও পৌরাণিক চরিত্ররা মরে গেছে—তবু আমি
তাদের ধ্বংসাবশেষের ভিতর আলোর সন্ধান করি
খুঁজি নতুন কবিতা। হায়... তুমি কি আগে জানতে—
অভিধানের ভিতর থাকে শুধু অক্ষর। হে ভালোবাসা অবুঝ
কেমন করে বেড়ে ওঠো?... কেমন করে বড়ো হও।

---

[৪৪৬]. বেন জিদ, মুনির, *মাহমুদ দারভীশ'স পোয়েটিকস অব ডিজায়ার: ভিশনস এন্ড রিভিশনস* (ওমান: এশিয়ান জার্নাল অব সোশ্যাল সাইন্সেস এন্ড হিউমানিটিস, ভলিয়ম-৩ (৩), আগস্ট ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৫৫।

[৪৪৭]. আলী, আজীজা, সুবহি হাদীদীর দারভীশ বিষয়ক উদ্ধৃতি এনেছেন তার লেখা: দারভীশ ইলতাক্বাত্বা আল ভিজদান আল জাময়ী লি আল উম্মাহ ওয়া হাওয়ালা আল শি'রা ইলা কুওয়াতিন ওয়াতিনিয়্যাহ ওয়া ছাকাফিয়্যাহ, (২৫/০৭/২০১১ খ্রি.) درويش التقط الوجدان الجَمْعي للأمّة وحول الشعر إلى قوّة وطنية وثقافية - جريدة الغد (alghad.com),

[৪৪৮]. দারভীশ, মাহমুদ, *আখির আল লাইল*, ১৮৮

দারভীশ এখানে বড় হওয়া বলতে বস্তুত মানুষের চৈতন্যের প্রগতির কথা বুঝিয়েছেন। অন্তরাত্মার ক্রমবিকাশের কথা বুঝিয়েছেন। মানবাত্মার উৎকর্ষতার কথা ব্যক্ত করেছেন। ইতিহাসের নানান উত্থান পতনের মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনের যে পরিণতি সেদিক থেকে দারভীশ তার জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে মানুষের চিন্তার মুক্তির আহবান করেছেন। জায়োনিস্টরা যে আতঙ্ক তৈরি করে রেখেছে, যে মৃত্যুর ভয় ছড়িয়ে জায়োনিস্ট শক্তি ফিলিস্তিনীদের রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে রাখতে সক্রিয় রয়েছে ফিলিস্তিনীদের মন থেকে সেই মৃত্যুর ভয় দূরিভূত করতে সাহসী উচ্চারণ করেন দারভীশ। ফিলিস্তিনীদের আত্মমর্যাদাময় যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে তা থেকে নতুন সময়ের দিকদর্শন খুঁজে পেতে হবে– সন্ধান করে নিতে হবে নতুন ভাষা– নতুন দিনের মাইলফলক। কিন্তু সেই ভাষা, সেই দিকচিহ্ন অভিধানের ভিতর পাওয়া সম্ভব নয়। অভিধান মানে, যা স্থির, অপরিবর্তনীয় কিংবা যার অর্থ ইতিমধ্যে নির্মিত হয়ে গেছে ফলে তা থেকে নয়া পরিবর্তনের অর্থ ও ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবেনা। বরং তা অর্জন করতে হলে বাস্তব ও চলমান ইতিহাসের ভিতর, বিবদমান সময়ের মধ্যে বসবাস করতে হবে। এবং তার ভিতর থেকেই সন্ধান করে নিতে হবে নতুন দিনের আলো– মুক্তির নতুন বার্তা।

لنذهب كما نحن :
إنسانة حرة
وصديقا وفيا
لنذهب كما نحن
جئنا مع الريح من بابل ونسير الى بابلٍ
لم يكن سفرى كافيا
ليصير الصنوبر فى أثري لفظة لمديح المكان الجنوبي
نحن هنا طيبون ... شمالية ريحنا
والاغانى جنوبية
هل انا أنتِ اخرى ؟
وانت انا آخر ؟
ليس هذا طريقي الى ارض حريتى
ليس هذا طريقي الى جسدي
وأنا , لن اكون انا مرتين
وقد حل أمس محل غدى
وانقسمت الى امرأتين
فلا أنا شرقية ولا انا غربية
ولا انا زيتونة ظللت آيتين
لنذهب اذ ا .

لا حلول جماعية لهواجس شخصية
لم يكن كافيا ان نكون معا
لنكون معا
كان ينقصنا حاضر لنرى
أن نحن
لنذهب كما نحن
انسانة حرة
وصديقا قديما
لنذهب معا فى طريقين مختلفين
لنذهب معا
... ولنكن طيبين[৪৪৯]

চলো আমরা, যেমন আমরা
বাতাসের সাথে আমরা ব্যাবিলন থেকে এসে পড়েছি
আবার আমরা চলে যাবো ব্যাবিলনে
আমার সফর এখনো শেষ হয়নি
যেন প্রত্নমাটির তলায় পাইন গাছটি হয়ে ওঠে
দক্ষিণীয় স্থানের বন্দনার একটি শব্দ
আমরা ওখানে ভালো আছি
আমাদের বাতাস উত্তরের,
গানগুলো দক্ষিণীয়
আমি কি অপর কোনো তুমি?
এবং তুমি কি অপর কোনো আমি?
স্বাধীনতার ভূমিতে যাওয়ার
এটা আমার পথ নয়
আমার দেহে প্রবেশের
এটা আমার পথ নয়
আমি—আমি কখনো দুবার আমি হবো না
আমার আগামীর ভিতর স্থান করে নিয়েছে গতকাল
দুই নারীতে আমি বিভক্ত হয়ে পড়েছি
আমি নই পূর্ব, নই পশ্চিম
নই আমি জলপাই। আমি হয়ে উঠেছি

[৪৪৯]. দারভীশ, মাহমুদ, *সারীরুল গারীবাহ*, ৭-৮

দুটি নিদর্শন।

কিংবা...

قليل من الليل قربكِ يكفي
لأخرج من بابلي الى جوهري _ آخري . !!
لا حديقة لي داخلي
وكلكِ انتِ .
وما فاض منكِ " أنا" الحرة الطيب[৪৫০]

রাত্রির আর সামান্য কিছু অংশ তোমার খুব কাছাকাছি
যেন ব্যাবিলন থেকে মুক্ত হয়ে আমি ফিরে আসি
আমার মৌলের কাছে– পরমের সান্নিধ্যে
আমার জন্য আমার গহিনে নেই কোনো উদ্যান
যখন তোমার সবটুকু কেবল তুমিই
তোমার সবকিছু থেকে যাকিছু উপচে পড়ে–
তা তো স্রেফ 'আমি'– প্রকৃষ্ট স্বাধীনতা।

এই দুটি উদ্ধৃতিতে ইতিহাসের প্রসঙ্গ রয়েছে। রয়েছে ফিলিস্তিনের পৌরাণিক সময়ের কথা। পুরাকাল ভ্রমণ করে আসার মধ্যদিয়ে দারভীশ এক নতুন অনুভবের কাছে– নতুন উপলব্ধির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। যে কালে– যে আদি সময়ে দারভীশের আত্মা ঘুরে বেড়ায়– যেখান থেকে ফিলিস্তিনী সত্তার প্রাগৈতিহাসিক পরিভ্রমণ শুরু হয়েছিল সেখানে বারবার দারভীশ নিজেকে ঘুরেফিরে নিয়ে যান। কিন্তু দারভীশ সেখানে কি খুঁজে বেড়ান? এখানে যেমন ব্যাবিলনের মাটি সন্ধান করেন তেমনি তারও অনেক আগের পদচিহ্ন খোঁজেন ক্যানানের জীবনযাত্রায়।[৪৫১] আত্মার সেকড় যেখানে প্রোথিত রয়েছে দারভীশ সেখানেই বারবার পরিভ্রমণ করে আসেন। দারভীশ নিজের সত্তাকেই বারবার প্রশ্ন করছেন নিজের পরিচয় এবং নিজের সত্তার স্বরূপ নিয়ে। দারভীশ মূলত আত্মার ঐতিহাসিকতা কিংবা ইতিহাসের ভিতর দিয়ে আত্মার মুক্তি এবং স্বাধীনতার স্বরূপ সন্ধান করতে চান। আত্মানুসন্ধানের এমন অভিযাত্রা ঐতিহাসিক। নিজেকে ইতিহাসের ভিতর দিয়ে খুঁজে পাওয়ার এমন তরিকা দারভীশ স্রেফ কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য করছেন? না, আদৌ তা নয়। বরং এর মধ্যদিয়ে দারভীশ ব্যক্তির নিজের এবং ফিলিস্তিনী সত্তার সেকড় তিনি খুঁজে পেতে চান। ছাপা কাগজে মুদ্রিত ইতিহাস কিংবা পাথরে খচিত, খনন করে উদ্ধার করা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের ভিতর ফিলিস্তিনী সত্তার যে সন্ধান

[৪৫০]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২২
[৪৫১]. দারভীশ, মাহমুদ, *হাজারুন কানআনিয়্যুন ফী আল বাহ্‌র আল মাইয়্যেত, আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-৩*, পৃ. ৩১১-৩২০।

ইতিমধ্যে উন্মোচিত হয়ে আছে দারভীশ তার আরো অনেক উর্ধ্বে গিয়ে খুঁজে পেতে চান আপন সত্তার পরিচয় ও স্বরূপ। দারভীশ এক মহাজাগতিক অভিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে যে অভিযাত্রা শুরু করেছেন তার মৌল আবেগ ও অনুকম্পা বস্তুত পরমাত্মার স্বরূপ সন্ধান।[৪৫২] স্বাধীনতার মর্ম কিংবা তার প্রকৃত অর্থ কি তা বুঝতে চান দারভীশ। এমন প্রশ্ন থেকেই দারভীশ বিশ্বাস করেন, মানুষের স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম খুঁজে পেতে হলে পরমাত্মার সত্য এবং তার স্বরূপ সন্ধান করতে হবে। বস্তুত পরম'র মধ্যদিয়েই মানুষ সত্যিকারের স্বাধীনতার মর্মবাণি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। ফলে দারভীশ ঐতিহাসিক অভিযাত্রাকে ক্রমেই পরমের অনুসন্ধানে রূপান্তরিত করেন। এবং স্বাধীনতার এক অন্যতরো অর্থ উন্মোচন করেন। কিন্তু দারভীশকে এমন অনুসন্ধানের পরিক্রমায় রহস্যময় এবং ধূসর মহাকাশ পাড়ি দিতে হয়েছে। দারভীশ বলেন,

هل تريدُ الرجوع إلى ليل منفاك
في شَعْر حُوريّةٍ؟ أَم تريد الرجوع
إلى تين بيتك. لا عَسَلٌ جارحٌ للغريب
هنا أَو هناك . فما الساعَةُ الآن؟
ما أُسمُ المكان الذي نحن فيه ؟ وما
الفرق بين سمائي وأَرضك. قل لِيَ
ما قال آدَمُ في سَرِّه . هل تَحَرَّرَ
حين تَذَكَّرَ . قل أَيّ شيء يُغَيِّر لون
السماء الرماديَّ . قل لِيَ بعضَ الكلام
البسيط , الكلام الذي تشتهي أُمرأةٌ
أَنَّ يُقال لها بين حينٍ وآخرَ . قُلْ
إنَّ في وسع شخصين , مثلي ومثلك ,
أَن يحملا كل هذا التشابه بين الضباب
وبين السراب , وأَن يَرْجِعَا سالمين . سمائي
رماديَّةٌ , فبماذا تفكِّرُ حين تكونُ السماءُ
رماديَّةً ؟[453]

তুমি কি ফিরে যাবে তোমার নির্বাসনের রাত্রিতে, হুর-পরীর চুলের গহীনে
নাকি ফিরে যাবে তোমার বাড়ির কোমল মাটিতে?
তবে নেই এখানে কিংবা ওখানে আগন্তুকের জন্য কোনো বেদনাবিধুর মধু
এখন তাহলে সময় কতো? সেই স্থানের নাম কি যেখানে আমরা আছি?
কি ব্যবধান তোমার ভূমি আর আমার আকাশের মাঝে? আমাকে বলে দাও হে,

---

[৪৫২]. এম. জামিল, আদিল, *মাহমুদ দারভীশ এন্ড জয় হার্জো: কসমিক কনশাসনেস* (অ্যারাব ওয়ার্ল্ড ইংলিশ জার্নাল (AWEJ), ভলিয়ম: ৩, সংখ্যা-৩, আগস্ট, ২০১৯), পৃ. ২০-৩৬।
[৪৫৩]. দারভীশ, মাহমুদ, *ছারীর আল গারীবাহ* (). পৃ. ৩৫-৩৬।

আদম গোপনে কি বলেছিল? তুমি কি মুক্ত স্বাধীন? যখন তুমি জিকির করো
বলে দাও, কোন জিনিস বদলে দিতে পারে এমন ধূসর আকাশের রঙ?
আমাকে বলে দাও এমন কিছু অখণ্ড বাক্য যা নারীর চিত্তাকর্ষক এবং
সময়ে সময়ে যা তাকে বলে দেয়া যায়? আমায় বলে দাও হে দুজন ব্যক্তির
পরিসরে– ধরো যেমন আমি আর তুমি– যারা বয়ে বেড়ায় কুয়াশা আর
মরিচীকার সব উপমা। যারা ফিরে যায় নিরাপদে। আমার আকাশ শুধুই
ধূসর। তবে যখন ধূসর হয়ে যায় আকাশ কি করে ডুবো তুমি মগ্নতায়?

দারভীশ ক্রমে নিবিষ্ট হতে থাকেন বস্তুত পরমের গভীর সন্ধানে। এ পর্যায়ে তিনি মারেফতের তত্ত্বজ্ঞানে নিজেকে নিবেদিত করেন। কবিতা এবং গূঢ়জ্ঞানকে এক জায়গায় একাকার করে নিয়ে আসেন তার ভাবচর্চা এবং সূফিতত্ত্ব সাধনায়। আরব-পারস্য-ইসলামি ঐতিহ্যে যে সূফি ধারার সমৃদ্ধ ভাবসম্পদ সঞ্চারিত হয়েছে দারভীশ তার মহাসমুদ্রে ডুব দেয়ার জন্য নিজেকে নিবেদন করার চেষ্টা করেন। তবে দারভীশ আধুনিক পরাবাস্তববাদী সাহিত্য কিংবা কবিতার ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। একইসাথে ম্যাজিক রিয়্যালিজম কিংবা যাদুবাস্তবতাবাদী কবিতার ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। নিছক রহস্যময়তা এবং লক্ষ্যবিহীন-মর্মবিহীন ধারণার মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা যে কাব্যধারার জন্ম হয়েছে আধুনিক এসব চিন্তাধারায় দারভীশ তা থেকে সূফিধারা ও এবং মারেফতী ধারাকে আলাদা করেন। উপরের কবিতাংশটি তার পরিষ্কার উদাহরণ। দারভীশ এ কবিতার মাধ্যমে বস্তুত আধুনিক এসব বিমূর্ত এবং নিছক রহস্যময়তা সৃষ্টিকারী কবিতার ধারার সমালোচনা হাজির করেন। যেকারণে তিনি প্রশ্ন করেন, যদি আকাশ ধূসর হয়ে যায় তবে কিভাবে তুমি ভাবনায় ডুব দেবে? পরাবাস্তববাদী কিংবা যাদুবাস্তবতাবাদী কবিতায় সাময়িক যে ঘোর এবং রহস্যময়তা সৃষ্টি হয় তার কোনো সত্যিকার কোনো গন্তব্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বিশেষ কোনো উত্তর নেই। সাময়িক যে ঘোরের জন্ম দেয় তাতে একধরনের গভীরতা ও রহস্যময় অর্থানুসন্ধানের উস্কানি কিংভা নিবিড় আবেগ তৈরি হয় বটে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার কোনো হদিস পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু মারেফতি ধারার কাব্য তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৪৫৪] মারেফতির ধারার কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। এসব কবিতার অর্থ, তফসির ও ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া যেসব চিন্তাধারার এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপর ভর করে তৈরি হয়েছে তার হাজার বছরেরও অধিক কালের বিপুল বিস্তীর্ণ ঐতিহ্য রয়েছে। তাতে সুনির্দিষ্ট কাঠামো, আঙ্গিক এবং বক্তব্যের পরিণতি কি তাও যথেষ্ট স্বীকৃত এবং ব্যাপকভাবে অভিষিক্ত। কিন্তু মারেফতি কিংবা আধ্যাত্মিক ধারার কবিতার যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে স্রষ্টার সাথে বান্দার প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ-অভিমান, আত্মতত্ত্ব, আত্মানুসন্ধান, স্রষ্টার স্বরূপ, পরমভাব, গুরু ও মুরশিদী তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব প্রকৃতি, মহাবিশ্ব ও সৃষ্টির গূঢ়জ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আধ্যাত্মিক কবিতার বিস্তার।

আরবী কবিতার ইতিহাসে যেসব সূফীতাত্ত্বিক কবিতার ধারা গড়ে উঠেছিল দারভীশ তা থেকে তার যাকিছু উপাদেয় তা বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি কবিতা লিখেছেন পারস্য ধারায়। বিশেষত দারভীশ

---

৪৫৪. আদোনীস, *আল ছুফিয়্যাহ ওয়া আল ছুরইয়ালিয়্যাহ* (আল সাকিয়্যাহ, ১৯৯১)।

ফরীদ উদ্দীন আত্তার র. দ্বারা বেশ প্রভাবিত ছিলেন। আল হুদহুদ নামক দীর্ঘ কবিতা লিখে তার প্রমাণ রাখেন দারভীশ। ফরীদউদ্দীন আত্তার রহ. এর বিখ্যাত গ্রন্থ *মানতিক আল তাইর* এর পুরো কাহিনীর প্রধান চরিত্র হুদহুদ। পবিত্র কোরআনেও রয়েছে হুদহুদ পাখির বিবরণ। তবে মানতিক আল তাইর যে সারার্থ সূফীতাত্ত্বিক দিক থেকে উপস্থাপন করেছে দারভীশের কবিতা হুদহুদ'র মূল বক্তব্য পুরোপুরি তা নয়। দারভীশ ফিলিস্তিনের বিবদমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে হুদহুদ লিখেন। যেখানে তার হুদহুদ পাঠে ইজরাইলের বিপরীতে ফিলিস্তিনের মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।[৪৫৫] দারভীশ হুদহুদকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করেন। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হুদহুদের উপস্থিতি যেমন রয়েছে দারভীশের কবিতায় তেমনি রয়েছে ফরীদউদ্দী আত্তার র. এর মানতিক আল তাইর এর হুদহুদ। অর্থাৎ দুইভাবে দারভীশ হুদহুদকে রূপক ও প্রতীক হিসেবে হাজির করেন। একদিকে তাতে রয়েছে রাজনৈতিক মর্ম। রাজনৈতিক রূহানিয়্যাত। অপরদিকে রয়েছে সূফী জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দীক্ষা ও দিকদর্শন। যেখানে শুধু আধ্যাত্মিক প্রাসঙ্গিকতার মধ্যেই কবিতার তাৎপর্য সীমিত হয়ে যায়নি বরং ভাষা, নতুন অর্থোৎপাদনের ইশারা, জ্ঞান-চিন্তা ও ভাবুকতার বিবিধ অনুপ্রেরণা উদ্রেককারী পঙক্তিতে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে দারভীশের কবিতা। দারভীশের বিশেষভাবে *জিদারিয়্যাহ*, *ছারীর আল গারীবাহ*, *আছার আল ফারাশাহ*, *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদান*, *ফী হাদরাহ আল গিয়াব*, *লা উরীদু লিহাজি আল কাসিদাহ আন তানতাহী*, *কাজাহর আল লাওজ আও আবআদ* এবং *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা* কাব্যগ্রন্থে সূফিতাত্ত্বিক কবিতার বিপুল উপস্থিতি রয়েছে।

[৪৫৫]. আসাদী, জামাল ও মাহমুদ নামনেহ, *মাহমুদ দারভীশ: আ রিভাইভড সুফি অর আ সুফি রিভাইভার* (কাউন্সিল ফর ইনোভ্যাটিভ রিসার্চ, জার্নাল অব অ্যাডভান্সিস ইন হিউম্যানিটিস, ভলিয়ম: ৩, সংখ্যা: ১, আগস্ট ২২, ২০১৪), পৃ. ১৫১-১৫৯।

পঞ্চম অধ্যায়
প্রতিরোধ, কাব্য, ভাষা, রাজনীতি ও ফিলিস্তিন

প্রতিরোধ দারভীশের কবিতার একটি মৌলিক দিক। বিচিত্র দিক থেকে প্রতিরোধ বিস্তারিত হয়েছে তার কবিতায়। প্রতিরোধের যেমন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আছে, ঐতিহাসিক তাৎপর্য কিংবা ইতিহাসের নিরিখে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে তেমনি প্রতিরোধের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে উঠতে পারে। দারভীশের কবিতায় নানামাত্রায় প্রতিরোধ তৈরি হয়েছে। দারভীশ বস্তুত ব্যবহারিক দিক থেকে গণপ্রতিরোধকে গুরুত্ব দিয়েছেন। একইসাথে প্রতিরোধ ব্যবহারিক রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে যেমন গড়ে তোলা প্রয়োজন তেমনি প্রতিরোধকে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গড়ে তোলা প্রয়োজন। দারভীশ সবদিক থেকে প্রতিরোধের অর্থ নির্দেশ করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের নানা ঘটনা, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, পৌরাণিক চরিত্র, ভাষা-ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিরোধের ভাষা গড়ে তুলেছেন দারভীশ। ফিলিস্তিনের ইতিহাস যেভাবে নাকবার মধ্যদিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে তেমনি তার কবিতায় প্রতিরোধের ধরন ও মাত্রায়ও ভিন্নতা, গভীরতা অনুধাবন করা যায়। প্রতিরোধের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। প্রতিরোধ খোদ রাজনৈতিকতা ধারণ করে থাকে। রাজনৈতিক পাঠ যেমন পার্টির মতাদর্শ মেনে করা যায় তেমনি প্রতিরোধও করা যায়। কিন্তু দারভীশ যে প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধের বয়ান উপস্থাপন করেছেন তাতে গণশক্তি এবং গণমানুষের সংশ্লিষ্টতা কিংবা সাধারণ মানুষের সাধারণ ইচ্ছার ভিতর দিয়ে তার রূপ ধরতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য, প্রতিরোধের ভাষায় শত্রুবিষয়ক জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ। ইজরাইল এবং তার জায়োনিস্ট মতাদর্শ পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে দারভীশ তার প্রতিরোধে শত্রুর বলপ্রয়োগ ও ক্ষমতার স্বরূপ আলোচনা করেন। কবিতায় এসব বিষয় কিভাবে প্রকাশ করা যায় তার একটি বোঝাবুঝির পদ্ধতিও দারভীশের কাব্যপাঠে পরিষ্কার করে তোলা সম্ভব।

৫.১: ফিলিস্তিন: প্রতিরোধের সত্য ও বিস্তার
৫.২: প্রতিরোধ এবং ইতিহাস
৫.৩: প্রতিরোধ যখন গণপ্রতিরোধ
৫.৪: দারভীশের প্রতিরোধ
৫.৫: ছুমুদ এবং প্রতিরোধের নতুনমাত্রা
৫.৬: প্রতিরোধ: দ্রোহ, ক্ষোভ, গণপ্রতিরক্ষা ও গণচৈতন্য
৫.৭: ইজরাইলের সাম্রাজ্যবাদ, বলপ্রয়োগের নীতি এবং ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ

ভাষা, কাব্য ও গণমানুষ

৫.২.১: ‘গণ’ (Mass) কথাটি কেন জরুরি হয়ে ওঠে

৫.২.১: বর্গ হিসেবে ‘গণ’ এবং গণমানুষের সত্যাসত্য

৫.২.৫: অন্তর্পাঠ্যতা (ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি)

৫.২.৬: আন্তপাঠ: প্রাচীন নগর ও সভ্যতা

৫.২.৭: আন্তপাঠ: সাহিত্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিত্ব

৫.২.৮: ইমরুল কায়েস

৫.২.৯: লাবিদ ইবনে আবি রাবীআ

৫.২.১০: তারফা বিন আল-আবদ

৫.২.১১: আবুল আলা আল মাআরি

৫.২.১২: আবু তাম্মাম

৫.২.১৩: আল মুতানাব্বী

৫.২.১৪: আন্তপাঠ: ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

৫.১: ফিলিস্তিন: প্রতিরোধের সত্য ও বিস্তার

শৈশবেই ইজরাইলি হানাদারদের মুখোমুখী হওয়ার নির্মম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন দারভীশ। তার বাড়িঘর বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল তার গ্রাম আল বিরওয়ার। এমন বিধ্বস্ত স্মৃতি দারভীশের মতো ফিলিস্তিনের প্রতিটি মানুষকেই বয়ে যেতে হয়। ১৯৪৮ সালেই নাকবার সেই স্মৃতি এবং ঘটনা শেষ হয়ে যায়নি। বিজয়ের মধ্যদিয়ে ইজরাইলের শক্তি আরো কঠিন–আরো সম্প্রসারিত হয়ে উঠেছিল। ফলে ধ্বংসযজ্ঞ, দখলদারিত্ব, জুলুম নিপীড়ন প্রতিমুহূর্তের ঘটনা হয়ে ওঠে। ইতিহাসের এক নৈর্ব্যক্তিক নিয়মে তাই ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের মাঝে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রবণতা তৈরি হয়।

প্রতিরোধ দারভীশের জীবন ও কর্মের ভিতর এক অপরিহার্য অংশ হয়ে যায়। ফিলিস্তিনের জনসাধারণের মধ্যে যেমন প্রতিরোধ বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে একটি সময় তেমনি দারভীশের কবিতারও এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ প্রতিরোধ। দারভীশের পুরো ভাষা-কাঠামোর এক অপরিহার্য শক্তির নাম প্রতিরোধ। কবির প্রাথমিক কাব্যজীবনেই প্রতিরোধের অগ্নিসত্তা সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে তা ক্রমে বিকশিত হয়েছে। ভাষার সারল্য আর সুসংহত কাঠামোর ভিতরে দারভীশ তার প্রতিরোধ-চিন্তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। আরবী কবিতার ইতিহাসের আধুনিক পর্বে দারভীশ তার কাব্যজগত গড়েছেন নিজের মতো করে। নতুন চিত্রকল্প, প্রাজ্ঞ অভিব্যক্তি, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাব্যভাষা আর অভূতপূর্ব রূপক ও প্রতীকের সমাহারে দারভীশ যে আলাদা কাব্যভুবন নির্মাণ করেছেন তা শেষপর্যন্ত মৌলিক বটে। বরং মানুষ, মানবতা, প্রকৃতি, ধর্ম ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের যে পরিবর্তিত রূপ ও সংস্কৃতির ব্যপক অভিপ্রকাশ দারভীশের সমগ্র কর্মে তা উঠে আসে ধর্ম, পুরাণ, ঐতিহ্য ও মানবেতিহাসের নানান উপাখ্যানের মেলবন্ধনে। সর্বোপরি তার সমগ্র চিন্তা এবং কর্মের ভিতর এক সপ্রাণ অনুভব ক্রিয়াশীল ছিল। একটি লিপ্ত এবং সদা জাগ্রত একটি সত্তা তার ভিতর অটল ছিল। আর সেই সত্তার নামই মূলত প্রতিরোধ-সত্তা।

একটি নতুন সমাজ কিংবা নতুন ইতিহাস তৈরির জন্য সামাজিক বয়ান তৈরি করার প্রয়োজন হয়। বিপ্লবী চিন্তাশীল মানুষেরা সেই দুরূহ কাজটি করেন। ফিলিস্তিনের নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য দারভীশকেও গড়ে তুলতে হয়েছে এমন ডিসকোর্স। তবে দারভীশ তা করেছেন কবিতার ভাষায়। কিংবা অভিনব সুরের ব্যঞ্জনায়, মানবিক আবেদনে। দারভীশের কবিতা বিচিত্র বিষয়ে সমৃদ্ধ। দারভীশের এই ডিসকোর্সে প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ। ইজরাইলের জায়োনবাদী আগ্রাসন মোকাবেলায় ফিলিস্তিনের গণমানুষ যে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে দারভীশ ছিলেন তার অন্যতম লড়াকু। চিন্তায়–ভাবে-কর্মে দারভীশ এ প্রতিরোধে শামিল ছিলেন আমৃত্যু। নানা ঘটনা ঘটনের মধ্যেও দারভীশ প্রতিরোধ লড়াই থেকে সরে আসেননি।

মানুষের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া প্রতিটি সফল কিংবা ব্যর্থ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি জরুরি অংশ প্রতিরোধ। কোনো না কোনোভাবে প্রতিরোধের প্রাসঙ্গিকতা তৈরি থাকে রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিতর। বিশেষ করে বিপ্লবী তৎপরতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রতিরোধ একটি সাধারণ সত্য। যেকোনো উপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়েরও একটি প্রক্রিয়া ছিল প্রতিরোধ। ফিলিস্তিনেও একই ঘটনা ঘটে। ফিলিস্তিনে যখন উপনিবেশিক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় বিশ শতকের শুরুর দিকে শেষপর্যন্ত লড়াই প্রতিরোধের সূত্র গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ইজরাইলের দখলদারিত্বের ফলে ফিলিস্তিনে প্রতিরোধ নতুনভাবে গড়ে ওঠে। নতুন এই কারণে যে, ফিলিস্তিনে ইজরাইলের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা নতুন রাষ্ট্রগঠনের যে লড়াই তা কিছুটা বিশেষ। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে কিংবা অন্যকোনো সমঝোতার মধ্যদিয়ে। কিন্তু ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাষ্ট্রগঠনের লড়াইয়ের মূল পন্থাই হলো প্রতিরোধ। প্রতিরোধই কেন ফিলিস্তিনে একমাত্র প্রক্রিয়া হয়ে ওঠলো তার নানারকম বিশ্লেষণ করা যায়। সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, মনোস্তাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে এর বিশ্লেষণ করা যায়। মোটকথা ফিলিস্তিনে কি করে প্রতিরোধের সত্য জরুরি হয়ে ওঠে এবং তা ক্রমাগত যে পর্যায়ে পৌঁছেছে প্রতিরোধই যেখানে একটি জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র চরিত্র হয়ে ওঠে– তার পর্যালোচনা জরুরি।

আরব জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকে গোত্রভিত্তিক ছিল। তাদের আর্থ-সামাজিকতা, যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সবকিছু গোত্রভিত্তিক ছিল। এই গোত্রের একটি আরবী প্রতিশব্দ *কওম (قوم)*। বস্তুত কওম শব্দ থেকেই আরবীতে ব্যবহার হওয়া প্রতিরোধের সমার্থক শব্দ *মুকাওয়ামাহ'র (مقاومة)* উৎপত্তি। *مقاومة (মুকাওয়ামাহ)* শব্দটির মূল অক্ষর ق-و-م। এই অক্ষরগুলোর যুক্তরূপ قوم'(কওম)। যার অর্থ– জনগোষ্ঠী, জাতি, গোত্র, সম্প্রদায়। শব্দমূল থেকে বেশ কয়েকটি আরবী শব্দ তৈরি হয়েছে। যেমন, 'قيام' (ক্বিয়াম)– দাঁড়ানো, উত্থিত হওয়া, ওঠা, তৎপর হওয়া, জাগ্রত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া। 'اقامة' (ইক্বমাহ)– প্রতিষ্ঠা করা, বাস্তবায়ন করা, স্থাপন করা ইত্যাদি। 'تقويم' (তাকভীম)– কাঠামো দান করা, গঠন করা, ঠিক করা, সংস্কার করা, মূল্যায়ন করা এবং [৪৫৬]'مقاومة' (মুক্বওয়ামাহ)– প্রতিরোধ যুদ্ধ করা, প্রতিরক্ষা লড়াই করা, মোকাবেলা করা, প্রতিহত করা ইত্যাদি আরও অনেক শব্দ এই মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন হতে পারে। মূলধাতুর সংঙ্গে সরাসরি قوم (কওম) বা জনগোষ্ঠী বা জাতি শব্দটি যুক্ত। অন্য শব্দগুলোর সাথে বাড়তি বর্ণ যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ যে বিষয়টি এখানে প্রণিধানযোগ্য তা হলো এই মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দগুলোর সাথে সামগ্রিকতা কিংবা 'বহু'র অর্থ মূলগতভাবে জড়িত। এই সামগ্রিকতার গুণ বা সম্পর্কটি এসেছে মূল ধাতু 'ق-و-م' থেকে সরাসরি উৎপন্ন হওয়া 'কওম' শব্দটি থেকে। যার অর্থ জনগোষ্ঠি, জাতি। সেদিক থেকে 'মুক্বাওয়ামাহ' বা প্রতিরোধ শব্দটির ভাষাগত তাৎপর্য গোড়ার বিষয়। প্রতিরোধ মানে একটি জনগোষ্ঠীর গণমানুষের অবস্থানগত লড়াই। ভাষাগত বিশ্লেষণের বিষয়টি তুলে ধরার কারণ এর আদি ও আসল যোগসূত্র বুঝবার জন্য। কারণ একটি শব্দ কোনো জনগোষ্ঠীর মাঝে এমনি এমনি তৈরি

[৪৫৬]. হোসেন, শাহাদাৎ, *মাহমুদ দারভীশের কবিতা : ভাব ও বিষয় অনুষঙ্গ*, ২০০৬.

হয়না। বিশেষ সময়কালে বিশেষ অবস্থার সমাজ ও সংস্কৃতির নানা সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়েই তার অর্থ সৃষ্টি হয়। ফলে *মুক্বাওয়ামাহ* বা প্রতিরোধ শব্দটির মর্মগত এবং ব্যুৎপত্তিগত গুরুত্ব ঐতিহাসিক এবং এর ভাষা-রাজনৈতিক গুরুত্বও বহু প্রাচীনতার সাথে সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, যে কোনো জনগোষ্ঠীর মতো আরবের প্রতিরোধ লড়াইয়ের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বিশেষত ফিলিস্তিনের লড়াইয়ের ইতিহাস অনেক অনেক প্রাচীন। ফিলিস্তিন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন নগরীগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই নগরী বারবারই প্রাচীনকাল থেকেই বাহিরের শক্তি কর্তৃক অধিকৃত, নিয়ন্ত্রিত ও নিপীড়িত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে এই নিয়ন্ত্রণ ও উপনিবেশিকীকরণের যাত্রা যে চরিত্রে অবতীর্ণ হয়– তা থেকেই তৈরি হয় জায়োনিস্ট ইজরাইলি হানাদার দখলদার প্রক্রিয়া। একইসাথে এর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিরোধের যে সত্য তৈরি হয় ফিলিস্তিনের জনমানসে তার ফলাফল ও প্রভাব অনেক গভীর এবং অপরিহার্য।

৫.২: প্রতিরোধ এবং ইতিহাস

নিসন্দেহে প্রতিরোধ মূলত একটি পরিস্থিতির ফলাফল। বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে এর বিশ্লেষণ হতে পারে। সামাজিক–রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিবিধ পটভূমির মধ্যদিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। যেহেতু এর পেছনে কারণ হিসেবে অপর কোনো পক্ষের হস্তক্ষেপ, আগ্রাসন, প্রতিহিংসা, শত্রুতা-বিদ্বেষ ইত্যাদি নানাবিধ রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক এবং ভৌগলিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কাজ করে থাকে। একইসাথে এসব বিষয় যেহেতু মানুষের আদি– এবং কোনো কোনো সময় বিষয়গুলো খুব স্বতসিদ্ধ– ফলে নৃতাত্ত্বিক এবং মনোস্তাত্ত্বিক কারণে প্রতিরোধের ঐতিহাসিকতা মানুষের সমাজবদ্ধতার ইতিহাসের সমসাময়িকও বটে। এসব কারণে তত্ত্বীয় কাঠামো কিংবা তত্ত্বীয় বিশ্লষণের বাইরে গিয়েও বলা যায়, ফিলিস্তিনের প্রতিরোধের রীতি ও ধারা অনেক প্রাচীন। এই প্রাচীন জনবসতি অসংখ্যবার বাইরের শক্তিদ্বারা আগ্রাসনের শিকার হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ফিলিস্তিনীদের বাইরের শত্রুর মোকাবেলা করে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। যেমন ফিলিস্তিন অঞ্চলে মেসোপটেমীয়, সুমিরীয়, বাবেল বা বেবিলনীয় শাসন থেকে শুরু করে নমরুদের শাসন, পারস্য, ফেরাউনের শাসন, গ্রিক ও রোমান শাসক কর্তৃক আগ্রাসন–দখলের ঘটনা ঘটেছে।[৪৫৭] তেমনি এসব বহিশত্রুর আগ্রাসন ও শাসনকে ফিলিস্তিনীরা খুব সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলো বিষয়টি মোটেও তেমন নয়। বরং তাদের প্রতিরোধের প্রাচীর ভেদ করেই শাসন ও শোষণব্যবস্থা কায়েম করতে হয়েছিল। তবে ভিন্ন পরিস্থিতির ঘটনাও কখনো কখনো ঘটেছে। যেখানে তারা কোনো কোনো বহিঃশক্তিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। যাদেরকে তারা নিজেদের সমাজ ও জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছিল। ইসলাম আসার পর এখানে আবারো বহুবার তারা বিদেশী শক্তির আগ্রাসনের শিকার হয়। ক্রুসেড যুদ্ধের ঘটনা ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা। পরবর্তীতে উসমানী খেলাফতের শেষদিকেও প্রতিরোধের ঘটনা ঘটে। এর ধারাবাহিকতায় বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালে ফিলিস্তিনে প্রতিরোধ

---

[৪৫৭]. ফারিসানি, ইলেলওয়ানি, *দি ইজরাইলিটিজ ইন প্যালেস্টাইন*, *ডিউরিং দি ব্যাবিলনিয়ান অ্যাক্সাইল* (ওল্ড টেস্টামেন্ট অ্যাসেইস, ভলিয়মঃ ২১, সংখ্যাঃ ১, প্রেটোরিয়া, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৬৯-৮৮।

তীব্রতরো হয়। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে প্রতিরোধ যেভাবে গণচরিত্র অর্জন করেছিল এর আগে এ অঞ্চলে প্রতিরোধ তৎপরতায় এতোটা ব্যাপকতা দেখা যায়নি। ১৯৪৮'র নাকবা পরবর্তী পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে আবারো প্রতিরোধের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইজরাইল এবং জায়োনিস্ট বিরোধী এ প্রতিরোধ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক জটিল এবং কৌশলী হয়ে ওঠে। নাকবার ফলে সর্বগ্রাসী যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল এবং একইসাথে এমন বিধ্বস্ত পরিস্থিতির মধ্যে যখন ইজরাইলের দখলদারিত্ব আরো তীব্র হয়ে ওঠে ফিলিস্তিনীদের মধ্যে তখন প্রতিরোধের প্রবণতা মনোস্তাত্ত্বিকভাবেই তৈরি হতে থাকে। নাকবা পরবর্তী পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনজুড়ে একধরনের শূন্যতা তৈরি হয়। এ শূন্যত আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে শুরু করে সমাজের নেতৃত্ব, প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি-খাদ্যব্যবস্থা, শিক্ষা–সর্বত্র সংকট তৈরি করে। ইজরাইলের সামরিক হামলা-আগ্রাসনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে ফিলিস্তিনের সামাজিক শৃঙ্খলা কিংবা সামাজিক কাঠামো অনেকটা ভেঙ্গে পড়ার কারণে এ শূন্যতা তৈরি হয়। ১৯৬০ এর শেষ সময় পর্যন্ত এ পরিস্থিতি জারি থাকে। এ সময় ফিলিস্তিনে সবচেয়ে বেশি শূন্যতা তৈরি হয় রাজনৈতিক অঙ্গনে। সঙ্ঘবদ্ধ কোনো রাজনৈতিক শ্রেণির উপস্থিতি দৃশ্যত দেখা যায়নি। রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণিরও কোনো কার্যকর সক্রিয়তা দেখা যায়নি। জাতীয় পর্যায়ে এমন অবস্থাই বিরাজমান ছিল সেই সময়ে। সমাজের সাংগঠিনক প্রক্রিয়ায় যেভাবে নৈর্ব্যক্তিকভাবে নানাবিধ পারিপার্শ্বিকতার কারণে, বিবদমান রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের কারণে যেসব পরিবর্তন ঘটে– তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভব–পরিগঠন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু যুদ্ধ কিংবা কোনো বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমাজের এসব পরিগঠন অনেকখানি ব্যাহত হয়। নাকবা পরবর্তী পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনের জাতীয় জীবনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোই বলা যায় অচল হয়ে গিয়েছিল। ফিলিস্তিনের প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক জামিল হিলাল মনে করেন, নাকবা-পরিস্থিতিতে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক পর্যায়ে–কিংবা সমাজের নেতৃত্বের পর্যায়ে সেটা এক দশকের বেশি স্থায়ী হয়নি। এর মধ্যেই সেখানে নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ হওয়া শুরু হয়। তবে তার পরিগঠন ছিল অদ্ভুত। জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অভিজাতশ্রেণির তৎপরতা প্রায় অনুপস্থিত থাকায় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয় আঞ্চলিক পর্যায় থেকে। শহুরে শ্রেণির থেকে নেতৃত্বের পরিগঠন নতুন করে আর শুরু হয়নি। গ্রামীণ সমাজ থেকে– গরিব শ্রেণি থেকে ফিলিস্তিনের জাতীয় নেতৃত্বের সংকট পূরণের পরিস্থিতি তৈরি হয়। জামিল হেলাল মনে করেন, সমাজের শরণার্থী শ্রেণিতে এবং উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের মাঝে দেশপ্রেমের যে গভীরতা দেখা যায় তা থেকেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে।[৪৫৮] ফিলিস্তিনে যে অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে বস্তুত তার উত্থান শুরু হয় উসমানি খেলাফতের শেষের দিকে। তবে ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে যে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে কৃষক শ্রেণি থেকে তাই মূলত ক্রমাগত ফিলিস্তিনের রাজনীতির মূলধারার নির্ধারক হয়ে ওঠে।[৪৫৯] ফলে দেখা যায়, ফিলিস্তিনে রাজনৈতিক শ্রেণি বলতে যা বোঝায় তার মধ্য থেকেও পরবর্তীকালে অভিজাত শ্রেণির বিকাশ ঘটে।

---

[৪৫৮]. হিলাল, জামিল, *তাকভীন আল নুখবাহ আল ফিলাত্বীনিয়্যাহ: মুনজু নুশুই হারাকাহ আল ওয়াত্বানিয়্যাহ আল ফিলাসত্বীনিয়্যাহ ইলা মা বা'দা ক্বিয়াম আল সুলত্বাহ আল ওয়াত্বানিয়্যাহ* (রামাল্লাহ: মুয়াতিন, আল মুয়াসসাসাহ আল ফিলাসতীনিয়্যাহ লিদারাসা আল দিমাকরাতিয়্যাহ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩৯-৯৫।
[৪৫৯]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫-২০।

সমাজে কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে কোনো একটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে তার সাথে সেই সমাজ ও জাতির নেতৃত্বের প্রশ্নও যুক্ত রয়েছে। রাজনৈতিক শ্রেণির পটভূমি হিসেবে গ্রামীণ সমাজ কতোটা পরিপক্ক হয়ে উঠতে পারে সেই প্রশ্নের চেয়ে আপাত একটি সমাজে কিভাবে নেতৃত্বের উদ্ভব ও পরিগঠন ত্বরান্বিত হয় তার নৈর্ব্যক্তিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে পারা বরং জরুরি। যখন ফিলিস্তিনে এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল যেখানে প্রভাবশালী শ্রেণির কার্যকর সক্রিয়তা মৌলিকভাবে নষ্ট হয়ে যায়। রাজনীতির প্রক্রিয়াগুলোতে প্রান্তিক পরিস্থিতি তৈরি হয়। একইসাথে তখন মধ্যবিত্তের সামাজিক শ্রেণিকাঠামোগুলোও ভেঙ্গে পড়ে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তৃণমূল পর্যায় থেকে একটি অসংগঠিত রাজনৈতিক শ্রেণির উদ্ভব হওয়া শুরু হয়। এর মধ্যদিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক শ্রেণির গঠন সম্ভব হয়ে ওঠে ফিলিস্তিনে। যেকারণে ফিলিস্তিনে নাকবা পরিস্থিতির মধ্যে গড়ে ওঠা এমন রাজনৈতিক শ্রেণির উদ্ভবের ফলে নতুন ধরনের ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৪৬০] পিএলও'র প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল না। একইভাবে আনুষ্ঠানিক কোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বও দৃশ্যমান ছিল না ফিলিস্তিনে।[৪৬১]

আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার আগেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমাজে হাজির থাকে অন্যভাবে। ফিলিস্তিনে নাকবা পরিস্থিতির মধ্যে শহরে তৈরি না হয়ে তার পরিগঠন শুরু হয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে। যেখান থেকে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এ নেতৃত্ব শহরমুখী হয়ে ওঠে। শহরমুখী হওয়াটাই স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য জাতীয় রাজনৈতিক কার্যক্রম শহর বিশেষত রাজধানী শহর থেকেই সংগঠিত হয়। রাজনৈতি নেতৃত্ব পরিগঠনের সাথে প্রতিরোধের সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িত। একটি বৃহৎ শক্তির সাথে প্রতিরোধযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তিনে সেই বাস্তবতা ইতিমধ্যে সমাজের নানা শ্রেণিপেশার মধ্যে তৈরি হয়েছে। যারা এরইমধ্যে খুব ছোট পরিসরে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিরোধ শুরু করে দিয়েছিল। একটি সময়ে ক্ষুদ্র গ্রুপগুলো থেকে একটি প্রকিয়া শুরু হয়। জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বগঠনের জন্য এসব গ্রুপ বা ক্ষুদ্র সংগঠনের মধ্যে একধরনের উপলব্ধি ও বোঝাবুঝি গড়ে ওঠে। এরফলে দেশটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব ঘটে। ১৯৬৪ সালের মে মাসে পিএলও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন) আনুষ্ঠানিকভাবে তার যাত্রা শুরু করে। যেসব ছোট ছোট রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগঠন ইতিমধ্যে কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছিল তাদেরই একটি কেন্দ্রীয় এবং ঐক্যবদ্ধ সংগঠন পিএলও। পিএলও স্বতন্ত্র কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়। যেসব দল স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে কার্যকর রয়েছে তাদের একটি আম্ব্রেলা সংগঠন পিএলও। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর প্রধান লক্ষ্য ছিল, আরবদের ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে ম্যান্ডেটরি প্যালেস্টাইন সীমানায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা। সশস্ত্র এবং বেসামরিক উভয় প্রক্রিয়ায় পিএলও তার কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিরোধ লড়াইয়ের জন্য পিএলও তখন একটি জাতীয় সংগঠনে রূপ লাভ করে।

---

৪৬০. প্রাগুক্ত। পৃ. ২০-৫৪।

৪৬১. মাসালহা, নূর, *দি প্যালেস্টাইনিয়ান নাকবা*, ২০১২, পৃ. ৯-১৩, ১৩৬-১৪২।

পিএলওর প্রতিষ্ঠা এবং নাকবার ঘটনার আগেই মূলত ফিলিস্তিনে প্রতিরোধ লড়াই জারি ছিল। কারণ ফিলিস্তিনজুড়ে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল তা প্রথমত বৃটিশবিরোধী ছিল, দ্বিতীয়ত একই প্রতিরোধ তৈরি হয় ইজরাইলের বিরুদ্ধে। তবে ফিলিস্তিনী জনগণের ভিতর ইজরাইলবিরোধী লড়াই আর বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের মাঝে চরিত্রগত কিছু পার্থক্য ছিল। ব্রিটিশদের মাঝে ধ্বংসাত্মক এবং উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া ছিল না। ভৌত কাঠামো এবং ভূমি দখল করার একচেটিয়া প্রক্রিয়াও খুব বড়কোনো পরিসরে দৃশ্যমান ছিল না। যেকারণে দুটি প্রতিরোধ লড়াইয়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্যগতভাবে আলাদা। কিছুটা পিছনের দিকে নজর ফেরালে দেখা যাবে, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাত্রা ছিল ব্যাপক। ইজরাইলের সামরিক প্রক্রিয়াগুলোর চরম বিধ্বংসী এবং নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা না থাকায় সাধারণ জনগণ খুব সহজে এসব আন্দোলনে অংশ নিতে পারতো। যেকারণে নাকবাপূর্ব সময়ে প্রতিরোধের মাত্রা সহজ ছিল। জনগণের অংশগ্রহণও খুব কঠিন ছিলনা। যেকারণে প্রতিরোধ ছিল ব্যাপক। তবে যখন বৃটিশদের সাথে জায়োনিস্ট প্রক্রিয়াগুলো এক হওয়া শুরু করে তখন আরবদের প্রতিরোধের মাত্রা ক্রমে দৃশ্যমান অবস্থা থেকে পিছু হটতে শুরু করে। একটি পর্যায়ে প্রতিরোধ গুপ্ত সশস্ত্র কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠে। পরিস্থিতি অন্যরূপ লাভ করে। নাকবার ঘটনার ঠিক আগের সময়গুলোতে প্রতিরোধ কিংবা বৃটিশ-ইজরাইল বিরোধী ফিলিস্তিনী শক্তিগুলোর প্রতিরোধের চালচিত্র এমনই ছিল। মোটকথা, আধুনিক ফিলিস্তিনের ইতিহাসে বস্তুত মোকাওয়ামা বা প্রতিরোধ শব্দটির পরিচয় ব্যাপকতরো হয়ে ওঠে বৃটিশ-বিরোধী লড়াই-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে। ১৯৩৬ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে ফিলিস্তিনের উপর বৃটেন-ইহুদী সংঘবদ্ধ আগ্রাসন প্রতিহত করার সময়কাল থেকে এ শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে দেখা যায়[৪৬২]। এটি ছিলো ফিলিস্তিনীদের ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান। কৃষক, শ্রমিক সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে অংশ নেয় এই গণঅভ্যুত্থানে। এর প্রধান সংগঠক ছিলেন ইজ্জুদ্দীন আল কাসসাম। আল কাসসামের সাংগঠনিক তৎপরতায় বহু কবি, সাহিত্যিক এই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন। সেই সময় দুই শ্রেণীর কবি ছিলেন যারা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে শামিল হন। তাদের কেউ কেউ এই যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেন। যেমন, আল কাসাম এই লড়াইয়ে শহীদ হন। তিনি নিজেও কবি ছিলেন। আরো এক শ্রেণী ছিলো যারা বিপ্লবী কবিতা লিখতেন। তাদের প্রতিরোধ আর দ্রোহে প্রকম্পিত জাগরণমূলক কবিতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাদের কাব্যভাষা শিল্প ও অলংকারের দিক থেকে খুব বেশী সমৃদ্ধ নয়। বর্ণনা ধর্মী কাব্য ভাষা ছিলো সে সময়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কারণ সাধারণ মানুষকে সরাসরি স্পর্শ করা ছিলো তখনকার অপরিহার্য দাবী। অন্যদিকে মানুষের বাঁচা- মরার লড়াই। ঘরে আগুন, বাইরে আগুন। শিল্প করার, সাহিত্য করার প্রশ্ন ছিলো তখন অমূলক। কবিতা মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ে এগিয়ে যাবার পথে অন্যতম হাতিয়ার হিশাবে দেখা যায়। যারা এই হাতিয়ারকে শাণিত করেছিলেন সে সময় তাদের মধ্যে উলে- খযোগ্য ছিলেন কবি মাহমুদ ত্বহা, ইব্রাহীম নাজী কবি প্রমুখ[৪৬৩]। ইব্রাহীম নাজী কবিতায় আধুনিক পন্থী ছিলেন। যুদ্ধ ও প্রতিরোধের কবিতা ছাড়াও গজল, দার্শনিক ও ভারী বিষয়ের কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তখনকার ফিলিস্তিনের সাহিত্যে। '৩৬ এর এপ্রিলের বিপ- ব

[৪৬২]. আল নাক্কাশ, রজা, *শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ*, ১৯৬০, পৃ. ৫৯।
[৪৬৩]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৬০।

পরিস্থিতিতে মিশরের কাব্যসাহিত্য লড়াই বা প্রতিরোধ বিষয়ে বলা যায় নীরব ছিলো। মিশরের মুখ্য প্রবণতা ছিলো শিল্পমুখীতা। তবে ফিলিস্তিনের '৩৬ এর বিপ- বের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সে দেশের সাধারণ মানুষের জায়োনবাদী আগ্রাসন বিরোধী প্রতিরোধ লড়াইয়ের আগুন লেবানন, সিরিয়া, মিশরসহ সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ে। এর মূল কারণ ছিলো ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ লড়াইয়ের গ্রপগুলো। কারণ তারাই ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়[৪৬৪]। তবে সে সময়ের প্রতিরোধ কবিতায় যারা উৎকর্ষ সাধন করেন তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইবরাহীম তুওকান, আব্দুর রহীম মাহমুদ, আব্দুল করীম আল কারমা। তাদের প্রতিরোধ বিষয়ক কবিতা সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত করে। আরব বিশ্বের তৎকালীন খ্যাতিমান প্রফেসর কামিল সাওয়াফিরী বলেনঃ "ইবরাহীম তুওকানের "আল ফিদায়ী", "আশ শাহীদ", আব্দুর রহীম মাহমুদের "আশ শাহীদ", "আশ শাআবুল বাসিল" ও আবু সালমার কবিতা ফিলিস্তিনের পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের মধ্যে মুখস্থ নাই এমন কাউকে বোধ করি পাওয়া যাবে না।"[৪৬৫]

ইবরাহীম তুওকানের জন্ম ১৯০৫ সালে ফিলিস্তিনের নাবলুসে। কবি ফাদওয়া তুওকান ছিলেন ইবরাহীম তুওকানেরই সহোদরা ভগ্নী। ইবরাহীম তুওকানের প্রতিরোধ বিষয়ক কবিতার একটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

فأهدي يا عواصف - خجلا من جرائته
صامت لو نكلما – لفظ النار و الدماء

তার সাহসে লজ্জীত হয়ে উৎসর্গীত হও হে ঝড়।
সে থাকে চুপচাপ, কিন্তু কথা বললে আগুন ঝরে, রক্ত ঝরে।[৪৬৬]

পরবর্তীকালে এই ধারা ১৯৪৮'র ১ম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আরো বিকশিত হয়। ১৯৪৮ সালে ইসরাইলীরা ব্যাপকভাবে ধবংসযজ্ঞ চালায় ফিলিস্তিনে। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী আরবদেরকে তাদের ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। ইসরাইলী বাহিনীর এই হানাদারী তান্ডবের ফলে ফিলিস্তিনীদের জীবনে মহাবিপর্যয় নেমে আসে। ফিলিস্তিনীরা তাদের এই ঘটনাকে নুকবা বা মহাদুর্যোগ হিসেবে অভিহিত করে। নুকবা'র আগ পর্যন্ত ফিলিস্তিন আরবী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানে কোনো অবদান রাখতে পারেনি। কিন্তু এই নুকবা বা মহাদুর্যোগ ফিলিস্তিনীদের জীবনে বিশাল পরিবর্তনের প্রেরণা তৈরি করে। এই বিশেষ সময়কালকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনের জাতীয় চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটে। '৪৮'র এই নুকবা ফিলিস্তিনীদের মধ্যে জাতীয় পরিচয় গঠনের শর্তও তৈয়ার করে। যার ফলে স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা নির্মাণের রাজনৈতিক শ্রেণী তৈরি হয় সেখানে। তেমনি চিন্তা, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে তারা নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে থাকে। অব্যাহত রাজনৈতিক লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতা থেমে

---

[৪৬৪]. প্রাগুক্ত. পৃ. ৫৩।
[৪৬৫]. সাওয়াফীরী, কামেল, *আল শি'র আল আরাবী আল হাদীস ফী মা'আসাতি ফিলাস্তীন: মিন সানাহ ১৯০০ ইলা সানাহ ১৯৬০* (কায়রোঃ মাত্বাবিউ সাজ্জিল আরাব, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ২৯৮।
[৪৬৬]. আল নাক্কাশ, রজা, *শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ*, ১৯৬০, পৃ. ৬৩।

থাকেনি। বরং রাজনৈতিক লড়াই সংগ্রামই তাদের কবিতা, সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা বা উপায় আকারে হাজির হয়।

১৯৫৬'র আরব-ইসরাইল যুদ্ধে অধিকৃত এলাকায় কাফারে কাসামে ইসরাাইলী হত্যাকান্ড ছিলো ভয়াবহ। এ ঘটনা ফিলিস্তিনীদেরকে আরোও উজ্জীবিত করে[৪৬৭]। এ সময় থেকেই মানে ষাটের দশক থেকেই মূলত ফিলিস্তিনের আরবী কবিতার প্রতিরোধবাদী ধারার বিকশিত পর্যায়ের সূত্রপাত হয়।[৪৬৮] এ সময়ের কবিদের মধ্যে উলে- খযোগ্য ছিলেন হাবীব কাহোজী, হান্না আবু হান্না[৪৬৯]। তবে ষাটের দশকের শেষের দিকে এই ধারা সংগঠিত আকারে তৎপর হয়। সে সময় লেবাননের গৃহ যুদ্ধের অবস্থায় বহু লেখক, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি ফিলিস্তিন মুক্তি কাউন্সিলের ব্যানারে একত্রিত হয়ে প্রত্যেকে নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করেন।[৪৭০] নুকবা পরবর্তী ষাটের দশকে ফিলিস্তিন ভূখন্ড থেকে যারা প্রথম প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কবি ইউসুফ আল খাতীব। ইউসুফ আল খাতীব প্রতিরোধকে প্রতিবাদী জায়গায় না নিয়ে কল্পিত ভাবে মনোগাঠনিক নির্মাণের জন্য কবিতা রচনা করেন। তার সমসমায়িক ছিলেন কবি হারুন হাশিম, রাশেদ আল বুহাইয়ি। ইউসুফ আল খাতীবের পরপরই আসেন মাহমুদ দারভীশ, সামীহ আল কাসিম, তাওফীক জিয়াদ, সালেম জিবরান, রাশিদ হুসাইন, নাইফ সালীম, মাঈন বাসীসু কবি প্রমুখ।[৪৭১]

মুকাওয়ামা বা ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সাহিত্যের মূল পথিকৃত শহীদ গাসসান কানফানী। এই ধারাকে কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস সহ সর্বস্তরে বিস্তৃত করেছেন তিনি। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রতিরোধ কবিতার প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ কবি মাহমুদ দারভীশ। এরপর যথাক্রমে সামীহ আল কাসিম, তাওফীক জিয়াদ ও সালিম জিবরান[৪৭২]। যদিও সামীহ আল কাসিমের জন্ম জর্দানে। কিন্তু তিনি ইসরাইলের অধিবাসী এবং ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় অন্যতম লড়াকু কবি। তবে ফিলিস্তিনের ভূখ" থকে তৌফিক জিয়াদ প্রতিরোধ কবিতায় প্রাণের সঞ্চার ঘটান। ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ কবিতায় এ অঞ্চলে জিয়াদের খানিক পূর্ববর্তী ইউসুফ আল খাতীব। আল খাতীবের মাধ্যমে কবিতায় প্রতিরোধের নিঃশব্দ অগ্নি প্রবাহিত হয়। জিয়াদ এ ধারাকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলেন। কিন্তু মাহমুদ দারভীশের বাহুতে প্রতিরোধের প্রাচীর ষোল আনায় পূর্ণ হয়।[৪৭৩] সত্তরের দশকের শেষে দারভীশের ফিলিস্তিন ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ কবিতার ধারা অন্যান্য আরবদেশে আরো বেশী ছড়িয়ে পড়ে। সমকালীন আধুনিক আরবী কবিতার প্রতিভূ পঞ্চাশের কবি আদোনীস, আল হাভী ও ইউসুফ আল খলীল, নিজার কাবানীসহ আরো অনেকে সম্পৃক্ত হন এ ধারায়।

---

[৪৬৭]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৯।

[৪৬৮]. ইউসুফ আল ইউসুফ, *আল তাহওজীহ ইলা বায়ান আল মুক্বাওয়ামাহ (বৈরুত: আল ইখতেবার, ২০০৮ খ্রি.)*, পৃ. ৪।

[৪৬৯]. সাওয়াফীরী, কামেল, *আল শি'র আল আরাবী আল হাদীস ফী মা'আসাতি ফিলাস্তীন*, ১৯৮৫, পৃ. ৬৩।

[৪৭০]. ইউসুফ আল ইউসুফ, *আত তাওজীহ ইলা বায়ান আল মুক্বাওয়ামাহ*, পৃ. ৫।

[৪৭১]. প্রাগুক্ত. পৃ. ঐ।

[৪৭২]. প্রাগুক্ত. পৃ. ঐ।

[৪৭৩]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৭, ৮।

৫.৩: প্রতিরোধ যখন গণপ্রতিরোধ

সাহিত্য কিংবা সংস্কৃতির মাধ্যমগুলোতেও দেখা যায়, প্রতিরোধের যে সত্য ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল সাধারণ জনগণ। জনশ্রোতের ভিতর থেকে প্রতিরোধ সবসময় এখানে গড়ে উঠেছে। প্রতিরোধ কথাটির সে অর্থে একটি সাংস্কৃতিক মানগত বিষয় আছে। সংস্কৃতি কিংবা সাংস্কৃতিক কথাটি এখানে বিশেষ অর্থে নয় বরং একটি সর্বজনীন বিশিষ্টতা পেয়েছে প্রতিরোধ প্রশ্নে। প্রতিরোধ যে সমাজে নিছক কথার কথা নয় বরং এটি যেমন সেই সমাজের মনোদৈহিক প্রকৃতিজাত বিষয়বিদ্যা হয়ে উঠেছে তেমনি এর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মানও তৈরি হয়েছে। সমসাম্প্রতিককালে বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রে সামাজিকভাবে এতো দীর্ঘকাল ধরে প্রতিরোধ আন্দোলনের ঘটনা খুব একটা দেখা যায় না। যেকারণে ফিলিস্তিনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরোধ বিভিন্ন কারণে বিশেষ চরিত্র অর্জন করেছে। এই বিশেষ চরিত্রের মূলে রয়েছে জনমনস্তত্ত্ব– যার গোড়া থেকে যে প্রতিরোধের বিস্তার ঘটেছে তাকে গণপ্রতিরোধ বলার মধ্যদিয়ে ঘটনা শেষ হয়ে যায়না। বরং প্রতিরোধ কিভাবে গণপ্রতিরোধে রূপান্তরিত হয়েছে কিংবা গণপ্রতিরোধের সত্য কেন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তা বোঝা জরুরি।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের একটি বক্তব্য হলো, যখন কোনো মানুষ আশ্রয় নিতে, সহযোগিতা নিতে বাধ্য হয় না– কিংবা দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে শেষ করণীয় হিসেবে স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিস্ট নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও বাধ্য হতে হয়না তখন আইনের শাসন অনুসরণের মাধ্যমেই মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে।[৪৭৪] এর মানে হলো, যদি মানুষ বাধ্য হয়– তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কারো দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, কিংবা মানবাধিকার পরিস্থিতি চরম লঙ্ঘন হয় তখন মানুষ বাধ্য হয়ে নিপীড়ক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। মানুষকে তার টিকে থাকার স্বার্থে প্রতিরোধে নামতে বাধ্য হতে হয়। মোটকথা যখন আর কোনো উপায় থাকে না, আইনের সমস্ত শর্ত ও ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে তখন প্রতিরোধই কেবল অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে। এতে পূর্বানুমান হলো, মানবাধিকার লঙ্ঘনের তীব্রতা ও ব্যাপকতার সাথে প্রতিরোধের উদ্ভবের সম্পর্ক রয়েছে। সহজ কথায় প্রতিরোধের পথে কেন মানুষকে যেতে হয় তার একটি কারণ আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। দ্বিতীয়ত, কোনো রাষ্ট্রের স্বাধীন সার্বভৌম আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কোনো শত্রুপক্ষ কর্তৃক অকার্যকর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এর বাইরে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন, শুধু রাজনৈতিক কারণেই কোনো সমাজে মানুষ খুব সহসায় প্রতিরোধের রাস্তা বেছে নেয় তা নয়, বরং এর কারণ হিসেবে কোনো জনগোষ্ঠীর সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিও কাজ করে। একইসাথে ওই সমাজের ইতিহাসে বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতিতে মানুষের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াগুলো কেমন তা বিচার করেও বোঝা সম্ভব। কারণ যখন কোনো রাষ্ট্র অপর কোনো শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয় তখন তার সামনে দুটি উপায় থাকে, হয়

[৪৭৪]. ডানিলিয়্যাস, হ্যান্স, *কনভেনশন অ্যাগেইনস্ট টর্চার এন্ড আদার ক্রুয়েল, ইনহিউম্যান অর ডিগ্র্যাডিং ট্রিটমেন্ট অর পানিশমেন্ট* (ইউনাইটডে ন্যাশন্স অডিওভিজ্যুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্টারন্যাশনাল ল’, জাতিসংঘ, ২০০৮ খ্রি.)। chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400007294a.pdf

শত্রুপক্ষকে মেনে নেয়া। না হয় সরাসরি যুদ্ধ কিংবা প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া। ফলে আক্রান্ত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র এবং তার জনগণ তা কিভাবে মোকাবেলা করছে– এবং পরিস্থিতি তৈরির বিপরীত প্রক্রিয়াগুলোর সাথে তার বোঝাপড়ার ধরন কেমন তা দিয়ে বোঝা সম্ভব প্রতিরোধ নাকি আত্মসমর্পণ? প্রতিরোধ হলে তার স্বরূপ ও পন্থা কেমন হবে তাও বোঝা যায়। যেমন ৪৮ এর আগ্রাসনের পর নাকবা পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনের জনগণের ঘুরে দাঁড়ানোর পটভূমি পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায়, জনগোষ্ঠী হিসেবে ফিলিস্তিন ঐতিহাসিকভাবে প্রতিরোধপ্রবণ। তবে ফিলিস্তিনে প্রতিরোধের ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটলেও কিন্তু তা ছিল শান্তিপূর্ণ। অহিংস প্রতিরোধের প্রতি ফিলিস্তিনীদের অবস্থান ঐতিহাসিক। ফিলিস্তিনের ইতিহাসে সশস্ত্র প্রতিরোধের ঘটনা একেবারেই নেই তা বলা যায় না।[৪৭৫]

তবে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ যুদ্ধেরই একটি অংশ। যুদ্ধ যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন প্রতিরোধও নৈর্ব্যক্তিকভাবে কখনো কখনো সহিংস হয়ে উঠতে পারে। কারণ যুদ্ধই যখন কোনো জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ধরে রাখার শর্ত হয়ে ওঠে তখন যুদ্ধ হোক না আর হোক প্রতিরোধ হবে এটি একটি স্বতসিদ্ধ। এই প্রতিরোধ কখনো শান্তিপূর্ণ কখনো সশস্ত্রও হতে পারে। কোনো প্রতিরোধ গণপ্রতিরোধে রূপ নিলে সেটা যতোটা সহিংস হয়ে ওঠার আশঙ্কা ধারণ করে তার চেয়ে অহিংস হয়ে ওঠে বেশি। যেহেতু প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য গণমুখী ফলে তা সাধারণত অহিংস কিন্তু সহিংসতা কিংবা সশস্ত্রতার বিষয়টি খুব বেশি রাজনীতি বা আদর্শের নীতিগত সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত। মোটকথা প্রতিরোধ শান্তিপূর্ণ হোক কিংবা সহিংস হোক– ফিলিস্তিনের প্রতিরোধের স্বরূপ যে গণপ্রতিরোধমুখী তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। কয়েকটি ঐতিহাসিক উদাহরণ থেকে এই সত্য বোঝা সম্ভব। এর একটি ছিল ধর্ম। ধর্মভিত্তিক তৎপরতা বরাবরই গণমুখী। একইসাথে তারা জাতপাত শ্রেণি নির্বিশেষে গণমানুষের সাথে মিলেমিশে থাকার কারণে ধর্ম সার্ধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি ছিল। যেকারণে যেকোনো অন্যায় ও নিপীড়নমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে ধর্মের ভূমিকা ইতিবাচক ঐতিহাসিক। ফিলিস্তিনে নবী ইবরাহীম, নবী, দাউদ, সোলাইমান, ইয়াকুব, মুসা, ঈসার সামাজিক তৎপরতা ছিল গণমুখী। অপর শক্তিগুলো সাধারণত আগ্রাসন চালিয়ে দখলদারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল। কিন্তু ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্ম ফিলিস্তিনে যখন তাদের সূচনালগ্নে সক্রিয় হতে থাকে তখন তারা অপর হিসেবে আবির্ভূত হয়নি, বরং তারা আপন হয়ে ওই জনগোষ্ঠীর আত্মার সাথে মিশে যায়। দ্বিতীয়ত ধর্মদুটি ওই জনপদের ভিতর থেকেই উঠে আসা ধর্ম হওয়ার ফলে যখনই কোনো প্রতিরোধ গড়ে ওঠতো তখন তা গণপ্রতিরোধে রূপ নিতো। ইসলামও একইভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আত্মার একান্ত আপন হয়ে ওঠে।[৪৭৬] ফিলিস্তিন-সিরিয়াসহ বৃহত্তর ওই অঞ্চলের জনগণ কখনো

---

৪৭৫. এলিজাবেথ কিং, মেরি, *প্যালেস্টাইন: ননভায়োলেন্ট রেজিসট্যান্স ইন দ্য স্ট্রাগল ফর স্টেটহুড, ১৯২০-২০১২, রিকভারিং ননভায়োলেন্ট হিস্ট্রি: সিভিল রেজিসট্যান্স ইন লিবারেশন স্ট্রাগলস—সম্পাদনা:* ম্যাসিয়েজ জি. বার্টকোস্কি (যুক্তরাষ্ট্র: লিন রিইনার পাবলিশার্স, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৬১-১৭৫।

[৪৭৬]. বাস্সাম ইউসেফ ইবরাহীম বানাত, হাসান ইয়াহইয়া, বাশির আহমদ, ফাদওয়া হালাবিয়্যাহ, *পপুলার বিলিফস ইন দি প্যালেস্টাইন সোসাইটি: অ্যান অ্যানালিটিক স্টাডি* (ওপেন জার্নাল অব সোস্যাল সাইন্স, সাইন্টিফিক রিসার্চ পাবলিশিং, আগস্ট ২৬, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ৩৪০-৩৬১। ড. আনজুম, ওভামির ও ড. ওমর সুলেইমান, *দি প্যালেস্টাইনিয়ান স্ট্রাগল থ্রো দ্য প্রফেটিক লেন্স* (ইয়াক্বিন ইনস্টিটিউট, ১৩ জুলাই ২০২১), ভিজিট: ৫ মে, ২০২৩, https://yaqeeninstitute.org/read/paper/the-palestinian-struggle-through-the-prophetic-lens,

ইসলামকে অপর হিসেবে দেখেনি। এরপরও ব্যতিক্রম ঘটেনি বলা যাবে না। দ্বিতীয়ত ছিল ফিলিস্তিনের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহ এবং ফলাফল হিসেবে ইহুদি ও জায়োনিস্টদের বিস্তার। এই বিদ্রোহের কারণ ছিল তুরস্কভিত্তিক উসমানী খেলাফত প্রবর্তিত ভূমি সংস্কার আইন। যে আইন ছিল মূলত কৃষকদের স্বার্থবিরোধী এবং অভিজাত, সমাজের প্রভাবশালী ও ধনিক শ্রেণির অনুকূলে। উসমানী শাসনের সূচনা হয় ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যদিয়ে যার অবসান হয়। তুরস্ককেন্দ্রিক উসমানি শাসনের শেষদিকে ফিলিস্তিনে জায়োনিস্টদের অনুপ্রবেশ, বসতিস্থাপন এমনকি সামাজিকীকরণ ঘটতে থাকে। যার পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে উসমানীয়দের ভূমি সংস্কার আইন সবচেয়ে বড় ধরনের পটভূমি ও সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। আইনটি ছিল, সামাজিক মালিকানা থেকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর সংক্রান্ত নতুন আইন। ১৮৫৮ সালে এটি প্রবর্তন করে উসমানীয় শাসন। সামাজিক মালিকানা বলতে বোঝানো হয়, যেখানে কোনো বিশেষ বংশ-গোত্র কিংবা গ্রামের নামে জমি বরাদ্ধ থাকতো। কৃষকরা তাতে জমি চাষ করতো গ্রাম কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত গোত্রের মাধ্যমে পাওয়া জমি। যেখানে গ্রাম এবং গোত্রই ছিল জমির মালিক। অন্য অর্থে বলা যায়, কৃষকরা স্বাধীন ছিল জমি ব্যবহারে। যাতে বলা যেতো কৃষকরাই ছিল ভূমির মালিক। এটি ছিল পুরনো আইন। কিন্তু নতুন আইন অনুযায়ী এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন কৃষকরা। কারণ নতুনে আইনে যেসব ভূমি গ্রাম কিংবা গোত্রের অধীনে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল সেসব জমির মালিকানা ধনিক শ্রেণিকে হস্তান্তর করা হয়। যাতে সেসব জমি তাদের নামে নিবন্ধন করে দেয়া হয়। একইসাথে ধনিক শ্রেণিকে নিবন্ধনকৃত ভূমি বিক্রয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। এতে নিয়মিত কর দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয় ধনিক শ্রেণিকে। একইসাথে কর দেয়ার মাধ্যমে তারা যে উসমানী কর্তৃপক্ষের বাধ্যগত সেই বার্তাও দেয়া হতো। এতে দুটি ঘটনা ঘটে খুব দ্রুত। প্রথমত, নাম তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে জমিদারশ্রেণির ভাড়াটে প্রজা হিসেবে নতুন করে কৃষকদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। জমি বেহাত হয়ে জমিদারদের হাতে চলে যাওয়ায় কৃষকরা চরম নিপীড়নের শিকার হন। অপরদিকে জমি বিক্রয়ের অবাধ সুযোগ তৈরি হয়। যার দামি খদ্দের হয়ে ওঠে জায়োনিস্ট এজেন্টরা। ব্যক্তি মালিকানার নামে মূলত যেখানে বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশিকদের অনুকরণে নতুন জমিদার শ্রেণি তৈরি করা হলো যাতে ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবেই ছিল। এর ফলে জায়োনিস্টরা ব্যাপকভাবে জমি ক্রয় করা শুরু করে।[৪৭৭] আইনের সুযোগ কাজে লাগিয়ে জায়োনিস্টদের প্রভাবশালী সংগঠনগুলো ফিলিস্তিনে তখন কাজ শুরু করে দেয়। ১৮৫৮ এর প্রবর্তিত এই ভূমি আইনে আরো পরিবর্তন আনা হয়। ১৮৬১ এবং ১৮৬৭ এর ভূমি আইন সংস্কারের মাধ্যমে যেখানে বিদেশীদের জমি ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা আরো সহজ ও সুবিধাজনক করে তোলা হয়। বিদেশী ক্রেতা বলতে তখন বস্তুত জায়োনিস্টরাই ছিল একচেটিয়া। এর সাথে ছিল ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কোম্পানি। ওই সময়ে ১৮৬০ সালে জায়োনিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন The Alliance Israélite Universelle ফিলিস্তিনে তৎপরতা চালানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদের কাজ ছিল আর্থিক সহযোগিতা, তহবিল সংগ্রহ করা

মিগুয়েল আসিন, *জেরুজালেম*, *ইসলাম*, *দান্তে*, *সম্পাদনা ও ভূমিকা: ওয়ালিদ খালিদি*, *ফ্রম হ্যাভেন টু কনকোয়েস্ট: রিডিংগস ইন জায়োনিজম এন্ড দ্য প্যালেস্টাইন প্রবলেম আনটিল ১৯৪৮* (), পৃ. ৩৫-৪৪।

[৪৭৭]. বি. কুমসিয়েহ, মাজিন, *পপুলার রেজিসটেন্স ইন প্যালেস্টাইন: আ হিস্ট্রি অব হোপ এন্ড এম্পাওয়ারমেন্ট* (লন্ডন: প্লুটো প্রেস, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২০-৪৮।

এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করা। মোটকথা, এ ঘটনার মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনে জায়োনিস্টদের বসতিস্থাপনে যে বৈধ সুযোগ দেয়া হয়েছিল তা ছিল নজিরবিহীন। প্রকারান্তরে উসমানি সরকারের এই ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে জায়োনিস্টদের ফিলিস্তিন দখলের ঐতিহাসিক পটভূমিও তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। যদিও তখনো উসমানি সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে জায়োনিস্টদের তৎপরতা ধীরগতিতেই চলছিল। বৃটিশরা আসার পর তাদের কার্যক্রম বিপুলভাবে ত্বরান্বিত হয়। এসব কারণে ফিলিস্তিনের জনগণ চরম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল উসমানীয়দের উপর। বেশ কয়েকবারই ফিলিস্তিনীরা বিদ্রোহ করেছিল। এর আগে ১৮০৮, ১৮২১ এবং ১৮৪০ এর দিকে ফিলিস্তিনের কৃষকরা বিদ্রোহ করে। ১৮৪০ এর বিদ্রোহ পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। জন অসন্তোষ এবং ক্ষোভ থেকে যে গণপ্রতিরোধ তার ফলে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিদ্রোহের রেশ বিরাজ করেছিল। এসব বিদ্রোহের পরই মূলত উসমানীয় প্রশাসন কৃষকদের উপর আরো কঠোর হয়ে ওঠে। তারা তখন নতুন সামন্তীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করে। যার ফলে তারা কৃষক স্বার্থ বিরোধী নতুন ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষকদের ভূমি থেকে উচ্ছেদের কাজ সম্পন্ন করে। এই ভূমি সংস্কার আইনের প্রভাব এতোটা ভয়ঙ্কর এবং গভীর ছিল যেখানে বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশকে সহজ ও বৈধ করে দিয়েছিল যাতে আপাত তখনকার উসমানী শাসক লাভবান হলেও এর ফলাফল আজকের নিরসন অযোগ্য ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত এবং আরব-পশ্চিমা সংঘাতের প্রবর্তন।

তৃতীয়ত কারণ ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য, আর্থিক নিপীড়ন। যার ভিত্তি ছিল নয়া জমিদারি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে উসমানীয় শাসন তার শেষ অধ্যায়ে যে ক্ষয়ীষ্ণু পরিস্থিতির আলামত ছড়িয়েছিল তার সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছিল ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের কৃষকজনগোষ্ঠী। এবং শেষ কারণ ছিল বৃটিশদের উপনিবেশায়ন এবং উপনিবেশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন। যে আন্দোলনের বীজ হিসেবে মূলত কাজ করেছে গণপ্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা। উসমানী আমলের কৃষক বিদ্রোহে যার বীজ রোপিত হয়েছিল সেই বীজ থেকে হাজারো বিদ্রোহীর জন্ম হয়েছে বৃটিশ এবং জায়োনিস্ট বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে।

৫.৪: দারভীশের প্রতিরোধ

মাহমুদ দারভীশের হাতে প্রতিরোধ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয় কবিতায়, জ্ঞানে, ভাবে। এই প্রতিরোধের বিস্তৃতি সীমাহীন–গভীরতায় অন্তহীন। সর্বব্যাপী তার প্রতিরোধ। কিন্তু দারভীশের কাছে প্রতিরোধ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেদিক থেকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিরোধ খুবই নগন্য। অর্থাৎ দারভীশের যে প্রতিরোধ– রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আত্মিক ও নৈতিকতার পরিধি পর্যন্ত তা বিস্তৃত। দারভীশ যে শুধু তার কাব্য-ভাষার মাধ্যমে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়েছেন তা বলা যাবে না। দারভীশের ধারণা প্রায়োগিক অর্থেও যথেষ্ট কার্যকর। কারণ কবি তার পুরো জীবন ব্যবহারিক রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রতিরোধ ছিল তার জীবন ও অস্তিত্বের একটি অংশ। তার কবিতা এবং যাপিত জীবনে প্রতিরোধের বিস্তার অনেক দূর। তার কবিতা কিংবা

প্রতিরোধ বোঝার সাথে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতগুলোও সম্পর্কিত। তবে প্রতিরোধই তার কবিতার শেষ কথা নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক একটি অধ্যায় হয়ে আছে তার কবিতাজুড়ে।

ফিলিস্তিনী সাহিত্য, কবিতা কিংবা শিল্পে 'প্রতিরোধ' বর্গ হিসেবে অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত একটি ধারণা। ফিলিস্তিনী সাহিত্যিক ও সমালোচক গাসসান কানাফানি প্রথম সাহিত্যের প্রেক্ষিতে 'প্রতিরোধ' এর প্রয়োগ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতিরোধ সম্পর্কিত ধারণা, পরিধি এবং সাহিত্যে এর ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৯৬৬ সালে তার এ সংক্রান্ত গ্রন্থ *আদাব আল মুকাওয়ামাহ ফী ফিলিস্তিন : ১৯৪৮-১৯৬৬* প্রকাশিত হয়। বইটিতে কানাফানি 'প্রতিরোধ'কে ফিলিস্তিনের কবিতা ও উপন্যাসসহ সাহিত্যের একটি প্রকরণ হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিরোধ সাহিত্যের নজির হিসেবে তওফিক জিয়াদ, মাহমুদ দারভীশ, সামীহ আল কাসিম, সালিম জিবরান, নাইফ সালীম প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মে প্রতিরোধ কিভাবে গড়ে ওঠে তার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। মোটকথা কানাফানির বিশ্লেষণের পর একটি ব্যাপক প্রভাব তৈরি হয় ফিলিস্তিনের সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজে। ১৯৬৭ সালে সংঘটিত তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধের প্রাক-পরিস্থিতির মধ্যে বইটি প্রকাশিত হয়। এর আগেই যেখানে নাকবার সংকটময় অবস্থা থেকে পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় ফিলিস্তিনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতিরোধ বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতিও গতিশীল হওয়া শুরু করেছে। কারণ ইতিমধ্যে দেশটির জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন পিএলও তাদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে। কানাফানি এমন একটি রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক টালমাটাল অবস্থার মধ্যে বইটি প্রকাশ করেছেন। নানা দিক থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব তৈরি করে কানাফানির এই বই। ১৯৬৬ সালে বইটির প্রকাশের মধ্যদিয়ে একটি বিষয় খুব জোরালোভাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ৪৮'র ইজরাইলি হামলার মাধ্যমে যে ব্যাপক বিধ্বংসী নাকবা নেমে আসে ফিলিস্তিনীদের জীবনে তা কাটিয়ে উঠে তারা আবার রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার লড়াইয়ে ফিরে এসেছে সর্বাত্মকভাবে। তাতে তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করতে সক্ষম এমন একটি বার্তা উঠে আসে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রতিরোধের প্রায়োগিকতা কেমন হওয়া উচিত কিংবা কবিতা ও সাহিত্যে প্রতিরোধের বিষয়টি যে চিহ্নিত হওয়া ঐতিহাসিক কারণেই জরুরি বইটি ছিল তার একটি অনন্য নজির। প্রতিরোধের সাহিত্য বিশ্লেষণ কিংবা প্রতিরোধ-সাহিত্যের স্বভাব ও রুচি রাজনৈতিক ঘনিষ্টতা বজায় রেখে কি করে সাহিত্যের একটি ধারা হয়ে উঠতে পারে কানাফানি তা দেখিয়েছেন অত্যন্ত সুকৌশলে। কানাফানি যখন প্রতিরোধ-সাহিত্যকে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করছেন তখন আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রতিরোধ লড়াই সক্রিয় ছিল। আলজেরিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে উপনিবেশবিরোধী প্রতিরোধ বিদ্যমান ছিল। অন্যঅর্থে সাহিত্যে একটি তৃতীয়বৈশ্বিক কিংবা আফ্রো-এশিয়ান মুক্তি সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে কানাফানির প্রতিরোধ তত্ত্ব। একই সময়ে সোভিয়েত বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডাযুদ্ধ (কোল্ড ওয়ার) চলছিল। সবমিলিয়ে এর একটি আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল। কানাফানির জীবন ও অন্যান্য সাহিত্যকর্ম থেকে বোঝা যায়, তিনি

মার্কসীয় বিপ্লবী মতাদর্শে প্রভাবিত ছিলেন। তবে প্রতিরোধ সাহিত্যের তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে মাও জে দং এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব সবেচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে তাকে।[৪৭৮]

প্রতিরোধ কথাটির একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে যেমন, তেমনি এর সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সক্রিয়তার বিষয়গুলো প্রতিরোধের ধারণার সাথে সম্পর্কিত। রাজনীতির সাথে সাথে সাহিত্য এবং সংস্কৃতিও ক্ষমতামুখী ধারণা হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু ক্ষমতামাত্রই রাজনৈতিক– ফলে তার শত্রুমিত্র নির্ধারণও জরুরি। যার বিপরীতে মোকাবেলার রাজনীতিও সক্রিয় হতে বাধ্য। যেখান থেকে প্রতিরোধের ধারণা গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায়, কানাফানি প্রতিরোধ কথাটিও বুঝতে চেষ্টা করেছেন। কানাফানি মনে করেন, বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইজরাইল যে বাবস্তবতা সৃষ্টি করেছে ফিলিস্তিনে এটাকে শুধু ব্যবহারিক রাজনীতির জায়গা থেকে বুঝলেই শুধু চলবে না, বরং তার একটি বুদ্ধিবৃতিক বোঝাবুঝিও জরুরি। যেহেতু ইজরাইলের হাতে ফিলিস্তিনের দখল হয়ে যাওয়ার পর এ ঘটনা নিছক রাজনৈতিক বিষয়ই নয়, বরং সাংস্কৃতিকও। জায়োনিস্ট শক্তি এখানে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যেখানে তারা শুধু সামরিক হামলা চালিয়েই ক্ষান্ত নয়, একইসাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরগুলোকেও তাদের হামলার লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছে। কানাফানি এর জন্য ছয়টি বাস্তবতা তুলে ধরেন। যাতে সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, প্রতিবেশ, গণমাধ্যম-প্রকাশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জায়োনিস্টদের আগ্রাসন কঠিন হয়ে ওঠে। এ অবস্থাকে কানাফানি ইজরাইলের 'বুদ্ধিবৃত্তিক অবরোধ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্যাপক অর্থে 'সাংস্কৃতিক অবরোধ'ও বলেন অনেকে।[৪৭৯] এমন অবরুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক উপায় হিসেবে সাহিত্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিকল্প নেই বলে মনে করেন কানাফানি। ভাষা ও সাহিত্যের সকল মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সৃষ্টি করা অনিবার্য। এমন অবরোদ্ধ পরিস্থিতিতে বহু প্রতিক্ষার পর দারভীশের উত্থান ঘটে ফিলিস্তিনে।[৪৮০] দখলকৃত ফিলিস্তিনের সাহিত্য এবং কবিতায় সে সময় দারভীশের সটান উপস্থিতিকে দুর্লভ এবং বিস্ময়কর হিসেবে দেখেছেন কানাফানি। বস্তুত কানাফানির বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে দারভীশ যৌবনের প্রথম প্রহরেই 'প্রতিরোধের কবি' হিসেবে অভিষিক্ত হন। দারভীশের কবিতায় প্রতিরোধ সত্তরের দশকে বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষাকে জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করতে গভীরভাবে কাজ করে তার কবিতা। দারভীশের প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে প্রথম উচ্চারণগুলোয় ছিল দ্রোহ আর ক্ষোভ মাখামাখি এক অনিরুদ্ধ আওয়াজ।

أأجوع يا بلدي ويشبع غاصب
جعل البقايا من عظامي موائدا
أنا ثائرلك يا تراب بلادنا

---

৪৭৮. এম. হল্ট, এলিজাবেথ, *রেজিসট্যান্স লিটারেচার এন্ড ওকুপাইড প্যালেস্টাইন ইন কোল্ড ওয়ার বেইরুট* (ইনস্টিটিউট অব প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, জার্নাল অব প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, জানুয়ারি ২২, ২০২১ খ্রি.), ভিজিট: অক্টোবর ৯, ২০২২, https://doi.org/10.1080/0377919X.2020.1855933

৪৭৯. এম. হল্ট, এলিজাবেথ, *রেজিসট্যান্স লিটারেচার এন্ড ওকুপাইড প্যালেস্টাইন ইন কোল্ড ওয়ার বেইরুট* (ইনস্টিটিউট অব প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, জার্নাল অব প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, জানুয়ারি ২২, ২০২১ খ্রি.), ভিজিট: অক্টোবর ৯, ২০২২, https://doi.org/10.1080/0377919X.2020.1855933

৪৮০. কানাফানি, গাসসান, *আদাব আল মুক্বাওয়ামাহ ফী ফিলাস্তীন আল মুহতাল্লাহ ১৯৪৮-১৯৬৬* (বৈরুত: দারু মানশুরাত আল রামাল, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ২৯।

أنا ثائر لك يا شقيق العائدا
ولكن يظل النهر ثرا صاخبا
ناديت أدفع للمصب روافدا.[৪৮১]

১৯৭২ সালে কানাফানিকে জায়োনিস্ট ঘাতকরা হত্যা করে। কানাফানি আরো বেঁচে থাকলে হয়তো প্রতিরোধ সাহিত্য নিয়ে আরো বিস্তর আলোচনা ও বিশ্লেষণ পাওয়া যেতো। তবে কানাফানি তার প্রতিরোধের ধারা রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন। যে অর্থে কানাফানি প্রতিরোধকে ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছেন মাহমুদ দারভীশ প্রতিরোধকে সেদিক থেকে অনেক দূর নিয়ে গেছেন। ব্যবহারিক রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিসরগুলোর বাইরে দারভীশ শুধু তার ভাষা ও কবিতায় প্রতিরোধকে এক গভীর এবং সর্বাত্মক অর্থময়তায় স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। ভাষার উত্তাপে– ক্রোধের আগুন ঢেলে দিয়ে যেমন প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছেন তেমনি গতিশীল গভীর শান্ত কিন্তু অপ্রতিরুদ্ধ এক মহাসমুদ্র সৃষ্টি করেছেন দারভীশ। ব্যবহারিক প্রতিরোধ থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রতিরোধের ভিত রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন কবি। ফলে দারভীশের কবিতায় প্রতিরোধ নানা মাত্রায় গতিশীলতা পেয়েছে। তার জীবনের শেষের দিকের কবিতা বিশেষত “লিমাজা তারাকতুল হিছানা ওয়াহীদা”(অশ্বদের কেনো একা ছেড়ে গেলে), “সারীবুল গারীবাহ”(নির্বাসিতের বিছানা) এবং “জিদারিয়্যাহ” (দেয়ালচিত্র) কাব্য গ্রন্থগুলোতে কবিতার ভাষা, শৈল্পিক নির্মাণ ও অলংকার কাঠামোতে যেমন পার্থক্য বিদ্যমান তেমনি চিন্তা ও ভাবগত ফারাকও স্পষ্ট। এসব কাব্যগ্রন্থে তার প্রথম দিককার কবিতা থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন স্বরে প্রতিরোধের ধারা গভীর ও শীতল ভঙ্গিতে কিন্তু মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি সাক্ষাৎকারে দারভীশ তার প্রতিরোধ ভাবনা সম্পর্কে নিজের অবস্থান প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন,

أنا لا أسعى لفك ارتباط لكن أسعى لمساحة، مساحة تعطي الحق للصوت الشخصي أن يعبِّر عن نفسه ضمن الإطار العام. ذلك يعني أن من الممكن أن أكتب، ويجب أن أكتب، في موضوعات لا تخص القضية الفلسطينية كمشكلة سياسية. وأنا أنظر إلى هذه المنطقة التي أبحث عنها على أساس تطوير، أو إضاءة البعد الإنساني في الشخصية الفلسطينية المقاومة – الإنسان الفلسطيني يخاف من الموت، يحب، يشعر بالبهجة من تفتح شقائق النعمان، يشعر بالحزن لسبب أو لآخر. فإذاً هذه الإنسانيات الفلسطينية يجب ألاّ توضع دائماً تحت استعارة سياسية. في داخلها إنسان عنده مشكلاته الوجودية، عنده الخوف من الموت، عنده أسئلة ميتافيزيقية يجب أن ّ يعبر عنها بحرية من دون أن يُتهم بأنه ابتعد عن نفسه، أوأجرى شرخاً ما بين ذاتهوبين الجماعة[482]

---

[৪৮১]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০।

[৪৮২]. খুরি, জিযেল, *হিওয়ার মা'আ মাহমুদ দারভীশ: আন আল সিয়াসাহ ওয়া আল শি'র ওয়া তাজরিবাহ আল মাওত*, (বৈরুত, মাজাল্লাহ আল দিরাসাত আল ফিলিস্তীনিয়্যাহ, মুআসসাসাহ আল দিরাসাত আল ফিলিস্তীনিয়্যাহ, ভলিয়ম-১২, সংখ্যা-৪৮, ২০০১), পৃ. ১০

প্রতিরোধ বিষয়ে দারভীশের নিজস্ব বোঝাবুঝি ছিল। ছিল উপনিবেশিত সমাজে ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্য উচ্চারণের সাহসী পদক্ষেপ। রাজনৈতিক সক্রিয়তার সাথে সাথে প্রতিরোধ সম্পর্কিত ভাবনার বিস্তার ঘটেছে তার বিপুল কবিতা ও গদ্যের সমাহারে। ফিলিস্তিনের জনগণের যন্ত্রণা, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও শোকতাপের সাথে প্রতিরোধের সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ থেকে শুরু করে জনগণের লড়াইয়ের প্রতিটি উপাদান, প্রতিটি অনুষঙ্গই মূলত প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত। ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফিলিস্তিনীদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত মূর্ত-বিমূর্ত প্রতিটি বিষয়ই প্রতিরোধের একেকটি বিশেষ উপায় ও উপকরণ। যেকারণে দেখা যায়, ক্ষমতা, ভাষা, প্রেম-ভালোবাসা, জীবন-জীবিকা, প্রকৃতি, মৃত্যু ও নির্বাসন সবই প্রতিরোধের বৃহত্তর পরিসরে পরিব্যপ্ত। সবকিছু যেখানে প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠতে সক্ষম। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা, আত্মগৌরব ও আত্মমর্যাদা গড়ে তোলা প্রতিরোধের প্রতি গণআত্মবিশ্বাসের অংশ। দারভীশ প্রতিরোধকে তাই বৈচিত্র্যে ব্যাপকতায় নির্মাণ করেছেন। দারভীশ বলেন,

إن قصفتْ عاصفة
في تشرين..
ثالثهم...
فجذور التين
راسخة في الصخر... وفي الطين
تعطيك غصوناً أُخرى..
وغصون![483]

যদি অক্টোবরে
আঘাত হানে ঝড়...
তবে আসবে তাদের তৃতীয়জন...
ডুমুরের শিকড়গুলো
প্রোথিত পাথরের গভীরে... এবং মাটির ভিতরে
আরো কিছু ডালপালা দিয়ে যাবে তোমায়
আরো কিছু ডালপালা!

'ঝড়' ইজরাইলের প্রতীক। দারভীশের কবিতায় জায়োনিস্ট ও দখলদার ইজরাইলীদের বুঝাতে ঝড়ের ব্যবহার বিপুল। কিন্তু যতোই ঝড় আসুক না কেন কোনো না কোনো একজন দাঁড়িয়ে যাবে সেই ঝড়ের বিরুদ্ধে। যারা প্রতিরোধ অব্যাহত রাখবে নিরন্তর। এই পঙক্তিগুলোতে প্রতিরোধ কতোটা ব্যাপক এবং গভীর তার একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। ডুমুর, শিকড়, পাথর, মাটি এবং ডালপালা– প্রতিরোধের প্রতীকী হাতিয়ার। একদিকে দারভীশ আত্মবিশ্বাস তৈরি করছেন। আবার

[৪৮৩]. দারভীশ, মাহমুদ, আল দিওয়ান: আল আল'মাল আল উ'লা-১, পৃ. ১০৫

বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যাদের উপড়ে ফেলার জন্য ঝড় আসছে সেই ডুমুরেরা অনেক শক্তিশালী। তাদের বিরুদ্ধে ইজরাইল যতোই ঝড় আকারে আঘাত হানুক, তাদের উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়। কারণ তাদের শিকড় পাথরের মতো প্রচণ্ড শক্ত মাটির অনেক গভীরে প্রোথিত। আবার শুধু পাথরই নয়, তাদের কোনো কোনো শিকড় নরম উর্বর মাটির ভিতরে ছড়িয়ে আছে। যাতে তারা প্রতিরোধের জন্য বিপুল ডালপালা মেলে প্রতিরোধের ডাল বিস্তার করার জন্য প্রস্তুত।

দারভীশের প্রতিরোধ বিষয়ক কবিতা ফিলিস্তিনের লড়াই সংগ্রামের নানান সময়ের নানা অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও সময়েকে কেন্দ্র করে কবিতাগুলো রচিত হওয়ায় প্রতিরোধের প্রকাশ ভঙ্গিতেও ভিন্নতার স্বাদ পাওয়া যায় ভাষা, ছন্দ ও চিন্তার দিক থেকে। সত্তর দশকের শুরুর দিকে ইজরাইল প্রচুর গণহত্যা চালায় ফিলিস্তিনে। জাতীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠিত প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালে ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদ (Palestinian National Council (PNC)) গঠিত হয়। পিএনসি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৮ সালে। এটি ইজরাইলের সাথে যুদ্ধ-সংঘাত পরবর্তী ফিলিস্তিনের প্রথম জাতীয় সংস্থা– ফিলিস্তিনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষীয় সংস্থা– যার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল মূলত আইনসম্মতভাবে ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের জনগণের রক্ষা, প্রতিরোধ এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান।[৪৮৪] পরবর্তীতে এই পরিষদের মাধ্যমে পিএলও'র যাত্রা শুরু হয়।[৪৮৫] পিএলও'র প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হবার পর ফিলিস্তিনে ইজরাইলি আগ্রাসন আরো তীব্রতরো হয়। সেই সময়ের ইজরাইলী গণহত্যার কথা উঠে আসে দারভীশের কবিতায়। দারভীশ বলেন,

حالةُ الاحتضار الطويلةْ
أرجعتني إلى شارع في ضواحي الطفولة
أدخلتني بيوتاً... قلوباً... سنابل
جعلتني قضيَّة
منحتني هويَّة
وتراثَ السلاسل[৪৮৬]

কবিতাটিতে যে মৃত্যুর দীর্ঘ উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে তা মূলত ইজরাইলের গণহত্যার বয়ান। জায়োনিস্টদের এমন গণজিঘাংসা ফিলিস্তিনীদের স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। তারা বরং আরো সতেজ ও আরো দীপ্ত হয়ে ওঠে। কবিতাটিতে তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে শেষ কয়েকটি পঙক্তিতে। যেখানে ইজরাইল কর্তৃক দখল, মৃত্যু আর হত্যাই যেন ফিলিস্তিনী গণমানুষের পুনর্জীবিত হওয়ার নিশ্চয়তা তৈরি করে। ইজরাইলের দখলদারিত্ব, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ যে শুধু তাদের পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চৈতন্য গড়ে তোলে তাই নয়, বরং এর মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিন তাদের জাতীয় আত্মপরিচয়কেও নতুন করে ফিরে পায়।

---

[৪৮৪]. *কাউন্সিল ইস্টাবলিশমেন্ট, ভিজিট: জানুয়ারি ১১, ২০২৩।* https://www.palestinepnc.org/en/council-establishment
[৪৮৫]. পার্লম্যান, উইন্ডি, *দি প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, সম্পাদনা: ডাব্লিউএম. রজার লুইস ও আভি শ্লেইম, দি ১৯৬৭ অ্যারাব-ইজরাইলি ওয়ার অরিজিনস এন্ড কন্সিকোয়েন্সিস* (ক্যামব্রিজ, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১৩০।
[৪৮৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আল'মাল আল উ'লা-২*, পৃ. ৩৭-৩৮।

দারভীশের কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতায় প্রতিরোধকে দুইভাবে শনাক্ত করা যায়। সরাসরি প্রতিরোধ এবং পরোক্ষ প্রতিরোধ। ইজরাইলের রাজনৈতিক শ্রেণি এবং জায়োনিস্টদের বিরুদ্ধে লিখিত কবিতাগুলো সরাসরি প্রতিরোধ বিষয়ক। ইজরাইলী সাম্রাজ্যবাদ এবং যেকোনো সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ কবিতাগুলো প্রযোজ্য। তবে নিজেদের সুসংহত করার প্রক্রিয়া হিসাবে জাতীয় আত্মপরিচয়ের নিমিত্তে যেসব কবিতা দেখা যায় সেগুলোকে পরোক্ষ কবিতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। মাহমুদ দারভীশ ইজরাইলী কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত ছিরেন। স্বভাবতই তিনি মার্কসীয় চিন্তার অনুসারী ছিলেন। যদিও এক পর্যায়ে তিনি পিএলওতে যোগ দেন। মার্কসীয় চিন্তায় বিশ্বাসী হওয়ার পর রাজনৈতিক বাস্তবতায় ফিলিস্তিনের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আপোসহীন ছিলেন তিনি। জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে তিনি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য আকারে গ্রহণ করেন। যদিও জাতীয়তাবাদ দারভীশের রাজনৈতিক আদর্শ কমিউনিজমের সাথে খুব বেশি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে ক্রমাগত জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে দারভীশের মাঝে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে। কারণ এক সময় তিনি আরব জাতীয়তাবাদী অবস্থান নিয়েছিলেন। মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদে মুগ্ধ ছিলেন। এরপর সেই জাতীয়তাবাদের প্রতি তার মোহমুক্তি ঘটে। পরবর্তীতে তিনি ফিলিস্তিনের জাতীয়তাবাদী রাজনীতে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। দারভীশ বরাবরই জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে সবসময় বিপ্লবী চিন্তার অনুগামী হিসেবে বিবেচনা করতেন। তার কবিতা এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় যার সাক্ষর বিপুল।[৪৮৭] এই অবস্থান তাকে নিতে হয়েছিল ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর জাতীয়মুক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ মোকাবেলার প্রেক্ষিতে। অন্যদিকে দারভীশের কাছে প্রতিরোধ যতোটা রাজনৈতিক তেমনি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিকও। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে প্রতিরোধ মূলত ফিলিস্তিনকে পুনর্গঠনের প্রকল্পের অংশ। সেকারণে পরোক্ষা প্রতিরোধ জাতীয় পরিচয় এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত।

প্রতিরোধের উত্তাপ যখন ছড়িয়ে পড়েছিল তার আগের পরিস্থিতি কেমন ছিল? সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে কিঞ্চিত অনুভব করা যাক। ইজরাইলী গণহত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, দখলদারিত্ব এসব ছিল নাকবা পরিস্থিতির নিত্যকার ঘটনা। এমন পরিস্থিতিতে একজন ফিলিস্তিনী প্রেমিকা তার প্রেমাষ্পদের প্রতি আবেগময় আকুতি নিবেদন করেছিল। যেখানে সে কথা দিয়েছিল সে আসবে। তার জন্য সে তার সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু জায়োনিস্ট হানাদাররা পথিমধ্যে তাকে হত্যা করে। নির্মম সেই পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন দারভীশ...

غابة الزيتون كانت مرة خضراء
كانت ..و السماء
غابة زرقاء.. كانت حبيبي

[৪৮৭]. হাম্মাদ, নাজীব, *আল ইদিউলোজিয়্যাহ আল সিয়াসিয়্যাহ ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ: দিরাসাহ নামাজিয়া শি'রিয়্যাহ* (আলজেরিয়া, ভাষা ও আরবী সাহিত্য বিভাগ, জামেআ আল আরাবী বিন মাহিদী-উম্মুল বাওয়াকী, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৩৭-৫০।

ما الذي غيرّها هذا المساء؟

لك مني كلّ شيء
لك ظل لك ضوء
خاتم العرس، و ما شئت
و حاكورة زيتون و تين
و سآتيك كما في كل ليلة
أدخل الشبّاك، في الحلم، و أرمي لك فله
لا تلمني إن تأخرت قليلا
إنهم قد أوقفوني
غابة الزيتون كانت دائما خضراء
كانت يا حبيبي
إن خمسين ضحيّة
.. جعلتها في الغروب
بركة حمراء.. خمسين ضحيّة
..يا حبيبي.. لا تلمني
..قتلوني.. قتلوني
قتلوني[৪৮৮]

একবার জলপাই বন সবুজ হয়ে গিয়েছিল
একবার... এবং আকাশ হয়ে গিয়েছিল
নীল নীল গহিন বন... হে প্রিয়
এ কি সেই যাকে বদলে দিয়েছিল এই আকাশ?

তোমার জন্য আছে আমার সবকিছু
তোমার জন্য একটু ছায়া, তোমার জন্য একটু আলো
বাসর রাত্রির আংটি এবং আরো আরো যা তুমি চেয়েছিলে...
জলপাই এবং ডুমুরের হাকুরা
শিঘ্রই তোমার কাছে আসবো আমি প্রতিটি রাত্রিতে
স্বপ্নের ভিতর খুলে দেবো জানালা

[৪৮৮]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আল'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ২২৪-২২৬।

রেখে যাবো তোমার জন্য ফুল্লা
একটু দেরি হয়ে গেলে তিরষ্কার করো না
কারণ তারা আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল।

জলপাইয়ের বন সবসময় সবুজ ছিল
হে প্রিয়
পঞ্চাশটি খুন
যাকে অস্তগামী করেছিল
রক্তিম পুকুর... পঞ্চাশটি হত্যাকাণ্ড
হে আমার ভালোবাসা... আমাকে তিরষ্কার করো না
তারা আমাকে হত্যা করেছে...
        তারা আমাকে হত্যা করেছে...
                তারা হত্যা আমাকে করেছে...

দারভীশ যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে এই কবিতা লিখছিলেন তখন সময়টি ছিল ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১। ৪৮ এর বিজয়ের মধ্যদিয়ে ইজরাইল ফিলিস্তিন দখল করে। পরবর্তীতে তারা দখলদারিত্ব আরো বেগবান করে। ৪৮ পরবর্তী এক দশক জুড়ে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি ছিল ভয়ঙ্কর। ইজরাইল তাদের তৎপরতা শতগুন বাড়িয়ে দেয়। এ সময় লাখ লাখ ফিলিস্তিনের বাড়িঘর দখল করতে গিয়ে অসংখ্যা হত্যাকাণ্ড চালায় তারা। ১৯৫৬ সালে ফিলিস্তিনের কাফার কাসিম এলাকায় গণহত্যার ঘটনা নিয়ে এ কবিতা লিখেন দারভীশ। এসব গণহত্যার প্রেক্ষিতে *ফী আখির আল লাইল* লিখেন তিনি। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। ফিলিস্তিনে ইজরাইলের যেসব গণহত্যা আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হয়েছিল কাফার কাসেম তার অন্যতম।[৪৮৯] কাফার কাসেম ফিলিস্তিনের একটি গ্রাম ছিল। ইজরাইল সেখানে সামরিক হামলা চালিয়ে গ্রামের প্রায় সব বসতিদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। বর্তমানে এটি ইজরাইলের দখলে। দারভীশ বলেন,

في الليل دقوا كل باب..
كل باب.. كل باب
وتوسلوا ألا نهيل على الدم الغالي التراب
قالت عيونهم التي انطفأت لتشعلنا عتاب:

[৪৮৯]. কাফার কাসেম গণহত্যা– ফিলিস্তিনীদের উপর ইজরাইলী কুখ্যাত গণহত্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৬ এর ২৯ অক্টোবর ইজরাইলের সীমান্তবর্তী ফিলিস্তিনি শহরের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা কাফার কাসেমে গণহত্যা চালায় ইজরাইল। দ্বিতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধে ব্রিটিশ-ফ্রান্স-ইজরাইলের সম্মিলিত ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। প্রায় ৫০ জন নিরীহ নিরস্ত্র ফিলিস্তিনীদের নির্মমভাব হত্যা করে ইজরাইলের সেনারা। যাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল কৃষিকাজের সম্পৃক্ত। রিপোর্ট, সেপ্টেম্বর, ২০২২, হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল, জাতিসংঘ। ভিজিট: মে ৫, ২০২৩, https://www.un.org/unispal/document/release-of-crucial-documents-on-kafr-qasims-massacre-on-its-66th-anniversary-statement-submitted-to-the-human-rights-council-by-palestinian-return-centre-a-hrc-51-ngo-176/

لا تدفنونا بالنشيد، و خلدونا بالصمود
إنّا نسمّد لبراعم الضوء الجديد
يا كفر قاسم!
من توابيت الضحايا سوف يعلو
علم يقول: قفوا! قفوا!
و استوقفوا!
لا :لا تذلوا !
دين العواصف أنت قد سدّدته ،
و انهار ظلّ
يا كفر قاسم! لن ننام.. و فيك مقبرة و ليل
ووصية الدم لا تساوم
ووصية الدم تستغيث بأن نقاوم
أن نقاوم..[৪৯০]

রাতের অন্ধকারে প্রতিটি দরোজায় তারা আঘাত করেছিল
প্রতিটি দরোজায়... প্রতিটি দরোজায়...
পৃথিবীর সবথেকে দামী রক্তের সাথে অবমাননা না করতে তারা
অনুরোধ করেছিল। তাদের পুড়ে যাওয়া প্রায় ম্রিয়মান চোখগুলো
বলেছিল, সংগীত দিয়ে আমাদের কবর দিও না। আমাদের বরং
ধীরে ধীরে অমর করে রেখো। নতুন আলোর অঙ্কুরে আমাদের জন্ম হবে
হে কাফার কাসেম!
নিহতদের কফিন থেকে উদ্ভেদ করে উঠবে এক পতাকা– বলবে সে-
ওঠো, দাঁড়াও!
তারা থেমে গিয়ে বলবে–
না, অপদস্থ হয়ো না
তোমারা ঝড়ের ঋণ পূরণ করে দিয়েছো
এমনকি ধসে পড়েছে ছায়া...
হায়, কাফার কাসেম– আমরা কখনো ঘুমাইনা।
আমাদের ভিতরেই কবর, আমাদের ভিতরেই রাত
রক্তের নির্দেশ, তোমরা আপোস করো না
রক্তের নির্দেশ দাবি করে– যেন আমরা প্রতিরোধ করি
যেন প্রতিরোধ করি।

৪৯০. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আল'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ২২৯-২৩০।

কিংবা

كفر قاسم
إنني عدت من الموت لأحيا، لأغني
فدعيني أستعر صوتي من جرح توهّج
و أعينيني على الحقد الذي يزرع في قلبي عوسج
إنني مندوب جرح لا يساوم
علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي
و أمشي.
وأقاوم ثم أمشي[৪৯১]

কাফার কাসেম
বাঁচার জন্য গান গাওয়ার জন্য আমি
ফিরে এসেছি মৃত্যু থেকে
সুতরাং আমাকে ধার করতে দাও দগদগে ঘা থেকে বের হওয়া কণ্ঠ
আমাকে দেখাও সেই বিদ্বেষ ঘৃণা যা আমার হৃদয়ে রোপন করে
ঝোপ– আমি এমন আঘাত ও ক্ষতের নিরাপোসকামী প্রতিনিধি
জল্লাদের আঘাত আমাকে শিখিয়েছে –
যেন আমি ঘা মাড়িয়ে চলতে থাকি
এবং চলতে থাকি
এবং প্রতিরোধ করি এবং হাঁটতে থাকি

কাফার কাসেমের মতো বহু গণহত্যা ঘটিয়েছে জায়োনিস্ট ইজরাইল। ইজরাইল শুধু নগর জীবন এবং নাগরিক কাঠামোই ধ্বংস করেনি একইসাথে ফিলিস্তিনের অসংখ্য গ্রাম দখল করে নিয়েছিল। ভেঙ্গে দিয়েছিল তারা গ্রামের কৃষিব্যবস্থাও। ইজরাইলের ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিটি চিহ্ন ফিলিস্তিনের প্রতিকণা মাটির গায়ে লেগে আছে। লেগে আছে তাদের নির্মম জুলুম নিপীড়নের ইতিহাস। কিন্তু জুলুম–নিপীড়নের পরও তাদের প্রতিরোধ থেমে থাকেনি। কারণ ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুর পেয়ালা পান করার নিদারুণ মুহূর্তেও একজন ফিলিস্তিনী তার প্রতিরোধের অদম্য ইচ্ছার কথা ভুলে যায়নি। ভুলে যায়নি তার মাতৃভূমি ফিরে পাবার অধিকারের কথা। ভুলে যায়নি সে তার স্বপ্নের কথা। কবি তাই বলেন,

هو الآن يرحل عنّا
و يسكن يافا
و يعرفها حجراً.. حجراً
و لا شيء يشبهه

[৪৯১]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ২।

و الأغاني
تقلِّدهُ..
تقلِّد موعده الأخضرا.
هو الآن يعلن صورته
و الصنوبر ينمو على مشنقهْ
هو الآن يعلن قصَّته
و الحرائق تنمو على زنبقهْ
هو الآن يرحل عنّا
ليسكن يافا[৪৯২]

আমাকে ছেড়ে এখন সে যাচ্ছে চলে
সে থাকবে ইয়াফায়
ইয়াফাকে সে জানে পাথরের মতো পাথরের মতো
কিছুতেই তার তুলনা হয় না
তাকে অনুসরণ করে
গানগুলো
গানগুলো অনুসরণ করে তার সবুজ মুহূর্ত
তার ফাঁসির কাষ্ঠে বেড়ে ওঠে দেবদারু
এখন সে বলতে থাকবে তার গল্প
যখন পদ্মফুলে জ্বলে ওঠে আগুন
এখন সে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে চলে
ইয়াফায় থাকবে বলে...

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইহজাগতিক নানা সম্পর্কের মধ্যে যে বিভাজন, দারভীশ তারই মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। প্রতিরোধ গড়ে তোলেছেন নিজের প্রচেষ্টার পথে। এক জায়গায়, এক দেহে মিলিত করার সাধনা করেছেন, লড়াই করেছেন। এটিই ছিলো তার ভাবপ্রক্রিয়া। রাজনীতি ও কবিতা।

[৪৯২]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আল'মাল আল উ'লা-২*, পৃ. ৪৭-৪৮।

৫.৫: ছুমুদ এবং প্রতিরোধের নতুনমাত্রা

কাফার কাসেমের গণহত্যার পর ফিলিস্তিন নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। ফিলিস্তিনের প্রতিটি নাগরিকের নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। তারা নতুনভাবে ফিরে দাঁড়াতে চায়। এই গণহত্যার পর যদিও ফিলিস্তিন নতুন সংকটের মুখে পতিত হয়। নতুন আরেকটি সংঘাতের মুখোমুখি হয়ে ওঠে ফিলিস্তিন। মিশরের সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড আবারো ইজরাইলের আঘাতের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। যুদ্ধ যদিও মিশরের সাথে ইজরাইলের। কিন্তু ফিলিস্তিন আক্রান্ত হয় প্রবলভাবে। পাঁচ দিনের এ যুদ্ধে ফিলিস্তিনের গাজা, রাফাহ এবং আল আরিশার বড় একটি অংশ দখল করে নেয় ইজরাইল।[৪৯৩] দখল করে নেয়ার পর ইজরাইল থেমে যায়নি। আরো তীব্র আগ্রাসন চালায় জায়োনিস্ট প্রশাসন। হত্যা, লুণ্ঠন এবং গুম- গ্রেপ্তারের অসংখ্য ঘটনা ঘটে সে সময়। ফিলিস্তিনে জাতীয়ভাবে সংগঠিত কোনো সংগঠন তখনো গড়ে উঠেনি। কিন্তু ততোক্ষণে ইজরাইলের হামলা মোকাবেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিরোধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে। দারভীশ সে সময়ের বিপুল সাক্ষ্য রাখেন তার অসংখ্য কবিতায়। নিচের এ কবিতাটিতে অন্যরকম এক অবস্থার কথা বলছেন দারভীশ। ছুমুদ কিংবা প্রতিরোধ সম্পর্কিত যে সক্রিয় তৎপরতা শুরু হয়েছিল ফিলিস্তিন জুড়ে সেরকম একটি অবস্থায় দারভীশ সমালোচনার সুরে কথা বলছেন। কার সমালোচনা করছিলেন তিনি? প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্যে যারা বিরতি কিংবা শান্তি-সমঝোতার জন্য নানা কূটনৈতিক উদ্যোগ নিচ্ছিলেন দারভীশ তাদের সমালোচনা করেছেন। একইসাথে হতাশার একটি বাস্তব চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। কবি বলেন,

[৪৯৩]. পাপ্পি, এলান, *আ হিস্ট্রি অব মডার্ন প্যালেস্টাইন* (ক্যামব্রিজ, ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ প্রেস, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২১০-২১৪।

هل تُكَلِّمُني يا أَبي؟
عقدوا هُدْنَةً في جزيرة رودوس ،
يا بني!
وما شأننا نحن، ما شأننا يا أبي؟
وانتهى الأمرُ ...
كم مرّةً ينتهي أَمرُنا يا أَبي؟
إنتهى الأمر. قاموا بواجبهم:
حاربوا ببنادقَ مكسورةٍ طائرات العدوّ.
وقمنا بواجبنا، وابتعدنا عن الزَنْزَلَخْتِ
لئلاّ نُحرِّكَ قُبَّعَةَ القائد العسكريّ.
وبعنا خواتم زوجاتنا ليصيدوا العصافي
يا ولدي![৪৯৪]

কথা বলো হে পিতা!
তারা এমন স্বর্গদ্বীপে যুদ্ধবিরতির সন্ধি করেছে
বৎস্য হে!
আমাদের কি অবস্থা হে পিতা!
বস্তুত ইস্যু শেষ হয়ে গেছে...
আর কতোবার হে পিতা, শেষ হয়ে যাবে আমাদের ইস্যু?
ইস্যু শেষ হয়ে গেছে। তারা পালন করেছে তাদের দায়:
ভাঙ্গা বন্দুকে হলেও তারা যুদ্ধ করেছে শত্রুর বিমানের বিরুদ্ধে
আমরা পালন করেছি আমাদের দায়–
এবং সেনাপতির ক্যাপে আঁচড় দিতে দেবো না বলে
সরে এসেছি ভূতের জীবাস্ম থেকে দূরে
আমরা কিনে নিয়েছি আমাদের স্ত্রীদের আংটি
কারণ তারা শিকার করে পাখিদের
হে বৎস্য!
তবে কি আমরা থেকে যাবো এখানে, হি পিতা!
বাতাসের ফিসফিস শব্দের আড়ালে
সমুদ্র এবং আকাশের মাঝে?

কবিতাটি দারভীশের *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদা কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা।* ১৯৯৫ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। তাতে সে সময়ে সংঘটিত কয়েকটি চুক্তি– যা নিয়ে দারভীশের তীব্র

[৪৯৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদান* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, খ্রি.) পৃ. ৩৭।

সমালোচনা রয়েছে। এটি সে সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও প্রতিরোধ বিষয়ক একটি মূল্য তৈরি করেছে এ কবিতা। বাবার সাথে সন্তানের সংলাপ– এমন একটি আবহ পুরো কবিতায় তৈরি করা হয়েছে। সংলাপের যেমন আন্তপাঠমূলক সাহিত্যিক বা ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে তেমনি এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যও রয়েছে।[৪৯৫] ফিলিস্তিনের জনগণ ইজরাইলের বিপরীতে জাতীয় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় যে দীর্ঘ প্রতিরোধ লড়াই জারি রেখেছে তা কখনো কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে। বারবার বাধার সম্মুখিন হয়। বারবার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। বারবার ফিলিস্তিনের 'বিষয়' কিংবা 'ইস্যু' নাই হয়ে যায়। ফিলিস্তিন প্রশ্নের কোনো কিনারা হয় না। জনগণ যে লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে যাচ্ছিলো তা বারবারই এমন করুণ অবস্থার মুখোমুখী হয়– এমন তীব্র আক্ষেপ আর ক্ষোভের ভাষায় কবিতাটি তার মুগ্ধ আবেগের এক শিহরিত হৃদয় গড়ে তুলেছে। যেখানে ঘুম, স্বপ্ন, জাগরণ, চৈতন্য, বর্জন কিংবা প্রত্যাবর্তন সবই বস্তুত প্রতিরোধের একেকটি অনুষঙ্গ-উপাদান।

নিজেদের গঠন এবং তৈরি করার জন্য নাকবা পরবর্তী পরিস্থিতে প্রতিরোধ যেমন জরুরি হয়ে উঠেছিল তেমনি ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা প্রতিরোধের ধরন এবং অভিমুখ শনাক্ত করার প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এর প্রয়োজনীয়তা এ কারণে জরুরি ছিল যে, এর মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনে একটি রাজনৈতিক শ্রেণি যে কাজ করছে তার প্রকাশ এবং ইতিবাচক উসকানির গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল। তাতে বোঝা যায়, ইতিমধ্যে প্রতিরোধ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করার মতো শক্তি ফিলিস্তিন নিজেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিরোধ আন্দোলন যখন দানা বাঁধতে শুরু করে মাত্র তার একদম গোড়ার দিকেই প্রতিরোধের প্রকরণও চিহ্নিত করা হয়েছিল। গাসসান কানাফানির প্রতিরোধ সংক্রান্ত আলোচনা তখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে কবিতায় কিংবা গল্পে এর ধরন ও প্রকরণ নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে বিপুল। মোকাওয়ামা (প্রতিরোধ) এর মতো ছামুদ নামেও প্রতিরোধের অপর একটি ধারা চিহ্নিত করা হয় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে।[৪৯৬] চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়াটি সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে তৈরি হয়েছে। তবে এরে উৎস কবিতা এবং অন্যান্য শিল্পমাধ্যম। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের ধরন কেমন তাকে কেন্দ্র করেই মোকাওয়ামা এবং ছমুদ বর্গদুটির উৎপত্তি ঘটে। তবে মোকাওয়া শব্দটি সাধারণ প্রতিরোধ অর্থে ব্যবহার হয়। ছামুদ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার হয়। ছুমুদ এর মানেও প্রতিরোধ। আত্মনির্ভরতা–প্রতিরক্ষা ইত্যাদি এর বিশেষ অর্থ। মোকাওয়ামা বললে যেমন তাতে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং অহিংস প্রতিরোধ উভয় অর্থ বোঝানো হয় তেমনটি ছমুদ এর ক্ষেত্রে হয়না। ছমুদ সাধারণত আত্মনির্ভরতা, আত্মপ্রস্তুতির অনুসঙ্গগুলো নিয়ে কবিতা বা সাহিত্যে ব্যবহার হয়। ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বিষয়ক ফিলিস্তিনের যে সার্বিক আয়োজন ও

---

[৪৯৫]. তামার, মেবুকি, *দি রোল অব ইন্টারটেক্সুয়াল রিলেশন্স ইন কালচারাল ট্যাডিশন* (পোল্যান্ড: জার্নাল অব লিটারেসি রিসার্চ, ভলিয়ম: ৫ (২), ২০১৪ খ্রি), পৃ. ৫২-৬৩। জারদিনী, মারদিয়াহ জারা', *জহিরাতু আল তানাছ ফী লুগাতি মাহমুদ দারভীশ আল শি'রিয়্যাহ* (আল তুরাছ আল আদাবী, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৬৭ খ্রি.), ৭৯-১০০ পৃ.।

[৪৯৬]. হায়দার, লামীছ, *গাওয়াইয়াতু আল জাকিরাহ ওয়া আল ছুমুদ ফী কাছীদাতি মাহমুদ দারভীশ 'কাম মাররাতান ইয়ানতাহি আমরুনা'* (মাজাল্লাতু আওরাকুন ছাকাফিয়্যাহ, জানুয়ারি ২৬, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ১-২০।, ভিজিট: অক্টোবর ৯, ২০২২, যঃঃঢ়ং://ীীী.ধৎিধয়ঃযধয়ধভুধ.পড়স/৭১৬/#:ূঃবীঃ=%উ৯%৮অ%উ৮%অঅ%উ৮%অ৩

প্রস্তুতি তারই একটি অংশ ছুমুদ। কারণ আত্মনির্ভরতা অর্জন না করতে পারলে প্রতিরোধ করাটাও অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সুমুদ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হয়ে ওঠে প্রতিরোধের অপর ক্যাটাগরি হিসেবে। ছুমুদ সংক্রান্ত কবিতাগুলোতে প্রতিরোধ সাধারণত প্রতীকী এবং রূপকাশ্রিত ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিংবা ছুমুদের ক্ষেত্রে কবিতার ভাষাও খুব বেশি উত্তেজনাকর নয়। মাহমুদ দারভীশের একটি কবিতায় এর যথার্থ ব্যবহার লক্ষ করার মতো। দারভীশ বলেন,

1
لو يذكرُ الزيتون غارسَهُ
لصار الزيت دمعا !
يا حكمة الأجداد
لو من لحمنا نعطيك درعا !
لكن سهل الريح ,
لا يعطي عبيد الريح زرعا !
إنّا سنقلع بالرموش
الشوكَ والأحزانَ... قلعا !
وإلام نحمل عارنا وصليبنا!
والكونُ يسعى...
سنظل في الزيتون خُضرتَه'
وحولَ الأرضِ درعا!

2
إنّا نحبُّ الوردَ ,
لكنّا نحبُّ القمحَ أكثرْ
ونحب عطر الورد'
لكن السنابل منه أطهرْ
فاحموا سنابلكم من الأعصار
بالصدر المسَمَّرْ
هاتوا السياج من الصدور..
من الصدور؛ فكيف يكسرْ؟؟
إقبض على عنق السنابل
مثلما عانقتَ خنجرْ !

الأرض ، والفلاح ، وا؟الإصرار،
قل لي : كيفَ تقهرْ...
هذي الأقانيم الثلاثة ,
كيف تقهرْ؟[৪৯৭]

এক.
জলপাই'র যদি মনে পড়ে তার চাষীর কথা
তবে অশ্রু হয়ে যায় তার তেল
হায় পূর্বপুরুষের প্রজ্ঞা
যদি আমাদের মাংসপিণ্ড দিয়ে তোমাকে দিতে পারতাম একটি লোহার পোশাক
কিন্তু বাতাসের কোমলতা
বাতাসের দাসকে দেবে না কোনো শস্য ফসল
তবে আমরা চোখের পশম দিয়েই মূলসহ উপড়ে ফেলবো
কাঁটা আর দুঃখগুলো
না হয় আমাদের বয়ে যেতে হবে
আমাদের শরম, আমাদের ক্রুশ
এই বিশ্বজগত চায়...
জলপাইময় আমরা হয়ে যাবো সবুজ
এবং পৃথিবীকে ঘিরে এক লোহার পোশাক

দুই.
আমরা ভালোবাসি গোলাপ
তার চেয়ে বেশি ভালোবাসি গম
আমরা ভালোবাসি গোলাপের ঘ্রাণ
কিন্তু আমাদের কাছে গমের শীষ তার চেয়ে বেশি পবিত্র
সুতরাং ঝড়ের কবল থেকে তোমরা তামাটে বুক পেতে রক্ষা করো
তোমাদের গমের শীষ
বুকে বুকে গড়ে তোলো বুকের প্রাচীর
কি করে ভাঙবে?
শক্ত হাঁতে আঁকড়ে ধরো শীষ
যেমন করে ধরতে খঞ্জর!
জমিন, কৃষক এবং প্রতিজ্ঞা–
বলো, কিভাবে বিজয় লাভ করবে?

---

[৪৯৭]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ৪৮-৪৯।

এই ত্রি-সত্তা
কিভাবে ছিনিয়ে আনবে?

ছুমুদের মূল বৈশিষ্ট্য অবিচলতা। দৃঢ়তা। নিজেদের স্বয়ম্ভু করে তোলা। প্রতিরোধের সাথে কি সম্পর্ক? মোকাওয়ামা বা প্রতিরোধ একটি বড় পরিসর হলে তার প্রধান অংশ হলো ছুমুদ। ছুমুদ এর অপর নাম, ফিলিস্তিনী হয়ে ওঠা– কিংবা ফিলিস্তিনী হয়ে ওঠার ক্রমাগত চর্চা ও অনুশীলন। ফিলিস্তিনী আত্মপরিচয় এখানে যতোটা গুরুত্বপূর্ণ তারচেয়ে বরং ফিলিস্তিনী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যেসকাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে তার মোকাবেলা করা। স্বভাবতই ছুমুদের সাথে ক্ষমতা এবং ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিরোধ নিবিড়ভাবে যুক্ত। ছুমুদ শুধু কথার কথা নয়। তার বাস্তবতা এবং বাস্তবতা কিভাবে ঘটে তার বোঝাপড়াও জরুরি। ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব যেমন ইজরাইলের জন্য একটি সমস্যা, সেকারণে ফিলিস্তিনকে নানান দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা ইজরাইলের জন্য অনস্বীকার্য। ফিলিস্তিনের যাদেরই ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হয় তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এমনকি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ সেলে এনে বিভিন্নভাবে তাদের দমন করার প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা হয়। এর জন্য জিজ্ঞাসাবাদ সেলকে যেভাবে তৈরি করা হয়– তার সবধরনের পদ্ধতি, সূত্র ও কাঠামো– কলাকৌশল বিস্তারিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা জিজ্ঞাসাবাদকারীদের দেয়া থাকে। এসবকিছু মোকাবেলার নামই ছুমুদ। অপরদিকে জায়োনিস্টদের নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে ছুমুদও তার প্রতিরোধের কলা কৌশল নির্ধারণ করে। ছুমুদ জায়োনিস্টদের সমস্ত নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়া রীতিমতো অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।[৪৯৮]

ফিলিস্তিনী গবেষক লিনা মিয়ারি একটি বর্গ হিসেবে ছুমুদ এর রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। লিনা মিয়ারি মনে করেন, ছুমুদের একটি রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে। এটি যেমন ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক কর্তাসত্তা তৈরিতে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে তেমনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক থাকে না তখন রাজনৈতিক সম্ভাবনাগুলো কি হতে পারে সেদিক থেকে ছুমুদ তার সক্রিয়তা প্রকাশ করতে পারে। নির্যাতন নিপীড়ন, জুলুম ও দমনমূলক পরিস্থিতিতে ছুমুদ একটি স্থায়ী বৈপ্লবিক এবং বিকল্প রাজনৈতিক সম্ভাবনা হিসেবে নিজের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম। ছুমুদের মধ্যদিয়ে বস্তুত ফিলিস্তিনীদের নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম *আমি* গড়ে ওঠে। ছুমুদের এই সার্বভৌম সত্তা মূলত উপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রক্রিয়া ও কাঠামোগুলোর ভিতরের বস্তু। লড়াইয়ের এমন সারসত্তা উপনিবেশিক শাসন প্রক্রিয়ার বিপরীতে গড়ে উঠেছিল ঐতিহাসিকভাবে।[৪৯৯] ইজরাইলের বিরুধিতার যৌক্তিকতা তৈরির প্রেক্ষাপটে ছুমুদ একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা নিয়ে আসে ফিলিস্তিনে।

---

[৪৯৮]. রিজকি, আলেক্সান্দ্রা ও টয়নি ভেন টিফিলেন, *টু এক্সিসট ইজ টু রেজিস্ট: সুমুদ, হিরোইজম, এন্ড দি ইভরিডে* (জেরুজালেম কোয়ার্টার্লি, ইস্যু: ৫৯, সামার ২০১৪), পৃ. ৮৬-৯৯।

[৪৯৯]. মিয়ারি, লিনা, *ছুমুদ: আ প্যালেস্টাইনিয়ান ফিলোসফি অব কনফ্রন্টেশন ইন কলোনিয়াল প্রিজন* (যুক্তরাষ্ট্র: দি সাউথ আটলান্টিক কোয়ার্টার্লি, ভলিয়ম: ১১৩, সংখ্যা: ৩, সামার ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৫৪৮-৫৬৬।

কাজে ফিলিস্তিনের জাতিগত পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে দেখা যায়, প্রতিরোধের যেমন দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তেমনি ছুমুদেরও একটি ঐতিহাসিক হাল-হকিকত আছে। ইজরাইলের নিরন্তর উপনিবেশায়নের মধ্যেই ছুমুদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। একজন কারাবন্দির জীবন, জিজ্ঞাসাবাদ সেলের বন্দি ফিলিস্তিনীর যে প্রতিরোধের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা কাঠামোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যাওয়ার বিষয় রয়েছে তেমনি এর বাইরেও ছুমুদ এর বিস্তার রয়েছে। জীবনব্যাপী ছুমুদ এর উপস্থিতি ফিলিস্তিনী হয়ে ওঠার একটি উপায়। কিন্তু তার মানে ছুমুদ সহিংস কিংবা সশস্ত্রতার সীমা অস্বীকার করে না। বরং ইজরাইলের ক্ষমতা চর্চার সীমা ও পরিসরগুলো কতোটা বিস্তার ঘটাতে পারে তার মুখোমুখী হওয়ার মনস্তত্ব তৈরি করে ছুমুদ। মোটকথা, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিসরগুলোর মধ্যদিয়ে ছুমুদ তার সক্রিয়তা সবসময় হাজির রাখার ঐতিহাসিকতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ফিলিস্তিনীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি পর্যায় হিসেবে ছুমুদের শক্তিশালী বর্গ হয়ে ওঠার ঘটনা নিসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে ছুমুদ'র ধারণা গড়ে ওঠার সাথে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র মার্কসবাদী ধারার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৬৯ এর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মূলত ছুমুদ এর ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ছুমুদের রাজনৈতিক আবেদন তৈরিতে পিএফএলপির (Popular Front for the Liberation of Palestine) ছিল বিশেষ অবদান। সাম্রাজ্যবাদ, জায়োনিজম, আরব বুর্জোয়াতন্ত্রের যেকোনো কর্তৃত্বপরায়ণ তৎপরতার বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ছিল।[৫০০]

লিনা মিয়ারির আলোচনার বিস্তার ছিল মূলত নাকবা পরবর্তী ফিলিস্তিনে ইজরাইলের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া এবং তার ক্ষমতা কাঠামোর ভিতরে 'শাবাক'র মতো অসংখ্য জিজ্ঞাসাবাদ সেলের নিপীড়ন ও নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে। পুরো পরিস্থিতির যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তাতে ছুমুদের উৎপত্তি কিভাবে নতুনতরো রাজনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করেছে তা চিহ্নিত করা। এ চিহ্নিতকরণের সবথেকে জীবন্ত উৎস হলো কবিতা এবং স্মৃতি। দারভীশের কবিতা একইসাথে সেসব প্রতিরোধ ও ছুমুদের ঘটনাবলীর মর্ম নিদারুণভাবে তুলে এনেছে। চতুর্থ আরব-ইজরাইল যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি যখন আরো ঘনিভূত হয়ে উঠেছিল ফিলিস্তিনে। প্রতিরোধ যেমন তীব্রতরো হয়ে উঠেছিল তেমনি জায়োনিস্ট ইজরাইলের সামরিক নিয়ন্ত্রণকৌশলগুলোও বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। বিচিত্র দমন-পীড়নের উপায় গ্রহণ করে ইজরাইল। সে সময় অসংখ্য গোপন কারাসেল নির্মাণ করে ইজরাইল। যেখানে বিপ্লবীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। অসংখ্য ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের গোপনে গুম করে নিয়ে যাওয়া হতো সেসব সেলে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাদের সেখানে অকথ্য নির্যাতন করা হতো। এমন শ্বারুদ্ধকর পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ থেমে যায়নি। নতুন কৌশলে প্রতিরোধ চলতে থাকে। দারভীশ এমনি পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনীদের লড়াইয়ের মহাকাব্য প্রণয়ন করেছেন *'তিলকা ছুরাতুহা ওয়া হাজা ইনতিহারুল আশিক'* গ্রন্থে। বইটিতে ইজরাইলের দমন-পীড়ন, জুলুম নির্যাতনের সারবর্ণনা যেমন

---

৫০০. প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৫৫-৫৫৬।

রয়েছে তেমনি উঠে এসেছে ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধের সীমাহীন সাহসিকতার অনিশেষ কাহিনী। দারভীশ বলেন,

والصوت أسودكنت أعرف أن برقا ما سيأتي
كي أرى صوتا على حجر الظلام
والصوت أسود
كنت في أوج الزفاف
الطائرات تمرّ في عرسي
كتبت
حبيبت فحم
كتبت
وكنت أعرف أن برقا ما سيأتي

في زمن الدخان يضيء تفّاح المدينة
تنزل الرؤيا إلى الجدران
في زمن الدخان يخّبىء السجان صورته..
رأيت رأيت عصفورين يحتلان قبّعة
رأيت الذكريات تفر من شبّاك جارتنا
وتسقط في جيوب الفاتحين
وأشتهي ما يشتهى
والطائرات تمرّ
والزمن المكلّس ينتهي في الانهيارات
الأصابع ظل ذاكرة على الجدران
والدم نطفة أو بذرة
لا لون لي
لاشكل لي
لا أمس لي
إن الشظايا حاصرتني
فاتسعت إلى الأمام
وصرت أعلى من مدينتنا أنا الشجر الوحيد
أنا الشظايا و.. الهدايا
أريديك، وأخلع الأيام
لا تاريخ قبل يديك
لا تاريخ بعد يديك
سموك البديل

لأن لون الثورة احتلّ الكآبة
والغزاة يمشطّون يديك من آثار ظهري
أرتديك وأخلع الأيام
سموك البديل
وبدلوك
كأن أغنية تغيرّ أو تطهّر أو تدمّر أو تفجّر
هم يبحثون عن البكارة خندقا[৫০১]

২
في زمن الدخان يضيء تفّاح المدينة
تنزل الرؤيا إلى الجدران
..في زمن الدخان يخّبىء السجان صورته
رأيت رأيت عصفورين يحتلان قبّعة
رأيت الذكريات تفر من شبّاك جارتنا
وتسقط في جيوب الفاتحين
وأشتهي ما يشتهى
والطائرات تمرّ
والزمن المكلّس ينتهي في الانهيارات
الأصابع ظل ذاكرة على الجدران
والدم نطفة أو بذرة
لا لون لي
لاشكل لي
لا أمس لي
إن الشظايا حاصرتني
فاتسعت إلى الأمام
وصرت أعلى من مدينتنا أنا الشجر الوحيد
أنا الشظايا و.. الهدايا
أريديك، وأخلع الأيام
لا تاريخ قبل يديك
لا تاريخ بعد يديك
سموك البديل
لأن لون الثورة احتلّ الكآبة

৫০১. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আল'মাল আল উ'লা-২*, পৃ. ২০৫।

والغزاة يمشطّون يديك من آثار ظهري
أرتديك وأخلع الأيام
سموك البديل
وبدلوك
كأن أغنية تغيرّ أو تطهّر أو تدمّر أو تفجّر
هم يبحثون عن البكارة خندقا
ويمارسون الغزو ضدّ الغزو في خلجان جسمك
أرتديك.. وأخلع الأيام
سموك البديل
وهم ضحاياك[৫০২]

১
কণ্ঠটি বেশ কালো
আমি জানতাম, একটি বিদ্যুৎ ঝিলিক দ্রুত আসবে
যেন অন্ধকারে পাথরের উপর আমি দেখতে পাই একটি কণ্ঠ
কণ্ঠটি অতি কালো
আমি ছিলাম বিয়ের উৎসবের মধ্যমণি
বিমানগুলো তখন উড়ে যাচ্ছিল উৎসবের মধ্যদিয়ে
আমি লিখেছি
আমার প্রিয়তমা এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার
অমি লিখেছি
যখন আমি জানতাম, এক চিলতে বিদ্যুৎ এসে পড়বে দ্রুত

২.
ধোঁয়াচ্ছন্ন সময়ে আলো ছড়ায় শহরের আপেল
দেয়ালে দেয়ালে নেমে আসে স্বপ্ন
ধোঁয়াচ্ছন্ন সময়ে বন্দিরা লুকায় ফেলে তাদের কণ্ঠ
আমি দেখেছি– দেখেছি দুটি চড়ুই দখল করে আছে মাথার ক্যাপ
আমি দেখেছি প্রতিবেশির জানালা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে স্মৃতিরা
এবং সেসব স্মৃতি ঝরে পড়ছে বিজয়ীদের পকেটের ভিতর
যা কামনা করা যায় আমি তাই চাই
বিমানগুলো যখন অতিক্রম করে যাচ্ছে
যখন পতনে ভাঙ্গনে শেষ হয় চূর্ণবিচূর্ণ সময়

৫০২. প্রাগুক্ত। পৃ. ২০৬-২০৭।

আঙুলগুলো তখন দেয়ালে দেয়ালে ইঙ্গিতময় ছায়া
এবং খুন যেন কেবল দাগচিহ্ন কিংবা শস্যদানা
আমার কোনো রঙ নেই
আমার কোনো আকার নেই
আমার কোনো অতীত নেই
আমাকে ঘিরে আছে লাশের টুকরাগুলো
তবু আমি এগিয়ে যাই সমুখে
আমি পৌঁছে যাই আমাদের শহরের উপকণ্ঠে
আমিই একমাত্র বৃক্ষ
আমিই খণ্ড খণ্ড লাশ এবং... উৎসর্গীত প্রাণ

আমি তোমাকে পরাই, খুলে ফেলি কালের আবরণ
তোমার আগে কোনো ইতিহাস নেই
তোমার পরেও কোনো ইতিহাস নেই
তারা তোমার নাম দিয়েছে বিকল্প
কারণ বিপ্লবের রঙ দখল করে নিয়েছে যাবতীয় যন্ত্রণা
আমার পিঠ জুড়ে তোমার হাত দিয়ে চিরুনি করে দেয় লড়াকুরা
আমি তোমাকে পরাই, খুলে ফেলি কালের আবরণ
তারা তোমার নাম দিয়েছে বিকল্প
কারণ তারা তোমাকে বদলে দিয়েছে
যেনবা একটি গান সবকিছু পরিবর্তন করে দেয়
অথবা পবিত্র করে দেয় সব
অথবা সবকিছু তছনছ করে দেয়
অথবা বিস্ফোরিত করে দেয় সব
তারা কুমারিত্বের ভিতর থেকে সন্ধান করে পরিখা
তারা তোমার দেহের শরমের ভিতর
যুদ্ধ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে
আমি তোমাকে পরাই... খুলে ফেলি কালের আবরণ
তারা তোমার নাম দিয়েছে বিকল্প
এবং তারাই তোমার কোরবানি।

৩.
মরছে খেঁজুর গাছ কিংবা বেঁচে উঠছে
বিস্তৃত হচ্ছে আমার ধারা

এবং উপকূলগুলো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছে আমার সম্প্রসারণের ভিতর
আমি চাই:
প্রথম খুন এবং প্রথম স্মৃতি থেকে
শেষ জীবিত পর্যন্ত
একটি মানচিত্র
যাকে আমি ভেঙ্গে ফেলি ছুঁড়ে ফেলি পাখির মতো বৃক্ষের মতো
যাতে আমি হেঁটে চলি অবরুদ্ধ হয়ে অবরোধের ভিতর।
বিস্তীর্ণ আগামীর প্রান্ত থেকে আমার বিবিধ ভাঙনের ভিতর থেকে
আদিগন্ত আমার বিস্তার
এই আমার নতুন হাত
এই আমার নতুন আগুন...[৫০৩]

দারভীশের এই কবিতায় পাঠ করার পর দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। একটি, ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন কতোটা গভীর এবং বিচিত্র। অপরদিকটি হলো, এর বিপরীতে ফিলিস্তিনীদের লড়াই ও প্রতিরোধের আগুন কিভাবে আরো জীবন্ত হয়ে উঠতে সক্ষম। ছুমুদকে এখানে অন্যমাত্রায় চিত্রায়িত করেছেন দারভীশ। তিলকা ছুরাতুহা ওয়া হাজা ইনতিহারুল আশিক– এটি একটানা কবিতা।

৫.৬: প্রতিরোধ: দ্রোহ, ক্ষোভ, গণপ্রতিরক্ষা ও গণচৈতন্য

ছুমুদ–এর উৎপত্তি ও বিকাশের ঘটনা একটি বিশেষ ঐতিহাসিকতার জন্ম দিয়েছে। ছুমুদ মূলত সার্বিক প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। লিনা মিয়ারির আলোচনায় এর বৈপ্লবিক সম্ভাবনার কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি এর তাত্ত্বিক পর্যালোচনাও রয়েছে। 'হয়ে ওঠা' যেখানে ফিলিস্তিনীদের শক্তি অর্জনের ঘটনা। এই হয়ে ওঠাটাই বৈপ্লবিক। এর মানে ইজরাইলের অনন্ত উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া এবং তার ক্ষমতা কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য নিজেদের 'হয়ে ওঠা'র ঘটনা ঐতিহাসিক এবং বৈপ্লবিক। যার গোড়ার বস্তু হলো ছুমুদ। কিন্তু এটি ঠিক আত্মপরিচয়ের সারমর্ম নয়। বরং বৈপ্লবিক কর্তাসত্তাকে নতুন করে গড়ে তোলার পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার সাথে এই হয়ে ওঠার নামই ছুমুদ। ফলে এই বৈপ্লবিক সত্তার গড়ে ওঠাটা একাট্টা কোনো একক সম্পর্কের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। বিচিত্র এবং বহুবাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত হয়ে এর উত্থান এবং সম্প্রসারণ সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।[৫০৪] গণমানুষের বিচিত্র সম্পর্কগুলোর সাথে সম্পর্কিত হয়ে এই 'হয়ে ওঠা'র প্রক্রিয়া চূড়ান্তে উপনীত হতে পারে। ফলে পারিবারিক, অর্থনৈতিক,সামাজিক, সামরিক কিংবা আরো বহু সম্পর্কের নিগড় থেকে এর বিস্তার সম্ভব করে তোলে এই ছুমুদ।

---

৫০৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ২২৪।
৫০৪. মিয়ারি, লিনা, *ছুমুদ: আ প্যালেস্টাইনিয়ান ফিলোসফি অব কনফ্রন্টেশন ইন কলোনিয়াল প্রিজন*, পৃ. ৫৫৮-৫৬৬।

ছুমুদ এর সাথে গণসম্পর্ক কিংবা গণমুখী বহুবাস্তবতা মৌলিক। ছুমুদ কিংবা প্রতিরোধ কোনোভাবেই সম্ভব নয় যদি না এর সাথে গণভিত্তি না থাকে। প্রতিরোধের সাথে ক্ষোভ এবং দ্রোহের প্রকাশ দেখা যায়। দ্রোহ কিংবা ক্ষোভ প্রতিরোধের একটি সাধারণ মাত্রা। যখন বৈপ্লবিক কথাটি উচ্চারিত হয় তার সাথে অজান্তেই ক্ষোভ কিংবা দ্রোহের একটি চিত্র ভেসে ওঠে। ক্ষোভ বা দ্রোহ মূলত একজন নিপীড়িত সত্তার অন্তর্গত ধৈর্য্যের একটি চূড়ান্ত প্রকাশ। অর্থাৎ দ্রোহ কিংবা ক্ষোভ কখন কোন ধরনের– কোন শ্রেণির মানুষের মধ্যে কখন কোন বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এর প্রকাশ ঘটে কেন ঘটে– এসব প্রশ্নের সাথে ক্ষোভ এবং দ্রোহকে বোঝার সম্পর্ক রয়েছে। দ্রোহ মানুষকে এমন একটি অবস্থায় নিয়ে যায় যেখানে সমাজের ক্ষমতা এবং ক্ষমতাহীনতার প্রক্রিয়াগুলোকে চিহ্নিত করতে দ্রোহ এবং ক্ষোভ দারুণভাবে কাজ করে। কিন্তু ক্ষোভের পরিণত রূপই হলো ছুমুদ। কারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠা এবং ক্ষোভ প্রকাশের বিষয়গুলো যখন একটি নিয়মতান্ত্রিকতা এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তা প্রতিরোধের পর্যায়ে উন্নীত হয়। প্রতিরোধ যখন আরো ব্যাপকতরো হয়ে ওঠে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তখন এটি ছুমুদে রূপান্তরিত হয়। ফলে বিপ্লবের সত্তা 'সামাজিক হয়ে ওঠা'– কথাটির চেয়ে বরং নতুন সমাজ নির্মাণের প্রত্যয় তৈরি করে– কথাটি বেশি যৌক্তিক। কারণ নতুন সমাজ গড়ে তোলার সাথে সামাজিক হয়ে ওঠা নয় বরং গণসম্পৃক্ততার সূত্র এবং নৈতিকতা তৈরি করা বৈপ্লবিক সত্তার কাজ হয়ে ওঠে যার সাথে নতুন ইতিহাস নির্মাণের সম্পর্ক রয়েছে। যেকারণে ছুমুদ বস্তুত একটি বহুমাত্রিক সম্পর্ক প্রস্তাব করে যাতে বিপ্লবের সত্তা নিছক ব্যক্তির ইউটোপিয়া হয়ে থাকে না– বরং সত্তার বহুবিধ সম্পর্ক কিংবা গণসম্পর্কের পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। গণসম্পর্কের অর্থ হলো, সমাজের প্রত্যেরক স্তরের মানুষের পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক গঠন করা। এটি একটি বন্ধন প্রক্রিয়া। এই সম্পর্ক প্রক্রিয়ার ফলে বৈপ্লবিক সত্তাকে নিছক ব্যক্তির সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না বরং এটি ক্রমাগত গণসত্তা কিংবা গণচৈতন্যে রূপ গ্রহণ করে। ছুমুদের জন্য এটি একটি বড় ধরনের ঘটনা। ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধের সত্তার সাথে গণচৈতন্যের যে সম্পর্ক তার ভাষাগত এবং ঐতিহাসিক প্রামান্য বয়ান গড়ে উঠেছে দারভীশের কবিতার মধ্যদিয়ে।

দারভীশ ক্ষমতাসীন শ্রেণি, উপনিবেশিক দখলদার শক্তি– অপরদিকে উপনিবেশিত এবং প্রতিরোধ লড়াকুদের আলাদা করে দেখেছেন। একটি গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শোষক শ্রেণির শোষণ, জুলুম এবং বহিরাগত উপনিবেশিক দখলদারী ক্ষমতা কাঠামো, বলপ্রয়োগ এবং ইন্টারোগেশন থেকে শুরু করে সার্বিক নিপীড়ন প্রক্রিয়াগলোর মধ্যে মৌলিক তফাত রয়েছে। উপনিবেশিক দখলদার শক্তি যখন হানাদারি পরিস্থিতি তৈরি করে সেখানে দখলকৃত জনগোষ্ঠীর শ্রেণিবিবেচনা খুব গৌণ হয়ে ওঠে। দখলদারদের আগ্রাসন ও নিপীড়ন প্রক্রিয়ার মুখে সর্বস্তরের মানুষ একই লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। সেখানে কোনোরকম শ্রেণি বিবেচনা থাকে না। রাজনৈতিক শ্রেণি এবং সাধারণ মানুষ তাদের আগ্রাসন ও দমনমেশিনারির একই বিবেচ্য হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক শ্রেণি শুধু কখনো কখনো সমঝোতার জন্য ব্যবহারের মাধ্যম হয়ে ওঠে–এর বেশি কিছু নয়। সবথেকে জরুরি

বিষয় হলো, উপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে অধিকৃত জনগোষ্ঠীর কোনো মৌলিক অধিকারই থাকে না। ইজরাইলের কাছে ফিলিস্তিন এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যেই নিজেদের ভাগ্য বরণ করে যাচ্ছে যুগের পর যুগ। ক্ষমতাসীন শ্রেণি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইজরাইলের এমন একটি চিত্র তুলে ধরেছেন দারভীশ তার 'নাশিদ' নামক কবিতায়। দারভীশ বলেন,

غضب السلطان، والسلطان في كل الصور
وعلى ظهر بطاقات البريد
كالمزامير نقيّ وعلى جبهته وشم العبيد،
:ثم نادى... وأمر
أقتلوا هذي القصيدة
!ساحة الإعدام ديوان الأناشيد العنيدة
أخبروا السلطان،
أن البرق لا يحبس في عود ذره
للأغاني منطق الشمس، وتاريخ الجداول
ولها طبع الزلازل
والأغاني كجذور الشجرة
فإذا ماتت بأرض،
أزهرت في كل أرض
كانت الأغنية الزرقاء فكره
حاول السلطان أن يطمسها
!فغدت ميلاد جمره
كانت الأغنية الحمراء جمره
حاول السلطان أن يحبسها
!فإذا بالنار ثوره
كان صوت الدم مغموسا بلون العاصفة
وحصى الميدان أفواه جروح راعفه
وأنا أضحك مفتونا بميلاد الرياح
عندما قاومني السلطان
أمسكت بمفتاح الصباح
وتلمست طريقي بقناديل الجراح
آه كم كنت مصيبا
عندما كرست قلبي
لنداء العاصفة

فلتهبّ العاصفة!
ولتهبّ العاصفة[৫০৫]!

সম্রাট শাসক থাকেন প্রতিটি ছবির ভিতর।
ডাকটিকিটের গায়ে থাকেন সম্রাট।
সম্রাটের রাগ সম্রাট-বন্দনার মতো পরিষ্কার
তার কপালজুড়ে আঁকা গোলামের ব্যাঙ্গচিত্র
অতঃপর তিনি ডাকলেন, হুকুম দিলেন:
হত্যা করো এসব কবিতা
মৃত্যুকুপে ছুঁড়ে ফেলো
অবাধ্য একগুঁয়ে সব সঙ্গীত সম্ভার।
তোমরা সম্রাটকে জানিয়ে দাও
সামান্য খাদ্যফলকে আবদ্ধ করা যায় না বজ্রালো
গানেদের আছে সূর্যদীপ্ত ভাষা, পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস
আছে ভূকম্পনের চরিত্র।
বৃক্ষের শিকড়ের মতো গান
একবার মাটিতে মরে মিশে গেলে
প্রতিটি ভূমিতে কুসুম ছড়ায় আবার
নীল নীল গানগুলো যেন কল্পনার আধার
সম্রাট চেষ্টা করলো তা মুছে ফেলতে
কিন্তু তা জন্ম দিলো এক জ্বলন্ত অঙ্গার
খুনরাঙ্গা লাল লাল গানগুলো তপ্ত কয়লাই ছিল
সম্রাট চেষ্টা করলো তা আটকে ফেলতে
কিন্তু সেই গান মুহূর্তে ফেটে পড়লো অগ্নিঝরা বিপ্লবে

খুনমাখা কণ্ঠ মিশে আছে ঝড়ের রঙে
মাঠের নুড়িগুলো হয়ে ওঠে ক্ষতবিক্ষত নাজুক কিছু মুখ
বাতাসের জন্মে আমি মুগ্ধ হয়ে হাসি
যখন সম্রাট আমাকে প্রতিরোধ করে
আমি আঁকড়ে ধরি ভোরের চাবি
এবং শল্যচিকিৎসকের লাইট দিয়ে সন্ধান করি আমার পথ
হায়, তুমি কতোটা বিপদাক্রান্ত ছিলে
যখন আমার হৃদয় উজাড় করে দিয়েছিলাম

---

৫০৫. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আল'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ২৫৭-২৫৮।

ঝড়ের ডাকে
সুতরাং ঝড়কে আসতে দাও
সুতরাং ছড়িয়ে পড়তে দাও ঝড়ের আগুন!

পুরো কবিতাটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। দারভীশ অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে জায়োনিস্ট ইজরাইলের আগ্রাসন প্রক্রিয়ার মুখে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধের ছবি এঁকেছেন অগ্নিঝরা ভাষায়। প্রতিরোধ কতোটা মৌলিক এবং ব্যাপক হতে পারে তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ কবিতায়। দারভীশ এখানে ইতিহাস, সময়, দেশকাল, ভাষা এবং প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের মাধ্যমে যে প্রতিচিত্র তৈরি করেছেন তাতে ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক থেকে প্রতিরোধের বিস্তারকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। ইজরাইলের নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠীর প্রতিরোধের কথাও এখানে এসেছে। যাতে ফিলিস্তিনের পাল্টা প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন দারভীশ। দারভীশের কাব্যিক উপস্থাপন নিবিড় শিল্পমণ্ডিত এবং অর্থসমৃদ্ধ। দখলদার প্রভুর রাগ-অহমিকা দুমড়ে মুচড়ে দারভীশ প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই আগুন ফিলিস্তিনীদের অধিকার আদায়ের আগুন। এই আগুন-ঝড় ইজরাইলের ত্রাসসৃষ্টির সমস্ত প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। দখলদারির বিরুদ্ধে। কবি বলেন,

يا قارئ !
لا ترج من الهمس
الا ترج الطرب
هذا عذابي
ضربة في الرمل طائشة
و أخري في السحب!
حسبي بأني غاضب
والنار أول غضب[৫০৬]

সুতরাং পাঠক হে!
আমার কাছে নরম নরম কথা আশা করো না
আনন্দ পাবার আশা করো না।
এই আমার অত্যাচার
তপ্ত বালুতে বেপরোয়া প্রহার
আরেক আঘাত মেঘের মধ্যে
এতটুকুই যথেষ্ট, আমি এক বিদ্রোহী
এবং জেনে রাখো, আগুনের সূচনা দ্রোহ।

---

[৫০৬]. মাহমুদ দারভীশ. *আদ্দীওয়ান. আল আ'মালুল উলা*- ১. ২০০৫. পৃ. ১৫, ১৬।

উপরের কবিতাটি শত্রুর দেহমনকে অগ্নিঝরা চাবুকের মতো যেমন বিদ্ধ করেছে তেমনি কবিতার শ্রেণীগত দিক থেকে শিল্প প্রকরণগত অলংকারিক বিন্যাস যথাযর্থভাবে ফুটে উঠেছে। কবি যেমন বিদ্রোহ প্রদর্শন করেন তেমনি আশারও সঞ্চার করেন। কবি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সান্ত্বনার সুরে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। 'আন ইনসান'(মানুষ বিষয়ক) কবিতার শেষে কবি বলেন-

ايا دامي العينين, والكفين
أن الليل زائل
لا غرفة التوقيف باقية
ولا زرد السلاسل
نيرون مات و لم تمت روما
بعينها تقاتل
وحبوب سنبلة تموت
ستملأ الوادي سنابل![৫০৭]

হে রক্তচক্ষু খুনরাঙা হাত
দ্যাখো রাত সরে যাচ্ছে
অয়েটিং রুম স্থায়ী নয়
শিকল কড়া স্থায়ী নয়।
নীরুন মরে গেছে কিন্তু রোম মরেনি
তার চোখ দিয়েই সে লড়াই করছে
আর গমশীষের দানাগুলো মরছে
দেখবে শীষে শীষে উপত্যকারা ভরে যাবে।

অভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে কবি বলেনঃ

ردوه عن كل النوافذ[৫০৮]

"তাকে তাড়িয়ে দাও প্রতিটি জানালা থেকে।"
১.

ومن كان منكم قويًا ..أعينه نائبا للمدائح
ومن كان منكم بلا ذهب أو مواهب
ـ فلينصرف

৫০৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ২১।
৫০৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৭।

ومن كان منكم بلا ضجرٍ ولآلىء
فلينصرف[509]
২.
الضجـر !
الضجـر !
ألا تشعرون ببعض الضجر[৫১০]!

একই কবিতায় কবি সমসাময়িক কবিদের সমালোচনার ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। মূলত কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যারা জায়োনবাদী ইসরাইল ও সাম্রাজ্যবাদীদের স্থানীয় আজ্ঞাদাসের ভূমিকা পালন করে কবি তাদেরকে নাকচ করে দেনঃ

في سوق شعر خائب
و أقول للشعراء:
أيا شعراء أمتنا المجيدة
أنا قاتل القمر الذي

كنتم عبيده!
"নিষ্ফল কাব্য বাজারের
কবিদের আমি বলছি-
হে আমাদের জাতির গৌরবদীপ্ত কবি সকল
তোমরা যে চাঁদের গোলাম, আমি তার হত্যাকারী।"

শত্রুর প্রতিরোধে আরবের সৌর্য্য-বীর্যের ঐতিহ্য স্মরণ করে আক্ষেপের নিঃশ্বাস ফেলেন কবি। কবি আরবের সাহসের প্রতীক শকুনকে বা ঈগলকে সম্বোধন করে বলেন,

وطني! أيها النسر الذي يغمد منقار اللهب
في عيوني
أين تاريخ العرب[৫১১]

হায় আমার দেশ! যে শকুন লুকিয়ে রাখতো
আগুনের চঞ্চু
আমার চোখের ভেতর
কোথায় সেই আরবের ইতিহাস।

এই কবিতার পরের পঙক্তিতে কবি প্রতিরোধের বীজ বপনের নির্দেশ করেন প্রতীকি ব্যঞ্জনায়ঃ

---
৫০৯. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিকতাতুরহ* (), পৃ. ১১।
৫১০. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৭।
৫১১. মাহমুদ দারভীশ. *আদ্দীওয়ান. আল আ'মালুল উলা- ১.* ২০০৫, পৃ. ২৪৩

وأنا أوصيت أن يزرع قلبي شجرة
وجبيني منزلا للقبرة

আমি নির্দেশ করলাম আমার হৃদয় রোপন করবে বৃক্ষ
এবং আমার ললাট হবে ভারুই পাখীর ঠিকানা।[৫১২]

কবির এই বীজ থেকেই উৎপন্ন হয় ফিলিস্তিনীদের মাঝে সাহসের অংকুর, প্রতিরোধের অসংখ্য ডালপালা। কিন্ত সময়টি ছিলো এমন, চারিদিক থেকে ফিলিস্তিনীদের তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল। হত্যা করা হচ্ছিল। এক মহা ট্রাজেডী পূর্ণ অবস্থার মধ্যে তাদের দিন অতিবাহিত হয়। সময়টা তখন ষাট এবং সত্তরের দশক। একদিকে প্রতিরোধ গড়ে উঠছে, অন্যদিকে ইসরাইলী আক্রমণে আবার তা স্তিমিত হয়ে যায়। ফলে প্রতিরোধকে ক্রিয়াশীল রাখার তাগিদে কবি সাহস উচ্চারণ করেন– যারা মৃত্যু বরণ করছে কবি তাদের স্বজনদের শোক সহ্য করে আবার জেগে ওঠার মন্ত্রে উদ্ধুদ্ধ করেন।

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখল করে জায়োনিস্ট শক্তি তার রাষ্ট্র কায়েম করেছিল। ৪৮'র যুদ্ধে সীমাহীন জুলুম ও ও যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তার সেসময়ই শেষ হয়ে যায়নি। বরং পরবর্তীতে এই দমন প্রক্রিয়া অনেক ব্যাপক এবং গভীর হয়ে ওঠে। 'আন ইনসান' বা মানুষ বিষয়ক এক কবিতায় দারভীশ সে সময়ের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন।

على فمه السلاسل وضعوا
ربطوا يديه بصخرة الموتى ،
و قالوا : أنت قاتل !
أخذوا طعامه و الملابس و البيارق
الموتى ، ورموه في زنزانة
وقالوا : أنت سارق !
طردوه من كل المرافيء
حبيبته الصغيرة ، أخذوا
ثم قالوا : أنت لاجيء ![513]

তারা তাদের মুখ বেঁধে রাখলো শিকল দিয়ে
তারা তার হাত বেঁধে রাখলো মৃতের শিলাস্তুপে
তারা বললো- তুমি খুনি।
তারা তার অন্ন, বস্ত্র, পতাকা কেড়ে নিয়ে
ফেলে দিলো মৃতদের গহীন গহবরে।
তারা তাকে প্রতিটি বন্দর থেকেই তাড়িয়ে দিলো।

---

[৫১২]. প্রাগুক্ত. পৃ. ঐ।
[৫১৩] মাহমুদ দারভীশ. *আদ্দীওয়ান. আল আ'মালুল উলা-১.২০০৫*. পৃ. ২০, ২১।

তারা তার কিশোরী বান্ধবীকে নিয়ে গেলো
এর পর বললো: তুমি শরণার্থী।

কিংবা 'মাররাতান উখরা' বা আরেকবার কবিতায় কবি ইসরাইলী হত্যাকান্ডের স্বরূপ এঁকেছেন ভিন্ন রূপকে–

حذف الظلّ يديها من جبيني
فاختبأنا في الظهيره
قتلوها في الظهيره
بدلا مني،
ولم يعتقلوني
مرة أخرى
لأن القتله
تحت جلدي[৫১৪]

আমার ললাট থেকে ছায়াটি তার দুহাত সরিয়ে নিলো
অতপর আমরা লুকিয়ে পড়লাম দুপুরের ভেতর।
তারা তাকে হত্যা করলো দিন দুপুরে
আমাকে রেখে
তারা আমাকে গ্রেফতার করেনি
আরেকবার
কারণ হত্যাকারীরা লুকিয়ে থাকে
আমার চামড়ার নিচে।

উদ্ধৃতিগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইজরাইলী নির্যাতনের নির্মম চিত্র। কবিতার ভাষাগুলোও অলংকারে ভারাক্রান্ত নয়, সরাসরি হৃদয়স্পর্শী। ফলে সাধারণ মানুষের ভিতর কবিতাগুলো সহজেই দাগ কাটে। তদুপরি দারভীশ ভাষার সারল্য সুসংহত রেখেই শৈল্পিক মান অক্ষুন্ন রেখেছেন। এ ধরনের কবিতাগুলোতে রূপক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন উপরের কবিতাটিতে কবি 'জিল- ' বা ছায়া শব্দটি জায়োনবাদী হত্যাকারীদের রূপক হিসেবে চয়ন করেছেন। এই উদ্ধৃতিরই শেষ কয়েকটি পঙক্তিতে ইমেজ বা কল্পচিত্র ভিন্ন কাব্যমাত্রা সৃষ্টি করেছে। কবির ভাষায়- "তারা আমাকে গ্রেফতার করেনি,/ আরেকবার,/ কারণ তারা লুকিয়ে থাকে/ আমার চামড়ার নিচে।/ এখানে– 'কারণ তারা লুকিয়ে থাকে আমার চামড়ার নিচে' বাক্যটি ভাবচিত্র। কবি এখানে ইংগিতময় ভাবকল্পের অবতারণা করেছেন। কবি বুঝাতে চেয়েছেন জায়োনবাদী শত্রুরা কবিকে পুনরায় গ্রেফতার করেনি। কারণ কবি গ্রেফতার হয়েই আছে। যেহেতু হত্যাকারী জায়োনবাদী শত্রুরা তার চামড়ার নিচে লুকায়িত। এই কবিতার অন্য পঙক্তিতে কবি বলেন-

[৫১৪]. মাহমুদ দারভীশ. আদ্দীওয়ান. আল আ'মালুল উলা-২. ২০০৫. পৃ. ৭৫, ৭৬।

مرة أخرى
يمر العسكريّ
تحت جلدي
مرة أخرى
يواري شفتي
في تجاعيد النشيد الوطن

আরেকবার
সেনারা অতিক্রম করে যাবে
আমার চামড়ার নিচ দিয়ে
আরেকবার দেশাত্মবোধক সংগীতের মূর্ছনায়
আমার দুঠোঁট ডুবে যাবে।[৫১৫]

শত্রুর বেষ্টনীর মধ্যে অসংখ্য ফিলিস্তিনীর মতো কবিরও জীবন যাপন। তাকে গ্রেফতার করা, না করা সমান কথা। এই ভাবচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তাতে জায়োনিস্ট সেনাবেষ্টিত পুরো আরব ফিলিস্তিনীদের শ্বাসরুদ্ধকর জীবন যাপনের করুণচিত্র স্বার্থকভাবে ফুটে ওঠেছে। "আসসিজনু ওয়াল ক্বমার" বা কারাগার ও চাঁদ কবিতায় ইসরাইলী নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের আবেগময় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ চিত্রকল্পের ভাষায় কবি বলেন:

في أخر الليل التقينا تحت قنطرة الجبال
منذ اعتقلت, و أنت أدري بالسبب
الأن أغنية تدافع عن عبير البرتقال
وعن التحدي والغضب
دفنوا قرنفلة المغني في الرمال

রাতের শেষে, পর্বতের খিলানের নিচে আমরা মিলিত হলাম।
যখন আমাকে গ্রেফতার করা হলো, কারণটা তুমিই বেশী জানো।
কারণ সংগীতেরাই এখন রক্ষা করে
কমলার সৌরভ,
চ্যালেঞ্জ এবং দ্রোহের ভাষা।
তারা গায়েনের করনফুলকে কবর দিয়েছে বালুর ভেতর।[৫১৬]

দারভীশের অসংখ্য কবিতায় জায়োনবাদী হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কখনো সরাসরি কখনো উপমা ও প্রতীকের দ্যোতনায়। এইসব হত্যাকান্ডের প্রত্যক্ষ দলীল দারভীশের কবিতা। কারণ যখনই ঘটনা ঘটছে তখনই দারভীশ কবিতা লিখেছেন।

---

[৫১৫]. প্রাগুক্ত. পৃ. ঐ।
[৫১৬]. মাহমুদ দারভীশ. আদ্দীওয়ান. আল আ'মালুল উলা-১.২০০৫. পৃ. ২৩১।

উপরে আলোচিত কবিতার উদ্ধৃতিগুলোতে দারভীশ কিছু বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবিতার ভাষায় ইঙ্গিতই যথেষ্ট। যদিও দারভীশ অনেক কবিতায় ইজরাইলের ইন্টারোগেশন এবং জেলপ্রকল্পের বহু উদাহারণ, উপমা, রূপক এবং সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য কবিতায় তিনি খোলাখুলি বলেছেন। কারানিপীড়নের বর্ণনা দিয়েছেন। যাইহোক, নির্মূল করে দেয়ার চেষ্টা ইজরাইলের একটি বিশেষ প্রকল্প। দ্বিতীয় প্রকল্প হলো, ইন্টারোগেশন, গুম, গোপন খুন এবং আটক। এধরনের টর্চার, টর্চারের রীতি, কৌশল, নীতি, প্রক্রিয়া, সেট আপ সবকিছুই ইজরাইল তার পরিকল্পনার মধ্যেই কার্যকর হয়ে থাকে। এসব প্রকল্প ইজরাইলের ক্ষমতা কাঠামোর বিচলন এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ধরে রাখার সাথে সম্পর্কিত। দখলদার-উপনিবেশায়ন যেহেতু ইজরাইলের একটি বিশেষ এবং মৌলিক কার্যক্রমের অংশ সেকারণে টর্চার এবং ইন্টারোগেশন প্রক্রিয়াগুলোও ইজরাইলের একটি অর্গানিক উপাদান। ইজরাইলের জায়োনিস্ট চরিত্র এবং তার ক্ষমতা ও ক্ষমতার দেহ থেকে এই বিশেষ দিকটি কখনো আলাদা করে চিন্তা করা যায় না। জায়োনিস্ট উপনিবেশায়ন এবং তার ক্ষমতা যেভাবে কাজ করে তার একটি কাঠামোগত দিক আছে। এই কাঠামোগত দিকটি শুধু 'ইহুদি ধর্ম'র প্রপঞ্চ দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ ইজরাইল তার জায়োনিস্ট মতাদর্শিক কাঠামো অনুযায়ী সামগ্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিশেষত মানবাধিকার লঙ্ঘনের সীমা-পরিসীমা, নিরাপত্তা ইস্যু, আটক, গুম-খুন, টর্চারসেল, টর্চারের প্রক্রিয়া, টর্চারের সৃষ্টিশীলতা, মনস্তাত্ত্বিক টর্চার, যন্ত্র, প্রযুক্তি, ও কৃৎকৌশলের ব্যবহার, ইন্টারোগেশনসহ সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় বিশেষ পদ্ধতিগত কাঠামো অনুসারে।[৫১৭]

যে ধরনের টর্চার ফিলিস্তিনীদের জন্য জারি রয়েছে তাকে ভায়োলেন্স (Violance), ফোর্স (Force), অ্যাবিউজ (Abuse), ইল-ট্রিটমেন্ট (Ill-treatmenঃ), প্রেসার (Pressure), সাউন্ড প্রেসার (Sound Pressure), মডারেট ফিজিক্যাল প্রেসার (Moderate Physical Pressur), এক্সট্রিম প্রেসার (Extreme Therapy), এক্স-রে থেরাপি (X-Therapy), লাইটিং থেরাপি (Lighiting Therapy) সহ অসংখ্য টর্চারের পদ্ধতি রয়েছে। যদিও জাতিসংঘ কর্তৃক ভায়োলেন্স এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা রয়েছে। যাতে ভায়োলেন্স এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসীমা ঠিক করে দেয়া হয়েছে।[৫১৮] কিন্তু মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক ঘোষণা এবং রীতিনীতির কোনো তোয়াক্কাই করে না ইজরাইল। এসব টর্চার, ইন্টারোগেশন, আটকাবস্থা বিচারিক প্রক্রিয়াগুলোর একটি জায়োনিস্ট অর্গানিক প্রকৃতি রয়েছে। কারণ জায়োনিস্ট ক্ষমতা কাঠামো যেভাবে তৈরি করা হয়েছে তাতে টর্চারের নিয়মও তার মনোদৈহিক রসায়নক্রিয়ার অংশ। এটি জায়োনিস্ট শরীরীয় অঙ্গ হয়ে ওঠার প্রথম ঘটনা ঘটে তার জায়োনিস্ট ধর্মতত্ত্ব যেভাবে অপরায়ণ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে কার্যকর থাকে তার ভিতরে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি ঘটে জায়োনিস্ট আইনের

---

[৫১৭]. *টর্চার এন্ড ইল-ট্রিটমেন্ট: ইজরাইল'স ইন্টারোগেশন অব প্যালেস্টাইনিয়ানস ফ্রম অকুপাইড টেরিটোরিস* (নিউ ইয়র্ক: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মিডলইস্ট, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৬-৪৫ । الاحتلال والمقاومة. دراسات ووقائع

[৫১৮]. ডানিলিয়্যাস, হ্যান্স, *কনভেনশন অ্যাগেইনস্ট টর্চার এন্ড আদার ক্রুয়েল, ইনহিউম্যান অর ডিগ্র্যাডিং ট্রিটমেন্ট অর পানিশমেন্ট* (ইউনাইটডে ন্যাশন্স অডিওভিজ্যুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্টারন্যাশনাল ল', জাতিসংঘ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১-৪।

উৎপত্তিগত নীতির ভিতর ইজরাইলের দখলকৃত সীমানাধীন অধিবাসীদের অপরাধের সংজ্ঞা, বিচারিক প্রক্রিয়া, আইনি কাঠামো, টর্চার, শাস্তি ও দণ্ডবিধি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যদিয়ে।[৫১৯] ফলে ইজরাইল যে ইন্টারোগেশন এবং টর্চার চালু রেখেছে তার একটি অনন্তকালীন ব্যাপার রয়েছে। কারণ জায়োনিস্ট আইনের নীতি পরিবর্তনযোগ্য নয়। তার ধর্মীয় আইনি কাঠামো এভাবে গড়ে উঠেছে। একইসাথে টর্চার, ইম্প্রিজনমেন্ট এবং ইন্টারোগেশন প্রক্রিয়া ইজরাইলের একটি আইনসিদ্ধ রীতি। যেকারণে এটি বাদ দেয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে তাদের দখলদারিত্ব নিশ্চিত করাটা কঠিন বিধায় তারা এটি এধরনের নিপীড়ন প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতে পারে না।

কারাগারগুলো ছিল এমন নিপীড়নে জন্য মূলত এক উদ্ভাবনী কারখানার মতো। যেখানে নিত্যনতুন টর্চারের সূত্র ও কৌশল উদঘাটন করা হতো। লিনা মিয়ারি জানান, আল জাফর কারাগার ছিল এমন টর্চারের জন্য কুখ্যাত। ১৯৭০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যেটি জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে ১২৪ মাইল দক্ষিণে।[৫২০] এমন ছোট ছোট বহু কারাগার প্রতিষ্ঠা করে ইজরাইল। দারভীশ মনে করেন, ইজরাইলের যেমন একদিকে দখলদারিত্ব রয়েছে অপরদিকে রয়েছে দমন ও নিপীড়ন প্রক্রিয়া। এর বিপরীতে রয়েছে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ। প্রতিরোধ এবং ছুমুদের কোনো বিকল্প তাদের নেই। প্রথাগত যুদ্ধের চেয়ে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ধারাবাহিক প্রতিরোধই একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিকভাবে এটি এখন স্থায়ী একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে। তবে বারবার এই প্রতিরোধ-প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়েছে। ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর প্রতিরোধের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এধরনের সমঝোতা ও শান্তিচুক্তি ফিলিস্তিনীদের জীবনে শেষপর্যন্ত কোনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারেনি। বরং ইজরাইল তার রাজনৈতিক সুবিধা আরো বেশি পাকাপোক্ত করার বৈধ সুযোগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৮ সালে পুরো ফিলিস্তিনজুড়ে যে ইন্তিফাদা সংঘটিত হয়েছিল– ধারণা করা হয় এর মধ্যদিয়ে ফিলিস্তিনীদের গণপ্রতিরোধ বড়ধরনের একটি পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ইন্তিফাদা পরবর্তী বিভিন্ন শান্তি উদ্যোগ প্রতিরোধের চেতনার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। দৃশ্যত, অসলো চুক্তির মধ্যদিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন কারণ এর পেছনে রয়েছে। বিশেষত, রাজনৈতিক শ্রেণির একধরনের বিরাজনীতিকরণের দিকে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। কারণ, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির পর ফিলিস্তিনে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার যে কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল– অসলো চুক্তির পর এসব কার্যক্রম আরো বেগবান হয়। ফলে ফিলিস্তিনে অসলো চুক্তি পরবর্তী পরিস্থিতিতে এসব সংস্থার কার্যক্রম রাজনৈতিক শ্রেণিকে প্রভাবিত করে। খোদ নেতৃস্থানীয় সমাজই নিজেদের এনজিওকরণের দিকে ধাবিত করে। ফিলিস্তিনের খ্যাতিমান নৃতাত্ত্বিক ও সমাজ বিশ্লেষক রিমা হাম্মানি এর জন্য এনজিওকরণকে দায়ী করেন। রিমা হাম্মানি মনে করেন, ১৯৯৫ গাজা এবং পশ্চিম তীরে

[৫১৯]. কোহেন, স্টেনলি ও ডাফনা গোলান, *জেরুজালেম*, *মার্চ ১৯৯২*, *বিটসেলেম: দি ইন্টারোগেশন অব প্যালেস্টাইনিয়ানস ডিউরিং দি ইন্তিফাদা, ফলো-আপ টু মার্চ ১৯৯১ বিটসেলেম রিপোর্ট* (জেরুজালেম: দি ইজরাইলি ইনফরমেশন সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ইন দ্য অকুপাইড টেরিটোরিস, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৭-১০, ৪৩-৮৫।
[৫২০]. মিয়ারি, লিনা, ২০১৪, পৃ. ৫৬০।

বহু এনজিও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।[৫২১] যাদের নেতৃত্ব এবং সম্পৃক্ততায় এসব সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে নতুনধরনের শ্রেণি গড়ে ওঠে ফিলিস্তিনে। তবে দারভীশ চুক্তির প্রক্রিয়া এবং খোদ চুক্তি নিয়ে বরবারই বিরোধিতা এবং সমালোচনা করে আসছিলেন।

৫.৭ ইজরাইলের সাম্রাজ্যবাদ, বলপ্রয়োগের নীতি এবং ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ

আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির হানাদারি সম্পর্কের মধ্যে ফিলিস্তিন এবং তার জনগোষ্ঠীর যে বেড়ে ওঠা উত্তর ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যীয় পরিমণ্ডলে ইজরাইলী শক্তি তাতে এ রাজনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠে। তবে ইজরাইল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে দখলদারিত্ব এবং ক্রমাগত বলপ্রয়োগ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যদিয়ে তার একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছে। একইসাথে অব্যাহত উপনিবেশায়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াগুলোতে অধিপতিপরায়ণ প্রভাব তৈরির মাধ্যমে ইজরাইল তার সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পও বলবৎ রেখে চলেছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৈশ্বিক ক্ষমতাকাঠামোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি হয়ে উঠলেও তার সাথে রয়েছে যেমন ইউরোপীয় শক্তিগুলো তেমনি রয়েছে ইজরাইল। এ তৃশক্তির সাথে রয়েছে আবার স্থানীয় আরবমিত্র। আরবের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। এসব রাজনৈতিক পাঠকে আলাদা করে দারভীশের চিন্তা ও সাহিত্যের দিক থেকে তাঁর সমসাময়িকতা বোঝাবুঝি যথেষ্ট সহজ কাজ নয়। তাঁর সমকালীন কবি, কবিতা, সংগীত, নাটক, গল্প সহ পুরো সাহিত্য পশ্চিমের আধুনিক যে চিন্তা ও ভাষা প্রকরণের মধ্য দিয়ে যাপিত হচ্ছিল দারভীশ সেখানে কী করে আলাদা পথ ধরে হাঁটার চেষ্টা করছিলেন সেটা বোঝার প্রয়োজন রয়েছে।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ এবং পশ্চিমের ইহুদী বিরোধিতার চরম উত্থানের মধ্যদিয়ে ইহুদীদের পুনর্জাগরণের কালপর্ব সূচিত হয়। ১৮৮০ অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ দিকে এটি দানা বাঁধতে থাকে। ১৯১৭-১৯১৮ সালে ব্রিটিশরা আরবদের আনুকূল্য নিয়ে ওসমানীয়দের কাছ থেকে ফিলিস্তিনে দখল প্রতিষ্ঠা করলে প্রতিশ্রুত ভূমি হিসাবে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে ইহুদীদের সামনে এক নতুন সুযোগ তৈরি হয়। এ সময় ইহুদীদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিলো আন্তর্জাতিকভাবে সুসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণ। থিওডোর হার্জেলের নেতৃত্বে যায়নবাদের প্রতিষ্ঠা ছিলো এ প্রচেষ্টারই বাস্তবরূপ। জায়োনিস্ট তৎপরতার মধ্যদিয়েই ইহুদীরা রাজনৈতিক আত্মপরিচয় নির্মাণে জোরালোভাবে ফিলিস্তিনমুখি হয়ে ওঠে। এ তৎপরতার সাথে ব্রিটিশ, আমেরিকা এবং আরবের সংশি-ষ্টতা ছিলো আগাগোড়া।

---

[৫২১]. হাম্মামি, রেমা, *প্যালেস্টাইনিয়ান এনজিওস সিন্স অসলো: ফ্রম এনজিও পলিটিক্স টু সোশ্যাল মুভমেন্টস* (শিকাগো, মিডল ইস্ট রিপোর্ট, সংখ্যা: ২১৪, স্প্রিং ২০০০), পৃ. ১৬-১৯। তারিক দানা, *ডিককানেক্টিং সিভিল সোসাইটি ফ্রম ইটস হিস্ট্রিক্যাল অ্যাক্সটেনশন: এনজিওস এন্ড নিউলিবারেলিজম ইন প্যালেস্টাইন* (), পৃ. ১১৭-১৩৪।

তবে মানুষের ইতিহাসে বলপ্রয়োগের ঘটনা তার সৃষ্টির প্রায় সমান প্রাচীনতা নিয়ে বর্তমান রয়েছে। বলপ্রয়োগের প্রশ্নটি সেকারণে মানুষের প্রকৃতির সাথে মিশে আছে। কিন্তু বলপ্রয়োগের প্রশ্ন সবসময় প্রাকৃতিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যেই আটকে থাকেনি। নৈতিক ও রাজনৈতিক সীমা পরিসীমার মধ্যে কিংবা আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যেও বলপ্রয়োগের বিপুল নজির রয়ে গেছে ইতিহাসে। তার মানে বলপ্রয়োগের বিশেষ ইতিহাস যেমন রয়েছে তেমনি বলপ্রয়োগের বিশেষ শ্রেণিচরিত্রও রয়েছে। একদিকে শ্রেণিগত ক্ষমতাকাঠামোর ভিতর থেকে যেমন বলপ্রয়োগ, দমন-পীড়নের চর্চার নজির রয়েছে তেমনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মোটকথা বলপ্রয়োগ নিয়ে তাত্ত্বিক দিক থেকে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। এসব আলোচনা বিশ্লেষণের মোটাদাগে দুই প্রকার ধারাকে চিহ্নিত করা যায়। প্রাকৃতিক আইন () বা প্রকৃতিবাদী ধারা। অপরটি ইতিহাসবাদী ধারা। প্রকৃতিবাদী ধারা মতে, বলপ্রয়োগের বাসনা প্রকৃতিজাত বা প্রকৃতিপ্রদত্ত বিষয়। প্রকৃতির মধ্যেই সহিংসতার বিষয়টি বর্তমান রয়েছে। প্রকৃতিতে যেমন বাঘ, সিংহ, হায়েনা, নেকড়ে থেকে শুরু করে হিংস্র প্রাণিরা অপর প্রাণিকে সহিংস উপায়ে ভক্ষণ করে। কিংবা ঈগল যেমন অন্য পাখি বা মাছ খেয়ে ফেলে তেমনি প্রাকৃতিক ব্যাপার। অর্থাৎ দুর্বলকে সবল বা শক্তিমান গ্রাস করে ফেললে তাতে দোষের কিছুই নেই। কারণ এটা প্রাকৃতিক। যেহেতু প্রাকৃতিক তাই এটি ন্যায্য। এই যুক্তিতে যেকোনো সবল-ক্ষমতাধর ব্যক্তি, শ্রেণি বা পক্ষ অপর কোনো দুর্বল ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর উপর সহিংস বলপ্রয়োগ করলে সেটা ন্যায়সংগত হবে। এই যুক্তি অনুসারে ইজরাইলের ফিলিস্তিনীদের উপর হামলা, হত্যা এবং তাদের ভূমি ও সীমানা দখলও ন্যায্য। প্রাকৃতিক আইন দর্শনের বাইরে রয়েছে ঐতিহাসিক ধারা। যাতে মনে করা হয়, বলপ্রয়োগ বা সহিংসতা ইতিহাসের ফল। প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মে বিদ্যমান আইনগুলোকে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবেচনা করে বলপ্রয়োগের ঘটনা ন্যায্য কি ন্যায্য নয় তা নির্ধারণ করে। কিন্তু ইতিহাসের ধারা বা পজিটিভ ল'() তার উল্টা। অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনাঘটনে সিদ্ধ আইনের দর্শনানুযায়ী, আইনের বিবর্তন কিংবা আইন তৈরির ঘটনা এবং বিবর্তিত প্রক্রিয়া ও উপায়ের পর্যালোচনা করে বলপ্রয়োগের নীতি বা ন্যায্যতা ঠিক করা হয়। প্রকৃতিবাদী ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন ডারউইন ও স্পিনোজা। তবে পজিটিভ ল' কিংবা ঐতিহাসিক ধারার অনুসারী না হলেও গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচক ছিলেন ওয়াল্টার বেঞ্জামিন। প্রকৃতিবাদে আইনের বিচারে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বলপ্রয়োগের ন্যায্যতার নিশ্চয়তা প্রদানকে গুরুত্ব দিয়েছে। তবে ঐতিহাসিক ধারায় উপায় বা মানদণ্ডকে গুরুত্ব দিয়েছে। বেঞ্জামিন উভয়পক্ষের অবস্থানের ন্যায়সঙ্গত পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে সমাচলোনাও করেছেন। বেঞ্জামিন উভয়পক্ষের যুক্তির চক্র ভাঙতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, কোনটি ন্যায্য লক্ষ্য আর কোনটি ন্যায্য উপায় তার বিচারের আলাদা আলাদা মানদণ্ড ঠিক করা না গেলে বলপ্রয়োগের সাথে ইনসাফ প্রশ্নের সমাধান সম্ভব না।[৫২২] প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিক ধারার যুক্তি অনুসারে তাহলে কি ফিলিস্তিনের উপর ইজরাইলের বলপ্রয়োগ, সহিংসতা, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ন্যায়সঙ্গত হয়ে ওঠার যুক্তি তৈরি করে? বেঞ্জামিনু শেষপর্যন্ত যে আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড তৈরির করার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তাতে তিনি মূলত

---

৫২২. বেঞ্জামিন, ওয়াল্টার, *ক্রিটিক অব ভায়োলেন্স*, *ওয়াল্টার বেঞ্জামিন: সিলেক্টেড রাইটিংগস*, ভলিওম-১, ১৯১৩-১৯২৬, চিফ এডিটর: মাইকেল ডাব্লিউ. জেনিংগস (যুক্তরাষ্ট্র: দি বেল্কন্যাপ প্রেস অব হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৩৬-২৫২।

ইনসাফের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। বেঞ্জামিনের যুক্তি ও অবস্থান শুদ্ধ হোক বা না হোক ইতিহাস নির্ধারিত ফল হিসেবে এবং আইনের যে যে উপায়ে ফিলিস্তিনে ইজরাইলের জায়োনিস্ট রাষ্ট্রীয় শক্তি বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটায় তা কোনোভাবেই আইনসিদ্ধ হতে পারে না। এমনকি আন্তর্জাতিক আইনের সরাসরি লঙ্ঘনও বটে।

কিন্তু বলপ্রয়োগের সাথে মাহমুদ দারভীশের কবিতা কিংবা ফিলিস্তিন প্রশ্নের সাথে কি সম্পর্ক রয়েছে? বলা বাহুল্য, বলপ্রয়োগ শুধু ইজরাইলের রাজনীতি ও ক্ষমতাকাঠামোর অংশই নয়, বরং ইজরাইলের জায়োনিস্ট মতাদর্শগত মূলনীতিরও অন্তর্ভুক্ত বলপ্রয়োগ। মুহাম্মদ ইকবাল বুলগিনি বলপ্রয়োগের সাথে দারভীশের কবিতার সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইকবাল বুলগিনি ইন্দোনেশিয়ার 'মাওলানা মালিক ইবরাহিম স্টেট ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মালাং' এর একজন গবেষক। তিনি মাহমুদ দারভীশের কবিতা বিষয়ক একটি গবেষণাপত্রে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বলপ্রয়োগের ইস্যু কিভাবে দারভীশকে প্রভাবিত করেছে এবং একইসাথে পাল্টা বলপ্রয়োগ তথা প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে ইজরাইলের সহিংসতার মোকাবেলার ভাষাও গড়ে তুলেছেন দারভীশ। বুলগিনি অবশ্য একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।[৫২৩] তবে দারভীশের কবিতায় যে বলপ্রয়োগের কথা এসেছে এই বলপ্রয়োগ বস্তুত ফিলিস্তিনের আত্মমর্যাদা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের উপায় হিসেবে এসেছে। বলপ্রয়োগ বলতে যেমন ইজরাইলকে নির্দেশ করা হয়, দারভীশ তথা ফিলিস্তিনীদের ক্ষেত্রে বরাবরই তা প্রতিরোধ সংগ্রাম হিসেবে বিবেচ্য হয়ে আসছে।

অন্যদিকে বলপ্রয়োগ এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প জায়োনিস্ট মতাদর্শের একটি অবিচ্ছেদ্য কাঠামোর আপাত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র। জায়োনিজম বস্তুত ব্রিটিশ উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার অংশীদারিত্ব নিয়েছে অনেক আগেই। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, জায়োনিস্ট প্রক্রিয়াগুলো উসমানি শাসনের শেষদিকে ফিলিস্তিনে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে আসছিল। অনুপ্রবেশের ঘটনা পরবর্তীতে অনেকদূর এগিয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর যায়োস্টিদের জন্য ফিলিস্তিনে বসতিস্থাপনই শুধু নয়, ফিলিস্তিনের সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিসরে বিশেষ প্রভাবক শক্তি হিসেবে ইহুদি জায়োনিস্টদের বিপুল সুযোগ তৈরি করে দেয় ব্রিটিশ শাসন। ইজরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে জায়োনিস্ট শক্তিগুলো ক্রমাগত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করেছে অনেক আগেই। ইজরাইলকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই কারণে বলা যায়, কারণ মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্ক ও প্রক্রিয়াগুলো কাজ করে আসছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ইতিমধ্যে তাদের কাঁধে বর্তিত হয়েছে। একইসাথে ইজরাইল নানান দিক থেকে তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নির্মাণ করে চলেছে। তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো যুদ্ধনীতি। অপরটি জুলুম, দমন-পীড়ন, দখলদারিত্ব ও সহিংস বলপ্রয়োগ।
তবে ইজরাইলের যায়োনবাদী সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের অনন্ত দখলদারিত্ব ও জুলুম নিপীড়নের বিরুদ্ধে একমাত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনের মজলুম জনগোষ্ঠী। দ্রোহ, ক্ষোভ এবং প্রতিরোধই

[৫২৩]. ইকবাল বুলগিনি, মুহাম্মদ, *আল উনুফ ফী আশআরি মাহমুদ দারভীশ: দিরাসাতুন ফী দওয়ি ইলম আল আদাব আল নাফসী* (ইন্দোনেশিয়া: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মাওলানা মালিক ইবরাহিম স্টেট ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মালাং, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২১-৭৪।

জায়োনিস্ট মেশিনারির বিরুদ্ধে একমাত্র উপায়। এই প্রতিরোধ ন্যায়সংগত লড়াই। দ্রোহের সাথে যেমন প্রতিরোধের সম্পর্ক তেমনি প্রতিরোধের সাথে বলপ্রয়োগ () এর সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিরোধের প্রক্রিয়াগুলোতে বলপ্রয়োগ কিভাবে ঘটে– এর প্রকাশকে কতোদূর আইন কিংবা বৈধতার সীমারেখার মধ্যে বোঝাবুঝি করা সম্ভব তার বিচার বিশ্লেষণ হতে পারে। তা অন্য জিনিস। কিন্তু প্রতিরোধ একটি স্বয়ংক্রিয় বাধ্যবাধকতার বিষয়। অর্থাৎ ইজরাইল যেভাবে হাজির ঠিক তার বিপরীতে ফিলিস্তিনের জনগোষ্ঠী দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ ইজরাইল আক্রমণ করলে, দখল করলে, খুন করলে কিংবা বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার পর ফিলিস্তিনীদের তখন পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যেকারণে দারভীশ বলেন, মাদিহ জিল আল আলি...

সাধারণ ভাবে যে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে কবি ছিলেন আপোসহীন। শাসকগোষ্ঠীর অধিপতিসুলভ আগ্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে কবির ভাষা ছিলো সোচ্চার। تحد কবিতায় এই প্রতিরোধের দ্রোহ উপচে পড়েছে আরো ব্যাপক অর্থে। ইসরাইলী বাহিনী কবির ভাষাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে বারবার। কবি তার জবাব দিয়েছেন ইস্পাত কঠিন ভাষায়–

فالشعر دم القلب
ملح الخبز
ماء العين
يكتب بالأظافر
و المحاجر
والخناجر
سأقولها:
في غرفة التوقيف
والحمام في الأسطبل
تحت السوط القيد
في عنف السلاسل
مليون عصفور
علي أغصان قلبي
يخلق اللحن المقاتل

“শুনে রাখো কবিতা হৃদয়ের রক্ত
রুটির লবন
চোখের অশ্রু
লেখা হয় নখ দিয়ে
চোখের কোটর দিয়ে
খঞ্জর দিয়ে।
আমি তা

অয়েটিং রুমে
বাথরুমে
আস্তাবলে,
জরুরি
চাবুকের নিচে
হাতকড়ার নিচে
শিকলের সহিংসতায়
উচ্চারণ করি:
লক্ষ লক্ষ চড়ুই
আমার হৃদয়ের ডালপালায়
সৃষ্টি করছে যুদ্ধংদেহি সুর।"[৫২৪]

৫.৮: জায়োনিস্ট মতাদর্শের স্বরূপ

কবির প্রতিরোধ যেমন ক্ষুরধার, লক্ষ্যভেদী তেমনি তার প্রতিরোধমুখর কবিতায় অলংকারিক বিন্যাস উপমায়, চিত্রকল্পে কারুকার্যময়। পূর্বের উদ্ধৃতিগুলোতে দ্রোহরস, উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক ও খরস্রোতময় বর্ণনার বিপুল উপস্থিতি রয়েছে। অলংকার বিষয়ক আলোচনায় সুযোগ নাই বলে বিষয়ের মধ্যে হাজির থাকতে হচ্ছে। নিচের উদ্ধৃতিতেও দেখা যাবে প্রতিরোধের প্রকাশ উপমার মধ্যে দিয়ে ঘটছে। দারভীশের বড় সার্থকতা সম্ভবত এ কারণেই যে, বিষয় এবং কবিতা মানে রাজনৈতিকতা আর শিল্পকে একাকার করে উপস্থাপন করতে পারঙ্গম তিনি। শিল্প এবং ভাব কোনোটাই ক্ষুণ্ন হয় না তার কবিতায়। বিখ্যাত "আহমদ আজ জা'তার" শিরোনামের দীর্ঘ কবিতায় ইজরাইলী অধিবাসী আহমদ আজজা'তারকে প্রতিরোধে উদ্দীপ্ত করেন। জা'তার ইসরাইলের অধিবাসী হয়েও জায়োনবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কবি তাই বলেন-

يا أيها الولد الموزع بين نافذتين
لا تتبادلان رسائلي
قاوم
أن التشابه للرمل وأنت للأزرق[৫২৫]

দুই জানালায় বিভক্ত হে সন্তান
জানালাগুলো আমার পত্রের বিনিময় করবে না
প্রতিরোধ করো
তুমি নিশ্চয়ই তপ্ত বালুর উপমা, তুমি নীলের জন্য।

[৫২৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান. আল আ'মালুল উলা-১*, ২০০৫। পৃ. ১৩২।
[৫২৫]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান. আল আ'মালুল উলা-২*, ২০০৫। পৃ. ২৬২

يا أيها الولد المكرس للندي
قاوم[৫২৬]

শিশিরের জন্য অভিষিক্ত হে বালক
প্রতিরোধ করো

অথবা–

فاذهبي عميقا في دمي
اذهب براعم
واذهب عميقا في دمي
اذهب خواتم
واذهب عميقا في دمي

اذهب سلالم
يا أحمد العربي – قاوم![৫২৭]

অতপর যাও গভীর হয়ে আমার রক্তে
যাও ফুলের কলি হয়ে
এবং যাও গভীর হয়ে আমার রক্তে
যাও শেষ বিন্দু গুলোতে
এবং যাও গভীর হয়ে আমার রক্তে
যাও সিঁড়ি বেয়ে
হে আহমদ আল আরাবী প্রতিরোধ করো।

দারভীশের প্রতিরোধ কেবল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বা প্রচারসর্বস্ব ব্যাপার নয় তার প্রতিরোধ গঠনমূলক, গভীর এবং সর্বব্যপ্ত। কবি বলেন-

لأجله يصارع الثعالبا
ويصنع الأطفال
والتراب
والكواكبا[৫২৮]

কারণ তিনি শৃগালের সাথে লড়াই করেন
তৈরি করেন সন্তান মাটি নক্ষত্র।

[৫২৬]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬৩।
[৫২৭]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৭১।
[৫২৮]. মাহমুদ দারভীশ. *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা*- ১. ২০০৫. পৃ. ৩৫।

ভাষা, কাব্য ও গণমানুষ

ভাষা এবং রাজনীতির প্রকৃতি আলাদা হতে পারে। তবে রাজনীতির ভাষা, কাব্য ও ক্ষমতা চর্চা এক বিন্দু থেকে কী করে ছড়াতে পারে তার প্রকৃষ্ট নমুনা দারভীশের 'ভাষা'। ভাষা কথাটি এখানে এ কারণে ব্যবহার করা হলো যে, কবিতা এবং ভাষা দারভীশের কাছে একই শক্তির নাম। সেই অর্থে কবিতা ও রাজনীতি একই দেহ। অঙ্গবিচ্ছেদ সম্ভব নয়। একইসাথে তাতে রাজনীতির প্রচলিত সংজ্ঞাও আর এখানে থাকে না। কারণ কবিতা নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে, নতুন অর্থের শর্ত তৈরি করে। যাতে স্থির কোনো কাঠামোতে আটকে থাকতে পারে না কবি এবং তার কবিতার ভাষা। নতুন ইতিহাস তৈরির বিশেষ অর্থ আর নতুন ক্ষমতা চর্চার ছাপ এ কবিতার ভাষাতেই তৈরি হয়। যেখানে বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্ত ধারণ করে নতুন কোনো ক্ষমতা সম্ভাব্য রাজনীতি কায়েম করতে পারে। এর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে সপ্রাণ মানুষের ইচ্ছা ও ভাষার সম্পর্ক। এ সপ্রাণ মানুষের ইচ্ছা যে লড়াইয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে তাই তার ভাষা, তার রাজনীতি। যেখানে রাজনীতি এবং সমগ্র জীবন একই বস্তু। অন্য অর্থে রাজনীতিই সপ্রাণ মানুষের হকিকত বা স্বরূপ। মোটকথা রাজনীতি, কাব্য, ভাষা ও গণমানুষ একই অর্থের নানা রূপ মাত্র। কারণ দারভীশের কাছে কবিতা ও ভাষা শুধু জনমানুষের কণ্ঠস্বরই নয় বরং মানুষের পরম জীবনী শক্তি ও অমরত্বের মর্ম। একইভাবে রাজনীতিই মানুষের মেনিপেস্টিশন। সেদিক থেকে কাব্য, ক্ষমতা, রাজনীতি ও ভাষাকে বাদ দিয়ে গণমানুষ কথাটিরও কোনো অর্থ নেই।

অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের ধরন হিসাবে ফিলিস্তিনে গণপ্রতিরোধই এখনো পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে স্বীকৃত। দুটি ইন্তেফাদাই এর শক্ত দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। তবে অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হলেও আত্মঘাতী প্রচেষ্টাও কম স্বীকৃত নয়। প্রশ্ন হলো এর পরিণতি কী? মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক আরব-ইজরাইল-মার্কিন রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তিগুলোর নানা সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি বুঝলে প্রতিরোধ কতোটা গণপ্রতিরোধ হয়ে উঠেছে বা উঠতে পারে এ প্রশ্ন তোলাটা জরুরি হয়ে উঠতে পারে। কথাটি অন্যদিক থেকে তুললে এর মানে হবে ফিলিস্তিনে রাজনৈতিক দল-সংগঠন ও নানা শ্রেণির প্রতিরোধের রূপ ও ধারণা কী? বাস্তব দিক থেকে দেখলে দেখা যাচ্ছে ফাতাহ ও হামাসের অবস্থান একদমই আলাদা। ক্ষমতা চর্চা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রশ্নে এ দুই দল মৌলিকভাবে ভিন্ন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটি অভিন্ন জাতিসত্তা নির্মাণের দিক থেকে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠার সম্ভাবনা উপস্থিত নেই। ফলে বিভেদকে জাতীয় বিভেদের মধ্যে জিইয়ে রেখে কোনো একটি সাধারণর ঐক্য বা অভিন্ন জাতীয় অবস্থানে পৌঁছানো খুবই কঠিন। এ অবস্থা জাতীয় আত্মপরিচয় বা স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্ভাবনা তৈরিতে সহায়ক নয়। এদিক থেকে দারভীশের রাজনৈতিক চিন্তা ও চর্চা অনুধাবন করলে বর্তমান ফিলিস্তিনকে যেমন বুঝা যায় তেমনি এর ভবিষ্যত সম্ভাবনাও উপলব্ধি করা যায়। দারভীশ একটি বিকল্পের কথা বলেছিলেন, সেটি হলো গণশক্তির উত্থান। সেটিই হতে পারে একটি বৃহৎ ফিলিস্তিনের বিকল্প রাজনীতি। এ গণশক্তির জায়গায় বর্তমান সংকট থেকে বেরিয়ে আসার প্রশ্ন একটি ঐতিহাসিক এবং বাস্তব প্রক্রিয়া। তাছাড়া ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক শক্তিগুলোর

কূটনৈতিক কৌশলে এগিয়ে যাওয়া কিংবা মিশর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আরব রাষ্ট্রসহ আমেরিকার সাম্প্রতিক শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ত কোনো সমাধান হতে পারে। এর বাইরে ফিলিস্তিনের জনগণের মধ্যে ইজরাইলের জায়োনিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যে গণরোষ জারি রয়েছে তা থেকেই মূলত বিভিন্ন সময়ে গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সেকারণে ফিলিস্তিনের সর্বস্তরের মানুষের মুক্তি এবং জাতিগঠনসহ যেকোনো রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের জন্য গণপ্রতিরোধ কিংবা গণশক্তিই মূল নেয়ামক। দারভীশ প্রায়ই 'গণমানুষ' এবং কবিতা শব্দ দুটি পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন বিশেষ তাৎপর্যের জায়গা থেকে। সেকারণে তাঁর ভাষা, গণমানুষ, ক্ষমতা ও কাব্যের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিচার না করলে তাঁকে পুরোপুরি বুঝা সম্ভব নয়। যাতে ফিলিস্তিন প্রশ্নের পর্যালোচনায় দারভীশের প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

৫.২.১: 'গণ' (Mass) কথাটি কেন জরুরি হয়ে ওঠে

মাহমুদ দারভীশের কবিতা সম্পর্কিত এ আলোচনায় *গণপ্রতিরোধ* কথাটি এখানে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিরোধ প্রত্যয়টির আগে *গণ* শব্দটি যুক্ত হয়ে প্রতিরোধের অর্থে বিশেষত্ব তৈরি হয়েছে। প্রতিরোধ শব্দটি এমন একটি বর্গ যাতে এমনিতেই জোরারোপ থাকে। শব্দটির ধ্বনি এবং উচ্চারণে যে ব্যাঞ্জনা তাতে ব্যক্তির নিজস্ব শক্তিবলয়ের বাইরেও আরো অনেক ব্যক্তির সম্ভাবনাকেও সম্ভাব্য করে তোলে। কিন্তু তাতেও যথেষ্ট মাত্রা সৃষ্টি করে না এই প্রতিরোধ। বরং অনেক এবং বহুকে সঙ্গে নিয়ে যে প্রতিরোধ তার মধ্যদিয়ে বস্তুত দারভীশের গণপ্রতিরোধের সারার্থ অনুধাবন করা যায়। কারণ দারভীশ যখন প্রতিরোধের কথা বলেন, কেন বলেন কিভাবে বলেন– এসব প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তার প্রতিরোধের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এর সাথে একটি জনগোষ্ঠীর সর্বস্তরের মানুষের সাধারণ ইচ্ছা, স্বপ্ন-কল্পনা ও স্বার্থও যুক্ত থাকে। ফলে এটি নিছক একটি প্রতিরোধ হয়ে থাকে না, বরং সমাজের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনকে নিয়ে এই যে প্রতিরোধ সেই প্রতিরোধ *গণপ্রতিরোধ* হয়ে ওঠে। কিন্তু কবিতায় গণপ্রতিরোধ এর *গণ* শব্দটি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যাতে এর ব্যবহার কিংবা সংযুক্তির বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে?

গণ কথাটি এখানে *Mass* এর সমরূপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এয়াড়া ইংরেজিতে আরো বেশকিছু শব্দ রয়েছে যাতে গণ– শব্দার্থের প্রকাশ ঘটে। *পিপল, পাবলিক, ক্রাউড, ম্যাজরিটি, ননক্লাস, মব* ইত্যাদি। সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে এর বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। তবে কখনো কখনো রাজনীতি এবং নৃতত্ত্বের বর্গ হিসেবেও এসব শব্দের ব্যবহার রয়েছে। সাধারণত পিপল এবং পাবলিক শব্দের সমার্থক হিসেবে *ম্যাস* এর ব্যবহার দেখা যায়। *মাস* শব্দটিকে প্রথম বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে অন্যান্য সমার্থক শব্দ থেকে আলাদা করেন মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক Herbert George Blumer (1900-1987)।[৫২৯] তবে যেকোনো বিষয়ে সাধারণ জনগণ পর্যায়ে ব্যাপক বিস্তার বুঝাতে *মাস* এর ব্যবহার

[৫২৯].মরিয়েল শফিল্ড, জোসেফিন, *আ ক্রিটিক অব দি কনসেপ্ট অব মাস সোসাইটি* (কানাডা: দি ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৬-১০।

রয়েছে। কিন্তু ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক যেকোনো গণভিত্তিক রাজনীতি অর্থে মাস এর ব্যবহার অনেক প্রাচীন। প্রাচীন হলেও রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক যেকোনো পর্যায়ে মাস কিংবা গণমানুষের কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু রাজনীতি খুব ব্যাপক হয়ে ওঠলেই যে মাস বা গণমানুষের সম্পৃক্ততা ঘটবে তা সবসময় সত্য নয়। ঐতিহাসিকভাবে এর বাস্তবতা থাকলেও মতাদর্শ সেক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। মানুষের স্বপ্ন এবং ইচ্ছা-মানসিকতা পরিবর্তনে রাজনীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সেকারণে কখন গণ মানুষের ভূমিকা ও সক্রিয়তাই কোনো একটি রাজনৈতিক পটভূমির জন্য নির্ধারক এবং মৌলিক উপাদান হয়ে উঠতে পারে তাও শনাক্ত করা যায় সেই আদর্শ এবং গণমানুষের অবস্থান এবং প্রেক্ষিত বিচার করে। সেকারণে স্পেনিশ দার্শনিক ও সাহিত্যিক José Ortega y Gasset (1883-1955) মনে করেন, ফ্যাসিবাদ হোক আর কম্যুনিজম হোক যেকোনো মতাদর্শিক রাজনীতির জন্য মাস পিপল বা গণমানুষের নির্ধারক ভূমিকা রয়েছে।[৫৩০] তবে লাটভিয়ার রাজনীতি বিষয়ক তাত্ত্বিক Judith Nisse Shklar (১৯২৮-১৯৯২) ওর্টেগ্রার অবস্থানকে আরো এগিয়ে নিয়েছেন। শাকলার মনে করেন, মাস বললে এর যেসব অর্থ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রাজনীতিই প্রধান এবং মৌলিক। [৫৩১] শাকলার বলেন, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো 'মাস' কিংবা গণ কী এবং কারা গণ? এ প্রশ্নের খুঁজে পাওয়া যায় আরো বড় পরিসরে ডানিয়েল বেল এর 'দি থিওরি অব মাস সোসাইটি গ্রন্থে। ডি বেল দেখিয়েছেন কি করে গণ কথাটির সাথে শ্রেণির অধিকার, সচেতনতা জড়িয়ে আছে। একইসাথে অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে যে গণ ধারণা গভীর এবং সম্প্রসারিত হয় ঐতিহাসিক কারণেই গণ কথাটির সাথে বৃহত্তর রাজনীতি নিবিষ্ট হয়ে যায়। ড্যানিয়েল বেল বলেন,

> The notion of the masses as developed in Hellenistic times was deepened by the struggles between plebs and aristocracy in the Roman Republic and by the efforts of the Caesars to exploit mob support;.[532]

> গণমানুষের ধারণার বিকাশ ঘটে হেলেনিস্টি সময়কালে। রোমান প্রজাতন্ত্রে বঞ্চিত সাধারণ জনগণ ও অভিজাত শ্রেণির মাঝে লড়াই-সংগ্রাম এবং হাঙ্গামাকারী উচ্ছৃঙ্খল জনতার সমর্থন নস্যাৎ করার জন্য সিজার যেসব উদ্যোগ নিয়েছিল তার ফলে এই ধারণা গভীর হয়ে ওঠে।

---

৫৩০. প্রাগুক্ত। পৃ. ৯।

৫৩১. এন. শকলার, জুডিথ, *আফটার ইউটোপিয়া: দি ডেকলাইন অব পলিটিক্যাল ফেইথ* (প্রিন্সটন: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ১৫৬. ১২।

৫৩২. বেল, ড্যানিয়েল, *দি থিওরি অব মাস সোসাইটি: আ ক্রিটিক* (যুক্তরাষ্ট্র: কমেন্টারি, ভলিয়ম: ২২, জুলাই, ১৯৫৬ খ্রি.), পৃ. ৭৮।

ফলে দেখা যায়, ঐতিহাসিকভাবে গণচৈতন্য কিংবা গণরাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামের ঐতিহ্য বহুপ্রাচীন। যার চিহ্ন ইতিহাসে যেমন রয়ে গেছে তেমনি গভীরভাবে রয়েছে ধর্ম-পুরাণ-সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য এবং কবিতায়। কবিতা কিংবা সাহিত্যে গণচৈতন্য এবং গণমানুষের কণ্ঠস্বরকে জারিত করার ঘটনা এবং উপস্থাপন অনেক পুরনো। এটি নতুন কিছু নয়। কিন্তু আধুনিককালে বিশেষত উপনিবেশিকোত্তর সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের ক্ষমতাকাঠামো ও প্রক্রিয়াগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, অতীতের সমাজ ও রাষ্ট্রে গণমানুষের লড়াই-সংগ্রামের পরিসর এতোটা ব্যাপক ছিল না। তাদের অবস্থান এবং অভিমুখ ছিল মূলত শ্রেণি এবং গোত্রকেন্দ্রিক কিংবা সামাজিক অসমতার এবং নিপীড়নকারী প্রক্রিয়াগুলোর বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে নিজ সমাজ-রাষ্ট্রে এবং দেশে দেশহীন হয়ে যাওয়ার, রাষ্ট্রহীন হয়ে যাওয়ার এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা তা থেকে ভিন্ন। ফিলিস্তিনে এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এখনো তা চলমান– যেখানে অর্ধশতাব্দির অধিক সময়কাল ধরে স্বাধীনতা এবং জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই অব্যাহত রয়েছে। ইজরাইল বিরোধী এই লড়াইয়ের বিশেষ দিক হলো প্রতিরোধ। মাহমুদ দারভীশ তার কবিতা এবং সাহিত্যে ফিলিস্তিনীদের প্রতিরোধের এই গণচরিত্র বিশদ এবং বিচিত্রভাবে তুলে ধরেছেন। জলপাইয়ের পত্রাবলী দারভীশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম আত্মপ্রকাশেই দারভীশ তার গণমুখী সক্রিয়তার স্বাক্ষর রাখেন। দারভীশ সেইসব কবিতা লিখলেন যেখানে নিজের কবিতায় যেন তিনি ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের যাপিত জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণার মুখোমুখী হচ্ছেন। দারভীশ বলেন,

> هذا هو طعم عكا الأول. دائماً أبحث فيها عن شيء لا أجده .فتشت فيها عن أمي, فكانت قد
> عادت إلى القرية. وبعد سنين فتشت فيها عن حبيبتي, فكانت تزف إلى رجل آخر. وفتشت فيها
> عن عمل، فكان الفقر يلاحقني. وفتشت فيها عن شعبي فوجدت الزنزانة والضابط الوقح. كانت
> آخر حدود العالم, وأولى المحاولات والخيبة. وكان سورها يتآكل في الزمن.[৫৩৩]

> এটি ছিল প্রথম আমার আকার স্বাদ নেয়ার ঘটনা। এখানে এসে সবসময় কিছু একটা খুঁজতেছিলাম, পাইনি। মাকে খুঁজেছি কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে গ্রামে ফিরে গেছেন। কয়েক বছর পর প্রিয়তমাকে খুঁজে দেখি আরেকজনকে বিয়ে করে ফেলেছে। কাঁজের সন্ধান করে দেখেছি শুধু দারিদ্র্যই ঘিরে ধরে। অবশেষে আমার জনগণকে খুঁজেছি কিন্তু তাদের পাইনি পেয়েছি শুধু একটি কারাগার আর একজন রূঢ় বদ অফিসার। আকা ছিল পৃথিবীর সাথে শেষ সীমান্ত, সব চেষ্টা লড়াই-সংগ্রাম আর ব্যর্থতার শুরু। সময়ের সাথে সাথে আকার প্রাচীরটিও ক্ষয় হতে থাকে।

---

৫৩৩. দারভীশ, মাহমুদ, *ইয়াওমিয়্যাতু হুজন আল আদী* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৬।

এটি ছিল দারভীশের অতি কিশোর বয়সের অভিজ্ঞতা। ১৯৪৮ সনে নাকবার ঘটনায় দারভীশ লেবাননে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়ার কিছুদিন পরই পুনরায় মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। কিন্তু সেই অবস্থায় মাতৃভূমি ছিল ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণে। পরবর্তীতে খুববেশি পরিবর্তন আসেনি ফিলিস্তিনীদের জীবনে। কিন্তু তারপরও তারা হার মানেনি। তারা ভুলে যায়নি তাদের জীবনের কথা অস্তিত্বেও কথা। তারা ভুলতে পারেনি কিভাবে তাদের বসতবাড়ি ইজরাইলি সেনারা ধ্বংস করে দিয়েছিল। সবহারিয়ে শেষপর্যন্ত তারা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। বারবারই তারা প্রতিরোধের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

১৯৬৭ সালের জুনের যুদ্ধের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন দারভীশ তার *জাকিরা আল নিসইয়ান* গ্রন্থে। দারভীশ জানান, বেশ কয়েকজন ইজরাইলি সৈনিক সেখানে এসেছিল। কিন্তু তারা অবাক হয়ে যায়, মানুষজন এখনো পুরনো স্মৃতি ধরে রেখেছে। তাদের দেশ গ্রাম সব তো ধ্বংস হয়ে গেছে। হারায় গেছে। তারপরও তারা সেসব মনে রেখেছে। কারণ যারা মনে রেখেছে তারা সেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রাম দেখেইনি কোনোদিন। কারণ তাদের জন্ম হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু তারপরও তাদেরকে সেসব ঘটনা-স্মৃতি ছুঁয়ে যায়। এক ইজরাইলি সৈনিক আরো বিস্মিত হয়ে যায়। কারণ সে এক শরণার্থী শিবিরে গিয়ে দেখতে পায়, সেখানকার আশ্রিত লোকজন এমনভাবে তাদের শিবিরটি তৈরি করেছে যেন তারা তাদের আগের গ্রামেই বসবাস করছে। হুবহু সেই গ্রামের ধরন, হুবহু তাদের গ্রামের সেইসব রাস্তাঘাট ও প্রবেশ পথ। যারা বলে, আমরা বির আল-সাবি এলাকার।[৫৩৪]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় দারভীশ কিভাবে মানুষের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। একটি রাষ্ট্রহীন দেশহীন জনগোষ্ঠীর স্মৃতি, তাদের ভাষা-যাপিত জীবন নিজের ভাষায় গ্রন্থিত করেছেন। গণমানুষ কথাটি নিছকই কথার কথা নয়। তার সাথে মিশে যাবার–মানুষের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করার মধ্যদিয়ে কেবল মানুষের জীবনকে জীবন্ত করে তোলা যায়। একটি জনগোষ্ঠী ইজরাইলি ধ্বংসযজ্ঞের সামনে মাথা নত করেনি। ক্রমাগত নিপিড়নের মুখে– নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়ার পরও শরণার্থী শিবিরে এমনভাবে জীবনকে নির্মাণ করে তুলেছিল তারা যেন মাতৃভূমি ফিলিস্তিনেই তারা আছে। তাদের অস্তিত্বকে কেউ মুছে দিতে পারেনি। এই যে স্মৃতি– এটি আসলে স্মৃতি নয়– স্মৃতিকে সপ্রাণ করে তোলার মধ্যদিয়ে প্রতিরোধের অন্য এক উপায় তারা তৈরি করে নিয়েছেন–যা লঙ্ঘন করা সম্ভব। দারভীশ তার গদ্যে এমন উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু কবিতায় সেই উপস্থাপন আরো নিবিড় আরো ঘনিভূত, স্পর্শকাতর। আরো সংবেদী। মানুষের আবেগ আর নির্মম বাস্তবতাই যেন তার কবিতায় উঠে আসে। কিন্তু সেই বাস্তবতা এবং অসহায়ত্ব কখনো আত্মমর্যাদার ফানুস ওড়ানো বুলি নয়, কখনো মাটি দিয়ে খেলা ধুলোর সাম্রাজ্য নয়। হাজারো করুণ পতিত দশার মধ্যেও নিজেদের আওয়াজকে–গণকণ্ঠস্বরকে হারানো অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারের তীব্র প্রতিধ্বনিই যেন হয়ে ওঠে তার কবিতা।

---

[৫৩৪]. মুহাবী, ইবরাহিম, *জার্নাল অব অ্যান অর্ডিনারি গ্রিফ*– মাহমুদ দারভীশের মূলগ্রন্থ 'ইয়াওমিয়্যাতু হুজন আল আদী'র অনুবাদ (ব্রুকলিন: আর্চিপেলেগো বুকস, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৩৬।

যে কবিতায় নিপীড়ক শক্তির বিপরীতে নতুনতরো মানবিক শক্তি নির্মাণের অঙ্গিকারও ব্যক্ত হয়ে ওঠে।

We, too, cry when we fall to the earth's rim.
Yet we don't preserve our voices in old jars.
We don't hang a mountain goat's horns on the wall,
and we don't make of our dust a kingdom.
Our dreams do not gaze upon other people's grapevines.
They don't break the rule.[535]

আমাদের কান্না আসে যদ্যপি আমরা পড়ে যাই পৃথিবীর প্রান্তে
আমাদের কণ্ঠস্বরগুলো তবু আটকে রাখতে পারি না পুরনো জারের ভিতর
দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখি না আমরা পাহাড়ি ছাগলের শিঙ
তৈরি করি না আমরা ধুলোর রাজ্য
অপরের ক্ষেত গ্রাস করতে উঁকিঝুঁকি মারে না আমাদের স্বপ্ন-ইচ্ছেরা
তারা কখনো ভঙ্গ করে না নীতি ও নিয়ম।

আধুনিক কবিতায় সাধারণ মানুষের অভিব্যক্তি–ভাষা ও জীবন যাপনের অনুষঙ্গগুলো স্বভাবত জটিলভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়। কবিতাকে খুব বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জ্ঞাননির্ভর করে তোলার ফলে কবিতার ঐতিহ্যগত প্রকৃতি হারিয়ে যায় আধুনিক কবিতায়। বিমূর্ত ভাষায় কবিতার নির্মাণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা থেকে নিজের সৃষ্টিশীলতায় অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে কবিতা পাঠকমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু মাহমুদ দারভীশ আধুনিক কবিতার এই দশা থেকে নিজের অবস্থান এবং কাব্যিক সক্রিয়তা ভিন্নমাত্রায় তৈরি করলেন। কবিতার প্রাণ-প্রকৃতি–কবিতার ভাষাগত গড়নে সারল্য মেখে দিয়েছেন দারভীশ। কবিতাকে আদি মেজাজে পুনর্বাসিত করে সব পাঠকের কাছে নিয়ে গেছেন তিনি। ফলে তার কবিতায় স্বভাবতই একটি গণমুখি ভাষাভঙ্গি গড়ে উঠেছে। তাতে দেখা যায়, সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষ তার দুঃখ, আবেগ, অভিব্যক্তি যে সহজ-সাবলীল ভানমুক্ত অকৃত্রিম ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন কবি তাদের ভঙ্গিতেই কথা বলেন। দারভীশ তার কাব্যভাষা সেখান থেকেই ধারণ করেছেন। কবি তার সময়ের পুরো আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের প্রতীক মাত্র। যাতে সুস্পষ্ট ইংগিত নির্দেশ করে তার সমসাময়িক ফিলিস্তিনের বাস্তবতার। পরের বক্তব্যে এটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

---

৫৩৫. শাহীন, মোহাম্মদ, *হোয়াই ডিড ইউ লিভ দ্য হর্স অ্যালন?*– মাহমুদ দারভীশের মূলগ্রন্থ 'লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদা'র অনুবাদ (লন্ডন: হেসপেরাস প্রেস লিমিটেড, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২১।

-3

العشرين قد صرت في
وصرت كالشباب يا أماه
الجدار أدخن التبغ ، و أتكي على
أقول للحلوة : آه
كما يقول الآخرون
أطيب البنات ، يا أخوتي ؛ ما
تصوروا كم مرة هي الحياة
. " بدونهن ... مرة هي الحياة
و قال صاحبي : "هل عندكم رغيف ؟
الإنسان يا إخوتي ؛ ما قيمة
" إن نام كل ليلة ... جوعان ؟
أنا بخير
بخير أنا
عندي رغيف أسمر
و سلة صغيرة من الخضار

-4

في المذياع سمعت
قال الجميع : كلنا بخير
لا أحد حزين ؛
والدي فكيف حال
ألم يزل كعهده ، يحب ذكر الله
الزيتون ؟ و الأبناء .. و التراب .. و
و كيف حال إخوتي
هل أصبحوا موظفين ؟
: والدي يقول سمعت يوما
... سيصبحون كلهم معلمين
سمعته يقول
(أشتري لهم كتاب أجوع حتى)
لا أحد في قريتي يفك حرفا في خطاب
أختنا و كيف حال
هل كبرت .. و جاءها خطّاب ؟
و كيف حال جدّتي

كعهدها تقعد عند الباب ؟ ألم تزل
تدعو لنا
! بالخير ... و الشباب ... و الثواب
و كيف حال بيتنا
! و العتبة الملساء ... و الوجاق ... و الأبواب
سمعت في المذياع
رسائل المشردين ... للمشردين
! جميعهم بخير
... لكنني حزين
تكاد أن تأكلني الظنون
... خبرا لم يحمل المذياع عنكم
و لو حزين
و لو حزين[৫৩৬]

আমি ভালো আছি
আমি হয়ে গেলাম বিশ বছরের
আমি যুকদের মতো হয়ে গেলাম, মা!
আমি তাম্রকূটের ধোঁয়া ছাড়ি আর চেয়ারে হেলান দিয়ে
অন্যদের মতো মহাসুখে বলিঃ আ. হা হা
আরে ভাই, কী সুন্দরী মেয়ে!
চিন্তা করে দেখো তো এদের ছাড়া জীবন কতো তিক্ত
জীবন কতো কষ্টের
কিন্তু আমার বন্ধু বললঃ তোমাদের কাছে কি
রুটি আছে?– ভাইজান মানুষের কী মূল্য?
যদিও সে প্রতি রাতেই ক্ষুধার্ত থাকে
আমি ভালো আছি।
আমার কাছে আছে তাম্র বর্ণের ঝলসানো রুটি
আছে সবজির ছোট্র একটি ঝুড়ি।
আমি রেডিওতে শুনেছি-
বিতাড়িতদের জন্য বিতাড়নকারীদের অভিনন্দন
তারা বললোঃ আমরা সবাই ভালো আছি।
কেউ দুঃখী নাই।

---

৫৩৬. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান, আল আ'মাল আল উ'লা-১.২০০৫*, পৃ. ৪৩-৪৬।

তাহলে আমার বাবা কেমন আছেন?
তিনি কি তার সময়মতো আল-   াহর জিকির,
সন্তানাদি, মাটি, আর জলপাইকে ভালোবাসতে পারেন?
কেমন আছেন আমার ভাই
তারা কি সবাই কর্মজীবি
চাকরিজীবি
আমি একদা আমার বাবাকে বলতে শুনেছি-
তারা সবাই শিক্ষক হবে
আমি শুনেছি, তিনি বললেনঃ
(আমি কিছুই খাইনা যাতে তাদের জন্য বই কিনতে পারি)
আমাদের বোন কেমন আছে?
সে কি বড় হয়ে গেছে। তার কাছে কি বিয়ের কোনো প্রস্তাবকারী এসেছে?
আমার দাদী, নানী কেমন আছেন?
তারা কি স্বভাব মতো দরোজার সামনে বসতে পারেন
তারা আমাদের জন্য দোয়া করেন–
ভালো থাকার, তারুণ্যের, পূণ্যের
আমাদের ঘর,
মসৃণ চৌকাঠ, স্টোভ আর দরোজাগুলো কেমন?
আমি রেডিওতে শুনেছি–
বিতাড়িতদের প্রতি বিতাড়নকারীদের পত্র-
তারা সবাই ভালো!
কিন্তু আমি একজন দুঃখভারাক্রান্ত
বহু চিন্তা যেনো আমাকে গ্রাস করে ফেলছে ?
জেনে রাখো, রেডিও তোমাদের জন্য রুটি বহন করে না
যদিও দুঃখী হও
যদিও দুঃখী হও।

এই কবিতাংশটি দারভীশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের। যেখানে নাকবার সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের করুণচিত্র ফুটে উঠেছে। এ ধরনের কবিতায় সাধারণ মানুষের কথা-আবেগ ও সংবেদনা বিপুলভাবে জায়গা করে নিয়েছে। এর জন্য দারভীশের ভাষা নিয়ে ভাবতে হয়েছে। প্রায় একই বক্তব্য দারভীশ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ আছাফীরু বিলা আজনিহায়ও দিয়েছেন। কিন্তু এর ভাষাগত উপস্থাপন সর্বস্তরের পাঠককে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। তবে দ্বিতীয় কবিতায় এসে দেখা যায় দারভীশের পরিবর্তন। এখানে তাকে ভাবতে হয়েছে। সেকারণে দারভীশের কাছে ভাষা ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কবিতাকে কি করে তার উৎপাদনশীল এবং মানুষের প্রকৃতির মধ্যদিয়ে সপ্রাণ ভাষায় জারিত করা যায় সেই জিজ্ঞাসা।

কবিতাকে নানাবিধ নন্দনতত্ত্ব, ভাষাগত মতাদর্শের বিধিবদ্ধ কিংবা পদ্ধতিগত বেড়াজাল থেকে মুক্ত করেছেন দারভীশ। এই মুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় কিংবা কবিতার স্বাভাবিক অভিমুখে তিনি হাঁটলেন। তার গতিবিধিই কবিতার গতি হয়ে উঠল– নতুন কবিতার– যে কবিতায় মানুষেরা এসে মিলিত হয়েছে। অসংখ্য প্রাণ– বহুস্বর– বিপুল কণ্ঠ প্রবাহিত হয়েছে সে কবিতায়। এমন অপ্রতিরোদ্ধ কবিতায় তার মানচিত্র আঁকলেন। নির্মাণ করলেন একটি জাতি– একটি জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। দারভীশ বলেন,

"وأنا أكتب شعراً، أي: أموت الآن، فلتذهب أصول الشعر ليتضح الخنجر ولينكشف الرمز: الجماهير هي الطائر والأنظمة الآن تسمّى قتلة"[537]

আমি কবিতা লিখছি অর্থাৎ আমি এখন মরছি আর যেনো কবিতার প্রথাবদ্ধ তত্ত্ব ও নীতি নিয়মরা বিদায় নিচ্ছে। যেনো খঞ্জর স্পষ্ট হয়ে ওঠছে। যেনো উন্মোচিত হচ্ছে প্রতীক: গণমানুষই সেই পাখি ও সুসংবদ্ধ নীতি ও ছন্দের নাম যাদের এখন নাম দেয়া হয় ‘হত্যাকারী’।[৫৩৮]

আরেকটি কবিতার দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। সময়টি ছিল ১৯৭৭। সে সময় ফিলিস্তিন এবং লেবাননে ভয়াবহ জায়োনবাদী আগ্রাসন চলতে থাকে। ফিলিস্তিনের অধিকৃত ভূমিসহ বিভিন্ন এলাকার বিদ্যুৎ ও পানির লাইন বন্ধ করে দেয় ইসরাইলী সেনারা। তেমনি এক পরিস্থিতিতে ইবরাহীম মারজুকের জীবনে ঘটে যায় এক হৃদয় বিদারক ঘটনা। ইবরাহীম মারজুক ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। জলরঙে আঁকতেন ফিলিস্তিনকে।[৫৩৯] অন্তরঙ্গ সাধনায় মারজুক গভীর মমত্ব দিয়ে আঁকতেন ফিলিস্তিনীদের দুঃখ-দুর্দশার জীবন্ত চিত্র। জায়োনবাদী অস্ত্র, গোলা, কামান, ট্যাংক আর বুলডোজারের হিংস্র উৎসবে ধবংস বিধবংস মানুষ ও মানবতার বিধ্বস্ত জীবনকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরাই ছিলো ইবরাহীম মারজুকের সাধনা ও লড়াই। কিন্ত কোনো এক সকালে যখন পানির লাইন বন্ধ ছিলো তার দুই সন্তান পাঁচ বছরের লাইলাক এবং ছয় বছরের শামস তাকে জাগিয়ে রুটি আর দুধ চেয়েছিল কিন্তু ইসরাইলী সেনাদের তান্ডবে দুই শিশুর জীবনই শেষ হয়ে যায়। তাদের রুটি আজীবনের জন্য কেড়ে নিয়েছে ইসরাইলী হানাদাররা। দারভীশ সেই ঘটনায় এমন মমতায়ময় ভাষা মেখে দিলেন যেন হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

و يرسم
جسدا مزدحما بالوطن المطحون

---

৫৩৭. আসতহ, আদিল, *মাহমুদ দারভীশ: তাখলীছুশ শি'রি মিম্মা লাইসা শি'রা* (দিওয়ান আল আরাব, জানুয়ারি ১৭, ২০০৬ খ্রি.), ভিজিট: মে ১০, ২০২৩, [تخليص الشعر مما ليس شعراً - ديوان العرب (diwanalarab.com)]

৫৩৮. হোসেন, শাহাদাৎ, ২০০৮, পৃ. ২২।

৫৩৯ সালমান, তিলাল, *লিকায়াতুন আক্বাল্লু... মাআ মাহমুদ দারভীশ*– ড. আলী আল কাইয়্যিম কর্তৃক সংকলিত ‘মাহমুদ দারভীশ: সাজ্জিল! আনা আরাবিয়্যুন’ (আলকুতুব.কম, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২০৯। ভিজিট: এপ্রিল ২৭, ২০২৩, [مكتبة نور اكبر مكتبة إلكترونية عربية مفتوحة للكتب (noor-book.com)]

في معجزة الخبز
و يرسم
مهرجان الأرض و الإنسان ،
خبزا ساخنا عند الصباح
الأرض رغيفا كانت
كانت الشمس غزالة
كان إبراهيم شعبا في الرغيف
و هو الآن نهائيّ... نهائيّ
تمام السادسة
دمه في خبزه
خبزه في دمه
الآن
تمام السادس[৫৪০]

আর তিনি আঁকলেন
রুটির মোজেজায়
চূর্ণ বিচূর্ণ দেশটি দিয়ে একটি ঘননিবীড় দেহ
তিনি আঁকলেন
মানুষ ও পৃথিবীর উৎসব
ভোরের গরম রুটি।
পৃথিবী ছিলো এক টুকরো রুটি
সূর্য ছিলো এক হরীণ
ইবরাহীম ছিলো রুটির ভেতর স্বয়ং এক জনগোষ্ঠী
আর তিনি এখন শেষ... শেষ
শেষ ছয়তম বছর
তার রক্ত রুটির ভেতর
তার রুটি রক্তের ভেতর
এখন ছয়তম বছরের শিশু শেষ।

দারভীশের এমন কবিতা অসংখ্য। যেখানে একটি দেশকে একটি জাতিকে যখন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে– এমন একটি রাষ্ট্রহীন বিপর্যস্ত সময়ে কবিতা কেমন হওয়া উচিত কিংবা একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও কবিতার অবস্থান কেমন হওয়া উচিত দারভীশ পাঠে সহজেই তা অনুধাবন করা যায়। কবিতার বসতবাড়ি সবসময় মানুষের মধ্যেই। তার যাপনও মানুষ ও প্রকৃতি নিয়েই। যেন

[৫৪০]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২. ২০০৫*, পৃ. ২৮১-২৮২।

কবিতামাত্রই একটি জনগোষ্ঠী, একটি জাতি, একটি জাতির মানচিত্র। একটি ভূখণ্ডই যেন কবিতা। মানুষের এমন অর্থ দারভীশের কবিতায় যেন বিরলভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

إن نهضت صباحاً، ولم تجد الآخرين معك
يفركون جفونك، قل للبصيرة: شكراً!

إن تذكرت حرفاً من اسمك واسم بلادك
كن ولداً طيباً!
ليقول لك الربُّ: شكراً![৫৪১]

যদি ঘুম থেকে ওঠো আর কাউকে দেখতে না পাও
যারা ঘুমের কারণে চোখ কচলাতো
তবে দৃষ্টিকে বলে রাখো: শুকরিয়া!

যদি তোমার এবং তোমার মাতৃভূমির নামের
একটি অক্ষরও স্মরণ করতে পারো,
তবে তুমি হয়ে যাও ভালো সন্তান
তোমাকে তোমার রবের বলা উচিৎ: ধন্যবাদ!

কিংবা,

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك
[لا تنس قوت الحمام]

وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك
[لا تنس من يطلبون السلام]

وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك
[لا تنس من يرضعون الغمام]

وأنت تعود إلى البيت، بيتك، فكر بغيرك
[لا تنس شعب الخيام]

وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك

[৫৪১]. দারভীশ, মাহমুদ, *কাজাহরি আল লাউজ, আও আবআদ...* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৫।

[ثمة من لم يجد حيزاً للمنام]

وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك
[من فقدوا حقهم في الكلام]

وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك
[قل: ليتني شمعة في الظلام][542]

নিজের জন্য তুমি নাস্তা তৈরি করছো তবে অন্যের কথাও ভাইবো
'ভুলে যেও না কবুতরের খাদ্যের কথা'

তুমি যুদ্ধ করছো, তবে অন্যের কথাও চিন্তা কইরো
'ভুলে যেও না তাদের কথা যারা শান্তি চায়'

তুমি পানির বিল শোধ করছো, তবে অন্যের কথাও ভাইবো
'ভুলে যেও না তাদের কথা, যারা মেঘের পানি পান করে বাঁচে'

তুমি তোমার নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছো, তবে অন্যের কথাও চিন্তা কইরো
'ভুলে যেও না তাদের কথা, যারা আশ্রয়কেন্দ্রের তাঁবুতে থাকে'

তুমি ঘুমাও আর তারা গোনো, তবে অন্যের কথাও ভাইবো
'একটু থামো, ভাবো তাদের কথা, যাদের ঘুমানোর কোনো জায়গা নেই'

তুমি নিজেকে স্বাধীন রাখো রূপক-উপমায়, তবে অন্যের কথাও চিন্তা কইরো
'যারা হারিয়ে ফেলেছে কথা বলার অধিকার'

তুমি চিন্তা করো দূরের মানুষদের, তবে নিজের কথাও ভাইবো
'বলো: হায় যদি হতাম অন্ধকারে একটুকরো মোম'

---

৫৪২. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪।

৫.২.২: বর্গ হিসেবে *গণ* এবং গণমানুষের সত্যাসত্য

গণ প্রত্যয়টি কবিতায় কিভাবে সম্ভব হয়ে উঠেছে তার মাত্রা ও ব্যবহারের বৈচিত্র্যই তা নির্ধারণ করে দিতে পারে। একের অধিক এই যে বহু, কিংবা বহুমানুষের বহু কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন কবি দারভীশ অথবা ফিলিস্তিনের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর বহুস্বর এর যে বিপুল উপস্থিতি তার কবিতায় প্রত্যক্ষ করা যায় তা বোঝার জন্য রুশ সাহিত্য তাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিনের শরণ নেয়া যেতে পারে। মিখাইল বাখতিন একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও তাত্ত্বিক। লিটারেরি তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার রয়েছে মৌলিক এবং বৈপ্লবিক প্রস্তাবনা। যেটি তাকে সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে ব্যাপক সমাদৃত করেছে। তার কয়েকটি ধারণার মধ্যে *পলিফনি (polyphony)* একটি। এর মানে বহুস্বর। বাখতিন তার Problems of Dostoevsky's Poetics () গ্রন্থে এই ধারণা গড়ে তুলেছেন।[৫৪৩] এটি বইটির একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বচিন্তা। *পলিফনি* কথাটি এসেছে মূলত মিউজিক থেকে। যেটি বাখতিনের আগেই কোমারোভিচ সংগীতে পলিফনি হিসেবে চিহ্নিত করেন। বাখতিন মিউজিকের এই পলিফনির সাথে তুলনা করে দস্তয়ভস্কির উপন্যাসে পলিফনি কিংবা বহুস্বর বিশ্লেষণ করেন। যেখানে তিনি দেখান যে, বহুস্বর থাকলেও কিন্তু এগুলো এমন যে, প্রতিটি স্বরই স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত– একটি অপরটি থেকে আলাদা। স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেউ কারো মধ্যে মিলিয়ে যায় না। যাতে দেখা যায়, কোনো স্বরেই লেখকের নিজস্ব মতামত, মতাদর্শ কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি আরোপিত নয়। প্রতিটি চরিত্রের স্বরই স্বাধীন– নিজের মতো করে কথা বলে যাচ্ছে– যাতে লেখকের উপস্থিতি নাই। কোনো স্বরই লেখক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়।[৫৪৪] বস্তুত বাখতিন দস্তয়ভস্কির উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ও বহুস্বরের মুখোমুখী হন।

দ্বিতীয়ত, হেটারোগ্লোসিয়া কিংবা সামাজিক হেটারোগ্লোসিয়া *(Heteroglossia)*। অনেক এবং বহুবিধ ঘটমান বাস্তবের বাস্তব। এটি একদিকে সমাজ–ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা অপরদিকে শিল্প ও নন্দনতাত্ত্বিক একটি ধারণাও। শিল্পের বিভিন্ন সামাজিক স্তর থাকে তেমনি ভাষারও। এদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থাকে। এই অবস্থান একইসাথে সহাবস্থানও। সংবাদ বা গণমাধ্যমের ভাষা, আইনের ভাষা, বিচারের ভাষা, জমি-জেরাতের ভাষা, আর্থ-রাজনৈতিক ভাষা কিংবা প্রতিদিনের যাপিত জীবনের ভাষার অবস্থান ও সহাবস্থান। অর্থাৎ বহু মানুষের বহুস্বর– বহুকথা– এসব কথা কিংবা ভাষার পরষ্পর সংলাপরত অবস্থার মধ্যদিয়ে যেসব পরিবর্তন ঘটে তাতে বহু ডিসকোর্স বর্তমান থাকে। এসব ডিসকোর্সের ফলাফল কিংবা স্বরূপ হলো হেটারোগ্লোসিয়া। এক কথায় এর প্রকাশ করা কঠিন। বাংলায় যেটাকে বলা যায়, 'বহু-বাস্তব-সমন্বিত বাস্তব'।[৫৪৫] বলা বাহুল্য অন্যসব ধারণার মতো এটিও উপন্যাস এবং উপন্যাসের ভাষা সম্পর্কিত। বাখতিন বলেন,

---

[৫৪৩]. এমার্সন, কার্লি, *প্রবলেমস অব দস্তয়ভস্কি'স পোয়েটিক্স*-- মিখাইল বাখতিনের রুশ ভাষায় লিখিত মূলগ্রন্থ '*Проблемы поэтики Достоевского*, *problemy poetiki Dostoevskogo*'এর অনুবাদ' (মিনেসোটা: ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৬।

[৫৪৪]. জেসিনস্কি, জেমস, *হেটারোগ্লোসিয়া*, *পলিফনি*, *এন্ড 'দি প্যাডেরালিস্ট পেপার্স'* (রেটরিক সোসাইটি কোয়ার্টার্লি, ভলিয়ম: ২৭, সংখ্যা: ১, উইন্টার ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩-৩৭। রবিনসন আন্দ্রে, *ইন থিওরি বাখতিন: ডায়ালজিজম*, *পলিফনি এন্ড হেটারোগ্লোসিয়া* (সিজফায়ার ম্যাগাজিন, জুলাই ২৯, ২০১১), ভিজিট: ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২২, https://ceasefiremagazine.co.uk/in-theory-bakhtin-1/

[৫৪৫]. আজম, মোহাম্মদ, *মিখাইল বাখতিন: যাপিত জীবন*, *ভাষা ও উপন্যাস* (ঢাকা: প্রকৃতি, ২০২৩), পৃ. ৪৭।

> The novel as a whole is a phenomenon multiform in style and variform in speech and voice. In it the investigator is confronted with several heterogeneous stylistic unities, often located on different linguistic levels and subject to different stylistic controls.[৫৪৬]

> উপন্যাস সামগ্রিকভাবে আঙ্গিকের এবং ভাষা, ধ্বনি ও কথা বলার বহুকাঠামো ও রূপবৈচিত্র্যের এক ফেনোমেনা। এমন অনুসিন্ধুৎসুকের মধ্যে উপন্যানকে মোকাবেলা করতে হয় বহুজাতিক ও বহবাস্তব সমন্বিত বাস্তবের আঙ্গিকের এককসমূহকে। উপন্যাসকে প্রায়ই বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক স্তরে অবস্থান করতে হয়। এবং একইসাথে ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলগত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হয়।

ফিলিস্তিনের নাকসা-উত্তর সময়কালে মাহমুদ দারভীশের কবিতায় হেটারোগ্লোসিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ সময়ে বিপুল মুক্তছন্দের কবিতা লিখেন। তেমনি গদ্যছন্দের কবিতা লিখেন অসংখ্য। এসব কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত দিক হলো প্রচুর সংলাপময়তা এবং বহুস্বরতা (মাল্টিপল ভয়েস)। এর মধ্যে রয়েছে বর্ণনাময়তা (ন্যারেটিভ), নাট্যময়তা এবং আছে মহাকাব্যিক কাঠামোর বিপুল উপস্থিতি–যাতে বহুস্বর ও বহুবাস্তবতার বিচিত্র উদাহরণ রয়েছে। বাখতিন তার ডিসকোর্স এবং ধারণাকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। বাখতিন মনে করেন, সমাজের সর্বস্তরে বহুবিধ ভাষা এবং ভাষাগত ডিসকোর্স গতিশীল রয়েছে। শুধু ভাষাই নয়, কোনো একটি ভাষা কোন ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হচ্ছে– তার প্রকাশভঙ্গি, কথা বলার ধরন–কাঠামো এসব বিপুল বিচিত্র। ভিন্ন ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। আর এই বিচিত্র এবং বহুস্বরময় ভাষার উপর নির্ভর করছে উপন্যাস। এর সাথে রয়েছে লেখকের ভাষা এবং স্টাইলগত বয়ান (ন্যারেশন)– এই স্টাইলও বিচিত্র এবং বহুত্বের গুণ ও বৈশিষ্টসম্পন্ন। একইসাথে চত্রিগুলোর কথা বলার রীতি ও স্টাইল।

> These heterogeneous stylistic unities, upon entering the novel, combine to form a structured artistic system, and are subordinated to the higher stylistic unity of the work as a whole, a unity that cannot be

---

[৫৪৬]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০৫।

> identified with any single one of the unities subordinated to it.[547]

মাহমুদ দারভীশের কবিতায় যেহেতু নাট্যরীতির বিপুল ব্যবহার রয়েছে তেমনি রয়েছে উপন্যাসের মতো বহুবিধ চরিত্র। রয়েছে সংলাপময়তা। একইসাথে রয়েছে বহুস্বরতার নানান দৃষ্টান্ত ও অনুষঙ্গ। সেকারণে দারভীশের কবিতায় এর প্রাসঙ্গিকতা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। একইসাথে এতে নিরীক্ষা করে দেখা যাবে, দারভীশের কবিতা সংলাপধর্মী সম্পর্ক (ডায়ালজিক্যাল রিলেশন্সশিপ), সামাজিক বিনিময় এবং বহুভাষা ও ডিসকোর্সের অতীত-বর্তমানের মাঝে সামাজিক আদান-প্রদান ও সম্পর্ক কিকরে নতুন ধরনের ভাষা, নতুন অর্থোৎপাদন, দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলে। দারভীশের কবিতা বিচিত্র। বিষয়ের দিক থেকে যেমন তেমনি গঠনরীতি ও স্টাইলের দিক থেকেও। একইভাবে রয়েছে বহু চরিত্র। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, ক্ল্যাসিক, ধর্মীয় এবং সাহিত্যিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব রয়েছে তার কবিতায়। রয়েছে নানা ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও পৌরাণিক ভাষ্য। অতীতের যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সমকালের। দারভীশের *মাদীহ আল জিল আল আলী* কাব্যগ্রন্থ এর সবচেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত। এখানে একদিকে রয়েছে নায়ক চরিত্র। অন্যদিকে রয়েছে আরো বহুচরিত্র এবং বহুস্বর। বহু কথক। স্বাধীনতা সংগ্রামী, ফেদাইন (ফেদাঈন), রাজনীতিক, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব-চরিত্র (আদম, যীশু, আইয়্যুব আ.) এবং পৌরাণিক কল্পকাহিনীর চরিত্র ও রূপক (ফনিক্স)। এদের প্রত্যেকের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্বর, বক্তব্য, আদর্শ, ভাষা ও ডিসকোর্স– যেখানে সহবাস্থান সত্ত্বেও প্রতিটি স্বরই স্বাধীন এবং পরস্পরের সম্পর্ক সংলাপময়তার মাধ্যমে সম্পর্কিত। যদিও এখানে নায়ক এবং ফেদাইনদের নাম নেই। তাদের স্বর আছে। তারা ফিলিস্তিনীদের কাছে এবং ফিলিস্তিনীদের ততকালীন নেতা ইয়াসির আরাফাতের কাছে পরিচিত– যারা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য একসাথে যুগপত লড়াই করেছেন।

كَمْ من نبيٍّ فيك جَرَّبَ
كَمْ تعذَّب كي يُرَتَّبَ هيكَلَهْ
عبثاً تحاول يا أبي مُلْكَاً ومَمْلَكَةً
فَسِرْ للجُلْجُلَهْ
واصْعَدْ معي
لِنُعيْدَ للروح المُشَرَّد أوَّلَهْ
ماذا تُريد , وأنت سَيِّدُ روحنا
يا سَيِّدَ الكينونة المتحوِّلَهْ؟
يا سَيِّدَ الجمرهْ
يا سَيِّدَ الشُّعْلَهْ

[547]. কার্লি এমার্সন ও মাইকেল হলকোইস্ট, *দি ডায়ালজিক ইমাজিনেশন: ফোর অ্যাসেইস*– মিখাইল বাখতিনের রুশ ভাষায় লিখিত মূলগ্রন্থ ‘Вопросы литературы и естетиќи (*Voprosy literatury i estetiki*) এর অনুবাদ (যুক্তরাষ্ট্র: দি ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস প্রেস, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৩০৫।

ما أوسع الثورة
ما أضيقَ الرحلة
ما أكبَرَ الفكرة
ما أصغَرَ الدولة!..[৫৪৮]

কতো নবী তোমার ভিতর লড়াই চালিয়ে গেছে
কতো টর্চার সয়ে যেতে হয় কতো নির্যাতন যেন
উদ্ধার করা যায় মন্দির
বাবা, তুমি বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছো রাজ এবং রাজ্যের জন্য
সুতরাং তুমি বেরিয়ে পড়ো গলগোঠার[৫৪৯] জন্য
আরোহন করো আমার সাথে
যেন তাড়িত আত্মার জন্য ফিরিয়ে আনি তার আদি স্থান
কি চাও
তুমিই আমাদের আত্মার নেতা
রূপান্তরশীল সত্তার সর্দার হে
হে জ্বলন্ত অঙ্গারঅলা
হে আলোকিত প্রদীপঅলা
কি বিশাল বিপ্লব
কি সংকীর্ণ এই ভ্রমণ
কি মহান চিন্তা
কতো ক্ষুদ্র এই রাষ্ট্র!

৫.২.৩: অন্তর্পাঠ্যতা (ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি)

এখানে সম্বোধনে আরাফাতকে বোঝানো হয়েছে। এবং যিনি বলছেন তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা সংগ্রামী। পুরো কাব্যগ্রন্থে এ ধরনের সংলাপধর্মী সম্পর্কের যে আবহ এবং স্টাইল গড়ে উঠেছে তার অপর নাম হলো *ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি*। বাখতিন রাশিয়ান উপন্যাসিক ফিউডোর দস্তয়ভস্কির উপন্যাসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ ধরনের ক্যাটাগরি চিহ্নিত করেন। যেখানো দেখানো হয়, সাহিত্যে উপন্যাসত্ব (নভেলনেস) ব্যাপারটি ইন্টারটেক্সচুয়ালিটির মধ্যদিয়ে পরিষ্কার

---

৫৪৮. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, ২০০৫, পৃ. ৩৯২।

৫৪৯. জেরুজালেমের প্রাচীরের বাইরে লাগোয়া একটি ঐতিহাসিক স্থান গোলগোঠা। ক্যালবেরিও বলা হয়। এই স্থানেই যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। ব্রিটানিকা অনলাইন। (ভিজিট: ২৭ এপ্রিল, ২০২৩), https://www.britannica.com/place/Golgotha

হয়ে ওঠে যখন লেখক এবং অপরাপর চরিত্র কিংবা নায়ক এবং অন্যান্য ব্যক্তিত্বগুলোর মধ্যে সংলাপময়তা কার্যকর থাকে। আন্তঃপাঠ্যতা– এটি উপন্যাসের অতি সাধারণ একটি রীতি। অপরাপর টেক্সট বা পাঠের উদ্ধৃতি, পুঞ্জিভূতকরণ এবং এক জায়গায় বা একটি পাঠে সন্নিবেশিত করার মধ্যদিয়ে একটি উপন্যাসের ভাষায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। অপরদিকে আন্তপাঠ্যতা এবং ডায়ালজিজম উপন্যাসের ভাষাগত ডিসকোর্সগুলোকেও শক্তিশালী করে। সমান্তরালভাবে আন্তপাঠ্যতা উপন্যাসের পাঠ এবং আন্তসম্পর্কগুলোকে গভীর এবং বিস্তৃত করে তোলে। দৃশ্যত, মাহমুদ দারভীশের কবিতায় কোরআনের শব্দ, বক্তব্য, পাঠ এবং বিবিধ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব তুমুলভাবে জায়গা করে নিয়েছে। দারভীশের কবিতার ইন্টারটেকচুয়ালিটি কিংবা আন্তপাঠ্যতার এমন বৈশিষ্ট্য তার কবিতাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। সাহিত্যের বিবেচনার বাইরেও এর গুরুত্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পাঠগুলোতে বিশেষত্ব হাজির করে। আদম, হাওয়া, নূহ, হাজার, ইসমাইল, যোসেফ, মুসা এবং যীশুর চরিত্র-ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাবলী কোরআন থেকে নিয়েছেন তার কবিতায়। এসব ব্যক্তিত্ব এবং তাদের ঘটনা বর্ণনার মধ্যে একধরনের সংলাপধর্মী সম্পর্ক রয়েছে। সমাজে অতীত কিংবা ঐতিহাসিকতাকে বর্তমান করে তোলার মধ্যদিয়ে যে হেটারোগ্লোসিয়া গড়ে তুলতে এই সংলাপ কাজ করে– সেখানে ধর্মীয় ভাষা, ধর্মীয় ঘটনা-চরিত্রগুলোর পুনর্বয়ানের মধ্যদিয়ে একটি কাব্যিক ডিসকোর্স নির্মাণের চিত্র দৃশ্যমান হয়ে ওঠে দারভীশের কবিতায়। ধর্মীয় আন্তপাঠ উপস্থাপনের ফলে কবিতা নিছক ধর্মীয় হয়ে ওঠে না বরং একটি গণসাংস্কৃতিক বয়ান গড়ে তোলা যায় কাব্য এবং তার ভাষাগত প্রকৌশলের মাধ্যমে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনে যে সাংস্কৃতিক বয়ান ও সক্রিয়তা গড়ে উঠেছিল সত্তর এবং আশির দশকে তাতে ধর্মীয় বয়ান আত্মীকরণ করা হয়েছিল।[৫৫০] ধর্মীয় অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে ফিলিস্তিন ইস্যুতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা কঠিন। লেবাননের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী ইলিয়াস খুরি তার *আল জাকিরাহ আল মাফকুদাহ, দিরাসাতুন নাকদিয়্যাহ* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, ধর্মের যে গণস্মৃতি রয়েছে কিংবা লোকমুখে বহমান ধর্মীয় বয়ানের যে ধারা ও চর্চা রয়েছে ইজরাইলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর সবথেকে মৌলিক ভূমিকা ছিল।[৫৫১] ধর্মীয় ভাষ্য গস্থহণ করায় দারভীশের কবিতার গুমুখী হওয়া সহজ হয়ে যায় দ্রুত। বিশেষত কোরআন কেন্দ্রিক ধর্মীয় ভাষ্য ব্যবহারের ফলে পাঠককে খুব দ্রুত তার কবিতার সাথে সম্পর্কিত করতে সক্ষম হন দারভীশ। ধর্মীয় অন্তর্পাঠ্যতার ফলে সমাজের গণস্বরকে তার কবিতায় এবং সাহিত্যিক সক্রিয়তায় সন্নিহিতকরণের মধ্যদিয়ে বিদ্যমান যে বহুস্তররের বাস্তবতা (হেটারোগ্লোসিয়া) দারভীশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন এটি তার কবিতাকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। অন্যদিক থেকে বলা যায়, এটি উপন্যাসের পর্যালোচনায় বিধৃত হেটারোগ্লোসিয়ার ধারণার একটি কাব্যিক উপস্থাপনও বটে।

---

[৫৫০]. নিশান, মরদেচাই, রিলিজিয়াস, *কালচারাল, এন্ড রেটোরিক্যাল আসপেক্টস ইন প্যালেস্টাইনিয়ান স্ট্র্যাটেজি–* আরিয়েহ স্টেভ কর্তৃক সম্পাদিত 'ইজরাইল এন্ড আ প্যালেস্টাইনিয়ান স্টেট: জিরো সাম গেম?' (ইজরাইল: এসিপিআর (অ্যারিয়েল সেন্টারা ফর পলিসি রিসার্চ), জেডমোরা-বিতান পাবলিশার্স, ২০১১ খ্রি.), ১৪৭-১৫৪।

[৫৫১]. খুরি, ইলিয়াস, *আল জাকিরাহ আল মাফকুদাহ: দিরাসাতুন নাকদিয়্যাহ* (বৈরুত: দার আল আদাব, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৬৯-৮১।

অন্তর্পাঠ্যতা বস্তুত ভাষাতাত্ত্বিক বর্গ। ভাষাতত্ত্বের বর্গ হলেও সাহিত্য সমালোচনায় কিংবা সাহিত্যকর্মের ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় অন্তর্পাঠ্যতার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ কোনো সাহিত্যকর্মের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ণয় কিংবা সাহিত্যের ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অন্তর্পাঠ্যতা একটি বিশেষ উপায়। কোনো টেক্সট বা গ্রন্থে শুধু লেখক-গ্রন্থকারের বক্তব্যই থাকে না। আগের কিংবা সমসাময়িক অনেক লেখক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, পুরাণ-পৌরাণিক চরিত্র, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বক্তব্য, মতামতের পরোক্ষ ইঙ্গিতও কোনো না কোনোভাবে নিহিত থাকে। এই আন্তপাঠ লেখকের সাথে পাঠকের এবং পাঠিত বই বা টেক্সটের সাথে অন্যকারো সংযোগ ও যোগাযোগ ঘটায়। সংক্ষেপে এটাকেই ইন্টাটেক্সচুয়ালিটি বলা যায়। ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি বা অন্তর্পাঠ্যতা প্রথম শনাক্ত করেন ফরাসী দার্শনিক ও নারীবাদী লেখক জুলিয়া ক্রিস্টেভা ()। ক্রিস্টেভা প্রথমত অ্যালুশন (allusion) এবং ইলফ্লুয়েন্স (influence) সম্পর্কিত ধরন ও ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এর আলোকপাত করেন। ইনফ্লুয়েন্স মূলত সমাজ-মনোস্তাত্ত্বিক একটি ধারণা। আর অ্যালুশন মানে, পরোক্ষ উল্লেখ, পূর্বপ্রাসঙ্গিকতা। পূর্বসূত্রের প্রতি ইংগিত কিংবা পূর্বের কোনো বিষয় কিংবা অন্যকোনো বিষয়-পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা। শ্রোতা কিংবা পাঠকের সামনে এটি তুলে ধরা হয় সরাসরি সংযোগ ঘটানোর উদ্দেশ্যে। লেখক এটি করেন প্রত্যক্ষভাবে পাঠকের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য। যেখানে লেখক তার লেখায় বা পাঠে নতুন ধরনের পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করতে পারে এর মাধ্যমে। যাতে নতুন অর্থ কিংবা নতুন তাৎপর্য উৎপাদন করা যায়। তবে এতে এমন পূর্বানুমান করা সম্ভব নয় যে, এরফলে সবধরনের নতুন অর্থ এবং অন্তর্পাঠের ধরনগুলো অ্যালুশনেই প্রকাশ করা সম্ভব। যদিও সাহিত্য এবং আর্টে অ্যালুশন প্যারোডির সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। তবে অন্তর্পাঠের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে অ্যালুশন। কারণ অ্যালুশন একাধিক টেক্সটের সাথে সংযোগ ঘটাতে সক্ষম।[৫৫২] মোটকথা, ক্রিস্টেভা অ্যালুশনের পথ ধরে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটির ধারণার উন্মোচন ও বিস্তার করেন। যাইহোক, ক্রিস্টেভা দার্শনিক ফার্দিনান্দ দ্যা সস্যুর এর ভাষাতত্ত্ব এবং বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের হেটারোগ্লোসিয়া এবং ডায়ালজিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অন্তর্পাঠ্যতাকে একটি বিশেষ ক্যাটাগরি হিসেবে আলোচনায় আনেন। হেটারোগ্লোসিয়া তথা বহুস্বর, বহুপক্ষীয় ভাষা-ডিসকোর্স ধারণ করে যেমন উপন্যাসের ভাষার নির্ধারণী স্বভাব গড়ে ওঠে তেমনি তাতে ইন্টারটেক্সটও থাকে। ক্রিস্টেভা মনে করেন, উপন্যাসে যেহেতু দুই বা তারোধিক স্বর, কথা (আটারেন্স) কিংবা বক্তব্য থাকে। এরফলে দুটি কিংবা তারোধিক প্রতিযোগিতাপরায়ণ ভাষা, অর্থ, ডিসকোর্স কিংবা দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি হয়। কাজে সাহিত্যে, আর্টে বা উপন্যাসে শুধু বহুস্বরই থাকে না, বহুটেক্সটও নিহিত থাকে। যেখানে এটি এমন একটি সমন্বিত কারুকাজের (মোজাইক) মতো যা একইসাথে একই টেক্টটে বহু টেক্সটের সমাহার ঘটানোর মাধ্যমে ভাষার নতুনতরো প্রেক্ষিত তৈরি করতে সক্ষম। কারণ ক্রিস্টেভা মনে করেন এটি ভাষার একধরনে আন্তক্রিড়ার মতো ঘটনা। যাতে ভাষার ভিতরগত প্রক্রিয়াগুলো প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। ভাষার স্বয়ংক্রিয়া চর্চা গড়ে ওঠে। বস্তুত যা ভাষাকে প্রাণবন্ত করে রাখে। ক্রিস্টেভা তাই বলেন,

---

৫৫২.

> The notion of intertextuality replaces that of intersubjectivity, and poetic language is read as at least *double*.[553]

> ইন্টারটেক্সচুয়ালিটির ধারণা যেটি ইন্টারসাবজেক্টিভিটি আকারে থাকে তার স্থানান্তর ঘটায়ে দেয়। যেখানে ভাষা অন্তত দ্বিগুণ পঠিত হয়।

পূর্বের পাঠগুলোর সাথে পাঠক যাতে বিষয় এবং সংলাপের সম্পর্ক ধরতে পারে অন্তর্পাঠ্যতা তার উপায় হিসেবে কাজ করে। যেকারণে অন্তর্পাঠ্যতার অপর নাম মেরুকরণ। দুই বা তার অধিক সূত্র বা পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরিকরণের মাধ্যমে এই মেরুকরণ তৈরি করা যায়। অর্থাৎ সময় এবং স্থানের মাঝে যেমন সম্পর্ক রয়েছে– তেমনি রয়েছে ব্যক্তির সাথে জাতির, বাস্তবের সাথে কল্পনার, বিদ্যার সাথে অধিবিদ্যার কিংবা বস্তুর সাথে বস্তুর উর্ধ্বের সম্পর্ক। এক কথায় সমাজ ও মানুষের প্রতিটি সম্পর্কই একটি অপরকে বরাতের সম্পর্কে সম্পর্কিত করে থাকে। এসব সম্পর্কের মধ্যে কবিতার কাজ হলো সেই সম্পর্ককে যেমন উন্মোচন করে তোলা তেমনি কবিতা নিজেকেও সম্পর্কের একটি উপায় হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম। এটি একধরনের মেরুকরণ। এই মেরুকরণের ঘটনা ঘটতে পারে একজন সামাজিক সত্তার মধ্যে। যিনি মূলত অনেক ধরনের সম্পর্কের মধ্যমণি কিংবা বিবিধ সম্পর্কের ঘটক এবং সম্পর্কের উপায় হয়ে উঠতে পারেন। মাহমুদ দারভীশ তার কবিতায় এই মেরুকরণের কাজটিই করেছেন। অন্তর্পাঠমূলক ভাষার বরাত ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ উপায়– যেখানে অন্তর্পাঠের রেফারেন্সগুলোকে নিজের পাঠের সাথে নিবিষ্ট করেন। এর মধ্যদিয়ে কবিতায় নতুন ধরণের ভাষাভঙ্গি এবং উপস্থাপনা নতুনতরো হয়ে ওঠে। দারভীশ কখনো কখনো তার কবিতায় পূর্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনাও দিয়েছেন। যেখানে মূলত কবি নিজেই কথক হয়ে ওঠেন নিজের। কবি মাতৃভূমি সংক্রান্ত পুরনো স্মৃতির মুখোমুখী হন। যাতে দুটি পাঠগ্রহণের ঘটনা ঘটে। এর ফলে নতুন ধরনের বাস্তবতা মোকাবেলা করতে হয় তাকে। দুটি অভিজ্ঞতার উপস্থাপন একই পাঠে প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের সম্বোধন নিজেকেই করতে হয়। সর্বনামে নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে আন্তপাঠের নতুনতরো পরিবর্তন তৈরি করলেন দারভীশ।[৫৫৪] দারভীশ বলেন,

((هل هذا هُوَ؟)) اختلف الشهودُ:
لعلَّه, وكأنه. فسألتُ: ((مَنْ هُوَ؟))
لم يُجيبوني. هَمَسْتُ لآخري: ((أَهو
الذي قد كان أنتَ... أنا؟)) فغضَّ
الطرف. والتفتوا إلى أُمِّي لتشهد

---

[৫৫৩]. ক্রিস্টেভা, জুলিয়া, *ওয়ার্ড*, *ডায়ালগ*, *নোভেল– দি ক্রিস্টেভা রিডার*, সম্পাদনা: টরিল মোই (নিউ ইয়র্ক: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩৭।

[৫৫৪]. আব্দেল খালেক ইসসা ও আব্দেল কারিম দারাগমেহ, *আসপেক্টস অব ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি ইন মাহমুদ দারভীশ'স পোয়েট্রি* (International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), Volume 6, Issue 2, February 2018), পৃ. ২৩-৩৩।

أَنني هُوَ... فاستعدَّتْ للغناء على
طريقتها: أنا الأمُّ التي ولدتْهُ،
لكنَّ الرياحَ هِيَ التي رَبَّتْهُ.
قلتُ لآخري: لا تعتذر إلاّ لأمِّكْ![555]

এই কি তিনি?” বিবিধ হয়ে ওঠলো সাক্ষ্যগুলো:
হয়তো, যেনবা। আমিই করেছিলাম প্রশ্ন: “কে তিনি?”
তারা আমার উত্তর দেয়নি। আমি বরং শুনেছি অন্যের কণ্ঠ:
“তিনি কি সেই যে হয়ে উঠেছিল তুমি... আমি?” এরপর ঘুরে
গেল দৃষ্টি। আমার মায়ের দিকে তাকালো তারা যেন তিনি
সাক্ষ্য দেন– আমিই সে... অতঃপর আপন রীতিতে তৈরি হলেন
তিনি গান গাইবেন: আমিই মা যাকে তিনি দিলেন জন্ম। কিন্তু
তাকে বড় করে তুলেছে বাতাস।
আমি আমার অপরকে বলেছি:

মাহমুদ দারভীশ নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর নিজ দেশে এক নতুন ধরনের পরিস্থিতি উদযাপন করেন। কিছুটা বদলে যায় তার জীবন যাপন। কবি ব্যক্তিত্বে নতুনতরো পরিবর্তন দেখা যায়। অর্থাৎ নির্বাসিত জীবনের অভিজ্ঞতা আর দেশে এসে জীবনের যে চালচিত্র প্রত্যক্ষ করেন দুটো অবস্থার তুলনামূলক আত্মোপলব্ধি তাকে মূলত বদলে দেয়। নির্বাসিত জীবনকে তিনি অন্যমাত্রায় উপস্থাপন করতে শুরু করেন– যাতে তাকে নতুন করে তার কবিতার ভিশন, কাব্যবয়ান, প্রতীক, পুরাণ আর কবিতাকলা গড়ে তুলতে হয়। এতে করে তার জীবনে দুটি অভিজ্ঞতার ঘটনা ঘটে। পুরনো এবং নতুন। পুরনো অভিজ্ঞতা একটি নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখী করে তোলে তাকে। নতুন কালক্রমিক অবস্থার অনুধাবনে যেতে হয় তাকে যেখানে মৃত্যু-পরজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাদ তাকে ভাবিয়ে তোলে। এই দুই অভিজ্ঞতার এক নাম পুরনো সত্তা। আরেক নাম নতুন সত্তা।[৫৫৬] এর মানে কি দারভীশ মৃত্যু কিংবা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে ফেলেছেন? তবে তিনি তার নিজের জীবন এবং দখলকৃত মাতৃভূমির আপন জনগোষ্ঠীকে প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুবৎ পরিস্থিতির মধ্যেই যেতে হয় এবং সেই অবস্থার স্বাদ এবং গভীর উপলব্ধিই নতুন এক সত্ত্বায় রূপান্তরিত করে কবিকে। এমন ট্রাজিক পরিস্থিতি ফিলিস্তিনীদের জীবনে নিত্যদিনের ঘটনা। যে ঘটনা তাকে বিহ্বল করে তোলে। যেখানে রয়েছে হত্যা, গুম, বুলডোজার, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের ধ্বংসলীলা, উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া, পলায়ন-বিতাড়ন, দখলদারিত্ব, অনিশেষ ট্রমা–মানসিক অস্থিরতা, জীবন-জীবিকার নির্মম টানাপোড়েন। পুরনো

[৫৫৫]. দারভীশ, মাহমুদ, *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৬।
[৫৫৬]. মাহফুজ, হাদার, *দি পোয়েট্রি অব দারভীশ ইন দি ১৯৬০: হোমল্যান্ড এন্ড অ্যাক্সাইল* (অ্যারাব ওয়ার্ল্ড ইংলিশ জার্নাল, ভলিয়ম: ৫, সংখ্যা: ৩, আগস্ট ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৭০-৮১। ফ্রেড, আইজ্যাক, *পোয়েটিক্স অব অ্যাক্সাইল ইন দারভীশ এন্ড কাফকা* (পোয়েটিক্স এন্ড লিটারেচার সেমিনার, স্প্রিং ২০১৯), পৃ. ১-১০। ভিজিট: জুলাই ১৭, ২০২১, যঃঃঢ়ং://িি.ধপধফবসরধ.বফঁ/৪১৩৪৯৬৪১/চড়বঃরপংথড়ভথঊীরষবথরহথকধভশধথথধহফথউধৎরিংয,

অভিজ্ঞতা কিংবা পুরনো সত্তা তাকে এ অবস্থায় মুক্তি দিতে পারেনি। ফলে সেইসব পরিস্থিতি–অভিজ্ঞতার মোকাবেলা করতে গিয়েই তার কবিতার ডিকশন পাল্টে যায়। কবি তার পুরনো এবং নতুনতরো অবস্থার অভিজ্ঞানকে এভাবেই এক আন্তপাঠের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেন। প্রকাশ করেন একই পাঠে নিজেকে দুইভাগ করে পুরনো এবং নতুনসত্তা রূপে। নিজেকে মুখোমুখী করে তোলেন দুই অভিজ্ঞানে– দুই ভিন্ন সত্তায়।

৫.২.৪: আন্তপাঠ: প্রাচীন নগর ও সভ্যতা

অন্তর্পাঠ্যতায় দারভীশ নিজেকে ভেঙ্গেচুরে নতুন করে দেখতে চেয়েছেন। অন্তর্পাঠ্যতার এমন দৃষ্টান্ত দারভীশের প্রায় কবিতায় কোনো না কোনোভাবে হাজির রয়েছে। নিজের সত্তাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন পুরনো এবং নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে। তবে অন্যরকম দৃষ্টান্তও তার কবিতায় গড়ে উঠেছে। প্রাচীন সভ্যতা, নগর, বন্দর, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ইত্যাদি তার বহু কবিতায় স্থান পেয়েছে।

বেবিলন, মেসোপোটেমিয়া, সাদুম, মাজদালিয়া, লদ, আরীহা, ইত্যাদি সভ্যতার নাম এসেছে।

৫.২.৫: আন্তপাঠ: সাহিত্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিত্ব

তবে ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিত্বও কম সৃষ্টি হয়নি দারভীশের কলমের চারুকলাক্রিয়ায়। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব– অনেকেই তার কবিতার ডিসকোর্সে গড়ে উঠেছে নতুন দৃষ্টি মেলে। বিশেষত সাহিত্যিক চরিত্র ছিল তার কবিতার অন্যতম। যেখানে একেকজন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব তার কবিতার ভাষায় তার নির্মিত বয়ানের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছেন। এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্বের নাম একটি কবিতায় একসাথে গেঁথেছেন কবি দারভীশ। এদের দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত দারভীশ। তাদের কবিতা, দর্শন, চিন্তাভাবনা কিংবা কোনো বক্তব্যের ছাপ-চিহ্ন দারভীশের কবিতায় এসেছে। কিন্তু তা এসেছে শিল্পের চাদর জড়িয়ে– তুলির আঁছড়ে ফুটে ওঠা নতুন দৃষ্টি হয়ে– স্থপতির হাতে আঁকা এক ভিন্ন স্থাপত্যরেখা হয়ে কিংবা কোনো শিল্পীর নয়া সুর হয়ে– যেখানে সেইসব ব্যক্তিত্বের পুরনো অভিজ্ঞতার প্রতিধ্বনি এবং চিহ্ন ভেসে ওঠে। কবিতায় বাহিত ভাবও এমন চিহ্ন যা কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। মানুষের ইতিহাসের প্রাচীনতার সাথে কবিতার প্রাচীনতাও জড়িয়ে আছে। কবিতা এতোটা গভীর এবং এতোটা বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ যে, তার শেষ করা যায় না– যেখানে কবিতা তৈরি করে রাখে অসংখ্য দরোজা। সেইসব দরোজা বন্ধ হয়েও অস্তিত্বমান থাকে। কারণ তা খুলেই পরবর্তী কবিরা উন্মোচিত করে আরো কোনো ভিন্ন জগত। এবং সেখানেও তৈরি হয় অনেক অনেক দরোজা। কবিতা তৈরি করে এমন এক ভাব ও সৌন্দর্য্যের পরম্পরা যা তার পরবর্তী প্রজন্মকে স্পর্শ করে যায়। দারভীশ বলেন...

لا تعتذرْ عمَّا فَعَلْتَ – أَقول في
سرّي. أقول لآخَرِي الشخصيِّ:
ها هِيَ ذكرياتُكَ كُلُّها مرئِيِّةٌ:
ضَجَرُ الظهيرة في نُعَاس القطِّ/
عُرْفُ الديكِ/
عطرُ المريميَّةِ/
قهوةُ الأمّ /
الحصيرةُ والوسائدُ/
بابُ غُرفَتِكَ الحديديُّ/
الذبابةُ حول سقراطَ/
السحابةُ فوق أفلاطونَ/
ديوانُ الحماسةِ/
صورةُ الأبِ/
مُعْجَمُ البلدانِ/
شيكسبير/[557]

৫.২.৬: ইমরুল কায়েস

অন্তর্পাঠ্যতার এমন নজির কবি ইমরুল কায়েস। প্রাচীন– একইসাথে ক্ল্যাসিক অভিজ্ঞতা আর নতুনের মিলিত আকারে যে চেষ্টা দারভীশের নিরন্তর কাব্যযাত্রায় এসে মিশে গেছে তার এক নাম ইমরুল কায়েস। ইমরুল কায়েস থেকে যেমন নন্দনতাত্ত্বিক কলাকৌশল রপ্ত করা যায় তেমনি তার জীবন থেকে আহরণ করা যায় ভাবনা-চিন্তার খোরাকও। তা হতে পারে দার্শনিক কিংবা হতে পারে রাজনৈতিক। কিন্তু ইমরুল কায়েসের জীবনের এমন কি উপাদান দারভীশকে এতোটা ভাবিয়ে তুলেছিল যা তাকে ঋদ্ধ করেছে তুমুলভাবে? ইমরুল কায়েসের কবিতা যতোটা দারভীশকে ভাবিয়েছিল তার চেয়ে বরং ভাবিয়েছিল ইমরুল কায়েসের যাপিত জীবনের স্বভাব ও মনোস্তত্ত্ব। ইমরুল কায়েস ছিলেন মূলত গোত্রভিত্তিক এক রাজবংশের রাজকুমার। আরব জাহিলী যুগের ক্ষমতাশালী কিন্দা গোত্রের সন্তান ছিলেন কবি কায়েস। শত্রুবংশ বনু আব্বাসের সাথে যুদ্ধে করে তার বাবা নিহত হওয়ার পর তার রাজবংশের রাজক্ষমতা ও আধিপত্যও বেদখল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত দায় এসে পড়েছিল কবি ইমরুল কায়েসের উপর। কিন্তু ক্ষমতা কিভাবে পুনরুদ্ধার করবে কবি কায়েস? যিনি রাজক্ষমতা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়– কিভাবে তার অভ্যন্তর ও বাহিরের শত্রু মোকাবেলা করে নিজের সিংহাসন ও ক্ষমতাধীন ভূগোল ও গোত্রপরিধি রক্ষা করতে হয় সেই কৌশল ও রাজনীতির জ্ঞান সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। যিনি ছিলেন

---

[৫৫৭] দারভীশ, মাহমুদ, *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা ২০০৪*, পৃ. ২৫-২৬।

নিছক একজন কবি। কায়েস অনেকভাবে চেষ্টা করেছিলেন তার হারানো রাজক্ষমতা এবং পরাধীন জাতিকে পুনরুদ্ধারের। শেষপর্যন্ত তিনি রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যেকারণে তাকে الملكِ الضـــلّيل ক্ষমতা হারানো রাজা বলা হতো।[৫৫৮] ক্ষমতা হারিয়ে এবং ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ে জিততে না পেরে একসময় তার অপমৃত্যু হয়। ধারণা করা হয় তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। রাজনৈতিকভাবে কেন তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন তার অনেক ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। এরমধ্যে বহুল প্রচলিত একটি ব্যাখ্যা ছিল, ইমরুল কায়েসের মধ্যে একধরনের ঘরবিমুখ কিংবা ভবঘুরে বৈশিষ্ট্য ছিল। যেকারণে তাকে ভবঘুরে রাজা (الملك التائه) বলা হতো। এ ব্যাখ্যা কতোটা যৌক্তিক– বা কতোটা প্রমাণসাপেক্ষ তা বলা মুশকিল হলেও তবে তিনি তার বাবার সময়ে রাজনীতি কিংবা রাজকার্যাবলী বিষয়ক সম্পর্কগুলো থেকে দূরে থাকতেন বলে যে ব্যাখ্যা প্রচলিত রয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ।[৫৫৯] যেকারণে তার বাবার সাথে তার সম্পর্ক ভালো ছিলনা। যাইহোক একটা সময়ে রাজক্ষমতা হারানোর বেদনা তাকে যে কষ্ট ও যাতনা দিয়েছিল তা এক প্রকার ক্ষমতা থেকে নির্বাসিত হওয়ার মতো একটা ব্যাপার ছিল। ইমরুল কায়েসের জন্য ক্ষমতা থেকে বিচ্ছেদের ঘটনা দেশ থেকে বিতাড়িত এবং নির্বাসিত হওয়ার চেয়ে কম ছিলনা। ইমরুল কায়েস বলেন,

أجارتنا إنا غريبان هاهنا * وكل غريب للغريب نسيب[৫৬০]

আমাদের রক্ষা হয়েছে, আমরা ভিনদেশি ভবঘুরে আগন্তুক
তবু আগন্তুকের সাথে রয়েছে আগন্তুকের সম্পর্ক

তবে দারভীশের কাছে এ ঘটনা অন্যভাবে নয়– বরং আরো ব্যাপকতরো হয়ে উপস্থিত হয়। দারভীশ যেমন তার নিজের সত্তার সাথে তুলনা করতে চেয়েছেন তেমনি চেয়েছেন তার মধ্যদিয়ে তার জাতির নির্বাসিত জনমানুষের সত্তা সাথে। মোটকথা দারভীশ এ ঘটনার উপলব্ধি তার জীবনের সাথে মিলিয়ে যেমন পাঠ করতে চেয়েছেন তেমনি পাঠ করতে চেয়েছেন ফিলিস্তিন এবং নির্বাসিত ফিলিস্তিনীদের জীবনের সাথে মিলিয়ে– যেখানে বস্তুত দুটি সত্তা দুইভাবে হাজির হয় তার কবিতায়। একদিকে নির্বাসিত জীবন অপরদিকে তার হারানো স্বদেশ। একদিকে তার নির্বাসিত সত্তা অপরদিকে তার জাতিসত্তা। দারভীশ বলেন,

ياسمي : سوف تكبَرُ حين أَكبَرُ
سوف تحمِلُني وأَحملُكَ
الغريبُ أَخُ الغريب[561]

[৫৫৮]. ফাখুরী, হান্না, ১৯৫৩, পৃ.।

[৫৫৯]. জে. ফেসবার্গ, টেড্ডি, *দি গ্রিক ডেথ অব ইমরু' আল কায়স* (জার্নাল অব দি আমেরিকান অরিয়েন্টাল সোসাইটি, ভলিয়ম: ১৪০, সংখ্যা: ২, এপ্রিল-জুন ২০২০), পৃ. ৪১৫-৪৩৩।

[৫৬০]. আল কায়স, ইমরু, *দীওয়ানু ইমরু আল কায়স*, ব্যাখ্যা-রিভিউ: আব্দুর রহমান আল মুস্তাবী (বৈরুত: দার আল মা'রিফাহ লি আল তবাআহ, ওয়া আল নাশার ওয়া আল তাওজী', ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮৩।

[৫৬১]. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ* ২০০০, পৃ. ৪।

হে নাম, শিগগির তুমি বড় হয়ে যাবে, যখন আমি বড় হবো
আমাকে তুমি বয়ে বেড়াবে, আমিও বহন করবো তোমায়
এক ভিনদেশি যেন আরেক ভিনদেশির ভাই।

কিংবা,

كلابُنا
هَدَأَتْ . وماعِزُنا توشَّح بالضباب على
التلال . وشجَّ سَهْمٌ طائش وَجْهَ
اليقين . تعبتُ من لغتي تقول ولا
تقولُ على ظهور الخيل ماذا يصنعُ
الماضي بأَيَّامِ امرئ القيس المُوَزَّعِ
بين قافيةٍ وقَيْصَرَ .../[562]

শান্ত হয়ে গেছে
আমাদের কুকুরগুলো। ছাগলটি আমাদের পাহাদের পাদদেশে
গায়ে দিয়েছে কুয়াশার চাদর। এক তীরের ফলক
ক্ষতবিক্ষত করেছে নিশ্চয়তার মুখাবয়ব।
আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমার ভাষায়, বলে সে। তবে বলেনি
সে কায়সার আর অন্ত্যমিলের মাঝে ভাগ হয়ে যাওয়া
ইমরুল কায়েসের দিনগুলি নিয়ে কি করছে তার অতীত?.../

তবে দারভীশ এই নির্বাসনের ধারণাকে ব্যাপকতরো এবং গভীরতরো এক অর্থময়তার দিকে নিয়ে গেছেন তার কবিতার মধ্যদিয়ে। নির্বাসন থেকে অদৃশ্যতা–গায়েব–অধরা এমন ধারণার মাধ্যমে যে কাব্য বয়ান দারভীশের মধ্যে দেখা যায় তা নানাভাবে নানান মাত্রায় উপস্থিতি তৈরি করেছে তার কবিতা এবং তার ভাবনার জগতজুড়ে। এমন ভাবনা বিভিন্নভাবে ধরা দেয় তার কবিতায়। তবে আন্তপাঠের মতো কবিতার শিল্প-প্রক্রিয়ায় এ ভাবনার আরেক বাহক হয়ে উঠেন লাবিদ ইবনে রাবিআ।

---

৫৬২. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৪-৩৫।

৫.২.৭: লাবিদ ইবনে আবি রাবীআ

লাবিদ ছিলেন জাহিলী কবিতার খ্যাতিমান কবি। সাবআ মুআল্লাকার সাত কবির অন্যতম প্রধান কবি তিনি। লাবিদের কবিতায় কখনো কখনো জীবনঘনিষ্ট দার্শনিক ভাবনাবিন্দু উঁকিঝুঁকি দিতো রীতিসিদ্ধ কবিতার মাত্রা-ছন্দ ও অলঙ্কারের চাদর ভেদ করে। তার কবিতায় যেমন আশাবাদ ছিল তেমনি ছিল হতাশার মতো জীবনের স্বাভাবিক উপাদান। একসময় নবী মুহাম্মদ স. এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি। তিনি পবিত্র কোরআন পাঠ করে খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কোরাআন পাঠের অভিজ্ঞতা তাকে এতো বেশি ভাবনা ও ধ্যান কাতর করেছিল যে, এক পর্যায়ে তিনি তার কাব্যচর্চারও ক্ষান্তি দেন। কোরআন তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। কোরআন পাঠের মধ্যদিয়ে জীবন ও বিশ্বজগত সম্পর্কিত ভাবনা তাকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল।[৫৬৩] তার পূর্বের জীবন প্রক্রিয়া, জীবন দর্শন সব মুহূর্তে তছনছ হয়ে গিয়েছিল কোরআনে মগ্ন হওয়ার পর। ইসলাম গ্রহণের পর নতুন যে অভিজ্ঞতার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন কবি লাবিদ তা অবগাহণ করেই একবার দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন তিনি,

ألا كل شيء ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل[৫৬৪]

জেনে রাখো আল্লাহ ছাড়া সবকিছু নিরর্থক, অসার
সব নেয়ামত-সুখ-প্রাচুর্যের ধ্বংস অনিবার্য অনিবার

এ বিখ্যাত কবিতার পাঠ দারভীশের জীবনেও প্রভাব ফেলেছিল। লাবিদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবাহিত হয়েছে দারভীশীয় কবিতার পন্থায়। লাবিদের জীবন সম্পর্কিত এমন তীব্র সত্য দারভীশ এড়িয়ে যেতে পারেননি। যে নশ্বরতা-অবিনশ্বরতার ধারণা লাবিদের কাছ থেকে পাঠ করতে হয়েছে দারভীশের কাছে তার প্রকাশ ভিন্নভঙ্গিতে– অন্যভাষায় উচ্চারিত হয়েছে বটে।

وانتظرْ
ولداً سيحمل عنك رُوحَكَ
فالخلودُ هُوَ التَّنَاسُلُ في الوجود .
وكُلُّ شيءٍ باطلٌ أو زائل ، أو

---

[৫৬৩]. জাবার আবু আরীবান, হামেদ মুহাম্মদ, *লাবীদ বিন রাবীআহ: হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু* (কায়রো: জামেআ আল আজহার, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ১৯-৭১।
[৫৬৪]. বিন রাবীআহ আল আমীরী, লাবীদ, *দীওয়ানু লাবীন বিন রাবীআহ আল আমীরী* (বৈরুত: দার ছাদির, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৩২।

زائل أو باطلٌ][565]

অপেক্ষা করো
এমন সন্তানের, যে বয়ে যাবে তোমার থেকে তোমার আত্মা
অতএব চিরন্তনতা হলো বস্তুত সত্তার ভিতর অধিপ্রজনন
এবং সবকিছু বাতিল-নিরর্থক, অপসৃয়মান
অথবা অপসৃয়মান অথবা বাতিল-নিরর্থক

লাবিদ যে অর্থে অবিনশ্বরতা কিংবা চিরন্তনতার ধারণা পোষণ করেছিলেন সে অর্থে দারভীশের প্রকাশ ঘটেনি। দারভীশ বেশি কাব্যময়তার মধ্যে চিরন্তনতার ধারণা প্রকাশ করায় একটি বিমূর্ত অর্থ তৈরি হয়েছে। যেটি খুব পরিষ্কার নয়। যদিও এখানে চিরন্তনতার ধারণা বিশ্লেষণের অবকাশ নেই তবে প্রাসঙ্গিক কারণে বলা যায়, লাবিদ একেবারে পরিষ্কার ছিলেন। যেখানে লাবিদ আল্লাহকে স্থান দিয়েছেন ঠিক সেখানেই দারভীশের কবিতার চাদর আবৃত হয়ে আছে। চিরন্তনতা বরং কিভাবে ঘটে এবং কিভাবে মানুষের রূহানিয়্যাতের মধ্যে বসত করে দারভীশ তাই বলতে চেয়েছেন একেবারে নিজের ভঙ্গিতে। অন্যভাবে বলা যায়, দারভীশের কাছে আত্মাতত্ত্বের ধারণা বিশুদ্ধ ইসলামের পরম্পরাগুলো থেকে যতোটা এসেছে বরং তার চেয়ে কবিতা, শিল্প-সাহিত্য, লোক-ঐতিহ্য-পুরাণ কিংবা সাংস্কৃতিক নানা উপাদান পাঠ করে দারভীশ তার বিশ্বজগত এবং আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা গড়ে তুলেছেন। তদুপরি দারভীশ লাবিদের উছিলায়– কিংবা লাবিদের ভাবনার পরম্পরায় নিজেকে যুক্ত করে নিজের ভাব–ভাষা ব্যক্ত করেছেন আন্তপাঠের এক নতুন ব্যাঞ্জনায়।

৫.২.৮: তারফা বিন আল-আবদ

মাহমুদ দারভীশ তার জিদারিয়্যা কাব্যগ্রন্থে যেসব চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার মধ্যে মৃত্যুচিন্তা গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যু তার ভাষায় বহুমাত্রিকতায় উপস্থাপিত হয়েছে। আরব সংস্কৃতি এবং আরব জ্ঞানের ঐতিহ্যে মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তাধারা কিংবা কবিতা-সাহিত্যে যেভাবে হাজির রয়েছে তার মাঝেই তিনি মৃত্যুভাবনার পাঠ গ্রহণ করেছেন। যাদের থেকে তিনি নিয়েছেন কিংবা প্রভাবিত হয়েছেন তাদের মধ্যে কবি ত্বরাফা বিন আল আবদ ছিলেন অন্যতম।[৫৬৬] ত্বরাফা সাবআ মুআল্লাকার অন্যতম খ্যাতিমান কবি ছিলেন। মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনার জন্য ত্বরাফার কবিতা এক ক্ল্যাসিক অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিল আরবের জ্ঞানভাণ্ডারে। তবে দারভীশের ত্বরাফার কবিতার শরণাপন্ন হওয়ার অন্যকারণ রয়েছে। ত্বরাফার এক ঐতিহাসিক ঘটনা দারভীশকে ভাবিয়েছিল। তরাফা জাহিলী যুগের তৎকালীন আল হিরার শাসক আমর বিন হিন্দ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডাদেশের মুখোমুখি হন। আমর বিন হিন্দ সে

[৫৬৫]. দারভীশ, মাহমুদ, জিদারিয়্যাহ ২০০০, পৃ. ৪২।
[৫৬৬]. মারওয়া, জাওয়াদা ও বিদাত জাহরা, জামালিয়্যাত আল তানাছ ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ: ক্বিরাআতুন ফী নামাজিয (আলজেরিয়া: ভাষা ও আরবী সাহিত্য বিভাগ, জামেআ মুহামেদ বোজিয়াফ আল মাসিলা, ২০২০), পৃ. ৯৬-৯৮।

সময়ের বাহরাইন দ্বীপরাষ্ট্রের শাসক আজাদ ফিরোজকে পত্রমাধ্যমে এই হত্যাদেশ দিয়েছিলেন। কারণ উমর বিন হিন্দকে নিয়ে প্রচুর ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করায় উমর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন কবি ত্বরাফার প্রতি। বাহরাইনে পৌঁছালে ত্বরাফার সহযাত্রী কবি মুতালাম্মিস পালিয়ে গেলেও ত্বরাফা পালাননি। দরবারে পৌঁছানোর পর আজাদ ফিরোজ তাকে বললেন, আমি তোমার ইচ্ছামতোই তোমাকে হত্যা করবো। তবে মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছা কি জানতে চাইলে জবাবে ত্বরাফা প্রচুর মদ খেতে চেয়েছিলেন। এবং মদ পান করে জ্ঞানহারা হলে তার পায়ের রগ যেন কেটে দেয়া হয় এমন ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছিলেন কবি।[৫৬৭] শেষপর্যন্ত তাকে বন্দি করা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়। ত্বরাফা খুব অল্প সময় বেঁচে ছিলেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর। তার দিওয়ান বা কাব্যসংকলনও মাত্র একটি। মুআল্লাকায় স্থান করে নিয়েছিল এ কবিতা। কিন্তু তাতেই তিনি তার কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তার কবিতা ছিল জীবন সম্পর্কিত অতিব বাস্তবতার নিরিখে রচিত এক কাব্যগাথা। যেখানে জীবনের অসারতা, নিরর্থ ব্যাঞ্জনা ফুটে উঠেছে। যেহেতু জীবনের কথা এসেছে– হতাশাবাদে আক্রান্ত অস্তিত্ববাদীদের ধারণাও এসেছে। যেখানে তার বিপরীতে মৃত্যুর ভাবনাও উসকিয়ে ওঠে। এ কবিতায় মৃত্যু সম্পর্কিত ত্বরাফার অভিব্যক্তি থেকে দারভীশ তার ভাবনার খোরাক কুড়িয়েছেন। তবে ত্বরাফা তার স্বল্পায়ুষ্কালে জীবনের নির্মম বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবিতার মগ্নতা জীবনবোধের মগ্নতাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। একধরনের অস্তিবাদী যাপনের মধ্যেও জীবনের সৌন্দর্য্য সন্ধান করে গেছেন ত্বরাফা। তার কবিতার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে সেইসব ইঙ্গিত যেন বাঙময় হয়ে ওঠে।

يشق حباب الماء حيزومها بها   كما قسم الترب المفايل باليد[৫৬৮]

জাহাজের শীর্ষবিন্দু ঘেঁষে বিদীর্ণ হয়ে যায় জলতরঙ্গ
খেলোয়াড় যেমন তার হাত দিয়ে দুভাগ করে নেয় পুঞ্জিভূত বালুকারাশি

জীবনকে যেন খুব কাছে থেকে গভীরভাবে দেখেছেন কবি। নিখুঁত হাতের আঁচড়ে জীবনের করুণ বাস্তবতাকে কবি এঁকেছেন নিবিড় প্রতীক আর ঘনরূপকের রঙ মেখে। ত্বরাফা যতোটা বাস্তববাদী জীবনকে দেখার এবং প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ততোটা খোলাখুলি ছিলেননা। শিল্পের দাবি কোনোভাবেই যেন জীবনঘনিষ্টতার ছুতায় এড়িয়ে যাবার জিনিস নয়। কবিতায় তিনি তাই খুব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বয়সের স্বল্পতার চেয়ে ভাষা ও জীবনবোধে ত্বরাফা অসাধারণ কামেল হয়ে উঠেছিলেন। গভীর প্রজ্ঞাদীপ্ত ভাষা ও বক্তব্যের কারণে দার্শনিক অভিজ্ঞানে অভিষিক্ত হয়ে ওঠেন ত্বরাফা আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে। আরবী কবিতায় যারা দার্শনিক রূপ নির্মাণ করেছিলেন তাদের অন্যতম

[৫৬৭]. নিকলসন, রেইনলড আ, *আ লিটারেরি হিস্ট্রি অব দি অ্যারাবস* (লন্ডন: টি. ফিশার আনউইন, আডেলফি তেরাস, ১৯০৭ খ্রি.), পৃ. ১০৭-১০৮।
[৫৬৮]. তুরফা বিন আল আবদ, *দীওয়ানু তুরফাহ বিন আল আবদ*– ব্যাখ্যা ও ভূমিকা: মাহদী মুহাম্মদ নাছের আল দীন (বৈরুত: দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৯।

ত্বরাফা।[৫৬৯] তাই আরবী কবিতার ইতিহাস এবং আরবের জীবন-সংস্কৃতি ত্বরাফাকে ভুলে যেতে পারেনি। ত্বরাফা বলেন,

جنوح دفاق عندل ثم افرعت لها كتفاها في معالي مصعد[570]

সে দুলছিল, তার জাতি যেন হঠকারী–আবেগী, মাথা তার বেশ শক্তিশালী। অনেক উচ্চতা ছুঁয়ে গেছে যেন তার দু কাঁধ।

ত্বরাফা দৃশ্যত তার প্রিয় উঁটের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিলেন মুআল্লাকার শেষ পঙক্তিগুলোতে। প্রথম পাঠে মনে হয়, যেন তিনি তৎকালীন জাহিলী কবিতার কাঠামো ও গঠনশৈলী অনুযায়ী প্রিয়তমার গুণ কীর্তন করে যাচ্ছেন কবিতার ভাষায়। কিন্তু উঁট যেখানে মূলত তার জাতি-গোত্রের রূপক হয়ে ওঠে এ কবিতায়। তার জাতি ও গোত্রের করুণ এক চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। এমন নিবিড় প্রতীকী ব্যঞ্জনায় কবিতার ভাষাকে একটি বিশেষ সময়কালের বিশেষ মানুষদের জীবনের রূপায়ণ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন কবি ত্বরাফা।

أري العيش كنزا ناقصا كل ليلة   * وما تنقص الأيام والدهر ينفذ[৫৭১]

ত্বরাফার এসব পঙক্তিই দারভীশকে আন্দোলিত করেছিল। দারভীশ বলেন,

هل يُعيدونَ الحكايةَ ؟ ما البدايةُ ؟
ما النهايةُ ؟ لم يعد أَحَدٌ من
الموتى ليخبرنا الحقيقة ... /
أَيُّها الموتُ انتظرني خارج الأرض ،
انتظرني في بلادِكَ ، ريثما أُنهي
حديثاً عابراً مَعَ ما تبقَّى من حياتي

[৫৬৯]. আল ফাখুরী, হান্না, *তারীখ আল আদাব আল আরাবী* (বৈরুতঃ আল মাতবায়া আল বুলসিয়া, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ১০৮-১১৩। আল শানকীতী, আহমদ বিন আল আমীন, *আল মুআল্লাকাত আল আশার ওয়া আখবারু শুআরায়িহা* (যুক্তরাজ্যঃ হিনদাবি ফাউন্ডেশন সিআইসি, ২০১৮ খ্রি.),
[৫৭০]. তুরফা বিন আল আবদ, দীওয়ানু তুরফাহ বিন আল আবদ, পৃ. ২২।
[৫৭১]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬।

قرب خيمتكَ ، انتظِرْني ريثما أُنهي
قراءةَ طَرْفَةَ بنِ العَبْد[572]

সেই গল্প বয়ান কি তারা ফেরৎ নিয়ে আসছে? সূচনা কি?
শেষ কি? সত্য-রহস্যটা আমাদেরকে প্রকাশ করতে
মৃতদের ভিতর থেকে তো কেউ আর ফিরে আসেনি।

পৃথিবীর বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করো হে মৃত্যু!
অপেক্ষা করো আমার জন্য তোমার স্বদেশে
যতোক্ষণ না তোমার তাঁবুর কাছে পড়ে থাকা আমার বাকি জীবনের সাথে
পূর্ণ করে তুলি চলমান বর্তমান
অপেক্ষা করো আমার জন্য
যতোক্ষণ না ত্বরাফা বিন আল আবদকে পাঠ করা শেষ করি।

এই পাঠ কেমন? কিংবা সেই গল্প– সেই বয়ান যা আবার নিয়ে আসতে হবে আরবের সংস্কৃতিতে? ফিলিস্তিনীদের জীবনের কাছে? সেই বয়ান গড়ে তোলার পাঠ শেষ না করা পর্যন্ত মৃত্যু চান না দারভীশ। মাত্র ছাব্বিশ বছরের ক্ষণিকের সুযোগ দিয়ে মৃত্যু যেমন ত্বরাফাকে নিয়ে যায়– সেই মৃত্যু দারভীশ তার জীবনে– তার স্বদেশের জন্য কামনা করতে পারেন না। ত্বরাফার মৃত্যুর ঘটনা দারভীশকে এমন উপলব্ধির গভীরে ফেলে দিয়েছিল এই কারণে যে, দারভীশ এমন একটি পাঠ– এমন একটি বয়ান গড়ে তুলতে চান যা তার জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করতে সক্ষম। কিন্তু মৃত্যুর অনিবার্যতা দারভীশের সেই বয়ান নির্মাণের অপেক্ষা হয়ে থাকতে পারে কিনা বলা বেশ কঠিন।

৫.২.৯: আবুল আলা আল মাআরি

আন্তপাঠের অভিজ্ঞতা দারভীশকে সমৃদ্ধ করেছে নিসন্দেহে। অন্তর্পাঠ্যতার চর্চা কবিতা ও সাহিত্যের একটি বিশেষ অনুষঙ্গ হলেও তার সৃজনশীল মূল্য তৈরি করা সহজ কাজ নয়। জ্ঞান ও ভাবুকতার পূর্বকালীন ধারাকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত করার চেষ্টাগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে অন্তর্পাঠ্যতা বিশেষ স্থান করে আছে। আরবীয় জ্ঞান, কাব্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের এই ধারাবাহিকতায় শক্তিশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম হলেন কবি ও দার্শনিক আবুল আলা আল মাআরি।[৫৭৩] দারভীশের কাব্যিক ও জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতার শিল্পোন্নত প্রকাশে আল মাআরির পাঠসূত্র গুরুত্বপূর্ণ। আব্বাসীয় যুগের সাহিত্য ও চিন্তার ইতিহাসে আল মাআরির অবস্থান ও প্রভাব খুব গভীর ও শক্তিশালী। আল মাআরির দর্শনচিন্তার পুনর্বয়ানের চেষ্টা দেখা যায় দারভীশের কবিতায়। আল মাআরি

৫৭২. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ* ২০০০, পৃ. ২১।
৫৭৩. আল ফাখুরী, হান্না, *তারীখ আল আদাব আল আরাবী* ১৯৫৩, পৃ. ৬৮৭-৭০৬।

ছিলেন দৃষ্টিহীন। অন্ধ হলেও তার দেখার চোখ ছিল বিশেষ। দৃষ্টিশক্তিতে ভরপুর ছিলেন আল মাআরি। অন্তর্দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এমন কবি ও ভাবুক ব্যক্তিত্বের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। দারভীশের কবিতায় যেকারণে আল মাআরির প্রকাশ ছিল প্রাসঙ্গিক। ধর্মের সমালোচনা, পাপ-পুণ্য, মৃত্যু-নৈরাশ্যদর্শন, ধর্মতত্ত্ব, নৈতিকদর্শন ইত্যাদি ছিল আল মাআরির চিন্তার ক্ষেত্র। এছাড়া মৃত্যুচিন্তা আল মাআরির দর্শন ও চিন্তার একটি বিশেষ দিক ছিল যেটা দারভীশকে প্রভাবিত করেছিল। তেমনি আল মাআরির ব্যক্তিজীবনও দারভীশের জীবনে আছর ফেলে। দারভীশ একাধিক বিয়ে করেও আল মাআরির মতো নিঃসন্তান ছিলেন। আল মাআরি সন্তান জন্মদান সমর্থন করতেন না। যেকারণে তিনি বিয়ে করেননি। যাইহোক, ব্যক্তিজীবনের বাইরে চিন্তা ও ভাবনা কি করে একজন মানবসত্তায় গড়ে উঠতে পারে তার সূত্র ও সম্পর্কগুলো আল মাআরিকে পাঠ করার মধ্যদিয়ে গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞানীয় পরিমণ্ডলে মাআরির নিখুঁত ব্যাজস্তুতি ছিল আরেক শক্তিশালী প্রসঙ্গ। দারভীশের এ ছিল অন্যপাঠ– যা তাকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

كذب الظن لا إمام سوي العقل مشيرا في صبحه و المساء
فإذا أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء[574]
أيها الغر إن خصصت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي[575]

মানুষ বড় মিথ্যা বলে সকাল সন্ধায়
বিবেক ছাড়া তার আর কোনো ইমাম নেই
হে আকস্মিকতা যদি তুমি বিবেক সম্পন্ন হও
তবে আমি তার অর্জনে প্রার্থনা করি
বস্তুত প্রতিটি বিবেকই একজন নবী

দারভীশ বলেন,

رأيت المعريَّ يطرد نُقَّادَهُ
من قصيدتِهِ :
لستُ أَعمى
لأُبْصِرَ ما تبصرونْ ،
فإنَّ البصيرةَ نورٌ يؤدِّي
إلى عَدَمٍ أَو جُنُونْ[৫৭৬]

---

[৫৭৪]. আল মা'আরি, আবু আল আলা', *আল লুজুমিয়্যাত (১ম খণ্ড)*–বিশ্লেষণ: আমীন আব্দুল আজীজ আল খাঞ্জি (বৈরুত: মাকতাবাহ আল হিলাল, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৫৫।

[৫৭৫]. আল মা'আরি, আবু আল আলা', *আল লুজুমিয়্যাত (২য় খণ্ড)*, পৃ. ৪৩৯।

[৫৭৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ* ২০০০, পৃ. ১৩।

৫.২.১০: আবু তাম্মাম

পুরনো অভিজ্ঞতা নতুন অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যে ভাব-ভাষা ও অর্থ তৈরির প্রয়াস ছিল দারভীশের সেই ভাষা-ডিসকোর্সে কার্যকর ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবু তাম্মাম।[৫৭৭] একজন মধ্যযুগীয় আরব কবি। আরবী কবিতায় যারা ভাবুকতা এবং প্রজ্ঞাময় ভাষার সৌকর্যে আলোর বৃক্ষ রোপন করে গেছেন তাদের মধ্যে আবু তাম্মামের অবস্থান ছিল ঈর্ষণীয়। তার কবিতায় ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পথে পরিভ্রমণের এক অদৃশ্য শক্তি। তার কবিতায় এক অধরা ভাবনার ইঙ্গিত ছিল বেশ তীক্ষ্ম। নিজের অবস্থান এবং পূর্বস্মৃতি– দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান ঘটিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন তিনি। অর্থাৎ ভাবের জগতে ভ্রমণ কিংবা ডুব দেয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেটাকে অতিক্রম করে যাওয়া একটি বিশেষ সক্ষমতার ব্যাপার। কোনো একটি জ্ঞানীয় কিংবা ভাবুকতার প্রশ্নে পূর্বাবস্থান বিস্মৃত হয়ে যাওয়া মানে অতিক্রম করে যাওয়া জরুরি প্রশ্ন অবশ্যই। আবু তাম্মাম সেই দিকে নজর ফিরাতে পাঠককে বাধ্য করতে সক্ষম ছিলেন। আবু তাম্মাম বিষয়ক এমন পাঠ দারভীশকে নতুন করে উন্মোচিত করতে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে নিসন্দেহে। দারভীশের দেশত্যাগ এবং একইসাথে নির্বাসিত জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশের নতুনতরো উপাদান খুঁজে নিয়েছেন আবু তাম্মামকে পাঠ করার মধ্যদিয়ে। তাম্মাম বলেন,

وغربت حتي لم أجد ذكري مشرق
وشرقت حتي قد نسيت المغاربا[৫৭৮]

আমি পশ্চিমে পৌঁছাই যখন হারাই প্রাচ্যের স্মৃতি
প্রাচ্যে উপনীত হই যখন ভুলে যাই পশ্চিম।

দারভীশের কাছে ছিল এটি একটি ঘটনা। একটি জ্ঞান ও চিন্তার ইতিহাস। একটি দেশকালে অবস্থান করে কিভাবে নাই হয়ে যাওয়া যায় সেই অভিজ্ঞতাময় ঘটনার আত্মমগ্নজাত প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়। ফিলিস্তিন ছিল তার এমন পরিভ্রমণের নগদ পুজি। একদিকে আপনভূমি ফিলিস্তিন ত্যাগ করতে হয়েছে। অপরদিকে অবস্থান করতে হয়েছে পরদেশে নির্বাসনে। জীবনের এমন অভিজ্ঞতাকে অন্য এক দার্শনিক প্রশ্নের মুখোমুখি করে তুলেছিল তাকে। নিজের একটি অবস্থান কখন কিভাবে নাই হয়ে যায়। বিপরীতে অপর একটি অবস্থানে ঠাঁই নিয়ে তাকেও আবার ভুলে যাওয়া যায় কি করে সেইসব ভাবনাকে এক জায়গায় গেঁথেছেন দারভীশ। যেন এক অধিবাস্তবতাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তার মধ্যে অবগাহন করে চলেছেন কবি।

---

[৫৭৭]. ইসা, আব্দেল খালেক ও আব্দেল কারীম দারাগমেহ, *আসপেক্টস অব ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি ইন দ্য মাহমুদ দারভীশে'স পোয়েট্রি কালেকশন "ডু নট অ্যাপোলোজাইজ ফর হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান"* (ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অন স্টাডিজ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচার, ভলিওম: ৬, ইস্যু: ২, ফেব্রুয়ারি ২০১৮), পৃ. ২৮।
[৫৭৮].

তবে আবু তাম্মামের পরিভ্রমণ যখন নিজের সত্তাকে নতুনভাবে উন্মোচন করে তুলতে পারে তখন তার আপনসত্তা এমনকি নিজের বিদ্যমান বসতঘরও যেন নাই হয়ে যায়। তাম্মাম মনে করেন, দীর্ঘ সময় পরিভ্রমণের পর সেই ঘর – যেখানে সত্তার বসতি– আপনভুবন– তাকে যেন কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হয়ে যেত হয়। যে বিস্মৃতি নিজেকে চেনার অন্য এক তরিকা হয়ে উঠতে পারে। আবু তাম্মাম বলেন,

لا أنت أنت
ولا الديار ديار[৫৭৯]

তমি নও তুমি
বাড়ি নয় বাড়ি

আবু তাম্মামের অভিজ্ঞতা যখন জারিত হয় দারভীশের মধ্যদিয়ে তার আন্তপাঠ কেমন হতে পারে? একই উপলব্ধি একই মগ্নতা যেন দারভীশকেও ডুবিয়ে দিয়ে গেছে তুমুলভাবে। আপন মাটি–আপন ভূমি থেকে তাড়িত হওয়ার ঘটনা কিভাবে নিজেকে দেখার প্রক্রিয়ায় নতুন ভাবনার উপাদান তৈরি করে দিতে পারে আবু তাম্মাম থেকে তারই পাঠ নিয়েছিলেন কবি দারভীশ। দারভীশ বলেন,

والأن لا أنا أنا
ولا البيت بيتي[৫৮০]

এবং আমি নই আমি
এবং ঘর নয় আমার ঘর

একই ভাবনা–একই চিন্তার সূত্র-পরিক্রমা যেন অন্য সীমান্তেও ঠাঁই নিয়েছে। যে ভাবনা– যে ছন্দের অববাহিকা আবু তাম্মামের মাধ্যমে বাহিত হয় স্পেনের প্রখ্যাত বিপ্লবী কবি লোরকার ভাষায়। লোরকার চিন্তা ও কার্যক্রমে দারভীশ বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। লোরকাও একসময় স্পেনের বিখ্যাত নগর করডোভা ও গ্রানাডা থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরৎ আসার পর সেই চিরচেনা শহর আর তিনি চিনতে পারছিলেন না। এ অবস্থা তার ভিতর অন্য এক উপলব্ধি তৈরি করে। কিন্তু লোরকার বিপ্লবী তৎপরতার পাঠই সবথেকে বেশি আন্দোলিত করেছিল দারভীশকে। দারভীশের তারুণ্যের অভিমুখ ছিলো লোরকা। স্পেনের গৃহযুদ্ধকালীন সময়ে জাতিয়তাবাদীরা আটক করে তাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। তাকে কারারুদ্ধ করে একসময় হত্যা করা হয়। দারভীশের পাঠ শুধু তার কবিতা ও সাহিত্যের মধ্যে আটকে থাকেনি বরং লোরকার লড়াকু ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞার পাঠ দারভীশকে আরো বেশি বিমোহিত করেছিল।[৫৮১] ফিলিস্তিনের বিবদমান পরিস্থিতির সাথে

---

[৫৭৯]. দারভীশ, মাহমুদ, *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা* ২০০৪, পৃ. ১১।
[৫৮০]. প্রাগুক্ত। পৃ. ঐ।
[৫৮১]. *মাহমুদ দারভীশ ফী দীওয়ানিহি আর জাদীদ "লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা" তানাছুন মাআ আল নাফসি ওয়া আল আখার ওয়া আজাব ফী শাহওয়াতি আল ইক্বা* (আল শুরুক, আলতুরেস.কম, জুন ১৮, ২০০৫ খ্রি.), ভিজিটঃ মে ১৩, ২০২৩, যঃঃঢ়ং://ীিি.ঃৎবং.পড়স/ধষপযড়ঁৎড়ঁশ/১১৬৩৯

লোরকার বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব মিলিয়ে পাঠ করলে দেখা যায় তারুণ্যের কালে দারভীশ কতোটা টগবগে ছিলেন। লোরকার সংগ্রামী জীবনের কথা স্মরণ করে দারভীশ বলেন,

عفوَ زهر الدم , يا لوركا , وشمس في يديكْ
وصليب يرتدي نار قصيده
أجمل الفرسان في الليل .. يحجون إليك
بشهيد.. وشهيدة[582]

মুছে ফেলো রক্তকুসুম, হে লোরকা, তোমার হাতে আছে সূর্য
আছে ক্রুশ– যা ধারণ করে আছে কবিতার আগুন
রাতের সুন্দরতম অশ্বারোহী... তারা আসছে
শহীদ আর শহীদ নারীদের নিয়ে তীর্থযাত্রায় আসছে
তারা তোমার কাছে।

৫.২.১১: আল মুতানাব্বী

দারভীশের অন্যতর এক অধ্যায়ের নাম আল মুতানাব্বী। আরবীয় জ্ঞান ও সাহিত্যের ইতিহাসে মুতানাব্বী প্রবল প্রতাপশালী এক কবি ব্যক্তিত্ব। কবিতায়, চিন্তায় এবং সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে মুতানাব্বীর শক্তিশালী অবস্থান ছিল। ফিলিস্তিনকে নানান দিক থেকে বোঝার এবং প্রকাশ করার ক্ষেত্রে দারভীশ বিভিন্ন অছিলা তালাশ করতেন। এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় মুতানাব্বীকে পাঠ করার ঘটনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুতানাব্বী তার সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে নিয়মিত সম্পর্ক রক্ষা করতেন। রাজনীতির গতিবিধিগুলো খুব কাছে দেখেছিলেন মুতানাব্বী। ফলে তার কবিতায় রাজনীতির ছাপ স্পষ্ট ছিল। তার কবিতায় তার সমকালের রাজনৈতিক সমালোচনাগুলোও ছিল বেশ তীক্ষ্ম। তার প্রতিক্রিয়া ছিল কাব্যময়।[৫৮৩] রাজনীতি ও সমাজের নানা বিষয়ে তার শক্ত প্রতিক্রিয়া ছিল। এসব প্রতিক্রিয়ায় সত্যের প্রকাশ ঘটতো প্রবলভাবে। একইভাবে ফিলিস্তিনের রাজনীতি ও সমাজ বাস্তবতায় দারভীশের কার্যকর অবস্থান ছিল। যেকারণে উভয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে আন্তপাঠ দেখা যায় তা ছিল যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

و أنا الذي اجتلب المنية طرفه
فمن المطالب و القتيل القاتلُ[584]

---

[৫৮২]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১* ২০০৫, পৃ. ৭৫।
[৫৮৩]. আল ফাখুরী, হান্না, ১৯৫৩, পৃ. ৬১১-৬৪৮
[৫৮৪]. আল মুতানাব্বী, *দীওয়ান আল মুতানাব্বী* (বৈরুত: দারু বাইরুত লি আল তবাআহ ওয়া আল নাশার, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৭।

মুতানাব্বীকে নিয়ে যখন দারভীশ কবিতা লিখলেন তখন সময় ছিল ১৯৮০। رحلة المتنبي إلى مصر যখন লিখছিলেন ফিলিস্তিন-ইজরাইলের সম্পর্ক খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। ১৯৭৮ এর সেপ্টেম্বরে ইজরাইলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ঠিক দুবছরও পার হয়নি– এরইমধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সমঝোতা চুক্তির পর ইজরাইল আরো বেশি কঠোর হয়ে ওঠে। চুক্তির কেন্দ্রে ছিল মূলত মিশর। আরববিশ্বকে পাশ কাটিয়ে মিশর এককভাবে ইজরাইলের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার পর চুক্তি পর্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু তাতে মিশরের আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে যে সম্পর্ক ছিল তা দুর্বল হয়ে পড়ে। বলা যায় আরব নেতৃত্বের পর্যায় থেকে অনেকটা ছিটকে পড়ে মিশর। সদ্য ঘটে যাওয়া এ চুক্তির প্রতিক্রিয়াও ফিলিস্তিনের জন্য ভালো ছিল না। ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং বাইরের সাথে সম্পর্ক সবমিলিয়ে খুব সংকটময় হয়ে ওঠে। পিএলও'র সাথে দারভীশের সম্পর্কও খারাপ হয়ে ওঠে। সেই সময়ের পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

حين سألتقي في الآخرة مع السيد ميغيل سرفانتيس سابدرا، سأعترف له بأن رحلته الثالثة مع دون
كيشوته قد أنقذتني من الانهيار النهائي، قبل سبع سنين، حين اختلفت احلامي مع أدوات تحقيقها،
واختفيت في باريس (16

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৮২ সালে ইজরাইল লেবাননের ফিলিস্তিনী শরণার্থী শিবির শাবরা শাতিলায় হামলা চালায়। এটি ছিল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে ইজরাইলের সবচেয়ে বর্বরতম গণহত্যার ঘটনা। গণহত্যা-পূর্বপরিস্থিতিতে অর্থাৎ ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো চুক্তিপরবর্তী ইজরাইলী হানাদারি তৎপরতার মোকাবেলা করতে পারছিল না। চুক্তির শুরু থেকেই দারভীশ এর বিরোধিতা করে আসছিলেন– কিন্তু চুক্তি-পরবর্তী পরিস্থিতিতে যেখানে ইজরাইল-ফিলিস্তিন সম্পর্ক স্থিতিশীল থাকার কথা সেখানে অবস্থা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আরো নাজুক হওয়ায় দারভীশের অবস্থান আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। তারপরও অভ্যন্তরীণভাবে পিএলও'র সাথে দারভীশের সম্পর্ক ভালো যায়নি। ভালো যায়নি ইয়াসির আরাফাতের সাথে। দারভীশ এ ঘটনার নির্যাস কিভাবে তুলে আনবেন? কবিতাই হয়ে ওঠে এর মোক্ষম উপায়। ইতিহাসের কোনো মুর্হর্ত–কোনো ঘটনা কবিতায় কিভাবে কাব্যময় হয়ে উঠতে পারে দারভীশের কলমে ছিল তার কুশলী শক্তি। ইয়াসির আরাফাত–দারভীশ এবং আব্বাসী আমলের সিরিয়ার 'সাইফ আদ দৌলা'[৫৮৫] খ্যাত তৎকালীন শাসক

[৫৮৫]. সাইফ আল দাওলাহ আল হামাদানী। ইতিহাসে যিনি সাইফ আল দাওলাহ নামে বিখ্যাত। তার পুরো নাম– আলী ইবনু আব্দিল্লাহ আবিল হিজা ইবনে হামাদান ইবনে আল হারেছ। ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায় তার জন্ম। তৎকালীন ফোরাত উপকূলীয় অঞ্চলের প্রভাবশালী বনু তাগাল্লুব গোত্রের হামাদান বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বস্তুত সাইফ আদ দাওলাহ ছিলেন প্রচণ্ড প্রভাবশালী শাসক। যিনি আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তর সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা আলেপ্পোর শাসনাধীন করার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে নিজের শাসনপ্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তার মাধ্যমে সে সময়ে আলেপ্পোকে কেন্দ্র করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। সাইফ আল দাওলাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে গভীর অনুরাগী ছিলেন। সামী আল কায়ালী, *সাইফ আল দাওলাহ ও আছর আল হামাদানিয়্যীন* (আলেপ্পো: আল মাতবাআহ আল হাদীছাহ, ১৯৩৯ খ্রি.), আলী হুসাইন দুর্‌রাহ, *আল তারীখ আল হাদারিয়্যী লি আল দাওলাহ আল হামাদানিয়্যাহ ফী হালব* (বৈরুত: ইতিহাস বিভাগ, জামেআ বাইরুত আল আরাবিয়্যাহ, ২০১৬ খ্রি.)।

علي بن أبي الهيجاء بن حمدان بن الحارث سيف الدولة التغلبي এবং মুতানাব্বীর মাঝে একটি তুলনামূলক প্রতিকী কাব্যের নিরিখে পুরো পরিস্থিতির আখ্যান রচনা করেন দারভীশ। رحلة المتنبي إلى مصر – কবিতায় দারভীশ তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তা বোঝার জন্য মুতানাব্বীর সাথে সাইফ আদ দৌলার সাথে ঘটে যাওয়া সম্পর্কের হদিস করা জরুরি। সাইফ আদ দৌলার সাথে মুতানাব্বীর যথেষ্ট ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। এক সময় সেই সম্পর্ক সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। মুতানাব্বী সাইফ আদ দৌলার রাজপ্রাসাদে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নানা বিষয়ে তিনি মতামত দিতেন। এক সময় তার সাথে এমন কিছু ঘটে গেল যার জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। তার প্রতি ঈর্ষান্বিত কতিপয় হিংসুক এমন কিছু করেছিলেন যাতে সাইফ আদ দৌলার সাথে মুতানাব্বীর সম্পর্ক ক্রমেই নেতিবাচক হয়ে ওঠে। কিন্তু মুতানাব্বী কখনো তার প্রতি বিরাগ ছিলেন না। যাইহোক, এক পর্যায়ে মুতানাব্বী প্রাসাদে এবং রাজদরবারে আসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি সিরিয়া ছেড়ে মিশরে চলে যান। তৎকালীন মিশরের সম্রাট কাফুর তাকে সমাদরে গ্রহণ করেন।[৫৮৬] তবে তাতে সাইফ আদ দৌলার সাথে মুতানাব্বীর যে সম্পর্ক ছিল তা মুছে ফেলা যায় না। বরং এটি ছিল সম্পর্কের আরেক পর্ব– ভিন্ন অধ্যায়। মুতানাব্বী সে সময় মিশর গমন এবং কাফুরের সাথে সম্পর্কের কথা স্মরণ করতে গিয়ে বলেন,

كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً
وحسب المنايا أن يكنَّ أمانيا[587]

মুতানাব্বীর এভাবে সিরিয়ার আলেপ্পো থেকে মিশরে ভ্রমণের ওই ঘটনার সাথে নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনারই হয়তো একটি মিল– একটি ভিন্ন আন্তপাঠ তুলে আনতে চেয়েছিলেন। দারভীশ ১৯৭০ এর পর মিশর ভ্রমণ করেছিলেন। সেই সময় মিশরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জামাল আবদ আল নাছের। জামাল নাছেরের সময়কে দারভীশ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। জামাল নাছের যেভাবে আরব দুনিয়ায় আরব জাতিয়তাবাদের বিপ্লবী উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাতে ফিলিস্তিনেরাই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলো ধারণা করা হয়। জামাল নাছেরের প্রতি যেকারণে দারভীশের ভালোবাসা ছিল তীব্র। নাসেরের মৃত্যুতে কবি প্রচণ্ড বেদনাবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুশোকে নিজের গভীর আবেগ ঢেলে দিয়ে শোকের কাব্য লিখেন নাছেরের স্মরণে। যে কবিতা নাসেরের প্রতি দারভীশের ভালোবাসার ঐতিহাসিক দলীল হয়ে আছে।[৫৮৮] যাইহোক সেসময় তরুণ দারভীশ মিশরে গেলে জামাল নাছের যে আতিথিয়েতা তাকে দিয়েছিলেন তা তিনি ভুলতে পারেননি। একইসাথে মুতানাব্বীর চিন্তায়ও আরব জাতীয়তাবোধ ছিল প্রবল। তার কবিতায় এবং চিন্তায় যার বড় ধরনের চিহ্ন রয়ে গেছে। সর্বোপরি দারভীশ

---

[৫৮৬]. আসতাহ, আদিল, *মাহমুদ দারভীশ ওয়া আল মুতানাব্বী ওয়া ইমরাউ আল কায়স ওয়া আবু তাম্মাম* (ইয়ামপু.কম, অক্টোবর ২৯ ,২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪। ভিজিট: মে ১৩, ২০২৩, https://www.yumpu.com/xx/document/view/28264033/-

[৫৮৭]. আল মুতানাব্বী, ১৯৮৩. পৃ. ৪৪১।

[৫৮৮]. দাইর, রেবেকা, *পোয়েট্রি অব পলিটিক্স এন্ড মাউর্নিং: মাহমুদ দারভীশ'স জনরা-ট্রান্সফর্মিং ট্রিবিউট টু এডওয়ার্ড ডাব্লিউ সাঈদ* (জার্নাল অব দি মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ এসোসিয়েশন, ভালিয়ম: ১২২, সংখ্যা: ৫, অক্টোবর ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৪৫৪।

أعرفُ أنني أمتصُّ فيكِ الغزوَ
أعرف أنني لا أعرف السرَّ الدفينَ
وأنني صِفْرُ اليدين وسائرِ الأعضاءِ
أعرف أنني سَأمُرُّ في لمح الوطنْ
وأذوبُ في الغزوات والغزوات
لكنْ كُلَّما حاولتُ أن أبكي بعينيكِ
التفتِّ إلى عَدُوِّي
فالتصقتُ بما تبقَّى منكِ أو منِّي ' وأدركَني الزمنْ...
هل تتركين النيل مفتوحاً
لأرمي جُثَّتِي في النيل؟
لا ز لن يستبيح الكاهنُ الوثنيُّ زوجاتي
ولا ' لن أبنيَ الأهرام ثانيةً ' ولا
لن أنسج الأعلام من هذا الكفن
من يفتديني , يا مُعَذِّبتي ' بمنْ؟
ولمنْ؟

যাইহোক, আনোয়ার সাদাতের মিশরকে দারভীশ গ্রহণ করতে পারেন নি। নাসেরের সময়ে মিশরে যাওয়ার পর পুনরায় তিনি সত্তরের দশকের একদম শেষদিকে মিশর গমন করেন। ওই সময়টাই ছিল আনোয়ার সাদাতের। বেশ ঝুঁকিপূর্ণ দ্বিতীয়বার ভ্রমণের ঘটনাই ছিল رحلة المتنبي إلى مصر এর মুখ্য পাঠ। তার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল মিশর-প্রশাসন সম্পর্কে– হয়ত যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সেটা হয়তো মৃত্যু কিংবা খুন। কারণ যে রাষ্ট্র ইজরাইলের সাথে এমন চুক্তি করলো– যে চুক্তির বিরোধিতা তিনি করে আসছিলেন ঠিক সেই রাষ্ট্রেই তিনি গেলেন– যেকারণে তিনি এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারেননি। মুতানাব্বীর কবিতা, রাজনৈতিক সম্পর্ক, রাজদরবারের সম্পর্কের সূত্রগুলোর সাথে বিরোধ, মিশর-যাত্রা– সমবমিলিয়ে মুতানাব্বী থেকে যে অভিজ্ঞতার পাঠ নিয়েছেন দারভীশ তারই একটি প্রতীকী এবং তুনামূলক প্রতচ্ছবি আঁকার প্রয়াস নিয়েছেন দারভীশ তার কাব্যিক অভিযাত্রায়।[৫৮৯]

---

[৫৮৯]. ইয়াকুব, ড. নাছের, *কাছীদাহ আল কানা': কিরাআতুন ফী কাছীদাতি "রিহলাহ আল মুতানাব্বী ইলা মিছার" লি মাহমুদ দারভীশ* (দমেশক: মাজাল্লাতু জামিআ দামিশক, আল মুজাল্লাদ: ২৪, আল আদাদ: আল ছালিছ-আল রাবি', ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৪৯-২৯২।

৫.২.১২: আন্তপাঠ: ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

দারভীশের সমগ্র কবিতার অভিযাত্রায় বিচিত্র আন্তপাঠের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। ধর্মীয় আন্তপাঠ তার মধ্যে সবথেকে ব্যাপক। কিন্তু এতো অন্তর্পাঠ্যতার মধ্যে ধর্মের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ কেন বিপুলভাবে উপস্থিত তার কবিতায়? এক কথায় এটি বলা সম্ভব নয়। তবে একটি কথা বলা যায়, দারভীশ যে ফিলিস্তিনের কথা সবসময় বিভিন্ন মাধ্যমে নানান পর্যায়ে বলে আসছিলেন তার মূল কারণ ছিল ফিলিস্তেনের স্থায়িত্ব। ফিলিস্তিনের এই স্থায়িত্বের ইতিহাস কতোটা প্রাচীন সেটা যেমন দেখানোটা জরুরি তেমনি এর সেকড় নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিকভাবেও কতোট গভীর এবং মৌলিক তার একটি উপস্থাপনও জরুরি। দারভীশের এই পুরো প্রকল্প মূলত প্রতিরোধ-চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত। ধর্মীয় আন্তপাঠের মধ্যদিয়ে দারভীশ যে বয়ান তুলে ধরতে চেয়েছেন তার পেছনে ফিলিস্তিন-প্রশ্ন পুরোপুরি জড়িত। ফিলিস্তিন সম্পর্কিত যে বয়ান তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন ধর্মের প্রসঙ্গে বাদ দিয়ে তা রীতিমতো অসম্ভব। ধর্ম নিছক ঐতিহ্য কিংবা রীতিনীতির ব্যাপার নয়, ধর্মের মধ্যদিয়ে কিভাবে ফিলিস্তিন নামক একটি ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক সত্তা জীবন্ত রয়েছে তার নজির হাজির করেছেন দারভীশ। বৃহত্তর আরব-পারস্য-আফ্রিকান সভ্যতায় ঐতিহ্য ও পরম্পরায় তিনটি প্রধান ধর্ম– ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম যেমন করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে বর্তমান রয়েছে তার নানা অনুষঙ্গকে দারভীশ তার কবিতায় নানান দিক থেকে তুলে এনেছেন।[৫৯০] এর যেমন আত্মিক দিক রয়েছে তেমনি রয়েছে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য। একইসাথে রয়েছে প্রজ্ঞা ও দার্শনিক অর্থময়তার বিচিত্র উদাহরণ। কোরআন, তাওরাত, জাবুর, বাইবেল-ইঞ্জিল, নবী-পয়গম্বরদের নিয়ে এমন একটি ডিসকোর্স প্রবহমান রয়েছে দারভীশের কবিতায়। পবিত্র কোরআন নিয়ে দারভীশের এক আবেগমথিত বক্তব্যে আন্তপাঠের অমীয় ব্যাঞ্জনা যেন প্রবাহিত হয়েছে। দারভীশ বলেন,

عَلَّمني القرآنَ في دوحة الريحانِ
شَرْقَ البئر،
من آدمٍ جئنا ومن حوَّاءَ
في جنة النسيانِ.
يا جدِّي! أَنا آخر الأحياء
في الصحراء، فلنصعدْ!

البحرُ والصحراءُ حول اسمِهِ
العاري من الحُرَّاسِ
لم يعرفا جدّي ولا أَبناءَهُ
الواقفين الآن حول "النون"

[৫৯০]. আবু শারার, ইবতেসাম মুসা আব্দেল কারীম, *আল তানাছ আল দীনী ওয়া আল তারীখী ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ* (ফিলিস্তিন: আরবী ভাষা বিভাগ, জামেআ আল খালীল (Hebron University), ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১-৯৬।

في سورة "الرحمن"،
اللهم ... فلتشهَدْ![591]

দাওহাতে রাইহানে কোরআন শিখিয়েছে আমায়
পশ্চিম কূপের কথা। আমরা এসেছি আদম ও হাওয়া থেকে
বিস্মৃতির উদ্যানে। হে পিতামহ! এই মরুদ্যানে আমিই শেষ প্রাণ
অতএব আমরা চলি!

তার নামের চারপাশ ঘিরে সমুদ্র এবং মরুদ্যান
শূন্যবসনার প্রহরী যারা
তারা চিনে না আমার পিতামহের পরিচয়, চিনে না
তার সেসব সন্তানদের– যারা দাঁড়িয়ে আছে সূরা 'আর রহমান'র
'নূন'র চারপাশে।
হে আল্লাহ... আপনি তবে সাক্ষ্য থাকুন

পবিত্র কোরআন নিয়ে দারভীশের আরো অনেক কবিতা রয়েছে। এছ আন্তপাঠের অপর দৃশ্য ইতিহাস ও পুরাণ। প্রাচীন নগর, সভ্যতা, ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ পাঠের মাধ্যমে ভিন্নধরনের একটি চিত্র রূপায়িত হয়েছে দারভীশের কবিতায়। এই রূপায়ন দারভীশের কবিতাকে যেমন ঋদ্ধ করেছে তেমনি ফিলিস্তিন প্রশ্নকে আরো শক্তিশালী করেছে। প্রাচীন নগর এবং সভ্যতার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের নতুন বয়ান নির্মাণের প্রয়াস।[৫৯২] এ বয়ান মূলত জায়োনিস্ট একচেটিয়া আধিপত্যবাদী বয়ানের বিপরীতে প্রতিরোধ তৈরির চেষ্টা হিসেবে দেখা যায়। দারভীশের কবিতাজুড়ে ইতিহাস ও পুরানের অসংখ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন রয়েছে, যেখানে ইতিহাস আর প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্বের মধ্যদিয়ে নিজের ঐতিহাসিকতার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন দৃপ্ত উচ্চারণে।[৫৯৩]

৫.২.১৩: *গণ* সম্পর্কে

দারভীশের কবিতায় যে বহু কিংবা গণ–র ব্যবহার রয়েছে তাতে এরকম বর্গ অন্যভাবেও বোঝা সম্ভব। অর্থাৎ বাখতিন যেটাকে বহুস্বরতা বলেছেন বিভিন্ন ক্যাটাগরির মাধ্যমে যেটাকে আরো বিস্তার করতে চেষ্টা করেছেন শুধু তার মধ্যেই এই বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং এটিকে তিনি জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন। কিংবা এই বহু ব্যাপারটি আরো অন্যভাবেও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যেটি তার *ডিসকোর্স ইন*

---

[৫৯১]. দারভীশ, মাহমুদ, লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদা ১৯৯৫, পৃ. ৭৪-৭৫।
[৫৯২]. আবু শারার, ইবতেসাম মুসা আব্দেল কারীম,
[৫৯৩]. দারভীশ, মাহমুদ, *সারীর আল গারীবাহ*, পৃ. ১৯।

লাইফ এন্ড ডিসকোর্স ইন আর্ট-এ বিস্তারিত হয়েছে।[৫৯৪] "the only social unit to which the poet belongs"। যেখানে বহু কিংবা বহুস্বরতাকে বাখতিন জীবনঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন তার তত্ত্বালোচনায়। বাখতিন যেটাকে সামাজিক একক (Social Unit) হিসেবে নির্ধারণ করেন। যেটা কবিতায় ঘটে যায়। কবি এবং কবি-কথক এবং তার শ্রোতা এবং পাঠকের মধ্যদিয়ে কবিতায় এর বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। বাখতিনের অনুমান হলো, কবি নিছক একজন কবিই নন, একইসাথে কথক এবং ভাষ্যকারও বটে। যেখানে কবি-কথক (পোয়েটে-স্পিকার) এবং কবির মধ্যে একটা শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কে কখনো কখনো অবশ্য দুইয়ের মধ্যে অর্থাৎ কবি এবং তার ডিসকোর্সের মধ্যে দূরত্বও বজায় রাখে। তবে এই সম্পর্ক পাঠককে ("a natural ally of the poet")[৫৯৫] কবির স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে গড়ে তোলে। কারণ পাঠক, শ্রোতা, কবি-কথক, কবিতার ভাষ্য, কবিতার ভাষা (পোয়েটিক টেক্সট) সবমিলিয়ে পাঠক-শ্রোতার জন্য এমন একটি পরিস্থিতি এবং পরিসর সৃষ্টি করতে পারে যেটা পোয়েটিক আটারেন্স বা কবিতার উচ্চারণ ও ভাষার সরাসরি অর্থ এবং কাঠামো সৃষ্টিতে সামর্থ তৈরি করতে সক্ষম। এমনকি কবিতার ডিসকোর্সের ভঙ্গি ও ধরনের উপর অনেক সময় যে নির্ভরতা তৈরি হয় পাঠক, শ্রোতা এবং কবি-কথকের মধ্যে এ সম্পর্ক সেই নির্ভরতাও বদলে দিতে পারে। আবার কখনো কখনো শ্রোতা এবং কবি-কথক মিলে স্বয়ং কবিকেও উপেক্ষা করতে পারে। যেটা আদতে কৌতুকের ক্ষেত্রে ঘটে। অপরদিকে আবার কবি-কথক এবং ককি শ্রোতার বিপরীতে এক হতে পারে। যেটা আদতে রোমান্টিক কবিতার ক্ষেত্রে ঘটে। কবিতার কথা যতোটা দাবি করে এবং শ্রোতার সহানুভূতিতে যেটা ঠিক হয় এটা আসলে শ্রোতার সাথে কবির একটা লড়াই। বস্তুত কবিতার এই ডিসকোর্সে প্রতিটা পক্ষই রচনার প্রক্রিয়াজুড়ে আলাদা এবং তারা ভিন্নতা বজায় রেখে সহাবস্থান ধরে রাখে।[৫৯৬]

কারণ হিসেবেও একটি সামগ্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাখতিন। বাখতিন মনে করেন কবি যে শিল্পের চর্চা করেন সেটা মূলত এটি আসলে সমাজের একক হিসেবেই করেন। অর্থাৎ সমাজ সংগঠন যে বিবিধ এবং বহু বৈচিত্র্যের সম্মিলনে গড়ে ওঠে সেই বহুত্ব তথা এককগুলো যেহেতু সমাজ সংগঠনের একেকটি স্বতন্ত্র অংশ ফলে তা জীবনেরই একক। এর মাধ্যমে বাখতিন কবির শিল্পব্রতকে জীবন কিংবা সমাজের যে একক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তার ব্যাত্যয় ঘটলে সামাজিক এককেরই ক্ষতি অপরপক্ষে জীবনেরই ক্ষতি। যাতে সমাজের একটি অখণ্ডতা কিংবা সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন হয়। বাখতিন বলেন,

> If the poet's consciousness and consideration of the outside public begins to occupy an important role in

[৫৯৪]. বাখতিন, মিখাইল, *ডিসকোর্স ইন লাইফ এন্ড ডিসকোর্স ইন আর্ট* (ইনস্ট্রাকচার.কম,), পৃ.। ভিজিট: মে ১৪, ২০২৩, https://usu.instructure.com/files/56960688/download?download_frd=1

[৫৯৫]. মোত্তাওয়া, খালিদ, ২০০৯, পৃ. ২৫৮।

[৫৯৬]. বাখতিন, মিখাইল, *দি ডায়ালজিক ইমাজিনেশন: ফোর অ্যাসেইস*, পৃ. ২৯।

the poet's work, the work will lose its artistic purity and will fall to a lower social level. When he begins to pay attention to outside factors, the poet then loses the listener that is closest to him [inside him] and he begins to break the social totality that the work of art has already configured within it.[৫৯৭]

যদি কবির সচেতনতা আর বাইরের বিবেচনা কবির কাজে প্রধান ভূমিকা নিতে শুরু করে তবে কবির কাজ শিল্পের বিশুদ্ধতা হারাবে এবং সমাজের একেবারে তলানিতে গিয়ে পড়বে। কবি যতোই বাইরের বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিতে শুরু করবে ততোই সে তার কাছের শ্রোতাদের হারাবে। এমনকি সমাজে তার কাজের যে একটি আকার দাঁড়ায় গিয়েছিল তাতে করে সেই সামাজিক সামগ্রিকতাও ভেঙ্গে পড়বে।

বাখতিন বলতে চাচ্ছেন, কবিতার যিনি কথক, কবি এবং একজন আবিষ্কৃত কিংবা আবিষ্ক্রিয়মান সম্ভাব্য ঘনিষ্ট শ্রোতার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সংলাপ চলে কবিতার ডিসকোর্স মূলত তারই ফলাফল। যেখানে এই সম্পর্ক, পরস্পরের আকর্ষণ এবং লড়াই– এসবের মধ্যদিয়ে কবি তার প্রতিটি কবিতার সাথে সাথে নিজেকে নতুন করে গড়েন। নতুন করে সৃষ্টি করেন। এই ভিন্নতা, একসাথে থেকেও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান, নতুন সম্ভাবনা সবকিছু কবি এবং তার মধ্যেই ঘটে। এতে করে একইসাথে কবি নিজেকে যেমন গড়েন তেমনি এমন পাঠক শ্রোতাও তৈরি করেন, যিনি কবির প্রতি আস্থা রাখেন– আবার সেই শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করাটা কবির জন্য খুব সহজও নয়। বেশ কষ্টসাধ্য একটি প্রক্রিয়া। এই যে সামগ্রিক ঘটনা এটি নিছকই শিল্পের ঘটনা না শুধু। এটি একটি সামগ্রিকতার প্রশ্ন। বাখতিন এই সামগ্রিকতার মূল সম্পর্কটাকে যে সংলাপের ফলাফল হিসেবে দেখছেন এটি বস্তুত কবির জীবন-যাপন, তৎপরতা এবং সক্রিয়তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। মানে সংলাপ আসলে সমাজে এক্ট করার কিংবা কার্যকরভাবে সক্রিয় থাকার নামান্তর একটি ঘটনা। এই সক্রিয়তার মধ্যদিয়েই সামগ্রিক কথাটি জড়িয়ে আছে– যেখানে একজন কবি যখন নানাবিধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গবিবিধি– যেগুলো তার কবিতাকে প্রভাবিত করে– সেসব বিষয়াদি নিজের সাথে সম্পর্কিত করতে সক্ষম এবং একইসাথে সেসব বিষয় ও সম্পর্কগুলোর বোঝাবুঝি ও প্রকাশ ঘটাতেও পারঙ্গম।

কিন্তু এ আলোচনার সূত্র দারভীশের সাথে কিভাবে সম্ভব কিংবা প্রাসঙ্গিক হতে পারে? বাখতিন জীবন ও শিল্পের অন্যঅর্থে কবিতার যে ডিসকোর্সের পর্যালোচনা করেছেন তাতে কবি, কবিতার কথক এবং

[৫৯৭]. প্রাগুক্ত।

পাঠক ও শ্রোতা গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ফলাফল ও প্রক্রিয়াগুলোর কবি হিসেবে দারভীশের যাপিত জীবন, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, এবং তার কার্যকর সক্রিয়তার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। দারভীশের এই পাঠক, শ্রোতা বিচিত্র– যারা তৈরি হয়েছিল দারভীশের ফিলিস্তিন-ইজরাইল সম্পর্কিত দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। এই পাঠক, শ্রোতা যেমন ফিলিস্তিনের, তেমনি ইজরাইলের, আরবের অংশ। আবার একইসাথে পাঠকদের অনেকে নিপীড়িত-মজলুম, অনেকে নিপীড়নকারী জালেম। অনেকে আছেন যারা শুধু পরিদর্শন করে যান। দূরে দাঁড়িয়ে দেখে দেখে বুঝতে চান। যারা হয়ত তাকে বিশ্বাস করেন– আস্থা রাখেন তার উপর। যাদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং সম্পর্কিত হওয়ার ঘটনা ব্যক্তি দারভীশের কবিত্ব কিংবা কবি ব্যক্তিত্বের গাঠনিক উপদান কিংবা যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু এই পাঠকশ্রেণি একইসাথে অবস্থান করলেও তারা আলাদা স্বতন্ত্র– যারা বহুবিচিত্র–গণপাঠক।[৫৯৮] তাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হয় তাকে। তাদেরকে প্রতিনিয়ত আমলে নিতে হয়। আবার যেখানে দারভীশের দিনশেষে তাদের উপর কোনো খবরদারী করা সম্ভব হয় না। কিন্তু দারভীশকে কোনো না কোনোভাবে তার তৈরি করা সম্পর্কসূত্রে তাদেরকে আটকে রাখতে হয় এবং তা করতে তিনি সক্ষমও হয়েছেন। দারীভশের ইলা আল ক্বারী (পাঠকের প্রতি) কবিতায় বলেন,

من أي غابٍ جئتني
يا كلَّ صلبانِ الغضبْ ؟
بايعتُ أحزاني...
وصافحتُ التشردَ والسِّغَبْ
غضبٌ يدي....
غضبُ فمي...[599]

কোন বন থেকে এসেছো
যতো ক্ষোভের ক্রুশ
আমি শপথ নিয়েছি আমার সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার
আলিঙ্গন করে নিয়েছি ক্ষুধা আর যাযাবর জীবন
আমার হাতে দ্রোহ
আমার মুখে দ্রোহ...

এখানে যেমন দেখা যায়, পাঠককে অন্যভাবে মোকাবেলা করছেন তিনি। এখানে যে ক্ষোভ দেখা যায়, তার ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। দারভীশের তারুণ্যের বয়স ছিল এই ক্ষোভের সময়কাল। যার প্রধান লক্ষ্যবস্তু ইজরাইল। কিন্তু দারভীশ ইজরাইলের জনগণ এবং জায়োনিস্ট রাজনৈতিক শ্রেণিকে আলাদাভাবে দেখেছেন। ক্ষোভ আর দ্রোহের আগুন একপাশে রেখে দারভীশ তাদের সাথে ডায়ালগে

---

[৫৯৮] মাত্তাওয়া, খালিদ, ২৫৯।
[৫৯৯]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১* ২০০৫, পৃ. ১৫-১৬।

যেতে চেয়েছেন। দারভীশ মনে করতেন, যাদের সাথে সহাবস্থানের বিষয়টি শুধু রাজনৈতিকই নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকও। ফলে যেটা রাজনৈতিক সেটা একইসাথে সামাজিকও। কিন্তু সামাজিকতার কারণে সহাবস্থানের বিষয়টি ডায়ালগ ছাড়া কঠিন। দারভীশ অনেকবার চেষ্টা করেছেন, উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের সাথে ডায়ালগে যাবার। তাদের একদিকে ছিল ইজরাইলের সাধারণ জনগণ অপরদিকে ছিল লেখক-বুদ্ধিজীবী।[৬০০] দারভীশ সে সময় ইজরাইলের কম্যুনিস্ট পার্টি 'রাকাহ'র রাজনীতি করতেন দলীয় প্লাটফর্মে। সেসময় যেমন ইজরাইলের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ফিলিস্তিনীদের একীভূতকরণের একটা চেষ্টা ছিল তেমনি ইজরাইলের বাইরে ফিলিস্তিনীদের ইজরাইলের সাথে স্বাভাবিক সহাবস্থানের জন্য ডায়ালগের চেষ্টা ছিল। ইজরাইলের খুবই ক্ষুদ্র একটি লেখক শ্রেণি এই ডায়ালগে সাড়া দিলেও শেষত তা ব্যর্থ হয়। এইসব চেষ্টাকে যেমন ইজরালাইজেশন আখ্যা দেয়া হয়েছিল তেমনি দেয়া হয়েছিল ফিলিস্তিফিকেশন।[৬০১] তারা ডায়ালগে এসেছিল একটি মিটিংয়ের মাধ্যমে, কিন্তু তারা তাদের ভিতরের বিদ্বেষ শেষতক লুকিয়ে রাখতে পারেননি। তারা ওই ডায়ালগ প্রত্যাখ্যান করেন এবং একইসাথে ফিলিস্তিনী পক্ষকেও প্রত্যাখ্যান করেন।[৬০২] ইজরাইলী লেখক দাহলিয়া রেভোকোভিচসহ যারা এসেছিলেন, তাদের এধরনের আচরণে দারভীশ তাদেরকে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

দারভীশের ডায়ালগের চেষ্টা একদিকে যেমন তার নাগরিকতার তেমনি সমাজের একক হিসেবে কবি-ব্যক্তিত্বের সক্রিয়তারও অংশ। এর মধ্যদিয়ে দারভীশ মূলত 'অপর'কে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন– অনেককে কিংবা বাখতিনের ভাষায় বহুস্বরকে একজায়গায় এনে সহাবস্থানের কাজে ব্রত হয়েছিলেন। দারভীশের জীবনে দেখা যায়, তিনি একদিকে যেমন ইজরাইলকে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি বর্জনও করেছিলেন। মূলত দারভীশ সবসময়ই ফিলিস্তিনী ছিলেন। কিন্তু যেটা তিনি চেয়েছিলেন তা ছিল সহাবস্থান। যখন কৈশোর ও তারুণ্যে কিছু সময় তিনি ইজরাইলে ছিলেন, তখন যেমন তিনি ফিলিস্তিনী হিসেবে ইজরাইলের সাথে সহাবস্থান চেয়েছিলেন, তেমনি ইজরাইল ছেড়ে আসার পর ফিলিস্তিনে থেকেও তিনি ইজরাইলি সাধারণ মানুষের সাথে সামাজিকভাবে সহাবস্থান চেয়েছিলেন। দারভীশ বলেন,

ْ
رضي النقّادُ لكنَّ عيون المجدليَّهْ
حَفَرَتْ في جَسَدي
شكل الجليل
ولهذا .... أستقيل
...يا دمي
فرشاتُهم ترسم لوحات عن اللدِّ
'وأنت الحبرُ

[৬০০].
[৬০১]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১* ২০০৫, পৃ. ১৫-১৬।
[৬০২]. শাই আন আল ওয়াতান, ৫০, ৬৮, ৭৯

ما يافا سوى طبول
وعظامي كالعصا في قبضة المخرج
: لكني أقول
أتقن الدور غداً يا سيدي
ولهذا ... أستقيل
..سيداتي
..آنساتي
! سادتي
سلَّيتكلم عشرين عامْ
آن لي أن أرحل اليوم
وأن أهرب من هذا الزحامْ
وأغنّي في الجليل
للعصافير التي تسكن عشَّ المستحيل
ولهذا.. أستقيل
أستقيل
..أستقيل[603]

যখন সমালোচকরা খুশি তবু মাজদালিয়ার চোখগুলো
আমার দেহের ভিতর গর্ত খুঁড়ে গ্যালিলির রূপ দেখলো
তাই আমি ইস্তফা দিয়ে বের হয়ে যাবো..
হে আমার রক্ত...
তাদের তুলি আঁকছে লদ'র রূপ
তুমি তো কালি মাত্র
ড্রাম-তবলা ছাড়া ইয়াফা হয় না যেন
আমার হাড় লাঠির মতো আটকে আছে
পরিচালকের মুষ্ঠির ভিতর
তবে আমি বলবো:
লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান,
আগামী দিনের
সবচেয়ে ভালো ভূমিকার কথা
তাই আমি বের হয়ে যাবো
ল্যাডিস এন্ড জেন্টলম্যান
বিশ বছর আগে বলেছিল,
সময় হয়েছে আমার চলে যাওয়ার

৬০৩. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১* ২০০৫, পৃ. ৩২০-৩২২।

সময় হয়েছে এই ভিড় থেকে পালিয়ে যাবার
গ্যালিলির ভিতর আমি চড়ুই পাখিদের জন্য গান গাই
অসম্ভবের বাসায় যাদের বসবাস
তার জন্যেই আমি বের হয়ে যাবো
আমি বের হয়ে যাবো....

কবিতাটি একটি ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী হয়ে আছে। দারভীশের বিশ বছর থাকার পর ইজরাইলকে ছেড়ে আসার কারণ ও পটভূমি উঠে এসেছে এই কবিতায়। এখানে দেখা যায়, দারভীশের নিজের কবিতায় কিভাবে তিনি কথক হয়ে উঠছেন। কিভাবে একজন কবি একটি মঞ্চে উঠে অভিনেতা হয়ে উঠছেন– যেখানে তিনি একইসাথে অভিনেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন, তেমনি শ্রোতার ভূমিকাও পালন করছেন। কিন্তু এতে তিনি শেষপর্যন্ত শ্রোতা কিংবা পরিচালকদের সন্তুষ্ট করতে পারছেন না। কিন্তু তিনি কাজটি করে যাচ্ছেন– একইসাথে যেখানে তিনি অনুভব করছেন, এই শ্রোতারাও তার সাথে একটি সম্ভাব্য খেলা খেলে যাচ্ছে বা কোনো একটি ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এতে তারা তাদের ভূমিকার কারণে যে পরিসর সৃষ্টি করছে সে পরিসর মূলত শেষপর্যন্ত দারভীশেরও। মোটকথা কবি-কথক এবং শ্রোতা-পাঠকের মধ্যে কবির অভ্যন্তরীণ সংলাপের মধ্যদিয়ে তৈরি হওয়া যে ডিসকোর্স হাজির করেছিলেন বাখতিন তার একটি নজির এই কবিতা। সংলাপের ক্ষেত্রে কখনো কখনো দারভীশ নিজের সাথে সংলাপের রীতিও অনুসরণ করেছেন। নিজের সাথে আলাপের ধরন ও নমুনা বিস্তর। কবিতায় কবির নিজের সাথে সংলাপের বিষয়টি খুব সাধারণ একটি ঘটনা যদিও। তবে যেকোনো ধরনের সংলাপই হোক না কেন, দারভীশ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তাতে প্রতিরোধের একটি আবহ তৈরি করেছেন। দারভীশের বিষয়চিন্তার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রতিরোধকে কার্যকরভাবে কিংবা সামাজিকীকরণের জন্য সংলাপ তাই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিরোধ, ভাষা, ইতিহাস, প্রকৃতি ও ধর্ম

দারভীশের কবিতায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে প্রতিরোধের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গড়ে উঠেছে। ফলে ইতিহাসচিন্তা কিংবা ইতিহাস বোঝার ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিয়ে দারভীশের রয়েছে বিশেষ অবস্থান। ইতিহাসের পদ্ধতি বিচারের বড় কারণ, ইজরাইল ও জায়োনিজমের ইতিহাস বিকৃতি। ইতিহাসকে তার প্রকৃতিতে ফিরিয়ে আনা ছিল দারভীশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দারভীশ সেজন্য ইতিহাস অনুসন্ধান ও ভাষাকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষা এবং ইতিহাস যেখানে একই রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে তার কবিতায়। নিম্নবর্গের ভাষা, বিউপনিবেশায়ন, অবিনির্মাণ এবং বিস্মৃতির স্মৃতি ছিল দারভীশের ইতিহাস বোঝার একেকটি উপায়। যেখানে ভাষা, শরীর, স্থানকাল, মিথ, পুরাণ ও রূপকথার মধ্যদিয়ে দারভীশ প্রতিরোধের বিচিত্র উপাদান খুঁজে বেড়িয়েছেন নিরন্তর।

৬.১: প্রতিরোধ: প্রেক্ষিত সাবঅল্টার্ন ও বিউপনিবেশায়ন
৬.২: প্রতিরোধ: প্রকৃতি কিংবা ইকো-পোস্ট কলোনিয়াল পরিস্থিতি
৬.৩: প্রতিরোধ: ভাষা, অর্থ এবং শরীর: নয়া ডিসকোর্সের সন্ধানে
৬.৪: প্রতিরোধের ভাষা: গায়েব-হাজের কিংবা অনুপস্থিতির উপস্থিতি
৬.৫: প্রতিরোধ: প্রেক্ষিত ভাষা ও অবিনির্মাণ (ডিকনস্ট্রাকশন)
৬.৬: ভাষা, অর্থ এবং শরীর: ক্ষমতা ও প্রতিরোধ
৬.৭: প্রতিরোধ: স্থান-কাল, ইতিহাস, স্মৃতি ও পুরাণ
৬.৮: ইতিহাসচিন্তা: বুদ্ধিবৃত্তির প্রেক্ষিতে
৬.৯: পুরাণ এবং স্মৃতির প্রেক্ষিতে
৬.১০: স্মৃতি, স্মৃতির তাড়া (হন্টলোজি), নির্বাসন ও প্রত্যাবর্তন
৬.১১: পুনরুদ্ধার ও ফিরিয়ে আনা
৬.১২: পুনর্পাঠ ও পুনরুদ্ধার
৬.১৩: নির্বাসন
৬.১৪: পুরাণ ও রূপকথা: মৃত্যুর মোকাবেলা কিংবা প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিত
৬.১৫: পরিবর্তন কিংবা সম্ভাবনার প্রেক্ষিত: কবিতায় ধর্মভাব ও তার যোগাযোগ
৬.১৬: লিবারেশন থিওলজি কিংবা পলিটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি, ফিলিস্তিন এবং মাহমুদ দারভীশ

৬.১: প্রতিরোধ: প্রেক্ষিত সাবঅল্টার্ন ও বিউপনিবেশায়ন

সাবঅল্টার্ন শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় সামরিক বাহিনীতে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন কর্মকর্তাদের সাবঅল্টার্ন বলা হতো। তবে ইউরোপে ইতিহাস ও সংস্কৃতি অধ্যয়নে একসময় এটি বিশেষ ধারণাগত ক্যাটাগরি হয়ে ওঠে। যাতে নিম্নবর্গের সামগ্রিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়। নিম্নবর্গের বিশেষত তাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও শ্রেণিগত অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ইতালির মার্কসীয় ধারার খ্যাতিমান দার্শনিক ও রাজনীতিক অ্যান্তোনীয় গ্রামশির গ্রন্থ 'কারাগারের নোটবই'-এ।[৬০৪] ১৯৬০ থেকে সত্তরের দিকে ইউরোপে সামাজিক ইতিহাস চর্চার যে ধারার সূত্রপাত ঘটে তাতে সাবঅল্টার্ন শব্দটির ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। পরবর্তীতে সাবঅল্টান বিষয়ক চিন্তা ও তত্ত্ব পর্যালোচনায় আরো বৈচিত্র গড়ে ওঠে। তবে ইউরোপের বাইরে সাবঅল্টার্নের ধারণা এবং তাকে কেন্দ্র করে ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চা ও বিশ্লেষণ ব্যাপকতা লাভ করে ভারতে। বিশেষ করে রণজিৎ গুহ, পার্থ চ্যাটার্জি, শাহিদ আমিন, গৌতম ভদ্র এবং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রমুখ তাত্ত্বিকদের হাত ধরে সাবঅল্টার্ন একটি প্রভাবশালী চিন্তা, তত্ত্ব ও ইতিহাস বিশ্লেষণের ধারা হয়ে ওঠে।

সাবঅল্টার্নের বাংলা প্রতিশব্দ নিম্ববর্গ। নিম্ববর্গ পরিভাষাটিও রণজিৎ গুহ এবং পার্থ চ্যাটার্জির মাধ্যমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে রণজিৎ গুহই প্রথম এর বাংলা প্রতিশব্দ 'নিম্নবর্গ' নির্ধারণ করেন। গৌতম ভদ্র ও পার্থ চ্যাটার্জি সম্পাদিত *নিম্নবর্গেও ইতিহাস*[৬০৫] নামে বইয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলে সাবঅল্টার্ন ধারণার বিকাশ ঘটে। এর আগে গ্রামসির সাবঅল্টার্ন বিষয়ক আলোচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের এই খ্যাতিমান তাত্ত্বিক, দার্শনিক, ইতিহাস বিশ্লেষক, সমালোচক এবং ইউরোপীয় একাডেমিশিয়ানদের সমন্বয়ে সাবঅল্টার্ন স্টাডি সম্পর্কিত একটি গ্রুপ গড়ে ওঠে। যাদের পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিন খণ্ডের সাবঅল্টার্ন বিষয়ক একটি গবেষণা সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ পরবর্তী সময়ে সংকলনটি *Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society (1982-1987)*[606] প্রকাশিত হয়। মূলত নব্বইয়ের শুরুর দিকে তারা আন্তর্জাতিকভাবে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গ্রুপ (SSG) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

শব্দটির সংজ্ঞা এক কথায় বলা কিছুটা মুশকিল। কিছুটা বিস্তারিত করে তার ব্যবহারিক এবং ধারণাগত অর্থ প্রকাশ করা জরুরি হয়ে পড়ে। ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে ডেভিড লুডেন ২০০১ সালে

---

৬০৪. হোয়ার, কোয়েন্টিন ও জিওফারি নাওয়েল স্মিথ, *সিলেকশনস ফ্রম প্রিজন নোটবুকস*—অ্যান্তোনিও গ্রামসির (ইতালিয়ান ভাষায় লিখিত) মূলগ্রন্থ *Quaderni del carcere*'র অনুবাদ (লন্ডন: লরেন্স এন্ড উইশার্ট, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৪৮, ২০২-২০৭। অনলাইন সংস্করণ: https://abahlali.org/files/gramsci.pdf

৬০৫. গুহ, রনজিৎ, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*—গৌতম ভদ্র ও পার্থ চ্যাটার্জি সম্পাদিত *নিম্নবর্গের ইতিহাস* থেকে (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২২-৪৬।

৬০৬. *সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ: রাইটিংগস অন সাউথ এশিয়ান হিস্ট্রি এন্ড সোসাইটি*—সম্পাদনা: রনজিৎ গুহ (যুক্তরাজ্য: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮২ খ্রি.)।

প্রকাশিত তার এক নিবন্ধে নিম্নবর্গ অর্থে সাবঅল্টার্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত এবং ধারণাগত অর্থের একটি ক্রমবিকশিত বিবরণ তুলে ধরেন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে এর সূত্রপাত ঘটে কৃষক-প্রজা শ্রেণির মধ্যে। পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীতে এর চল শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৮০০ শতকে সাবঅল্টার্ন বিষয় লেখকদের লেখায়- উপন্যাসে স্থান পেতে শুরু করে। এরপর ভারতে ও আমেরিকায় ইতিহাস লেখার পদ্ধতি হিসেবে এর প্রচলন ঘটে।[৬০৭]

সাবঅল্টার্ন ইংরেজি সাবঅর্ডিনেট শব্দের সমার্থক রূপ। সাধারণত সেনাবাহিনীতে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। ক্যাপ্টেন পদবীর পরের ধাপ থেকে একেবারে নিচের পদ পর্যন্ত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সাবঅল্টার্ন নামে সম্বোধন করা হয়। যাইহোক, সাবঅল্টার্ন বা নিম্নবর্গ বিষয়ক ধারণা বিশ্লেষণের সাথে দারভীশের চিন্তা ও কবিতার বিশেষ সম্পর্ক থাকায় এখানে এর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। শব্দটির ধারণাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাবে দারভীশ এবং ফিলিস্তিন কিংবা ফিলিস্তিনের জনগণের লড়াই সংগ্রামের সাথে এ ধারণার সম্পর্ক কিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। একইসাথে নিম্নবর্গীয় ধারণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীর ইজরাইল বিরোধী গণপ্রতিরোধ এবং তাদের অবিরাম লড়াই সংগ্রামের মর্মার্থ ও ন্যায্যতা বোঝাবুঝির প্রক্রিয়া শনাক্ত করা সম্ভব। সাবঅল্টার্ন শব্দটির দুই অর্থের ব্যবহার বিশ্লেষণ করেছেন গ্রামশি। একটি প্রোলেতারিয়েত। অর্থাৎ ধারণাগত মিল থাকায় সাবঅল্টার্নের প্রতিশব্দ হিসেবে প্রোলেতারিয়েত শব্দটি চিহ্নিত করেন তিনি। কারণ সাবঅল্টার্ন বলেত সাধারণত বোঝানো হয় সমাজের সবথেকে নিচে অবস্থানরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে। সেদিক থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণি হলো সাবঅল্টার্ন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রধানত দুটি শ্রেণিকে মোটাদাগে আলোচনা করা হয়। একদিকে শাসক শ্রেণি অপরদিকে শোষিত ও শ্রমিক শ্রেণি। এই বিন্যাসকে গ্রামসী দেখিয়েছেন, সমাজের বাস্তবতায় একদিকে রয়েছে সাবঅল্টর্ন বা শ্রমিকশ্রেণি অপরদিকে রয়েছে বুর্জোয়া বা হেজেমনিক শ্রেণি। এর বাইরে রয়েছে সাধারণ শ্রেণি। অর্থাৎ ক্ষমতার বিন্যাস প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় যে শ্রেণিবিভাজন দেখা যায় তার বাইরের অতিসাধারণ অর্থে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সাবঅল্টার্ন শব্দটির লক্ষণীয় ব্যবহার বিদ্যমান। যাতে দেখা যায়, সমাজের একদিকে কর্তৃত্বপরায়ণ শ্রেণি অপরদিকে রয়েছে তার প্রভাবাধীন শেণি বা সাবঅল্টার্ন শ্রেণি।[৬০৮]

এর মানে, নির্মবর্গীয় আলোচনায় প্রধান দুটি চরিত্রগত দিক রয়েছে। একটি হলো– প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য, প্রভাববিস্তার এবং অপরটি হলো– শোষণ, নিপীড়ন, দমন, নিয়ন্ত্রণ, বলপ্রয়োগ, দখলদারিত্ব, জুলুম, উচ্ছেদ, বিতাড়ান, নির্বাসন ইত্যাদি। এই মৌলিক উপাদান ও চরিত্রের কারণে নিম্নবর্গীয় ধারণায় পরবর্তীকালে উপনিবেশিক প্রভু এবং উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী– এমন বিন্যাস ও প্রক্রিয়া অনুসারে আলোচনা-পর্যালোচনা বিকশিত হয়েছে। ফলে সাবল্টার্ন তত্ত্বের এমন বিশ্লেষণ

---

[৬০৭]. লুডেন, ডেভিড, *আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব সাবঅল্টার্নিটি*—ডেভিড লুডেন সম্পাদিত *রিডিং সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ: ক্রিটিক্যাল হিস্ট্রি, কনটেস্টেড মিনিং এন্ড দ্য গ্লোবালাইজেশন অব সাউথ এশিয়া থেকে* (নিউ ইয়র্ক: অ্যানথেম প্রেস, ২০০২, খ্রি.), পৃ. ৪।

[৬০৮]. চট্রোপাধ্যায়, পার্থ, *ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*—গৌতম ভদ্র ও পার্থ চ্যাটার্জি সম্পাদিত *নিম্নবর্গের ইতিহাস* থেকে, পৃ. ৩-৪।

অনুযায়ী দেখা যায়– বিষয়টি শুধু উচ্চবর্গীয় এবং নিম্নবর্গীয় কিংবা উঁচুতলা বনাম নিচুতলার ইতরবিশেষ নিছক সরল ধারণার মধ্যেই আটকে থাকেনি। বরং তার আলোচনার পরিসর আরো বিচিত্র ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। ফলে সহজেই এই বিশ্লেষণের নমুদা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফিলিস্তিন ও ইজরাইলের সামাজিক, রাজনৈতিক প্যাটার্ন-বিন্যাস ও অবস্থান বোঝা যায়। যেখানে সাবঅল্টার্ন কেবল ফিলিস্তিনের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেই বোঝায় না, বরং ইজরাইল ও জায়োনিস্ট শক্তির ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখল, ফিলিস্তিনীদের তাদের আপন ভূমি থেকে উচ্ছেদ, দমন-পীড়ন, জুলুম-নির্যাতন, শোষণ-নির্বাসনের ঘটনাবলি দিয়ে এ ধারণাকে যেমন বোঝা যায় তেমনি ফিলিস্তিনে ইজরাইলের রাজনৈতিক উপনিবেশিক প্রভুসুলভ বাসনা এবং প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও একচেটিয়া হানাদারী নীতিও বোঝা সম্ভব। এতে ইজরাইলে বসবাসকারী ফিলিস্তিনী সংখ্যালঘু, প্রতিবেশী আরব দেশগুলোতে অবস্থানরত শরণার্থী এবং নির্বাসিত ফিলিস্তিনীরাও রয়েছে। অপরদিকে একই পাঠকে ইজরাইলের বর্ণবাদী এবং সাম্রাজ্যের বাসনা দিয়েও বোঝা সম্ভব।

সাবঅল্টার্ন তত্ত্ব ও ধারণার সাথে উত্তর-উপনিবেশিক তত্ত্ব ও ধারণার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন যারা তাদের অন্যতম হলেন এডওয়ার্ড সাঈদ এবং গায়ত্রি স্পিভাক। গায়ত্রি স্পিভাক মূলত ইতিহাস এবং সংস্কৃতি পর্যালোচনার পদ্ধতির দিক থেকে মার্ক্সীয় চিন্তা, ডিকনস্ট্রাকশন, নারীপ্রশ্ন ও উত্তর-উপনিবেশিকতা এবং নিম্ববর্গীয় চিন্তার পর্যালোচনা করেছেন তার বিভিন্ন লেখায়। গায়ত্রি মনে করেন, উপনিবেশায়ন এবং এর প্রক্রিয়া, ধারণা এবং মনস্তত্ব মূলত ব্রিটিশদের ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। কিন্তু তাদের উপনিবেশ, সাম্রাজ্য, সাহিত্য কিংবা ইতিহাস প্রতিষ্ঠায় উপনিবেশিতের এবং উপনিবেশিত সমাজ, দেশ-জাতি, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের কোনো মূল্য নেই। তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চা উপনিবেশিত জাতি ও জনগোষ্ঠীগুলোকে এভাবেই দেখে আসছে। তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার পরিসরে উপনিবেশিতদের কোনো জায়গা নেই। এটি একটি পরিস্থিতি এবং তাদের নির্মাণ করা একটি ইতিহাস যেখানে উপনিবেশিতরা ভাষাহীন এবং অবদমন করে রাখা নিপীড়িত জনগোষ্ঠী। ব্রিটিশ অর্থাৎ উপনিবেশিক প্রভুত্বকারীদের ইতিহাসে ভাষাহীনরা তাদের ইতিহাসের একেবারে প্রান্তে এবং তলায় অবস্থানকারী কতোগুলো গ্রুপ মাত্র। দেখা যাচ্ছে, ঐতিহাসিকভাবে রাজা-বাদশা কিংবা ক্ষমতাশীল শ্রেণির অবস্থান ও ভাষাকেই ইতিহাসে স্থান দেয়া হয়; যেখানে বিপরীত দিকে অবস্থানরত নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইতিহাসে এমন নিম্নবর্গের জীবন, ভাষা ও কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত। কিন্তু সর্বজনের সমস্বরের নামে যে ইতিহাস রচিত হয়ে আসছে নিম্নবর্গের মানুষের দিক থেকে এই ইতিহাস ছলনা ছাড়া আর কিছু নয়। সাবেক মার্ক্সীয় তত্ত্বে এর ব্যবহার থাকলেও গত কয়েক দশকজুড়ে পোস্ট-কলোনিয়াল স্টাডিতে নতুনতর বর্গ হিসেবে নিম্নবর্গ নিয়ে প্রচুর তর্কবিতর্ক হয়। এতে ক্ষমতাশীল শ্রেণির বিপরীতে নিম্নবর্গের ভাষা ও জীবন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তাদের অধিকার, রাজনৈতিক দ্রোহ ও প্রতিরোধও গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা ও প্রতিরোধ এই তত্ত্বের নির্ধারক বৈশিষ্ট্য।

ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের সময় সতিদাহ প্রথা নিয়ে প্রশ্ন তোলার মধ্যদিয়ে গায়ত্রি স্পিভাক মূলত তার নিজস্ব পর্যালোচনার জায়গা উন্মোচন করেন। স্পিভাক তার বিখ্যাত *Can the Subaltern Speak*? রচনায় উপনিবেশিত ভারতে নারীপ্রশ্ন নিয়ে পর্যালোচনা করতে চেয়েছেন। স্পিভাক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এভাবে– যে নারী উপনিবেশিক শাসনের মধ্যে স্বামীর সাথে সাথে সহমরণে যাচ্ছেন সে কি কথা বলতে পারছেন? স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারতেন? তার নিজের ব্যাপারে কিংবা অন্যসব ভারতীয় নারীদের ব্যাপারে? যেটা এমন একটা পরিস্থিতি, এমন একটা ব্যবস্থার মধ্যে ঘটমান যেখানে সত্যিকার কোনো ভাষা নেই, আওয়াজ নেই, প্রশ্ন নেই সেটা ভারতীয় হোক, আফ্রিকান হোক কিংবা যেকোনো জনপদের সাবঅল্টার্ন গ্রুপ কিংবা যেকোনো নিম্নবর্গীয় গ্রুপ হোক। সাবঅল্টার্ন গ্রুপের একই ইস্যুতে ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব মতামত থাকতে পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐতিহাসিক বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিশেষত উপনিবেশিক সময়ে শুধু নিজের অবস্থান প্রকাশ করার জন্য, নিজের মনোভাব, নিজের অধিকার প্রকাশের জন্য শুধু কথা বলাটাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। যেকারণে দেখা যায়, ঐতিহাসিকভাবে বিশেষত রাজনৈতিক ইস্যুতে একই পর্যায়ের সাবঅল্টার্ন গ্রুপের ভিন্নমত, বহুমত কিংবা সহমত গড়ে উঠতে দেখা গেল। স্পিভাক মনে করেন, ইতিহাসের যেকোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে নিম্নবর্গের মানুষ সত্যিই ভাবতে পারেন কিনা এটা তাদের বাইরের যেকারো পক্ষে বোঝা অনেক কঠিন। এমনকি তাদের সত্যিকারের ভাষা, কথা শুনতে পারাও তাদের পক্ষে কঠিন।[৬০৯]

সাবঅল্টার্ন কথা বলতে পারে?—প্রবাদের মতো এমন বাক্য সাবঅল্টার্ন বিষয়ক আলোচনায় খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। খুব আলোচিত এই বাক্য একসময় স্পিভাকের পরিচয় নির্ধারক হয়ে ওঠে। যাইহোক, স্পিভাক বস্তুত এটি বলার মধ্যদিয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেন। এর পেছনে কি ধরনের রাজনীতি, রাজনৈতিক এবং ক্ষমতার কাঠামো কার্যকর রয়েছে সেসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। একইসাথে তার প্রতিকারের পদ্ধতিও নির্দেশ করেন। সাবঅল্টার্ন কথা বলতে পারে? এই প্রশ্ন তোলাটাই খোদ একটি প্রতিরোধকারী বক্তব্য হয়ে ওঠে। কারণ খোদ এই প্রশ্নের মধ্যেই প্রতিকারের উপাদান রয়ে গেছে। স্পিভাক প্রথমত প্রতিরোধের জন্য ভাষা সচেতনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তবে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গ্রুপ যাকে নিম্নবর্গ বলছেন, এডওয়ার্ড সাঈদ তাকে বলেছেন সাবঅর্ডিনেট পিপল ()।[৬১০] সাঈদ মনে করেন, সাম্রাজ্য এবং তার ক্ষমতা কাঠামো যেভাবে কাঠামোগত এবং পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত তাতে যে শ্রেণিবিভাজন ঘটে তাতে করে উপনিবেশিত স্থানীয় জনগোষ্ঠী, তাদের সমাজ, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস গভীরভাবে অবদমিত হয়। একইসাথে প্রতিরোধের মাধ্যমে সেই অবদমিত ইতিহাস এবং সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারও সম্ভব। নিপীড়িতের

---

[৬০৯]. স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী, *ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক?*—রোজালিন্ড সি. মরিস সম্পাদিত *ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক?: রিফ্লেকশনস অন দি হিস্ট্রি অব এ্যান আইডিয়া থেকে* (নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০ খ্রি.), পৃ ৪০।

[৬১০]. ড্যাড, আজীজ আলী, *আ গাইড টু সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ' ক্রিটিক অব অরিয়েন্টালিজম* (পোস্টকলোনিয়াল.নেট, জুন ২৭, ২০১৯), ভিজিট: মে ১৪, ২০২৩, https://postcolonial.net/2019/06/a-guide-to-subaltern-studies-critique-of-orientalism/

আত্মসচেতনা এই প্রতিরোধের প্রধান নিয়ামক শক্তি। স্পিভাক যেটাকে বলছেন, 'সাবঅল্টার্ন কথা বলতে পারে?' সাঈদ একই কথাকে

ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে বলেছেন, 'আমরা কি বেঁচে আছি?[৬১১]। অন্যদিকে দারভীশ বলেছেন, 'আমাদের কি কোনো দেশ আছে'?

দারভীশকে মনে করা হয়, তিনি সবসময় 'দ্বিগুণ ঝুঁকি' (ডাবল জিওপার্ডি) মোকাবেলা করেছেন। কারণ একদিকে তিনি ফিলিস্তিনের হওয়ায় ইজরাইলের নিপীড়নের শিকার। অপরদিকে পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমা মনোভাবের কারণেও তিনি নিপীড়নের শিকার। দারভীশ প্রান্তিক মানুষের কথা বলেন। সার্বক্ষণিক নিজের দেশ, ভূমি, জাতি ও জনগণের কথা বলেন। নিজের ইতিহাস ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের কথা বলেন। মানুষের কারণে এমনকি তিনি রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েন। দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেন। আবার একইসাথে মানুষের জন্য, দেশ ও ভূমি রক্ষার স্বার্থে তিনি রাজনীতি থেকে সরেও আসেন। তার কবিতায়, ভাষায় সবসময় ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের নিম্নবর্গীয় মানুষের কণ্ঠ তুমুলভাবে উচ্চারিত হয়েছে। বিবিধ কারণে তাকে সাবঅল্টার্ন কবি বলা হয়। দারভীশ তার কবিতায় দেখিয়েছেন, সাবঅল্টার্নও কথা বলতে পারে। তার অধিকারের কথা, তার নিগ্রহের কথা, তার জুলুমের কথা, ভূমিহীনতার কথা বলতে পারে। এবং সর্বোপরি সাবঅল্টার্ন শুধু কথাই বলেনা, বরং তার নিজের জন্য, তার জাতি এবং সামগ্রিক ইতিহাস রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধও করতে সক্ষম।[৬১২]

মাহমুদ দারভীশ তার কবিজীবনের প্রাথমিক পর্বেই প্রতিরোধের কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফিলিস্তিনের নিপীড়িত, নিগৃহীত জনগণের পক্ষে তিনি লিখেছেন। ইজরাইলের রক্তচুক্ষু, কামান, বুলডোজার, মিসাইলকে উপেক্ষা করে মজলুম গণমানুষের ভাষায় কথা বলেছেন। ইজরাইলের জায়োনিস্ট দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে মানুষকে অনবরত সজাগ করেছেন। জায়োনিস্টদের হানাদারি তৎপরতা রুখে দিতে সাধারণ জনগণকে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। এসব কারণে সাবঅল্টার্ন কবি হিসেবে দারভীশকে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া দারভীশের কবিতায় প্রান্তিক মানুষের জীবনাচার, তাদের ভাষা, দুঃখ-বেদনা, জুলুম-বঞ্চনা, অধিকারহীনতা, অত্যাচার-নির্যাতন, ভূমিহীনতার কথা বিপুলভাবে এবং বিচিত্র ভাষায় স্থান পেয়েছে। অপরদিকে ইজরাইল যখন ফিলিস্তিনীদের 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত করছে এবং অনবরত ফিলিস্তিনের জনগণকে মানুষ নয়–সন্ত্রাসী–হিসেবে ল্যাবেল দিয়ে বিমানবিকীকরণ করছে দারভীশ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। দারভীশ শুধু ফিলিস্তিন নয় একইসাথে ইজরাইলের ইহুদি জনগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে নিজের ইতিবাচক অবস্থান

---

[৬১১]. সাঈদ, এডওয়ার্ড, *অন প্যালেস্টাইনিয়ান আইডেন্টিটি: আ কনভার্সেশন উইথ সালমান রুশদি* (নিউ ল্যাপ্ট রিভিউ, ভলিয়ম: ১, সংখ্যা: ১৬০, নভেম্বর/ডিসেম্বর, ১৯৮৬), ভিজিট: মে ১৪, ২০২৩, https://newleftreview.org/issues/i160/articles/edward-said-on-palestinian-identity-a-conversation-with-salman-rushdie

[৬১২]. ইউসেফ, তাওফিক ও আসীল আবু আল রুব, *দি সাবঅল্টার্ন ইন সাম সিলেক্টেড পোয়েমস বাই মাহমুদ দারভীশ* (যুক্তরাষ্ট্র: কালচারাল এন্ড রিলিজিয়াস স্টাডিজ, ডেভিড পাবলিশিং কোম্পানি, ভলিয়ম: ৪, সংখ্যা: ৫, মে, ২০১৬), পৃ. ২৮৮।

প্রকাশ করেন। নিজেদের পাশাপাশি ‘অপর’র মানবিক মর্যাদার ব্যাপারে দারভীশ সতর্ক ছিলেন। ফিলিস্তিনীদের ক্রমাগত আত্মপরিচয়হীন করে তোলার জায়োনিস্ট প্রকল্পের বিরুদ্ধে দারভীশ ভাষাহীন এবং পরিচয়হীন ফিলিস্তিনী জনগণকে নতুন করে আত্মসচেতন করে তোলেন। তার কবিতায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা যেমন রয়েছে তেমনি আত্মপরিচয়হীন, ‘ভাষাহীন’ নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা এবং আত্মপরিচয়ের কথা উঠে এসেছে।

ভাষাহীনতা কথাটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কথাটি আসলে কি অর্থ বহন করে? নিম্ববর্গের আলোচনায় ভাষাহীনতা বেশ আলোচিত একটি প্রসঙ্গ। উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের মধ্যে যেসব সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং বিচারিক কাঠামো ও শৃঙ্খলা গড়ে তোলা হয় তার মধ্যে নিম্নবর্গের নিজের বঞ্চনার কথা বলার অধিকার তো দূরের কথা তার কোনো অবস্থানেরই মূল্য বহন করেনা। সমাজে এমন এক বাস্তবতা তৈরি করা হয় উপনিবেশিত কাঠামোর কারণে যাতে নিম্নবর্গের কথা বলার রীতিই উধাও হয়ে যায়। কাঠামোগতভাবেই তার অস্তিত্বের সক্রিয়তা কিংবা ব্যবহারিক মূল্য নাই করে দেয়া হয়। ফলে নিজের সমাজ ও সংস্কৃতির মাঝে থেকেও নিম্নবর্গীয় মানুষের আর কোনো পরিচয় থাকে না। একটি বিমানবীয় সংস্কৃতির মধ্যে তার বেড়ে ওঠা নিশ্চিত হয়। যেখানে তার কথা বলার অধিকার ভাবা যায় না। এক অবদমিত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এ ধরনের পরিস্থিতিতে।[৬১৩]

পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য প্রতিরোধই একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে তখন। একটি সময় ঐতিহাসিকভাবে প্রতিরোধই অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেখানে প্রথম আঘাত তৈরি হয় ভাষা থেকে। ফলে সাবঅল্টার্নের জন্য ভাষা নিজেই একটি প্রতিরোধ। দারভীশ বলেন,

حملتُ صوتكَ في قلبي وأوردتي
فما عليك إذا فارقتَ معركتي
أطعمتُ للريح أبياتي وزخرفها
إن لم تكن كسيوف النار.. قافيتي !
آمنت بالحرفِ.. إما ميتاً عَدَماً
أو ناصباً لعدوّي حبلَ مشنقِة
آمنت بالحرف ناراً...[৬১৪]

[৬১৩]. বার্গম্যান র‍্যামোস, মিরা, *প্যাডাগজি অব দি অপরেসড*——পাওলো ফ্রিয়েরে’র মূলগ্রন্থ (ব্রাজিলিয়ান) *Pedagogia del oprimido*’র অনুবাদ (নিউ ইয়র্ক: কন্টিনিয়াম, ১৯৭০), পৃ. ৪৮।
[৬১৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১*, ২০০৫, পৃ. ১৭।

আমার শিরায়-স্নায়ুতন্ত্রে হৃদয়ে বয়ে চলি তোমার কণ্ঠ
তোমার কিছুই নেই যখন লড়াই ছেড়ে দেবে
বাতাসকে খেতে দিয়েছি আমার কবিতা ও অলঙ্কার
যদি আগুনের তরবারির মতো না হতো আমার অন্ত্যমিল!
মৃত হোক কিবা অস্তিত্বহীন বিশ্বাস করি আমি অক্ষরে–ভাষায়...
কিংবা হোক সেই ভাষা শত্রুর জন্য ফাঁসির রজ্জু স্থাপনকারী
আমি তবু বিশ্বাস করি অক্ষরের আগুন...

এই আগুন ঝরা ভাষায় কবি 'তোমার কণ্ঠ' বলে কার কণ্ঠ'র কথা বুঝিয়েছেন? দারভীশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'জলপাইয়ের পত্রাবলী'র দ্বিতীয় কবিতা এটি। বইটি প্রধানত ক্ষোভ, দ্রোহ, প্রতিরোধ, শোক-যন্ত্রণা, উচ্ছেদ-নির্বাসন, কারানির্যাতন, মৃত্যু-গণহত্যা ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত। যেখানে আসলে তিনি তার নির্যাতিত জনগণের কথা বলেছেন। নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে তার কবিতায়। যে কণ্ঠ কবি তার হৃদয়ে স্নায়ুতন্ত্রে শিরায় আত্মায় বয়ে বেড়ান। যেখানে একমাত্র তার দ্রোহের হাতিয়ার হয়ে ওঠে তার ভাষা এবং কবিতা। যে সাবঅল্টার্নের কথা বলা হয়েছে– যেখানে তাদের ভাষাপ্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল– কারণ, তারা কথা বলতে পারে না, নিজেদের কথা বলার সুযোগ নেই। মোটকথা যেখানে তারা কথা বলতে পারে না, তার মানে তাদের ভাষাও একপ্রকার নাই হয়ে আছে। অস্তিত্বহীন। দারভীশ তাই তার অতিসাধারণ আর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমার ভাষা মৃত হোক আর অস্তিত্বহীন হোক–যাই হোক নাক কেন– আমি তোমার ভাষাতেই বিশ্বাস করি। তোমার ভাষাতেই আস্থা রাখি।

দারভীশ যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন ষাটের দশকে তখন ফিলিস্তিনে ইজরাইলের তৎপরতা ছিল বহুমুখী। ইজরাইল শুধু সামরিক ও নিরাপত্তাজনিত তৎপরতাই চলমান রাখেনি তারা ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব এবং আর্থসামাজিক নানা পরিসর, সম্পর্ক ও কাঠামোগুলোতেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। সামরিক কথাটা সেক্ষেত্রে যতোটা পরিচিত ততোটাই অপরিচিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি। ইজরাইল তার দখলদারি উপনিবেশায়ন (সেটলার কলোনাইজেশন) প্রকল্প যেমন অব্যাহত রেখেছে, অপরদিকে একইসাথে ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের প্রতিরোধও শুরু হয় ইতিমধ্যে। এসব প্রতিরোধ সংঘবদ্ধভাবে না হলেও ফিলিস্তিনের নানা প্রান্তে প্রতিরোধ তৎপরতা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। জায়োনিস্ট আগ্রাসন যেমন নানামুখি ছিল তেমনি প্রতিরোধের মাত্রাও কমবেশি ইজরাইলের হস্তক্ষেপের শিকার সবক্ষেত্রেই শুরু হয়। এ সময়ের প্রতিরোধকে যেমন নিম্নবর্গের দিক থেকে চিহ্নিত করা যায় তেমনি বিউপনিবেশায়নের দিক থেকেও বিবেচনা করা যায়। ফিলিস্তিনের খ্যাতিমান ইতিহাস বিশ্লেষক ও তাত্ত্বিক নূর মাসালহা মনে করেন, ইজরাইলের সর্বগ্রাসী ব্যাপকতরো উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া যেমন ফিলিস্তিনকে লক্ষ্য করে চলমান রয়েছে তেমনি তার বিপরীতে ফিলিস্তিনীদের বিউপনিবেশায়নও চলমান। ফিলিস্তিনের জনগণ ইজরাইলের যেকোনো আগ্রাসী সক্রিয়তার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গ্রহণ করেছে তাকে সাধারণ অর্থে বিউপনিবেশায়ন বলা চলে।

ফিলিস্তিনের চলমান ইতিহাস একদিক থেকে তাই বিউপনিবেশায়নের পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে নির্মিত হয়ে চলেছে।

তাতে পদ্ধতিগত দিক থেকে ফিলিস্তিনের আদি জনবসতি, কৃষি, পরিবেশ, ভাষা, শিক্ষা, নারীইস্যু ও জনসংস্কৃতির বিউপনিবেশায়ন যেমন গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি সাবঅল্টার্ন এবং ফিলিস্তিনের ইতিহাসের পদ্ধতিকরণও গুরুত্ব পেয়েছে। ইজরাইল বনাম ফিলিস্তিন– প্রেক্ষিতে ফিলিস্তিনের জাতিয়তা একটি চ্যালেঞ্জ এক্ষেত্রে। অপরদিকে আছে ফিলিস্তিনের নাগরিক সমাজ, সুশীল সমাজ, অভিজাত শ্রেণি, শহরের জনগোষ্ঠী, নগর-সংস্কৃতি, আইন ও বিচারিক রীতি-কাঠামো ইত্যাদি। বিউপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত দিক থেকে এগুলো বড়ধরনের চ্যালেঞ্জ। এছাড়া ফিলিস্তিন-ইজরাইল– এই বাইনারির ভিতরে চলমান বাস্তবতায় আরো যেসব ক্যাটাগরি মোকাবেলা করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে, 'প্রাচীন-নতুন ইতিহাস, উপরতলা-নিচুতলা, লিঙ্গ-রাজনীতি, বর্ণবাদী ইতিহাসের বয়ান। এসবের মধ্যদিয়ে মূলত ফিলিস্তিনের বিউপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া। এছাড়া সাম্প্রতিক কালের ফিলিস্তিনের বিউপনিবেশায়নের পটভূমিতে রয়েছে জাতিগত নির্মূলকরণ, রাজনৈকি ও সাংস্কৃতিক গণহত্যা। যা মূলত ১৯৪৮ এর জাতিগত নির্মূলকরণের মধ্যদিয়ে শুরু হয়েছে। এর ঐতিহাসিক নাম 'নাকবা'। নাকবাকে কেন্দ্র করে বিউপনিবেশায়নের যেসব অনুসঙ্গ উপজিব্য হয়ে আছে তাতে রয়েছে যায়োনিজমের পদ্ধতিগত নিমূলকরণের ইতিহাস, ইতিহাস, জনস্মৃতি, মৌখিক ইতিহাস (ওরাল হিস্ট্রি), ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, ভাষা-প্রত্নতত্ত্ব মুছে ফেলার স্মৃতি, শোক, যন্ত্রণা (ট্রমা), গ্রাম-শহর ধ্বংসকরণ, দখল, উচ্ছেদ, নির্বাসন, নাম মুছে ফেলা ইত্যাদি।[৬১৫]

একটি জাতিগঠন এবং তার বাধা ও সম্ভাবনা সবকিছু সামনে রেখে দারভীশের প্রতিরোধ বিচিত্র, ব্যাপক ও গভীর। কারণ আর্থ-সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র, শত্রু-মিত্র, ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস থেকে শুরু করে মানুষের আত্মিক ও মানবিক সবমিলিয়ে দারভীশ তার প্রতিরোধের বয়ান তৈরি করেছেন। দারভীশ শুধু কবিতার পর কবিতা লিখে যাননি, বরং তার কবিতায় যেসব উপাদান ও সারনির্যাস উঠে এসেছে তাতে জাতিগঠনের সামগ্রিক উপাদান রচিত হয়েছে। ফলে কবির কবিতায় উঠে আসছে রূপকের আদলে জাতি গঠনের কারিগরের চরিত্র। দারভীশ যেমন তার কবিতায় শিশুর জীবনপ্রক্রিয়া গড়ে তোলেন তেমনি সৃষ্টি করেন মাটি ও মৃত্তিকার বিস্তৃতি ও গভীরতা। সৃষ্টি করেন নতুন নক্ষত্র, নয়া আকাশ। নয়া প্রকৃতি। এই শিশু, মাটি আর নক্ষত্রের আলো দিয়ে কবির প্রতিরোধ অনেক দূর বিস্তারিত হয়েছে। দারভীশ বলেন,

لو كان لي حقل ومحراث
زرعت القلب والأشعار
في بطن التراب
لو كان لي عود

৬১৫. মাসালহা, নূর, *দি প্যালেস্টাইনিয়ান নাকবা*, পৃ. ২০৬-২৫৭।

ملأت الصمت أسئلة ملحنة
وسليت الصحاب
لو كان لي قدم
مشيت – مشيت حتي الموت
من غاب لغاب
لو كان لي......

যদি থাকতো আমার একটি ফসলক্ষেত, লাঙ্গল
আমি চাষ করতাম মাটির ভিতর
হৃদয়, কবিতা
যদি থাকতো আমার একটি বীণা
নিস্তব্ধতাকে ভরিয়ে তুলতাম তরঙ্গিত বিপুল জিজ্ঞাসায়
মুগ্ধ করতাম বন্ধুদের
যদি থাকতো আমার একটি পা।
আমি হাঁটতাম... হাঁটতাম মৃত্যু পর্যন্ত
যারা অদৃশ্য হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে তারা
হায় যদি থাকতো আমার ....[৬১৬]

'এই কবিতায় মূলত কবি একজন ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ যোদ্ধার চরিত্র ধারণ করে তার মনের আকাঙক্ষা চিত্রিত করেছেন আবেগপূর্ণ ভাষায়। '৪৮'র মহাদুর্যোগ ও '৫৬'র কাফার কাসেমের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, নিহত হয়। চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেন অনেকে। তবু কি তারা তাদের ভূমি আর অস্তিত্ব ফিরিয়ে আনার লড়াই থেকে বিমুখ হয়ে পড়েন? না। বরং তারা আরো বেশী উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। কবিতাংশটিতে মূলত সেই সময়ের পঙ্গুত্ব বরণকারী এক যোদ্ধার চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু গণমানুষের লড়াইয়ের অভিমুখে সার্বিক রূপদানে কবির বিপুল আকুলতা ধরা পড়ে কবিতার পঙক্তিগুলোতে। কবি তার প্রতিরোধ শুরু করেন বহুব্যাপ্তী নিয়ে। গোড়া থেকে, ভেতর থেকে। এই প্রতিরোধ মননের। মানস গঠনের। কবির মনোযোগ মূলত লড়াইরত শ্রেণী গুলোর প্রতিরোধের অন্তর্গত ভিত্তি গঠনে। এবং এই শ্রেণী গুলোর লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সকল দিক থেকে জাতীয় অগ্রগতির নিশ্চয়তা তৈরি করে। কবি তাই কবিতার ভাষায় উচ্চারণ করেন: "যদি থাকতো আমার একটি শস্য ক্ষেত, একটি লাঙ্গল/ আমি চাষ করতাম মাটির ভেতরে হৃদয়, কবিতা।" কবিতায় কবির প্রতিরোধ প্রাচীরের ব্যাপ্তি আরো তীব্রভাবে উপস্থিত হয়।'[৬১৭] একটি ফসলী জমিতে চাষ করতেন কবি। যার জন্য দরকার একটি লাঙ্গল। এই কাব্যোক্তি একটি প্রতীকী বক্তব্য। কবি জমি আর লাঙল দিয়ে চাষ করতেন। পরিচর্যা করতেন। জমি

[৬১৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১* ২০০৫, পৃ. ৯৯।
[৬১৭]. হোসেন, শাহাদাৎ, ২০০৮, ৯০।

আর ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এরপর একদিন তা ফলনে ভওে উঠতো। একটি জাতিগঠনের স্বপ্নের বিভোর ছিলেন কবি। যাকে তিনি ফসলের মতো চাষ করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে, পরিচর্যা করে তৈরি করতেন। একসময় সে জাতি প্রতিষ্ঠিত হবে। কবি আরো বলেন,

سنظل في الزيتون خضرته
وحول الأرض درعا[৬১৮]

অচিরেই আমরা হয়ে যাবো জলপাইয়ের সবুজ
হয়ে যাবো পৃথিবীর চারপাশে সাঁজোয়া, বর্ম।

কবিতাটিতে দেখা যায় চারদিকে সবুজে ঘেরা একটা পরিবেশ। সবুজের প্রাচুর্য এতোটা যে মনে হবে যেন সেখানকার বসবাসকারীরাও খোদ সবুজে রূপান্তরিত হয়ে উঠছেন। কিন্তু কেন দারভীশ এমন সবুজের কল্পনা করতেন? কারণ সবুজকে তিনি প্রতিরোধের অনুষঙ্গ মনে করেন। কারণ সবুজ প্রকৃতিই তাদের ডাল ও বর্ম হয়ে তাদের শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করছে। ১৯৪৮ এর ভয়াবহ ধ্বংসের স্মৃতি মনে রেখে দারভীশ লিখেছেন এসব কবিতা। ৪৮'র যুদ্ধে ইজরাইল গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল। পুরো প্রকৃতি সবুজ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। ফিলিস্তিনের ইতিহাস বিশ্লেষক সালমান আবু সিত্তা জানান, ৪৮'র জাতিগত নির্মূলকরণের সময় ৫৩১টি গ্রামের অধিকাংশ বসতি অপর দেশে শরণার্থী শিবির আশ্রয় নিয়েছিল। কারণ তাদেরকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হলে তারা দেশে ছেড়ে চলে যায় প্রতিবেশি দেশগুলোতে।[৬১৯] এছাড়া ৪১৮টি গ্রাম পুরোপুরি জনমানবহীন হয়ে পড়ে। এবং ২৯৩টি গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয় ইজরাইলের সেনাবাহিনী।[৬২০] এই সবুজই আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন কবি।

একটি কবিতা দিয়ে পুরো ফিলিস্তিনের পুরো প্রতিরোধকে বোঝা সম্ভব। নিম্নবর্গ কিংবা বিউপনিবেশায়ন সবকিছু এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। যেখানে একটি কবিতায় প্রতিরোধ কতো বিস্তৃত এবং ব্যাপক সহজে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

---

[৬১৮]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৯।

[৬১৯]. আবু সিত্তা, সালমান, *ম্যাপিং মাই রিটার্ন: আ প্যালেস্টাইনিয়ান মেমোয়র* (কায়রো: দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব কায়রো প্রেস, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৮৫-৯২।

[৬২০]. খালিদি, ওয়ালিদ (সম্পাদিত), *ফ্রম হেভেন টু কনকোয়েস্ট: রিডিংগস ইন জায়োনিজম এন্ড দ্য প্যালেস্টাইন প্রবলেম আনটিল ১৯৪৮* (বৈরুত: দি ইনস্টিটিউট ফর প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৭৬১-৮৬৭।

৬.২: প্রকৃতি ও প্রতিরোধ

দারভীশের কবিতায় প্রকৃতি একটি বড় জায়গা করে রেখেছে। ভিন্ন অর্থে। সাধারণত যেমন প্রকৃতির নান্দনিক বর্ণনা, উপমা ও চিত্রকল্পের আড়ম্বর বিবরণে রঙিন হয়ে ওঠে কবিতার পৃষ্ঠা। প্রকৃতির যেমন নিখাদ বর্ণনা রয়েছে, রয়েছে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আর তার সাহিত্যিক ও কাব্যময় প্রয়োগের সীমাহীন বিস্তার। কিন্তু দারভীশের কবিতা ঠিক তেমনটি নয়। তবু প্রকৃতি তার কবিতাকে জীবনঘনিষ্টতা দিয়েছে সবদিক থেকে। কারণ কবি আর প্রকৃতি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতি আর মানুষের জীবনকে দারভীশ বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ দিতে চাননি। প্রকৃতিকে নিজের সৌন্দর্য্যের চাহিদা ও কামনা উপভোগের একমাত্র উপায় হিসেবে নিতে দারভীশ একদম রাজি নন। কারণ দারভীশ শুধু প্রকৃতির কবি হয়ে থাকতে চাননি। নিসর্গ প্রেমিকের মতো নিছক প্রকৃতিকে অবগাহন করতে চাননি। দারভীশ কবি হিসেবে প্রকৃতিকে প্রধানত মানুষের প্রয়োজন ও বিপদের বন্ধুর মতো দেখতে চেয়েছেন। কবির কবিতায় তাই প্রকৃতি নিজেই যেন প্রতিরোধের নীরব প্রহরী হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি আর মানুষ যেখানে পরস্পর সহযাত্রী হয়ে উঠেছে তার কবিতায়।

ফিলিস্তিনের প্রকৃতি কেমন?

অন্যান্য আরব দেশগুলোর মতো ফিলিস্তিনের প্রকৃতি এক নয়। এখানে বৃক্ষের মতো মোহনীয় সবুজ রঙ ধারণ করে আছে পাথর আর পাথর। ফিলিস্তিনের সৌন্দর্য যেন আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় পাথরের বিচিত্র সৃষ্টি। সবুজ পাথরের শখ্য নিয়ে ফিলিস্তিনের আকাশও ছেয়ে যায় জলপাই বনের গভীর সবুজে। প্রচুর বালুভূমি আছে। সবুজ প্রান্তরের দেহ কেটে কেটে বিস্তৃত হয়ে গেছে অসংখ্য পর্বতের সারি। পর্বতগুলোর শরীর ঢেকে রযেছে জলপাইয়ের বন। কমলার উদ্যান। তার ভেতর রয়েছে ছোট-বড় অনেক নদী। নদী পার হয়ে মায়াবী হাতছানি আছে মাঠভরা গমের শীষের। সঙ্গে আছে কোমল বাতাস, কমলা আর লেবুর রস ঝরানো গন্ধের চাতুর্য। প্রচুর পরিমাণে কমলা ও লেবুর চাষ হয় ফিলিস্তিনে। প্রায় পুরো বছরই ফিলিস্তিনের আকাশ আরবের অন্য দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ থাকে। যেখানে নির্মল বাতাসে আছে চাঁদনী রাত। খুব কাছেই আছে ভূমধ্যসাগরের নিবিড় সুরধারী গর্জন। নগরের কোলাহল পার হয়ে গ্রামে এলে সারা ফিলিস্তিনকে মনে হবে ছায়া সুনিবীড় এক ধ্যানমগ্ন পরিবেশ। বৃক্ষঘন গ্রামীণ ফিলিস্তিনে চড়ুই পাখির বিপুল কোলাহলের মধ্যেই আছে অসংখ্য ধ্যানমুখী সুশান্ত কবুতর আর ঘুঘু পাখির নির্মল জীবন যাপন। তাই সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই বহু নবী রাসুল, জ্ঞানী, গুণী, কবি, দার্শনিক ও সাধকের আগমন ঘটে এখানে। বিশেষত নবী সোলাইমান (আঃ) এর জন্মে ফিলিস্তিনসহ গোটা জগত ধন্য হয়। এখানকার মানুষের আচার-আচরণ, চলন-বলন আর সমগ্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে তাওরাত, জবুর, ইঞ্জীল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ এই পুণ্য ভূমিতে যে কারো হৃদয় মন সংবেদনময় হয়ে ওঠে। জ্ঞান ও মননশীলতার জন্য এই পরিবেশ খুবই উর্বর ও সহায়ক। ফিলিস্তিনের এমন প্রাকৃতিক পরিবেশেই হযরত দাউদও (আঃ) বেড়ে ওঠেন মোহময় বাঁশির সুরালোকে। কারণ ফিলিস্তিন কবিতা আর সুরেরও এক অনন্য ভূমি। ফিলিস্তিনের গান ও সুরের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। চর্চায় সাধনায় আরবীয় সংগীতে

ফিলিস্তিনী গীতিকা ও সুরের অবদান অনেক বেশি মৌলিক। ফিলিস্তিনী সুরের বাণী– জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূফী ভাবে সমৃদ্ধ। তেমনি এর লিরিকে আছে প্রেমময় আবেগের মূর্ছনা। ফিলিস্তিনের গান ও সুরের ক্ল্যাসিক ধারা প্রেম, ভাব ও দর্শন সঞ্জাত হওয়ায় এখানকার লোকজ এমনকি আধুনিক গানেও এর প্রভাব লক্ষণীয়।[৬২১] এবং হযরত দাউদ আঃ এই ক্ল্যাসিক ধারার অন্যতম পথিকৃত। তবে গান তার মুখ্য চর্চা ছিলো না। তিনি তার স্বভাবসুরকে নিবেদন করেন তাওরাতে।[৬২২]

গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষজন প্রকৃতির সাথে যেভাবে মিশে যায় সেখানে প্রকৃতিকে আলাদা করে চিন্তা করতে পারেননি দারভীশ। কারণ প্রকৃতির অন্য সব সত্ত্বার মতো, মানুষও একটি সত্ত্বা। প্রকৃতির আর অংশগুলোর মতো মানুষ প্রকৃতিরই একটি অংশ। একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। ব্যবচ্ছেদ ঘটাবার কোনো উপায় নাই। ফলে কবিতা বা নন্দন তত্ত্বে স্বতন্ত্র বিষয় আকারে প্রকৃতির যে তাৎপর্য দারভীশের কাছে তা নিতান্তই গৌণ। প্রকৃতিকে ভিন্ন বা একক বিষয় করে শিল্প ও সৌন্দর্যের যে চর্চা গড়ে ওঠেছে দারভীশের চিন্তায় তা আলাদাকরণ প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। দারভীশ বিভাজনপ্রবণ যে কোনো প্রচেষ্টার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একরৈখিক শিল্প ও কাব্য চর্চার ইতিহাসে প্রকৃতি কেন্দ্রীক রোমান্টিকতা, রোমান্টিসিজম এবং প্রকৃতিকে সৌন্দর্যের আধার গণ্য করে যে ধারণা, তত্ত্ব, চর্চা ও প্রত্যয়ের ভীত মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত দারভীশ তার অভিমুখ প্রতিষ্ঠা করেন এর বিপরীত পথে। দারভীশের কবিতায় প্রকৃতির অনুষঙ্গ এসেছে জীবনের সামগ্রিকতা অনুসরণ করে। প্রকৃতির চিত্র দারভীশের কবিতায় বিপুলভাবে উপস্থিত। এই উপস্থিতি প্রকৃতিকে অর্থ ও পার্থক্যে অনেক দূর সম্প্রসারিত করেছে। কবি প্রকৃতিকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেননি। নিছক শৈল্পিক কাঠামো গঠনের তাগিদে প্রকৃতিকে আত্মস্থ করেননি কবি। প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের জায়গায় ছিলো দারভীশের অনুসন্ধান।

জীবনের সৌন্দর্য্য, মাহাত্ম এখানেই দারভীশকে নিয়ে গেছে। দারভীশ কেবল এই একটি জায়গায় স্থির থাকেননি। জীবনের শেষ নাগাদ তার পরিভ্রমণ আরো অনেক দূর অতিক্রম করে। প্রথাগত স্থির পথে দারভীশের প্রকৃতি এগোয়নি। বিভিন্ন ঘটনায় নানা সময়ে নানা কারণে প্রকৃতি হাজির হয় তার কবিতায়। এটিই তার মূল বিষয় নয়। তার প্রেরণার বিষয় দেশ, মাটি, প্রকৃতি ও জীবন। এই দেশ, জীবন বা মানুষের সাথে প্রকৃতি একাকার। একনিষ্ঠ। প্রকৃতি আর জীবন আলাদা নয়। পৃথক কোনো সৌন্দর্য নয়। তার কাব্যমানস গতিশীল ছিলো প্রকৃতি ও মানুষের সমকালীন সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা বা নতুন বোঝাপড়াকে কেন্দ্র করে। আর দেশ ও তার ইতিহাস ছিলো কেবল উপলক্ষ। মূলত তার অভিযাত্রা ছিলো একটি অবিচ্ছেদ্য পূর্ণতার দিকে। ফলে প্রকৃতির রূপচিত্র তার কাছে নিছক শিল্পের উপকরণ হয়ে আসেনি। প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক রচনা করা ছিলো তার কর্তব্য ও ধ্যান। দারভীশের এই জীবন চৈতন্য কবিতায়, ভাষায়, যাবতীয় কর্মে প্রতিফলিত হয় বাস্তবতাকে সংলগ্ন করে। সেজন্য তার কবিতায় দেখা যায়– কৃষক কখনো গোলাপকে গমের শীষের উপর প্রাধান্য

---

[৬২১]. আল নাক্কাশ, রাজা, *শায়ির আল আর্‌দ আল মুহতাল্লাহ*, পৃ. ১৫৫।

[৬২২]. হোসেন, শাহাদাৎ, ২০০৮, পৃ. ১০৭-১১০।

দেয় না। অবশ্য সৌন্দর্য্য ও শিল্পের সমালোচকগণ গমশীষের উপর গোলাপকে প্রাধান্য দিতে পারেন। কিন্তু দারভীশের মনোযোগ সৌন্দর্য্য চর্চাকারীদের প্রতি নয়। তার অভিনিবেশ কৃষকের প্রতি। কৃষক মানে এখানে চাষাবাদের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে কমবেশি জড়িত। এবং তাহলে গোলাপের উপর গমের শীষের প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টিও জীবনের মানবিক চর্চার সাথে সম্পর্কিত। কৃষকদের প্রতি দারভীশের যে দৃষ্টিপাত এটি শ্রেণিচিন্তার কারণেও হতে পারে। কারণ শৈশবেই দারভীশ কম্যুনিস্ট মতাদর্শের দীক্ষা নিয়েছিলেন। দারভীশ বলেন:

-2-
إنا نحبُّ الوردَ،
لكنّا نحبُّ القمحَ أكثرْ
ونحبُّ عطر الورد،
لكن السنابل منه أطهرْ
فاحموا سنابلكم من الإعصار
بالصدر المسَمَّرْ
هاتوا السياج من الصدور...
من الصدور، فكيف يكسرْ؟؟
اقبض على عنق السنابل
مثلما عانقتَ خنجرْ!
الأرض، والفلاح، والإصرار،
قل لي: كيف تقهرْ...
هذي الأقاليم الثلاثة،
كيف تقهرْ؟[৬২৩]

আমরা ভালোবাসি গোলাপ
তারচে বেশি বাসি গম
আমরা ভালোবাসি গোলাপের সৌরভ
তবু তারচে বড় পবিত্র গমের শীষ
এবং ঝড় থেকে রক্ষ করো তোমাদের শীষগুলো
রোদে পোড়া তামাটে বুক দিয়ে
বুক থেকে গড়ে তোলো বুকের প্রাচীর।
কী করে তা ভাঙ্গবে?
শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরো শীষের গ্রীবা
যেমন তুমি গলাগলি করো খঞ্জরে
জমিতে, কৃষকে, দ্রোহে

[৬২৩]. মাহমুদ দারভীশ. আদ্দীওয়ান. আল আ'মালুল উলা-১. ২০০৫. পৃ. ৪৯

বলো, কী করে পদানত করবে
এমন তৃ-জগৎ শক্তি
কেমন করে পরাজিত করবে?

গোলাপ ও গমের শীষ। এমন একটি প্রতীক তৈরি করলেন দারভীশ তার কবিতায় যাতে শিল্প ও সৌন্দর্য্যের

এ যাবতকালের সকল চিন্তা ভাবনার রশি ধরে টান দিয়েছেন। নিছক অস্তিত্ববাদী জায়গা থেকে দারভীশের এ অবস্থার ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করা যাবে না। কারণ গম এবং শীষকে দুই শ্রেণির কিংবা দুই বাস্তবতার প্রতীক হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন কবি। কবি কোন দিকে যাবেন? দারভীশ গোলাপকে নেননি দৃশ্যত। কিন্তু গোলাপকে না নেয়ার বিষয় এখানে একেবারেই গৌণ। কারণ দারভীশ তার সৌন্দর্য্যবিদ্যার সংজ্ঞা যে মানদণ্ডে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, তা হলো ফিলিস্তিনী জনগণের সে সময়ের উৎপাদন ব্যবস্থায় গোলাপের ভূমিকার চেয়ে গমের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কবি যেমন বলেন,

ولیکن...
لا بد لي أن أرفض الورد الذي
يأتي من القاموس، أو ديوان شعر
ينبت الورد على ساعد فلاّح، و في قبضة عامل
ينبت الورد على جرح مقاتل
و على جبهة صخر....[৬২৪]

আমার জন্য অপরিহার্য গোলাপকে প্রত্যাখ্যান করা
যা আসে অভিধান থেকে, কিংবা কবিতার দিওয়ান থেকে
গোলাপ তো জাগ্রত হয় কৃষকের বাহুতে, শ্রমিকের মুষ্ঠিতে
গোলাপ ভেদ করে ওঠে লড়াকুর জখমের উপর
পাথরের কপাল ছুঁয়ে।

গম এবং গোলাপের আলোচনার মধ্যদিয়ে কবি অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়েন। কারণ কবি প্রতিরোধ করতে এসেছেন। এই প্রতিরোধ যেমন ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ইজরাইলের প্রকৃতিবিষয়ক বর্ণবাদী ধারণা ও কৃষিনীতির বিরুদ্ধে তেমনি কবিতাকলায় জেঁকে বসা প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা কিংবা নিছক প্রকৃতিকেন্দ্রিক রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে। একইসাথে সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে।[৬২৫] কবিতার শিল্পকে বাস্তবতার ভিতর দিয়ে ধারণ করতে চেয়েছেন দারভীশ। যে বাস্তবতায় ফিলিস্তিনের জীবন,

---

[৬২৪]. প্রাগুক্ত. পৃ. ১৮৮।
[৬২৫]. হামিদি, তাহরির, *বেয়ারিং উইটনেস ইন প্যালেস্টাইনিয়ান রেজিসট্যান্স লিটারেচার* (রেস এন্ড ক্লাস, ইন্সটিটিউট অব রেস রিলেশনস, ভল: ৫২ (৩), ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২১-৪২। Race & Class, 1 Institute of Race Relations, ২০১১ খ্রি.), পৃ.। Hamidi. T. (2011)Bearing Witness in Palestinian Resistance Literature’, Race and Class 52 (3): 21–42.

ভূমি, কৃষি ও সামগ্রিক প্রাণবৈচিত্র্যের সংহতি ও অখণ্ডতা ধ্বংস করে দেয়ার নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে ইজরাইল ও তার জায়োনিস্ট ক্ষমতাকাঠামো তেমন পরিস্থিতিতে শিল্প, কবিতা ও সাহিত্যের ভূমিকা, সাহিত্য ও কবিতার কাজ কি তার নয়া রূপরেখা বাতলে দিতে চান কবি। কিংবা পুরো সাহিত্য ও কবিতাকলার ব্যবস্থা নতুন করে নির্মাণের তাগিদ অনুভব করেন দারভীশ। কবি মূলত প্রকৃতি ও মানুষের জীবন প্রণালী একটি পরম্পর সহায়ক ও ইকোসেন্ট্রিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গড়ে তুলতে চান। বস্তুত নাকবা পরবর্তী ফিলিস্তিনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিসরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাতে যেমন উপনিবেশিক অবস্থা তৈরি হয়, তেমনি প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে উত্তর-উপনিবেশিক প্রক্রিয়াও গড়ে ওঠে। নাকবার পরে বস্তুত ১৯৬৭ এর যুদ্ধোত্তর সময়কালে বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

প্রকৃতির ভিতর দিয়ে প্রতিরোধ দারভীশের প্রতিরোধের একটি বৈচিত্র্য বটে। দারভীশ তার কাব্যতৎপরতাকে যে জায়গায় নিয়ে গেছেন তাতে তার মাতৃভূমির প্রতিরোধ প্রক্রিয়া গড়ে তোলেন প্রকৃতির ভিতর। দারভীশ তাই প্রকৃতিকে তার নিজের করে নিয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যদিয়ে নিজের অস্তিত্বকে একাকার করে নিয়েছেন। একইসাথে প্রকৃতিকে নিজের অস্তিত্বের জন্য পরিপূরক করে তোলেন। দারভীশ তাই বলেন,

اذ خسرت الصديقة
فقدت طعم السنابل
وان فقدت الحديقة
ضيعت عطر الجدائل
وضاع حلم الحقيقة[৬২৬]

যখন প্রিয়জন ক্ষতিগ্রস্থ হয়
তখন হারিয়ে ফেলি গমফুলের স্বাদ
যখন বাগান হারিয়ে ফেলি
তখন মূলত হারিয়ে ফেলি নদীদের ঘ্রাণ
এবং হারিয়ে যায় হাকীকতের স্বপ্ন

কিন্তু এই হাকিকত কি? হাকিকত হলো সেই সত্য যে প্রক্রিয়ায় মানুষ ও প্রকৃতির একসূত্র-বন্ধনে বিরাজ করে। একইসাথে অবস্থান করে। প্রকৃতির বিপর্যয়ের মানে নিজেরই বিপর্যয়। এই চরম সত্য দারভীশ এখানে খবু সহজ করে বলেছেন। কিন্তু এই অনুধাবনশক্তি অনুভব করা যায় যখন প্রকৃতি আর জীবনকে একই সত্তা কল্পনা করা যায়। দারভীশ তাই এমন ধারণা দিয়েছেন, যাতে প্রকৃতি একটি রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে। এবং প্রকৃতি মানুষের রক্ষাকবচ হয়ে ওঠার মানে হলো, প্রকৃতির নিজের বেঁচে থাকা। নিজের টিকে থাকা। কিন্তু সেই প্রকৃতির টিকে থাকার আসলে অর্থ কি? প্রকৃতির

[৬২৬]. প্রাগুক্ত. পৃ. ১৯৩।

টিকের মানেই হলো ফিলিস্তিনের টিকে থাকা। ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব দারভীশকে প্রকৃতির মতো একটি বিমূর্ত শব্দের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করতে হয়েছে বিষয়টি প্রকৃত অর্থে তা নয়। বরং প্রকৃতির অখণ্ডতা মাত্রই ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব। প্রকৃতি যেহেতু একটি আম বা নির্বিশেষ শব্দ কিন্তু দেশ বা মাতৃভূমি বা ফিলিস্তিন বিশেষ। ফলে প্রকৃতির অনিবার্যতা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির ক্ষুণ্ন হওয়ার মানেই হলো, সেই বিশেষ অঞ্চলের অস্তিত্বের ক্ষতিসাধন। ফলে দারভীশ বারবার তিনি নজর ফেরাতে চেষ্টা করছেন প্রকৃতির কাছে। কিন্তু এই ক্ষতিসাধন কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, বরং রাজনৈতিক। ফলে দারভীশকে প্রকৃতির মধ্যদিয়ে যে আকুতি প্রকাশ করতে হয়েছে প্রতিরোধের নিশানা উড্ডীন করার জন্য তার পিছনের রহস্য হলো, ইজরাইল এবং জায়োজিনম। ইজরাইলের বিধ্বংসী তৎপরতার জন্য মানুষের মন কতোটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে তার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেন কবি। কবি বলেন,

يا أبي هل غابة الزيتون تحمينا اذ جاء المطر
وهل الأشجار تغنيناعن النار وهل ضوء القمر
سيذيب الثلج أو يحرق أشباح الليالي[৬২৭]

বাবা, জলপাইয়ের বনকি আমাদের রক্ষা করে যখন বৃষ্টি আসে
বৃক্ষরা কি আমাদের মুক্ত রাখে আগুন থেকে,
আলো কি বরফ গলায় কিংবা রাতের অন্ধকার পুড়িয়ে দেয়?

কবি তার জবাব দিয়েছেন। অন্যভাবে তার জবাব দিয়েছেন। যেহেতু ইজরাইল তার ধ্বংস প্রক্রিয়া অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে। এবং ধ্বংযজ্ঞে শুধু কি মানুষের ক্ষতি হয়? প্রকৃতি তার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। প্রকৃতির ক্ষতি মানে যেহেতু মানুষের ক্ষতি। তাই কবি শুধু আশার আলো জাগিয়ে রাখেন। আশা ও স্বপ্নের কথা শুনিয়ে মানুষকে ফিলিস্তিনকে প্রাণবন্ত রাখতে চেষ্টা করেন। কবি ইতালির এক পৌরাণিক কাহিনীর কথা মনে করিয়ে বলেন,

نيرون مات ولم تمت روما
بعينها تقاتل!
وحبوب سنبلة تموت
ستملأ الوادي سنابل[৬২৮]

নিরু মরে গেছে কিন্তু রোমের মৃত্যু হয়নি
সে তার দু চোখ দিয়েই লড়াই করছে
এবং লড়াই করছে গমের দানারা
আর শীষে শীষে ভরে উঠছে উপত্যকা

৬২৭. প্রাগুক্ত. পৃ. ২১০, ২১১।
৬২৮. প্রাগুক্ত. পৃ. ২১।

কিংবা,

سدّوا عليّ النور في زنزانةٍ
فتوهّجت في القلب... شمس مشاعل
كتبوا على الجدران رقم بطاقتي
فنما على الجدران... مرج سنابل[৬২৯]

তারা অন্ধকূপের ভেতর বন্ধ করে দিয়েছে আলো
কিন্তু হৃদয়ের ভেতর জ্বলে ওঠলো দীপ্ত সূর্য
তারা দেয়ালের উপর লিখে দিলো আমার কার্ড নম্বর
অথচ দেয়ালেই অংকুরিত হলো গমের উদ্যান

দারভীশ ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীকে যে স্বপ্ন দেখিয়ে উজ্জীবিত রেখেছেন তার সত্য হলো, যে অপশক্তি, যে হানাদার বাহিনী মানুষকে তার আপন ভূমি থেকে বিতাড়িত করে, আপন প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাকে তারা যতোই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করুক না কেন, তার নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রকৃতি আবার তার আপনরূপে ফিরে আসবেই। তাই তিনি বলেন,

يا أمي
جاوزت العشرين
فادعي الهم ونامي
ان قصفت عاصفة
في تشرين
ثالثهم
فجذور التين
راسخة في الصخر ...وفي الطين
تعطيك غصونا أخري....
وغصون[৬৩০]

মা আমার বিশ বছর পার হয়ে গেছে
তুমি দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ওঠো
যদি অক্টোবরে
তাদের তৃতীয় জনকে
চূর্ণ করে দেয় ঝড়

[৬২৯]. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৪৯।
[৬৩০]. প্রাগুক্ত. পৃ. ১০৫।

দ্যাখো তবে, ডুমুরের শিকড়গুলো
পাথরে প্রোথিত গভীরতা ভেদ করে উঠে আসছে
কাদামাটি ছেদ করে
তোমাকে দেবে আরো অনেক ডালপালা
এবং অনেক ডালপালা।

দারভীশ প্রতিটি কথায় বর্ণনাত্মক প্রতীকের জন্ম দিয়েছেন। ডুমুর, শিকড়, পাথর, প্রোথিত হওয়া, গভীরতা, ভেদ করে ওঠা, কাদামাটি, ছেদ করে ওঠা, ডালপালার প্রাচুর্য এসব মূলত একেকটি প্রতীক। আর এই সব প্রতীকের বিপরীতে মাত্র একটি শক্তিই আছে তার নাম ঝড়। ঝড় প্রকৃতির ভিতর থেকে তৈরি হওয়া প্রকৃতিবিরোধী এক শক্তির নাম। সেই শক্তির নাম ইজরাইল ও জায়োনিজম। দারভীশ বলে দিয়েছেন, সেই শক্তিকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। কারণ মানুষ এবং প্রকৃতি যেখানে এক হয়ে আছে, তার সামনে ইজরাইলের ঝড় শেষপর্যন্ত কোনো কাজে আসবে না। এসব প্রতীকী বর্ণনার মধ্যদিয়ে দারভীশ বুঝিয়ে দিয়েছেন, ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব এবং তার ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সত্যকে সমূলে শেষ করে দেয়া সম্ভব নয়। ইজরাইলের সমস্ত শক্তির সামনে দারভীশ বস্তুত মানুষের আত্মিক শক্তি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। নিরলসভাবে এ সাধনায় জীবন পার করে দিয়েছেন কবি। মানুষকে প্রকৃতির গভীর সত্য যেমন বিহিত করেছেন তেমনি শত্রুর মোকাবেলায় প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধের আহবান রাখেন। দারভীশ শিখিয়ে দিয়েছেন যেন মহাপরাক্রম ক্ষমতাধরকেও ভয় করা যাবে না। তার সামনে সত্য উচ্চারণ করে যেতে হবে। দারভীশ তাই সাহস আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন,

أخبروا السلطان
أن البرق لا يحبس في عود ذره
للأغاني منطق الشمس ،و تاريخ الجداول
و لها طبع الزلازل
و الأغاني كجذور الشجرة
فإذا ماتت بأرض،
أزهرت في كل أرض
كانت الأغنية الزرقاء فكره
حاول السلطان أن يطمسها
فغدت ميلاد جمره!
كانت الأغنية الحمراء جمره
حاول السلطان أن يحبسها
فإذا بالنار ثوره![৬৩১]

[৬৩১]. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৫৭, ২৫৮।

বাদশাকে তোমরা বলে দাও
নিশ্চয়ই ভুট্টার কাঠখড়ির ভিতর বন্দি করা যায় না আলো
গানের আছে সূর্যদীপ্ত ভাষা, নদী নালার ইতিহাস
গানের আছে ভূমিকাঁপানো আঘাত
এবং গানের আছে বৃক্ষের শিকড়
এক ভূমিতে মরে
আর সব ভূমিতে কুসুমিত হয়।
নীল আকাশময় গান এক চিন্তা
বাদশা তাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে
কিন্তু তা হয়ে যায় এক জ্বলন্ত অঙ্গারের জন্ম
লালাকাশময় গান এক জ্বলন্ত অঙ্গার
বাদশা তা মুছে ফেলার সাহস করে
কি বিষ্ময়কর গান হয়ে যায়
এক অগ্নিগর্ভ বিপ্লব।

৬.৩: প্রতিরোধ: ভাষা, অর্থ এবং শরীর: নয়া ডিসকোর্সের সন্ধানে

ভাষা–কাব্য–চিন্তা—এই তিন মিলে দারভীশের ভাষা, শিল্প, জ্ঞান ও ভাবুকতার জগৎ। আর তার সাথে মিশে আছে রাজনীতি, প্রতিরোধ ও পরমার্থিক আকাঙ্ক্ষা। ভাষার সাথে কবিতার সম্পর্ক, কবিতার সাথে ভাষার সম্পর্ক—এখানে দৃশ্যত দুটি সম্পর্ক দেখা যায়। কিন্তু ভাষা ও কবিতা এই দুইয়ের মাঝে প্রধানত একটি সম্পর্কেরই ঘটনা। অর্থাৎ কবি হিসেবে ভাবুক নাকি ভাবুক হিসেবে কবি? ভাবুকতা, চিন্তা এবং ভাষার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। সামাজিক, মতাদর্শিক ও ঐতিহাসিক কারণে ভাষা ও চিন্তাকে আলাদা মনে হয়। কিন্তু চিন্তা ভাষার অন্তর্গত বিষয়। চিন্তাকে শুধু ভাষার মাধ্যমে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। আবার চিন্তা ছাড়াও ভাষা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। তবে চিন্তার স্বাভাবিকতা ভাষার ভিতর ঘটমান থাকে। ভাষার ভিতর দিয়ে চিন্তার বিকাশ কিংবা চিন্তার প্রতিফলন ঘটলেও চিন্তা আরো নানান মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে পারে। নানান চিহ্ন এবং মাধ্যমে চিন্তার প্রকাশ ঘটতে পারে। প্রথমত, চিন্তা, ভাষা ও চিহ্ন। দ্বিতীয়ত চিন্তার বসত। তৃতীয়ত, চিন্তা ও ভাষার সম্পর্ক। এই ত্রিসম্পর্কীয় চক্রের ভিতর দিয়ে মানুষকে দেখেছেন দারভীশ। অর্থাৎ যেখানে সত্যিকার একটি সম্পর্ক রয়েছে, যাতে দারভীশ তার ভাষার জীবন ও জগত নির্মাণ করেন। কারণ চিন্তার বসবাস ভাষার মধ্যে। দারভীশ কবি হিসেবে এবং ভাবুক হিসেবে তা ভাবতে পারেন। ভাষা ও চিন্তার জমিনে কবি তার জীবন ও জগতের মানচিত্র নির্মাণ করেন।

জার্মান দার্শনিক মার্টিন হেইডেগার মনে করেন, চিন্তা বসবাস করে ভাষার ভিতর। শিল্প, কবিতা এবং ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় হেইডেগার ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক নিয়ে তিনটি ক্যাটাগরি শনাক্ত

করেন—*building, dwelling, thinking*—এতে হেইডেগার চিন্তা এবং ভাষার স্থান ও সম্পর্ক নির্ণয় করেন। যেহেতু ডুয়েলিং বা বসবাসের কথা বলা হয়, তার মানে তাতে *বিল্ডিং* বা কোনো কাঠামোভবনকেও বিবেচনা করা যায়। কিন্তু এ *বিল্ডিং* মানে নির্মাণ বা শিল্পের কলা কৌশল হিসেবে বিল্ডিংকে দেখার বিষয় নয়। বিল্ডিং মানে বরং এমন কিছু বা এমন কোনো সত্তার সন্ধান করে দেখা, যাকে বিল্ডিং নিজের করে নেয়। ফলাফল হিসেবে দুটি প্রশ্ন তৈরি হয়। একটি হলো, কি বসবাস করে? দ্বিতীয়ত, কিভাবে বসবাসকে *বিল্ডিং* নিজের মধ্যে আত্মীকরণ করে? হেইডেগার মনে করেন, বিল্ডিং বসবাস সংশ্লিষ্ট হলেও বিল্ডিং মাত্রই বসবাসের ব্যাপার নয়। যেমন ব্রিজ, স্টেডিয়াম, হেঙ্গার, কিংবা পাওয়ার স্টেশন। অপরদিকে, মহাসড়ক, রেলপথ, রেলস্টেশন, বাঁধ, মার্কেট ইত্যাদি বিল্ডিং বটে। কিন্তু বসবাসের জায়গা নয়। যেমন দেখা যায়, একজন ট্রাক চালক যখন রাস্তায় গাড়ি চালান, তখন এটিই যেন তার বসবাসের জায়গা হয়ে ওঠে। স্পিনিং মিলে একজন নারী শ্রমিক যখন ঘর থেকে বের হয়ে সেখানে অবস্থান করেন তখন যেন এটি তার বসবাসের জায়গা হয়ে ওঠে। এতে যে ঘটনা ঘটে তা হলো, ট্রাক চালক রাস্তায় এবং স্পিন মিলের নারী শ্রমিক তার মিলে বসবাস করলেও তারা এটাকে কখনো স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল মনে করেন না। সাময়িক সময়ের জন্য তারা বসবাসের বিষয়টি তাদের মাথায় ঢুকিয়ে নেয় বটে কিন্তু এতে বসবাসের সাধারণ ধারণা প্রমাণিত হয় না। *বিল্ডিং* এবং *ডুয়েলিং* বা বসবাস এর সম্পর্ক হলো, একটিকে (ডুয়েলিং) শেষ বা চূড়ান্ত বসবাস মনে করা অপরটিকে (বিল্ডিং) উপায় হিসেবে বিবেচনা করা। কিন্তু মানুষের মাথায় এ দুটি জিনিসের সম্পর্ককে আলাদা হিসেবে ধরে নেয়া হয়। যাতে মানুষ দুইয়ের মধ্যকার একটি মৌলিক সম্পর্ক মুছে দেয় বা বাধাগ্রস্থ করে। অথচ বিল্ডিং শুধু উপায় নয়, বসবাসের প্রক্রিয়াও বটে। এবং যেটা বসবাসের প্রক্রিয়া সেটা ইতিমধ্যে আসলে বসবাসেরই বিষয়। এগুলো আলাদা কিছু নয়।[৬৩২] হেইডেগার এসব উদাহরণ ও যুক্তি দেয়ার মাধ্যমে *বিল্ডিং* ও *বসবাস*'র মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক কি এবং তার ধরন ও প্রেক্ষিত সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যাতে পরবর্তীতে তিনি ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারেন।

বিল্ডিং এবং ডুয়েলিং এর মধ্যে সম্পর্ক যেমন অভিন্ন তেমনি ভাষা ও চিন্তার সম্পর্কও অভিন্ন। হেইডেগার জার্মান শব্দ *bauen ()* এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করে ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক বোঝাতে চেয়েছেন। যাইহোক, ভাষা ও চিন্তার সম্পর্ক উন্মোচন করা জরুরি। কারণ দারভীশের কবিতায় ভাষা ও চিন্তার প্রশ্ন বোঝার জন্য এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ একটি দরকারি বিষয়। তাতে করে দেখা যাবে, দারভীশের কবিতায় ভাষার মধ্যদিয়ে কিভাবে ফিলিস্তিনের জাতিগঠন, নেতৃত্ব এবং অপরদিকে জায়োনিস্টদের হানাদারি তৎপরতার বিপরীতে প্রতিরোধময় ভাষার ক্ষমতা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাষায় চিন্তার প্রকাশ কিভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে কিংবা জীবন্ত ও সক্রিয় ভাষা বলতে কি বোঝায়, দারভীশের– ভাষায় রাষ্ট্র নির্মাণ সংক্রান্ত—উক্তি থেকে বোঝা যায়। দারভীশ তার

[৬৩২]. হাইডেগার, মার্টিন, *পোয়েট্রি, ল্যাঙ্গুয়েজ, থট* (নিউইয়র্ক: হার্পার কলিন্স পাবলিশার্স ইন্স, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ১৪৩-১৬০।

দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, *I built my homeland, I even established a state, in my language*।[৬৩৩] একই প্রতিধ্বনী উচ্চারিত হয় তার একটি কবিতায়। দারভীশ বলেন,

ونحن الذين
سنحرق كل المراحل ..كي نصنع الطبقة
من المصنع اللغوي ،[৬৩৪]

এবং আমরা জ্বালিয়ে দেবো প্রতিটি শ্রেণিস্তর যেন
ভাষার কারখানা থেকেই তৈরি করি শ্রেণি

কবিতাংশটি নেয়া হয়েছে তার খুতাব আদ দিকতাতুর কাব্যগ্রন্থের 'খিতাব আল ফিকরা' পর্ব থেকে। আল ফিকরা পর্বে দারভীশ মূলত বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা এবং শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাসী মার্ক্সবাদীদের সমালোচনা করেছেন। মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শকে কিঞ্চিত খোঁচা দিয়ে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক অভিমুখ এবং তার প্রক্রিয়া কিভাবে গড়ে তোলা যায় তার সম্ভাবনার কাব্যিক বয়ান উপস্থাপন করেন কবি দারভীশ। এখানে *'ভাষার কারখানা থেকে আমরা সৃষ্টি করি শ্রেণি'* এবং ভাষায় মানচিত্র অথবা রাষ্ট্র নির্মাণ একই যুক্তিগত তুলনা নির্দেশ করে। হেইডেগার ভাষার একটি ন্যাচার বা প্রকৃতির কথা বলেছেন। যাতে তিনি দেখিয়েছেন, ভাষা মূলত জীবন্ত। কারণ ভাষা খোদ কথা বলে। *In what way does language occur as language?We answer: Language speaks*[৬৩৫] অপর অর্থে মানুষ ভাষার মধ্যদিয়ে প্রকাশিত। যেখানে ভাষা নিজেই ভাষা। ভাষার কথা বলার মানে ভাষা এবং তার আত্ম বা চিন্তা অভিন্ন ও অখণ্ড। দারভীশের কথায় তার গভীর সাক্ষ্য রয়ে গেছে। দারভীশের কবিতা থেকেই বিষয়টি বোঝা যাক,

ا دلني أحد علي. أنا الدليل, أنا الدليل
إلى بين البحر والصحراء. من لغتي ولدت
على طريق الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما
قمر الديانات القديمة, والسلام المستحيل
وعليهما أن تحفظا فلك الجوار الفارسي
وهاجس الروم الكبير, ليهبط الزمن الثقيل
عن خيمة العربي أكثر. من أنا؟ هذا
سؤال الآخرين ولا جواب له. أنا لغتي أنا,

---

৬৩৩. দারভীশ, মাহমুদ, *অ্যাক্সাইল ইজ সো স্ট্রং উইদিন মি, আই মেই ব্রিংগ ইট টু দ্য ল্যান্ড*—সাক্ষাৎকার, হেলিৎ ইয়েশুরুন (বৈরুত: জার্নাল অব প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, ভলিয়ম: ৪২, সংখ্যা: ১, অটাম ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৫২।
৬৩৪. দারভীশ, মাহমুদ, *খুতাব আল দিকতাতুর আল মাওজুনাহ* (বৈরুত: দার রাইয়াহ লি আল নাশার, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৫৬।
৬৩৫. হাইডেগার, মার্টিন, *পোয়েট্রি, ল্যাঙ্গুয়েজ, থট*, পৃ. ১৮৮।

وأنا معلقة... معلقتان... عشر, هذه لغتي
أنا لغتي.[৬৩৬]

আমাকে দেখায়নি কেউ পথ। আমি নিজেই নিজের প্রদর্শক।
সমুদ্র এবং মরুভূর মাঝে নিজেকে আমি দেখাই পথ
দুটি ক্ষুদ্র গোত্রের ভিতর দিয়ে ধাবমান ভারতের পথ বেয়ে
ভাষার ভিতর থেকে আমার জন্ম। যাদের উপর বয়ে চলে
প্রাচীন ধর্মসমূহের চাঁদ এবং অসম্ভব শান্তি। তাদেরকে আলবৎ
রক্ষা করতে হবে পারস্যের প্রতিবেশি আকাশ এবং
বৃহত্তর রোমের উৎকণ্ঠা। যেন আরব শিবির থেকে নেমে যায় বিপুল
জগদ্দল সময়।... তবে আমি কে? এই হলো অন্যদের প্রশ্ন–
যার কোনো উত্তর নেই। আমিই আমার ভাষা– আমি।
আমি একটি মুআল্লাকা, দুটি মুআল্লাকা... দশটি মুআল্লাকা–[৬৩৭]
এই হলো আমার ভাষা। আমি নিজেই আমার ভাষা।

ভাষা নিজেই কথা বলে—হেইডেগারের এমন বক্তব্যের যেন কাব্যিক রূপ দিলেন ফিলিস্তিনের কবি মাহমুদ দারভীশ। ভাষায় বসত কিংবা বস্তুর মাঝে বসত করা আরো বৃহত্তর অর্থে ভাষা এবং বস্তু কিংবা দেহ সামগ্রিকভাবে একটি সত্তা– এমন একটি প্রতিরূপ তৈরি করেছেন দারভীশ তার কবিতায়। পুরো বিষয়টি বোঝার সাথে বসত এর ধারণা তাই গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে উপরের কবিতাটিতে দেখা যায়, বসত কথাটি এখানে আরো গভীরভাবে অনুরণিত হয়। কারণ যখন 'বস্তু' () কথাটি উচ্চারণ করা হয় তার সাথে 'বসত'র এর ধারণাও অন্তর্নিহিত রয়েছে। হেইডেগারের মতে বস্তু কথাটির অর্থ সার্থক হতে পারে তার মাঝে যখন বসত বা ডুয়েলিং-কে একসাথে চিন্তা করা যায়। হেইডেগার মনে করেন, বসত এবং বসবাসের ধারণা বোঝার সাথে আরো দুটি ধারণা বোঝা জরুরি। একটি হলো *প্রিজার্ভিং* বা *স্পেয়ার* এবং অপরটি হলো *ফ্রি*। মূলত এই তিনটি শব্দের অর্থ সমার্থক। কারণ, ফ্রি মানে মুক্ত থাকা। খারাপ, ক্ষতিকর কিংবা নেতিবাচক কিছু থেকে মুক্ত থাকা। স্পেয়ার এর মানে, নিরত থাকা, বিরত হওয়া। যাকিছু অতিরিক্ত– মানে কোনো বস্তুর অন্তর্সত্তায় যাকিছু নিবিষ্ট রয়েছে স্বাভাবিকভাবে– সৃষ্টিপ্রদত্তগতভাবে তাকে তার মতো থাকতে দেয়া। তার অতিরঞ্জন থেকে নিবৃত্ত থাকা। প্রিজাভিং মানে সংরক্ষণ করা। এর মানে হলো, বস্তুর ভিতর বসত বা থাকার (bauen[638]) বিষয়টি সংরক্ষণ করা। কারণ, হেইডেগারের মতে, বসত এর মৌলিক চরিত্র হলো সংরক্ষণ করা (The fundamental character of dwelling is this sparing and preserving)।[৬৩৯]

৬৩৬. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদান*, পৃ. ১১৫।
৬৩৭.
৬৩৮. হাইডেগার, মার্টিন, *পোয়েট্রি, ল্যাঙ্গুয়েজ, থট*, পৃ. ১৪৪।
৬৩৯. প্রাগুক্ত। ১৪৭।

মার্টিন হেইডেগার ভাষা বিষয়ক বোঝাবুঝি আরো অনেক দূর বিস্তৃত করেছেন। *ভাষা নিজেই কথা বলে*, হেইডেগার তার এই বক্তব্যকে আরো খুলে বলেছেন। কারণ, যখন আমরা বসত এর কথা বলি, সংরক্ষণ এর কথা বলি– কিংবা আরো যাকিছু অর্থ উদঘাটন করি এটি আমরা কিভাবে করি? হেইডেগারের উত্তর হলো, আমরা ভাষা থেকে তা উদ্ধার করি। কারণ ভাষা নিজেই তা প্রকাশ করে। ভাষা নিজেই কথা বলে তা পরিস্কার করে তোলে। যেমন বিল্ডিং মানে ডুয়েলিং। ডুয়েলিং মানে থাকা (), থাকা মানে বস্তু বা বিলিং এর একটি যাপিত আচরণ। এবং যখন এটি বস্তু বা বিল্ডিংয়ের আচরণ তার মানে এটি একইসাথে তার মৃত্যুও। মৃত্যুও তার একটি আচরণ। অর্থাৎ থাক আর থাকা কিংবা বসত করা না করা। যেটি এই বিশ্বজগতে ঘটমান। অপরদিকে বসবাস এর দিক থেকে বিল্ডিং এর ঘটনা ঘটে বিল্ডিং এর ভিতরে। এর মানে, বিল্ডিং বস্তুর বেড়ে ওঠাকে ত্বরান্বিত করে। বেড়ে ওঠাকে লালন-প্রতিপালন ও পরিচর্যা করে। এই পরিপালন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বস্তুর বেড়ে ওঠা নিশ্চিত হয়। যার ভিতর দিয়ে বস্তুত বিল্ডিং আরো বিল্ডিং গড়ে তোলে। এ সকল যাকিছু অর্থ আমরা করি তা ভাষাই করে দেয়। কিভাবে? হেইডেগার এর মতে, যেমন আমরা যখন আকাশ কথাটি উচ্চারণ করি তখন এর আকাশের সাথে এবং এর অন্তস্থিত সবকিছু আমাদের মাথায়– কল্পনায় পুঞ্জিভূত হয়। সূর্যের গতিপথ, ছায়াপথ, নক্ষত্রের বিচরণ রেখা, চাঁদের পরিবর্তন, ঋতু ও সময়ের পরিবর্তন ও ভিন্নতা, জোয়ার–ভাটা, সামুদ্রিক আচরণে পরিবর্তন, বৈশ্বিক আচরণগত পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিবিধ পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তন, দিন-রাত্রির পরিবর্তন, ঋতুচক্র ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়-আশয় ও অর্থ আমাদের কল্পনায় উদয় হয়। আকাশ কথাটি বলার মানে হলো, ইতিমধ্যে আমরা তা ভাবছি। চিন্তা করছি। কিংবা আমাদের কল্পনায় তার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে আছে। এই ভাষা, অর্থ, ভাব ও সম্ভাবনা ধারণ করে মানুষ। মানুষ তাকে মূর্ত করে তোলেন মাত্র। এই সম্ভাবনাগুলো ধারণ করার সাথে কবি ও কবিতার সম্পর্ক রয়েছে। অর্থোৎপাদন কিংবা ভাব ও ভাবুকতা ধারণের জন্য কাব্যিক হালে যাপনের প্রয়োজন রয়েছে। হেইডেগার জার্মান কবি ফ্রেডেরিখ হোল্ডারলিন (১৭৭০-১৮৪৩) এর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে কাব্যিকভাবে যাপন বা বসবাসের কথা বলেন। হোল্ডারলিন এর কবিতাংশটি ছিল এমন *(Full of merit, yet poetically, man Dwells on this earth)*।[৬৪০] হেইডেগারের প্রশ্ন হলো, কবি হয়ত কবিতাময় বসত করেন। কিন্তু সব মানুষ কি এভাবে যাপন করতে পারেন বা করেন কাব্যিকভাবে? মানুষের না পারার কারণ হিসেবে হেইডেগার মানুষের তৈরি তার জীবন-প্রক্রিয়া এবং তার গড়ে তোলা জীবন ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। এই আলোচনার সূত্র ধরে হেইডেগার বস্তু, দেহ, বসত, সত্তা (বিইং) এবং ভাষা ও সময়ের ধারণাকে অনেক দূর নিয়ে গেছেন। হেইডেগারের দর্শনের কেন্দ্রীয় শব্দ হয়ে ওঠে বিইং এবং সময়। যাইহোক, দারভীশের ভাষা, কবিতা, চিন্তা এবং অর্থোৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাথে হেইডেগারের দর্শন ও চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। দারভীশ নিজেও সেদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা কবিতায়।

[৬৪০]. হাইডেগার, মার্টিন, ১৯৭১, ২১৪।

رأيت ريني شار
يجلس مع هيدغر
على بُعْدِ مترين منِّي ،
رأيتهما يشربان النبيذَ
ولا يبحثان عن الشعر ...
كان الحوار شُعَاعاً
وكان غدٌ عابرٌ ينتظرْ[৬৪১]

আমি দেখেছি "রেনে শার"
বসে আছে "হেইডেগারের" পাশে
আমার থেকে মাত্র দুমিটার দূরে
আমি দেখেছি তারা দুজন মদপানে মগ্ন
কবিতার সন্ধানে তারা বিভোর নয়......।
আলাপ ছিলো দীপ্তিমান
অতিক্রম্য আগামী যেখানে অপেক্ষমান

এখানে দারভীশ হাইদেগার সম্পর্কে দৃশ্যত হালকাচালে মন্তব্য করেছেন। তবে ভঙ্গি হালকা থাকলেও সুরাপানের প্রসঙ্গ হাইদেগারের সাথে তার ঘনিষ্টতাকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। কবিতায় যে দৃশ্যকল্প এঁকেছেন দারভীশ তাতে তিনি কিঞ্চিত দূরে থাকলেও একসাথে বসে আড্ডা দেয়ার মেজাজ তৈরি করে দারভীশ হাইদেগারের চিন্তা ও দর্শনের কতোটা ঘনিষ্ট এবং নিবিড় পাঠক ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। হাইদেগার মৃত্যু বরণ করেন ১৯৭৬ সালে। দারভীশ সে সময় পুরোদস্তুর কবিতা ও রাজনীতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দারভীশের প্রথম বই বের হয় ১৯৬০ সালে। তাতে ধরে নেয়া যায়, দারভীশ মোটামুটি বিশ থেকে পঁচিম বছরের একটি সময় পেয়েছেন হাইদেগারের জীবনের। দারভীশ কখনো হাইদেগারের সাথে সরাসরি দেখা করেছেন কিনা জানা না গেলেও দারভীশ গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন হাইদেগারের দর্শন দ্বারা। তবে দারভীশ একটি সময় দীর্ঘদিন ফ্রান্সে বসবাস করছিলেন। সে সময় তিনি হয়ত ফরাসি ও জার্মান অনেক দার্শনিকের লেখার পাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন। দারভীশ শুধু ভাষা নয়, হাইদেগারের *বিইং এন্ড টাইম* দ্বারাও বিপুলভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দারভীশের *ফী হাদরাহ আল গিয়াব*, *জিদারিয়্যাহ*, *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদা*, *সারির আল গিয়াব*, *জাকিরা আল নিসইয়ান*, *আছার আল ফারাশ*, *কাজাহর আল্লাওজি আও আবআদ*, *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা*, *খুতাব আল দিকতাতুর* ইত্যাদি রচনায় হাইডেগারের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ১৯৪০ সালে সংঘটিত ফ্রান্স রেজিসটেন্স আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন ফরাসি কবি রেনে শার। হাইদেগারের পর রেনে শার'র প্রতিরোধের কবিতাও দারভীশকে বেশ অনুপ্রাণিত করেছে ধারণা করা যায়।

[৬৪১]. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ*, পৃ. ১২-১৩।

দারভীশের কবিতায় ভাষার বিষয়টি একটি সামগ্রিক সত্তারূপে হাজির রয়েছে। ভাষার বোঝাবুঝি যেভাবে দারভীশের কবিতায় নির্মিত হয়েছে কাব্যিকরীতি অনুসরণের মধ্যদিয়ে তাতে ভাষা খোদ একটি পরিপূর্ণ বিষয়বিদ্যা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যেখানে ভাষা কি, ভাষার রীতি, ভাষার সাথে অর্থোৎপাদনের ঘটনা, প্রেক্ষিত, অর্থোৎপাদন প্রক্রিয়া-সম্ভাবনা ইত্যাদি ভাষাবিষয়ক অনুষঙ্গ বর্তমান। অপরদিকে ভাষার সাথে মানুষের সম্পর্ক, বস্তু-জগতের সম্পর্ক, ভাবগত সম্পর্ক, ভাষা ও দেহের সম্পর্ক, আত্মিক ও পরমার্থিক সম্পর্ক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক, পৌরাণিক, দার্শনিক, শত্রুমিত্রের সম্পর্ক, শত্রুর মোকাবেলায় প্রতিরোধ ও ক্ষমতা গড়ে তোলার প্রশ্নসহ বিচিত্র সম্পর্কের মুখোমুখী হয়ে দারভীশ তার কবিতার উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন। ভাষার মধ্যদিয়ে যেমন তার কবিতা তৈরি হয়েছে, তেমনি তৈরি হয়েছে দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র নির্মাণের প্রকল্প। এরসাথে গড়ে উঠেছে বিবিধ জ্ঞান ও শিল্পের অনুকল্প। মূলত দারভীশের কবিতাযোগ–ভাষা প্রকল্পের মধ্যদিয়ে একধরনের বিশেষ ডিসকোর্স বা বয়ান গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। যদিও ডিসকোর্স বললে সমাজ, জ্ঞান, ক্ষমতা ও মতামত ব্যাখ্যার একটি পদ্ধতি বোঝায়। যাতে দুনিয়া এবং তার চলমান ইতিহাসকে জানা ও বোঝা যায়। মিশেল ফুকোর মতে, ভাষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের যে বেড়ে ওঠা তাই ডিসকোর্স। ফুকোর মনে করেন, মানুষের সমাজ কাঠামো, ব্যবস্থা এবং দুনিয়ার ইতিহাস জটিল। ফলে তা বোঝার জন্য ডিসকোর্সের প্রয়োজন। মানুষের ভাষা ও জ্ঞানের বিকাশের মধ্যদিয়ে ডিসকোর্স গড়ে ওঠে। ডিসকোর্সের সাথে ভাষার তত্ত্বগত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন, বিভিন্ন মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণাকে একীভূতকরণের নাম ডিসকোর্স। যেহেতু ডিসকোর্স একটিমাত্র মতামত বা বক্তব্যের ভিত্তিতে ডিসকোর্স তৈরি হয় না। মোটকথা কোনো বিশেষ জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ের ভাষাগত বয়ানই ডিসকোর্স। ফুকো ভাষাবিষয়ক ডিসকোর্স এর আলোচনায় এটাকে *formation of discourse* হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৬৪২] একদিকে ডিসকোর্স গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নানান বক্তব্যের সমন্বয় প্রয়োজন অপরদিকে ডিসকোর্সমাত্রই কোনো গৎবাধা পদ্ধতিও নয়। সেকারণে বলা যায়, কবিতা কিংবা যেকোনো শিল্পমাধ্যমে ডিসকোর্স গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। নানা ডিসকোর্স থেকে সূত্র–তথ্যউপাদান সংগ্রহ করেও ডিসকোর্স গড়ে উঠতে পারে। ডিসকোর্স গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় তাই একাধিক ডিসকোর্সের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং অন্তর্পাঠ্যতারও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। অন্যকোনো ডিসকোর্সকে হালনাগাদের মাধ্যমেও একটি নতুনতরো ডিসকোর্সের রূপান্তর ঘটতে পারে। তবে শেষপর্যন্ত ডিসকোর্স নিজের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে গড়ে ওঠে। ফুকোর ভাষায় এর নাম *system of dispersion*|[643] যেটি মূলত ডিসকার্সিভ বিভাজনের মধ্যে বিবদমান রোল অব ফরমেশন মেনে গড়ে ওঠে।

---

৬৪২. স্মিথ, এ. এম. শেরিদান, *দি আর্কিউলজি অব নলেজ এন্ড ডিসকোর্স অন ল্যাঙ্গুয়েজ*—মিশেল ফুকো'র মূলগ্রন্থ (ফরাসি) *L'Archeologie du Savoir* এবং *L'ordre du discours*'র অনুবাদ (নিউ ইয়র্ক: প্যানথিওন বুকস, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ২৩৩-২৩৪।

৬৪৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৮।

ডিসকোর্সের আলোচনায়, বক্তব্য, বিবৃতি, মতাদর্শের গুরুত্ব রয়েছে। ডিসকোর্স গড়ে ওঠার মালমশলা যেহেতু বক্তব্য বিবৃতি, ধারণা এবং সত-মিথ্যা ইত্যাদি। ডিসকোর্স যেহেতু মতাদর্শের বাহক সেকারণে ফুকো মতাদর্শ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বক্তব্যের সত্যতা ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ জরুরি মনে করেন। মতাদর্শ বা তার ডিসকোর্সকে সত্য বা মিথ্যা নিরুপণ করে যে বৈশিষ্ট্য তৈরি করা যায় তার উপর ভিত্তি করে মিথ্যা বক্তব্য থেকে সত্য বক্তব্যকে আলাদা করা যায়। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো সবসময় সব অবস্থায় সত্য হয় এমন দাবি করা কঠিন বটে। বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করা সহজ নয়। ইজরাইল যখন ফিলিস্তিনের উপর দখলদারিত্ব এবং বলপ্রয়োগ করে তখন তাদেরকে সন্ত্রাসী কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী বলা যাবে? অপরদিকে ইজরাইলের সশস্ত্র হানাদারি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগ্রামকে কেন সন্ত্রাসী বলা হয়? দুপক্ষকেই সত্য কিংবা মিথ্যা বলা যেতে পারে। পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে সত্য বক্তব্যের উপর। কিন্তু এই সত্য বক্তব্য কিভাবে সম্ভব? মিথ্যা বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেও একটি মতাদর্শের ডিসকোর্স গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু ডিসকোর্সের মাধ্যমেই আবার তার পাল্টা ডিসকোর্স তৈরি করে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায়। যাইহোক, দারভীশের কবিতায় নানান ধারণা, ভাব-চিন্তা, দর্শন ও বক্তব্যের সমাহারে যে ডিসকোর্স, তাতে ইজরাইলের বিপরীতে অপর একটি মতাদর্শের কিংবা একটি জীবনদার্শের বয়ানই নির্মিত হয়ে ওঠে। এই ডিসকোর্সে ভাষার ভূমিকা কেন্দ্রীয়।

একইকারণে ফিলিস্তিনের বৃহত্তর পরিসরে দারভীশের একটি বুদ্ধিজীবীমূলক সত্তাকেও শনাক্ত করা যায়। বুদ্ধিজীবীর কাজ কী কিংবা সামাজিক জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে বুদ্ধিজীবীতার সংজ্ঞায়ন ও মৌলিক চরিত্রে দারভীশের কর্মতৎপরতার একটি বিশেষ দিক রয়েছে। যেকোনো জাতির সূচনায়, গঠনপ্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠায় যেসব দিক প্রধান এবং কেন্দ্রীয় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাশীল মানুষের সক্রিয়তা তার মধ্যে খুবই মৌলিক। অন্য অনেক সেক্টরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্বের ভূমিকা ও অবদান নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু চিন্তাশীল, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা মৌলিক।

> The energetic activities of these professional intellectuals were central to the shaping of nineteenthcentury European nationalisms.[৬৪৪]
>
> ঊনিশ শতকীয় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ গঠনের মূলে ছিল পেশাগত এই বুদ্ধিজীবীদের প্রাণবন্ত কার্যক্রম।

সাধারণত কবিরা জাতীয় আন্দোলনগুলোর বহু কর্মসূচির সাথে যুক্ত হতে পারে। লেখালিখি, গান, ছড়া, গণসঙ্গিত, দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, ঐতিহাসিক নানাবিধ ঘটনার প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ,

৬৪৪. অ্যান্ডার্সন, বেনেডিক্ট, *ইমাজিনড কমিউনিটিজ: রিফ্লেকশনস অন দি অরিজিন এন্ড স্প্রিড অব ন্যাশনালিজম* (লন্ডন: ভার্সো বুকস, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৮৭। শামির, শিমন, *হিস্ট্রি অব দি অ্যারাবস ইন দি মিডল ইস্ট ইন মডার্ন টাইমস* (), পৃ. ২০৮, ২১৮, ২৬৯, ২৭১।

প্রযোজনা, পরিচালনা, বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী প্রথা ও সংস্কৃতির উদযাপন, অনুষ্ঠান পরিপালন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাকিজকভাবে নিজেদের সক্রিয় রাখতে পারে। দারভীশ কবিতা, সাংবাদিকতা, লেখালিখি ইত্যাদির মাধ্যমে ফিলিস্তিনের রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ জাতীয় অবস্থার চালচিত্র বিশ্লেষণে নিরলস সক্রিয় ছিলেন। ধরে নেয়া হয়, সমাজ এবং জাতিগঠনে সবচেয়ে অগ্রণী অবস্থানে থাকেন রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। সেদিক থেকে দারভীশের দুটি চরিত্র ধারণ করার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকায় বুদ্ধিজীবী হিসেবে দারভীশের একটি অভিজাত সমাদর ছিল। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বেশ প্রখর ছিলেন। তবে যারা একটি দেশের কেন্দ্রীয় অবস্থান ধারণ করেন, তারা সাধারণত সরকারের খুব কাছাকাছি থাকেন। ফলে তাদের মধ্যে দুধরনের ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ করা যায়। প্রথাম, যারা সরকারের সমালোচনা করেন, জাতীয় রাজনীতির ভালোমন্দ দিক নিয়ে কথা বলেন। সামগ্রিক জাতীয় বিষয়ে তাদের একটি গঠনমূলক অবস্থান থাকে। জাতীয় স্বার্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়েও তারা বেশ সরব থাকেন। এবং নির্দেশনালমূলক মতামত দিয়ে থাকেন। তারা বিশেষভাবে স্বাধীন বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের আত্মমর্যাদা ধরে রাখার চেষ্টা করেন। তাদের লেখালিখি, বক্তৃতা, মতামত জাতিগঠনের বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। একইসাথে তারা শুধু মতামত দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না, সমাজে গণসচেতনতা তৈরি, গণসংযোগ, সংঘবদ্ধকরণ এবং দেশের সার্বিক জাতীয় অভিমুখ রচনায় তারা সংগঠকের ভূমিকাও পালন করেন। জাতীয় নানান নীতি প্রণয়ণে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ– বিভিন্নভাবে প্রভাবক হিসেবে তাদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গ্রামসির উদ্ধৃতি দিয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ এমনতরো বুদ্ধিজীবীর প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছেন প্রশাসক, শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক। প্রথম পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের গ্রামসি অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল (আপন বুদ্ধিজীবী) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের গ্রামসি ট্রাডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৬৪৫]

ডিসকোর্স বিষয়ক আলোচনায় জাতীয় বুদ্ধিজীবীতার প্রাসঙ্গিকতা গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে তার গঠনপ্রক্রিয়া, আত্মপরিচয়, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং স্বাধীন সার্বভৌম একটি জাতিসত্তার ধারণাগত ভিত্তি রচনায় দারভীশের অসামান্য এবং মৌলিক অবদান রয়েছে। মুনা আবু ঈদ মনে করেন, কবি হিসেবে দারভীশ এবং ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জাতীয় মুহূর্তগুলোর মাঝে ব্যাপক সম্পর্ক রয়েছে। দারভীশ ফিলিস্তিনের ইতিহাস নিয়ে কবিতা লিখেছেন, জাতীয় ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করেছেন, জাতীয় ঘটনার দলিলপত্র লিখেছেন, এসব কিছু তার কবিতায় নানাভাবে এসেছে– শুধু এ কারণেই তার গুরুত্ব তৈরি হয়নি। বরং তার গুরুত্ব আরো অনেক বেশি। কারণ তিনি একটি জনগোষ্ঠীকে তৈরি করেছেন। একটি জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা ও মন তৈরি করেছেন। একটি জাতিকে একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপায়ে তিনি সংগঠিত সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পরিচয় গড়ে তোলার জন্য দারভীশের ভূমিকা ছিল অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। সাঈদ যেভাবে ক্ষমতার সামনে সত্য বলা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীতার সম্পর্ক ও কাজ নির্ধারণ করেছেন তার সবথেকে বড় দৃষ্টান্ত ছিলেন মাহমুদ দারভীশ।

৬৪৫

৬.৪: প্রতিরোধের ভাষা: গায়েব-হাজের কিংবা অনুপস্থিতির উপস্থিতি

ভাষায় দারভীশ তার ভাবুকতা ও চিন্তার একটি সীমা– একটি ভিন্ন জগত নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই স্বতন্ত্র জগতে দারভীশের বিচরণ অবাধ এবং গভীর। এটি তার সৃষ্টি ও উৎপাদনের উৎস। গোপন বীজতলা। এখান থেকে তার সামগ্রিক অর্থ এবং সম্ভাবনার উদ্ভাবন ঘটে। এখানে তিনি চাষ করেন চিন্তার ফসল। এখানে যাকিছু অজানা– অধরা– তার প্রকাশ ঘটান তিনি। দারভীশের জীবনের এমন সব সারনির্যাস ঢেলে দিয়েছেন তার 'ফী হাদরাহ আল গিয়াব'–এ। এটি একইসাথে পদ্য এবং গদ্য। একইসাথে কবিতা। বইটির ভূমিকায় দারভীশ এমন মন্তব্যই করেছেন। তবে কবিতা হিসেবেই তিনি বেশি বিবেচনা করেন।[৬৪৬] ফলে কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'ফী হাদরাহ আল গিয়াব' স্বীকৃত। তবে দারভীশ অন্যভাবে বইটির পরিচয় দিয়েছেন। নতুনধরনের অভিজ্ঞান বলা যায়। দারভীশ বলতে চেয়েছেন এটি কবিতার চেয়েও অধিক। যেকারণে তিনি প্রচ্ছদে বইয়ের নামের নিচে 'টেক্সট' (نص) শব্দটি জুড়ে দিয়েছেন। তাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এটি সাধারণ কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়। বইটির বিবেচনা দারভীশ নিজেই অন্যতরো তাৎপর্যে অভিষিক্ত করেছেন। পাঠককে এর মাধ্যমে নতুন কোনো পটভূমিতে– নতুন কোনো জগতে স্বাগত জানাতে চেয়েছেন। বইটি তিনি লিখেন পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং উমাইয়্যাহ কবি মালিক বিন আল রাইব[৬৪৭] এর চিন্তায় মুগ্ধ হয়ে। ২০০৮ সালে দারভীশের মৃত্যুর দু'বছর আগে বইটি বের হয়। বইটির মূল বক্তব্য মৃত্যুকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে। লেখকের মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর ফলে লেখক নাই হয়ে যায় না। বরং লেখকের মৃত্যু– অন্য অর্থে অনুপস্থিতি নতুনতরো উপস্থিতি তৈরি করে। নতুনতরো ভাব ও সম্ভাবনা ঘটায়। পাঠকের কাছে মৃত্যু লেখকের পরিচয়ের একটি উপায় হয়ে ওঠে। লেখকের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তার অনুপস্থিতিই একটি অন্যতরো উপস্থিতির উৎস হয়ে ওঠে।

মৃত্যুর প্রাসঙ্গিকতা বস্তুত দারভীশের ব্যক্তিসত্তার নিজস্ব অনুভব ও অভিজ্ঞতাজাত কাব্যিক আখ্যান। ১৯৮৪ সালে দারভীশ প্রথমবারের মতো হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুসারে ওই সময় ক্লিনিক্যালি মৃত ছিলেন। দুই মিনিটের মতো তিনি চেতনাহীন ছিলেন। বিশেষ পদ্ধতির ইলেক্ট্রিক শকের মাধ্যমে তার জ্ঞান ফিরে আসে। এ ঘটনায় দারভীশ মৃত্যুর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নিতে সক্ষম হন। তার জীবন এবং স্মৃতি মৃত্যুর একেবারে কাছাকাছি ছিল। ঘটনার সময় দারভীশ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় ছিলেন। ভিয়েনার একটি হাসপাতালে মৃত্যুর এ অভিজ্ঞতা তাকে অন্যকিছু এনে দিয়েছিল। দারভীশ বলেন,

> I encountered death twice, once in 1984 and once in 1998, when I was clinically dead and preparations were

[৬৪৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী হাদরাহ আল গিয়াব* (বৈরুত: রিয়াদ আল রাইস লি আল কুতুব ওয়া আল নাশার, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২।
[৬৪৭]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩।

> already being made for my funeral. In 1984, I had a heart attack in Vienna. That was a deep, easy sleep on a white cloud with clear light. I did not think it was death. I floated and cruised until I felt a powerful pain, and the pain was the signal that I had been returned to life. I was told that I was dead for two minutes.[648]

> আমি দুবার মৃত্যুর মুখোমুখী হই। একবার ১৯৮৪ সালে। একবার ১৯৯৮ সালে। যখন আমি ক্লিনিক্যালি ডেড এবং ইতিমধ্যে তখন আমার জানাজা ও দাফনের আয়োজন চলছিল। ১৯৮৪ সালে ভিয়েনায় আমার হার্ট অ্যাটাক হয়। যাতে স্বচ্ছ আলোযুক্ত শাদা মেঘের উপর এক গভীর- সহজ ঘুমে আমি হারিয়ে গেলাম। আমি মনেই করিনি এটা মৃত্যু ছিল। বরং আমি ভাসতে থাকলাম এবং ভয়াবহ একটা ব্যথা অনুভব করা পর্যন্ত আমি কুসড হয়ে গেলাম। ব্যথাটি ছিল একটি সংকেত, যাতে আমি আবার জীবন ফিরে পাই। আমাকে বলা হলো, দুই মিনিটের জন্য আমি মৃত ছিলাম।

তবে মৃত্যুর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে দারভীশ এক নতুন দারভীশে রূপান্তরিত হন। হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী কবিতায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। তার কবিতার ভাষা, আঙ্গিক, বক্তব্য সবকিছুতে নতুন পরিবর্তন ঘটে। *ফী হাদরাহ আল গিয়াব* রচনার পটভূমি হয়ে ওঠে এই ঘটনা।

বইটি মহাকাব্য সদৃশ। কিন্তু মহাকাব্যের আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্য ও রীতি পুরোপুরি অনুসৃত না হওয়ায় মহাকাব্যও বলা যায় না। বইটি মূলত মৃত্যু পরবর্তী জানাজাকে সামনে রেখে যে বক্তব্য দেয়া হয় যেটি 'ফিউনারেল স্পিচ' হিসেবে পরিচিত– তারই একটি কাব্যিক উপাখ্যান। দারভীশ যেখানে নেই। অদৃশ্য। সেখান থেকে তিনি কথা বলছেন। উপাখ্যান বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী কথক আছে। সেই কথককে পাঠক ইতিমধ্যে 'আমি' হিসেবে শনাক্ত করতে সক্ষম। তবে তাতে যে 'তুমি'র সাক্ষাৎ মেলে তিনি কে? এই 'আমি' এবং 'তুমি' দুজনে একই সত্তা। একই সত্তা দুই চরিত্রে হাজির যেখানে মৃতু বিষয়ক এই উপাখ্যানে। পুরো বইটিতে এই দুই চরিত্রই মূলত ঘটনা বর্ণনার মূল সূত্র হিসেবে কাজ করে। যাতে নিজেই নিজের মৃত্যুবিষয়ক এলিজি উপস্থাপন করছেন। কিন্তু দুইয়ের ভূমিকা ভিন্ন। দুটি

---

[৬৪৮]. কারপেল, ডালিয়া, *রিটার্ন অব দি মডেস্ট পোয়েট*—মাহমুদ দারভীশের সাথে কথোপকথন (হারেৎজ, জুলাই ১২, ২০০৭), ভিজিট: সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২১, https://www.haaretz.com/2007-07-12/ty-article/return-of-the-modest-poet/0000017f-e82b-d62c-a1ff-fc7b4e110000?mid2656=open

সময়কাল এখানে হাজির। একটি লেখকের অতীত। অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাকের ঘটনায় সৃষ্টি হওয়া মৃত্যুদশার পূর্বকালীন জীবন। অপরটি হলো *বারজাখ*। মৃত্যুবিষয়ক এলিজি যেটি শোকগাথা হিসেবে প্রাচীন আরবী কবিতার একটি প্রতিষ্ঠিত প্রকরণ। কিন্তু দারভীশের ভাষায় ক্ল্যাসিক্যাল শোকগাথার ঐতিহ্য ভেঙ্গে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। শোকগাথার প্রাক-ইসলামী আরবী কবিতার আঙ্গিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দারভীশের *ফি হাদরাত আল গিয়াব*। অন্যঅর্থে বইটি দারভীশের আত্মজৈবনিক আখ্যানও বটে। যদিও আত্মজীবনীমূলক লেখা সাধারণত এমন গভীর ভাষা, আঙ্গিক এবং মৃত্যুর কান্তিবিদ্যাজনিত ভাব-চিন্তায় ঋদ্ধ হয়না। সেদিক থেকে এটি আত্মজীবনীমূলক আখ্যানের রীতি ও কাঠামোতেও নতুন পরিবর্তন এনেছে। সিনান অ্যান্তোন দারভীশের এই নতুনত্বকে পোয়েটোগ্রাফী (poetography) হিসেবে অভিহিত করেন।[৬৪৯]

বইটিতে বিষয় বৈচিত্র্য যেমনই থাকুক, তার বিশেষ প্রসঙ্গ ভাষা ও মিনিং। অর্থ এবং ভাষা তৈরি হয় যেখানে– মৃত্যু এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের মধ্যবর্তী মুহূর্তে– যেটাকে 'বারজাখ' বলা হয়। বারজাখ– যেখানে মৃত্যুপরবর্তী মুহূর্ত– কিন্তু তারপরও এটি হলো অমরতার মুহূর্ত। অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব– উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি– একই সত্তার যমজ আত্মপ্রকাশের নাম বারজাখ। বারজাখ– ইসলামী জ্ঞানতত্ত্বের ঐতিহ্যের অংশ। বিশেষত সূফিতাত্ত্বিক জ্ঞানতত্ত্বে বারজাখের (eschatology) আলোচনা বিপুল। *বারজাখ* মানে, মানব সত্তা এবং তার বিদেহী আত্মার অধিষ্ঠানকালীন অবস্থান। যেখানে রূহ বিচার দিবসের জন্য অপেক্ষমান থাকে। পবিত্র কোরআনে শব্দটির একাধিক উল্লেখ রয়েছে।[৬৫০] বারজাখের উদাহরণের মাধ্যমে বস্তুত একটি রূপকাশ্রিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন দারভীশ। বারজাখ যেমন আত্মার অপেক্ষমান একটি সন্ধিক্ষণ বোঝায় তেমনি দারভীশ মৃত্যুর কাছাকাছি থেকে যে মৃত্যুবৎ অভিজ্ঞতায় সিক্ত হয়েছেন তাতে তার একটি পরমার্থিক হালত বা অবস্থা সৃষ্টি হয় যেখানে তিনি এমন সন্ধিক্ষণের মুখোমুখী হন। দারভীশ এ ঘটনার মধ্যদিয়ে অন্য এক অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করেন যাতে তার পরমার্থিক স্বজ্ঞালাভের ঘটনা ঘটে। এতে তার ভাষা ও জীবনের মাঝে যে জ্ঞান-প্রজ্ঞার সঞ্চার পুঞ্জিভূত হয় *ফী হাদরাহ আল গিয়াবে* দারভীশ তারই কাব্যিক বিস্তার ঘটিয়েছেন অন্য এক নতুন ভাষায়। এখানে রয়েছে তার পূর্ববর্তী জীবন। আর রয়েছে মৃত্যুপরবর্তী মুহূর্ত। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি যে সত্তায় উত্তীর্ণ যেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে কবি নিজেকে নিজের মুখোমুখী করেন। একইসাথে তার পূর্ববর্তী সময়কেও নিজের সামনে হাজির করেন। কবি যেখানে নানা অনুষঙ্গে বিবিধ বিষয় ও ঘটনার সাক্ষ্য দিতে থাকেন। এই সন্ধিক্ষণের সবথেকে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা হলো মানুষের ভাব–ভাবুকতা–সৃষ্টির আত্মিক প্রেরণা– ভাষাসৃষ্টির এক অমোঘ লীলাচৈতন্যের মাকাম। একইসাথে এখানে অধিষ্ঠিত হয়ে কবি তার মাতৃভূমির শত্রু-মিত্রের ভেদরেখা

---

[৬৪৯]. অ্যান্তোন, সিনান, *ইন দ্য প্রেজেন্স অব অ্যাবসেন্স*—মাহমুদ দারভীশের মূলগ্রন্থ (আরবী) *ফী হাদরাহ আল গিয়াব*'র অনুবাদ (নিউ ইয়র্ক: আর্কিপিল্যাগো বুকস, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৯।

[৬৫০]. এমনকি তাদের কাছে যখন মৃত্যু এসে পড়ে সে তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দাও, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি–যা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কক্ষনো এটি হবার নয়, কারণ এটি তো তার একটি কথার কথা মাত্র; তাদেরকে যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে, সেদিন পর্যন্ত সামনে থাকবে বরযখ—সূরা আল মু'মিনুন। আয়াত ৯৯।
(حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)

দেখতে অবলোকন করেন। শত্রুর মোকাবেলায় প্রতিরোধের ভাষার সাক্ষাৎ লাভ করেন এখানে। রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতিরোধের যে রূহানী বয়ান জরুরি ছিল দারভীশ তার সুরাহা করেন *ফী হাদরাহ আল গিয়াব* রচনার প্রাক-অভিজ্ঞতার এই লীলাভূমিতে ডুবে গিয়ে। এখানেই তিনি শত্রু মোকাবেলার ভিন্নতরো দর্শন লাভ করেন। ভিন্নতরো দর্শন কিভাবে কবিতায় ভাষা লাভ করে কিংবা কবিতার ভাষা হয়ে ওঠে তারই এক অপূর্ব রহস্যঘেরা আখ্যান নির্মিত হয়। শত্রুর বিরুদ্ধে কবিতা কেমন করে সৃষ্টি হয় কবি তার পরামার্থিক বিধি-শৃঙ্খলা লাভ করেন এখানে—এই বারজাখে। দারভীশ বলেন,

فلتأذن لي إذن، ونحن نفترق على هذا البرزخ، ب أن أفسخ
العقد المبروم بين عبث وعبث، فلا نعلم من انتصر منا ومن
انكسر أنا أم انت أم الموت، لأننا لم نعترف من قبل،
لننتصر، بأن العدو أذكى منا وأدهى، فلا شيء يغوي
الهزيمة أكثر من مجافاة هذا الاعتراف، يا صاحبي
المترف بالأوصاف النقيضة، المشرف في البحث عن
عبث لا بد منه لتدريب النفس على التسامح، ولتحظى
بنعمة التأمل في ماء يضحك في الغمازات، ويطير
فراشات فراشات تخلق الشعر من كل شيء حي، فالخفة،
كالندى ، قاهرة المعدن، وعذراء الزمن، هي التي تدرب
/ الوحش على النفخ في النايات[651]

দুটি নিরর্থের মাঝে বিবদমান বন্ধন ভেঙে দিতে আমাকে তবে অনুমতি দাও,
এইখানে এই বারজাখে আমরা একসাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো
আমরা জানিনা আমাদের মাঝে কার বিজয় এবং কার পতন—আমি? তুমি? নাকি মৃত্যু?
বিজয়ের জন্য আমরা আগেই স্বীকার করে নিইনি শত্রুই বেশি বুদ্ধিমান, দক্ষ!
এমন স্বীকারোক্তি নাকচ করা ছাড়া কোনো কিছুই বেশি মেনে নেয় না পরাজয়
হায় বন্ধু! যিনি বিপরীত ভাষ্য মুগ্ধ হয়ে দেখেন। যে শব্দের অর্থ এখনো তৈরি হয়নি
এমন নিরর্থের গভীর সন্ধানে রত—যাতে খোলা হৃদয়ের জন্য, নিস্তব্ধ পানির মতো
মগ্নতার নেয়ামত প্রাপ্তির জন্য নিজেকে তৈরি করা অনিবার্য– যেন পানি মগ্নতার ছোঁয়ায় হাসে
টোল পড়া হাসি– যেন ওড়ে প্রজাপতির মতো– যেন প্রজাপতি প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর ভিতর থেকে
সৃষ্টি করে চলে কবিতা। অতঃপর শিশির বিন্দুর মতো এমন তীক্ষ্ম সূক্ষ্মতা
জয় করে কঠিন খনিজ ভাণ্ডার, কালের কুমারিত্ব—যিনি
বাঁশিতে সুর সৃষ্টিতে দানবকেও তৈরি করে নেয় ঠিক।

০.

৬৫১. দারভীশ, মাহমুদ, *ফী হাদরাহ আল গিয়াব*, পৃ. ১২।

للحروف البيضاء على اللوح الأسود مهابةُ فجر ريفي
و كما يصبون الماء، علي مهل، في جرة لا تمتلي، تشربت
الشكل الناقص و صوته معا، بتعذيب الحنجرة و تطويعها
للاشارة، وباخضاع الحلق لما تراه العينان.[৬৫২]

কালোবোর্ডের শাদা অক্ষরগুলোর রয়েছে গ্রামের দিগন্তজোড়া ভোরের মুগ্ধ প্রেরণা
যেন ধীরে ধীরে পানি ঢলে পড়ছে জারের ভিতর। এমন জার কখনো পূর্ণ হয় না।
যাকিছু দেখে দুচোখ তার তরে
কণ্ঠনালী নিয়ন্ত্রণ করে চিহ্ন ও ইশারার অনুগামী করে
বশ করে মুখাবয়ব তুমি শোষণ করে নিয়েছো একইসাথে তার খণ্ডিত রূপ ও ধ্বনি।

OO
يا لها من لعبة! يا له من سحر. يولد العالم تدريجياً من
كلمات. هكذا تصير المدرسة ملعبا للخيال.. فتركض
إليها بفرح الموعود بهدية اكتشاف، لا لتحفظ الدرس
فحسب، بل لتعتمد على المهارة في تسمية الأشياء، كلُّ
بعيد يقترب وكل مغلقٍ ينفتح
إذا لم تخطيء في كتابة كلمة
ر،؟ر، فسيجري النهر في دفترك ؟
السماء أيضا تصبح
جزءاً من مقتنياتك الشخصية إذا لم تخطيء في الإملاء[653]

কী লীলা, কী জাদু! ভাষা থেকে ক্রমাগত জন্ম বিশ্বজগতের।
এমনি কল্পনার লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে বিদ্যাপীঠ... যেখানে তুমি ধাবিত হও–
এমন মানুষের আনন্দে যারা উদ্ভাবনের ফল পেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ–
শুধু বিদ্যা মুখস্থ করতে নয়, বরং বস্তুর নামকরণে দক্ষতানির্ভর হওয়ার জন্য।
প্রতিটি দূর কাছাকাছি হয়ে ওঠে, প্রতিটি রূদ্ধদ্বার যায় খুলে
‘নদী’ শব্দটি লিখতে যদি তুমি ভুল না করো তবে তোমার খাতায় বয়ে যাবে
আস্ত নদী। ‘আকাশ’ও তেমনি যদি ভুল না করো লিখতে তবে
আকাশই হয়ে ওঠবে তোমার নিজের অংশ।

---

৬৫২. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫।
৬৫৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫-২৬।

৬.৫: প্রতিরোধ: প্রেক্ষিত ভাষা ও অবিনির্মাণ (ডিকনস্ট্রাকশন)

দারভীশের কবিতায় প্রতিরোধ বিবিধ মাত্রায়, বিচিত্র পরিসরে কার্যকর। বিচিত্র প্রক্রিয়ায় প্রতিরোধকে সক্রিয় করে তুলেছেন দারভীশ তার কবিতায়। ভাষা তার মধ্যে একটি। তবে ভাষা একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র হলেও প্রতিরোধ এখানে বিভিন্ন উপলক্ষে সক্রিয়তা গ্রহণ করেছে। শুধু ভাষায় প্রতিরোধ বিপুল প্রাসঙ্গিকতায় হাজির রয়েছে তার কবিতায়। দারভীশ যে প্রকল্প প্রস্তাব করতে চেয়েছেন ফিলিস্তিনের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় তাতে বিদ্যমান ব্যবস্থার নতুন নির্মাণ বা বিনির্মাণ অন্যতম। ফলে দারভীশকে বিদ্যমান নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে। বিদ্যমান নিয়ম ভেঙ্গে তিনি নতুন নিয়ম গড়ে তুলতে চেয়েছেন। পরিবর্তনের ধারায় তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন দীর্ঘদিন। বাস্তব তৎপরতার সাথে নিজেকে যুক্ত করার মাধ্যমে ইজরাইলের বিবদমান কাঠামো এবং অভ্যন্তরীণ প্রথাগত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন দারভীশ। ঐতিহাসিক এসব সক্রিয়তাকে একপাশে রেখে দারভীশ সরাসরি ভাষার দুনিয়ায় নিজের ভূমি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যেখানে তিনি গড়ে তুলেছেন অন্য এক ফিলিস্তিন।

এই নয়া ফিলিস্তিন গড়ে তোলার পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন উপনিবেশিক ও সাম্রাজের বাসনায় তৎপর জায়োনিস্ট ইজরাইলের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভাষায় প্রতিরোধ কিভাবে সম্ভব? পুরো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কি ধরনের বক্তব্য দিতে চান দারভীশ? দারভীশ তৈরি করা ইতিহাসের বিপরীতে, ব্যবস্থার প্রতিকূলে যেমন গিয়েছেন। তেমনি যারা শান্তির পথে হাঁটছেন প্রতিরোধের পন্থা বাদ দিয়ে তিনি তাদের শান্তির বিরুদ্ধে হেঁটেছেন। প্রচলিত ভাষার বিপরীতি গিয়েছেন। চলমান স্মৃতির বিপরীতে– শাসন-প্রক্রিয়ার বিপরীতে, চলমান যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার বিপরীতে– রাজনীতির বিপরীতে, মিডিয়া ও গণমাধ্যমের বিপরীতে গিয়েছেন। ভাষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে পুরো ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন নীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছেন দারভীশ। দারভীশ বলেন,

سألغي احتفالات يوم الشهيد لننسى
سأحرث مقبرة الشهداء الحزينة
وأرفع منها العظام لتدفن فى غير هذا
المكان
فرادى فرادى
فلا حق في دولتي للتجمع ، حيا وميتا
لئلا يثير الفسادا
ولا حق للموت أن يتمادى
ويقضم نسياننا الحر منا
سأكسر كل المدافع حتى يفرخ فيها الحمام
سأكسر ذاكرة الحرب ..

ناموا كما لم تناموا
غدا تصبحون على الخبز والخير ناموا
غدا تصبحون على جنتي
.. فاستريحوا وناموا
يعيش السلام
يعيش النظام
.. شالوم .. سلام![৬৫৪]

শহিদ দিবসের আমি সব উদযাপন প্রত্যাখ্যান করি যেন ভুলে যাই
আমি চাষ করবো নিপীড়িত শহিদের কবর
অন্যকোনো ভূমিতে কবর দেয়া যায় তাই এক এক করে
আমি বরং তুলে নেবো কবরগুলো থেকে তাদের হাড়মজ্জা
যেন কেউ ফাসাদ–বিশৃঙ্খলা উস্কে দিতে না পারে
আমার রাষ্ট্রে জীবিত–মৃত মিলিত হওয়ার কারো অধিকার নেই
মৃত্যুর নেই অধিকার দীর্ঘজীবনের
আমাদের স্বাধীন বিস্মৃতিগুলো কাটতে থাকে আমাদের
আমি ভেঙ্গে ফেলবো শিঘ্রই প্রতিটি কামান
যতোক্ষণ না ওখানে ডিম পাড়ে কুবতর
ভেঙ্গে ফেলবো যুদ্ধের স্মৃতি
তোমরা যেমন ঘুমাওনি তবে তেমনি তারা ঘুমিয়ে গেছে
আগামী কাল তোমাদের ভোর হবে রুটিতে যখন ঘুমিয়ে থাকে রুটি
আগামী কাল তোমাদের ভোর হবে আমার বেহেশতে
সুতরাং তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করো এবং ঘুমিয়ে পড়ো
শান্তি দীর্ঘজীবী হোক
সিস্টেম দীর্ঘজীবী হোক
শালুম...
শান্তি...

দারভীশ যখন বলেন হাড়-অস্থি তুলে এনে অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে। এ কথার প্রতীকী তাৎপর্য আছে। শুধু সরিয়ে ফেলা নয়, এক এক করে সম্পূর্ণ মাটির নিচে দাফন করে ফেলতে হবে। এই হাড়মজ্জা হলো উপনিবেশিক ব্যবস্থার সারাংশ। উপনিবেশিক এবং যায়োনবাদী কাঠামোর কঙ্কাল তুলে এনে অন্যকোথাও পুরোপুরি মাটির গভীরে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে যাতে আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। একদিকে তিনি উপনিবেশিক সমাজ, সংস্কৃতি ও শাসন

---

৬৫৪. দারভীশ, মাহমুদ, *খুতাব আল দিকতাতুর আল মাওজুনাহ*, পৃ. ৩২।

কাঠামোর নিগড় উপড়ে ফেলতে চান অপরদিকে জায়োনিস্ট প্রক্রিয়াগুলোর তৎপরতা এবং তাদের দোসরদের প্রতিনিধিত্ব ভেঙ্গে দিতে চান। কিন্তু তার জন্য যুদ্ধ নয়, কামান নয়– প্রতিরোধের নয়া উপায় তিনি কার্যকর করার প্রস্তাব করেন। যারা শান্তি চায় তাদের সবকিছুর আগে তাদের যুদ্ধাস্ত্রগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে। এটিই দারভীশের প্রস্তাব। এরপর শান্তির প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। কবিতায় দারভীশ তাই সদর্প উচ্চারণে ট্যাংক-কামান ধ্বংস আর কবুতরের প্রজননপ্রক্রিয়া তথা শান্তিপ্রক্রিয়াকে এক করে দেখেন। একই সমান্তরালে দাঁড় করেন কবি।

তবে কবিতায় যে প্রক্রিয়ায় দারভীশ প্রতিরোধের এমন নয়া প্রস্তাব দিয়েছেন তার ভাষাগত বোঝাবুঝিও গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন ও ভাষাগত চিন্তার প্রক্রিয়াগুলোতে এসব বিষয়ের যথেষ্ট মোকাবেলার ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমা একাডেমিয়ায়। যেমন, ফরাসি দার্শনিক দেরিদার বিনির্মাণ কিংবা অবিনির্মাণ তত্ত্বের অছিলা নিয়ে দারভীশের নয়া নির্মাণ প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত হওয়া যায়। শুধু অবিনির্মাণতত্ত্ব ছাড়াও পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম, টি এস ইলয়টের ট্রাডিশন এর ধারণা কিংবা ফুকোর সাভার্সন এর ধারণা দিয়ে দারভীশের সাথে যোগসূত্র তৈরি করা যায়। দেরিদার অবিনির্মাণ বিষয়ক আলোচনায় প্রথমত সেন্টার, প্রেজেন্স, ডিফারেন্স ইত্যাদি ধারণার সাথে পরিচিত হওয়া জরুরি। দ্বিতীয় পর্যায়ে অবিনির্মাণের আলোচনায় অনুপ্রবেশ করে দারভীশের সাথে তা মিলিয়ে পাঠ করা যায়।

তারও আগে লজোস এবং লোগোসেন্ট্রিজম এর সাথে পরিচিত হওয়া যায়। কারণ অবিনির্মাণের সাথে লোগোসেন্ট্রিজমের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শব্দ বা ধ্বনিবিষয়ক ধারণা বলতে লোগোসেন্ট্রিজমকে বোঝানো হয়। ধর্মতত্ত্বে ও দর্শনে শব্দ বা লোজোসের জ্ঞান ও ধারণা অতিপ্রাচীন। শব্দ থেকেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। ধর্মীয় জ্ঞানের ঐতিহ্যে শব্দের এমন ধারণা ও বিশ্লেষণ বড়ধরনের স্থান দখল করে আছে। আদিকাল থেকে নানাবিধ ধর্ম, প্রথা, ঐতিহ্য, পুরাণ, দর্শন, চিন্তাধারা, মতাদর্শ ইত্যাদি গ্রন্থিত হয়েছে। নিজ নিজ মতের পক্ষে মানুষকে প্রভাবিত করতে প্রচারের স্বার্থে এসব গ্রন্থনার গুরুত্ব ঐতিহাসিক। আমাদের কাছে এসব গ্রন্থ বা যেকোনো বইয়ের একটি অধিবিদ্যামূলক আবেদন রয়েছে। লোজোস বা বাচনিক শব্দতন্ত্র () হিসেবে এর উপস্থিতির ঘটনা চলমান রয়েছে বাস্তব সমাজে। পরম্পরাগত ঐতিহ্য রয়েছে তার। অধিবিদ্যামূলক প্রভাব কিংবা কোনো বিশেষ শব্দতন্ত্র–প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বের অতিরেক উপস্থিতি () দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ অর্থ এবং অর্থের উপস্থিতিকে ধ্রুব ও চিরসত্য বলে নেয়াকে লোগোসেন্ট্রিজম বলা হয়। এই শব্দকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা অধরা, ধাঁধা ও ধোঁয়াসে অবোধগম্য এবং বস্তুর ঊর্ধ্বের দৈব কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত করতে পারে। কিন্তু দেরিদা সবসময় এধরনের মেটাফিজিক্যাল চেতনার বিপরীতে অবস্থান নেন। দেরিদা ধ্বনিকেন্দ্রিকতা থেকে এই মেটাফিজিক্যাল উপদান সরিয়ে ফেলতে চান। মূলত দেরিদার অবিনির্মাণতত্ত্বের মূল লক্ষ্য হলো মেটাফিজিক্স থেকে ভাষাকে মুক্ত করা। লোগোসেন্ট্রিজমের ব্যবহারিক দিক হলো ধ্বনিকেন্দ্রিকতা ()। যেহেতু ধর্ম ও মেটাফিজিক্সের ক্ষেত্রে ধ্বনিকেন্দ্রিকতার মুখ্য ব্যবহার রয়েছে ফলে তা মানুষের মধ্যে ধ্বনিকেন্দ্রিক চিন্তাকাঠামোও তৈরি করে। যেখানে বস্তুত ধ্বনি, শ্রুতি বা সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দেরিদা ধ্বনিকেন্দ্রিক চিন্তা ও ভাষাকাঠামোকে অস্বীকার করে

আসছেন। কারণ তাতে রয়েছে মেটাফিজিক্সের অস্তিত্ব। ধ্বনিকেন্দ্রিকতা এবং লোগোসেন্ট্রিজমের কারণে একধরনের সেন্টার তৈরি হয়। যাতে ধ্রুবসত্য এবং চিরায়ত সত্য ও ভাবচর্চার ধারার নির্ভরতা থাকে সেন্টারের উপর। মিনিং () তখন সেন্টারকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। দেরিদা মতাদর্শের এই কেন্দ্রিকতাকে ভাঙতে সেন্টারের ধারণাকে শনাক্ত করেন। একইসাথে সেন্টারের বা কেন্দ্রিকতার ধারণা অস্বীকার করেন। তার মতে, ভাষায় মূলত কোনো ধ্রুব সত্য, চিরায়ত অর্থ () এর কেন্দ্র থাকতে পারে না। থাকতে পারে না কোনো চিরায়ত উপস্থিতি ()। কারণ, ভাষামাত্রই মুক্তক্রিড়ার ক্ষেত্র ()। দেরিদা এ মুক্তক্রিড়া বা মুক্তগতিকে ভাষার একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। যেখানে ভাষাচিহ্নের () একটি অর্থ উপস্থিত হয়। আবার তা স্থগিত হয়ে যায়। অপরদিকে স্থগিত হয়ে যাওয়া অর্থ যুক্ত হয় অন্যকোনো ভাষাচিহ্নে। এ প্রক্রিয়া অন্য কোনো সিগনিফায়ার () এর সাথে ভাষাচিহ্ন তার উপস্থিতির ছাপ রেখে যাচ্ছে। আবার যেখানে এটি যুক্ত হয় অপর কোনো ভাষাচিহ্নে সাথে। দেশকালের প্রেক্ষিত বিচার করে এটি যুক্ত হয় অন্যকোনো ভাষাচিহ্নের সাথে। দেরিদা লোগোসেন্ট্রিজমের বিপরীতে অর্থাৎ মেটাফিজিক্সমুক্ত করার উদ্দেশ্যে ডিফারেন্স () নামক অপর একটি বর্গের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। ডিফারেন্স () মানে বিচ্ছেদ। ডিফারেন্স বলতে বোঝায়, লোগোসেন্ট্রিক বা অধিবিদ্যাজনিত দর্শনের বিপরীতে এমন একটি ধারণা গড়ে তোলা যাতে ধ্রুব সত্য বা চিরায়ত কোনো উপস্থিতি ও কেন্দ্র নেই। এধরনের কেন্দ্রমুক্ত করার ধারণা ও ভাষাগত প্রক্রিয়ার অপর নাম ডিসেন্টারিং। কারণ ডিফারেন্সে দেখা যায়, লিখিত কিংবা উচ্চারণ করা বাক্যে অথবা বাক্যের অংশে শুধু শব্দ নিজস্ব কোনো মূল্য তৈরি করে না। যাতে শব্দের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি ঘটছে প্রতিমুহূর্তে। পূর্বাপর শব্দের নিয়ন্ত্রণ মেনে এবং পার্থক্য বিচার করে এই ঘটনা চলমান থাকে। ডিফারেন্সর চরিত্র বলতে গিয়ে দেরিদা বলেন, ডিফারেন্স মূলত একটি সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়ার নামান্তর। যেখানে এটি প্রথমত, স্থান কালের প্রেক্ষিত বিচার করে ও প্রতিনিধিত্ব করে। দ্বিতীয়ত, এটি ভাষাকেন্দ্রিক পার্থক্যসৃষ্টিকারী। তৃতীয়ত, এটি নিজেই একটি সৃষ্টি। মোটকথা, দেরিদা ডিফারেন্স নামক বর্গ তৈরি করে ভাষা এবং অর্থের ভিতর ধ্রুব কেন্দ্র (), ধ্রুব উপস্থিতি () ভাঙার প্রস্তাব করেন।[৬৫৫]

ডিকনস্ট্রাকশন এর ধারণা মূলত উল্লেখিত ধারণাগুলোর মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে দেরিদার ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনে। যার মূল লক্ষ্য হলো, সেন্টার সৃষ্টিকারী মিনিং এবং এর উপস্থিতিকে পেছন থেকে সরিয়ে দেয়া। সরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ভাষাকে মেটাফিজিক্সমুক্ত করা। দেরিদা হাইদেগারের ডিস্ট্রাকশন () তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার অনুরূপেই ডিকনস্ট্রাকশন এর ধারণা বিশ্লেষণ করেন। হাইদেগারের ডিস্ট্রাকশন এর ধারণা গড়ে উঠেছে ভাষার প্রত্নবিদ্যার হদিস করার মধ্যদিয়ে। প্রত্নতত্ত্ব এর পুরো মানে, পুরনো জ্ঞান। পুরাতন অর্থ–বিদ্যা। যেখানে জ্ঞান ও চিন্তার ডিস্ট্রাকশন বা ধ্বংসাবশেষে শনাক্ত করা যায়। যাইহোক, অবিনির্মাণের সক্রিয়তা হলো কেন্দ্র ও প্রান্ত নিয়ে। কেন্দ্র থাকা যাবে না–ইটিই

[৬৫৫]. গুনে, আজদা ও গুনে, ক্যান, *এ ব্রিফ ডেসক্রিপশন অব জাক দেরিদা'স ডিকনস্ট্রাকশন এন্ড হারমিউনিটিক্স* (জার্নাল অব নিউ ওয়ার্ল্ড সাইন্সেস একাডেমি, ভলিয়ম: ৩, সংখ্যা: ২, ২০০৮), পৃ. ২১৯-২২৫। সায়মন ক্রিচলি, *ডিকনস্ট্রাকশন এন্ড প্র্যাগমেটিজম: ইজ দেরিদা এ প্রাইভেট আইরনিস্ট অর এ পাবলিক লিবারেল?*—চ্যান্টাল মোফি কর্তৃক সম্পাদিত *ডিকনস্ট্রাকশন এন্ড প্র্যাগমেটিজম* (লন্ডন: রুটলেজ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৯-৪২।

সাফ কথা অবিনির্মাণের। কেন্দ্র ভেঙে ফেলা যার মূল কাজ। এই ভাঙন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে দেখা যায়, সব প্রান্তই কেন্দ্র হয়ে ওঠে নয়া কাঠামোয় পরিণত হয়। আবার কেন্দ্র ভেঙ্গে– প্রান্ত ভেঙ্গে কেন্দ্র হয় এবং পুনরায় প্রান্তের সৃষ্টি হয়। এটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। সবসময় একটি কর্মকাণ্ড অনুশীলনের মাধ্যমে এটি চলমান থাকে।[৬৫৬] কেন্দ্র ভাঙতে হবে, কারণ, কোনো সত্য, চিরায়ত কোনো কেন্দ্রে, কোনো বিশেষ কাঠামো ও কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় আটকে থাকতে পারে না। সত্য সেকারণে ধ্রুব হতে পারেনা। সত্যে পৌঁছাতে হলে বরং কেন্দ্র ভাঙা জরুরি। এ তত্ত্বে যেমন বর্জন আছে তেমনি গ্রহণও আছে। অর্থাৎ, যেখানে কেন্দ্র ভেঙে যাচ্ছে, কেন্দ্রকে বর্জন করে প্রান্ত এবং প্রান্ত ভেঙে নতুন কাঠামো। যখন এটি বর্জন দিয়ে শুরু হয়, পুনরায় তা গঠন হয়। মানে তা গ্রহণ করাও হয়। এই গ্রহণও আবার বর্জিত হয়। এভাবে একটি পুরনো ব্যবস্থা যেমন ভাঙা হয়। তেমনি নতুন ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। দারভীশের কবিতায় এমনি ইশারার বিপুল উপস্থিতি লক্ষণীয়। দারভীশ বলেন,

-وأما بنعمة ما أنعم الحكم - حكمى)
فحدث)
ألم أبن خمسين سجنا جديدا لأحمى اللغة
.من الحشرات ومن كل فكر قلق أ
ألم أخلط الطبقات لألغى نظام التقاليد
!والمرجعية والزمن المحترق ؟
فمن يذكر الآن أجداده ؟
ومن يعرف الآن أولاده ؟[৬৫৭]

"আর আমার বিধান কতো চমৎকার। অতএব প্রচার করো আমার নেয়ামত"
কীটপতঙ্গের দল আর সব বিদগ্ধ উদ্বিগ্ন চিন্তা থেকে রক্ষায়–
আমি কি ভাষা রক্ষায় পঞ্চাশটি নতুন বন্দিশালা নির্মাণ করিনি?
আমি বিশেষত্ব না রেখে সব শ্রেণি একাকার করে ফেলিনি?
কারণ আমি প্রত্যাখ্যান করি প্রথাবদ্ধ ব্যবস্থা
প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং পুড়ে যাওয়া ক্ষয়ে যাওয়া সময়?
সুতরাং কারা পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে এখনো
কারা এখনো সন্তানের পরিচয় বহন করতে চায়?

এখানে কয়েকটি পঙক্তি কিছুটা ভিন্ন স্টাইলের। যেখানে পবিত্র কোরআনের সূরা আল দোহার দুটি আয়াতের ভঙ্গি অনুসরণ করে রচনার চেষ্টা করেছেন দারভীশ। কোরআনিক স্টাইল অনুসরণ করে কবিতার উপস্থাপনরীতিতে ভিন্ন রুচির প্রকাশ ঘটেছে নিশ্চয়ই। কবিতাটি নেয়া হয়েছে দারভীশের

---

[৬৫৬]. মরটন, ট্রিমোথি, *ইকোলজি*—ক্লেয়ার কলব্রুক কর্তৃক সম্পাদিত *জ্যাক দেরিদা: কী কনসেপ্টস* (লন্ডন: রুটলেজ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪১-৪৭।
[৬৫৭]. দারভীশ, মাহমুদ, *খুতাব আল দিকতাতুর আল মাওজুনাহ*, পৃ. ৩৭।

খুতাব আল দিকতাতুর আল মাওজুনাহ কাব্যগ্রন্থ থেকে। বইটির বিশেষ একটি দিক হলো, কবি এখানে রাষ্ট্রসম্পর্কিত তার জীবন দর্শন উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র হিসেবে কি ধরনের রাষ্ট্র হবে–তার রূপরেখা এই কাব্যগ্রন্থে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত প্রথম পঙক্তিতে কবি কোরআনের অনুসরণ করে নিজস্ব বিধান-ব্যবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন। বিশেষত এখানে কবি প্রথাগত ভাষা, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ভেঙ্গে নতুন নিয়ম প্রবর্তনের প্রস্তাব করছেন। কিঞ্চিত তীর্যকভঙ্গিতে ভাষা রক্ষার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এখানে। ভাষা রক্ষার জন্য কবি কারাগার নির্মাণের প্রসঙ্গ আনেন। কিন্তু ভাষা রক্ষায় কেন দারভীশকে এতোটা কঠিন হতে দেখা যায়? এর মধ্যদিয়ে প্রধানত অভ্যন্তরীণ বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করা হয়েছে। প্রত্যাখ্যান চলমান বিধিব্যবস্থার। তবে এখানে কবিকে ঐতিহ্যবিরোধী মনে হতে পারে। কবিতাটির স্টাইল এবং বক্তব্যের পূর্বাপর মেজাজের কারণে এমন বর্ণনার অবতারণার ঘটনা ঘটতে পারে। যার সাথে কবির সামগ্রিক কাব্য অনুসন্ধিৎসা এবং কবিতা বিষয়ক ভাবনার সাথে সাংঘর্ষিক। দারভীশ প্রথা ভাঙতে চেয়েছেন, কিন্তু ঐতিহ্যবিরোধী হতে চাননি। বরং ঐতিহ্যের পরিপালনে বিশ্বাসী ছিলেন। যেকারণে তার কবিতায় ধর্ম-পুরাণ, লোকাচারের নানা অনুষঙ্গ বিপুলভাবে এসেছে। কারণ দারভীশের কবিতা এবং ভাষা গণমুখী চরিত্র ধারণ করে তৈরি হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, তার কবিতার উৎস ও বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া ফিলিস্তিন। এবং শুধুই ফিলিস্তিন। মাতৃভূমি। তার জীবনের সমস্ত ভাব, ভাষা ও তৎপরতা এই একটি জায়গা থেকে উৎসারিত।

এই অবস্থার মধ্যে তার তিনটি বিষয় শনাক্ত করা যায়। প্রথমত, তার দেশ ও জন্মভূমি উৎসগত দিক থেকে তার সকল কর্ম প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, তার কবিতা, ভাষা ও জীবন অভিন্ন সম্পর্কে রূপান্তিরত হয়। তৃতীত, প্রথাবাহিত শিল্প ও অলংকার কাঠামোর বন্ধন থেকে তার কবিতা–ভাব, ভাষা ও শিল্প নৈপুণ্যে নতুন রূপে হাজির হয়। এই তিনটি দিক অর্থাৎ পুরো বিষয়টি ছিলো একটি যুথবদ্ধ প্রক্রিয়া। কোনোটাকে কোনোটা থেকে আলাদা করা যায় না। আরবের বুদ্ধিবৃত্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারায় দারভীশ একজন ব্যতিক্রমী কাব্যপুরুষ, একজন সৃজনশীল ভাবুক। অর্থাৎ দারভীশ যে বিপ্লবী ধারার কবি সেক্ষেত্রে তার পূর্বের দু একজনের নাম আসলেও (যেমন ইবরামীহ তুওকান) তিনি ছিলেন পুরাপুরি স্বতন্ত্রধারার। তবে ল্যাটিন আমেরিকা, স্পেন, আফ্রিকা ও এশিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে বিপ্লবীধারাগুলো যেভাবে বিকশিত হয়েছে ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে আরব অঞ্চলে একদম কম বিকশিত হয়েছে বলা যায়না। লাতিন আমেরিকার কবি পাবলো নেরুদা, রোকে ডালটন, ফেদেরিক গার্সিয়া লোরকা এবং তুরস্কের বিপ্লবী কবি নাজিম হিকমত– যারা ছিলেন দারভীশের অনন্ত প্রেরণা। তবে নিজস্ব ঐতিহ্যের আল মাআরী, মুতানাব্বী, আবু তাম্মাম, হাফিজ ইবরাহীম, আহমদ শাওকী, ইবরাহীম তুওকান, ফাদওয়া তুওকান, নিজার কাবানী প্রমুখ কবি সাহিত্যিক ছিলেন দারভীশের বিশেষ প্রেরণার উৎস। মোটকথা, দারভীশ বিপ্লবী ধারার কবি ছিলেন। যেকারণে তার কবিতায় গণচরিত্র বিপুলভাবে এসেছে।

দারভীশ রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন বলা বাহুল্য। কিন্তু তার সত্যিকার কাজের বড় পরিসর ছিল ভাষা ও সংস্কৃতি। যেকারণে তাকে এ দুটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে লড়াই করতে হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবেলা করতে হয়েছে অনেক কিছু। ইজরাইলি ধারার প্রভাব বলয়ের বিরুদ্ধে তাকে যুগপৎ লড়তে হয়েছে ফিলিস্তিনের অন্য অনেকের সাথে। ফিলিস্তেনের অভ্যন্তরের যারা নিজেদের সার্বভৌমত্ব এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ফিরিয়ে আনার লড়াইয়ের বিপরীতে শান্তি ও সমঝোতার নামে জায়োনিস্ট প্রকল্পকে স্বাভাবিক (নরমালাইজড) করতে সক্রিয় ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন দারভীশ। যাদের অন্যতম কাজ ছিল ইতিহাস বিকৃতি কিংবা সহজ কথায় বলা যায়, ফিলিস্তিনের হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস পরিবর্তন করে যায়োনবাদী ইতিহাস প্রচার করা।[৬৫৮] অপরদিকে ফিলিস্তিনের অগ্রযাত্রায় বাধাদানকারী পক্ষগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ছিল দারভীশের অন্যতম লক্ষ্য। ফলে ইতিহাস, ভাষা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে জায়োনিস্ট প্রকল্প সক্রিয় রয়েছে তার প্রক্রিয়া এবং কাঠামোর বিলোপ চেয়েছেন কবি দৃপ্তকণ্ঠে। দারভীশ বলেন,

ويا أيها الشعب ، آن لنا أن نصحح تاريخنا
.. كي نضاهي الحضارات قولا وفعلا
وآن لنا أن نلقن أعداءنا السلم ، درسا وحلا،
سنقطع عنهم جميع الذرائع ،
.كي لا يفروا من السلم .. ماذا يريدون ؟
ماذا يريدون ؟ كل فلسطين ؟
..أهلا وسهلا[৬৫৯]

হে জনগণ, এখন সময় হয়েছে আমাদের ইতিহাস সংস্কারের
... সভ্যতাগুলোর সাথে চলতে কথায়-কাজে সমান্তরাল
এখন সময় হয়েছে পাঠ আর তার সমাধান হিসেবে
শত্রুদেরকে শান্তির শিক্ষা দিতে
শিগগির আমরা তাদের সব মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো
তারা যেন শান্তি থেকে পালাতে না পারে? তারা তবে কি চায়?
তারা কি চায়? পুরো ফিলিস্তিন?
এসো, স্বাগতম...

---

৬৫৮. ওটমান, ই.টি, *এ কোয়েশন অব হিস্ট্রিওগ্রাফি: দি 'নিউ হিস্টোরিয়ানস' অব ইজরাইল* (রিতসুমেইকান অ্যানুয়াল রিভিউ অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, ভলিয়ম: ৭, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৫৫-৬৭।
৬৫৯. দারভীশ, মাহমুদ, *খুতবা আল দিকতাতুর আল মাওজুনাহ*, পৃ. ৩০।

৬.৬: ভাষা, অর্থ এবং শরীর: ক্ষমতা ও প্রতিরোধ

ভাষা বিশেষত দারভীশের সামগ্রিক সৃষ্টির মাঝে একটি মৌলিক জিজ্ঞাসা। তার নিজের সত্তা, বেড়ে ওঠা, রাজনীতি, দর্শন, চিন্তা-ভাবনা, মতাদর্শ, দেশ-জাতি-সংস্কৃতি-ধর্ম সবকিছু মিলে ভাষার প্রশ্ন এবং সম্পর্ক নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ। তার কবিতায় ভাষার প্রশ্ন যেভাবে উত্থাপিত হয়েছে তাতে ভাষা বিষয়ক দর্শন, তত্ত্বভাবনা, সংস্কৃতি এমনকি রাজনীতি বিষয়ক নানান ধারণা সম্পর্কে চিন্তার উদ্রেক করে। ভারি তত্ত্বভাবনায় তার কবিতা ভারাক্রান্ত হয়নি একেবারে। খুব সহজাতভাবে উঠে আসে গভীর বোধ ও প্রজ্ঞার সারসত্য। যেখানে জ্ঞান ও শিল্প এক হয়ে ওঠে। ফলে তার কবিতা শুধু শিল্প ও নান্দনিক সৌন্দর্যের বিভা ছড়ায় না বিবিধ চিন্তা ও ভাবেরও বাহক। তার কবিতা আবার ভাবসর্বস্বও নয়। কিন্তু তার কবিতা জীবনঘনিষ্ট হওয়ায় তাতে শিল্পসর্বস্বতার চাপ নেই। জীবন ও কবিতা এক হয়ে ওঠে। কবিতাকে যিনি তার জীবন একইসাথে তার দেশ ও মাতৃভূমির অংশ করে নিয়েছিলেন। তার কবিতায় কাব্যিক ভাষা এবং ভাষা হিসেবে শুধু ভাষার প্রশ্ন একাকার হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ভাষা একটি সামগ্রিক একক। এটি এমন একটি একক যাতে ভাষা–ভাব এবং শরীর কিংবা সমগ্র চিহ্নব্যবস্থা এমনকি দেশকালও একই দেহের আকার ধারণ করে। ভাষা ও কবিতার এমন সামগ্রিক সত্তার কারণে তার সাথে রাজনীতি একীভূত একটি দিক। ফলে তাতে ক্ষমতার প্রশ্নও জড়িত। ক্ষমতার কারণে একইসাথে প্রতিরোধও জড়িয়ে আছে।

ভাষা, অর্থ এবং দেহ এই তিন বর্গকে ঘিরে দারভীশের কবিতায় কিভাবে ক্ষমতা ও প্রতিরোধের ধারণা ও তৎপরতা তৈরি হয়েছে তার বিশ্লেষণ করা যায়। একইসাথে ক্ষমতা ও প্রতিরোধকে কেন্দ্র করে ভাষা এবং অর্থ কিভাবে কোন প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয় তাও লক্ষ্যণীয়। দারভীশ ভাষার সাথে শরীরকে কিভাবে দেখেছেন কিংবা শরীর এবং ভাষা ক্ষমতা ও প্রতিরোধ প্রশ্নের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তার পর্যালোচনা জরুরি। মোটকথা, ভাষা এবং দেহের প্রেক্ষিতে প্রতিরোধ কেন জরুরি হয়ে ওঠে তার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, দারভীশ প্রতিরোধকে কতোটা ব্যাপকভাবে নিয়েছেন এবং অপরদিকে ভাষা ও শরীরের দার্শনিক প্রশ্নগুলো কিভাবে এসব কবিতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদ্ভাবিত হয়েছে।

প্রথমত, ভাষা, শরীর এবং শিল্প ও ভাবুকতাকে দারভীশ কিভাবে দেখেছেন তা নির্ণয় করা দরকার। কবিতায় কিভাবে তার স্বরূপ তৈরি হয়েছে তার উন্মোচন করলে দেখা যায়, এ বিষয়গুলো একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যেমন, স্বদেশ বা মাতৃভূমি ফিলিস্তিনকে বিষয় করে কবিতা লেখার জন্য দারভীশকে বিষয়ের কবি বলা হয়। দারভীশ সম্পর্কিত নানান আলোচনা সমালোচনায় তার কাব্যশৈলী ও বিষয় বা ভাবের মধ্যে একটা আলাদাকরণ প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। বিষয় ও কর্ম, উদ্দেশ্য ও বিধেয় কিংবা দেহ ও আত্মার বিভাজন-চিন্তার মতো দারভীশের কবিতার শিল্প ও ভাব কাঠামোর মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্যকারী প্রয়াস দেখা যায় আরবের বিভিন্ন সমালোচকদের লেখায়। এই বিচ্ছিন্নতা ঘটে যাওয়ার ফলেই দারভীশকে বিষয় প্রধান কবিতার কবি কিংবা শিল্পহীন বিষয়ের কবি বলা সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু সমালোচনার এই পদ্ধতি দারভীশকে তার কবিতা, শিল্প, বিষয় ও ভাবের জায়গায়

বুঝার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতাকে ক্ষুন্ন করতে পারে। দারভীশের কবিতা– রূপ ও ভাবগতভাবে একাকার বলে প্রচলিত শিল্প ও নন্দনকলার জ্ঞান মাথায় রেখে বিচার করলে ভুল হতে পারে। নিছক নান্দনিক দিক থেকে তার কবিতাকে বিবেচনা করা যায় না। তাকে দেখতে হয় সমগ্রতা দিয়ে। অভিন্ন সম্পর্কের মধ্যদিয়ে। কারণ দারভীশ তার জীবনে যে অভিন্ন ও অখন্ড ভাবের বীজ বপন করেছেন সেখান থেকেই তার শিল্পবোধ, ভাষা, কাব্য ও রাজনীতি সবকিছু বিস্তারিত হয়েছে।

জগতকে অখণ্ড কল্পনা করার ভাব ও দর্শন প্রাচ্যে অনেক আগেই তৈরি হয়ে গেছে। বিশেষত ভারতীয় ও মুসলিম আরব-দর্শনে এর একটি শক্তিশালী ধারা ছিলো। স্রষ্টা ও প্রকৃতি সমার্থক। সৃষ্টি স্রষ্টারই অংশ ও আকার। বিশ্বজগতে বিরাজমান সবকিছু তারই প্রকাশ ও অভিব্যক্তি। পশ্চিমা দর্শনে প্লেটো থেকে শুরু দেহ ও ভাব বিষয়ক চিন্তাভাবনার। প্লেটো শরীর কিংবা বস্তুকে আলাদা করে দেখেছেন আত্মা থেকে। আইডিয়া কিংবা ভাব থেকে। আইডিয়াকে উপরে স্থান দিয়েছেন।[660]

তবে ভাষা মূলত সামগ্রিক প্রশ্নকে ধারণ করে। ভাষার ব্যাপ্তি ও পরিসর অনেক বিস্তৃত ও গভীর। মানুষের কথা ও ভাবপ্রকাশ কিংবা যোগাযোগের মাধ্যম ভাষা– ভাষার এমন সংজ্ঞায়নে ভাষাপ্রশ্ন আটকে থাকেনি। বর্ণমালার মধ্যেও ভাষা আটকে থাকেনি। কারণ বর্ণমালা কিংবা অক্ষর যেমন ইঙ্গিতবাহী চিহ্ন– এবং এসব অক্ষরের বিশেষ গঠনরে মধ্যদিয়ে রচিত তেমিন আমাদের চারপাশ, নানা দৃশ্য, চিত্র, ঘরের আসবাব, বিন্যাস-শৃঙ্খলা– সবই ভাষার চিহ্নব্যবস্থা। ফলে ধর্ম-বর্ণ, গোত্র-শ্রেণি, সমাজ, জীবন, সংস্কৃতি, জীবনাচার, কৃষি-পরিবেশ, প্রকৃতিসহ জীবনসম্পর্কিথ সকল অনুষঙ্গমাত্রই ভাষা এবং ভাষার চিহ্নব্যবস্থা। ভাষা মূলত মানুষের ইতিহাস এবং মানুষের জীবনের সমান। যেখানে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা, সহিংসতা, নিপীড়ন-বঞ্চনা, জুলুম-নির্যাতন, আনন্দ-বেদনা, অধিকারবোধ, স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা, আত্মপরিচয়, রাজনৈতিক চৈতন্য, বাদ-প্রতিবাদ, প্রতিরক্ষা-প্রতিরোধ সবই এই ভাষা এবং তার নানাবিধ চিহ্নব্যবস্থার মধ্যদিয়ে প্রকাশিত। ভাষাকে এভাবে দেখার কারণ, আধুকিন চিন্তা ও দর্শনের দুনিয়ায় ভাষা সম্পর্কিত তত্ত্বচিন্তা, ডিসকোর্স ও পর্যালোচনা বহুদূর এগিয়েছে। এসব বিবিধ কারণে মাহমুদ দারভীশের কবিতায় ভাষাপ্রশ্ন, ভাষার প্রাসঙ্গিকতা নানান দিক থেকে বিবেচ্য। দারভীশের কবিতায় দার্শনিক ও তত্ত্বগত দিক থেকে ভাষার বিস্তার যেমন ঘটেছে তেমনি ব্যক্তি ও জাতীয় পরিচয়, প্রতিরোধ–লড়াই সংগ্রামে ভাষা নিজেই একটি ইস্যু হয়ে ওঠে।

ভাষা যেমন বিচিত্র, ভাষা সম্পর্কিত আলাপও বহুপ্রকার। কারণ, ভাষা শুধু সাধারণ আলোচনার মধ্যে যেমন সীমিত থাকেনি তেমনি ভাষা আবার ভাষাদর্শন এবং তার তত্ত্বালোচনার মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভাষা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। সমাজ ও ইতিহাসের জীবন্ত প্রক্রিয়াগুলোর সাথে আন্তসম্পর্ক তৈরি করে ভাষা। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতি এবং উঁচু-নিচু ভেদ-পরিচয়সহ নানাবিধ বর্গের সম্পর্কগুলোর ভিন্ন অর্থ উৎপাদন করে এবং ভিন্ন ভিন্ন বার্তাও

---

৬৬০. চোরাকুই, ফ্র্যাঙ্ক, *দি বডি এন্ড এম্বডিমেন্ট: এ ফিলোসফিক্যাল গাইড* (নিউ ইয়র্ক: রোম্যান এন্ড লিটলফিল্ড, ২০২১ খ্রি.), পৃ. ২৫।

বহন করে ভাষা। ফলে বিভিন্ন সম্পর্ক যেমন ভাষার ফলাফল তেমনি খোদ সম্পর্কটাও ভাষার নামান্তর। এই ভাষা বিষয়টি ঐতিহাসিক নানা কারণে নানান প্রেক্ষিতে খুব গুরুত্বপূর্ণও হয়ে ওঠে। ভাষা যেহেতু সম্পর্ক রচনাকারী একটি উপায় তেমনি ভাষা সমাজের নানা মতামতের উৎপাদনশীল কর্তৃত্বও বহন করে। ভাষার সাথে তাই সমাজে সক্রিয় এবং নিস্ক্রীয় বিবদমান শ্রেণির এজেন্সিমূলক সম্পর্ক রয়েছে। একইকারণে ভাষার সাথে ক্ষমতার সম্পর্কও ওতোপ্রোতভাবে জাড়িয়ে আছে। মানুষের সক্ষমতা এবং ক্ষমতা কতটুকু এটি প্রথমত ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। ভাষা একটি শ্রেণির অবস্থানকে যেমন প্রকাশ করে তেমনি ভাষাহীনতার কারণে একটি জনগোষ্ঠীর অবস্থান কতোটা দুর্বল তাও নির্দেশ করে। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভাষা বিষয়ক আলোচনা জনপ্রিয়তা লাভ করে উপনিবেশিক তত্ত্বালোচনায়। পরবর্তীতে উত্তর-উপনিবেশিক এবং শীলতলযুদ্ধের সময় ভাষাসম্পর্কিত রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উপনিবেশিক শাসনামলে ভাষা নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নিয়ে আলোচনার শেষ নাই। উপনিবেশিক এবং উত্তর-উপনিবেশিক চিন্তাচর্চার ইতিহাসে ভাষাপ্রশ্ন মূলত উপনিবেশিতের নিপীড়িত দশার একটি পরিস্থিতি। এই অবস্থাকে অতিক্রম করার জন্য উপনিবেশিত জনগণের উপনিবেশিক কর্তৃত্ব, দখলদারিত্ব ও শাসনকাঠামোর বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই সংগ্রাম এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধই মূলত ভাষা। ভাষা এ কারণেই বলা হয়, কারণ উপনিবেশিক শাসনপ্রকিয়ায় সীমাহীন জুলুম-দমন-পীড়নের মধ্যে প্রথমত উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। তাদের জুলুম, বঞ্চনা ও অধিকার নিয়ে কথা বলার স্বাধীনতাই কেড়ে নেয়া হয়। ফলে যখন উপনিবেশিত জনগণ কথা বলতে শুরু করে উপনিবেশিক প্রভুর মুখোমুখি হয়ে তখন তার এই কথা বলা– এই ভাষাই বড়ধরনের প্রতিরোধ হয়ে ওঠে।[৬৬১]

ফ্রানৎস ফানো তার ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক গ্রন্থে ভাষার নানামাত্রিক ব্যবহার ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষত উপনিবেশিকতা এবং তার বর্ণবাদী প্রক্রিয়াগুলোর অসুস্থ প্রভাব এবং ক্ষমতার প্রক্রিয়াগুলো কতোটা ভাষার মধ্যদিয়ে সমাজে বিস্তার ঘটিয়েছে ফানো তার বিশদ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। একইসাথে ফানো উপনিবেশিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রক্রিয়া এবং কাঠামোর ভিতরে ভাষার অবস্থান-কার্যকারিতা কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রভাব তৈরি করে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। বইটিতে ফানো বৃহত্তর ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের উপনিবেশিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। ফানো এখানে ক্যারেবিয়ান জনগোষ্ঠী এবং তাদের সংস্কৃতিতে ফরাসি উপনিবেশিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিগঠন এবং তার প্রক্রিয়া হিসেবে ভাষাকে দেখেছেন।[৬৬২] ফানো মনে করেন, উপনেবিশক ক্ষমতার এবং তার প্রক্রিয়াগুলোর সাথে ভাষার সম্পর্ক খুব গভীর। মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে ফানো দেখেছেন, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, দমন-পীড়ন, বলপ্রয়োগ, শাসন-শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণের গোড়ার সাথে জড়িয়ে আছে ভাষা। কারণ ফানো মনে করেন, উপনিবেশিত

---

[৬৬১]. ল্যাম মার্কম্যান, চার্লস, ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্কস——ফ্রানৎস ফ্যাননের মূলগ্রন্থ (ফরাসি) *Peau Noire, Masques Blanc*'র অনুবাদ (লন্ডন: প্লুটো প্রেস, ১৯৮৬), পৃ. ৯।

[৬৬২]. রুডরিগেজ, ডেইনালি ফ্লোরেস, *ল্যাঙ্গুয়েজ, পাওয়ার এন্ড রেজিসট্যান্স: রি-রিডিংগ ফ্যানন ইন আ ট্রান্স-ক্যারিবিয়ান কনটেক্সট* (দি ব্ল্যাক স্কলার, ভলিয়ম: ৪২, সংখ্যা: ৩-৪, ফল-উইন্টার ২০১২), পৃ.।

জনগগোষ্ঠীগুলো মনস্তাত্ত্বিকভাবে হীনমানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে খুব সহজে। তার সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলো দ্রুত প্রকাশ হতে থাকে। বিশেষত তার ভাষা ও জীবন যাপনের বিভিন্ন সম্পর্কে।[৬৬৩]

বিপরীত দিক থেকে ভাষার ব্যবহার কিংবা ভাষার গড়ে ওঠাও দেখিয়েছেন ফানো। কারণ ভাষা একইসময়ে উপনিবেশিক ক্ষমতাবিরোধী প্রতিরোধের প্রধান ক্ষেত্র ওঠে। তবে সাদা উপনিবেশায়ন ধরে নেয় যে, কালোরা অন্টোলজিক্যালি প্রতিরোধ করতে অক্ষম। কিন্তু একটি সময় আসে, যখন তারা বাস্তবেই প্রতিরোধ শুরু করে দেয়। তাদের মধ্যে আত্মচৈতন্যের উদয় হয়। তাদের ভিতরে আত্মমর্যাদাবোধা তৈরি হয়। এমন আত্মসচেতনতাবোধ তাদেরকে এক ধরনে পরমার্থিক চৈতন্যের () দিকে ধাবিত করে। যাতে তারা এর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। ফানো এ অবস্থাকে হেগেলের দর্শন মেনে *the dignity of the spirit* হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৬৬৪]

ভাষাপ্রশ্নে প্রতিরোধ সাধারণত একটি সাংস্কৃতিক পুনরুৎপাদন পরিস্থিতির ফলাফল। এরমধ্যে নৈতিক বিষয় আছে– সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ও আছে। ঐতিহাসিকভাবে আরব অঞ্চলে উপনিবেশিকতার ঘটনা-পরবর্তী সময়ে প্রতিরোধ যেভাবেই ঘটুক– তার লক্ষ্য ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বাধীনতা, পরিচয়, আধুনিকতা ইত্যাদি। এই সবগুলো বিষয়ের সাথে বস্তুত ভাষা জড়িয়ে আছে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে। ব্রিটিশ উপনিবেশিকোত্তর পটভূমিতে ইজরাইল ছিল এর প্রধান কারণ। এরপর ঠাণ্ডাযুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের পরিসরে ভাষা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সবকিছুর পরও ইজরাইলের কারণে এই অঞ্চলে প্রতিরোধ অব্যাহত একটি আচরণ এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার একটি অংশ হয়ে ওঠে। যেহেতু সামগ্রিক যুদ্ধপ্রক্রিয়ার একটি অংশ প্রতিরোধ। কার্যত, যুদ্ধের নানান মাধ্যম রয়েছে– এরমধ্যে সশস্ত্রতার বাইরে সবথেকে বড় ক্ষেত্র হলো সাহিত্য। সাহিত্য এবং ভাষা বস্তুত যুদ্ধের যেমন উপায় তেমনি প্রতিরোধেরও। প্রতিরোধ সাহিত্য কথাটি সেকারণে আরবী বিশেষত ফিলিস্তিনের জাতীয় সাহিত্যের অনিবার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। প্রতিরোধের ভাষা এবং সাহিত্য মূলত সামগ্রিক যুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বারবারা হারলো'র ভাষায় প্রতিরোধ যুদ্ধপ্রক্রিয়ার কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেখানে ভাষা এবং সাহিত্য পুরো প্রক্রিয়ার একটি অখণ্ড রূপ।[৬৬৫] বারবারা মনে করেন, ভাষা কিংবা সাংস্কৃতিক মাধ্যমকে বিচ্ছিন্ন রেখে শুধু যুদ্ধই যখন একমাত্র উপায় হয়ে ওঠে তখন তাতে শেষপর্যন্ত কোনো মূল্য তৈরি করেনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিরোধকে ভাষা থেকে কিংবা প্রতিরোধ থেকে ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। প্রতিরোধ কোনো না কোনোভাবে সংস্কৃতি ও ভাষাপ্রশ্ন মোকাবেলা করেই তার সামগ্রিক সক্রিয়তা নিশ্চিত করতে পারে। গভীরভাবে দেখলে, সশস্ত্র প্রতিরোধের বাইরে ভাষা ছাড়া প্রতিরোধের আর কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তদুপরি প্রতিরোধ শুধু উপায়ের প্রশ্ন নয়, বরং প্রতিরোধ চিন্তা ও ভাষার মধ্যদিয়ে একটি সামগ্রিক লড়াইয়ের স্বরূপ নির্মাণ করে।

---

[৬৬৩]. ফ্যানন, ফ্রানৎস, *ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্কস*, পৃ. ৯।
[৬৬৪]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৬৯।
[৬৬৫]. হারলো, বারবারা, *রেজিসট্যান্স লিটারেচার* (নিউ ইয়র্ক: ম্যাথুয়েন, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১২-৬০।

দারভীশের কাছে তাই ভাষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাষা এবং জীবন কিংবা ভাষা, দেশ এবং রাষ্ট্র তার কাছে সমার্থক। ভাষার বাইরে তাই দারভীশের কাছে এতোটা জীবন্ত, কার্যকর কোনো উপায় ছিল না যাতে তার লড়াইয়ের অভিমুখ তুলে ধরতে পারেন। ভাষার মধ্যে তিনি তার জীবনের অভিজ্ঞতা দেখতে পেয়েছেন। তেমনি জীবনের লক্ষ্যগুলোকে ভাষার মধ্যদিয়ে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। যেকারণে ভাষা এবং বাস্তবতা দারভীশের কাছে অভিন্ন ছিল।

> I built my homeland, I even established a state, in my language. If there are no humanistic spaces in poetry that touch on the human, the text dies.[666]
>
> আমি আমার মাতৃভূমি নির্মাণ করেছি, এমনকি আমার ভাষার ভিতর রাষ্ট্রও কায়েম করেছি। কবিতায় যদি মানবিক কোনো জায়গা না থাকে যা মানুষকে স্পর্শ করে, তবে সেই কবিতার ভাষার মৃত্যু ঘটে।

দারভীশের কাছে মাতৃভূমির পুনরুদ্ধার এবং জাতিগঠন ছিল মূল বিবেচ্য। এটি দারভীশের নিছক মতাদর্শিকতা ছিল না। আরো অনেকদূর এগিয়ে বলা যায়, জীবনের মিশন ও ভিশনের সাথে দেশ-জাতি-রাষ্ট্রগঠনের ব্রতকে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন তিনি। এর জন্য ভাষা তার কাছে বড়ধরনের বিবেচনা হয়ে ওঠে। ইজরাইলের বিরোধিতা কিংবা জায়োনিস্ট উপনিবেশিক মতাদর্শের বিপরীতে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এই মিশনের একটি অংশ মাত্র। দেশহীনতার একটি গভীর এবং সীমাহীন একটি অনিশ্চয়তাকে দারভীশ নিশ্চিত করেন ভাষার মধ্যদিয়ে। ভাষার জমিনেই তিনি নির্মাণ করেন রাষ্ট্র। ভাষার ভিতর নির্মিত এই রাষ্ট্রপ্রকল্পে তিনি তার জাতিরও নেতৃত্ব দেন।

ভাষার ভিতর দিয়ে যে প্রতিরোধের অবয়ব নির্মিত হয়েছে দারভীশের কবিতায় তাতে ভিন্ন একটি সৌন্দর্য্যগত আকারও তিনি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ কবিতা কিংবা শিল্পের বাইরে সাধারণত প্রতিরোধ–লড়াই এসব বিষয়গুলোর মাঝে সৌন্দর্যসৃষ্টি মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে না, বরং একটি নিরস আবহ ও উত্তেজনা বিরাজমান থাকে। কিন্তু কবিতায় দারভীশ যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তাতে কেবল মানুষের মাঝে অনুপ্রেরণা, সচেতনতা জাগ্রত করার মধ্যেই কবিতার দায় শেষ হয়ে যায়নি। বরং প্রতিরোধের আবহে আকারে তিনি বিশেষ ধরনের গ্ল্যামার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।[৬৬৭] মোটকথা প্রতিরোধ সর্বস্বতার দোষে নিপতিত হয় যায়নি তার কবিতা। কিংবা অন্যকথায়, প্রচারসর্বস্বতার কবলে আটকে রাখেননি দারভীশ তার কবিতাকে। প্রতিরোধের ভাষাকে। কিংবা ভাষার প্রতিরোধকে। প্রতিরোধ একটি শৈল্পিক হয়ে ওঠে তার কবিতায়। একইসাথে শিল্পের

---

[৬৬৬]. দারভীশ, মাহমুদ, *অ্যাক্সাইল ইজ সো স্ট্রং উইদিন মি, আই মেই ব্রিংগ ইট টু দ্য ল্যান্ড*—সাক্ষাৎকার, হেলিৎ ইয়েশুরুন, পৃ. ৫১।

[৬৬৭]. এ. হামদান, মারওয়ান, *মাহমুদ দারভীশ'স ভয়েসিং পোয়েটিক্স অব রেজিসট্যান্স: আ রিসেপশোনিস্ট রিভিউ* (ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব হিউম্যানিটিজ এন্ড স্যোশাল সাইন্স, ভলিয়ম: ৬, সংখ্যা: ১০, অক্টোবর ২০১৬), পৃ. ১৭৪।

স্বাধ গ্রহণ করা যায় আবার মন ও আত্মার দাবিও মেটানো যায়। মোটকথা, একটি পরিপূর্ণ আকার সাক্ষাৎ করা যায় তার কবিতার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে।

৬.৭: প্রতিরোধ: স্থান-কাল, ইতিহাস, স্মৃতি ও পুরাণ

স্থান এর সাথে *কাল* যুক্তভাবে যেমন পাঠ করা যায় তেমনি আলাদা করেও পাঠ করা যায়। কিন্তু ধারণা আকারে যখন কালের কথা বিশ্লেষণ করতে হয় তার সাথে খুব স্বাভাবিকভাবে স্থানের ধারণাও চলে আসে। বাংলা ভাষায় স্থান-কাল শব্দবন্ধটি দেশকাল আকারে পাঠ করার রীতি অনেক পুরনো। স্থান অর্থে এখানে দেশ'র ব্যবহারের চল রয়েছে। স্থান-কাল শব্দটির জ্ঞানীয় বর্গ বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনায় বিভিন্নভাবে নির্ধারিত। এর যেমন বিজ্ঞাননির্ভর আলোচনা রয়েছে তেমনি রয়েছে দার্শনিক আলোচনা। বিজ্ঞানের আলোচনার বাইরে স্থান-কালের আলোচনার যুক্তি প্রক্রিয়াগুলোর দার্শনিক পরিসর থাকলেও সাধারণত ভাষার নিয়ম-কানুন মেনে বিবেচিত হয়ে আসছে। এছাড়া রয়েছে সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা। রয়েছে সাহিত্যে ও কবিতায় স্থান'র বিচিত্র ব্যবহার। বিজ্ঞানের বাইরে যেকোনো আলোচনায় স্থানকাল বলতে কোনো না কোনো পরিসরকে বোঝানো হয়। বিজ্ঞানে একপ্রকার পরিসর কিংবা তার সংজ্ঞা প্রায় একইরকম বোঝানো হলেও তাতে যেসব গাণিতিক যুক্তিপ্রক্রিয়া রয়েছে তা থেকে ধর্ম-ইতিহাস-দর্শন–ভাষা–সমাজ-সাহিত্য ও কবিতায় স্থানকালের ব্যবহারভঙ্গি ভিন্ন।

আরবী ভাষায় স্থানকে *মাকান* বলা হয়। বাংলা ভাষায় যেভাবে যুক্তরূপে *স্থানকাল*'র ব্যবহার রয়েছে আরবী ভাষায় *মাকান* কালবাচক শব্দ *জামান*'র সাথে যুক্তভাবে ব্যবহার হয় না। কিন্তু সংজ্ঞাগত দিক থেকে মাকান এর সাথে কালের অর্থও জড়িয়ে আছে। ড. হাবীব মুন্সি আরবী ভাষায় এবং আরবী কবিতায় *মাকান*'র দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন। হাবীব মনে করেন, মাকান আরবী ভাষায় যেভাবে বিস্তারিত হয়েছে তাতে তার সমাজতাত্ত্বিক দিকটি সাধারণ। ফলে মাকান বলতে এমন কিছু বোঝানো হয় যাতে স্থান ও কালগত ব্যাপ্তি ও পরিসর বিবেচিত। মাকান এমন একটি প্রত্যয় যেখানে কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাকান এর ধারণা লাভ করা যায়না। ফলে স্থান ও কাল দুটি অভিন্ন পদার্থ। প্রকৃতি বিজ্ঞান বা সাধারণ বিজ্ঞানে মাকান বললে যেমন ভৌত ও মূর্ত কিছু বোঝানো হয় ঠিক অনুরূপ কিছু সবসময় ভাষায়, সাহিত্যে কিংবা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে বোঝানোটা জরুরি নয়। তবে উভয়ের মৌলিক ধারণাগুলো এক হলেও ব্যবহারিক পর্যায়ে শিল্প সাহিত্যে– ইতিহাস ও সমাজে স্থান একটি মেটাফিজিক্যাল অবস্থান গ্রহণ করে। মাকান এর ভিতর একটি অধিবিদ্যাগত অর্থ ও ধারণা কাজ করে। কারণ স্থান এর পেছনে রয়েছে অতীত। কিন্তু সেই অতীত শুধু বিশেষ স্থান দেখে অনুধাবন করা যায়না তার সাথে জড়িয়ে থাকা ঘটনাবলীর কিংবা তার নিয়ম নীতি ও সম্পর্কসূত্রগুলোর অনুসন্ধান না করে। ফলে শেষপর্যন্ত মাকান বা স্থানকে নিছক একটি মূর্ত কিংবা বিমূর্ত পরিসর হিসেবে আর ধরে নেয়া যায়না। এর সাথে জড়িয়ে যায় নানাবিধ ঘটনাবলী, সম্পর্ক, কার্যকারণ। এটি ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা কিংবা ভাষা ও

সাহিত্যের অংশ হয়ে *ওঠে*। ডুরখেইম এবং রজার বেকন স্থান'র ধারণাকে একটি ব্যাপকভিত্তিক অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হন।[৬৬৮]

সময় এবং স্থান সাহিত্য, শিল্প, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাসবিদ্যায় যে ভেদবুদ্ধি গড়ে তুলেছে তার সাথে স্থান-কালের ধারণাগুলো নতুনভাবে দেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সাহিত্য, কবিতা এবং সৌন্দর্য্যবিদ্যায় ইতিহাস এবং স্থানকালের ধারণা, বিশ্লেষণ সেকারণে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে। ড. হাবীব যে দিকে ইঙ্গিত করেছেন মাকান শব্দের ব্যপ্তি নিয়ে, তার একটি ভাষাতাত্ত্বিক দিকও রয়েছে। বিজ্ঞানের আলোচনায় *মাকান* যে বস্তুগত ধারণার মধ্যে সীমিত হয়ে আছে কবিতা এবং সৌন্দর্য্যবিদ্যা তার অবমুক্তি ঘটানোর বিপুল সম্ভাবনা হাজির করতে সক্ষম। কারণ *মাকান* শব্দটি শুধু কোনো একটি স্থানের– সেটা মূর্ত হোক কিংবা বিমূর্ত হোক– উপলব্ধির মধ্যে সীমিত নয়, বরং *মাকান* একইসাথে শরীর, একইসাথে অস্তিত্ব এবং বড় অর্থে *হয়ে ওঠার* সম্ভাবনা প্রকাশ করার তাৎপর্য ধারণ করে। মাকান শব্দটির মূলশব্দ কাওন। কাওন (كون) মানে হয়ে ওঠা। হওয়া। থাকা। সম্ভাবনাময় হওয়া। মূর্ত হয়ে ওঠা। সৃষ্টি হওয়া। ইত্যাদি। মাহমুদ দারভীশের কবিতায় এই *হয়ে ওঠা*'র বিষয়টি অসংখ্য পঙক্তিতে রচিত হয়েছে। দারভীশের কবিতা পাঠ থেকে *হয়ে ওঠা* একটি বিশেষ ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। হয়ে ওঠা– একদিকে অস্তিত্বের সাথে, সত্তার সাথে সম্পর্কিত। অপরদিকে এটি সময়ের সাথে সম্পর্কিত। কারণ যখন বলা হয়, হয়ে ওঠা কিংবা হওয়া– এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফলাফল। কারণ শিক্ষা, উন্নয়ন, আত্মোন্নয়ন, আত্মোন্মোচন, নীতি-নৈতিকতা, শিল্প-রুচি, সামাজিকতা, ধর্ম-সংস্কার, সম্ভাবনা উদ্ঘাটন, উদ্ভাবন এর মাধ্যমে যে সত্তা, অস্তিত্ব, পরিচয়, চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে কিংবা হয়ে ওঠাটা একটি ফলাফল। ফলে এইভাবে পর্যায়ক্রমে হয়ে ওঠার বিষয়টির সাথে বস্তুত সময় গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই সময় ঐতিহাসিক সময়। হয়ে ওঠা যখন বলা হয় তখন এটি পেছনের দিকে অর্থাৎ একটি কালক্রমিক প্রক্রিয়ার দিকে নির্দেশ করে। দারভীশ যখন হয়ে ওঠার কথা বলেন তখন তিনি কখনো সাধারণ অর্থে *হয়ে ওঠা*'র কথা বলেন, আবার তিনি কখনো বলেন *ফিলিস্তিনের হয়ে ওঠা*। কারণ যখন ফিলিস্তিন হয়ে ওঠার কথা বলা হয় তখন সুদূর প্রাচীন ইতিহাসের গভীর সেকড়ের সাথে মূলীভূত হয়ে আছে ফিলিস্তিন। কিংবা ফিলিস্তিনের হয়ে ওঠা।[৬৬৯] নূর মাসালহা মনে করেন, হয়ে ওঠার ধারণার জন্য দারভীশ মার্টিন হেইডেগারের *বিইয়িং এন্ড টাইম* দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত ছিলেন।[৬৭০] দারভীশ হয়ে ওঠার ধারণা'র মাধ্যমে শুধু গোড়ার অনুসন্ধানের দিকে মনোযোগ ফেরাতে চেষ্টা করেছেন বলা যায়না, বরং একইসাথে তিনি ফিলিস্তিনের হয়ে ওঠা, তার সত্তা, তার পরিচয়-ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য কিভাবে গড়ে উঠেছে এবং সময় ও কালক্রমিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তার অভিজ্ঞতাগুলো কিভাবে গ্রহণ করেছে সেদিকেও নজর ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, ভিন্ন ভিন্ন জনমানুষ, তার ধারণা, জীবন যাপনের ভিন্নতা ও আলাদা জীবন প্রণালী কিন্তু একইসাথে বসবাসের গভীর সংহতি– সবকিছুর

---

[৬৬৮]. ড. মুন্সি, হাবীব, *ফালসাফাহ আল মাকান ফী আল শি'র আরাবী: ক্বিরাআতুন মাওদুইয়্যাতিন জামালিয়্যাহ* (দামেশক: মানশুরাত ইত্তিহাদ আল কুত্ত্বাব আল আরব, ২০০১ ইং), পৃ. ১১-৩০।

[৬৬৯]. মাসালহা, নূর, *পালেস্টাইন: আ ফোর থাউজ্যান্ড ইয়ার হিস্ট্রি* (), পৃ. ১৬ এবং ২৪০।

[৬৭০]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩।

পেছনের তাৎপর্যগুলো দারভীশ যেন একটি কাঁথায় হাজারো নকসার সমাহারে অঙ্কন করেছেন একটি মানচিত্র।

হেইডেগার বিইং শব্দটি দুইভাবে ব্যবহার করেছেন। being এবং Being। বিইং মানে ঠিক সত্তা নয়। ইংরেজি ইজ অর্থে হওয়া বা আছে নির্দেশ করে। বিইং অনেকটা তাই। বস্তু বা যেকোনো কিছুর আছেময়তা প্রকাশ করে। কিন্তু Being এর মানে কি? দুনিয়ার আর সমস্ত বস্তুর মতো আছে হয়ে থাকার মতো এই Being এর মানে এক নয়। এর মাধ্যমে বিইং এর সত্য বা পরমকে কিংবা অধরা সত্যের বিশ্লেষণা করা যায়। হেইডেগার এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। বিইং এর সাথে সর্বজনীনতার সম্পর্ক এবং বিতর্কগুলোও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। যেখানে দর্শনের ক্ল্যাসিক ইতিহাসে Being-কে ট্রান্সসেন্ডেন্স বিইং আকারে বিবেচনা করা হতো। সত্তার একক হিসেবেও দেখা হয়েছে Being-কে। মোটকথা ছোট হরফ b দিয়ে বিইং এর মানে এবং বড় হরফের Being– এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।[৬৭১] Being দিয়ে বস্তুত পরম-কে বোঝানো হয়েছে।[৬৭২] সত্তার হয়ে ওঠা (becoming of self) কিংবা আছেময়তাকে দারভীশ অনেক সময় অপর সত্তা (other self) হিসেবেও বর্ণনা দিয়েছেন। দেখেছেন পরম সত্তা হিসেবে। হেইডেগারের becoming of self কিংবা becoming of Being এর ধারণা বিশ্লেষণের দেখা যায়, হয়ে ওঠা কিংবা আছেময়তা বিয়িং এর অন্টোলজিক্যাল ট্রুথ। যার মানে দুনিয়ার মধ্যে ইতিমধ্যে আছে বা থাকা (being in the world)। এই আছেময়তা বা থাকাটা উন্মোচিত হোক বা না হোক কিন্তু এটি মানুষের সক্রিয় চিন্তা এবং তৎপরতার (action) মধ্যদিয়েই দৃশ্যমান হয়। মানুষ তাকে বিকশিত করে এবং পূর্ণতা দেয়। ফলে যে সত্তা বা পরম সত্য মানুষ উন্মোচন করে এবং ক্রমশ দৃশ্যমান করে তোলে– এর অর্থ হলো এই পরম বা তার আছেময়তা আগে থেকেই আছে। এই আগে থেকে থাকা বা আছেময়তা কিংবা মানুষের চিন্তা যে অধরা সত্যকে শনাক্ত করে– এই জায়গাটি দারভীশের কবিতায় দুইভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমত, পরম যেমন মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানে ধরা দেয়– উন্মোচিত হয় কিন্তু তার স্বরূপ কি? দুইভাবে এই আছেময়তা– হয়ে ওঠা কিংবা বিইং এর স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে দারভীশের কবিতায়। একটি *আমি* এবং তার *আছেময়তা*, তার হয়ে ওঠা। অপরটি– ফিলিস্তিন এবং তার হয়ে ওঠা।

দুটি দিকই দারভীশের কবিতায় উঠে এসেছে—যেখানে হয়ে ওঠা—যার আরবী শব্দ কাওন—যেটি ক্রিয়াবাচক শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে। ليكن, لأكون, تكونين, تكوني ইত্যাদি। কয়েকটি কবিতাংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

---

৬৭১. ম্যাকুয়্যার, জন ও এডওয়ার্ড রবিনসন, বিইং এন্ড টাইম—মার্টিন হেইডেগার'র মূলগ্রন্থ (জার্মান) *Sein und Zeit*'র অনুবাদ (যুক্তরাষ্ট্র: ব্ল্যাকওয়েল, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ১৯-৩২।

৬৭২. মাসালহা, নূর, *পালেস্টাইন: আ ফোর থাউজ্যান্ড ইয়ার হিস্ট্রি*, পৃ. ৩৬৪, দ্রষ্টব্য: নোট।

وأنا أحاول أن أكون
ولا أكون[৬৭৩]

আমার ব্রত হয়ে ওঠার
এবং না হওয়ার

يا أيها الجسم الذي يختصر الأرض،
يا أيتها الأرض التي تأخذ شكل الجسد الروحي
كوني لأكون[৬৭৪].

যিনি সীমিত করে এনেছেন পৃথিবীকে সেই দেহ হে
যিনি রূহানী শরীরের রূপ গ্রহণ করেছেন সেই পৃথিবী হে
হয়ে ওঠো যেন হয়ে উঠি আমি।

ليس قلبي قرنفلة
ليس جسمي حقلا
-ما تكونين؟[৬৭৫]

আমার হৃদয় নয় করনফুল
আমার দেহ নয় শস্যক্ষেত
তুমি কী হয়ে ওঠো?

سألتك ألا أكون وألا تكوني
سألتك ان تريديني
نهرا

وفي كل شيئ نكون
يوحدنا ما يشتتنا
ليس هذا هوالحب
في كل شيئ نكون
يجددنا ما يفتتنا[৬৭৬]

---

৬৭৩. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, ( ), পৃ. ৮১।
৬৭৪. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩৯।
৬৭৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৫২।
৬৭৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৬৮।

প্রার্থনা তোমার কাছে যেন আমি না হয়ে ওঠি এবং তুমিও না হয়ে ওঠো
প্রার্থনা তোমার কাছে যেন তুমি আমাকে চাও নদী

এবং প্রতিটি বস্তুর ভিতর আমরা হয়ে ওঠি
আমাদের এক করে তোলে যাকিছু বিচ্ছিন্ন করে আমাদের
এ নয় সেই ভালোবাসা
প্রতিটি বস্তুর ভিতর আমরা হয়ে ওঠি
আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করে যাকিছু ছিন্নভিন্ন করে আমাদের

وليكن.
لا بد لي...
لا بد للشاعر من نخب جديد
وأناشيد جديدة.[৬৭৭]

এবং হয়ে উঠতে হবে
আমার জন্য হয়ে ওঠা অনিবার্য...
অনিবার্য কবির জন্য নতুন এখতিয়ার
নতুন সঙ্গীত।

বিভিন্ন আঙ্গিক ও প্রেক্ষিত থেকে কবিতার পঙক্তিগুলো রচিত হয়েছে। দারভীশের জীবনের যখন মধ্যাহ্ন চলছিল সে সময়ে রচিত এসব কবিতার স্তবক। *মুহাওয়ালাতু রকম*.... থেকে নেয়া হয়েছে এসব পঙক্তি। শেষ স্তবকটি নেয়া হয়েছে *ফী আখির আল লাইল* থেকে। তবে দারভীশের প্রায় কাব্যগ্রন্থে এ ধরনের পঙক্তির দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। মুহাওয়ালাতু রকম– এগারোটি কবিতা রয়েছে বইটিতে। প্রায় সবগুলো কবিতা মোটামুটি দীর্ঘ। মুক্তছন্দে নির্মাণ করা এসব কবিতায় ইতিহাস, চলমান পরিস্থিতি, মানুষের জীবন, অস্তিত্ব, জীবন প্রকৃতি, পরমসত্য, আধ্যাত্মবোধ, লড়াই-সংগ্রাম, ইজরাইলের হত্যা-দখলদারিত্ব, শত্রু-মিত্রের ভেদজ্ঞান, রাজনৈতিক আখ্যান এবং ফিলিস্তিনের বিবিধ বিবরণ গভীরভাবে উঠে এসেছে। হেইডেগার যে অর্থে বিইং এর বিশদ আলোচনা করেছেন দারভীশের দিক থেকে এটি ছিল একটি কাব্যিক প্রয়াস। *আমি*—ব্যক্তির সত্তা, পরম কিংবা পরম সত্য দারভীশ আরব-ইসলামী জ্ঞান-দর্শনের ঐতিহ্যের মধ্যে খুঁজে নিয়েছেন। প্রকাশ করেছেন আধুনিক ভাষাভঙ্গিতে। তার দীর্ঘ এসব কবিতায় যখন *হয়ে ওঠার* প্রসঙ্গটি এসেছে তাতে পূর্বাপর কোনো সম্পর্ক ছাড়াই তার প্রকাশ ঘটেছে। যাতে একটি কবিতা পাঠ করতে করতে হঠাৎ একটি নতুন বক্তব্য সামনে এসে পড়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়। এখানে উদ্ধৃত প্রথম দুটি পঙক্তি একটি

[৬৭৭]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১* (), পৃ. ১৮৭।

কবিতার শেষ চরণ। *উহিব্বুকা আও লা উহিব্বুকা* কাব্যগ্রন্থের *আগনিয়্যাতুন ইলা আল রীহ আল শিমালিয়্যাহ* শীর্ষক কবিতার শেষ দুই চরণ। দুটি পঙক্তিকে ভিন্ন একটি প্যারায় কিংবা আলাদা স্তবক আকারেও ঠিক করা হয়নি। স্বাভাবিক গতিতে এসে কবিতাটি শেষ হয়েছে এই দুই পঙক্তিতে। কিন্তু তাতে ছেদ ঘটে গেছে। কারণ ঠিক আগের পঙক্তিগুলোর বক্তব্য বেশ ভিন্নরকম। যেখানে তিনি বলছেন, অতঃপর আমি ভুলে গেছি আমার কোমর, গ্রীবা, বৃষ্টির মুহূর্ত/এবং তাদের বাহুর পাশে রেখেছি আমার হেন্ডকাফ/ আর আমি হয়ে গেলাম বাহুবিহীন, তবু আমি বচসা করি গাছের সাথে/যখন বন্ধুরা অপেক্ষা করে পুলিশের/এবং জেসমিন ফুলের। এর পরের পঙক্তি উদ্ধৃত চরণ। যাকে দৃশ্যত এবং মুহূর্তের জন্য অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু দারভীশ তার কবিতার আঙ্গিক ও কাঠামো যেভাবে তৈরি করেন তাতে এ ধরনের গঠন লক্ষ্যণীয়। প্রশ্ন হলো দারভীশ কেন এমন *হয়ে ওঠার* সাধণার কথা বলেছেন? কিংবা কী হতে চাচ্ছেন তিনি? যেসব এই *হয়ে ওঠার* বিষয়টি এসেছে সেখানেই এভাবে এসেছে। এটি একটি বিশেষ চিহ্ন কিংবা একটি স্বারক পঙক্তির মতো নির্ধারিত হয়ে আছে তার কবিতায়। এই *হয়ে ওঠা*টা... ক্রমশ একটি ঘটনা। একটি অকাট সত্য। এই সত্য নির্মাণের নয় কিন্তু তাকে বিপুলভাবে প্রকাশ করার ব্রত নিয়েছিলেন দারভীশ। এই সত্য একদিকে ঐতিহাসিক অপরদিকে এটি ঐতিহাসিক হয়েও পরম। একটি তিনি তার ভূমি—ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিকতার সাপেক্ষে দেখতে পেয়েছেন। অপরটি তার ভাবজ্ঞান– পরম চিন্তায় অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছেন। সময়-স্থান-ঐতিহাসিকতা যেখানে একাকার হয়ে আছে। যাকে ফিলিস্তিন বলা হয়, দারভীশের কাছে এটি নিছক একটি ভূমির ব্যাপার নয়—এটি একটি সত্য'র প্রশ্ন, যা আগে থেকেই হয়ে আছে। হেইডেগারের ভাষায় বলা হয়, *বিইং (Being)*। ফলে ফিলিস্তিন—কোনো প্রশ্ন নয় বরং এটি একটি সত্যের মুহূর্ত, যে সত্য আর দারভীশ কিংবা ফিলিস্তিনের গণমানুষের অস্তিত্ব একইসাথে জাত, অখণ্ড এবং অভিন্ন। ফিলিস্তিন সম্পর্কে এমন বক্তব্য ম্যাটাফিজিক্যাল মনে হতে পারে, মনে হতে পারে ধর্মতাত্ত্বিক কিন্তু দারভীশ মনে করেন এটি একই সাথে পরম এবং ঐতিহাসিক। কারণ ফিলিস্তিনের সত্য তা প্রবলভাবে প্রকাশ করার বিষয়। এই সত্যের সাথে একজন দারভীশের সত্য জড়িয়ে আছে। এটি যেমন রাজনৈতিক তেমনি জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং কাব্যিকও বটে। দারভীশের বেড়ে ওঠার সাথে এমন ফিলিস্তিনের হয়ে ওঠার সত্য তৈরি হয়েছে।[৬৭৮] ব্যক্তির হয়ে ওঠার প্রশ্নটি যখন একটি সত্যের অভিযাত্রায় এবং তার পরম সত্যের অনুসন্ধানের পথে সম্পর্কিত তখন ব্যক্তির হয়ে ওঠার প্রশ্নটি পরম সত্যানুসন্ধানের পথ থেকে আলাদা করে দেখা যায়না। দারভীশ তার রাজনীতি, ইতিহাস, কবিতা, ভাষা, জীবনবোধ, ব্যক্তির বিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে সবসময় উৎকণ্ঠিত থাকতেন। প্রতিনিয়ত তাকে অস্থির করে তুলতো বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাবনা নিয়ে। দারভীশ বলেন, *أنا دائماً خائف من أن أكون وصلت إلى الباب المسدود*[679]*/আমি সবসময় আমার হয়ে ওঠা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি যখন বদ্ধ দরোজায় আটকে যাই*।

৬৭৮. মিনা, এরিকা, *দি জিওগ্রাফি অব পোয়েট্রি: মাহমুদ দারভীশ এন্ড পোস্ট-ন্যাশনাল আইডেন্টিটি (যুক্তরাষ্ট্র: ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস বোস্টন, হিউম্যান আর্কিটেকচার: জার্নাল অব দি স্যোসিওলজি অব সেল্ফ-নলেজ, ভলিয়ম-৭, সংখ্যা-৫, ২০০৯ ইং)*, পৃ. ১১১-১১৭।

৬৭৯. খুরি, জিযেল, *হিওয়ার মা'আ মাহমুদ দারভীশ: আন আল সিয়াসাহ ওয়া আল শি'র ওয়া তাজরিবাহ আল মাওত*, ২০০১), পৃ. ২১।

ফলে দেখা যাচ্ছে মাকান এবং কাওন—উভয়ের মূল এক। দুইটি যেমন ভিন্নভাবে প্রকাশ পায় তেমনি অভিন্নভাবেও প্রকাশ পায়। দুটির যেমন শরীরগত কিংবা বস্তুগত উপস্থিতি রয়েছে তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিকতা। ঐতিহাসিকতা নানান ঘটনার মধ্যদিয়ে যেমন তৈরি হয় তেমনি তার তাৎপর্য এবং বয়ানও তৈরি করা যায় বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উৎপাদনের নিমিত্তে। দারভীশের কবিতায় সময়ের ধারণা কিংবা ঘটনার সত্যাসত্য এবং ইতিহাসের আখ্যান গভীরভাবে নিহিত। কিন্তু ইতিহাস কেন দারভীশের কবিতায় স্থান পেয়েছে? দারভীশ কোনো ঐতিহাসিক নন, একজন কবি এবং রাজনীতিবিদ। ইতিহাস রচনা করেননি বটে তবে ইতিহাসের বয়ান ও নির্দেশনা হাজির করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। মহাকাব্যের আঙ্গিকে তিনি নানান চরিত্রের মাধ্যমে কোনো উপাখ্যান নির্মাণ করতে যাননি। তদুপরি ইতিহাস থেকে মুক্ত থাকেনি তার কবিতা। কারণ ইতিহাস এমন এক সত্য যেখান থেকে বের হওয়া যায়না। তবে বের করে দেয়া যায়—মানে রাজনৈতিক এবং ক্ষমতার কারণে ইতিহাসে কোনো শ্রেণি বা জাতিকে নিস্তব্ধও করে দেয়া যায়। প্রান্তে ঠেলে দেয়া যায়। কিংবা হয়ত নির্মূলও করে দেয়া যায়। কিন্তু আসলে কি শেষ করে দেয়া যায়? শেষপর্যন্ত জুলুমের সত্য এমনভাবে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যাতে মজলুমের অস্তিত্ব ক্রমশ দৃশ্যমান হতে থাকে।

তার কবিতায় গড়ে উঠেছে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ। কারণ ইতিহাসের তফসীর তার কবিতার ভাষায় উঠে আসাটা ছিল খোদ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তার বেড়ে ওঠার দীর্ঘ এবং তপ্ত অভিজ্ঞার মধ্যে আরব রাজনীতি, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামো-তৎপরতা—অপরদিকে ইজরাইল এবং অপরাপর শক্তির বিচরণ, সম্পর্ক ও সূত্র মিলে যে পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে—তার মধ্যে কবির দায় হয়ে ওঠে তার ব্যাখ্যা দেয়ার, দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার।[৬৮০] ফিলিস্তিনে দারভীশের জন্ম যতোটা ঐশ্বরিক, প্রাকৃতিক একইসাথে ঘটনাজাত—ঐতিহাসিকও। যেকারণে তার কবিতায় স্থানের সম্পর্ক রয়েছে, রয়েছে স্মৃতি। স্থানের আত্মার সম্পর্ক, স্থানের নিবিড় ও রক্তাক্ত সত্য জড়িয়ে আছে তার কবিতায়। এই স্থানগত ধারণা এমন যাতে, গমের শীষ, জলাপাইয়ে সবুজ পত্রাবলী, জয়তুনের ডালপালা, অলিভ অয়েলের গন্ধ, কারমেল পাহাড়ের নিস্তব্ধ আহবান, ফজরের বেলায় ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধুর শব্দ, গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি, আল কুদুস চত্বরের জমায়েত, রুটির ঘ্রাণ, শিশুদের হৈচৈ, মায়ের চেয়ে থাকা, সকাল সন্ধ্যার তৈরি করে দেয়া ফেনায়িত কফি, গ্যালিলির উপকূল জুড়ে সমুদ্রের গর্জন, বিকেলের বাজার, ইটভাটার কালো ধোঁয়া, পাথর ভাঙ্গার কাজে বাবার হাতের দৃঢ়তা, কৃষকের হাসি, নগরের ভাঙ্গা পুরনো দেয়াল আর অলিগলির ভাঁজে তরুণদের জড়ো হওয়া, আড্ডা। এমন বিপুল স্মৃতির কোমলতা ভেদ করে গুম, খুন, হত্যা, লুণ্ঠন, হানাদারি, নির্যাতন, উচ্ছেদ, বিতাড়ন, দখল, জুলুম-ধর্ষণ, গণহত্যার গভীর দাগ ও ক্ষতচিহ্ন লেগে আছে এই স্থানের সাথে। ফলে স্থানমাত্রই দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিন হয়ে ওঠে। শুধু ফিলিস্তিন। তবে কখনো কখনো অন্যতরো অর্থেও স্থানের প্রসঙ্গ এসেছে। এই স্থানের সত্য অনেক প্রাচীন। অনেক নিবিড়। মানুষের অস্তিত্বের সমান কিংবা তারো অধিক।

---

[৬৮০]. আতাসি, মাজেন, *জাদালিয়্যাতু আল জামান ওয়া আল মাকান ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ* (মাজাল্লাহ আল কালিমাহ, জানুয়ারি, সংখ্যা-৪৫, ২০১১ ইং.), পৃ. ২-৩২। ভিজিট: ০৩/০৩/২০২৩, مزن أتاسي (alkalimah.net)

ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্বয়ান। যেটি দারভীশের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ পাঠে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। দারভীশের কাব্যপাঠ থেকে ইতিহাস পাঠ সম্পর্কিত কয়েকটি নির্দেশনা গ্রহণ করা যায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতা। ঐতিহাসিক সত্য। ঘটনা বনাম ইতিহাস এবং মিথ বা পুরাকাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি (মিথিওপোয়েট্রি)—যার মধ্যদিয়ে কবি তার নিজের ভাষ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। দারভীশ তার কবিতায় নতুন ধরনের ইতিহাসবোধ, ইতিহাসচিন্তার বিস্তার ঘটিয়েছেন নিসন্দেহে। কবিতার জনগণসংশ্লিষ্টতা কিংবা পাঠকঘনিষ্ঠতার কারণ হিসেবে দারভীশের ইতিহাসচিন্তা নিশ্চিতভাবে প্রভাব রেখেছে। তার কবিতাপাঠে অনুধাবন করা যায়, ইতিহাস নিয়ে তার বিশেষ প্রকল্প রয়েছে। কারণ তিনি ফিলিস্তিনে ইতিহাস এবং ভাষার পুনরুদ্ধারে লড়াই করতে সচেষ্ট রয়েছেন।[৬৮১] যেখানে তিনি ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয়তা, ভৌগলিকতা, কবিতা-শিল্পরুচি এবং ইতিহাসবিদ্যার নতুন বয়ান উপস্থাপন করেন। একইসাথে ইতিহাসের বিপরীতে কবিতার ভাষাও তৈরি করেছেন। ইতিহাসের যে বয়ান শত্রুর ডিসকোর্সের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে নতুন বক্তব্য হাজির করেন দারভীশ। যে কবিতায় ইজরাইলিজম, জায়োনিজম এবং তার বুলডোজার তথা টর্চার ও দখদারিত্বের যাবতীয় উপায়-কৃৎকৌশলের বিপরীত বয়ান তুলে ধরেন। উদ্দেশ্য, তাদের বর্ণবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া। দারভীশ বলেছেন, কবিতা আকারে ইতিহাস লেখা যায়না। কিংবা ইতিহাসকে কবিতা বানানো যায়না। ফলে তিনি ইতিহাস লিখেননি। লিখেছেন ইতিহাসের সারসত্য—ইতিহাসের নিজের গতিতে আপন স্বভাবে বেড়ে ওঠার স্বরূপ। লিখেছেন কবিতার মধ্যদিয়ে। কবিতার ভাষা ব্যবহার করে—রূপক, প্রতীক এবং উপমার মধ্যদিয়ে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ নির্মাণ করতে চেয়েছেন দারভীশ। দারভীশের সামনে দুটি জনগোষ্ঠী—যাদের উভয়েরই দাবি একই ভূমি। দুই পক্ষের ইচ্ছা এক হলেও এই ভূমিকে কেন্দ্র করে তাদের ইতিহাস বলার পদ্ধতি এক নয়। ভাষা এক নয়। দেখার ভঙ্গি এক নয়। তারা একই ভূমি দাবি করছেন উভয়ই অথচ সেই ভূমির স্বতন্ত্র ইতিহাস কেমন তার বোঝার উপায় নেই। একই ভূমির দুইপক্ষের দাবির উৎপত্তিও দুইরকম। দাবি তোলার প্রক্রিয়া কেমন তা বোঝার কারণে দাবির পক্ষগুলো কেমন তাও বোঝা যায়। শত্রুপক্ষের দাবি যে ইতিহাসের বয়ানের কারণে সেই বয়ান তাদের নিজেদেরই তৈরি। যাদের দাবির উৎপত্তির পটভূমি কার্যকর করা হয়েছে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে—সেই পটভূমি থেকে গড়ে তোলা তাদের ভাষ্য ফিলিস্তিনের ভাষ্য হিসেবে প্রতিপাদ্য হওয়ার কিংবা সর্বজনীনতা লাভ করার সুযোগ কিংবা বৈধতা নেই। শত্রুর সেই বয়ানের বিপরীতে তাকে তাই লিখতে হয়েছে বিকল্প ধারায়। যার মধ্যদিয়ে তিনি তার পরিচয়, তার সত্তা নির্মাণ করেননি শুধু, নির্মাণ করেছেন একইসাথে তার জাতির রূপ ও পরিচয়। দারভীশ এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক ন্যায্যতা তার জনগোষ্ঠীর কাছে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। বস্তুত এটিই ছিল ফিলিস্তিনের নিজের ইতিহাস এবং ইতিহাসের সত্য। ইতিহাসকে এভাবে দেখার ক্ষেত্রে তিনটি স্তর পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। প্রথমত, দারভীশের নিজের গড়ে ওঠা। যাতে রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য শিল্প এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিশন

[৬৮১]. ই. প্রতিভা, *নিউ হিস্ট্রিসিজম ইন দি সিলেক্ট পোয়েমস অব স্টিফেন গিল এন্ড মাহমুদ দারভীশ* (ইন্ডিয়া: ইংরেজি বিভাগ, মাদুরাই কামারাজ ইউনিভার্সিটি, জুলাই ২০২০ খ্রি.), পৃ. ১-১৩।

নির্মাণ করা। যার মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তি সংগ্রাম এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে এবং একইসাথে আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করার সম্পর্ক ও প্রক্রিয়া গড়ে তোলা। স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে ছিল প্রতিরোধ। শত্রুপক্ষ ইজরাইলের ফিলিস্তিনীদের নির্মূল করাসহ সব ধরনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এসব প্রচেষ্টা ও লড়াই শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় পরিচয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রেও। যেকোনো সক্রিয়তার পেছনে দারভীশ মার্ক্সীয় চিন্তা ও নীতির ব্যাপারে সজাগ ছিলেন।[৬৮২] তারুণ্যজুড়ে কার্ল মার্ক্স ছিলো তার মনোযোগের বিশেষ উৎস।[৬৮৩] যেকারণে শত্রুর তৎপরতা আর নিজের করণীয় বিষয়ে—সেটা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন দারভীশ সে বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতেন। ব্যবহারিক দিক থেকে দারভীশ বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। ইজরাইলের যেকোনো নিপীড়নের বিপরীতে প্রথম কাজ ছিল নিজেদের মধ্যে মনোবল ধরে রাখার জন্য সাহস যোগানো। ইজরাইলের জুলম-দখলদারিত্ব আর হত্যার পরে দারভীশ লিখেছেন অনুপ্রেরণামূলক ও স্বপ্নসঞ্চারী অসংখ্য কবিতা। আতফালুনা ...

ভিশন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইতিহাস একটি মৌলিক ফেনোমেনা হিসেবে কাজ করেছে দারভীশের মাঝে। কারণ ইতিহাস লিখিত বস্তুমাত্র নয় বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ-সম্ভাবনা সৃষ্টিতে ইতিহাসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দারভীশ মনে করেন, ইতিহাস যখন নিছক লিখিত আকারে বইয়ের ভিতর রুদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তার আসলে কোনো কাজ থাকেনা। এইরকম ইতিহাস মৃতের নামান্তর। বস্তুত ইতিহাস একপ্রকার কর্তাসত্তা আকারে কাজ করে। কারণ ইতিহাস বা ইতিহাসের ঘটনাবলী লিখিতরূপে বসত করেনা বরং ইতিহাস জীবন্ত থাকে মানুষের মনে, চিন্তায় ও সক্রিয় তৎপরতায়। এই বসত করা আর জীবন্ত থাকার মানে হলো বর্তমান থাকা এবং কর্তারূপের সম্ভাবনা তৈরি করা। যেকারণে দারভীশের কবিতায় মিথ বা পুরাণের বিপুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত, দারভীশ তার ইতিহাসের যে পাটাতন গড়ে তুলেছেন তার মধ্যে একটি ছিল নিজ এবং অপর। এটি ছিল দারভীশের মধ্যবর্তীয় সময়কাল। এখানে দারভীশ খুব সংবেদনশীল হয়ে ওঠেন। যেখানে তিনি আপন এবং পর—এই দুই অবস্থার দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন যাতে তিনি দুই পক্ষের মধ্যে সংলাপ, আলোচনা বা বোঝাবুঝিতে যেতে চান। বোঝাবুঝির মাধ্যমে একটি সহাবস্থানমূলক পর্যায়ে পৌঁছানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চান।[৬৮৪] তবে এ বোঝাবুঝি মানে কোনো ধরনের শান্তি আলোচনা নয়। নিজের সাথে এবং পাঠকের সাথে বোঝাবুঝি। বড়জোড় ইজরাইলের সাথে একটি সামাজিক ডায়ালগ। কিংবা সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়া গড়ে তোলা। তৃতীয়ত, এই ধাপে এসে দারভীশের নিজেকে বরং নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। নিজের পুনর্বিন্যাসে মনোযোগ দিয়েছিলেন কবি। এটি ছিল তার শেষ পর্যায়ের সূচনাকালের কথা। ততোক্ষণে অসলো চুক্তি হয়ে যায়। এ চুক্তির কারণে দারভীশকে রাজনীতি থেকে শুরু করে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়েছিল। দারভীশ একটি

---

৬৮২. আব্দুল্লাহ, সায়িফ, *আল শি'র ওয়া আল সিয়াসাহ ফী মাছারি মাহমুদ দারভীশ* (সাফ,), পৃ. ২-৫। ভিজিট:: https://saaf.cerss.org/archives/317

৬৮৩. হাম্মাদ, নাজীব, *আল আইদিওলোজিয়্যাহ আল সিয়াসিয়্যাহ ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ: দিরাসাতু নামাজিজ শি'রিয়্যাহ*, পৃ. ৩৬-৫০।

৬৮৪. আবেদ আল হাকীম সালাহ, আমীরাহ, *জেরুজালেনম ইন পোয়েট্রি: এ কম্পাপেরাটিভ স্টাডি অব দি প্যালেস্টাইনিয়ান মাহমুদ দারভীশ, দি ইজরাইলি ইহেহুদা এমিচাই, এন্ড দি ইংলিশ উইলিয়াম ব্ল্যাক* (জর্ডান: ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচার, মিডল ইস্ট ইউনিভার্সিটি, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৩৪, ৪৭-৪৯।

পরিষ্কার অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময় তার কবিতায় মানবিক পরিচয়, জাতীয় পরিচয়, সংস্কৃতি, রুচিশীলতা, আধ্যাত্ম, ধর্ম-দর্শন, মানুষের সম্পর্ক, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ও ঘনিষ্টতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটা ছিল এমন একটি সময় যখন জাতীয় পরিচয় কিংবা পরিচয়ের বিতর্ক রাজনীতির পর্যায় থেকে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে জরুরি হয়ে ওঠে। যেকারণে দারভীশ সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রশ্নে আরো বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দারভীশ মনে করেন, রাজনৈতিক পরিচয়ের সারসত্য মূলত সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং পরিশীলনের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠে।

সংস্কৃতি বোঝার জন্য ভাষা যেমন জরুরি তেমনি ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে। কারণ দারভীশ যে ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহী তা হলো বর্তমানতা। কিংবা অতীতের ঘটনার নির্যাস বা প্রাণকে বর্তমানের জন্য সম্ভাবনাময় করে তোলার চেষ্টা। আর তার জন্য জরুরি হয়ে ওঠে ভাষা ও সংস্কৃতি। দারভীশ যে প্রতিরোধকে একটি ব্যাপকভিত্তিক ভিশন থেকে চিত্রিত করার চেষ্টা করছিলেন তার জন্য ইতিহাসের এমন একটি রূপ অসম্ভব জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ দুটি জিনিস সবসময় বর্তমান থাকে। একটি ভাষা অপরটি মানুষের সম্পর্ক ও যাপনপ্রক্রিয়া। অন্যকথায় এই যাপনপ্রক্রিয়া কিংবা তার ধরনই হলো সংস্কৃতি। ভাষা এবং সংস্কৃতি বস্তুত একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। কিন্তু কবির জন্য খুব সহজ বিষয়বস্তু হলো ভাষা। কারণ ইতিহাসকে বর্তমান করে তোলার জন্য ভাষাই সবথেকে তাৎক্ষণিক এবং অনিবার্য মাধ্যম। ভাষা ধারণ করতে সক্ষম হলে সংস্কৃতি প্রশ্নেরও সমাধান সম্ভব। কিন্তু মুশকিল হলো, ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার অকাট্য কোনো সমাধান এখনো নেই। অতীতের যেকোনো ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য গ্রহণযোগ্য পন্থা হতে পারে ‘অবজেক্টিভিটি’ বা নৈর্ব্যক্তিকতা। কিন্তু এটিও নিশ্চিত করে তোলা অনেক কঠিন। তবে কাছাকাছি একটি পর্যায়ে যাওয়া যায়। নৈর্ব্যক্তিকতার এমন জটিলতা এড়ানোর সবথেকে ভালো উপায় হলো, ভাষা। ভাষার নির্মাণগত ভঙ্গির উপর কোনো ঘটনার অর্থ কিভাবে ব্যক্ত হতে পারে তা নির্ধারণ করা যায়। অর্থাৎ কোনো বাস্তবতার কিংবা কোনো ঘটনার সত্য ভাষার দুনিয়ায় অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্ঘাটন করা যায়। ইতিহাসের মধ্যদিয়ে অর্থোৎপাদনের প্রক্রিয়ায় অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু ঠিক ইতিহাস লিখে সেই অর্থোৎপাদনের কথা বলছেননা কবি দারভীশ। কবিতা যেখানে ইতিহাসের উপায় হিসেভে ভূষিত যাতে ইতিহাসকে নতুন করে দেখার এবং নতুন অর্থ ও সম্ভাবনা সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি করা মূল প্রকল্প।

দারভীশের এমন ইতিহাস চিন্তা ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের ইতিহাসের দর্শন দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত বলে ধারণা করা যায়। দারভীশের কবিতায় যেখানে সময়, দেশকাল, দেহ-আত্মা, সত্তা, পরম সত্য ছাড়াও ভাষা, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম ও পুরাণ সংক্রান্ত অনুষঙ্গ এসেছে সেখানে বিভিন্ন দিক থেকে এসব কবিতার আঙ্গিক ও অর্থময়তা গড়ে উঠেছে। যাতে গভীর কাব্যময়তার মধ্যেই ইতিহাসচিন্তার বিবিধ প্রশ্নও তপ্ত হয়ে ওঠে। এসব প্রশ্নকে ক্রিটিক্যাল ফিলসফির বিভিন্ন দিক থেকে মোকাবেলা করা যায়। এখানে যেমন মার্টিন হেইডেগার, জাঁক দেরিদা যেমন প্রাসঙ্গিক তেমনি ওয়াল্টার বেঞ্জামিন গুরুত্বপূর্ণ। বেঞ্জামিন নানান দিক থেকে তার ইতিহাসচিন্তার জাল বিস্তার করেছেন। যেখানে

দারভীশকে দেখা যায় তিনি বেঞ্জামিনের *ডিস্ট্রাকশন অব হিস্ট্রি* ধারণা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত। দারভীশ বেঞ্জামিনের এই ইতিহাস চিন্তাকে আরব ও ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার জন্য কবিতাকে বেছে নিয়েছেন। কিংবা বেঞ্জামিনের ইতিহাসগত চিন্তা পর্যালোচনায় যে বিশ্লেষণী ক্যাটাগরি *অ্যাঞ্জেল অব হিস্ট্রি* অথবা *রুইনস অব হিস্ট্রি*– নিয়ে বিপুল আলোচনা লক্ষ করা যায়, সেখানে উদাহরণ টেনে আলোচনাকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা বোঝার জন্য দারভীশের কবিতাও সমগুরুত্বের দাবি রাখে। দারভীশ বলেন,

في زمن الدخان يضيئ تفاح المدينة
تنزل الرؤيا إلي الجدران
في زمن الدخان يخبئ السجان صورته
رأيت رأيت عصفورين يحتلان قبعة
رأيت الذكريات تفر من شباك جارتنا
وتسقط في جيوب الفاتحين
وأشتهي ما يشتهي
والطائرات تمر
والزمن المكلس ينتهي في الانهيارات
الأصابع ظل ذاكرة علي الجدران
والدم نقطة أو بذرة
لا لون لي
لا شكل لي
لا أمس لي
إن الشظايا

حاصرتني
فاتسعت إلي الأيام
وصرت أعلي من مدينتنا. أنا الشجر الوحيد
أنا الشظايا و... الهدايا[৬৮৫]

ধোঁয়ার কালে আলো ছড়ায় শহরের আপেল
স্বপ্নের ভিতর শহর নেমে আসে নগরের দেয়ালে প্রাচীরে
ধোঁয়ার কালে বন্দিরা লুকায় তাদের চেহারা
আমি দেখেছি– দেখেছি দুটি চড়ুই দখল করছে একটি ক্যাপ

---

৬৮৫. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান*, *আল আ'মাল আল উ'লা*-২, পৃ. ২০৬-২০৭।

আমি দেখেছি প্রতিবেশির জানালা দিয়ে পালিয়ে যায় স্মৃতি
এবং বিজয়ীদের পকেটের ভিতর ঝরে পড়ে সেই সব স্মৃতি
আমি চাই যাকিছু কাঙ্ক্ষিত
যখন উড়ে যায় বিমানগুলো
যখন চূর্ণবিচূর্ণ সময় শেষ হয় বিবিধ ধ্বংসাবশেষে
আঙুলগুলো যেন দেয়ালে দেয়ালে স্মৃতিময় ছায়া
রক্ত যেন বিন্দু বিন্দু কিংবা বীজমাত্র
আমার কোনো রঙ-বর্ণ নেই
রূপ নেই
আমার নেই গতকাল
ধ্বংসাবশেষের টুকরোগুলো ঘিরে আছে আমায়
আমি বিস্তৃত হয়ে গেছি কালে কালে
হয়ে গেছি শহরের চেয়ে উর্ধ্বে অনেক– আমি একমাত্র বৃক্ষ
আমিই টুকরা টুকরা স্প্লিন্টার... এবং উপহার

কবিতাটি নেয়া হয়েছে *তিলকা ছুরাতুহা ওয়া হাজা ইনতিহার আল আশিক ()* কাব্যগ্রন্থ থেকে। আরবী এই শিরোনামের বাংলা হতে পারে এমন, *ওইটি তার ছবি এবং এটি প্রেমিকের আত্মহনন*। এই শিরোনামের কবিতা দিয়েই বইটি সম্পন্ন হয়েছে। এটি একটি মাত্র কবিতাগ্রন্থ। বইটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি, লড়াই-সংগ্রাম, ইতিহাস, ইজরাইলিজম, জায়োনিজম ইত্যাদি প্রসঙ্গে মুখর হয়ে আছে। দারভীশের কবিতার বিশ্লেষক ও সমালোচক সিনান অ্যান্তোন বেঞ্জামিনের রুইনস অব হিস্ট্রি কিংবা তার ইতিহাসচিন্তা দ্বারা কবি বেশ প্রভাবিত ছিলেন।[৬৮৬] সিনান মনে করেন, দারভীশকে ব্যাখ্যা করার আগেই তিনি বেঞ্জামিনের ইতিহাস দর্শন নিয়ে তার পাঠ শেষ করেছিলেন। এছাড়া বেঞ্জামিনের অন্যান্য চিন্তার প্রভাবও দারভীশের কবিতায় ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। তবে বলে রাখা জরুরি যে, দারভীশের কবিতায় দার্শনিকতার বিপুল দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তার কবিতা দর্শনসর্বস্ব নয়। কিংবা দর্শনে অতিভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত দারভীশ কবিতাই লিখেছেন। পরিপূর্ণ কবিতার পরিমণ্ডলেই কবি তার পরিচয় গড়ে তোলেন। প্রসঙ্গত দারভীশের কবিতাটি বোঝার জন্য বেঞ্জামিনের ইতিহাসচিন্তা কিছুটা তলিয়ে দেখা দরকার।

ইতিহাসের দর্শনে প্রস্তাবিত ইতিহাসের সত্য বলে যে ধারণা পাওয়া যায়, কিংবা ইতিহাসের কোনো ঘটনার সত্য যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় বেঞ্জামিনের চিন্তা প্রক্রিয়া তা থেকে অনেকখানি ভিন্ন। সাধারণত কার্যকারণ সম্পর্ক–ফলাফল এর ভিত্তিতে ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এই

---

[৬৮৬]. অ্যান্তোন, সিনান, *“অন দি রুইনস অব হিস্ট্রি” – আ ওয়াল্টার বেঞ্জামিন মোমেন্ট ইন অ্যারাব থট*, (*বার্লিন, দুদিন ব্যাপী কর্মশালা, আয়োজক: ফোরাম ট্রান্সরিজিওনালে স্টুডিয়েন, ১-২, ডিসেম্বর, ২০১৭ ইং*), *ভিজিট: ১২ মার্চ, ২০২৩ ইং*, EUME: “On the Ruins of History” - A Walter Benjamin Moment in Arab Thought? (eume-berlin.de)

কার্যকারণ সম্পর্ক ও ফলাফলের তত্ত্ব অতিশয় সরলরৈখিক। সত্যকে দেখার বিষয়টি যেখানে খুব নির্ধারিত হয়ে থাকে– যেটি মূলত খুব কার্যকর নয়। ধারাবাহিক পরম্পরায় কোনো ঘটনার বিবরণে লেখা হয়ে আসছে ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস প্রণয়নের ধারা। ফলে বেঞ্জামিন ইতিহাসের এমন ধারণার সাথে সন্তুষ্ট নন। যেকারণে বেঞ্জামিন নিজের ইতিহাসচিন্তা এবং তার বুঝব্যবস্থা অন্যভাবে গড়ে তুলেছেন। বেঞ্জামিন একদিকে প্রথাগত ইতিহাসচিন্তার বিপরীতে নিজস্ব পন্থা তৈরি করেছেন। একইসাথে মার্ক্সীয় ধারার ইতিহাস পর্যালোচনার যে ধারা গড়ে উঠেছে মার্ক্সবাদ নামে তারও ক্রিটিক করেছেন। সমালোচনা করেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের। বেঞ্জামিন মনে করেন, প্রাকৃতিকভাবেই ইতিহাসে দ্বন্দ্ব থাকে। আবার কখনো কখনো খুব বেশি দ্বান্দ্বিকও মনে হয়না। ইতিহাসমাত্রই বিচিত্র, সহজ আবার জটিল। যেখানে সবকিছুই খুব সময় মেনে ঘটে তা নয়। অনেক কিছু সময়মতো নয় অসময়ে ঘটে যায়, ঘটে যায় নৈর্ব্যক্তিকভাবে। কোনো ঘটনা ঘটার জন্য পূর্বনির্ধারিত কারণ থাকতে হবে এমন কোনো প্রত্যয় থাকাও জরুরি নয়। থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। সবকিছু সফল হবে তা নয়; অনেক কিছু অসফল, ব্যর্থতাও আছে। আছে পরাজয়। সুখ আছে, দুঃখ আছে। সারল্য যেমন আছে, আছে জটিল এবং কুটিল নানাবিধ ঘটনাবলি। মোটকথা, ইতিহাস সরল নয়। কিন্তু ইতিহাস তাহলে কিভাবে বোঝা সম্ভব। বেঞ্জামিন মনে করেন, এর জন্য টেক্সট যথেষ্ট নয়। প্রথাগত ইতিহাসবিদ্যায় যেমন ইতিহাসের লিখিত রূপ বা পরম্পরাজাত ঘটনার ধারা পাঠ করা যায় তা থেকে ইতিহাসির সার্বিক সত্য কিংবা সর্বোতভাবে ইতিহাসের পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। বেঞ্জামিনের দর্শন মতে, সবসময় টেক্সট যথেষ্ট নয়। কখনো কখনো 'ইমেজ' মোক্ষম উপায় হয়ে উঠতে পারে। যেমন এখানে অসংখ্য ঘটনা ঘটে– এসব ঘটনা কাঠামোগতভাবে এবং দ্বান্দ্বিক নীতি অনুসারে সামনের দিকে অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু দেখা যায় কখনো তা অতীতের দিকে মোড় নেয়। এসব ঘটনা আমাদের কাছে ধারাবাহিক ঘটনার মতো প্রতীয়মান হলেও তার ভিন্নতা ধরা সম্ভব। ইতিহাসের ঘটনাগুলো যখন দেখা হবে প্রথাগত প্রক্রিয়া মোতাবেক তখন মনে হবে ঘটনাগুলো একটিমাত্র ধ্বংসাবশেষে () এসে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃতিতে এভাবে সবসময় সবকিছু ঘটেনা, সেকারণে এভাবে ঘটনা দেখার রীতি সুখকর নয়। ইতিহাসের প্রকৃতিতে, যে ধ্বংসাবশেষের একটি রূপ বা একক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তাই একমাত্র সত্য নয়– ধ্বংসাবশেষের পর আরো ধ্বংসাবশেষ রয়েছে (পাইল অব ডেব্রিস)। বেঞ্জামিনের ইতিহাসের দর্শনে এটি *রুইনস অব হিস্ট্রি* কিংবা *ডিস্ট্রাকশন অব হিস্ট্রি* নামে পরিচিত। একটি ইমেজের মাধ্যমে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে তোলেন বেঞ্জামিন। জার্মান চিত্রশিল্পী পল ক্লি'র আঁকা একটি ছবির উদাহরণ দেন তিনি। যেটি Angelus Novus নামে পরিচিত। যেখানে দেখা যায়, একজন ফেরেশতা এমন কিছু থেকে পেছনে সরে আসছে যেখানে সে তাকিয়ে আছে। তার চোখ প্রশস্ত। খোলা মুখ। ডানাগুলো বেশ ছড়ানো। সামনের দিকে মানে আকাশের দিকে উড়ে উঠে যাচ্ছে সেই ফেরেশতা, তার চোখের গতিও সমুখে আকাশের দিকে। অথচ সে সরে যাচ্ছে পেছনের দিকে। এমন একটি ইমেজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই ছবিতে। এটি ন্যাচারাল এবং প্রথাগত ইতিহাসের একটি রূপক। বেঞ্জামিন এই রূপক ও ইমেজের মাধ্যমে ন্যাচারাল ইতিহাসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেয়েছেন। মানে, ফেরেশতার আকাশের দিকে যাওয়া, এবং আকাশের দিকে মানে সমুখের দিকে তাকানো– এ

পর্যন্ত প্রথাগত ইতিহাসের নমুনা। কিন্তু ফেরেশতা সামনের দিকে যাচ্ছে– ডানা মেলে আকাশে পাড়ি দিচ্ছে, কিন্তু আবার পেছনে সরে আসছে– এই পেছনে সরে আসাটা বেঞ্জামিনের ভাষায় ন্যাচারাল ইতিহাস (), কিন্তু প্রথাগত ইতিহাস নয়। ফেরেশতার আকাশের দিকে যাওয়া এবং সমুখে আগানোটা প্রথাগত ইতিহাসচিন্তা। কিন্তু উর্ধ্বে উঠে আবার পেছনে নজর ফেরানো এবং সরে আসা– বিষয়ে বস্তুবাদী ইতিহাসচিন্তায় কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা নাই। কারণ এভাবে প্রথাগত এবং বস্তুবাদসর্বস্ব ইতিহাসচিন্তায় ইতিহসের পর্যালোচনা প্রায় অনুপস্থিত। ইমেজে দেখা যায়, ফেরেশতা ডানা মেলে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু উঠে আবার পেছনে সরে আসছে যেন। এই যে সরে আসছে মনে হয়– এ বিষয়ে ব্যাখ্যা নাই ইতিহাসের চলিত ভাষায়। কিছুদূর গিয়ে ফেরেশতা ভাবছে সে মাটিতে ফিরে আসবে। কারণ সে মৃত, দুর্বল, নিপীড়িত মানুষদের জাগিয়ে তুলতে চায়। এভাবে ভাবতে পারা, ইতিহাসকে এভাবে দেখা এবং নতুন অর্থোৎপাদন ও সম্ভাবনা সৃষ্টির মধ্যদিয়ে বেঞ্জামিন বস্তুত ইতিহাসের নয়া চিন্তার প্রক্রিয়া নিয়ে হাজির হন।

যাইহোক, মাহমুদ দারভীশের ইতিহাস চিন্তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার কবিতার পাঠ ইতিহাসের বাইরের অর্থাৎ ইতিহাসে যাপনের বাইরে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তার কবিতার পাঠ করা কঠিন। তার কবিতায় ইতিহাস, সময়চিন্তা, দেশকালের ধারণা, শরীর ও আত্মার ভাবকল্প বড়ধরনের স্থান দখল করে আছে। *আছার আল ফারাশাহ*, *লিমাজা তারাকতা আল হিছানা ওয়াহিদা*, *ফী হাদরা আল গিয়াব*, *হালাতু হিছার*, *জিদারিয়্যাহ*, *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা*, *ছারীর আল গারীবাহ*, *মাদীহ আল জিল আল আলী*, *হিছার লিমাদাইহ আল বাহর*, *উরীদু মা উরীদু*, *আহাদা আশারা কাওকাবান*– ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে দারভীশের ইতিহাসচিন্তার অনুষঙ্গ বিস্তৃত। দারভীশের কবিতা এমনকি তার চিন্তার অনিবার্যতা হলো দেশকাল এবং ইতিহাস। ভূমি এবং ইতিহাস– এই দুটি ফেনোমেনা তার কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তার আত্মা হলো ভাষা। দারভীশ নিজেই তা স্বীকার করেছেন।

> في شعري أرض، هناك شيئان يحملان النص الشعري: أرض وتاريخ. نصي - الشعري محمول دائماً على أرض وتاريخ، حتى في الهدهد عدلت في نهاية منطق الطير، بحيث صار الهدهد يحن إلى الأرض التي انطلق منها. حاولت أن أدخل في المراتب المعرفية التي عند الصوفيين، ولكن عندما وصلت إلى أبعدها عدت بالطائر (الهدهد) إلى الأرض ورأى الأرض من فوق. تنتهي تلك القصيدة الطويلة بغناء راقص لجمالية الأرض، لأن اللغة تبدأ من الأرض.[687]

[৬৮৭]. দারভীশ, মাহমুদ, *লাও আয়াদতু কিতাবাতা দাওয়াবীনী লাআকতাফাইতু বিখামছাহ*– সাক্ষাৎকার– আব্বাস বাইদুন (ইরাক রাইটার্স, অগাস্ট ১১, ২০০৮ খ্রি.), ভিজিট মে ২১, ২০২৩, : http://www.iraqiwriters.com/inp/view.asp?ID=1447

আমার কবিতায় আছে ভূমি। তবে দুই জিনিস কবিতার টেক্সট বয়ে বেড়ায়ঃ ভূমি এবং ইতিহাস। আমার কবিতার ভাষা সবসময় বহন করে চলে ভূমি আর ইতিহাস। এমনকি হুদহুদ কবিতায় শেষপর্যন্ত আমি পাখির যুক্তির ন্যায্যতা রক্ষা করেছি। ফলে যেখানে হুদহুদও ভূমির কাছে নুয়ে পড়ে যেখান থেকে সে চলতে শুরু করেছিল। আমি সূফিদের জ্ঞানতত্ত্বের স্তরগুলোর গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছি। কিন্তু যখন জ্ঞানের ব্যাপ্তিতে পৌঁছে যাই, পাখির (হুদহুদ) মাধ্যমে আবার ফিরে আসি ভূমিতে। যখন পাখি উপর থেকে দেখতে পায় তার ভূমি। ভূমির সৌন্দর্যের সৌজন্যে দীর্ঘ এই কবিতার পরিণতি ঘটে নৃত্যমুখর সংগীতের ধারায়। কারণ ভূমি থেকেই ভাষার উৎপত্তি।

৬.৮ঃ ইতিহাসচিন্তাঃ বুদ্ধিবৃত্তির প্রেক্ষিতে

দারভীশের কবিতায় তার ইতিহাসচিন্তাকে প্রতিরোধের ব্যপ্তির দিক থেকে একটি প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যেখানে কয়েকটি দিক থেকে তার আলোচনা করা যেতে পারে। দার্শনিকতার দিক থেকে, রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে, স্মৃতি ও পুরাণের দিক থেকে। দার্শনিক দিক থেকে সময় কী? সময় এবং ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে দারভীশের কবিতার প্রেক্ষিতে বিচার করার চেয়ে এখানে স্থানকাল, ইতিহাস বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যদিও দারভীশের কবিতায় সময় প্রশ্নে নানাবিধ দার্শনিক অভিজ্ঞানের মধ্যদিয়ে পরিভ্রমণের সুযোগ লাভ করা যায়। তার কবিতায় সময় প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা অনুসন্ধান হয়েছে লক্ষ করার মতো। জর্ডানের মু'তাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে দারভীশের কবিতায় সময় প্রশ্ন নিয়ে বিশদ গবেষণা, তদন্ত ও বিচার বিশ্লেষণ করেছেন সুলতান ঈসা আল শিআর।[৬৮৮] তবে যাইহোক, দারভীশের কবিতায় তার ইতিহাসচিন্তা প্রতিরোধ প্রশ্নে সময় প্রসঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তার কবিতায় ইতিহাস চিন্তার পরিসর গড়ে উঠেছে কাব্য, ভাষা ও সৌন্দর্য্যবিদ্যার মাধ্যমে। ইতিহাসের সাথে প্রতিরোধের সম্পর্ক ব্যাপক। প্রতিরোধের যেমন ব্যবহারিক দিক রয়েছে তেমনি রয়েছে এর দর্শন ও রাজনীতির জ্ঞানতাত্ত্বিক নানান দিক। প্রতিরোধ দারভীশের কবিতায় যেকারণে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে হাজির রয়েছে। রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রতিরোধের মূল্য নির্ধারণও ছিল দারভীশের কবিতার অন্যতম প্রকল্প। শত্রুমিত্র বিচারের প্রেক্ষিতে এই প্রতিরোধের সত্য তীব্রভাবে হাজির দারভীশের কবিতায়। প্রতিরোধ বরবারই তার সত্য কি তা জানান দিতে গিয়ে ইতিহাসের নিরেট ভূমিকা তুলে ধরে দারভীশের কবিতা। বিষয়টি কেমন– একটি কবিতার দুটি পঙক্তি থেকে তা অনুমান করে নেয়া যায়। দারভীশ বলেন,

[৬৮৮]. আল শিআর, সুলতান, *আল জামান ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ* (জর্ডান: কিস্ম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, মুতাহ ইউনিভার্সিটি, নভেম্বর, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১-৬৮।

وأري التاريخ في هيئة شيخ،
يلعب النرد ويمتص النجوم[৬৮৯]

এবং আমি দেখি বৃদ্ধের অবয়বে বসে ইতিহাস
পাশা খেলে আর শোষণ করে নক্ষত্র!

এখানে ইতিহাসের একটি ভূমিকা অনুধাবন করা যায়। ইতিহাসকে যেখানে বৃদ্ধের অবয়বে কল্পনা করা হয়েছে। এটি একটি দিক। ইতিহাসের এটি একটি পরিচয়। অপরদিকে ইতিহাস পাশা খেলে। আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্র চুষে ফেলে। এটি আরেকটি দিক। যেখানে ইতিহাসের একটি ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কিন্তু নক্ষত্র শোষণের কথা কেন বলা হয়েছে এ কবিতায়? বা নক্ষত্র খেয়ে ফেলে ইতিহাস– এমন অভিব্যক্তির পেছনে রয়েছে ফিলিস্তিনের জীবন্ত ইতিহাসের মর্মন্তুদ ইঙ্গিত। দারভীশ এখানে ইতিহাসকে প্রতিরোধ যোদ্ধা রূপে হাজির করেন। কারণ এই নক্ষত্র বস্তুত ইজরাইলের সহযোগী। যখন রাত ঘনিভূত হয়। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে তখন ইজরাইলের জায়নবাদীদের অভিযানের মোক্ষম সময় হয়ে ওঠে। বিপরীত দিক থেকে, রাতের অন্ধকার ফিলিস্তিনীদের সহায়ক শক্তি– কারণ অন্ধকারই তখন ফিলিস্তিনীদের আত্মরক্ষার আড়াল বা ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন আকাশে যখন নক্ষত্র ভরে যায় তখন তার ক্ষুদ্র আলো ফিলিস্তিনীদের আত্মরক্ষার কবচ রাতের অন্ধকার দূরীভূত হতে থাকে। তাতে করে তাদের আত্মগোপনের আড়াল মুক্ত হয়ে যায়। সেকারণে কবির কাছে মনে হয়েছে নক্ষত্র বস্তুত ইজরাইলের প্রতীক। একইসাথে ইজরাইলের সহযোগী শক্তি। ফলে তাকে প্রতিরোধ করা জরুরি। কবিতার পঙক্তিগুলোতে ইতিহাস এখানে ফিলিস্তিনীদের জন্য ইতিবাচক হয়ে ওঠে। তবে ইতিহাসের ভিন্নরূপ বা নেতিবাচক রূপও রয়েছে। আরো একটি কবিতায় ইতিহাসকে দারভীশ কিভাবে রাজনৈতিকতার দিক থেকে তুলে এনেছেন যেটি তার একটি নজির হয়ে আছে। দারভীশ বলেন,

والأرض تبدأ من يديه ومن نهايتها،
ويسأل أين وقتي؟
قال: إن الوقت من قمح
وقال: رصاصة أولي تثير الأرض توقظها، فتكشف
الفضائح العصافير العنيفة واحتمالات البداية.[৬৯০]

তার হাত থেকে এবং তার গন্তব্য থেকে ভূমির সূচনা
প্রশ্ন করেন তিনি, কোথায় আমার সময়?

[৬৮৯]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান, আল আ'মাল আল উ'লা-১*, পৃ. ১৮৭।
[৬৯০]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান, আল আ'মাল আল উ'লা-২*, পৃ. ২২০-২২১।

বললেন, সময় আসে গমের ভিতর থেকে
বললেন, একটি বুলেট, পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেয় এবং জাগিয়ে তোলে
অতপর খারাপ ঘটনাগুলো উদঘাটন করে হিংস্র পাখি
এবং সূচনার সম্ভাবনা

সময়কে এখানে খুব ঘনিভূত হয়ে ওঠে। যেখানে ইতিহাসের ধমনিতে ফিলিস্তিনের রক্ত বহমান সেই ইতিহাসে ফিলিস্তিনের রক্তের বহতাকে ঢেকে ফেলা হয় পরাজয় আর নানাবিধ ঘটনাবলীর মাধ্যমে। দারভীশের প্রথম কাজ হয়ে ওঠে ইতিহাসের সেই অবস্থা নির্ণয় করণ। সত্য উন্মোচন ইতিহাসেরই একটি নীতি। কারণ ফিলিস্তিন মাত্রই পরাজয়ের ইতিহাস নয়। তবে ফিলিস্তিনের মানে যারাই ফিলিস্তিনকে তৈরি করতে চেয়েছে– ইতিহাসের যেকোনো স্তর থেকেই হোক না– তাদের সক্রিয়তা এবং কাজের উদ্দেশ্য বিস্তৃত পরিসরে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করা। তারা পরাজিত হোক কিংবা অপরাজিত তাদের বিশ্লেষণের মধ্যেই রয়েয়ে ফিলিস্তিনের সত্যিকারের ইতিহাস। ইতিহাসের সত্য। দারভীশের *হিছার লিমাদাইহ আল বাহর* (حصار لمدائح البحر) কাব্যগ্রন্থভুক্ত *তায়াম্মুলাতুন সারীআহ ফী মাদীনাতিন ক্বাদীমাহ ওয়া জামীলাহ আলা ছাহিল আল বাহর আল আবইয়াদ আল মুতাওয়াছছাত* (تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر ألأبيض المتوسط) কবিতায় এমনকিছু বিষয় উঠে এসেছে কবিতার ভাষায়। কবিতাটিতে উঠে এসেছে ফিলিস্তিন এবং তার ইতিহাস নিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিস্তার। রূপক, প্রতীক আর বিবিধ ইঙ্গিতমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে ইতিহাসের নানান ভাবনা এগিয়ে গেছে এ কবিতায়। যেমন এখানে স্থানের একটি পরমার্থিক রূপ দেয়া হয়েছে। কবিতাটির পরতে পরতে রয়েছে সঙ্গীতের মূর্ছনা। গীতলতার গভীর ব্যাঞ্জনা। স্থান-কাল-ইতিহাস– এই তিন জিনিসকে এখানে বুনন করা হয়েছে নীরবচ্ছিন্ন সুর দিয়ে। আওয়াজ দিয়ে। জ্ঞানের গহিনতা আর চিন্তার সংবেদনশীলতায় বেঁধেছেন কবি তার ইতিহাসবোধ। যেখান থেকে বস্তুত দারভীশ ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিন হয়ে ওঠার এক নয়া ডিসকোর্স গড়ে তোলেন। কবিতায় যে ভাষ্য নির্মাণ করা হয়েছে তার মধ্যদিয়ে দারভীশ ফিলিস্তিনের ইতিহাসের পুনর্গঠনে অংশ নেন।

কবিতাটির শিরোনাম কিছুটা দীর্ঘ। শুরু হয়েছে সমুদ্র দিয়ে। সমুদ্র যেখানে একটি রূপক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। সমুদ্র দিয়ে বৃহত্তর ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। সমুদ্রের অন্য অর্থগুলোও এখানে অন্তর্ভুক্ত। সাহস, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, মুক্তহৃদয়, মগ্নতা, অনুধ্যান, গভীরতা, বিশালতা ইত্যাদি মর্মগুলো যেখানে ফিলিস্তিনের সাথে জড়ানো। কবি বলেন,

...لتكن أما لهذا البحر،
أو صرخته الأولي علي هذا المكان
...وليكن أن الذي شيدها من موجة
أقوي من الماضي و من ألف حصان
...وليكن أن التي نامت علي وردتها الأولي[৬৯১]

হয়ে ওঠুক মা এই সমুদ্রের
কিংবা এই স্থানের উপর লেগে থাকা তার প্রথম চিৎকার
হয়ে ওঠুক সেই সত্তা যিনি তাকে গড়ে তুলেছেন তরঙ্গ থেকে
অতীতের চেয়ে এবং হাজারো ঘোড়ার চেয়ে শক্তিশালী সেই তরঙ্গ
হয়ে ওঠুক যিনি ঘুমিয়ে ছিলেন তার প্রথম গোলাপের পর।

এখানে একইসাথে সেই সমুদ্রের উৎস হিসেবে একটি অভিব্যক্তিও ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, *হয়ে ওঠো এই সুমদ্রের মা*– মা মানে এখানে উৎস, মূলপ্রকৃতি, বিধি। এই মাতৃকল্পনাও একটি প্রতীকী অর্থ ধারণ করে। যাতে এই সুমদ্রের উৎস হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে– তাতে জননী বলে মূলত এক মর্ম কিংবা এক পরম নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সেই সমুদ্রের ধ্বনী বিরাজ করে এহৈ স্থানের উপর। স্থান মানে ফিলিস্তিন। এই পঙক্তিগুলোতে প্রচ্ছন্নভাবে এক পরমশক্তির কথা বলা হয়েছে। হয়ে ওঠা– উৎস– বিধি– প্রকৃতি– এই প্রত্যয়গুলো এখানে কিসের সাথে সম্পর্কিত? যে বিধি– শৃঙ্খলার কথা বলা হয়েছে তার আরেক প্রতীকী নাম তরঙ্গ। তরঙ্গ একধরনের শক্তি। তরঙ্গ এমন একটি বর্গ যার পরিগঠন-প্রকৃতির সাথে রয়েছে ধারাবাহিক শৃঙ্খলা। নীতি। কবি এখানে অতীত বলে এই নিয়মের শক্তিকে কালের নিয়ম এবং ইতিহাসের সত্যের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। সেই ঘুমিয়ে থাকা নিয়মের শক্তি ও সত্যকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন কবি। কবি বলেন,

وما شأني أنا
بسماء لا تغطيني بطير أو دخان؟
ما الذي يجعلني أقفز من هذا الأذان
لأصلي للذي علمها أسماءه
ثم رماني للأغاني[692]

---

৬৯১. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান, আল আ'মাল আল উ'লা*-২, পৃ. ৪৫৭।
৬৯২. প্রাগুক্ত। পৃ. ঐ।

আর আমার সত্য কি, আমি
আমি এক আকাশের সাথে
পাখি কিংবা ধোঁয়ায় যা আমাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনা
কি সেই বস্তু যা আমাকে এই আজান পার হয়ে যেতে দেয়
যেন আমি নামাজ পড়ি তার যিনি তাকে শিখিয়েছেন তার নাম
এরপর তিনি আমায় ঢুকিয়ে দেন গানের ভিতর।

স্বভাবত এখানে যেই পরম নিয়ম ও সত্যের কথা বরা হয়েছে যার নাম বা জ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছে তারই এবাদত, তারই নামাজ পড়ার কথা বলেছেন কবি। ইতিহাসের সেই কর্তারু অনুগামী হিসেবে মানুষও যেখানে সেই নিয়ম ও সত্যের অধীন হয়ে পড়ে। ফলে মানুষও একপ্রকার সত্য যিনি ইতিহাসের সেই নিয়মের প্রক্রিয়ায় তার সৃষ্টিশীলতা উদযাপন করতে সক্ষম। কারণ সেই সত্য ও নিয়মের জ্ঞান-রহস্য মানুষ ধারণ করতে পারে। আবার সেই সত্য মানুষই লঙ্ঘন করে। ফলে যখন মানুষ ইতিহাসের নিয়ম বা পরম সত্যের পরিপালনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যায় তখন তাকে কোনো কিছু ঢেকে ফেলতে পারেনা। আচ্ছন্ন করতে পারেনা কোনা অন্ধকার। দারভীশ এখানে ইতিহাসের দুটি পক্ষের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। একটি ইতিহাসের সত্য যারা পরিপালন করেন। আরেকটি পক্ষ যারা তার বিপরীতে হাঁটেন। তাই কবি বলেছেন, তাকে কোনো ধোঁয়া ঢেকে ফেলতে পারেনা। আচ্ছন্ন করতে পারেনা। কবিতার এখানে এসে কবি ইজরাইলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যে আকাশের কথা বলেছেন সেই আকাশ ফিলিস্তিনের আকাশ। যা প্রায়ই ইজরাইলের হানাদার বাহিনীর আধুনিক যুদ্ধবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা বিস্ফোরণের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এমন এক আকাশ যার ইতিহাসের পাতায় পাতায় ইজরাইলের সহিংস হানায় সব সত্য ঢেকে পড়েছে। কিন্তু দারভীশ বলেন, এভাবে ঢেকে ফেলা যাবেনা। ইতিহাসে এমন এক নিয়মশক্তি কার্যকর রয়েছে যাকে যুগের পর যুগ দাবিয়ে অন্যকিছু করা যায়না। ইতিহাস তার নিয়মেই তার সত্য প্রকাশ করে যাবে।

কবিতাটিতে মানুষের সহজাত চিন্তা, জ্ঞান অন্বেষা ও সত্যানুসন্ধানের প্রতি অনুপ্রেরণা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে রয়েছে তার বিপুল রাজনৈতিক চৈতন্য। সভ্যতা নির্মাণের প্রবল আগ্রহের গভীর বয়ান। আত্মপরিচয়, আত্ম অভিজ্ঞান, বিশ্বময় হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই ইত্যাদি। কবিতাটির একদিকে রয়েছে ধ্যান, অবসর, মৌনতা, চিন্তা-অনুধ্যান, ভাব-ভাবুকতা, গভীর অবলোকন সংক্রান্ত নানান প্ররোচনা ফুটে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে। যেকারণে কবিতাটির শিরোনামে যে সমুদ্র এবং *তায়াম্মুল* (ভাব অনুধ্যান) প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে অনুধ্যান সংক্রান্ত তার একটি প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। অপরদিকে রয়েছে দ্রুততা, অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য, মোকাবেলা, সংঘাত ইত্যাদি। এ বিষয়টিরও একটি ইশারা রয়ে গেছে শিরোনামে। *ছারীআহ* (দ্রুত, গতিশীল, অস্থির) বলে সেদিকে ঈষৎ ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। *মাদীনাতুন ক্বাদীমাহ* (প্রাচীন নগর) বলে সভ্যতা, ইতিহাস, ক্ষমতা, উত্থান-পতন, যুদ্ধ-সংঘাত-অস্থিরতা-অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি ধারণাগুলোর অনুমান করা যায়। প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, রোমান-গ্রীক-পারস্য-ব্যাবিলনীয় সভ্যতার

কথা বলা হয়েছে যেমন তেমনি সাম্প্রতিক ইতিহাসের কথাও বিবৃত হয়েছে। রয়েছে ইজরাইল-জায়োনিস্টদের কথা। কবিতাটির এসব প্রসঙ্গের মধ্যদিয়ে কবি চলমান ইতিহাস, সময়, সময়ের আবর্তন, চক্রাকার সময় ইত্যাদি বিষয়ে একধরনের দার্শনিক অভিঘাত সৃষ্টি করেছেন।[৬৯৩]

نَحْنُ أوراقُ الشَّجَرْ,
كلماتُ الزمنِ المكسورِ ' نَحْنُ
الناي إذ يبتعدُ البيتُ عن الناي . ونَحْنُ
الحقلُ إذ يمتدُّ في اللوحةِ ... نحنُ
نحن سوناتا على ضوء القمرْ
نحن لا نطلب من مرآتنا
غيرَ ما يُشبهنا،
نحن لا نطلب من أرض البشر
موطئا للروح،
نحن الماءُ في الصوت الذي سوف ينادينا
فلا نسمعُ . نحن الضفة الأخرى لنهرٍ بين صوت وحَجَرْ
نحن ما تنتجُهُ الأرضُ التي ليستْ لنا
نحن ما نُنتجُ في الأرض التي كانت لنا
نجن ما نترك في المنفى وفينا من أثَرْ
نحن أعشابُ الإناءِ المنكسِرْ
نحن ما نحن وَمَنْ نحنُ ' فما جدوى المكان ؟[694]

আমরা বৃক্ষের পত্রসম্ভার,
বিধ্বস্ত সময়ের শব্দাবলী,
বাঁশি আমরা যখন সেই বাঁশি বিনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ঘর।
শস্যভূমি আমরা যখন শিল্পকর্মজুড়ে তা বিস্তৃত হয়ে পড়ে... আমরা
চাঁদের উপর আমরা কতিপয় সনেট... আমরা
আমাদের সাথে যা মিলে যায় তাছাড়া কিছুই খুঁজিনা
আয়নার ভিতর।
আমরা যারা আমরা খুঁজিনা মানুষের ভূমির ভিতর
আত্মার মিলন
আমরা পানি কণ্ঠের ভিতর– আমাদের ডেকে যায় নিয়ত
তবে আমরা শুনতে পাইনা
ধ্বনি এবং পাথরের মাঝে আমরা এক নদীর অন্য তীর

[৬৯৩]. আল শিআর, সুলতান, *আল জামান ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ* (জর্ডান: কিস্‌ম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ, মুতাহ ইউনিভার্সিটি, নভেম্বর, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৩৫৬-৪৪৯।
[৬৯৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দিওয়ান, আল আ'মাল আল উ'লা*-২, পৃ. ৪৫৮-৪৫৯।

আমরা তাই এই ভূমি যেমন তৈরি করে আমাদের যে ভূমি আমাদের নয়
আমরা তাই যতটুকু আমরা তৈরি হই এই ভূমির ভিতর যে ভূমি ছিল আমাদের
আমরা তাই যাকিছু চিহ্ন রেখে আসি নির্বাসনে এবং আমাদের ভিতর
আমরা কিছু ভাঙ্গা পাত্রের ঘাস মাত্র

صخرةُ أجدادي وأُمِّي الواضحةْ
المكانُ الشيءُ في رحلته منِّي إليَّ
المكانُ الأرضُ والتاريخُ فيَّ
المكانُ الشّيء إنْ دَلَّ عليَّ[695]

আমার পূর্বপুরুষ এবং আমার মায়ের স্পষ্ট চিৎকার
স্থান আমার ভিতর এমন বস্তু যার ভ্রমণ আমাতে শুরু আমাতেই শেষ
স্থান আমার ভিতর ভূমি এবং ইতিহাস
স্থান তখনই স্থান যখন তা আমাকে দেখায় পথ

দারভীশ মনে করেন কোনো ভূমিতে তার ন্যায্যতা ঐতিহাসিকভাবেই গড়ে ওঠে। সর্বশেষ যারাই আসবে তাদের ন্যায্যতার উপাদান থেকে যাবে পূর্ববর্তীদের মাঝে। যেকারণে কোনো জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ন্যায্যতা যেকয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীর তার অন্যতম হলো ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এ দিকটি কবিতাটিতে গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে। এই ন্যায্যতা তার মাটির সাথে ভূমির সাথে নিবিড়ভাবে জড়ানো। মাটি থেকে যেমন শিকড় বিচ্ছিন্ন করার কারণে বৃক্ষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যায় তেমনি ওই ভূমির মানুষদের সম্পর্কও ভূমির সাথে তেমনি প্রাকৃতিক– যাদের বিচ্ছিন্ন করলে তাদের অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়তে বাধ্য। ফলে মানুষের ইতিহাস নানান দিক থেকে যেমন প্রাকৃতিক তেমনি তা ঐতিহাসিক। মানুষের সাথে তার ভূমির সম্পর্ক সেকারণে আত্মিকও বটে। দারভীশ ওই ভূমিকেই স্থান হিসেবে অভিষিক্ত করেন যাতে তার প্রাণ ও জীবের জীবন রূহানিভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে। এই নির্ধারণ মানুষই তার ঐতিহাসিকতার মধ্যদিয়ে গড়ে তুলেছে। দারভীশ মনে করেন, এই সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়। যে ভূমি থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না। বিচ্ছিন্ন করা যায় কেবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। কবি তাই বলেন, ...لا شيء يُثير الروحَ في هذا المكانِ[696]/ এমন কিছু নেই হায়... এই স্থানের ভিতর যা তার আত্মাকে উসকিয়ে দেবে। এ ধরনের একাধিকা পঙক্তি দারভীশ কবিতাটির স্তবকের শেষে ব্যবহার করেছেন বারবার। যেমন آه ' لا شيء يهزُّ القلب في هذا المكانِ[697]/ হায়, এমন কিছু নেই যা এই স্থানের ভিতর কাঁপিয়ে তুলবে হৃদয়। এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে দারভীশ বস্তুত ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীকে

৬৯৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৬৬-৬৭।
৬৯৬
৬৯৭

ঐতিহাসিকভাবে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ফিলিস্তিনের ইতিহাস, সভ্যতা, ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রবাহের মধ্যে মানুষকে শুধু রাজনৈতিকভাবে নয় আত্মিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন কবি। দারভীশ এর জন্য শুধু ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়, বরং প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাণের আশ্রয়ে নিজেদের উত্তরাধিকারের হিস্যা তার জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ব্যাবিলন, ফিনিশীয় সভ্যতা ও কানআন জনগোষ্ঠীর স্মৃতি রোমন্থন করেন কবি। যার সাথে এই ভূমির যোগসূত্র রয়েছে। অন্যদিকে নিছক আত্মিক সম্পর্কের মাধ্যমে নয় বরং স্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান পরিগঠনের মাধ্যমে এই সম্পর্ক পুনরুদ্ধার সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন জাতিগত এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয়। ফলে সর্বোতভাবে একটি অবিভাজ্য সম্পর্ক গঠন করতে চেয়েছেন কবি। যার একটি পরমার্থিক এবং অপরটি রাজনৈতিক– এই উভয় সম্পর্কের মাধ্যমে ফিলিস্তিন এবং তার স্থানকাল ও ইতিহাসকে একই সূত্রে গাঁথেন কবি দারভীশ।

৬.৯: পুরাণ এবং স্মৃতির প্রেক্ষিতে

ইতিহাসের এই পুরো প্রকল্প ঘিরে রয়েছে ফিলিস্তিন পুনর্গঠনের স্বপ্ন। দারভীশ তার প্রতিরোধপ্রকল্পকে এর মধ্যে আন্তনিবিষ্ট করেছেন। ইজরাইল এবং জায়োনিস্টদের সামগ্রিক তৎপরতার বিপরীতে যাকিছু দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে মিথ–পুরাণ এবং স্মৃতি তার অন্যতম। স্মৃতি প্রতিরোধের বিশেষ প্রক্রিয়া। স্মৃতির দুই ধরনের সক্রিয়তা রয়েছে। মানে দুই দিক থেকে স্মৃতি প্রতিরোধ করতে সক্ষম। প্রথমত, স্মৃতি ইতিহাসের দিক থেকে প্রতিরোধকে কার্যকর রাখে। দ্বিতীয়ত, বর্তমানের দিক থেকে। ইতিহাসের যেমন দৃশ্যত দুটি অর্থ রয়েছে। একটি অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণ। দ্বিতীয় অর্থ হলো, অতীতকে পাঠ করার মাধ্যমে বর্তমানের নির্দেশনা অর্জন করা। দ্বিতীয় অর্থ থেকে প্রতিরোধের একটি উপায় গ্রহণ করা যায়। কিন্তু স্মৃতি কিভাবে প্রতিরোধকর্ম হিসেবে কাজ করে? এক কথায় মানুষের জীবন থেকে যা হারিয়ে যায় তাই স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি বস্তুত ইতিহাসেরই অধীন হয়ে থাকে। তবে যখন স্মৃতি স্মরণ করা হয়, উদযাপন করা হয় কিংবা স্মৃতি মানুষের নানান কর্মকাণ্ডে–সম্পর্কে ও বিবিধ প্রক্রিয়ায় কাজ করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিংবা ইচ্ছা মারফত তখন তা জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই জীবন্তকরণের বিষয়টিই মূলত প্রতিরোধের জন্য কাজ করে। স্মৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য রয়েছে। ইতিহাস যতোটা সংগঠিত একটি ব্যাপার স্মৃতি সবসময় তা নয়। ইতিহাস অনেক সময় প্রমীতকরণে সমর্পিত হয়। প্রমীতকরণের মাধ্যমে ইতিহাসের যেন মুক্তি ঘটে। একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে তার চর্চার পরিসর প্রয়োজন হয়ে ওঠে। তার জন্য বিশেষ আভিজাত্য জরুরি হয়ে পড়ে। নানান রকম পৃষ্ঠপোষকতার দরকার হয়। কিন্তু স্মৃতি খুব স্বাধীন একটি ব্যাপার। তার এসবকিছুর প্রয়োজন নেই। স্মৃতি একটি অবাধ ব্যাপার। ফলে কখন কার মাঝে তা কাজ করে তা বলাটা বিস্তর কঠিন। স্মৃতি খুব তড়িৎ এবং তাৎক্ষণিক হয়ে ওঠতে পারে। যেকারণে তার নগদ লাভ যেমন আছে তেমনি তার কার্যকারিতা অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ স্মৃতি যখন ব্যক্তির পর্যায়ে সীমিত থাকে তখনও তার একটি অর্থ তৈরি হয়। একইসাথে যখন ব্যক্তি থেকে পরিবার এবং পরিবার থেকে শুরু করে সামাজিক

হয়ে ওঠে তখন তার তাৎপর্য গভীর ও ব্যাপক হয়ে ওঠতে পারে। এই পর্যায়ের স্মৃতিকে বলা হয়। সামষ্টিক স্মৃতি বা কালেক্টিভ মেমোরি ()। ব্যাপকতরো হওয়ার মূল কারণ স্মৃতির সংগঠিত হওয়ার জায়গাটি মনের এবং হৃদয়ের। স্মৃতি মনকে সংগঠিত করে। মনকে অর্থ দেয়। মানুষের মানসিক বিকাশে স্মৃতির প্রয়োজনীয়তা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অন্তকরণে যখন তার হারানো কোনো ঘটনা কিংবা তার মর্মান্তিক কোনো একটি বিষয় বারবার মনের মাঝে উঁকি দেয়, মনের মাঝে ভেসে ওঠে তখন তার অর্থ হলো ওই ঘটনাটি কিংবা ওই বিষয়টি তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তার হৃদয় থেকে তা মুছে ফেলা যায়নি। ফলে ইতিহাস থেকে কোনো কিছু মুছে ফেলা গেলেও স্মৃতি– যা মানুষের হৃদয়ে বাস করে তা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

কালেক্টিভ মেমোরি– ফিলিস্তিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিসন্দেহে। বর্গ হিসেবে *কালেক্টিভ মেমোরি*'র কথা তাত্ত্বিকভাবে প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক ইমিলি ডুরখেইম ()।[৬৯৮] ডুরখেইম সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সামষ্টিক স্মৃতির ধারণা বিশ্লেষণ করেন। মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে স্মৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্মৃতি রীতিমতো সংরক্ষকের ভূমিকা পালন করে তা নয় স্মৃতি বরং নিজেও একপ্রকার অভিজ্ঞতা। এমন অভিজ্ঞতা শুধু ব্যক্তির অভ্যন্তরেই থাকেনা, থাকে সমাজের নানান পরম্পরায়–ঐতিহ্যে, বহুবিধ ঘটনা-বাস্তবতায় এবং সমাজের বিচিত্র সম্পর্কের জটিল আবর্তে স্মৃতি সবসময় উষ্ণ থাকে। ধর্মীয় জীবনের সক্রিয়তা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডুরখেইম সমাজের বিশেষ একটি চরিত্র নির্ণয় করেন। যেখানে নৈর্ব্যক্তিকভাবে এমন বাস্তবতা কাজ করে, যাতে কার্যকর থাকে সামষ্টিক চৈতন্য (*collective consciousness*)। এই সামষ্টিক চৈতন্য ব্যক্তির মানসিক জগতে তুমুল প্রভাব সৃষ্টি করে। তবে এ প্রভাব নীরবে ঘটে। স্মৃতির প্রখরতা বস্তুত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের সবথেকে চরমতম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেন ডুরখেইম।[৬৯৯] সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো পরস্পরে স্মৃতির বিনিময়ের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হয় তখন সামাজিকভাবে এতে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলো যখন নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিশেষ কোনো কারণে ক্রমাগত ঘটতে থাকে তখন তা বড়ধরনের শক্তি সঞ্চার করে। পিয়েরে নোরা ফ্রান্সের ইতিহাস নিয়ে বিশ্লেষণে এমন একটি বিষয় নির্ণয় করেন। নোরা তার বিশ্লেষণে কনশাসনেস অব ব্রেক নামক এক ধরনের ক্যাটাগরি ব্যবহার করেন। এর মানে, ইতিহাসে কখন কোথায় ছেদ ঘটে যায় কিংবা কোনো একটি ঘটনার ধারাবাহিকতা এবং পরম্পরায় ফাঁক ও শুন্যতা সৃষ্টি হয় তা বস্তুত স্মৃতির কাজ। যেটি মূলত কনশাসনেস অব ব্রেক থেকে নির্ণয় করা যায়। ফ্রান্সের অভিজ্ঞতায় শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায়, শিল্প-কলকারখান গড়ে ওঠার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সাথে বিচ্ছেদ ঘটতে থাকে। তবে এটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের চেয়ে বরং স্মৃতির উদঘাটন ও পর্যালোচনার ব্যাপকতরো কাজের বিষয়। মোটকথা, স্মৃতি অতীতে ঘটে যাওয়া নানারকম ক্ষতচিহ্ন, সংবেদনশীল

---

৬৯৮. আনসক রো, জোহানেস, *মেমোরি এন্ড হিস্ট্রি: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন* (জার্মানি: দে গ্রুয়েটার, ২০২১), পৃ. ১-৫। ভিজিট: মে ২১, ২০২৩, Memory and History: An Introduction (degruyter.com)

৬৯৯. প্রাগুক্ত। পৃ. ১।

ঘটনাবলী, কষ্টকর দাগ ও বিচ্ছেদ তদন্ত করে ভিন্ন কোনো অর্থের হদিস করতে চেষ্টা করে। এ ধরনের বিষয়াদি যেমন আধুনিক নগরায়ণ, শিল্প-কলকারখানার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কৃষিজীবন ও সংস্কৃতির মাঝে ঐতিহাসিক ও সামাজিক ছেদ তৈরির বিষয়টি চিহ্নিত করা যায় তেমনি এর সবথেকে বড় উদাহরণ উপনিবেশিত মানুষের সমাজ-বাস্তবতা।[৭০০] বিশেষত করে উপনিবেশোত্তর সময়কালে এবং বিউপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া যখন চলমান থাকে তখন স্মৃতির ভূমিকা মানে কালেক্টিভ মেমোরি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্মৃতি এবং ইতিহাসের মধ্যে এখানেই সবথেকে বড় পার্থক্য। নোরা মনে করেন, স্মৃতির মধ্যেই মানুষের বর্তমান জীবন। স্মৃতির মাঝে মানুষ অর্থ খুঁজে পায়। কারণ মানুষের জীবনের সাথে সাথে স্মৃতিও চলতে থাকে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যেকারণে স্মৃতি অনেক বেশি শক্তিশালী ইতিহাসে তুলনায়। মানুষ তার সম্ভাবনা ও বাস্তবতা প্রতিমুহূর্তে স্মৃতির নিক্তিতে যাচাই করে দেখে। এই নিরীক্ষার মানে স্মৃতির মাধ্যমে নতুন অর্থ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করা।

স্মৃতির আলোচনার মূল কথা হলো, যা হারিয়ে যায় তার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নিশ্চিত করে স্মৃতি। এই পুনরুদ্ধারের অর্থ ও তাৎপর্য মাহমুদ দারভীশের কবিতায় বিপুলভাবে উঠে এসেছে। পুনরুদ্ধারের অন্য নাম প্রতিরোধ। দারভীশের কবিতার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ স্মৃতি। যেখানে ইজরাইল, ফিলিস্তিন এবং দারভীশের কাব্য যেন একইসূত্রে গাথা। ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে ইজরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ এবং নাকবা– এ ঘটনাগুলো স্বভাবত ইতিহাস মনে হতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা ইতিহাসমাত্র নয়, বরং তা ইতিহাস হয়েও যায়োনিজমের একটি চলমান প্রক্রিয়া। সেকারণে ফিলিস্তিন প্রশ্নে স্মৃতি একটি ব্যবহারিক এবং কার্যকর ক্যাটাগরি। কারণ ইজরাইল প্রতিষ্ঠা যে প্রক্রিয়ায় ঘটানো হয়েছিল সেসব প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম এখনো চলমান। ফিলিস্তিনে যা ইতিহাস তা একইসাথে স্মৃতি। স্মৃতি মানে বর্তমান পরিস্থিতি। এই বর্তমান কথাটির একটি অর্থ হলো যা হারিয়ে গেছে, যা দখল করা হয়েছে, যা মুছে ফেলা হয়েছে পুনরায় তা ফিরিয়ে আনা। পুনরায় তা বর্তমান করে তোলা। বর্তমান করে তোলার অর্থ হলো প্রতিরোধ এবং তার সম্ভাবনা। দারভীশ বলেন,

أَلسماءُ رصاصيّةٌ في الضّحي
بُرْتقاليَّةٌ في الليالي. وأَمَّا القلوبُ
فظلَّتْ حياديَّةً مثلَ ورد السياجْ.

في الحصار، تكونُ الحياةُ هِيَ الوقتُ
بين تذكُّرِ أَوَّلها
ونسيانِ آخرِها..[৭০১]

বুলেটময় ভোরের আকাশ

---

[৭০০]. নোরা, পিয়েরে, *বিটুইন মেমোরি এন্ড হিস্ট্রি: লেস লিয়াক্স দে মেমোয়র* (রিপ্রিজেন্টেশন, সংখ্যা: ২৬, স্পেশাল ইস্যু, স্প্রিং ১৯৮৯), পৃ. ৭।
[৭০১]. দারভীশ, মাহমুদ, *হালাতু হিছার*, ২০০২, পৃ. ১২।

কমলাময় রাতে। এবং হৃদয় যেন
দেয়ালে আঁকা গোলাপের মতো পক্ষহীন

অবরোধের ভিতর প্রথম স্মৃতির স্মরণ
এবং তার শেষলগ্ন ভুলে যাওয়ার মাঝে
জীবন হয়ে ওঠে সময়

দারভীশ যখন রামাল্লায় ছিলেন তখন মূলত অবরুদ্ধ ছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে রচনা করেন হালাতু হিছার বা অবরোধ পরিস্থিতি। যেখানে দারভীশ জীবনের তাৎপর্য তুলে ধরেন এ কবিতাংশটিতে। দারভীশের কবিতায় স্মৃতি কথাটির সাথে আরো কয়েকটি ধারণা জড়িয়ে আছে। যা স্মৃতি অর্থের সমার্থকও। যেমন, প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়ে আনা বা ফিরে আসা। দ্বিতীয়ত, পুনরুদ্ধার। তৃতীয়ত, স্বপ্ন। চতুর্থত, বারবার ঘটা। স্মৃতি এমন একটি বিষয় যেটি যেকোনো জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে স্মৃতির গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, পৃথিবীর প্রাচীন জনপদগুলোর মধ্যে ফিলিস্তিন অন্যতম। তার সাথে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর প্রভাবশালী তিনটি ধর্মের উৎস ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস। অপরদিকে রয়েছে একসময়ের প্রভাবশালী সভ্যতা বেবিলনীয় ও সুমিরীয় সভ্যতার পীঠস্থান বৃহত্তর এ অঞ্চল। ফলে এখানে ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিকতা, পুরাণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি স্মৃতিও। সামষ্টিক স্মৃতির সাথে আদর্শের একটি সম্পর্ক রয়েছে। কারণ যেকোনো মতাদর্শ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে স্মৃতি বড়ধরনের রসদ হিসেবে কাজ করে। ইউরোপের ইতিহাসে যেমন ইহুদিবাদের উত্থান। যার সাথে বাইবেলের ধর্মীয় (বিবলিক্যাল টেক্সট অব ওল্ড টেস্টামেন্ট) নির্দেশনার সম্পর্ক রয়েছে। হিব্রু বাইবেলে কাব্যিক ভাষায় প্রতীকী অর্থে ইহুদী জনগোষ্ঠীর বর্ণনা রয়েছে– এই বর্ণনা যেমন ধর্মীয় নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে তেমনি কাজ করে স্মৃতি হিসেবে। কারণ হিব্রু ধর্মগ্রন্থের ভাষ্য অনুসারে ইহুদিদের ঐতিহাসিক সেকড় অনুসন্ধানের জন্য কিংবা *প্রাচীন ইজরাইল'র* ধারণা পাওয়ার জন্য স্মৃতির প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। যেটা মূলত সামষ্টিক স্মৃতির প্রশ্ন। হিব্রু ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী এধরনের স্মৃতি তাদের নিজস্ব স্মৃতি। এই স্মৃতি ইহুদিদের বিশ্বাসগত ঐতিহ্যের মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে। এই স্মৃতি যেমন তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ তৈরি করেছে তেমনি বলপ্রয়োগ ও সহিংস উপায়ে ইজরাইল নামক ভূখণ্ড সৃষ্টির পেছনেও রয়েছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসগত সামষ্টিক স্মৃতি। কিন্তু প্রাচীন ইজরাইল'র ধারণা এবং আবিষ্কার যে প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে তার পুরো বয়ান বস্তুত ইউরোপীয় পণ্ডিত ও স্কলারদের পরিশ্রমের ফসল।[৭০২] প্রাচীন ইজরাইল এবং আধুনিক ইহুদিদের আবিষ্কারের যে ভাষ্য ও ধারণা তৈরি করেছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তা বর্তমান ইজরাইল রাষ্ট্র নির্মাণের প্রাকপ্রস্তুতির অংশমাত্র। এমনকি স্মৃতি নামক ইজরাইলীয় যে জ্ঞানপ্রয়াস তার সাথেও রয়েছে একই পরিকল্পনার নিবিড় যোগাযোগ। ফলে বাইবেলের স্মৃতি এবং গত আড়াই শতক ধরে চলা চলমান ইহুদি প্রমিত ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কারণ ফিলিস্তিনীদের মাঝে যে সামষ্টিক স্মৃতির পরিপালন দেখা যায় তা নিছক বিশ্বাসগত নয়, বরং তা নিতান্তই বাস্তব এবং ঐতিহাসিক। ফিলিস্তিনের সামষ্টিক স্মৃতির ধারা

[৭০২]. মাসালহা, নূর, *দি জায়োনিস্ট বাইবেল: বিবলিক্যাল প্রিসিডেন্ট, কলোনিয়ালিজম এন্ড দ্য ইরেজার অব মেমোরি* (লন্ডন: রুটলেজ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৭।

গড়ে উঠেছে ক্যানান সভ্যতাকে কেন্দ্র করে। পরবর্তীতে ইব্রাহীমীয় ঐতিহ্যের মধ্যদিয়ে এটি আরো বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে এমন সামষ্টিক স্মৃতি– যা থেকে তারা একটি কাল্পনিক ঐতিহাসিক উৎস (), প্রাচীন উৎস () তৈরি করেন। আদি অতীত () বলে তারা একটি ডিসকোর্স রচনা করেন। বস্তুত এই কাল্পনিক তত্ত্ব প্রণয়ন করা হয় উনিশ শতকে। সে সময়ে আধুনিক ইউরোপের জায়োনিস্ট বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ ও লেখকরা মিলে এমন কল্পনাপ্রসূত সামষ্টিক স্মৃতির তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। যার মাধ্যমে তারা ইহুদীদের প্রাচীন জাতিয়তার (অ্যানশিয়েন্ট ন্যাশনালিটি) বয়ান গড়ে তোলেন। এরফলে তাদের আদি ভূমির উদঘাটনের প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়।[৭০৩] ধর্মীয় টেক্সটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এমন সামষ্টিক স্মৃতিমূলক জায়োনিস্ট আখ্যান বস্তুত ফিলিস্তিন দখলের প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করে। ফিলিস্তিন দখলের সাথে যেকারণে জায়োনিস্টদের একটি বড়ধরনের প্রকল্প রয়েছে। যাতে তারা ফিলিস্তিনকে তার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সবধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। জায়োনিস্ট মতাদর্শ শুধু একটি ভূমি দখল করার মধ্যেই থেমে যায়নি। বরং ফিলিস্তিনকে তার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে মুছে ফেলার প্রকল্প কার্যকর করাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে জায়োনিজম। দারভীশ তাই বলেন,

تُنسى، كأنَّكَ لم تَكُنْ
تُنْسَى كمصرع طائرٍ
ككنيسةٍ مهجورةٍ تُنْسَى،
كحبّ عابرٍ
وكوردةٍ في الليل .... تُنْسَى
أَنا للطريق...هناك من سَبَقَتْ خُطَاهُ خُطَايَ
مَنْ أَمْلَى رُؤاهُ على رُؤَايَ. هُنَاكَ مَنْ
نَثَرَ الكلام على سجيَّتِه ليدخل في الحكايةِ
أَو يضيءَ لمن سيأتي بعدَهُ
أَثراً غنائياً...وحدسا
تُنْسَى, كأنك لم تكن
شخصاً, ولا نصّاً... وتُنْسَى
أَمشي على هَدْيِ البصيرة، رُبّما
أُعطي الحكايةَ سيرةً شخصيَّةً. فالمفرداتُ
تسُوسُني وأَسُوسُها. أنا شكلها
وهي التجلِّي الحُرُّ. لكنْ قيل ما سأقول.
يسبقني غدٌ ماضٍ. أَنا مَلِكُ الصدى.
لا عَرْشَ لي إلاَّ الهوامش. و الطريقُ
هو الطريقةُ. رُبَّما نَسِيَ الأوائلُ وَصْفَ
شيء ما، أُحرِّكُ فيه ذاكرةً وحسّا

---

৭০৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩১।

تُنسَى، كأنّكِ لم تكن
خبراً، ولا أَثراً... وتُنْسى
أَنا للطريق... هناك مَنْ تمشي خُطَاهُ
على خُطَايَ, وَمَنْ سيتبعني إلى رؤيايَ.
مَنْ سيقول شعراً في مديح حدائقِ المنفى،
أمامَ البيت، حراً من عبادَةِ أمسِ،
حراً من كناياتي ومن لغتي، فأشهد
أَنني حيٌّ
وحُرٌّ
حين أُنْسَى![704]

তোমাকে ভুলিয়ে দেয়া হবে এমনভাবে যেন তুমি ছিলেই না।
তোমাকে ভুলিয়ে দেয়া হবে হবে নিহত পাখির মতো
পরিত্যক্ত গীর্জার মতো তোমাকে ভুলিয়ে দেয়া হবে
ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় ভালোবাসার মতো
রাতের গোলাপের মতো তোমাকে ভুলিয়ে দেয়া হবে।

আমি বেরিয়েছি পথের খোঁজে... এখানে এমন সব ব্যক্তি
যেখানে আমার আগেও রয়ে গেছে যাদের পদচিহ্ন
যাদের দৃষ্টি দেখায় আমার পথচলা; যারা স্বভাবত
ছড়িয়ে দেয় বাক্য যেন ঢুকে যেতে পারে গল্পের ভিতর
কিংবা যারা গীতল প্রভাবে–স্বজ্ঞায় উত্তরসূরীদের জন্য
ছড়িয়ে যায় আলো।

তোমাকে ভুলিয়ে দেয়া হবে এমনভাবে যেন তুমি ছিলেই না
ব্যক্তিগতভাবে কিংবা লিখিত ভাষায়... এবং ভুলিয়ে দেয়া হবে
তোমাকে। অন্তর্দৃষ্টির পথ ধরে আমি চলি... হয়ত ব্যক্তিগত
আত্মজীবনীতে রেখে যাবো গল্পটি। আমাকে শাসন করে
শব্দ– যাদের শাসন করি আমিও। আমিই ভাষার আকার
বস্তুত ভাষাই স্বাধীন প্রকাশ। কিন্তু আমি যা বলবো হয়তো
তা বলা হয়ে গেছে। আমাকে অতিক্রম করে যায়
অতীতমান ভবিষ্য। আমিই ধ্বনির মালিক কর্তা। আমার নেই
কোনো সিংহাসন। আছে মাত্র কিছু প্রান্তদেশ। এই পথই
সেই পথ। প্রথম কেউ হয়ত ভুলে গেছে বলে যেতে কিছু

---

৭০৪. দারভীশ, মাহমুদ, *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা*, ২০০৪, পৃ. ৭১-৭৩।

আমিই সেখানে কাঁপিয়ে তুলবো স্মৃতি ও অনুভব।

তোমাকে ভুলিয়ে দেয়া হবে এমনভাবে যেন তুমি ছিলেই না
না কোনো খবরে, না কোনো সূত্রে...এবং ভুলিয়ে দেয়া হবে
তোমাকে। আমি বেরিয়েছি পথের সন্ধানে... এখানে এমন
সব ব্যক্তি যেখানে তারা পথ চলে আমাকে অনুসরণ করে
অনুগামী হয়ে ওঠে আমার দৃষ্টিরেখা ধরে, তারা অতীতপূজা
থেকে মুক্ত হয়ে, আমার ভাষা ও ভিন্নপদ থেকে মুক্ত হয়ে
ঘরের সমুখে নির্বাসন-বাথানের বন্দনায় পাঠ করে কাব্য।
সুতরাং আমি সাক্ষ্য দেই, যখনই আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হবে
আমি জীবন্ত, মুক্ত স্বাধীন!

স্মৃতির বিপরীত শব্দ বিস্মৃতি () বা ভুলে যাওয়া। ভুলে যাওয়া মানুষের খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়। আবার মনে থাকা বা স্মরণে থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু ভুলে যাওয়া এবং ভুলিয়ে রাখা কিংবা ভুলিয়ে দেয়া এতোটা স্বাভাবিক নয় যতোটা না তা রাজনৈতিক। ভুলিয়ে রাখা– অত্যন্ত ব্যাপক ধারণার অন্তর্গত। ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে এ ধারণা বোঝা সহজ। ফিলিস্তিনের ইতিহাস নিয়ে বিতর্কের সূত্র ধরে মূলত এর সূত্রপাত। অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে আরব ফিলিস্তিনের অধিবাসীরাই আদি জনগোষ্ঠী– এটা ইজরাইলের জন্য মেনে নেয়া অসম্ভব। যায়েনিস্ট শক্তিগুলো দাবি করে, ইহুদিরাই এখানকার আদিম অধিবাসী। ফলে তাদের এখানে বসতি স্থাপনের ঐতিহাসিক অধিকার রয়েছে। এভাবে একটি ঐতিহাসিক ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য ইজরাইল ফিলিস্তিনের ইতিহাস নিয়ে নিজস্ব ভাষ্য রচনার চেষ্টা করে। ফলে ফিলিস্তিনের ভূমি দখলের মতো ইতিহাস দখলও গুরুত্বপূর্ণ ইজরাইলের জন্য। এমন একটি পটভূমিকে কেন্দ্র করে পুরো কবিতাটিতে স্মৃতি সম্পর্কিত একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। একইসাথে ইজরাইলের ইতিহাস দখলের চেষ্টার প্রতিরোধে স্মৃতি পুনরুদ্ধারের অঙ্গিকারও কবিতাটিতে দারুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু জায়োনিস্টদের এই পুরো প্রকল্পের জন্য সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে ওঠে স্মৃতি এবং জনশ্রুতি। লোকমুখে চর্চিত ভাষার (ওরাল মেমোরি) উৎস মূলত স্মৃতি। এই স্মৃতি বস্তুত সামষ্টিক স্মৃতি। জায়োনিস্টরা তাদের নিজেদের মতো একটি ইতিহাস তৈরি করে নিয়েছেন– কিন্তু বাস্তবে চলমান এসব স্মৃতির সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। ইতিহাস বয়ানের জন্য যেসব তথ্য-প্রমাণ জরুরি তা বাস্তবে নেই জায়োনিস্ট ইতিহাস চর্চায়। ফলে ধারণাগতভাবে যে বিকল্প ইতিহাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে তাতে আরো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪৮ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধের সময় যাকিছু ঘটেছে তা সম্পর্কে যেমন ফিলিস্তিনীরা জানে তার বাস্তবতা কমবেশি সাধারণ ইহুদিরাও জানে। জাতিগত নিধন (ethnically cleansed), উচ্ছেদ, দখলদারিত্ব, গুম-খুন, গণহত্যা, শরণার্থি সমস্যা, নির্বাসন ইত্যাদি নিছক তথ্যের বিষয় নয় বরং ঐতিহাসিক ঘটনা। যেগুলো সাধারণ মানুষের

মাঝে বিধিত ও চলমান। কিন্তু সাধারণ ইহুদীদের মাঝে চলমান এই জানা স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে জায়োনিস্ট ইতিহাসে। জায়োনিস্ট ইতিহাসের ডিসকোর্সে যেটা একটি অন্যায্য প্রক্রিয়া।[৭০৫] ইজরাইলের সামগ্রিক তৎপরতার বিপরীতে ফিলিস্তিন তাদের স্মৃতি হারাতে চায়না। ইজরাইল হয়ত তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু ফিলিস্তিন মনে করে তাদের ইতিহাস আর তাদের অস্তিত্ব অভিন্ন। তাদের ভূমি যেমন তাদের অস্তিত্বের সাথে অবিমিশ্র তেমনি তাদের ইতিহাসও অভিন্ন। ফলে বিস্মৃতকরণের কোনো প্রকল্পই তাদের জন্য বাধা হয়ে উঠতে পারবেনা। কারণ প্রতিরোধই তাদের একমাত্র উপায়। ফিলিস্তিন তাদের এ উপায় পুরোপুরি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত। যেকোনো পরিস্থিতিতে তাদের ভূমি, তাদের সীমান্ত এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে প্রতিরোধ করে যাওয়াই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। যেখানে ইতিহাস রক্ষায় তাদের স্মৃতির উপর ভর করে গড়ে ওঠে তাদের প্রতিরোধ। দারভীশ তাই বলেন,

يا فرس الماء
هل كنتِ لى ضفتين
وكان المكان كما ينبغى ان يكون
خفيفا خفيفا على ذكرياتك ؟[706]

জলঘোড়া হে
তুমি কি আমার দুই কুল?
বস্তুত স্থানটি আছে যেমন তার থাকার কথা
তোমার স্মৃতির উপর ভর করে ধীরে ধীরে তা হয়ে ওঠুক

৬.১০: স্মৃতি, স্মৃতির তাড়া (হন্টলোজি), নির্বাসন ও প্রত্যাবর্তন

দারভীশের কবিতায় স্মৃতির প্রশ্ন বিচিত্র আঙ্গিকে বিকশিত হয়। নাকবা, জায়োনিস্ট দখলদারিত্ব, জুলুম-নিপীড়ন, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদির বিপরীতে রয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, ধর্মীয় ঐতিহ্য, পুরাণ। অপরদিকে রয়েছে নির্বাসনের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি। এবং রয়েছে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা। সবকিছুর উপস্থিতি ছিল তার কবিতায়। কিন্তু উপস্থাপনভঙ্গি বিচিত্র হলেও তার গোড়া ছিল ফিলিস্তিন। এই মূলকে অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে তার কবিতার স্মৃতিচক্র। সমালোচক স্টুয়ার্ট রিগেলুথ মনে করেন, দারভীশের কবিতায় যে প্রক্রিয়ায় তার স্মৃতির বিস্তার ঘটেছে তাকে একপ্রকার চক্রের সাথে তুলনা করা যায়। স্টুয়ার্টের ভাষায় এর নাম *মিমিক্রি (Mimicry)*। অতীতের বিবিধ ঘটনা ও বাস্তবতার অনুকরণ করে মিমিক্রি গড়ে তোলা হয়। অতীত থেকে মানুষ যেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তার উৎস অতীত বা ইতিহাস হলেও তার মাধ্যম হলো তার মনোজগত। মিমিক্রি বস্তুত বিশেষ কিছু ঘটনার নাম। যেখানে যাপন করে অতীতকে পাঠ করা কিংবা অতীতকে নতুন করে

---

৭০৫. বেইনিন, জুয়েল, *ফরগেটফুলনেস ফর মেমোরি: দি লিমিটস অব দি নিউ ইজরাইলি হিস্ট্রি* (জার্নাল অব প্যালেস্টাইন স্টাডিজ, ভলিয়ম: ৩৪, সংখ্যা: ২, উইন্টার ২০০৫), পৃ. ১২-২০।
৭০৬. দারভীশ, মাহমুদ, *সারীর আল গারীবাহ*, ১৯৯৫, পৃ.

হাজির করাটা সহজ হয়ে ওঠে। মিমিক্রি'র কাঠামোতে ঘটনাই মূল– ফলে স্মৃতির ভিতরে ঘটনার অনুপ্রবেশ করাটা যেখানে একটি প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। স্মৃতিতে অনুপ্রবেশযোগ্য হয়ে ওঠে ঘটনা। এ প্রক্রিয়ায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারবার আবর্তিত হয় নানাবিধ বক্তব্য। প্রথমে এটি মনস্তাত্ত্বিকভাবে তৈরি হয়। এরপর এটি মূর্ত হয়ে ওঠে লেখা ও ভাষার মধ্যদিয়ে। মিমিক্রির প্রধান উপজীব্য ঘটনা হলেও এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো চিন্তা ও কল্পনার উৎপাদন। মিমিক্রি এ কারণেই মিমিক্রি কারণ তাতে আবর্তন প্রক্রিয়া রয়েছে। মানে একটি বিষয় বিভিন্ন আঙ্গিকে বারবার প্রকাশ করা।[৭০৭]

মিমিক্রি'র ধারণার সাথে আবর্তন, প্রত্যাবর্তন কিংবা তাড়িয়ে বেড়ানো ধারণার সম্পর্ক রয়েছে। ইতিহাস প্রশ্নে প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় বিস্মৃতির বিপরীতে যেমন স্মৃতি রয়েছে, তেমনি রয়েছে পুনরুদ্ধার, রয়েছে প্রত্যাবর্তনের ধারণা। প্রত্যাবর্তন, তাড়িয়ে বেড়ানো (হন্টলোজি) কিংবা কোনো কিছু বারবার ঘটা–প্রকাশা পাওয়া প্রায় এক ধারণাগত। দারভীশের কবিতায় স্মৃতি কিংবা নস্টালজিয়ার প্রেক্ষিতগুলো পাঠ করা হয় প্রতিরোধের সাপেক্ষে। প্রত্যাবর্তন, ফিরে আসা, বারবার ঘটা'র বিষয়গুলোও একই প্রেক্ষিত থেকে পাঠ করা যায়। অন্য আঙ্গিক থেকেও পাঠ করা যেতে পারে। স্মৃতির ঘটনা যেমন বারবার ঘটে, তেমনি এমন অনুমান থেকেও বোঝা যায় দারভীশের কবিতায় অতীতের কিংবা পুরনো দিনের কোনো ঘটনা বা অবস্থার কথা বারবার কেন বিবৃত হয়? কারণ একসময় দেখা যায় দারভীশের কবিতায় নাকবার প্রসঙ্গ কোনো না কোনোভাবে উঠে আসছে। নাকবার সাথে যেন ইতিহাসের এক গভীর টান। ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব এবং আজকের বাস্তবতা নিরীক্ষা করার জন্য নাকবার প্রেক্ষাপট ও ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। যেকারণে যেকোনো পরিস্থিতিতে নাকবার স্মৃতি দাবি করার সাথে মূলত ফিলিস্তিনের পুরো অস্তিত্বের প্রত্যয় একইসাথে উচ্চারিত হয়।[৭০৮] কাজে স্মৃতি যেমন দাবি বা চর্চার বিয়ষ তেমনি তার সাথে জড়িয়ে আছে প্রতিরোধের তাৎপর্য। ভূমি, বাস্তুভিটা, সীমান্ত, শহিদ, শাহাদাৎ, মৃত্যু, খুন-হত্যা, নিপীড়ন, জুলুম, দখলদারিত্ব, উপনিবেশায়ন, উচ্ছেদ, নির্বাসন ইত্যাদি প্রসঙ্গ দারভীশের কবিতায় ফিরে ফিরে আসে। যে বিষয়গুলো দারভীশ তার কবিজীবনের প্রথম দিকে খুব স্পষ্ট করে বলেছেন একই বিষয় শেষজীবনে এসে কিছুটা বিমূর্ত ভঙ্গিতে প্রতীক ও রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার কবিতায় প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত অনুমানগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করা যায়। যেহেতু এর সাথে শুধু ঘটনার সম্পর্ক নয়, বরং ইতিহাসের সাথে গভীর বন্ধন যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা। সেদিক থেকে ফরাসি দার্শনিক জাঁক দেরিদার ধারণার সাথে মিলিয়ে দারভীশের কবিতা পাঠ করা যায়। *Hauntology*—বারবার কোনো কিছুর আসা-যাওয়া এবং কোনো কিছুর তাড়া করাকে ইংরেজিতে *Haunt* বলা হয়। সাধারণত আত্মা বা প্রেতাত্মার যাতায়াত প্রসঙ্গে *Haunt*'র ব্যবহার দেখা যায়। তবে যখন বিশেষ ধারণা আকারে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তৈরি হয় তখন *Hauntology* শব্দরূপ প্রয়োগ করা হয়। মূলত দেরিদার *Spectres of*

---

[৭০৭]. রেইগেলুথ, স্টুয়ার্ট, *মেমোরি এন্ড রেজিসট্যান্স: এ লিটারেরি পার্সপেক্টিভ অব প্যালেস্টাইনিয়ান অ্যাক্সিসট্যান্স* (লেবানন: সেন্টার ফর অ্যারাব এন্ড মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজ, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বেইরুত, জুন ২০০৫), পৃ. ২০-৩৬।

[৭০৮]. আবু লুঘদ, লায়লা ও আহমদ এইচ. সা'দি, *ইন্ট্রোডাকশন: দি ক্লেইমস অব মেমোরি*—আহমদ এইচ. সা'দি ও লায়লা আবু-লুঘদ কর্তৃক সম্পাদিত—*নাকবা: প্যালেস্টাইন, ১৯৪৮, এন্ড দি ক্লেইমস অব মেমোরি* (নিউ ইয়র্ক: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১-২৬।

Marx—গ্রন্থে হন্টলোজির ধারণার বিস্তার ঘটে। কার্ল মার্ক্স spectre শব্দ ব্যবহার করেন *দি কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো* গ্রন্থে।[৭০৯] রাজনৈতিক অর্থনীতির () দিক থেকে মার্ক্স ইউরোপে পুঁজির ভুতুড়ে অবস্থার বর্ণনা দেন। যেখান থেকে দেরিদা মার্ক্স রচিত *স্পেকট্রা*'র বিপরীতে নিজের দার্শনিক পর্যালোচনা হাজির করেন। তবে শেক্সপেয়ারের হেমলেটের সংলাপ থেকেও প্রেতাত্মা সম্পর্কিত ধারণার বিশ্লেষণে অনুপ্রাণিত হন দেরিদা।[৭১০]

দেরিদা মনে করেন, হন্টলোজি থেকে একবার এবং পুনরাবৃত্তি'র যে ধারণা পাওয়া যায় তার সাথে প্রেতাত্মা সম্পর্কিত ধারণার প্রশ্ন কোনো ঘটনারও প্রশ্ন। কোনো আত্মার চলাচল বা উপস্থিতি বলতে কি বোঝায়? প্রতিমূর্তি হিসেবে কোনো কিছুর নিষ্ক্রিয় থাকা বোঝায়? এর মানে বস্তুর নিজের এবং তার প্রতিমূর্তির মাঝে কিছু কি একটা আছে? আসলে এভাবে বলার মানে এর সাথে সময়ের সম্পর্কও রয়েছে। ফলে পুনরাবৃত্তি এবং প্রথমবার মানে পুনরাবৃত্তি ও শেষবারও। কারণ যেকোনো প্রথমবার– সেটা তার শেষবারও তৈরি করে রাখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ফলে প্রতিবারই বস্তুত শেষবার বা শেষ ঘটনা। অর্থাৎ প্রথমবারই শেষবার। একইসাথে শেষবারও প্রথমবার। দেরিদা এ অবস্থাকে হন্টলোজি হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৭১১] ধারণাগতভাবে ভুত বা প্রেতাত্মা আসে অতীত থেকে। এই ভুত মানে সাধারণভাবে মানুষ যেধরনের ভুতের কল্পনা করে মোটেই তা নয়। এখানে ভুত বা প্রেতাত্মা মানে কোনো ঘটনার বা কোনো সত্যের প্রতিমূর্তি। পুরনো কোনো সময়কাল থেকে এই প্রতিমূর্তি আসে এবং বর্তমানে তা হাজির হয়। যদিও অতীত থেকে আসলেই অতীতের প্রেতাত্মা বলতে হবে এমন নয়। এটা সবসময় নিশ্চিতভাবে নাও বলা যেতে পারে। কিন্তু যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা চরিত্রের প্রতিমূর্তি বা প্রেতাত্মা শনাক্ত করা হয় বর্তমানে সেক্ষেত্রেও তা বলা যেতে পারে। যদিও নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত বলা যায়না। সম্ভাবনা আছে। এধরনের ফিরে আসার বা প্রত্যাবর্তনের ধারণা দর্শনের সময় সংক্রান্ত চলমান ধারণাগুলোকে ভেঙ্গে দিতে পারে। খোদ সময় যেখানে প্রেতাত্মার প্রেক্ষিত থেকে পুরোপুরি বিমূর্ত এবং রহস্যময় হয়ে ওঠে। তবে ভাষাগত কাঠামোর মধ্যদিয়ে প্রেতাত্মার বা প্রতির্মূতির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা সময়ের এমন ধারণা সহজে বোঝা সম্ভব।[৭১২] মাহমুদ দারভীশের কবিতায় এর বিপুল উদাহরণ রয়েছে। অ্যানা বল তার *Communing With Darwish's Ghosts: Absent Presence in Dialogue With the Palestinian Moving Image*—শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু এর সাথে প্রতিরোধের কি সম্পর্ক রয়েছে? দারভীশের কবিতায় প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে হন্টলোজির ধারণা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। দারভীশ বলেন,

أري شَبَحي قادماً من بعيد ...

---

[৭০৯]. মুর, সাম্যুয়েল, *ম্যানিফেস্টো অব দি কমিউনিস্ট পার্টি*—কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডেরিখ অ্যাঙ্গেলস'র মূলগ্রন্থ (জার্মান) *Manifest der Kommunistischen Partei*'র অনুবাদ (মস্কো: প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, ১৮৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৪।

[৭১০]. ক্যামুফ, প্যাগি, *স্পেকটার্স অব মার্ক্স*—জ্যাক দেরিদার মূলগ্রন্থ (ফরাসি) *Spectres de Marx*'র অনুবাদ (নিউ ইয়র্ক: রুটলেজ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১-৬০।

[৭১১]. দেরিদা, জ্যাক, *স্পেকটার্স অব মার্ক্স* ১০,৬৩, ২০৩

[৭১২]. ফিশার, মার্ক, *দি ম্যাটাফিজিক্স অব ক্র্যাকল: অ্যাফ্রোফিউচারিজম এন্ড হন্টোলজি* (ড্যান্সকাল্ট, জার্নাল অব ইলেক্ট্রোনিক ড্যান্স মিউজিক কালচার, ৫(২), ২০১৩), পৃ. ৪৪-৫৩।

أُطِلُّ, كَشُرْفة بَيْتٍ, على ما أُريدْ
أُطِلُّ على أَصدقائي وهم يحملون بريدَ
المساء: نبيذاً وخبزاً,
وبعض الرواياتِ والأسطواناتْ ...

أُطلُّ على نَوْرَسٍ, وعلى شحنات جُنُودْ
تُغَيِّرُ أَشجارَ هذا المكانْ.[713]

আমি দেখি দূর দিগন্ত ছুঁয়ে আসছে আমার আত্মা...

আমি যাই চাই তার উপর দিয়ে বেলকনির মতো উঁকি মেরে দেখি
উঁকি মেরে দেখি বন্ধুদের উপর যখন তারা সন্ধ্যার ডাকে বয়ে যায়:
মদ, রুটি এবং কিছু উপন্যাস ও রূপকথা...

শঙ্খচিল আর সৈনিকের ট্রাঙ্কের উপর উঁকি মেরে দেখি
বৃক্ষরা বদলে দিচ্ছে এই স্থান।

একইধরনের ধারণার সাযুজ্য রয়েছে ম্যাসিয়ানিজমের *(Messianism)* সাথে। ম্যাসিয়ানিজমের ধারণা গড়ে উঠেছে মূলত ধর্মীয় টেক্সট ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। আবরাহিমক রিলিজিয়নের ধারাগুলো থেকে এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটে। প্রথমত ইহুদী ধর্মীয় ধারা থেকে ম্যাসিয়ানিজমের উৎপত্তি ঘটে। হিব্রু ভাষায় রচিত ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত থেকে এসেছে ম্যাসিয়াহ ()। যাতে একজন ত্রাণকর্তার ধারণা পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, তিনি পুরো পৃথিবীকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার এক কালপর্বে নিয়ে আসবেন।[৭১৪] ইহুদি ধর্মমতে, রাজা ডেভিডের (নবী দাউদ আ.) সময়কালকে সেই কাঙ্ক্ষিত সময় হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, যেহেতু ম্যাসিয়ানিজমের পরকালীয় কিংবা ভবিষ্যতীয় ধারণা অনুযায়ী সরাসরি ম্যাসিহার আগমনের উল্লেখ নেই সেকারণে ব্যক্তি বিশেষের চেয়ে সেখানে ধারণাই গুরুত্বপূর্ণ। সরাসরি ম্যাসিহার পুনরাগমনের চেয়ে যেখানে তার আদর্শিত ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বে রূপান্তরিত হয়েছে ম্যাসিয়ার ধারণা। ফলে তাতে দেখা যায়, রাজা ডেভিডের অনুসারী একজন আসবেন– এবং তিনিই ইহুদিদের ম্যাসিহা– যিনি ডেভিডের সেই ইহুদি রাজ আবার প্রতিষ্ঠা করবেন।[৭১৫] একইসাথে ইহুদিদেরকে তাদের রাজ্য

---

[৭১৩]. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদা*, ১৯৯৫, পৃ. ১১।
[৭১৪]. লেপ্টকুইৎজ, বেঞ্জামিন, *ইমিউনিজম: রিথিংকিং দ্য আইডিওলজি অব মেসিয়ানিক রিলিজিয়াস জায়োনিজম* (যুক্তরাষ্ট্র: কলেজ অব সোশ্যাল স্টাডিজ, ওয়েসলিয়েন ইউনিভার্সিটি, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৪০, ৫৪-৬৮।
[৭১৫]. জে. বোডা, মার্ক, *ফিগারিং দ্য ফিউচার: দি প্রফেটস এন্ড মেসিয়াহ*—স্ট্যানলি ই. প্রোটার সম্পাদিত *দি মেসিয়াহ ইন দি ওল্ড এন্ড নিউ টেস্টামেন্টস*'র সংকলিত নিবন্ধ (ক্যামব্রিজ, উইলিয়াম বি. ইয়ার্ডম্যানস পাবলিশিং কো., ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩৫-৭৪।

ইজরাইলে ফিরিয়ে আনবেন। পরবর্তীতে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম থেকেও একই ধারণার বিস্তার ঘটে। তবে প্রতিটি ধারা থেকে উদ্ভুত ম্যাসিয়ানিক ধারণা এক নয়। তাদের আলাদা প্রস্তাবনা রয়েছে। ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভিন্ন ও স্বতন্ত্র পন্থা থাকলেও মৌলিকভাবে এবং ধারণাগতভাবে ম্যাসিয়ানিজম প্রায়ই একই বস্তু।

পশ্চিমে ইহুদিদের ম্যাসিয়ানিজমের এমন ধারণা দার্শনিকভাবেও আরো বিকশিত হয়েছে। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন, জর্জিও আগামবেন, জাক দেরিদা ও আলাঁ বাদিও প্রমুখ দার্শনিকদের পর্যালোচনায়। ওয়াল্টার বেঞ্জামিনসহ সবার আলোচনার সাধারণ পাটাতন হলো, ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতর থেকে ম্যাসিয়ানিজমকে বের করে ঐতিহাসিক সময় (হিস্ট্রিক্যাল টেম্পোরালিটি) এবং ইতিহাস ব্যাখ্যার একটি পদ্ধতি হিসেবে গড়ে তোলা। বেঞ্জামিন মনে করেন, ইতিহাসের ভিতর নৈর্ব্যক্তিকভাবেই ম্যাসিয়ানিক প্রক্রিয়া কাজ করে।[৭১৬] দেরিদা ম্যাসিয়ানিজমকে তার ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো থেকে বের করে ইতিহাস এবং সময়ের ধারণা ব্যাখ্যার পদ্ধতি হিসেবে *ম্যাসিয়ানিসিটি* (messianicity) ক্যাটাগরি প্রস্তাব করেন।[৭১৭] তবে তাদের মধ্যে জর্জিও আগামবেন কিছুটা ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। আগামবেন একটি কালপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেন ম্যাসিয়ানিজমকে যেখানে তা কার্যকর থাকে। যার প্রধান ভূমিকায় থাকেন ম্যাসিহা। ধারণাগতভাবে যিনি ম্যাসিহা তিনি মূলত ম্যাসিয়ানিক কালপর্বের প্রধান কর্তাসত্তা। আগামবেন ম্যাসিয়ানিটিকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন যাতে মূলত জিনিয়ালজিক্যাল () প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে। যেখানে ম্যাসিয়ানিক কালপর্বের ভিতর একজন ম্যাসিহা থাকেন, আগামবেনের তত্ত্বানুযায়ী তিনি ম্যাসিয়ানিক কর্তাসত্তা (সাবজেক্ট)। কিন্তু বেঞ্জামিনের ম্যাসিয়ানিসিটি কিংবা ইতিহাসের আবর্তন প্রক্রিয়া দারভীশের কবিতার সাথে সবথেকে বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ বেঞ্জামিন ম্যাসিয়ানিজমকে ইহুদি ধর্মতত্ত্বের নির্দিষ্ট কাঠামোর বিশেষ ধারণা হিসেবে প্রয়োগ করতে রাজি নন। বেঞ্জামিন মনে করেন, এটি ইতিহাসেরই একটি নিজস্ব, নৈর্ব্যক্তিক এবং স্বয়ম্ভু প্রক্রিয়া। এটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির ইচ্ছা, আদর্শ–রাজনীতি বা ধর্মের ফলাফল হিসেবে ঘটেনা। বরং তা ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি ও শর্তানুযায়ী ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে ঘটে যায়। কারণ ইতিহাস শুধু। তদুপরি দারভীশের কবিতায় তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল এবং ইসলামসহ স্থানীয় সব ধর্মীয় ঐতিহ্য মিশে আছে। দারভীশ ধর্মীয় এমন ধারণাকে বরং ইজরাইল এবং যায়োনিজমের দখলদারিত্বের বিপরীতে প্রতিরোধের উপায় হিসেবে তার কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। দারভীশ বলেন,

---

[৭১৬]. জন, হ্যারি, *ইলুমিনেশনস*—ওয়াল্টার বেঞ্জামিন এর মূলগ্রন্থ (জার্মান) *Illuminationen*'র অনুবাদ (নিউ ইয়র্ক: শোকেন বুকস, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ৩৪-৫৯, ২৫৪, ২৬৩। অ্যালিসন রস, *রেভ্যুলুশন এন্ড হিস্ট্রি ইন ওয়াল্টার বেঞ্জামিন: এ কনসেপচুয়াল অ্যানালাইসিস* (নিউ ইয়র্ক: রুটলেজ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৯৬-১১৭। আন্দ্রে বেঞ্জামিন, *ওয়াল্টার বেঞ্জামিন এন্ড হিস্ট্রি*—সম্পাদিত (লন্ডন: কন্টিনিয়াম, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৭১-২১৫।

[৭১৭]. আগামবেন, জর্জিও, *দি টাইমস দ্যাট রিমেইনস: কমেন্টারি অন দি লেটার টু রোমানস* (ক্যালিফোর্নিয়া, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭১। তেরেসা ক্লিমোভিচ, *জর্জিও আগামবেন এন্ড দি কনসেপ্ট অব মেসিয়ানিজম—জুইস স্টাডিজ: আলমানাখ*—সম্পাদিত (নিউ ইয়র্ক: জুইস ইনস্টিটিউট অব হিস্ট্রি, তাওরো কলেজ, ২০১৭-২০১৮), পৃ. ১২৫-১৩৮।

يجيئون،
أبوابُنا البحرُ، فاجأنا مطرٌ. لا إله سوى الله. فاجأنا
مطرٌ و رصاصٌ. هنا الأرضُ سُجّادةٌ، و الحقائب
غربةْ!
يجيئون،
فلتترجّلْ كواكبُ تأتي بلا موعد. و الظهورُ التي
استندتْ للخناجر مضطرة للسقوط
و ماذا حدث ؟
أنت لا تعرف اليوم. لا لون. لا صوت. لا طعم
لا شكل.. يُولد سرحان، يكبر سرحان،
يشرب خمراً و يسكُرّ. يرسم قاتله، و يمزّق
صورته. ثم يقتله حين يأخذ شكلا أخيراً
و يرتاح سرحان:
سرحان! هل أنت قاتل ؟
و يكتب سرحان شيئاً على كُمِّ معطفه، ثمَّ تهرب
ذاكرةٌ من ملفِّ الجريمة.. تهرب.. تأخذ
منقار طائر.
و تأكل حبة قمح بمرج بن عامر
و سرحان مُتّهم بالسكوت، و سرحان قاتل[৭১৮]

তারা আসবে।
সমুদ্র আমাদের দরোজা, হঠাৎ আমাদের ভাসিয়ে দেয় বৃষ্টি
কোনো উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া। হঠাৎ আমাদেরকে বিদ্ধ করে বৃষ্টি
ও বুলেট। এই ভূমি সেজদাবনত যখন ব্যাগগুলো আগন্তুকের মতো!
তারা আসবে
পূর্বনির্ধারিত সময় ছাড়াই নক্ষত্রগুলোকে নেমে আসতে দাও
যখন পতনের জন্য বাধ্য হয়ে
দুপুরগুলো লীন হয়ে পড়েছে খঞ্জরের মুখে
কি ঘটেছিল?
আজ তুমি জানো না। কোনো রঙ নেই, শব্দ নেই, খাবার নেই
আকার নেই... জন্ম হবে এক নেকড়ের। বড় হবে সেই নেকড়েবাঘ
মদ পান করে উন্মত্ত হয়ে ওঠবে সে নেশায় এবং শনাক্ত করবে সে

[৭১৮]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, ২০০৫, পৃ. ৯৭-৯৮।

তার হত্যাকারী। চুরমার করে দেবে হত্যাকারীর ছবি। অতপর যখন
সে তার শেষ রূপ ধারণ করবে তখন সে তার খুনিকে হত্যা করবে
এরপ বিশ্রাম নেবে সে নেকড়ে:
নেকড়ে, তবে তুমি হত্যাকারী?
বাঘটি তার কোটের আস্তিনে লিখে রাখবে কিছু
এরপর ক্রাইম-ফাইল থেকে সে পালিয়ে যাবে স্মৃতি হয়ে
এবং পালিয়ে সে পুনরায় রূপ ধারণ করবে কোনো পাখির চঞ্চুর
এবং খুঁটে খুঁটে সে খাবে মারাজ ইবনে আমেরের যবের দানা।

কবিতাংশটি নেয়া হয়েছে দারভীশের উহিব্বুকা আও লা উহিব্বুকা () কাব্যগ্রন্থ থেকে। কবিতাটিতে *তারা*
আসবে () ক্রিয়াপদটি একাধিকবার এসেছে। ক্রিয়াপদটি ভবিষ্যতবাচক। কিন্তু এই *তারা* কারা? কবি কাদের বুঝিয়েছেন? *তারা* বলতে কবি ফিলিস্তিনের চলমান জুলুম ও নিপীড়ন পরিস্থিতি থেকে যারা মুক্তি দিবেন তাদের বুঝিয়েছেন। ম্যাসিয়ানিক ধারণায় যেমন একজন ব্যক্তিকে ত্রাণকর্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এখানে সেভাবে বিবৃত হয়নি। কবি এখানে ত্রাণকর্তা হিসেবে একাধিক মানুষের কল্পনা করেছেন। তবে কবিতাটিতে *তারা* মুখ্য নয়। মূলত এখানে নেকড়ে বাঘকে কল্পনা করা হয়েছে ত্রাণকর্তা হিসেবে। নেকড়ে– যাকে অসম সাহসী বীরের রূপক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে কবিতাটিতে। কবিতাটি কিঞ্চিত দীর্ঘ। যেখানে বস্তুত পুরো কবিতাজুড়ে নেকড়ের আখ্যান রচিত হয়েছে। তবে তাতে একটি ইঙ্গিত অনুমান করা যায়। যারা ইজরাইলের হামলায় শহীদ হয়েছেন, খুন হয়েছেন তারাই যেন আবার ফিরে আসবেন অসম্ভব শক্তি নিয়ে। জায়োনিস্ট হানাদারদের জুলুম অত্যাচার চিরতরে নির্মূল করতে যারা একদিন আবার আসবেন। এমন আসাই ব্যক্ত করেন কবি। কাসীদাতু বায়রুত () নামের একটি কবিতায় এমন দৃপ্ত উচ্চারণ আরো গভীর ও বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে। কবি বলেন,

ارفعوا عنِّي يديّ
ماذا ترى في الأفق؟
أفقاً آخراً
هل تعرف القتلى جميعاً؟
والذين سيُولدون....
سيولدون
تحت الشجرْ
وسيولدون
تحت المطرْ
وسيولدون
من الحجرْ

وسيُولدون
من الشظايا
يولدون
من المرايا
يولدون
من الزوايا
وسُيولدون
من الهزائم
يولدون
من الخواتم
يولدون
من البراعم
وسيولدون
من البداية
يولدون
من الحكاية
يولدون
بلا نهايةْ
وسيولدون , ويكبرون , ويُقتلون'
ويولدون , ويولدون ' ويولدون[719]

ঊর্ধ্বে তুলে ধরো আমার হাত
কি দেখতে পাও দিগন্তজুড়ে?
অন্য এক দিগন্ত
সব নিহতদের তুমি কি চিনতে পাও?
যাদের জন্ম হবে
এবং তাদের অচিরেই জন্ম হবে
বৃক্ষের নিচে
তাদের জন্ম হবে
বৃষ্টির নিচে
তাদের জন্ম হবে

[৭১৯]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, ২০০৫, পৃ. ৫১৮-৫২০।

পাথরের ভিতর থেকে
তাদের জন্ম হবে
বারুদ ও গোলার ভিতর
তাদের জন্ম হবে
আয়নার ভিতর থেকে
তাদের জন্ম হবে
বহু প্রান্ত থেকে
এবং শিগগির তাদের জন্ম হবে
পরাজয় থেকে
তাদের জন্ম হবে
নিঃশেষ থেকে
তাদের জন্ম হবে
ফুলের কুসুম থেকে
তাদের জন্ম হবে
শুরু থেকে
তাদের জন্ম হবে
গল্পের ভিতর থেকে
তাদের জন্ম হবে
অশেষ, অনন্ত
এবং তাদের জন্ম হবে, তারা বড়ো হবে এবং তারা হত্যা করবে
তাদের জন্ম হবে, তাদের জন্ম হবে এবং তাদের জন্ম হবে।

৬.১১: পুনরুদ্ধার ও ফিরিয়ে আনা

এবং একই সঙ্গে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানের ফলাফল ও প্রত্যয় আকারে পুনরুদ্ধার তৎপরতাও নিশ্চিত করতে হয়। পুনরুদ্ধার শব্দটি দারভীশ জিদারিয়্যাহতে 'استيعاد'(ইস্তীআদ) বা ফিরিয়ে আনা অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই ফিরিয়ে আনা বা পুনরুদ্ধার মানে মানুষের হাকীকতকে ফিরিয়ে আনা। মানবসত্ত্বার এ্যাসেন্স বা মর্মের অখন্ডত্ব মানুষের চিন্তা ও কর্মের ঐতিহাসিক ভূমিকার ফলে নানান সময়ে নানা অবস্থায় বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। ঐতিহাসিক নানান স্তর অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষকে যে বিকশিত স্তরে পৌঁছানোর কথা তা বারবার বাধাগ্রস্থ হয়েছে। পুনরুদ্ধার ও পুনর্পাঠের যুথবদ্ধ পদ্ধতিতে এ অবস্থাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। দারভীশ তার জিদারিয়্যাহতে কবিতার ভাব ও ভাষার জায়গায় এই প্রস্তাবনাই তুলে ধরেছেন। কিন্তু কবিতা থেকে এই পাঠটিও একটি উদ্ধারের বিষয়। পুনর্পাঠ ও পুনরুদ্ধার এই দুই নীতির উপর ভর করে দারভীশের প্রতিরোধ তত্ত্বের কাব্যিক উপস্থাপন ঘটে। দারভীশ মনে করেন মানুষ যেমন বহু ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী রাজনীতিতে বিভক্ত, তেমনি

যে সচতেন শ্রেণী এ রাজনীতির বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলছে, দেখা যাচ্ছে- তাদের প্রতিরোধ তৎপরতার দৃশ্যমান কাঠামোও খন্ড বিখন্ড কিংবা এর আল্টিমেইট ফলাফল একই পরিণতির দিকে গড়ায়। চিন্তা ও ধর্ম এক হতে পারেনি। ফলে দেখা যায় মানুষ আর এগোতে পারছে না। মানুষ বাস্তব ক্ষেত্রে সমাজের নানা সম্পর্কের জটিল বিন্যাস নিজেই গড়ে তুলে সব কিছুকে প্রান্তিক করে তোলছে। দ্বিখন্ডিত করে ফেলছে চেতনে বা অবচেতনে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দারভীশের কবিতার কাঠামোতে প্রতিরোধের কাব্য ব্যঞ্জনা তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি গ্রহণ করেছে ব্যাপকভাবে। এবং বলা যায় একটি পূর্ণ চিন্তা প্রতিরোধ রাজনীতিতে যুক্ত হয়। কারণ দারভীশের প্রতিরোধ একই সঙ্গে, একই মুহূর্তে সর্বক্ষেত্র থেকে প্রবল হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্ন করার কোনো সুযোগ নাই। ভেতর এবং বাহির, দেহ এবং মন, ভাব ও বস্তুকে আলাদা করে নয়। বরং দেহ ও মন একই ব্যাপার বলে সুসংহত রূপকে তার প্রতিরোধের প্রকাশ ঘটে। ফলে তার লড়াই সমানভাবে দেহ-মনের বিভাজন এবং বস্তুবাদ ও ভাববাদের বিরুদ্ধে। এবং যেকারণে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে বস্তুগত লড়াই সংগ্রাম থেকে আলাদা করার সুযোগও নাই এখানে। অতএব দারভীশের প্রতিরোধে নৈতিকভাবে যুদ্ধের প্রশ্ন আর অমীমাংসিত থাকছেনা। কিন্তু দারভীশের প্রতিরোধ ক্ষেত্র ব্যাপক। এ ব্যপকতার সামনে সবেচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে মৃত্যু। মৃত্যুর ভয় মানুষের আলাদাকৃত বস্ত ও ভাব বা নীতির জগতের মধ্যে একটা ভেদ তৈরি করে। অর্থাৎ আধুনিক ইতিহাসে বস্ত ও ভাবকে আলাদা করে তার কর্ম জগতের যে সকল সম্পর্ক ও যোগসূত্র রচনা করছে সেখানে মৃত্যুর ভয় তাকে নৈতিক চৈতন্য থেকেও আলাদা করে দেয়। ফলে নৈতিকতা বোধের বিলুপ্তি ঘটতে বাধ্য। তাই দারভীশের প্রতিরোধে মৃত্যুকে মোকাবেলা করা, মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাবার শক্তি অর্জন করাও অপরিহার্য। জিদারিয়্যাহতে এই অভিব্যক্তি ঘটেছে এইভাবে....

يَخْتَارُني الإيقاعُ, يَشْرَقُ بي
أنا رَجْعُ الكمان, ولستُ عازِفَهُ
أنا في حضرة الذكرى
صدى الأشياء تنطقُ بي
فأنطقُ...[৭২০]

আমাকে বেছে নেয়, আলোকিত সুর
আমিই স্থানের প্রত্যাবর্তন।
আমি নই তবে তার বেহালা বাদক
আমি থাকি শুধু স্মৃতির হাজিরানায় উদযাপনে
আমার সাথে কথা বলে বস্তুর প্রতিধ্বনি
অতএব আমিও কথা বলি...

[৭২০]. দারভীশ, মাহমুদ দারভীশ, *লা তা'তাজির আম্মা ফাআলতা*, ২০০৪, পৃ. ১৫।

وأَنا, سيحمِلُني الطريقُ
وسوف أَحملُهُ على كتفي
إلى أَنْ يستعيدَ الشيءُ صورتَهُ,
كما هِيَ,
واسمَهُ الأَصليَّ في ما بعد /[৭২১]

এবং আমি, অচিরেই আমাকে নিয়ে যাবে পথ
হয়ত আমিও আমার কাঁধে বহন করে নিয়ে যাবো
তাকে, যেখানে বস্তু যেমন ফিরিয়ে আনে তার স্বরূপ
এবং এরপর ফিরিয়ে আনে তার প্রকৃত নাম

তবে ফিলিস্তিনকে ঘিরে দারভীশের স্মৃতিচক্র কিভাবে রচিত হয়েছে? তার কৌশল ছিল বস্তুত অতীত এবং বর্তমানের মাঝে পরিভ্রমণ। অতীত এবং একইসাথে বর্তমানের ঘটনাবলীকে তিনি একটি জায়গায় এক করে তার সম্ভাবনা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যদিয়ে যেমন দারভীশ তার কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি ফিলিস্তিনের জাতীয় স্মৃতিও নির্মাণ করেন।[৭২২] জাতীয় স্মৃতি পুনর্গঠন ফিলিস্তিনীদের জন্য একটি বড়ধরনের ঘটনা। তদুপরি দারভীশের স্মৃতি সবথেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ইজরাইলের ধ্বংসযজ্ঞ, ভূমি হারানোর অভিঘাত থেকে। যেকারণে দারভীশের কবিতায় ধ্বংস থেকে উৎপত্তি স্মৃতির জন্য অনিবার্য তত্ত্ব হয়ে ওঠে। ফলে স্মৃতির সাথে নাকবার সম্পর্ক হয়ে ওঠে গভীর। নাকবা একটি পটভূমি স্মৃতির সাপেক্ষে। প্রাথমিকভাবে নাকবাকে ফিলিস্তিনের জাতীয় ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৭২৩] যেকারণে নাকবা ফিলিস্তিনের সামষ্টিক স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। তেমনি নাকবা ফিলিস্তিনের ন্যাশনাল মেমোরি হয়ে ওঠার কারণও বটে। নাকবার সাথে স্মৃতির সম্পর্ক যতোটা তার চেয়ে বেশি নস্টালজিয়ার। সাধারণ অর্থে নাকবার ঘটনার ঘটনা খুব আবেগের ফিলিস্তিনীদের কাছে। যেকারণে এর সাথে নস্টালজিক অনুষঙ্গ রয়ে গেছে। দেখা যায় নাকবাকে একটি গণসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করার দিক থেকে নস্টালজিয়ার বিপুল ভূমিকা রয়েছে। নস্টালজিয়ার ক্ষেত্রে সংবেদনশীল একটি বিষয় থাকলেও এর সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ।[৭২৪] নানান দিক থেকে এর প্ররোচনামূলক কাজ রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও কম নয়। কারণ অতীতকে একটি ঐতিহাসিক ভাষা দিতে সাহায্য করে নস্টালজিয়া। একইভাবে অতীতকে

[৭২১]. প্রাগুক্ত। পৃ. ২১।

[৭২২]. তওফীক মুহাম্মদ, আবদেল কারিম, *এন্ড উই আর নাও অব ক্লে এন্ড লাইট: হিস্ট্রি, মিথ, এন্ড দি প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যাশনাল মেমোরি ইন মাহমুদ দারভীশ'স পোয়েট্রি* (সেন্টার ফর প্রোমোটিং আইডিয়াজ, ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বিজনেস, হিউম্যানিটিজ, এন্ড টেকনোলজি, ভলিয়ম: ২, সংখ্যা: ৩, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৯৪-১০৩।

[৭২৩]. এইচ. সা'দি, আহমদ, ক্যাটাস্ট্রোফ, *মেমোরি এন্ড আইডেন্টিটি: আল-নাকবাহ অ্যাজ আ কম্পোনেন্ট অব প্যালেস্টাইনিয়ান আইডেন্টিটি* (ইজরাইল স্টাডিজ, ভলিয়ম: ৭, সংখ্যা: ২. জুলাই ২০০২), পৃ. ১৭৫-১৯৮।

[৭২৪]. স্যালাউল, আই.এ.এম. *নস্টালজিক মেমোরি এন্ড প্যালেস্টাইনিয়ান আইডেন্টিফিকেশন*—মূলগ্রন্থ *টেলিং মেমোরিস: আল-নাকবা ইন প্যালেস্টাইনিয়ান অ্যাক্সাইলিক ন্যারেটিভস*'র একটি অংশ (হল্যান্ড: হিউম্যানিটিজ, আমস্টারডাম ইউনিভার্সিটি, ২০০৯), পৃ. ১৫-২৫।

বর্তমানের সাথে সম্পর্কিত করে নস্টালজিয়া তার কাজ শেষ করেনা, বরং নতুন সম্ভাবনার দিকেও ইঙ্গিত করে।

৬.১৩: নির্বাসন

দারভীশের একদিকে স্মৃতির বিস্তার আরেকদিকে রয়েছে নির্বাসন পরিভ্রমণ। কিন্তু নির্বাসন দারভীশের জীবনকে অন্যতরো এক অভিজ্ঞানের মুখোমুখী করে তোলে। নির্বাসন দারভীশের কাছে নিছক একটি অবস্থার নাম নয়, বরং নির্বাসনই তাকে জাতিগত পরিচয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় বারবার। তাকে রাষ্ট্রহীনতার সংকট ক্রমাগত অভিঘাত দিতে থাকে। রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের তাৎপর্য তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নির্বাসনের কারণে। ইজরাইলের নিপীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা তাদের যাবতীয় উচ্ছেদ প্রক্রিয়া দারভীশের কাছে শুধু একটি সত্যের নাম– যেখানে তিনি নির্বাসিত জীবনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করেছেন নিজের পরিচয়ের জন্য। জাতিগত পরিচয় শুধু দৈব ঘটনা নয়, বরং দারভীশ পরিচয়কে একটি ঐতিহাসিকতার মধ্যদিয়ে দেখতে চেয়েছেন। নির্বাসিত জীবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা দারভীশের জন্য বড়ধরনের অবলম্বন হয়ে থাকবে। যেকারণে দারভীশ বলেন, *"Who Am I, Without Exile?*[725] নির্বাসন শুধু পরিচয়ের উপলক্ষ নয় নির্বাসন দারভীশকে প্রতিরোধের অন্যতরো উপায় হিসেবে অভিজ্ঞতা দিয়েছে। তার কবিতায়

৬.১৪: পুরাণ ও রূপকথা: মৃত্যুর মোকাবেলা কিংবা প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিত

পুরাণ বা রূপকথা দারভীশের কবিতার শরীরের সাথে খুব সহজভাবে মিশে আছে। তার কবিতা পাঠে আরোপিত কিংবা বিচ্ছিন্নতা বোধে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। বরং কবিতার উৎকর্ষ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে পুরাণের মধ্যদিয়ে। পুরাণের প্রকারভেদও একটি লক্ষণীয় বিষয়। তদুপরি পুরাণের ব্যবহার এবং তার তাৎপর্য নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা হতে পারে। তবে এখানে শুধু প্রতিরোধ সম্পর্কিত মিথের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে। যেহেতু ইতিহাস কিংবা স্মৃতি সম্পর্কিত আলোচনার অন্তর্গতবিদ্যা হিসেবে মিথের একটি বড় পরিসর রয়েছে– যা কোনো না কোনোভাবে প্রতিরোধ কিংবা ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব, আত্মমর্যাদা এবং ঐতিহাসিক ন্যায্যতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

স্মৃতি যেমন ফিলিস্তিনের অন্তরাত্মার গহিনে দীপ্যমান যার কেন্দ্রে রয়েছে ফিলিস্তিন-ইজরাইল সংঘাতের পটভূমি। অপরদিকে স্মৃতি অনেক সময় মনস্তাত্ত্বিকভাবে কাজ করার জন্য বিবিধ উপায় অনুসরণ করে। মিথ তার একটি। কারণ ফিলিস্তিনের যে প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে এবং তার ধারাবাহিকতায় যেখানে ছেদ ঘটে গেছে জায়োনিস্ট-আরব ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে সেখানে মিথ এবং স্মৃতি একটি

---

[৭২৫]. বাটলার, জুডিথ, *হোয়াট শ্যাল উই ডো উইথাওট অ্যাক্সাইল?: সাঈদ এন্ড মাহমুদ দারভীশ অ্যাড্রেস দ্য ফিউচার* ।

বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। সীমান্ত এবং ভূমি দখল নিয়ে যেসব সংঘাত এবং যুদ্ধের ঘটনা চলমান রয়েছে তার নির্ধারণের পেছনে স্মৃতি এবং মিথ গভীরভাবে সম্পর্কিত। যুদ্ধ-সংঘাতগুলো শুধু যে সবসময় প্রত্যক্ষভাবে সীমান্ত নিয়ে হয়েছে বা হয় তা নয়, বরং অনেক সময় তা ঘটে যায় বুদ্ধিজীবী এবং ইতিহাস বিশ্লেষকদের তৎপরতার মাধ্যমে। ফলে যুদ্ধটা কখনো কখনো ভাষায় ঘটে যায়– ঘটে যায় ইতিহাসের বয়ান নিয়ে। মাহমুদ দারভীশ মনে করেন, *সীমান্ত যুদ্ধ* শুধু আরব আর ইজরাইলের মধ্যকার দ্বন্দ্বই নয়, এটি খোদ যারা লিখেন, বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন তাদের নিজেদের ভিতরকার সংঘাতও।[৭২৬] এই সংঘর্ষ বিবদমান রয়েছে ইতিহাসের বয়ান নিয়ে– বয়ান এবং মিনিংয়ের সীমানা নিয়ে– যাকে মূলত স্মৃতি এবং ধর্মীয় পুরাণ দ্বারা নির্ধারণ করার চেষ্টা বলবৎ রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায়ের মাঝে। ফলে দেখা যায় মিথ একটি ইতিহাসগত ধারণা এই কারণে যে, এর সৃষ্টির পেছনে ঐতিহাসিক নানাবিধ ঘটনা রয়েছে। যেমন, ক্যানআন সম্প্রদায়ের বসবাস। ব্যাবিলনীয় অঞ্চলে নমরুদের () শাসন এবং তৎপরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনে নবী ইব্রাহীমের () আগমন এবং তার বংশধারার গোড়া পত্তন। যেখান থেকে বনি ইজরাইলের সূচনা। একইসাথে অপরধারার উন্মেষ ঘটে নবী ইউসুফের মাধ্যমে। ফলে যেখান থেকে দুটি ধর্মীয় ধারা বিভক্ত হয়ে যায়। একটি ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অপরটি ইসলাম। ফলে এখানে তিন ধরনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। একটি তৈরি হয় ইহুদি সম্প্রদায় থেকে– দীর্ঘ সময় ধরে যারা এখানে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অপরটি তৈরি হয়েছে খ্রিস্টান থেকে। যারা আরব-বাইজাইন্টাইন–ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেষে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল। তৃতীয় প্রেক্ষাপট তৈরি হয় ইসলাম থেকে। যারা পুরো আরব-আফ্রিকা-বাইজান্টাইন– হয়ে ইউরোপের কিছু অংশ (স্পেন) পর্যন্ত শাসন বিস্তার করে। কিন্তু সকল ধারার একটি উৎস ছিল বৃহত্তর ফিলিস্তিন। এবং এসব ঘটনার অন্তস্থিত কার্যকারণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র স্মৃতি ও মিথ। এবং প্রতিটি ধারারই রয়েছে নিজস্ব স্মৃতি এবং মিথ। এসব স্মৃতি এবং মিথ এক ধরনের অধিকার হিসেবে উপস্থিত হয়। নিজেদের বর্তমান বাস্তবতাকে ন্যায্যতা দেয়ার জন্য নিজ নিজ স্মৃতি ও মিথের মাধ্যমে যৌক্তিকতা দেয়ার চেষ্টা করে; যা দিয়ে তারা নিজেদের ঐতিহাসিক ন্যায্যতাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে।

ইহুদীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ফিলিস্তিন দখলের মধ্যদিয়ে ইজরাইলের যে প্রতিষ্ঠা তার পেছনে ছিল ইহুদি ধর্মীয় বিশ্বাস, সামষ্টিক স্মৃতি, ধর্মীয় পুরাণ ও রূপকথা। ইহুদীদের সামষ্টিক স্মৃতি তাদের মনস্তত্ত্ব গড়ে তুলেছে নিসন্দেহে। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মিথের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মিথ এবং সামষ্টিক স্মৃতি যদিও যুগপৎভাবে কাজ করে। Maurice Halbwachs মনে করেন, সুনির্দিষ্টভাবে একটি কালপর্বজুড়ে সামষ্টিক স্মৃতির মাধ্যমে কিছু রসদের জোগান সৃষ্টি হয়। যাতে একটি সম্মতি গড়ে ওঠে এবং তার ভিত্তিতে অতীতের একটি প্রকল্প– একটি পূর্ণ চিত্র নির্মাণ করতেই এই রসদগুলো কাজ করে যায়।[৭২৭] পৃথিবীজুড়ে ইহুদিদের বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতি ছিল শতাব্দির পর শতাব্দি। এ অবস্থায় তাদের পুরনো অতীত তাদের কাছে সুসংগঠিতভাবে সংরক্ষিত ছিলনা। কিন্তু একটি পর্যায়ে ইজরাইলের

---

[৭২৬]. মোহাবি, ইবরাহীম, *মেমোরি ফরগেটফুলনেস: অগাস্ট*, *বেইরুত*, ১৯৮২—মাহমুদ দারভীশের মূলগ্রন্থ () ذاكرة للنسيان এর অনুবাদ (), পৃ.।

[৭২৭]. হালবাখ, মাওরিস, *অন কালেক্টিভ মেমোরি*—সম্পাদনা: লুইস কজার (যুক্তরাষ্ট্র: শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩৭-৫০।

প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে তাদের সবকিছুর ন্যায্যতা দেয়ার সুযোগ তৈরি হয়। অন্যদিকে এ অবস্থায় ইজরাইল যেভাবে তাদের ঐতিহাসিক বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা চালিয়েছে তার প্রাথমিক ফলাফল ছিল ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষাসহ উপনিবেশিক কৌশল ও চাহিদা সম্পাদন করা। মিথ যখন শুধু ইতিহাসের বিষয় নয়, একইসাথে বরং ইতিহাসের সময়কে পেছন থেকে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য কাজ করে। এভাবে মিথের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ইতিহাসের একটি নতুন পর্যায়কে চিহ্নিত করা যায়।[৭২৮] কিন্তু ইজরাইল তার ইতিহাসের ধারাবাহিক বয়ান গড়ে তোলার মাধ্যমে তার বিদ্যমান কার্যক্রমের ন্যায্যতা যে প্রক্রিয়ায় কার্যকর করতে চায় তাতে বস্তুত ইতিহাসের ন্যায্যতার চেয়ে বরং তার উপনিবেশিক ন্যায্যতার ধারণা বেশি উচ্চারিত হয়েছে। কারণ ইজরাইল তার পুরনো ইতিহাসকে যে প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক করে তুলতে চেয়েছে প্রকারান্তরে তা তার উপনিবেশিক মনোবাসনাকে আরো তীব্রতরো করে তুলেছে। ফলে তার মিথ কিংবা ইতিহাস চর্চা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের বিপরীতমুখী রূপ নিতে থাকে ক্রমাগত। কাজে শেষপর্যন্ত খোদ ইতিহাস কিংবা মিথ ফিলিস্তিনের জন্য প্রতিরোধের একটি উপায় হয়ে ওঠে।

মিথের একটি ভূমিকা থাকে রূপকের মতো। মানে মিথের একটি রূপকীয় এবং প্রতীকী চরিত্র রয়েছে। দারভীশের কবিতায় মিথের মিনিং বস্তুত রূপকের ভূমিকায় প্রকাশিত। কিংবা মিথের যে অর্থ প্রথাগত কবি তার বিপরীতে গড়ে তুলেছেন মিথের ভূমিকা। কবিতায় মিথের ব্যবহার যেকারণে আলাদা কোনো বস্তুমাত্র নয়। কবিতারই একটি অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ নন্দনতাত্ত্বিক ব্যবহার থাকলেও মিথের কাজ কার্যত চিহ্ন () ও ভাষাতাত্ত্বিক। যেকারণে মিথ নতুন অর্থোৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি বিশেষ রূপ থেকে অর্থের রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা তৈরি করা যায় মিথের মাধ্যমে। সৃষ্টিগতভাবেই স্থির কোনো অর্থের মধ্যে মিথের চর্চা হয়না। বিশেষ একটি অর্থে সীমাবদ্ধ রাখা যায়না সবসময়। মিথ প্রায়ই যেকারণে ভাষা মানে অর্থের ডাকাতি করে (myth is always a language-robbery[৭২৯])। অর্থাৎ মিথ একধরনের ভাষাতাত্ত্বিক ফাঁদ যা দিয়ে অন্যকোনো অর্থ শিকার করা যায়। রোলাঁ বার্থ মিথের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেন। বার্থ মনে করেন, যেকোনো মিনিং এর দ্বিতীয় ব্যবস্থা ও প্রকল্প গড়ে তুলতে মিথের কার্যকর শক্তি। তবে দারভীশের কবিতায় ইতিহাস এবং মিথ তার প্রথাগত কাঠামোর ভিতর থাকতে পারেনি। দারভীশ তা থেকে মুক্ত করে নিয়েছেন তার কবিতা। কারণ তাকে জায়োনিস্ট ইতিহাস চর্চার বিপরীতে প্রতিরোধ গড়ে তুরতে হবে। যেকারণে দারভীশকে একধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্বিগ্নতার মধ্যে যেতে হয়েছিল। সত্তরের দশকের পর থেকে এ অবস্থার এক ধরনের রূপান্তর ঘটে। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইজরাইলের ইতিহাস চর্চা ফিলিস্তিনের জন্য খুবই সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। ফলে দেখা যায় দারভীশ তার মার্ক্সীয় মতাদর্শিক লাইন থেকে তার সাহিত্য প্রকল্পকে কিছুটা সরিয়ে আনেন। সেসময় কম্যুনিস্ট পাটি ছেড়ে রাজনৈতিকভাবে জাতীয় চৈতন্য গড়ে তুলতে তাকে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। এক পর্যায়ে **১৯৮৯** সালে দারভীশ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার

[৭২৮]. লি গফ, জ্যাক, *হিস্ট্রি এন্ড মেমোরি* (নিউ ইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৩৫।
[৭২৯]. বার্থিস, রোলাঁ, *মাইথোলোজিস* (নিউ ইয়র্ক: দি নুনডেই প্রেস, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ১৩১।

ঘোষণাপত্রও রচনা করেন। কিন্তু অসলো চুক্তির মধ্যদিয়ে দারভীশের সামগ্রিক স্মৃতি বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে। যে ঘটনার ফলে ফিলিস্তিনের স্বাভাবিক ইতিহাসের মাঝে বড় ধরনের ছেদ ঘটে যায়।[৭৩০]

বাটারফ্লাই ইফেক্ট

পুরাণ, রূপকথা বা মিথ কবিতার একটি শরীরীয় অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে যখন তখন তাতে নতুন কোনো অর্থের বাস্তবতা সৃষ্টি করতে পারে। দারভীশের কবিতায় পুরাণ, রূপকথা কিংবা মিথ এমনভাবেই মিশে আছে– যা বিচিত্র অর্থ ও বার্তা সৃষ্টি করতে সক্ষম। সেকারণে দারভীশের কবিতায় মিথের বিশ্লেষণ বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে তুলে ধরা যায়। দারভীশের কবিতায় প্রাচীন আরবীয় পুরাণ, পারস্য পুরাণ, ব্যাবিলনীয়-সুমিরীয় সভ্যতার পুরাণ, ইহুদী পুরাণ, খ্রিস্টীয় পুরাণ, গ্রিক পুরাণ এবং ইসলামি সভ্যতার বিচিত্র পুরাণের উল্লেখসহ বিভিন্ন রূপকথা ও মিথের উপস্থিতি রয়েছে। এসব পুরাণ নানান প্রসঙ্গে এসেছে।[৭৩১] এছাড়া মিথের প্রতিরোধগত একটি দিক এবং একটি ক্রিয়া আছে। দারভীশের কবিতায় এ বিষয়টি খুব গভীরভাবে উঠে এসেছে। তার একটি গ্রন্থের শিরোনাম থেকে মিথের প্রতি তার কি পরিমাণ আকর্ষণ ছিল তা অনুধাবন করা যায়। *আছার আল ফারাশাহ*—দারভীশের একটি কাব্যগ্রন্থ। বইটির প্রচ্ছদে যুক্ত শিরোনামের নিচে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখা রয়েছে 'ইয়াওমিয়্যাত'। দিনলিপি হিসেবে কবি নিজেই বইটির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রচনাকাল ধরা হয়েছে ২০০৬ এর গ্রীস্ম থেকে ২০০৭ এর গ্রীস্ম। প্রায় তিনশ' পৃষ্ঠার এই বইটি বস্তুত পুরোপুরি কাব্যিক কাঠামো অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। যাইহোক, বইটির শিরোনাম *আছার আল ফারাশাহ*– প্রবাদের মতো শোনালেও মূলত একটি মিথ। মূল টার্মটি ইংরেজি ভাষার butterfly's effect। যেটি প্রথম শনাক্ত করেন Edward Lorenz।[৭৩২] এর বাংলা করা যথেষ্ট কঠিন। বাংলায় ভাষান্তর করলে এর বিশেষ কোনো অর্থ দাঁড়ায়না। এর মানে, কথাটির আড়ালেই রয়েছে এর প্রকৃত অর্থ, যা শুধু আক্ষরিক অনুবাদ করে এর সঠিক অর্থ প্রকাশ করা যায়না। বাটারফ্লাই ইফেক্ট বলতে বোঝায় খুব ছোট্ট কিছু। হতে পারে তা কোনো বিষয় বা ঘটনা। তবে তা এতোটাই সামান্য যে, চোখেও পড়েনা। কিন্তু যতোই তা সামান্য হোক না কেন, তার ফলাফল বিশাল এবং অনেক গভীর। এর প্রভাব কতোটা স্থায়ী এবং শক্তিশালী তা এভাবে বোঝা যেতে পারে। যেমন কোনো এক জায়গায় বাটারফ্লাই বা প্রজাপতির ডানা ঝাপটানোর ঘটনা ঘটেছে। ঠিক এ কারণেই বিপরীত কোনো একটি জায়গায় ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে পারে। বাটারফ্লাই ইফেক্ট কতোটা ব্যাপক এবং গভীর তা বোঝানোর জন্য এমন উদাহরণ। দারভীশের কথায় আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে...

---

৭৩০. তওফীক মুহাম্মদ, আবদেল কারিম, *এন্ড উই আর নাও অব ক্লে এন্ড লাইট: হিস্ট্রি, মিথ, এন্ড দি প্যালেস্টাইনিয়ান ন্যাশনাল মেমোরি ইন মাহমুদ দারভীশ'স পোয়েট্রি*, ২০১২, পৃ. ৯৬।

৭৩১. আল সুলতান, ড. মুহাম্মদ ফুয়াদ, *আল রুমুজ আল তারীখিয়্যাহ ওয়া আল দীনিয়্যাহ ওয়া আল উসতুরিয়্যাহ ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ* (মাজাল্লাহ জামেয়া আল আকছা, ভলিয়ম: ১৪, সংখ্যা: ১, জানুয়ারি ২০১০), পৃ. ২-৩৬।

৭৩২. এম. জে. হালাবি, আয়া, *ট্রান্সলেশন এন্ড দি ইন্টারটেক্সচুয়াল স্পেস: দ্য ট্রান্সলেশন অব রেলিজিয়াস, হিস্ট্রিক্যাল এন্ড মিথিক্যাল অ্যালুশনস ইন দ্য পোয়েট্রি অব মাহমুদ দারভীশ* (নাবলুস: ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিকস এন্ড ট্রান্সলেশন, আল নাজাহ ইউনিভার্সিটি, ২০১৬), পৃ. ৪৪।

أَثَر الفراشة
أَثَر الفراشة لا يُرَى
أَثَر الفراشة لا يزولُ[733]

বাটারফ্লাই ইফেক্ট
দেখা যায়না বাটারফ্লাই ইফেক্ট
শেষ হয়না কখনো বাটারফ্লাই ইফেক্ট

কিন্তু দারভীশ বাটারফ্লাই ইফেক্ট বলে ঠিক কি বুঝিয়েছেন বা কাকে বুঝিয়েছেন? ঠিক কি বুঝিয়েছেন তার অর্থকে কোনো এক জায়গায় স্থির করা বা সীমিত করা মুশকিল যদিও। যেহেতু বিভিন্ন সম্ভাবনা এখানে কাজ করে। কিন্তু দারভীশ যে পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যদিয়ে নিজেকে গড়ে তুলেছেন, তাতে বোঝা যায় তিনি ফিলিস্তিনকে বুঝিয়েছেন। ইজরাইলের বিপরীতে– যায়োনিজমের বিপরীতে যে শক্তি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে যুগের পর যুগ সে শক্তি ইজরাইলের চেয়ে কতোটা সামান্য– তুচ্ছ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শক্তি তার লড়াই টিকিয়ে রেখেছে। এটা ইজরাইলের জন্য সবথেকে বড় সংকট। দারভীশ বলতে চেয়েছেন ফিলিস্তিন যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেন তার ইফেক্ট বাটারফ্লাই ইফেক্ট। যাকে নিঃশেষ করে দেয়া সম্ভব নয়।

আনাত
পৌরাণিক শব্দবন্ধের ভিতর বিবিধ সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। কখনো তাতে এমনভাবে পৌরাণিক কাহিনীর উপস্থাপন ঘটে যাতে দেবতা, ঈশ্বর, নায়কচরিত্র, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি কিংবা ভৌতিক উপাখ্যানের প্রকাশ ঘটে। পৌরাণিক কাহিনী উপস্থাপনের ভঙ্গি যেমন নাটকে হতে পারে তেমনি কবিতায়ও হতে পারে। তবে দুইয়ের উপস্থাপনের আঙ্গিকে ভিন্নতা রয়েছে। আঙ্গিক যেমনই হোক ধর্মীয় প্রসঙ্গ, নীতিকথা, বিশেষ বার্তা-উপদেশ, দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা ভাষাগত উৎকর্ষের ইঙ্গিত বহন করে পুরাণ।[734]

ُ

আনাত বস্তুত প্রাচীন শামদেশীয় পৌরাণিক এক দেবীর নাম। ভালোবাসা, প্রেম, যুদ্ধ-সংগ্রামের দেবী। একইসাথে আনাত পানি ও উর্বরতার দেবীরূপে যার গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ রয়েছে আরবের আদি লোককাহিনীতে।[৭৩৫] আনাতের উপস্থিতির মধ্যদিয়ে কবি ফিলিস্তিনের সভ্যতা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির

[৭৩৩]. দারভীশ, মাহমুদ, *আছার আল ফারাশাহ*, ২০০৮, পৃ.। ১৩১
[৭৩৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ*, ২০০০, পৃ. ২০।
[৭৩৫]. নোওর আল সালীম, মোহাম্মদ, *দ্য ট্রান্সলেশন অব মেটাফোর ফ্রম অ্যারাবিক টু ইংলিশ ইন সিলেক্টেড পোয়েমস অব মাহমুদ দারভীশ উইথ এ ফোকাস অন লিঙ্গুইস্টিক ইস্যু* (ইউকে: স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজিস, কালচারস এন্ড সোসাইটিস, ইউনিভার্সিটি অব লিডস, অগাস্ট ২০১৪), পৃ. ১৩৭-১৩৮, ১৯৪-১৯৫।

আদি শেকড়ের দিকে নজর ফেরাতে চেষ্টা করেন। উর্বরপ্রাণ, প্রাচুর্যভরা, সমৃদ্ধ এক সভ্যতার প্রতীক আনাত। একইসাথে আনাত যুদ্ধ ও প্রতিরোধের প্রতীক। আনাতের সাহস ও প্রাণশক্তি মানুষের মনে এতো গভীরভাবে জায়গা করে নিয়েছিল যে, তার নাম আরবের রূপকথা ও লোকগাথায় হাজার বছর ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে।

আনাতের প্রতি দারভীশের ভালোবাসার কারণ নিছক শিল্পতাত্ত্বিক বা কাব্যিক মাত্র নয়, বরং যায়োনিজমের বিকৃত ইতিহাস চর্চার বিপরীতে একদিকে ফিলিস্তিনের সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ন্যায্যতা বিধান করা। দ্বিতীয়ত ইজরাইলের বিবদমান দখলদারিত্ব ও হানাদারির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনীদের ভিতর লড়াকু ও প্রতিরোধমুখর মনস্তত্ত্ব গড়ে তোলা।

দারভীশের কবিতায় অসংখ্য পুরাণের ব্যবহার রয়েছে। আনকা তার অন্যতম। এখানে আনকা এসেছে ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের রূপক হিসেবে। আনকা– এক আরব পৌরাণিক পাখির নাম। ধারণা করা হয়, বহু বছরে একবার স্ত্রীলিঙ্গের এই পাখির জন্ম হয়। সূর্যোদয়ের সময় এবং সূর্যোদয়ের স্থানে এর জন্ম হয়। দীর্ঘ জীবন লাভ করে এই পাখি। পাখিটির অপর নাম العَنْقَاء المُغْرِب বলা হয়। এখানে মাগরিব মানে মরক্কো বা আফ্রিকান আরব এমন কিছু বোঝানো হয়না। মাগরিব শব্দটির অর্থ এখানে গরিব বা আগন্তুক, অচেনা, ভিনদেশী, দূরদেশের, দূরের, অজানা ও অজ্ঞাত, রহস্যময় ইত্যাদি। আনকা শব্দটি এসেছে থেকে। যার মূল অর্থ ঘাড় বা গলা, গ্রীবা। যেহেতু পাখিটির গলা এবং গ্রীবাদেশ খুব লম্বাকৃতির। তাই এ নামে নামকরণ বলে ধারণা করা হয়। অনেকে এ পাখির তুলনা করেন গ্রিক পুরাণের ফিনিক্স পাখির সাথে। যদিও দুইয়ের মাঝে বিশেষ পার্থক্য আছে। তবে পারস্য লোককাহিনীর সিমুরগ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এ পাখিকে।[৭৩৬] যাইহোক, এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এই পাখি লম্বা সময় ধরে বেঁচে থাকলেও পাখিটির মধ্যে বিশেষ সংকট রয়েছে। অপূর্ণতা রয়েছে। যেকারণে পূর্ণতার জন্য পাখিটি আগুনে পুড়ে মরে যায়। কিন্তু আবার সে জন্মলাভ করে। আবার সে মরে আবার জন্ম গ্রহন করে। পূর্ণতার জন্য তার রয়েছে অসম্ভব মানসিক শক্তি। অপূরন্ত লড়াই-সংগ্রাম-সাধনার অদম্য ইচ্ছা। যেকারণে পাখিটি মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে নিজের সাধনা অব্যাহত রাখে। ফলে এই চক্রাকার জন্ম-মৃত্যু বস্তুত তার লড়াই সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে দারভীশের কবিতায়। যার মাধ্যমে কবি ফিলিস্তিনীদের জীবন সংগ্রামের অদম্য আত্মিক শক্তিকে এই পাখির সাথে তুলনার মাধ্যমে পাঠ করতে চেয়েছেন।[৭৩৭] দারভীশে তার কবিতায় বলেন, সারহানা ইয়াশরিবু আল কাহওয়াহ....

---

[৭৩৬]. আব্দ আল রাউফ আল জাবার, খালিদ, *রামজ আল আনকা ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ* (মাজাল্লাতু ইত্তিহাদ আল জামিয়াত আল আরাবিয়্যাহ লি আল আদাব, ভলিয়মঃ ৯, সংখ্যাঃ ২, ২০১২), পৃ. ১১৩৭-১১৮৪। আইজ্যাক, করনেলিয়াস, *দ্য ম্যানি ফেসেস অব দ্য গডেজ: দি আইকোনোগ্রাফি অব দ্য সিরিও-প্যালেস্টাইনিয়ান গডেজ আনাত, অ্যাস্টার্ট, কেদিশেট এন্ড আসিরাহ সি. ১৫০০-১০০০ বিসিই* (সুইজারল্যান্ডঃ একাডেমিক প্রেস ফ্রিবার্গ, ২০০৪), পৃ. ১-৩০, ৮০, ৮৫, ৯২।

[৭৩৭]. ঈসা, এ. ডি. মুহাম্মদ ও গিদা ইউনুস, *আল রামজ আল উসতুরি ওয়া ফাননিয়্যাতিহি ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ* (সিরিয়াঃ জার্নাল অব হামা ইউনিভার্সিটি, ভলিয়মঃ ৪, সংখ্যাঃ ১২, ২০২১), পৃ. ৫-৬।

كل يوم نموت ،و تحترق الخطوات و تولد عنقاء
ناقصة ثم نحيا لنُقتل ثانيةً
يا بلادي، نجيئك أسرى و قتلى.[৭৩৮]

প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করি আমরা, এবং পুড়ে দগ্ধ হয় পদক্ষেপগুলো
তবু জন্ম হয় আনকার খণ্ডিত, অতপর আমরা বেঁচে ওঠি
আরেকবার যেন হত্যা করি, হে মাতৃভূমি, আমরা তোমার কাছে
আসি বন্দি হয়ে, খুন হয়ে

দারভীশ আনকার আশ্রয়ে ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়ের প্রাগৈতিহাসিক সেকড় শনাক্ত করতে চেয়েছেন। কারণ খ্রিস্টপূর্ব প্রায় দুই হাজার বছর আগের সময়ের শামদেশের ধর্ম-সংস্কৃতি ও জীবনাচারে দেবী আনাতকে গভীরভাবে পূজা করা হতো। ক্ষমতাপরায়ণ শ্রেণির বিপরীতে সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি ছিল দেবীর আনাতের প্রবল উপস্থিতি। কারণ আনাতের অসামান্য আত্মিক শক্তি মানুষকে ঘনিষ্টভাবে আকর্ষণ করতো। মৃত্যুঞ্জয়ী এক আত্মশক্তির অধিকারী এ দেবী মানুষের হৃদয়ে অনন্য স্থান করে নিয়েছিল। কবি আনাতকে তাই তার কবিতায় এক রূপক হিসেবে গ্রহণ করেন। আনাত তাই কখনো অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তিরূপে, কখনো আনাত কবির সেল্ফরূপে, কখনো আনাত স্বয়ং তার মাতৃভূমিরূপে হাজির হন। বস্তুত ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিকতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী পরিবর্তশীলতার মধ্যে আনাতকে কায়েম করেন এক সর্বজনীন রূপক হিসেবে।

আনকার সমতুল্যে পাখিপুরাণ ফিনিক্সও এসেছে দারভীশের কবিতায়। গ্রিক পুরাণে ফিনিক্স পাখির বিস্তার হলেও তার মূল রয়েছে মিশরীয় ও ফিনিশীয় সভ্যতায়। মৃত্যুকে জয় করা এক দৃষ্টান্ত ফিনিক্স। বস্তুত অমরত্বের প্রতীক হিসেবে তার বিপুল গুরুত্ব রয়েছে শিল্পসাহিত্যে। বিশ্বের প্রায় সব ভাষা ও সাহিত্যে ফিনিক্স পাখিপুরাণের প্রতীকী চর্চার অপরিসীম সমাদর রয়েছে। মানুষকে এবং মানুষের জীবনবোধ ও তার শিল্পরুচি, জীবনদর্শনকে বিভিন্ন দিক থেকে অর্থময় করে তুলেছে ফিনিক্স পাখিপুরাণ। ইজরাইলের বিপরীতে যে লড়াকু এবং প্রতিরোধ অন্তপ্রাণ ফিলিস্তিন সক্রিয় রয়েছে তার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এই পাখিপুরাণের আখ্যান। গত প্রায় ৭৫ বছরের সংগ্রামরত ফিলিস্তিনীদের জীবনপ্রবাহকে বুঝতে ফিনিক্স পাখির দৃষ্টান্ত যথেষ্ট কার্যকর। দারভীশ বলেন,

كانتِ الحربُ انتهتْ .
ورمادُ قريتنا اختفى بسحابةٍ سوداءَ لم
يُولَدْ عليها طائرُ الفينيقِ بَعْدُ ، كما
تَوَقَّعْنا ، ولم تَنْشَفْ دماءُ الليل في
قُمْصانِ موتانا . ولم تطلع نباتاتٌ ، كما

৭৩৮. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, ২০০৫, পৃ. ১০৮-১০৯।

يَتَوَقَّعُ النسيانُ ، في خُوَذ الجنودِ
هَلِّلويا
هَلِّلويا،
كلُّ شيءٍ سوف يبدأ من جديدِ .[739]

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।
তবু আমাদের গ্রামের ছাইভস্মগুলো কালো মেঘে
আড়াল হয়ে গেছে। এরপর কখনো ওখানে জন্ম হয়নি
ফিনিক্স পাখির। আমরা যেমন আশা করেছিলাম।
আমাদের মৃতদের জামাকাপড়ে লাগা রাতের রক্তগুলো
শুকায়ে যায়নি এখনো। উদ্ভেদ করে উঠেনি কোনো উদ্ভিদ
বিস্মৃতি যেমনটি আশা করে। সৈনিকের হেলমেটের ভিতর
হায় হাল্লিলুজা
হায় ঈশ্বর

প্রতিটি বস্তুর অচিরেই উত্থান হবে নতুন করে

কবি তার পাখিপুরাণের প্রতীকী বয়ানের মাধ্যমে নতুন এক সময়ের সূচনার কথাও ইঙ্গিত করেছেন। *সবকিছু হয়তো আবার শুরু হবে নতুন করে*– কবির এমন আহবান আবেদনময় হয়ে উঠেছে পুরো কবিতাজুড়ে। ভূমধ্যসাগর, শামদেশ, মেসোপটিমিয়ায় কবি যে তার অস্তিত্বের ঐতিহাসিকতা দেখিয়ে দিয়েছেন তার সাথেই ফিলিস্তিনের নিগড় বেঁধেছেন। অতীতের কাছে ফিরে যাওয়া নয়, বরং দারভীশ ইতিহাসের ভিতর দিয়ে তার অস্তিত্বের পরম্পরা, ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি, রাজনৈতিকতা এবং তার জীবন্ত সত্তার উন্মোচন করেছেন। যে সত্তাকে নিঃশেষ করে দেয়া যায়না বরং নিঃশেষ করে দিলেও– মানুষের অস্তিত্ব এবং তার ভূমি, তার ইতিহাস যে অখণ্ড এবং তা এক পরমাণুময় সত্য– তাকে চিরতরে শেষ করে দেয়া যায়না। তার আবার জন্ম হবেই। কোনো না কোনো রূপে তার প্রত্যাবর্তন হবেই।

আগুনপাখি

দারভীশের কবিতায় আসা পাখিপুরাণের অপর এক রূপক আগুনপাখি। আগুনপাখি কবির কবিতায় এক অপূরন্ত প্রেরণা হয়ে এসেছে। আগুনে ভস্মিভূত হয়েও আবার তার পুনরুত্থান ঘটে। আবার তার জন্ম হয়। মূলত আনকা, ফিনিক্স এবং আগুনপাখি একই সমতলে সমার্থক হয়ে এসেছে তার কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন নামে। কবি বলেন,

سأصير يوماً طائراً ، وأَسُلُّ من عَدَمي
وجودي . كُلَّما احتَرقَ الجناحانِ

৭৩৯. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদা*, ১৯৯৫, পৃ. ৪৬।

اقتربتُ من الحقيقةِ ، وانبعثتُ من
الرمادِ . أَنا حوارُ الحالمينِ ، عَزَفْتُ
عن جَسَدي وعن نفسي لأُكْمِلَ
رحلتي الأولى إلى المعنى ، فأَحْرَقَني
وغاب . أَنا الغيابُ . أَنا السماويُّ
الطريدُ.[৯৪০]

একদিন আমি পাখি হবো, ছিনিয়ে নেবো
আমার অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব। ডানা দুটো
যতোই পোড়ে ততোই আমি কাছাকাছি হই
সত্যের। যেন আমি উত্থিত হই ছাইভস্ম থেকে।
যেন আমি স্বপ্নদেখা মানুষের সংলাপ। যেন
পূর্ণ হয় অর্থের অভিমুখে আমার প্রথম যাত্রা–
তাই আমি বিযুক্ত করে রেখেছি আমার দেহ
ও আত্ম। অতঃপর তা আমাকে পুড়িয়ে
নিঃশেষ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমিই সেই
অদৃশ্য–গায়েব। আমিই আসমানী
বেহেশত-তাড়িত পলায়নপর।

স্পষ্টত এখানে কবি মৃত্যুকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছেন। যেখানে কবি এক পাখিপুরাণের আশ্রয় নিয়ে তার নতুনতরো অর্থের সন্ধানে বের হয়েছেন। এই সন্ধান এক নতুন অর্থময়তার অভিমুখে তাকে নিয়ে যায়। এক পুরাকাহিনীর প্রতীকী অনুষঙ্গ ধরে কবি এক জীবনবাদী বয়ানের প্রারম্ভিকা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। ইজরাইল এবং যায়োনিজমের নিপীড়ক মতাদর্শের মৃত্যুবৎ পরিস্থিতির বিপরীতে শুধু লড়াই-প্রতিরোধ ছাড়া যেন কোনো বিকল্প নেই। এই লড়াই আর প্রতিরোধের মধ্যেই কখনো নিঃশেষ হয়ে যেতে হয়, কাউকে না কাউকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় কিন্তু আবার তাকে উজ্জীবিত হতে হয়। জেগে উঠতে হয়। কখনো নাই হয়ে হয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই নাই হওয়া যাওয়া থেকেই আবার আছেময় হতে হয়। নাস্তি থেকে আবার আস্তিতে ফিরে আসতে হয়। এক ধ্বংসাবশেষ থেকে আবার তাকে নতুন করে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু এখান থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনো পথ নেই–সুযোগ নেই। একটি মাত্র পথ নিজেদের নতুন পন্থা–নতুন অভিযাত্রা ঠিক করে দিতে পারে আর তা হলো ক্রমাগত এবং অব্যাহত লড়াই এবং প্রতিরোধ। আগুনের পাখি নামে এক পাখিপুরাণের প্রতীকী উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে কবি ফিলিস্তিনী জনগোষ্ঠীকে এবং মনুষ্য সম্প্রদায়কে আশান্বিত করার এমনি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। উপরে তিন ধরনের পাখিপুরাণের উপস্থাপন থেকে মৃত্যু সম্পর্কিত এমন ধারণা পাওয়া যায়।

[৯৪০]. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ*, ২০০০, পৃ. ৩।

জিলজামেশ

শব্দটির বানান আরবী ভাষায় এভাবেই উচ্চারিত। কিন্তু বানানরীতিতে নানাভেদ আছে। ইংরেজি অনুকরণে গিলগামেশ শব্দরূপও প্রচলিত। গ্রিক পুরাণে যার রূপান্তর ঘটে *বিলগামেশ* হিসেবে। তবে ইংরেজির ব্যবহার অতিসাধারণ হয়ে যাওয়ায় গিলগামেশ'র ব্যবহার সবথেকে বেশি। আরবী অনুকরণে এখানে *জিলজামেশ* বানানরূপ অনুসরণ করা হয়েছে। জিলজামেশ এক পৌরাণিক মহাকাব্যের প্রধান নায়ক চরিত্র। বস্তুত এটি মেসোপটেমীয় সভ্যতার আক্কাদীয় ভাষায় রচিত পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য। এছাড়া প্রাচীন সুমিরীয় এবং আশুরীয় সভ্যতায় চলিত পুরাকাহিনীতে জিলজামেশের ব্যবহার খুবই সমৃদ্ধ। মেসোপটিমীয়, ব্যাবিলনীয়, সুমিরিয়, আশুরীয় এবং আরামীয় সভ্যতার সীমানা ছাড়িয়ে জিলজামেশর মহাকাব্যিক চর্চা ও সংরক্ষণ গ্রিক-রোমান সভ্যতা ও ইউরোপে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। ধারণা করা হয়, ঐতিহাসিকভাবে জিলজামেশ খিস্টপূর্ণ প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে সুমিরীয় অঞ্চলের উরুক নামক ভূখণ্ডে রাজত্ব করতেন। ক্রমে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে। কথিত আছে, তিনি দেবতাদের সহযোগিতা সমর্থন নিয়ে শক্তিশালী মহাবীরে পরিণত হন। তার দেহের দুই তৃতীয়াংশ ছিল ঐশ্বরিক দেবতাময়। আর এক তৃতীয়াংশ ছিল মনুষ্যজাত। যেকারণে ধারণা করা হতো তার শক্তি-ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। তার মৃত্যু হতে পারেনা। অমরত্ব তার সত্তাগত। কথিত এই মহাপরাক্রমশালী ক্ষমতাধর জিলজামেশ হিংস্র জন্তুদের সাথে লড়াই করে পরাস্ত করতে সক্ষম ছিলেন। মৃত্যু-জরা-ভয়কে সবসময় তিনি তাড়িয়ে বেড়াতেন। একদা তাকে এক ভয়ানক যুদ্ধে প্ররোচিত করা হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে জয়ী হলে তাকে এক অমরত্বের বীজ দান করা হবে। যুদ্ধে জয়ী হলে অমরত্বের বীজ ভক্ষণ করে জিলজামেশ ভয়ানক শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তার ক্ষমতা সর্ববিস্তারী হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে বনজঙ্গলসহ পুরো মেসোপটিমিয়ায় তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এতো প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়ার পরও জিলজামেশ ছিলেন নিঃসঙ্গ। একসময় তার নিসঙ্গতা কেটে যায়। দেবতাদের ইশারায় এক মল্লযুদ্ধে হারানোর মাধ্যমে আনকিদো নামের এক সাহসী যুবকের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আনকিদোকে নিয়ে বহু অভিযানে বের হয়ে নতুন নতুন বহু অঞ্চল করায়ত্ব করতে সক্ষম হন জিলজামেশ। এরপর একসময় তাদের সাথে সুমিরীয় এক নারীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। জিলজামেশের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন সেই নারী- যিনি সুমিরীয় প্রেমের দেবী ইশতা। কিন্তু জিলজামেশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ইশতার প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। রাগান্বিত হয়ে ইশতার স্বর্গীয় ষাঁড় লেলিয়ে দেন জিলজামেশের বিরুদ্ধে। জিলজামেশ ষাড়কে বধ করেন। ইশতার তাতে শোকে ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু স্বর্গীয় ষাড় হত্যা করায় দেবতারা ক্ষুব্ধ হন এবং অভিসম্পাত দেন জিলজামেশ এবং তার বন্ধু আনকিদোর ওপর। কিন্তু আনকিদো পুরোপুরি মনুষ্যপদবাচ্য হওয়ায় শেষাবধি তাকেই দেবতাদের মরণসাজা ভোগ করতে হয়। জিলজামেশ অনেক চেষ্টা তদবির করলেন প্রিয়তম বন্ধুকে বাঁচাতে। শেষপর্যন্ত তাকে মৃত্যুর চিরায়ত নিয়ম মেনে নিতে হয়েছিল। বন্ধুর এমন মরণ জিলজামেশ সহ্য করতে পারলেননা। তার অভিপ্রায় হলো অমরত্বের যে বীজ তিনি পান করেছিলেন তা উগরে দিয়ে মৃত্যুসুধা পান করে বন্ধুর সাথে মিলিত হয়ে অমর জীবনের খোঁজে বের

হবেন। কিন্তু দেবতাদের সতর্কতায় তাকে মৃত্যুর নির্ধারিত ক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।[৭৪১] দারভীশ বলেন,

كم من الوقت .
انقضى منذ اكتشفنا التوأمين : الوقتَ
والموتَ الطبيعيَّ المُرَادِفَ للحياة ؟
ولم نزل نحيا كأَنَّ الموتَ يُخطئنا ،
فنحن القادرين على التذكُّر قادرون
على التحرُّر ، سائرون على خُطى
جلجامشَ الخضراءِ من زَمَنٍ إلى زَمَنٍ ... /[742]

যমজ খুঁজতে খুঁজতে আমাদের চলে গেছে কতোটা সময়:
সময় এবং স্বাভাবিক মৃত্যু কি তবে জীবনের সমার্থক?
আমরা এখনো বেঁচে আছি যেন ভুল বোঝায় মৃত্যু আমাদের
স্মৃতির মতোই আমরা সক্ষম মুক্তি ও স্বাধীনতায়
জিলজামেশের সবুজ পদচিহ্ন ধরে আমরা ঘুড়ে বেড়াই
কাল হতে কালান্তরে .../

ফিলিস্তিনীদের মৃত্যু দেখতে দেখতে কবির হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। মৃত্যুই কেবল যেন ঘুরে ফিরে আসে তাদের জীবনে। মৃত্যু নিয়ে দারভীশের অভিমান আর ক্ষোভের শেষ নেই যেন। চাপা কষ্ট দানা বেঁধেছিল তার মৃত্যু নিয়ে। তার কাব্যসম্ভারে তাই মৃত্যু সংক্রান্ত কবিতা আর পঙক্তি অসংখ্য। যেখানে স্বাভাবিক মৃত্যু থেকে শুরু করে মৃত্যুর অসম্ভব দার্শনিক বয়ান রচনা করতে সক্ষম হন দারভীশ। জিদারিয়্যার এই কয়েক পঙক্তির স্তবকে মৃত্যু সম্পর্কিত এমন দার্শনিকতাই প্রকাশিত হয়েছে গভীরভাবে। জিলজামেশ নিয়ে দারভীশের এমন প্রবাদসম কাব্যোক্তিতে মৃত্যু নিয়ে তার সেই খেদই যেন উঠে এসেছে। যে নিসর্গপুরাণে অসম্ভব লড়াই ও সাধনায় অমরত্বের বীজ পান করেও জিলজামেশকের মতো মহাবীরকে মৃত্যুর পেয়ালা বরণ করে নিতে হয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল চিরন্তন জীবনের সন্ধানে এগিয়ে আসা। সেই একই উত্তরসূরীয় ভূখণ্ড ফিলিস্তিনের মাটিতে লড়াই আর তার পাশে মৃত্যুর পরোয়ানার যেন শেষ নেই। সেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলেছে লড়াইরত মানুষের মিছিল। কিন্তু কবি যেন এমন মৃত্যু আর খুনের মুখোমুখি হয়েও মৃত্যুকেই রুখতে চান। মৃত্যুর প্রতিরোধই যেন তাকে অমরত্বের সম্ভাবনা এনে দিতে পারে। যে অমরত্ব আর চিরন্তন জীবনের

---

[৭৪১]. হেইডেন, আলেকজ্যান্ডার, *দ্য গিলগামেশ এপিক এন্ড ওল্ড টেস্টামেন্ট প্যারালালস* (যুক্তরাষ্ট্র: শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪৬ খ্রি.), পৃ. ৫-১২, ১৩৭-২০০। বুলহাবাল, খাদীজা ও কারীমাহ হিবরী, *তাজাল্লিয়্যাত আল রামজ আল উসতুরি ইন্দা মাহমুদ দারভীশ ফী দিওয়ানিহি "লিমাজা তারাকতু আল হিছান ওয়াহিদা"* (আলজেরিয়া: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব উম এল বোয়াগি, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৩৯-৬৮।
[৭৪২]. দারভীশ, মাহমুদ, *জিদারিয়্যাহ*, ২০০০, পৃ. ৩৯-৪০।

অভিমুখে পা বাড়িয়েছিলেন বন্ধু আনকিদো সে পথেই দারভীশ তার মৃত্যুচিন্তার বীজ খুঁজে পান। সে পথ হলো নিরন্তর লড়াই ও সংগ্রামের পথ।[743]

.

দারভীশ তার মৃত্যুচিন্তা কিংবা তার জীবন ও ফিলিস্তিনময়তার কালপর্বে বিশেষ ঐতিহাসিকতার মধ্যদিয়ে কিভাবে তিনি কবিতা ও নান্দনিক মাধ্যমে তার মৃত্যুর আখ্যান সৃষ্টি করেন তা বোঝার চেষ্টা করা। জিলজামেশ প্রসঙ্গে দারভীশের অভিঘাত যতোটা মহাবীর জিলজামেশ থেকে তার চেয়ে বেশি আনকিদোর কাছ থেকে। কারণ যে লড়াই চালিয়েছিলেন জিলজামেশ একই লড়াই চালিয়েছেন আনকিদো। জিলজামেশের এ ঘটনায় আক্ষেপ ছিল নিসন্দেহে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মৃত্যুর পথে তাকেই এগিয়ে যেতে হয়েছিল। এই জায়গা থেকে দারভীশ মৃত্যুর ঐতিহাসিকতা তুলে ধরেন। কারণ দারভীশ শুধু জিলজামেশের পৌরাণিক কাহিনী বা নিছক পৌরাণিক কাহিনীর নায়কচরিত্রকে খুঁজতে যাননি। বরং এ ঘটনা তুলে আনার মাধ্যমে দারভীশ মৃত্যুর অধিবিদ্যায় আগ্রহী হওয়ার চেয়ে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন মৃত্যুর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য তুলে ধরায়। দারভীশের কবিতায় মৃত্যুর দুটি দিক শনাক্ত করা যায়। একটি মৃত্যু সংক্রান্ত প্রথাগত ধারণা কিংবা সাধারণ মৃত্যুর ঘটনা। যার সাথে রয়েছে আরো দুটি দিক একটি খোদ মৃত্যু এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের আলোচনা। যেখান থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনার বিস্তার ঘটে। অপর দিকটি হলো, মৃত্যুর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বিচার কিংবা কোন ঘটনাঘটনের মধ্যদিয়ে মৃত্যুর ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং মৃত্যুর ঘটনা তরান্বিত হয় তার পর্যালোচনা।

তাম্মুজ/জুলাই

শাকাইক আল নু'মান নামক এক ফুলের উপস্থিতি পাওয়া যায় দারভীশের জিদারিয়্যাহ কাব্যগ্রন্থে। এ ফুল লোহিত বর্ণের হয়। দেখতে এ অঞ্চলের নয়নতারা ফুলের মতো হলেও প্রজাতিগতভাবে এটি পপিফুল গোত্রীয়। সাধারণত এ ফুল জুলাই মাসে ফোটে। প্রাচীন শামদেশ, লেবানন এবং পব্যাবিলনীয় অঞ্চলে সর্বত্র এ ফুল ফুটলে লালে লাল হয়ে যেতো পুরো প্রকৃতি। জুলাই মাসে এই ফুল ফোটে তাই এই মাসকে তাম্মুজ বলা হতো। প্রাচীন আকাদীয় ভাষাভুক্ত শব্দটি পরবর্তীতে আরবী ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়। তাম্মুজ নামকরণের পিছনের রয়েছে পৌরাণিক কাহিনী। কারণ তাম্মুজ মূলত সবুজ বৃক্ষ তরুলতা উদ্ভিদের দেবতা। তারুণ্য ও উর্বরতার প্রতীক। মূলত তাম্মুজ ছিল সূর্য দেবতা; ইয়া এবং সাইদুরি দেবতার দেবপুত্র। কথিত আছে তিনি এক সময় দেবী ইশতার এর প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেন। তাম্মুজের বিচিত্র নাম রয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। শামদেশের প্রাচীন পূর্বাঞ্চল ক্যানানের পুরাকাহিনীতে আদোনিস নামে তার বর্ণনা রয়েছে।[৭৪৪] কথিত আছে একবার শিকার করতে বের হন এই দেবতা। যে সময়ে তিনি বের হয়েছিলেন সে সময়টা ছিল জুলাই মাস। সে সময় তিনি

---

৭৪৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০।

৭৪৪. বুলহাবাল, খাদীজা ও কারীমাহ হিবরী, *তাজাল্লিয়্যাত আল রামজ আল উসতুরি ইন্দা মাহমুদ দারভীশ ফী দিওয়ানিহি "লিমাজা তারাকতু আল হিছান ওয়াহিদা"*, পৃ. ৬৫।

শিকারের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। সেই ক্ষতস্থান থেকে যে রক্ত বের হয়ে আসছিল সেই রক্তে নদী পর্যন্ত প্লাবিত হয়। প্লাবিত হয় বন-বনানী ও সবুজ প্রান্তর। তার রক্তের প্লাবনে যে উর্বরতার রসায়ন ঘটে তাতে লোহিতবর্ণের ফুলে ফুলে ভরে যায় দিক দিগন্ত। যে নদী প্লাবিত হয়েছিল তার নামকরণ করা হয় আদোনিস নদী।[৭৪৫] দারভীশের কবিতায় এই ফুলপুরাণের কাহিনী উঠে এসেছে নানা অর্থে উর্বরতা ও সমৃদ্ধির হিসেবে। উঠে এসেছে অন্য অর্থেও। সময়ের প্রতীক হিসেবে তার পাঠ করা যায়। তেমনি মিলন এবং বিচ্ছেদের সম্ভাবনাঅর্থেও। *ليل يفيض من الجسد* –শীর্ষক কবিতাজুড়ে দারভীশ তাম্মুজকে বেশ কয়েক দিক থেকে দেখেছেন। যেখানে দারভীশের নির্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতও মিলিয়ে দেখেছেন।[৭৪৬]

তাম্মুজ এবং ইশতার ছিল দুজন পৌরাণিক প্রেমিক। তাদের মিলন হয়েছিল যেমন তেমনি তাদের বিচ্ছেদও হয়েছিল। একইসাথে আবার তারা মিলিত হয়েছিল। বিচ্ছেদ হলেও ফিরে ফিরে ঘটতো তাদের মিলন। মিলনের আবর্তন প্রক্রিয়া নিয়েই দারভীশের মুগ্ধতা। ফিলিস্তিনের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দারভীশ তাম্মুজ-ইশতার প্রেম বিচ্ছেদের ঘটনাকে দেখেছেন। ফিলিস্তিন যেমন তার ইতিহাসের পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তেমনি আবার তাদের মিলন হবে। এই কবিতার পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যদিয়ে এমন আশার সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন কবি। নতুন সম্ভাবনা, নতুন সূচনা এবং পুনরুত্থান ইত্যাদি অর্থেও তাম্মুজ চরিত্রের রূপক সৃষ্টি করেছেন দারভীশ তার কবিতায়। কারণ তাম্মুজ যখন কোনো বিরান ভূমি অতিক্রম করতেন তখন সেই ভূমি সবুজ প্রাণে ভরে যেতো। উত্থান হতো নতুন প্রাণের।[৭৪৭] *تموز والأفعى*– কবিতায় দারভীশ বলেন,

تموزُ مرّ على خرائبنا
و أيقظ شهوة الأفعى.
القمح يحصد مرة أخرى
و يعطش للندى..المرعى
تموز عاد، ليرجم الذكرى
عطشا ..و أحجارا من النارِ
فتساءل المنفيُّ:
كيف يطيع زرعُ يدي
كفا تسمم ماء آباري؟
و تساءل الأطفال في المنفى:
آباؤنا ملأوا ليالينا هنا.. وصفا
عن مجدنا الذهبي

---

৭৪৫. কেরেনি, কার্ল, *দ্য গডস অব দ্য গ্রিকস* (ইংল্যান্ড: থ্যামস এন্ড হাডসন, ১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ৭৬।
৭৪৬. দারভীশ, মাহমুদ, *লিমাজা তারাকতু আল হিছানা ওয়াহিদা*, ১৯৯৫, পৃ. ১৩০।
৭৪৭. ঈসা, এ. ডি. মুহাম্মদ ও গিদা ইউনুস, *আল রামজ আল উসতুরি ওয়া ফাননিয়্যাতিহি ফী শি'রি মাহমুদ দারভীশ*, পৃ. ৭।

قالوا كثيراً عن كروم التين و العنبِ
تموز عاد، و ما رأيناها
و تنهّد المسجون: كنت لنا
يا محرقي تموز... معطاءً
رخيصاً مثل نور الشمس و الرملِ
و اليوم، تجلدنا بسوط الشوق و الذلِ
تموز.. يرحل عن بيادرنا
تموز، يأخذ معطف اللهبِ
لكنه يبقى بخربتنا
أفعى
ويترك في حناجرنا
ظمأ
و في دمنا..
خلود الشوق و الغضبِ[748]

আজার/মার্চ

আজার জন্ম ও বসন্ত ঋতুর দেবতা। প্রাচীন আকাদীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত আজার। তাম্মুজের কাছাকাছি রূপক হয়ে এসেছে আজার। আজার বলতে বোঝায় বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস। প্রথম মাস যেহেতু মার্চ মাস তাই তাকে আজার বলা হয়। মার্চ মাস মানে নতুন জন্মের মাস। প্রকৃতির জেগে ওঠার মাস। শীতে প্রকৃতিতে যে জরা নেমে আসে তা থেকে আবার পুনর্জন্ম হয় প্রকৃতির। মাটিতে আবার পুনর্জন্মের বীজ উদ্গাত হয়। মাটিতে আবার উত্থানের শুরু হয়। প্রকৃতি আবার তারুণ্যে ভরে ওঠে। দারভীশ আজারের এমন অর্থকে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক হাকিকতের প্রেক্ষিতে রূপক হিসেবে দেখেছেন। ইজরাইলের দখলদারিত্বের মধ্যদিয়ে যে জমিন মৃতপ্রায় তার আবার জেগে ওঠার সময় হয়েছে।[৭৪৯] সেই জমিনকে তার ভগ্নদশা থেকে উত্থিত হওয়ার আহবান করেন দারভীশ।[৭৫০]

এছাড়া অসংখ্য মিথের ব্যবহার রয়েছে দারভীশের কবিতায়। প্রাচীন গ্রিক পুরাণ, গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়ড-ওডেসি, সফোক্লিস, ওসিরিস, আসখিলিউস, সাইদুরি, নারগিস, জেসমিন, হেলেন, আহমদ আল জা'তার, হোমার, ইউলিস, রেনে শার, ইত্যাদি অসংখ্য পুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

[৭৪৮]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১*, ২০০৫, পৃ. ১১৩-১১৪।
[৭৪৯]. বুলহাবাল, খাদীজা ও কারীমাহ হিবরী, *তাজাল্লিয়্যাত আল রামজ আল উসতুরি ইন্দা মাহমুদ দারভীশ ফী দিওয়ানিহি "লিমাজা তারাকতু আল হিছান ওয়াহিদা"*, পৃ. ৪৩-৪৪।
[৭৫০] দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, ২০০৫, পৃ. ২৮৫।

৬.১৫: পরিবর্তন কিংবা সম্ভাবনার প্রেক্ষিত: কবিতায় ধর্মভাব ও তার যোগাযোগ

কবিতার শরীর ও আত্মা নানান প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। একজন কবি যখন তার কবিতা জনসমুখ্যে প্রকাশ করে তখন পাঠক তার ভিতরে প্রবেশ করে। কবিতার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পর বিভিন্ন দিক থেকে কবিতার মুখোমুখি হয় পাঠক। কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যগুলোর প্রেক্ষিত বিচার করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন পাঠক। কিন্তু তার জন্য কবিতার নিজস্ব শক্তি থাকা জরুরি। যা পাঠককে কোনো না কোনোভাবে উত্তেজিত করতে সক্ষম হয় কিংবা আকর্ষণ করতে পারে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ (ডানাবিহীন চড়ুই) প্রকাশের পর খুব বেশি পাঠক আকর্ষণ করতে পারেননি দারভীশ। তবে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর দারভীশ বিপুল পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। প্রথম কাব্যগ্রন্থে জনপ্রিয় না হয়ে ওঠার কারণ ভাষা এবং আদর্শিক পটভূমি। *আছাফীরু বিলা আজনিহাতিন* এর ভাষা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যেতে পারেনি। এর নানাবিধ কারণ থাকতে পারে। এ সময় দারভীশ খুব বেশি ঐহিত্যবাদী ধারার সাথে ঘনিষ্ট হয়ে ওঠেননি। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের ভাষা অনেক বেশি সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি ছিল। সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিতর দিয়ে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের ভাষা নির্মিত হয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ– আওরাক আল জায়তুন (জলপাইয়ের পত্রাবলী)–এর একটি কবিতা– বিত্বাকাতুন হুবিয়্যাহ পরিচয়পত্র'র জন্য দারভীশ অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গত অর্ধশতাব্দি পার হয়ে এ কবিতার পাঠকপ্রিয়তা সীমান্ত ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সাহিত্যেও বিপুল চর্চিত একটি কবিতা। কবিতাটি বিশ্বের অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ কবিতার একটি দিক হলো নিম্নবর্গের মানুষের ভাষায় কথা বলেছেন কবি। একইসাথে ইজরাইলের দখলদারী পরিস্থিতির মধ্যে জর্জরিত ফিলিস্তিনের বিবদমান অবস্থার চালচিত্র তুলে ধরেছেন কবি। এখানে যেমন নিপীড়িত শ্রেণির কথা উঠে এসেছে তেমনি জাতীয় আত্মমর্যাদার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। কবিতাটির আন্তপাঠে মনোযোগ দিলে অনুধাবন করা যায়, দারভীশ তার সেসময়ে প্রবলভাবে মার্ক্সীয় মতাদর্শে প্রভাবিত ছিলেন। তবে পুরো কাব্যগ্রন্থের অন্যান্য কবিতাপাঠে দেখা যায়, মতাদর্শিকভাবে মার্ক্সপন্থী হলেও ধর্ম ও ঐতিহ্যবাদী নিবিড় সংযোগ রয়েছে কবির। পর্যায়ক্রমে অন্যসব কাব্যগ্রন্থগুলোতে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে আরো বিপুল ও গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হন কবি।

কবিতার জন্য ধর্মীয় অনুষঙ্গ কিংবা ধর্মীয় দৃষ্টান্ত-রূপকের ব্যবহার একটি স্বাভাবিক চর্চার অংশ। অনেক সময় বিষয়টি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। তবে দারভীশের গভীর সম্পর্ক রয়েছে গণমানুষ এবং গণমানুষের ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সাথে। যেকারণে দারভীশের কবিতায় ধর্মীয় ভাবধারা এসেছে স্বাভাবিকভাবে। দারভীশের কবিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ধর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় উপমা-চিহ্ন প্রতীক এসেছে প্রতিবাদী অনুপ্রেরণা হয়ে। প্রতিরোধের চৈতন্য জাগিয়ে তুলতে ধর্মীয় সংবেদনশীলতার কাব্যিক উপস্থাপন অপরিহার্য হয়ে ওঠে দারভীশের কবিতায়। এছাড়া আত্মতত্ত্ব, পরমজ্ঞান, সত্যানুসন্ধান, রূহানি শক্তির বিকাশ ও সূফি জ্ঞানতাত্ত্বিক চিন্তাচর্চায় ধর্মীয় জ্ঞানের ঐতিহ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে দ্বিধা করেননি দারভীশ। মোটকথা সামগ্রিক প্রতিরোধ, আত্মপরিচয়, ইতিহাসের সাথে গভীর সম্পর্ক নির্মাণ ও রাজনৈতিক স্পিরিট গড়ে তুলতে

ধর্মীয় জ্ঞানের ধারার সাথে সম্পর্ক ছাড়া সম্ভব নয়। দারভীশের ধর্মচিন্তায় তাই ধর্মকে আলাদা করে কাব্যচর্চা কিংবা যেকোনো চিন্তাচর্চা কঠিন এবং অবান্তর। তবে দারভীশ মতাদর্শগতভাবে ক্ল্যাসিক্যাল মার্ক্সপন্থী হলেও আধুনিক এবং সেকুলার ছিলেন। সাংস্কৃতিক চিন্তার দিক থেকে ঐতিহ্যবাদী হলেও চিন্তাগতভাবে বিপ্লবী ছিলেন। ফলে তার কাছে ধর্ম-সংস্কৃতি, লোকজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব যেমন কাব্যিক চেতনাজাত হয়ে ওঠে একইসাথে হয়ে ওঠে রাজনৈতিক এবং বিপ্লবী ঐতিহ্যের অনুগামী হয়ে। দারভীশ তাই মুক্তহস্তে যেমন প্রাচীন ক্যানান, মেসোপটিমীয়, সুমিরীয়, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা থেকে জ্ঞান ও চিন্তা আহরণ করেছেন, ইব্রাহীমীয় ধর্মীয় ধারা, ইহুদী-খ্রিস্টান, তাওরাত-ইঞ্জিল বাইবেল থেকে যেমন নিয়েছেন তেমনি নিয়েছেন ইসলাম ও কুরআন থেকে।

ধর্ম শুধু প্রতিবাদ ও লড়াইয়ের উৎস হয়ে আসেনি। জ্ঞান ও চিন্তা উদ্রেককারী প্ররোচক মাধ্যম হিসেবে ধর্মীয় চৈতন্যের কাছে মানুষের ঋণের শেষ নেই। মানুষ যখন কোনো সত্যজ্ঞানের সন্ধান করে তার সামনে তখন দুটি উপায় কাজ করে। একটি মানুষ তার চিন্তার ইতিহাসের মধ্যদিয়ে অর্জন করে নিয়েছে। নিজের জ্ঞান, যুক্তি ও চিন্তাচর্চার মাধ্যমে। অপরটি লাভ করতে হয়েছে পরমজ্ঞানের সাহায্যে কিংবা ধর্মীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক পরম্পরায়। কিন্তু ধর্মের অনুষঙ্গ বৈষয়িক যেকোনো পরিবর্তন ও বিকাশের জন্য অনুঘটক হিসেবে নিবিড়ভাবে কাজ করে। অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিংবা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। সাহিত্য, জ্ঞান ও কবিতার জন্য ধর্মের সম্পর্ক তাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মমাত্রই মতাদর্শিক কিংবা প্রচারসর্বস্ব চিন্তাজাত কোনো বিষয় কবিতায় আশ্রয় করেনা সবসময়। ধর্মের সাথে যোগাযোগ কবিতার যে সংস্কৃতি তার সুস্থতায়–বিকাশে প্রতিষেধকের মতো কাজ করে। ধর্মমাত্র কাঠামোগত কিংবা ধর্মতাত্ত্বিক বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া নয়; বরং ধর্মময় জ্ঞান এখানে আলোচ্য। ধর্মবোধ মূলত কবিতার জন্য একধরনের জ্ঞানীয় অভিঘাত। চিন্তা ও নান্দনিক তৎপরতার জন্য ধর্মীয় মনোস্তত্ত্ব কার্যকর একটি ব্যাপার– যাতে কবিতার যে শরীর ও অন্তপ্রবাহ তাতে চিন্তা ও জ্ঞানের পরিসর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বস্তুত কবিতায় যে চিন্তা–জ্ঞান ও সত্যের কার্যকারণ রয়েছে তার সাথে ধর্মের আন্তযোগাযোগ অস্বীকার করা যায়না। কারণ ধর্মের ভিতর সত্যজ্ঞান অনুসন্ধানের একটি বিষয় কাজ করে, কাজ করে চিন্তা ও জ্ঞানের পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া গড়ে তোলার সম্ভাবনা। ধর্ম যেমন অর্থ সৃষ্টি ও সম্ভাবনার কাজ করে, তেমনি কবিতাও করে। ফলে ধর্মের সাথে কবিতার একটি ফিতরাতগত পুরনো আত্মিক যোগাযোগ রয়েছে। এ ধরনের সম্পর্ক কবিতার জন্য অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চিন্তার যোগাযোগ ছাড়া কবিতা কখনো বড়ধরনের উল্লম্ফন ঘটাতে পারেনা। পরিবর্তন, নতুন সম্ভাবনা কিংবা বিপ্লবের যে ভাষা গড়ে ওঠে তার পুরোটাই যে কবিতার একক সৃষ্টি তা নয়, বরং তাতে কবিতায় যেসব আশ্রয় ও যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে তার সাথে ধর্মীয় যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে গভীরভাবে। আরবী কবিতার ইতিহাস তদন্ত করলে দেখা যাবে, কবিতা কেন চিন্তা, জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য চর্চার জন্য ধর্ম থেকে আলাদা পথে চলতে পারেনি? কাজে দারভীশের কবিতায় কেন ধর্মের যোগাযোগ ঘটে গেল তার ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। তার কুলজিনামা খুঁজে পাওয়া যাবে আরবী কবিতার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে। সিরিয়ার কবি আলী আহমদ ইসবার আদোনীস মনে করেন, কবিতায়

জ্ঞান ও চিন্তার সম্পর্ক কবিতার জন্মের সাথে মিশে আছে। আরবী কবিতার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ যে শি'র শব্দের মানে কবিতা হিসেবে পরিচিত বস্তুত সেই খোদ শি'র শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ চিন্তা, অনুভব, অনুধাবন, অনুধ্যান ইত্যাদি।[৭৫১] ফলে শি'র–যার অর্থ কবিতা বলা হয় তার আদি অর্থ চিন্তা ও জ্ঞান। সৌন্দর্য্য, শিল্পতত্ত্ব কবিতার সাথে যোগ হয়েছে ধীরে ধীরে কালক্রমে। কিন্তু ইসলাম আসার পর কোরআনের কারণে আরবী কবিতা মৌলিকভাবে পাল্টে যায়। আরবী ভাষার ভিতর-বাহির অর্থাৎ মনোদৈহিকভাবে স্বয়ং আরবী ভাষায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত ঘটে যায়। যেকারণে ভাষা ও চিন্তার দিক থেকে আরবী কবিতার ধরনও পাল্টে যেতে থাকে।[৭৫২] আদোনীস দেখিয়েছেন, এর মূল কারণ কোরআন তথা ধর্মের সংশ্লিষ্টতা।

৬.১৬: লিবারেশন থিওলজি কিংবা পলিটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি, ফিলিস্তিন এবং মাহমুদ দারভীশ

কবিতায় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ভাব-চিন্তা, ভাষা ও চিহ্নের ব্যবহার ফিলিস্তিনের সামগ্রিক পরিস্থিতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাজনীতি, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ফিলিস্তিনের বিবদমান অবস্থায় ধর্মের যেহেতু মৌলিক এবং গভীরতরো অবস্থান রয়েছে সেকারণে তাকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভবও। দারভীশের কবিতায় ধর্মের অনুষঙ্গ বিপুলভাবে প্রকাশিত হওয়ার পেছনে এটি একটি কারণ হতে পারে। তদুপরি ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির অগ্রগতির প্রশ্নে ধর্মের ভূমিকা অপরিহার্য। যেহেতু ইজরাইল ও যায়োনিজমের সার্বিক তৎপরতার বিপরীতে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং মুক্তির সাথে যেমন ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম-সংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড় ফলে কবিতায় কিংবা সাহিত্যে ধর্মের প্রশ্ন যতোটা নান্দনিক কারণে ঠিক ততোটা রাজনৈতিক কারণেও জরুরি। দারভীশের কবিতায় এসব প্রশ্ন এবং তার উত্তর কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার বোঝাবুঝির জন্য ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রাম ও প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ মুক্তিসংগ্রামের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে ধর্মীয় ঐতিহ্যের– আরো পরিচ্ছন্নভাবে বলা যায়, লিবারেশন থিওলজির।

রাজনৈতিক তৎপরতা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ধর্মের উপযোগিতা ও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক রাজনীতির সাথে তাই ধর্মের আন্তসম্পর্ক নিবিড়। কারণ মানুষের জাগতিক মুক্তি কিংবা রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে ধর্মের ভূমিকা প্রায় সবসময় ইতিবাচক ছিল। এমনকি কখনো কখনো প্রধান শক্তি হিসেবেও কাজ করেছে। ইতিহাসে এমন সাক্ষ্য অসংখ্য। পৃথিবীর সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যেখানেই সাধারণ মানুষের উপর জুলুম- নিপীড়ন নেমে এসেছে সেখানে ধর্ম ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছে মানুষকে মুক্ত করার জন্য। উপনিবেশিক শাসনামলে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর উপর যে জুলুমব্যবস্থা জেঁকে বসেছিল তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় পক্ষগুলোর

---

৭৫১. আদোনীস, *আল শি'রিয়্যাহ আল আরাবিয়্যাহ* (বৈরুত: দার আল আদাব, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩০-১০০।

৭৫২. প্রাগুক্ত।

অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। পৃথিবীর যেখানেই উপনিবেশ কায়েম হয়েছে সেখানে উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ ও লড়াই তীব্রতরো হওয়ার পেছনে ধর্মের ভূমিকা ছিল ব্যাপক এবং গভীর। ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন আলেম সম্প্রদায়।[৭৫৩] উপনিবেশিক ব্যবস্থার চরম জুলুমের বিরুদ্ধে তারা সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। একইভাবে আলজেরিয়াসহ আফ্রিকার উপনিবেশিত দেশগুলোর স্বাধীনতা আন্দোলনে ধর্মীয় সম্প্রদায় বিশেষত ইসলামী পক্ষগুলোর সক্রিয় তৎপরতা ছিল ঐতিহাসিক। ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। যখন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে তখন তার সূচনা ঘটেছিল ধর্মের ভিত্তিতে অর্থাৎ ইসলাম থেকে। পরবর্তীকালে বিশেষত পঞ্চাশের দশক থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিস্তার শুরু হয় এখানে। ১৯৫৬ সালে ২য় আরব-ইজরাইল যুদ্ধের পর কম্যুনিস্ট আন্দোলন রাজনৈতিকভাবে বিশেষত সাংস্কৃতিকভাবে বেগবান হয়। বামপন্থী ধারাগুলোর সাংস্কৃতিকভাবে কাজ করার অন্য কারণ ছিলো দ্রুত বিপ্লবী চেতনা ছড়িয়ে দেয়া। যদিও ইসলামী ধারাগুলোর মধ্যে আগে থেকেই জারি ছিল বিপ্লবী তৎপরতা। আগে থেকে বিদ্যমান থাকার কারণে ইসলামকেন্দ্রিক সংগ্রামী চেতনা কবিতার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তবে ধর্মকে সম্পৃক্ত করার ফলে কবিতায় ও সাহিত্যে বিপ্লবের আগেব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।[৭৫৪] এশিয়া এবং আফ্রিকার বাইরে ল্যাটিন আমেরিকায়ও ধর্মভিত্তিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯৬০ থেকে ৬৮ সালের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকায় শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা খ্রিস্টান ধর্মীয় গ্রুপগুলোর বিদ্রোহী এবং প্রতিরোধ আন্দোলন বিপ্লবী ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। খ্রিস্টানদের ঐতিহাসিক এ আন্দোলন *লিবারেশন থিওলাজি* নামে বিখ্যাত।

সেসময় ক্ষমতাসীন শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ধর্মীয়ধারাগুলোর এই আন্দোলন র‍্যাডিক্যাল রূপ ধারণ করে। তাদের আন্দোলনের ঢেউ সাধারণ মানুষের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ তারা নিপীড়িত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে– তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া সামাজিক অসম ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে– রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। লিবারেশন থিওলজি মূলত খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকদের মাধ্যমে প্রথমত শুরু হয়। ধারণাগতভাবে এর সূচনা ঘটে তাদের মাধ্যমেই। সেসময় এ আন্দোলন ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয় রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। তবে আন্দোলন শুরু হওয়ার এক পর্যায়ে বিদ্রোহী খ্রিস্টানদেরু সাথে সম্পৃক্ত হয় মার্ক্সপন্থী বিপ্লবী ধারাগুলো। যেকারণে ধর্মীয় ধারার সাথে বামধারার সম্পৃক্ততার ফলে চিন্তা ও বাস্তব রাজনীতি সম্পর্কিত প্রথাগত ধারণাগুলোর ঐতিহাসিক মোকাবেলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ধর্মের বিরুদ্ধে বামধারার মতাদর্শিক যেসব ধারণা প্রচলিত তার এক ধরনের নিরাময় হয়। আক্ষরিক অর্থে সেখানে মার্ক্সবাদী ধারা এবং ধর্মীয় ধারা– মানে

[৭৫৩]. ইনাম-উল-হক, মুহাম্মদ, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, সং: ২য়, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ভূমিকাংশ।
[৭৫৪]. আল নাক্কাশ, রাজা, *শায়ির আল আরদ আল মুহতাল্লাহ*, ১৯৭২, পৃ. ২০৩।

ক্যাথলিজমের মাঝে যে বিভাজন ছিল তা অনেকখানি কমে আসে।[৭৫৫] পরবর্তীকালে লিবারেশন থিওলজি নিয়ে বিপুল দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা হয়। এসব আলোচনায় লিবারেশ থিওলজিকে একটি ডক্ট্রাইন () হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মূলত লিবারেশন থিওলজিকে যারা তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের প্রধান ছিলেন *Gustavo Gutiérrez*। গুস্তাভো তার আলোচনায় ধর্মতত্ত্বের ভিতর থেকে কিভাবে ব্যবহারিক অর্থে মানুষের মুক্তির ধারণাকে প্রতিফলিত করা যায় তার পদ্ধতি নিয়ে কথা বলেছেন। বাইবেলে বর্ণিত সিন (পাপ), কনফেশন, সালভেশন, রিডেমশন কিভাবে যিশু খ্রিস্টের মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং তার তাৎপর্য সামাজিক যেকোনো প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিকভাবে শনাক্ত করা যায় তার ধারণা নিয়ে আলোচনা করেন গুস্তাভো। তিনি মনে করেন, লিবারেশন তথা মানুষের মুক্তির ধারণার একটি প্রথাগত মিনিং আছে কিন্তু তা অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে। তবে মুক্তির ধর্মতত্ত্ব নিয়ে নতুন ধারণার পর্যালোচনা জরুরি যা ঐতিহাসিকভাবে অনেক বেশি ব্যবহারিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকর।[৭৫৬] লিবারেশন থিওলজির যে ভাষ্য তৈরি করেছেন গুস্তাভো তার একদিকে রয়েছে ধর্মতত্ত্ব আরেক দিকে রয়েছে নিপীড়িত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। এই দুই অবস্থার মোকাবেলার মধ্যদিয়ে তিনি মুক্তির সম্ভাবনার মুখোমুখি হতে চেয়েছেন। মুক্তির সত্য এবং ইনসাফ কায়েমে লিবারেশন থিওলজির জ্ঞান ও নীতি প্রতিষ্ঠিত।

লিবারেশন থিওলজির প্রায় একই প্রেক্ষিত শনাক্ত করা যায় ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রেও। ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত এবং তার বিপরীতে ফিলিস্তিনীদের মুক্তিসংগ্রাম ও প্রতিরোধ আন্দোলনে লিবারেশন থিওলজির বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। নাইম স্টিফ্যান আতিক মনে করেন, ফিলিস্তিনে লিবারেশন থিওলজির স্বরূপ অনেক বেশি কনটেক্সচুয়াল। কারণ এখানে তাৎক্ষণিকতা গুরুত্বপূর্ণ। যাতে দ্রুত প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানে সাড়া দেয়া সম্ভব হয়। এই প্রশ্ন মানে ইজরাইল-ফিলিস্তিনের সংকট। ইজরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে ঠিক কোনটি ন্যায়সঙ্গত তাতে দ্রুত সাড়া দেয়ার প্রেক্ষিতে লিবারেশন থিওলজি কাজ করে। কারণ, ইজরাইলের দখলদারিত্ব, অন্যায় আক্রমণ, নির্যাতন-নিপীড়ন, খুন-হত্যা ইত্যাদি প্রশ্নে লিবারেশন থিওলজি মূলত নিপীড়িতের মুক্তির জন্য কাজ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিবারেশন থিওলজি ইজরাইলের মুক্তিও চায়। কারণ মুক্তির ধর্মতত্ত্বে সাধারণ নীতি হলো নিপীড়ক এবং নিপীড়িত– উভয়পক্ষকেই মুক্তির সন্ধান দেয়া।[৭৫৭] ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে লিবারেশন থিওলজির বিস্তার ঘটেছে তৃণমূল থেকে। তবে বাইবেল বা ঠিক ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতর থেকে এর বিকাশ ঘটেনি। পুরো ঘটনাটি ঘটেছে মূলত ফিলিস্তিনের সংকটাপন্ন পরিস্থিতির কারণে। ল্যাটিন আমেরিকায় *লিবারেশন থিওলজি* নামেই আন্দোলন চলছিল। তবে ফিলিস্তিনে লিবারেশন থিওলজির সূচনা হয় মূলত *সাবিল অ্যাকোমেনিক্যাল লিবারেশন থিওলজি সেন্টার* এর মাধ্যমে। ১৯৮৭ সালে ফিলিস্তিনজুড়ে

---

[৭৫৫]. জ্যাকবসন, রবার্টা স্টেইনফেল্ড, *লিবারেশন থিওলোজি অ্যাজ এ রিভোল্যুশনারি আইডিওলোজি ইন ল্যাটিন আমেরিকা* (যুক্তরাষ্ট্র: দি ফ্লেচার ফোরাম, ভলিয়ম: সংখ্যা: ২, সামার ১৯৮৬), পৃ. ৩১৭-৩৩৬।

[৭৫৬]. সিস্টার ক্যারিড্যাড ইন্ডা ও জন ইগলেসন, *এ থিওলজি অব লিবারেশন: হিস্ট্রি, পলিটিক্স এন্ড সালভেশন*—গুস্টাভো গুট্যারেজের মূলগ্রন্থ (ল্যাটিন আমেরিকান) *Teologia de la liberation, Perspectivas*'র অনুবাদ (নিউ ইয়র্ক: অরবিস বুকস, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ৩-৩৩।

[৭৫৭]. স্টিফ্যান আতিক, নাইম, *আ পালেস্টাইনিয়ান থিওলজি অব লিবারেশন: দি বাইবেল, জাস্টিস এন্ড দ্য পালেস্টাইন-ইজরাইল কনফ্লিক্ট* (নিউ ইয়র্ক: অরবিস বুকস, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৩৯।

ব্যাপকভাবে যে ইন্তেফাদা সংঘটিত হয়েছিল সে সময় গড়ে ওঠে সাবিল এর লিবারেশন থিওলজি।[৭৫৮] সে সময়ের পরিস্থিতিতে বড় ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছিল তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত। এর মধ্যেই লিবারেশন থিওলজির উৎপত্তি। যাইহোক, ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে লিবারেশন থিওলজিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যায়। তবে মৌলিকভাবে তিনটি দিক রয়েছে, লিবারেশন থিওলজির। একটি হলো ইজরাইলের বিপরীতে সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সমাধানে সহায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। তৃতীয়ত, মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে দেখা যায়, ফিলিস্তিনে লিবারেশন থিওলজির ধারণা ল্যাটিন আমেরিকার মতো গড়ে উঠেনি। ফিলিস্তিনে লিবারেশন থিওলজি খ্রিস্টীয় ধারার ভিতর থেকে তৈরি হলেও তারা এটাকে খ্রিস্টান বলতে নারাজ। বরং *খ্রিস্টোলজিক্যাল থিওলজি* হিসেবে আখ্যায়িত করে।[৭৫৯] কারণ এ ধারণা গড়ে উঠেছে যিশু খ্রিস্টকে মূল নিয়ামক বিবেচনা করে। ধর্মতত্ত্বকে কেন্দ্র করে নয়। যার মূল বক্তব্য হলো ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক এবং জাস্টিস বা ইনসাফ অনুসরণ করা। ফলে এ ধারণার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে যিশুখ্রিস্ট। যিনি একমাত্র ফিলিস্তিনীদের মুক্তির মূল প্রেরণা। কাজে লিবারেশন থিওলজি মানে মূলত মানুষের মুক্তির পথ তরান্বিত করা। একইসাথে অন্যায়ের প্রতিরোধে সক্রিয় থাকা। ফিলিস্তিনের গণপ্রতিরোধ যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে এ ধারার বড়ধরনের ভূমিকা ছিল। ইজরাইলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তার অন্যায় ও জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে সাধারণ মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে যীশুর রূহানি উপস্থিতি। মাহমুদ দারভীশ এবং তার কবিতায় যিশুর এমনি প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দারভীশ একইভাবে যীশুকে মুক্তির আধার হিসেবে কবিতায় যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন তার পঙক্তি ও ভাষার শক্তি মানুষকে প্রবলভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

مرَّةً أُخرى
يفر الشهداءْ
من أغاني الشعراءْ
مرةً أخرى
نزلت عن صليبِنَا
فلم نعثر على أرض
ولم نبصر سماءْ[760]

আরেকবার
কবিদের গান থেকে
পালিয়ে যাবে শহিদেরা
আরেকবার

[৭৫৮]. প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৩-১৩৮। আতিক, নাইম, *রিফ্লেকশনস অন সাবিলস লিবারেশন থিওলজি ইকুমেনিক্যাল ওয়ার্ক*—নূর মাসালহা ও লিসা ইশারউড সম্পাদিত *থিওলজিস অব লিবারেশন ইন প্যালেস্টাইন-ইজরাইল: ইন্ডিজেনাস, কন্টেক্সচুয়াল, এন্ড পোস্ট কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভ* (ক্যামব্রিজ: দ্য লুটারওয়র্দ প্রেস, ২০১৪), পৃ. ২১-৩২।

[৭৫৯]. এইচ. এলিস, মার্ক, *থিওলজিস অব লিবারেশন ইন প্যালেস্টাইন-ইজরাইল এন্ড দ্য স্ট্রাগল অব পিস এন্ড জাস্টিস*—নূর মাসালহা ও লিসা ইশারউড সম্পাদিত *থিওলজিস অব লিবারেশন ইন প্যালেস্টাইন-ইজরাইল: ইন্ডিজেনাস, কন্টেক্সচুয়াল, এন্ড পোস্ট কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভ*, ২০১৪, পৃ. ৪৫-৫৬।

[৭৬০]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২*, ২০০৫, পৃ. ৭৫।

নেমে আসবো
আমাদের ক্রুশ থেকে
আমরা আর খুঁজিনি এই ভূমি
দেখিনি এই আকাশ

صليبَنْا শব্দটিই এখানে হযরত ঈসার (আ.) রূপক হিসেবে আলোকিত করে রেখেছে কবিতার পঙক্তি। পুরো স্তবকটি পাঠ করার পর যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে তা অনন্য। দারভীশ তার ভাষায় পুরো ফিলিস্তিনী জাতিকে এভাবে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত করে রাখে।

هيا.. تقدم أنت وحدك،
أنت وحدك.
حولك الكهان ينتظرون أمر الله.
فأصعد
أيها القربان نحو المذبح
الحجري، يا كبش الفداء فدائياً.
وأصعد قوي

فأي آلاء نكذب؟
من يطهرنا سواك؟ وقد ولدت
نيابة عنا هناك.
ولدت من نور ونار..
وكنا نحن نجارين موهوبين في
صنع الصليب
فخذ صليبك وأرتفع فوق الثريا..[৭৬১]
.

[৭৬১]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল কুরবান* (আল-কারমেল, সংখ্যা: ৬৬, জানুয়ারি ২০০১), *ভিজিট: মে* ২৫, ২০২৩, http://www.alkarmel.org/prenumber/issue66/issue66.htm

অতঃপর কোন কোন নিয়ামত আমরা অস্বীকার করি?
তুমি ছাড়া কে আমাদের পবিত্র রাখে
তোমার জন্ম হয়েছে আমাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য
তোমার জন্ম আলো ও আগুন থেকে
আমরা তো তুচ্ছ কতিপয় কাঠমিস্ত্রী যারা নিজেদের
উৎসর্গ করেছে ক্রুশ তৈরিতে
অতএব গ্রহণ করো তোমার ক্রুশ এবং
নক্ষত্র সুরাইয়্যা পার হয়ে উঠে যাও অতি ঊর্ধ্বে

দুটি উদ্ধৃতিতেই দেখা যায় নবী ঈসাকে উপস্থাপন করা হয়েছে তার ক্রুশের শব্দ দিয়ে। ক্রুশই মূলত নবী ঈসার প্রধান প্রতীক। দারভীশ তার কবিতায় শুধু হযতর ঈসাকেই নিয়ে আসেননি বরং বাইবেলের নানান পরিভাষাও ব্যবহার করেছেন– যার সাথে রয়েছে খ্রিস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্যের মৌলিক সম্পর্ক। এর জন্য দারভীশকে পাঠ করতে হয়েছে বিভিন্ন খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ। আরবী, ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষার অনুবাদেও পাঠ করেছেন বাইবেল। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম থেকে অনেক ধারণা ও উদাহরণ তিনি তার কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। ম্যারি ম্যাগডালিন, সামারিতান, বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন নবীর নাম– বিশেষত হযরত ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, দাউদ, সোলায়মান, ইউসুফ, মুসা প্রমুখ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে তার কবিতায়। নাশিদ আল আনাশিদ, সুদুম, গোমোররাহ, নূহ, হাবাকুকসহ অনেকের নামের উল্লেখ রয়েছে।[৭৬২] ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে যেমন তাদের পাঠ করা যায় তেমনি সাহিত্যের উৎস হিসেবে পাঠ করা যায়। দারভীশ স্বীকার করেছেন তিনি বাইবেল তার সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনে অধ্যয়ন করেছেন।[৭৬৩] তবে সাহিত্যের চাহিদা বা রুচি যেহেতু মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও মননশীলতার সাথে তুলনামূলকভাবে বেড়ে ওঠে সেদিক থেকে যেকোনো পাঠ সাহিত্যের হলেও তার আবেদন চূড়ান্তভাবে রাজনীতি থেকে শুরু করে আরো বিচিত্র দরোজায় অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা খুলে দেয়। যেসব নবীদের নাম তিনি বয়ান করেছেন, ইজরাইলকে একপাশে রাখলে ফিলিস্তিনের পরিপ্রেক্ষিতে তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব কেমন তা অনুধাবন করা যায়। এর জন্য একটি কবিতার পাঠ পর্যালোচনা তুলো ধরা যায়। নাশিদ (نشيد) শিরোনামের একটি কবিতায় দারভীশের ধর্মীয় প্রকল্প সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটিতে নবী ঈসা, ইয়াসু', হাবাকুক ও মুহাম্মদ স. সহ বেশ কয়েকজন নবীর নাম রয়েছে। এসব নাম প্রয়োগের সাথে সাম্প্রতিক ইজরাইল-ফিলিস্তিন সংকটের পটভূমি ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। নবীদের নাম নিছক কবিতার অনুষঙ্গ হয়ে আসেনি বরং এর পেছনে রযেছে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধগত পটভূমি। কারণ কবিতাটির মুখ তৈরি করা হয়েছে প্রতিরোধের ভাষা ও বয়ানের নজির হিসেবে। কয়েকটি স্তবকেই দারভীশ তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৭৬৪]

---

[৭৬২]. রাহেব, মিতরি, *বিবলিক্যাল ন্যারেটিভ এন্ড প্যালেস্টাইনিয়ান আইডেন্টিটি ইন মাহমুদ দারভীশ'স রাইটিংগস*—রাহেব মিতরি সম্পাদিত *প্যালেস্টাইনিয়ান আইডেন্টিটি ইন রিলেশন টু টাইম এন্ড স্পেস* (যুক্তরাষ্ট্র: ডিয়ার পাবলিশার, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৮৯-৯১।
[৭৬৩]. প্রাগুক্ত। পৃ. ৯০।
[৭৬৪]. দারভীশ, মাহমুদ, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-১*, ২০০৫, পৃ. ১৫৬-১৬৭।

নাশিদ শিরোনামের দীর্ঘ এ কবিতাটিতে দারভীশ আরবে আগত নবীদের ঐতিহাসিক ভূমিকার একটি চিত্র তুলে ধরেন। তাতে দেখা যায় নবীদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বাইরে আরো গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রয়েছে আর তা হলো রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলা। দারভীশ ধর্মের প্রধান ব্যক্তিত্বের সামাজিক ও মানবিক কর্তব্য কেমন তা বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করেছেন নিপীড়িত মানুষের মুক্তির প্রশ্নে। নবীদের আরো অসংখ্য ভূমিকা রয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু একটি জালেম কর্তৃত্বপরায়ণ শ্রেণির কবল থেকে মজলুম মানুষের মুক্তি এবং তাদের জুলুম-নির্যাতন ও দখলদারিত্ব প্রতিরোধের জন্য নবীদের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সাংস্কৃতিক কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নবীদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিপুলভাবে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করা যায়। কারণ ধর্মীয় পরিপালনের ঐতিহ্য ও নৃতাত্ত্বিক পরম্পরায় নবীদের বিচিত্র ঘটনাবলীর ছাপ মানুষের অন্তকরণে রয়ে গেছে। দারভীশ শুধু সেসব বিস্মৃত ঘটনাবলীর স্মৃতি পুনর্জাগরিত করার চেষ্টা করেছেন। সামনে নিয়ে এনেছেন মানুষের নতুন সম্ভাবনা ও পরিবর্তনের অঙ্গিকার।

কবিতাকে যেমন আরবের দিওয়ান তথা রেজিস্ট্রার বলা হয় তেমনি কবিতা ফিলিস্তিনেরও দিওয়ান বা রেজিস্ট্রার। রেজিস্ট্রার মানে ফিলিস্তিনের পরিচয়, চিহ্ন, স্মারক ও ইতিহাস। ফিলিস্তিনের সাথে যখন থেকেই জায়োনিস্ট আন্দোলনের সংঘাত তৈরি হওয়া শুরু হয় কবিরা তার ইতিহাস ও স্মৃতি লিখে রেখেছেন তাদের কবিতায়। ফিলিস্তিনের কবিরা ইজরাইলের মানবাধিকার বহির্ভূত অন্যায্য প্রতিটি কর্মকাণ্ডের বিপরীতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সামগ্রিকভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার কথা তাদের কবিতায় উঠে আসে। যেসব দিক থেকে এসব অনুপ্রেরণা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা তৈরির ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তার অন্যতম ছিল ধর্ম। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে ফিলিস্তিনে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রশ্নে ধর্মের পর্যালোচনা না করে তৎপর হওয়ার কারণে এক পর্যায়ে তারা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি ধর্মচিন্তার পর্যালোচনা যতটুকু তাদের মধ্যে এগিয়েছিলো তা ছিলো একেবারেই সংশয়পূর্ণ এবং সংঘাতপূর্ণ। অন্যদিকে তারা প্রথম দিকে ফিলিস্তিনের আরবদের সাথে যতোটা সম্পর্কিত ছিলো ধীরে ধীরে ততোটাই তারা ইসরাইলমুখী হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে তারা আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। ফাদওয়া তুওকান, ইউসুফ আল খাতীব, মাঈন বাসীসু, সামীহ আল কাসিম প্রমুখ কবিগণ এই ধারার মধ্যে উলে-খযোগ্য।[৭৬৫] অনেককে শুধু কবিতা লেখার জন্য, তাদের লেখালিখির জন্য জীবন দিতে হয়েছিল। তাদের অন্যতম হলেন, কবি আবদুর রাহীম মাহমুদ, কামাল উদওয়ান, কামাল নাছের, গাসসান কানাফানি। ইজরাইল তাদের সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার জন্য হত্যা করে।

এর বাইরে ফিলিস্তিনে ধর্মের যে ঐতিহাসিক রূপ লক্ষ করা যায় তাকে যেমন লিবারেশেন থিওলজি কিংবা মুক্তির ধর্মতত্ত্ব দিয়ে বোঝা যায় তেমনি ধর্মের উত্তরউপনিবেশিক প্রেক্ষিত থেকেও বিবেচনা

---

[৭৬৫]. আল নাক্কাশ, রজা, *শায়ির আল আরদ আল মুহতাল্লাহ*, ১৯, পৃ. ২০৪।

করা যায়। থিওলজি কিংবা ধর্ম উপনিবেশিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো তেমনি ইজরাইলের জায়োনিস্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। কারণ ফিলিস্তিনে দখলদারিত্ব থেকে শুরু করে সামগ্রিক ব্যবস্থায় যে জায়োনিস্ট মতাদর্শ কাজ করে তার গভীরে রয়েছে যায়োনিজমের ধর্মতাত্ত্বিক প্রকল্প। মূলত নানান দিক থেকে এই প্রকল্পগত বয়ান গড়ে তোলে জায়োনিজম। একদিকে ইজরাইলের মাঠের বাস্তব ও রণকৌশলগত সামরিক তৎপরতা, সামগ্রিক নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম। অপরদিকে তাদের ধারণা, চিন্তা ও মতাদর্শগত নানা পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করা। যার মূল লক্ষ্য পুরনো সব বয়ান, মিথ ও পরম্পরাকে ভেঙ্গে ফেলা। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস বদলে দিয়ে নতুন বয়ান সামনে হাজির করা। কিন্তু পুরো বয়ানের প্রধান উৎস হিব্রু বাইবেল– যেটি ইহুদি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে অধিক পরিচিত। ফিলিস্তিন নামকরণ যেভাবে আদি সম্প্রদায় ক্যানান থেকে সৃষ্টি হয়েছে তার মিথ, ইতিহাস ও সত্য-বাস্তবতা হিব্রু বাইবেল থেকে তৈরি হওয়া উপজাত বয়ানে নীচুতরো এবং অধঃস্তন করে রাখার সব চেষ্টা করা হয়েছে। পুরো ইউরোপ ও পশ্চিম থেকে যে উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটেছে তার মূলে রয়েছে মূলত অপরকে নীচুতরো, অধঃস্তন এবং বশীভূতকরণের চিন্তাগত বীজ। উপনিবেশিক ধারণা ও প্রক্রিয়া মূলত হিব্রু বাইবেলের ভাষ্য থেকে পুনরুৎপাদন করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যসব উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী থেকে কিঞ্চিত ব্যতিক্রম ফিলিস্তিন। কারণ এখানে প্রথমত এখনো উপনিবেশিক প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে। দ্বিতীয়ত ইতিহাসকে তার সত্য থেকে একদিকে বদলে দিয়েছে জায়োনিজম। অপরদিকে এই বদলে দেয়া এবং সার্বিক দাশত্বকরণের প্রক্রিয়াকে ন্যায়সঙ্গত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে ইজরাইল এবং জায়োনিজম। ইজরাইলের প্রতি আমেরিকা এবং ব্রিটিশদের সমর্থন দুইটা ঘটে চলেছে মূলত ভূরাজনৈতিক কারণে। এটা যেমন সত্য, তেমনি জায়োনিজম খ্রিস্টান এবং বাইবেলের ইন্টারেস্টও গ্রহণ করে।[৭৬৬]

ইজরাইলের উপনিবেশিকীকরণের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগ্রাম বিভিন্নভাবে সংঘটিত হয়েছে। বিউপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া প্রতিরোধ লড়াইয়ের অন্যতম। ইজরাইল তার সামগ্রিক উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া কার্যকর করতে পশ্চিমা শক্তির সমর্থন যেমন নিয়েছে তেমনি ধারণাগত ভিত্তি তৈরি করতে তার ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং ধর্মতত্ত্বের কাঠামোও ব্যবহার করেছে। ধর্মতাত্ত্বিক নানান ধারণা থেকে উপনিবেশায়ণ ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তিও প্রতিষ্ঠা করেছে জায়োনিস্ট। কারণ হিব্রু বাইবেল বা ইহুদী ধর্মগ্রন্থগুলো দাবি করেছে ফিলিস্তিন তাদের ঈশ্বরকর্তৃক নির্দেশিত প্রতিশ্রুত ভূমি (প্রমিজড ল্যান্ড)। যেখানে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের উচ্ছেদ, খুন-হত্যা কিংবা বৃহদর্থে নির্মূলকরণে ঈশ্বরের নির্দেশের দোহাই প্রধান ধারণাগত কিংবা ন্যায্যতার উপজীব্য হিসেবে কাজ করে। বিপরীত দিক থেকে ফিলিস্তিনীদের বিউপনিবেশায়ন চিন্তা ও তৎপরতা নাকবা পরবর্তী পরিস্থিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সার্বিক দিক থেকে যায়োজিমের উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া এবং তার ধর্মতাত্ত্বিক প্রকল্প প্রতিরোধে পাল্টা গণধর্মতাত্ত্বিক প্রতিরোধ সংগ্রাম জরুরি হয়ে ওঠে। ফিলিস্তিনী ইতিহাস বিশ্লেষক নূর মাসালহা

---

[৭৬৬]. মাসালহা, নূর ও লিসা ইশারউড, *ইনট্রোডাকশন*, পৃ. xv। নূর মাসালহা, *রিডিংগ দ্য বাইবেল উইথ দি আইস অব ফিলিস্তিনস, ক্যানানাইটস, এন্ড অ্যামালেকাইটস: ম্যাসিয়ানিক জায়োনিজম, জিলোটোক্র্যাসি, দ্য মিলিটারিস্ট ট্রাডিশনস অব দ্য তানাখ এন্ড দি প্যালেস্টাইনিয়ানস* (১৯৬৭ টু গাজা ২০১৩)— নূর মাসালহা ও লিসা ইশারউড সম্পাদিত *থিওলজিস অব লিবারেশন ইন প্যালেস্টাইন-ইজরাইল: ইন্ডিজেনাস, কন্টেক্সচুয়াল, এন্ড পোস্ট কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভ*, ২০১৪, পৃ. ৬১।

এটাকে ফিলিস্তিনীদের *সিভিল থিওলজি* হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৭৬৭] ফিলিস্তিনে এ ধরনের সিভিল থিওলজি গড়ে তোলায় যে কজন প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অন্যতম একজন মাহমুদ দারভীশ। সিভিল থিওলজির মূল বক্তব্য হলো, ধর্মীয় ধারা এবং সেকুলার ধারার মাঝে বাইনারী অবস্থান এবং বিরোধাত্মক নীতি পরিহার করা। মোটকথা গণসংস্কৃতিতে চর্চিত ধর্মীয় রীতি ও মূল্যবোধে গুরুত্বারোপ করা। অন্যকথায় এমন একটি গণসংস্কৃতির উত্তরণ ঘটানো যেখানে বিদ্যমান ধর্মীয় এবং সেকুলার ধারাগুলো নিজেদের মতাদর্শিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও যায়োনিজমের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় গণপ্রতিরোধ প্রক্রিয়া জারি রাখতে পারে। দারভীশ এর জন্য দুহাত ভরে ফিলিস্তিনে বিদ্যমান প্রতিটি ধর্মীয় ধারা থেকে লিবারেশন থিওলজির বিপুল উপজীব্য গ্রহণ করেন। ফিলিস্তিনের আদি অধিবাসী ক্যানান থেকে শুরু করে ইসলাম পর্যন্ত প্রত্যেক ধারায় সমৃদ্ধ তার চিন্তা ও কবিতা। তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল এবং কোরআন থেকে গ্রহণে তার কবিতা ও চিন্তা সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুনধারা নির্মাণে পথিকৃতের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়। নূর মাসালহা বলেন, দারভীশ পবিত্র কোরআন থেকে, বাইবেল থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন যাতে দারভীশ তার প্রতিরোধের ভাষা কিংবা প্রতিরোধকে তার কবিতার মধ্যদিয়ে আরো গতিশীল করে তোলেন। বিশেষত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দারভীশ ইসলামী ঐতিহ্য এবং কোরআন থেকে বিপুল পরিমাণ রসদ সংগ্রহ করেছেন।[৭৬৮]

লিবারেশন থিওলজির বাইরে এধরনের গণসংস্কৃতির দিক থেকে প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত গড়ে তোলেন দারভীশ। যেখানে বৃহত্তর ফিলিস্তিনে ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্মীয় ধারার বাইরে দারভীশ তার কবিতায় ব্যাপকভাবে ইসলামী উপাদান নিয়ে আসেন। নিয়ে আসেন নবী মুহাম্মদ স. এবং কোরআনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত।

আল কুদস

আল কুদস। বিভিন্ন নামে এর প্রচার রয়েছে। আল বায়ত আল মোকাদ্দাস, আল মোকাদ্দাস, আল মাসজিদ আল আকছা, জেরুজালেম ইত্যাদি। তবে আরববিশ্বে আল কুদসের প্রচলন সবচেয়ে বেশি। মূলত আল কুদস– আরবী ভাষায় জেরুজালেম শব্দের সমার্থক। আল কুদসকে হিব্রু ভাষায় يِروشَالَيم (*Yerushaláyim*) ইওরুসালায়ম বলা হয়। ইওরুসালায়ম থেকে ইংরেজিতে Jerusalem। ইংরেজি অনুসরণ করে বাংলায় জেরুজালেম বলা হয়। আল কুদস বা জেরুজালেম ভূমধ্যসাগর এবং মৃতসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। পবিত্র নগরী হিসেবে এটি সমাদৃত।[৭৬৯] আল কুদস ফিলিস্তিনের আদি অস্তিত্বের স্মারক। আল কুদসের সাথে জড়িয়ে আছে ফিলিস্তিনের ভৌগলিক প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিকতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। আল কুদস মানেই ফিলিস্তিনের আত্মা। ফিলিস্তিন এবং আল কুদস এক এবং অবিভাজ্য সত্তা। ফিলিস্তিনের সামগ্রিক এবং জাতীয় পরিচয় আল কুদস। আল কুদসভিন্ন ফিলিস্তিনকে কল্পনা

৭৬৭.

৭৬৮

৭৬৯

করা যায়না যেন। ফিলিস্তিন যে সভ্যতাগত বিকাশের মধ্যদিয়ে বিবর্তিত এবং উন্নীত হয়েছে তার গভীরে রয়েছে আল কুদস। আল কুদসের কারণেই ফিলিস্তিন অনন্য হয়ে আছে পৃথিবীর ইতিহাসে। কিন্তু এই আলকুদসের ইতিহাস খুব সহজ এবং মসৃণ নয়। বহিঃশত্রুর রক্তচক্ষু দ্বারা আল কুদস বহুবার আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ফিলিস্তিনের জনগণ জীবন দিয়ে তাকে রক্ষাও করেছে। জেরুজালেমকে রক্ষার সাথে ফিলিস্তিনের চলমান প্রতিরোধ আন্দোলনের সম্পর্ক গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের নানাবিধ পরিবর্তনের সাথে রয়েছে এর নিবিড় সম্পর্ক। ফলে আল কুদস নিছক একটি পবিত্র নগরী কিংবা মসজিদ এর নাম নয়, হাজার বছর ধরে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে অদম্য সাহসেরও প্রতীক। আল কুদসকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনে অসংখ্য স্মৃতি, মিথপুরাণ ও লোকগাথার প্রচলন রয়েছে। ফিলিস্তিনের কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, লোককাহিনী, সাহিত্য-চলচ্চিত্রে বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আলকুদস। শুধু ফিলিস্তিনের সাহিত্যেই নয়, পুরো আরববিশ্বের সাহিত্যে উঠে এসেছে আলকুদস বা জেরুজালেম। তবে মাহমুদ দারভীশের কবিতায় আল কুদস এসেছে ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয়, ঐতিহাসিকতা এবং লড়াই-সংগ্রাম ও প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে।

আলকুদসের সাথে যেমন সুদীর্ঘ ইতিহাসের নানান চিহ্ন লেগে আছে তেমনি শত নবী-রসূলের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে আলকুদস। প্রায় তিন হাজার বছর আগে প্রতিষ্ঠার পর জেরুজালেমকে প্রথম আঘাত করে প্রাচীন ক্যানান জাতির একটি শাখা গোত্র। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রাচীন আশুরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং পারস্য জাতি আঘাত হানে তার শরীরে। গ্রিক, রোমান ও বাইজান্টাইনদের দ্বারাও আক্রান্ত হয় জেরুজালেম। যার পবিত্র শরীর এসব ধ্বংসাত্মক হাতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। তদুপরি অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে টিকে থাকে জেরুজালেম। সর্বশেষ রোমান বাইজান্টাইনদের হাত থেকে ৬৩৮ খ্রি. হযরত উমর রা জেরুজালেমকে মুক্ত করেন। উমাইয়্যা, আব্বাসী শাসকরা জেরুজালেমের রক্ষণাবেক্ষণে আরো গুরুত্বপূর্ণ পালন করেন। পরবর্তীকালে ১০৯৯ সালে ইউরোপীয় খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের হামলায় আবারো বেদখল হয়ে পড়ে জেরুজালেম। যেখানে তারা মসজিদে আকসার প্রাঙ্গনে প্রায় ৩০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। ১১৮৭ খ্রি. ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ করে সালাহ উদ্দিন আইয়্যুবি জেরুজালেমকে পুনরায় দখলমুক্ত করেন। দীর্ঘকাল জেরুজালেম মুসলমানদের হেফাজতে থাকার পর ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার ফলাফল হিসেবে ইহুদী-জায়োনিস্টদের কবলে চলে যাওয়ার পটভূমি রচনা হয়। ১৯৪৮ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধের মাধ্যমে আলকুদসের কিছু অংশ দখল করে নেয় ইজরাইলী বাহিনী। এরপর ১৯৬৭ সালের তৃতীয় আরব-ইজরাইল যুদ্ধে প্রায় পুরোটাই দখল করে ইজরাইল। কিন্তু ফিলিস্তিনের মুসলমান জনগোষ্ঠী এখনো ইজরাইলের সাথে লড়াই অব্যাহত রেখেছে আলকুদসকে ইজরাইলের হাত থেকে মুক্ত করতে।

দারভীশ আলকুদসের ইতিহাসের সাথে নবীদের জীবন ও তাদের দর্শন তুলে ধরেন। দারভীশ মনে করেন, আলকুদসকে কেন্দ্র করে এখানে যেমন নবীরা এসেছেন লড়াই-সংগ্রামের বার্তা নিয়ে তেমনি

তারা বিলিয়ে গেছেন শান্তি ও ভালোবাসার বাণি। একইসাথে আলকুদস জ্ঞান, ভাষার বিশুদ্ধতা এবং আধ্যাত্মিক চর্চার প্রতীক। কারণ এখানেই রচিত হয়েছে পবিত্র মিরাজের ঘটনা। তবে দারভীশের কবিতায় আলকুদস অন্যঅর্থে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রতিরোধ লড়াইয়ের অনন্ত প্রেরণার উৎস হিসেবে দারভীশ তার কবিতায় আলকুদসকে অভিষিক্ত করেন। আলকুদস যেমন ফিলিস্তিনের আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত তেমনি তার সাথে রয়েছে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ঐতিহ্য। কারণ জায়োনিস্ট দখলদারিত্বের মধ্যে থেকে তাকে দেখতে হয়েছে ফিলিস্তিনী জনগণের অন্তহীন ট্রাজেডিক জীবনপ্রবাহ– যেখানে ফিলিস্তিনের সুখ-সমৃদ্ধি, আনন্দ ও ভালোবাসার মুহূর্তগুলো যায়োনিজমের হানাদারী প্রক্রিয়ায় রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতিতে পরিণত হয়।

وكنت وحيداً
ومثليَ كان وحيداً هو المستحيل
أنا ساعة الصفر دقَّتْ
فشقَّت
خلايا الفراغ على سرج هذا الحصان
المحاصر بين المياه
أنا ساعة الصفر
جئت أقول :
أحاصرهم قاتلاً أو قتيل
أعدُّ لهم ما استطعتُ...وينشقُّ في جثتي قمرُ المرحلهْ
وأمتشق المقصلهْ
أحاصرهم : قاتلاً أو قتيل[770]

আমি ছিলাম একা
আমার মতো সে ছিল একা যা বস্তুত অসম্ভব
আমি শূন্যমুহূর্ত যা বেজে ওঠে
অতঃপর পানিতে আটকে পড়ে ঘোড়ার জিনের উপর
শূন্যতার মুহূর্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে ওঠে
আমি শূন্যমুহূর্ত।
আমি শুধু এসেছি বলতে–
অবরোধ করে ফেলো তাদের খুনী হয়ে অথবা খুন হয়ে
সাধ্যমতো তাদের সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হও
যখন আমার লাশের ভিতর খণ্ডিত হয়ে যায় মঞ্চের চাঁদ
আমি ছিনে নিয়ে যাই শিরোচ্ছেদ করার যন্ত্র
অবরোধ করে ফেলো তাদের

৭৭০. দারভীশ, মাহমুদ, আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা-২, ২০০৫, পৃ. ১৯২।

খুনী হয়ে কিংবা খুন হয়ে

أورشليم ! التي أخذتْ شكل زيتونةٍ
داميهْ...
صار جلدي حذاء
للأساطير والأنبياء
بابلي أنت . طوبى لمن جاور الليلة الآتيهْ
وأنا فيكِ أقرب
من بكاء الشبابيك . طوبى
لإمام المغنّين في الليلة الماضيهْ
وإمامُ المغنّين كان . وجسمي كائن
وأنا فيك كوكب
يسقط البُعْد في ليل بابل
وصليبي يقاتل...
هلّلويا..
هلّلويا...[৭৭১].

জেরুজালেম ! যে ধারণ করতো রক্তাক্ত জলপাইয়ের রূপ
আমার চামড়া হয়ে গেছে পৌরাণিক এবং নবীদের জুতা
ব্যাবিলন আমার তুমি। আসন্ন রজনীর কাছাকাছি যিনি, সুসংবাদ
তার জন্য। জানালার কান্নার চেয়েও কাছাকাছি আমি তোমার ভিতর
বিগত রাত্রির প্রধান গায়কের জন্য সুসংবাদ। সে ছিল মূল গায়ক
এবং আমার দেহ এক সত্তা। তবু আমি তোমার ভিতর এক নক্ষত্র
ঝরে পড়ে ব্যাবিলনের রাত্রিতে দূরে বহুদূরে
যখন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে আমার ক্রুশ
ঈশ্বরের প্রশংসায়...
ঈশ্বরের প্রশংসায়...

---

[৭৭১]. দারভীশ, *মাহমুদ*, *আল দীওয়ান: আল আ'মাল আল উ'লা*-১, ২০০৫, পৃ. ৩০৪।

উপসংহার

বক্ষমান অভিসন্দর্ভে শিরোনাম অনুযায়ী মাহমুদ দারভীশের কবিতায় প্রধানত দুটি বিষয় যুক্ত রয়েছে। একটি ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি-চেতনা। অপরটি গণপ্রতিরোধের স্বরূপ। এ দুটি বিষয় পর্যালোচনার উদ্দেশ্য হলো, বস্তুত দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি-চেতনা এবং গণপ্রতিরোধের স্বরূপ উন্মোচন করা। আলোচনা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে আরো বেশকিছু বিষয় তার সাথে বেরিয়ে এসেছে। আর তা হলো, ফিলিস্তিনের ইতিহাস, নাকবা, আত্মপরিচয়, জাতীয়তা, উত্তর-উপনিবেশিকতা, মুক্তি বিষয়ক বিতর্ক, বিপ্লব, ভাষা, ইতিহাস ও ধর্ম ইত্যাদি।

ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি-চেতনার উৎস, রূপ ও প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে আসে। নাকবা, ইতিহাস ও জাতিসত্তা। ১৯৪৮ সালে ইজরাইলী হামলা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, দখল, বিতাড়ন ও উচ্ছেদের ফলে পুরো জনগোষ্ঠীতে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। এ বিপর্যয়ের ফলে পুরো জাতি সার্বিকভাবে ভেঙে পড়ে। একটি সময় তারা এ অবস্থা থেকে বেরিয়েও আসতে শুরু করে। তারা পুনরায় লড়াই শুরু করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি কিভাবে তারা সঞ্চার করলো? বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে আসে। সামগ্রিক বিপর্যয়ের যে ঘটনা ঘটে ৪৮ সালে, তারা এটাকে নিছক একটি ঘটনা হিসেবে আর দেখতে চায়নি। তাদের কাছে নাকবাই মূলত পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবার কিংবা আবার উজ্জীবিত হওয়ার মূল উৎস হয়ে ওঠে। নাকবা অতিদ্রুত তাদের মধ্যে একটি সংগঠিত চিন্তা ও ধারণা আকারে বিকশিত হয়। এখান থেকে তাদের মাঝে জাতিগত চেতনার উন্মেষ ঘটে। ফলে নাকবার মধ্যে তাদের জাতিসত্তার বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে। নাকবা তাদের জাতীয় চেতনার সূতিকাগার হয়ে ওঠে।

জাতিসত্তার প্রথম দাবি হলো পরিচয়। বা জাতীয় পরিচয় গঠন। এ পরিচয় গঠন করতে গিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ফিলিস্তিনকে উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতিতে সবথেকে বড় সংকট হয়ে ওঠে পরিচয়ের সংকট। একইসাথে পরিচয়ের সংকট ঐতিহাসিকভাবেও মোকাবেলা করতে হয়। ফলে অনুসন্ধান করে দেখা যায়, ফিলিস্তিনকে নিজের ইতিহাসের প্রাচীনত্ব কিংবা আদি শিকড়ের হদিস নিয়ে বিতর্কের মুখোমুখী হতে হয়। যে ভূমিতে ফিলিস্তিন নিজের অধিকার দাবি করে তার প্রমাণ ও মানদণ্ড কি? যাতে ফিলিস্তিনকে ইজরাইলের বিপরীতে কিংবা ইজরাইলের দখলদারিত্ব ও বসতিস্থাপন ন্যায়সঙ্গত নয়–এমন দাবির যৌক্তিকতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়? ফিলিস্তিন তার ঐতিহাসিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে তার আদি বসতি ও প্রাচীনত্ব প্রমাণের মাধ্যমে।

ফলে উত্তর-উপনিবেশিক পরিস্থিতি এবং প্রথম বসতি বিতর্কের মধ্যদিয়ে নিজের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফিলিস্তিন নিজের পরিচয় নির্ধারণে এগিয়ে যায়। পরিচয় সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে ফিলিস্তিনে জাতীয় মুক্তির একটি প্রক্রিয়া ও সূত্র উন্মোচিত হয়। মুক্তি এবং মুক্তির চৈতন্য গঠনের এই প্রাক অবস্থার নাম

হলো জাতীয় কর্তাসত্তা কিংবা কর্তৃত্ববোধের উদ্বোধন ঘটানো। কারণ কর্তাসত্তা গড়ে না উঠলে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রক্রিয়া শুরু করাই সম্ভব নয়। কর্তাসত্তা গড়ে না উঠলে মুক্তির জন্য লড়াই করাও মুশকিল। ফলে শেষপর্যন্ত মুক্তির সম্ভাবনার জন্য প্রয়োজন মুক্তিসংগ্রাম। মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই সংগ্রাম ত্বরান্বিত হয় তার মধ্যদিয়েই মুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। মুক্তির ধারণা ও লড়াইয়ে নানাবিধ জটিলতা তৈরি হয়। যুদ্ধ কিংবা শান্তি বিতর্ক। দারভীশ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য বস্তুত জনগণের ইচ্ছার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। ফলে দেখা যায়, মুক্তির জন্য মুক্তি চেতনা, জাতিসত্তা, জাতীয় চৈতন্য ও জাতীয় পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এবং রাজনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীনতাকে মানুষের সর্বাতত্মক জীবনবোধ হিসেবে রূপান্তরিত করার সাথে সামগ্রিক মুক্তির সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, দারভীশ মুক্তি চেতনাকে শুধু রাজনৈতিক অর্থের মধ্যে সীমিত রাখেননি। বরং মানুষের আত্মিক ও বৈষয়িক অর্থাৎ সব অর্থেই মুক্তির ধারণা ও চৈতন্য গড়ে তোলেন।

গবেষণা অনুসন্ধানে দেখা যায়, ফিলিস্তিনে প্রতিরোধ শুধু রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে সীমিত নয়। প্রতিরোধকে দারভীশ একটি জীবন প্রক্রিয়া বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। যেকারণে প্রতিরোধ অনেক বড় পরিসরের কিংবা সামগ্রিক একটি ব্যবস্থার নাম হয়ে ওঠে প্রতিরোধ। ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ, কৃষি, ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি– মোটকথা সকল ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বস্তুত গবেষণায় একটি সর্বাত্মক প্রতিরোধের ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখনপর্যন্ত যেসব গবেষণার হদিস পাওয়া গেছে, তাতে শুধু 'প্রতিরোধ'র ধারণা আলোচিত হয়েছে। 'গণপ্রতিরোধ'– এমন বর্গ আকারে দারভীশের কবিতার কোনো গবেষণা চোখে পড়েনি। গবেষণার শুরু করার আগে 'গণপ্রতিরোধ' বর্গটি একটি পূর্বানুমান ছিল। তবে এ গবেষণায় বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে দেখা যায়, দারভীশের প্রতিরোধ বস্তুত গণপ্রতিরোধ।

পরিশেষে বলা যায়, দারভীশের কবিতায় ফিলিস্তিনের জাতীয় মুক্তি-চেতনা ও গণপ্রতিরোধের স্বরূপ সামগ্রিকভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী/Bibliography

বাংলা

আজম, মোহাম্মদ, *মিখাইল বাখতিন: যাপিত জীবন, ভাষা ও উপন্যাস* (ঢাকা: প্রকৃতি, ২০২৩)।

আরিওন, ইসফানদিয়র, *জমজমাট গায়েবানার হাজিরায়: মাহমউদ দারউইশের দুটো দীর্ঘকবিতার আরবী থেকে বাঙলায়ন, ভূমিকা ও টীকা* (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯)।

ইনাম-উল-হক, মুহাম্মদ, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭০৭-১৯৪৭)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, সং: ২য়, ২০০৩ খ্রি.)।

খান, সলিমুল্লাহ, *ভাষা দেশ মৃত্যু: মাহমুদ দারবিশ-এর আকার সাকার নিরাকার, মাহমুদ দারবিশ: পাঠ ও বিবেচনা*—ভূমিকা ও সম্পাদনা: শরীফ আতিক-উজ-জামান (ঢাকা: সংবেদ, ২০১০ খ্রি.)।

গুহ, রনজিৎ, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*—গৌতম ভদ্র ও পার্থ চ্যাটার্জি সম্পাদিত *নিম্নবর্গের ইতিহাস* থেকে (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮ খ্রি.)।

রহমান, সাইদুর ও মুহাম্মদ সিদ্দিক, *ইসরাইল ও মুসলিম জাহান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৪০।

হোসেন, শাহাদাৎ, *মাহমুদ দারভীশের কবিতাঃ ভাব ও বিষয় অনুষঙ্গ* (আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: মাস্টার্স থিসিস, ২০০৮ খ্রি.)।

<u>عربي</u>

القرآن، سورة بني إسرْائيل، آية:1.

البخاري، محمد بن إسماعيل، *صحيح البخاري*، عدد الحديث: 3176.

أحمد القططي، أريج، *فلسطين في مجلة المنار الصادرة في مصر (1898 - 1940م)* (غزة: مكتب النائب الرئيس للبحث العلمي والدراسات العليا، الجامعة الإسلاميةغزة، 2015)

أنطون، سنان، النقد الرمزي لاتفاق اوسلو عند محمود درويش (بيروت: مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد ،13 العدد 51 صيف 2002).

إبن كثير، *البداية والنهاية* (بيروت: المجلد الأول، بيت الأفكار الدولية 2004).

درويش بين هوية اللغة ولغة الهوية في المرحلة الأخيرة من تجربته الشعرية
إشتية، معاذ،
(مجلة المجمع، العدد: 13، 2018).

أبو شرار، ابتسام موسي عبد الكريم، *التناص الديني و التاريخي في شعر محمود درويش* (فلسطين: قسم اللغة العربية، جامعة الخليل،2007).

أ د. محمد عيسي و غيداء يونس، الرمز الأسطوري و فنيته في شعر محمود درويش (سورية: مجلة جامعة حماة، المجلد الرابع، العدد الثاني عشر، 2021).

أدونس، الشعرية العربية (بيروت: دار الأدب، 1985).

البهنسي، د. العفيف، *تاريخ فلسطين القديم من خلال علم الآثار* (دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، سورية، 2009).

بلقزيز، عبد الإله، *هكذا تكلّم محمود درويش: دراسات في ذكرى رحيله* (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009).

بوعلام، علي، جماليات *التكرار و آلياته في التماسك النصي قصيدة مديح الظل العالي* (الجزائر: قسم اللغة والأدب العربي، جامعة وهران، 2017).

بلغني، محمد إقبال، *العنف في شعر محمود درويش : دراسة في ضوء علم النفس* (إندونسيا: قسم اللغة العربية وأدابها، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، 2016).

بن ربيعة العامري، لبيد، *ديوان لبيد بن ربيعة العامري* (بيروت: دار صادر، 1999).

بن العبد، طرفة، *ديوان طرفة بن العبد*- شرح و تقديم- مهدي محمد ناصر الدين (بيروت: دار الكتب العلمية، 2002).

بولحبال، خديجة، وكريمة حبري، تجليات الرمز الأسطوري عند محمود درويش في ديوانه "لماذا تركت الحصان واحدا" (الجزائر: قسم اللغة والأدب العربي، جامعة أم البواقي، 2017).

جبر أبو عريبان، حامد محمد، *لبيد بن ربيعة حياته و شعره* (القاهرة: جامعة الأزهر، 1977).
بدة زهرة

جوادة مروة و بدة زهرة، جماليات *التناص في شعر محمود درويش: قراءة في نماذج* (الجزائر: قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2020).

الجبر، خالد عبد الرؤوف، رمز العنقاء في شعر محمود درويش (عمان: مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، 2012).

حماد، نجيب، *الأيديولوجيا السياسية في شعرمحمود درويش: دراسة نماذج شعرية* (الجزائر: قسم اللغة والأدب العربي، جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي، 2021).

خان، ظفر الإسلام، *تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي حتي آخرغزو صليبي* (1220 ق.م—1359 م) (بيروت: دار النفائس، ط.:3، 1981)

الخير، هاني، محمود *درويش رحلة عمر في دروب الشعر موسوعة آلام الشعر العربي الحديث* (دمشق: مؤسسة علاء الدين للنشر والتوزيع، 2005).

خوري، جيزيل، *حوار مع محمود درويش عن السياسة والشعر وتجربة الموت* (مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، المجلد: 12، العدد: 48، خريف 2001).

الخوري، إلياس، *الهزيمة والنكبة المستمرة* (البيروت: مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، العدد: 111، الصيف 2017).

خوري، إلياس، *الذاكرة المفقودة : دراسة نقدية* (بيروت: دارالأداب، 1982).

ديب السلطان، محمد فؤاد، صورة النكبة في شعر محمود درويش (غزة: مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الأول، قسم اللغة العربية، جامعة الأقصى، 2002).

درة، علي حسين، *التاريخ الحضاري للدولة الحمدانية في حلب* (بيروت: قسم التاريخ، جامعة بيروت العربية، 2016).

درويش، محمود،
الديوان: الأعمال الأولي-1 ((بيروت: رياض الرئيس للكتب و النشر، 2005).

الديوان: الأعمال الأولي-2 (بيروت: رياض الرئيس للكتب و النشر، 2005).

الديوان: الأعمال الأولي-3 (بيروت: رياض الرئيس للكتب و النشر، 2005).

الأعمال الكاملة (مصر: منتدي المكتبة الإسكندرية، 2011).

سرير الغريبة (1995)

آثر الفراشة (2008).

أحد عشر كوكبا (بيروت: دارالجديد، 1992).

حالة الحصار (2002).

جدارية (2000).

خطب الدكتاتورالموزونة (2013).

شيئ عن الوطن (1971).

عصافير بلا أجنحة (بيروت: دار العودة، 1960).

عابرون في كلام عابر (أردن: الأهلية للنشروالتوزيع، ٢٠١٦).

في حضرة الغياب (٢٠٠٦)

في وصف حالتنا (بيروت: دار الكلمة، 1987).

كزهر اللوز أو أبعد (2005).

لا تعتذر عما فعلت (2004).

لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي (2009).

لماذا تركت الحصان وحيدا (بيروت: رياض الرئيس للكتب و النشر،

مديح الظل العالي (بيروت: دار العودة، 1984)

محمود درويش-سميح القاسم، الرسائل (بيروت: دار العودة، ١٩٩

وداعا أيها الحرب وداعا أيها السلام (بيروت: دارالأهلية للنشر والتوزيع، 1974)

راشد، د. فائض، *خمسون عاما علي نكبة* (دمشق: اتحد كتاب العرب، 1999)

رحام، الشريف، *سيميائية العنوانة في قصائد محمود درويش* (دمشق: القسم

العربي، الجامعة دمشق، 2018).

الربح، زميت، *سيميائية العنوانة في شعر محمود درويش* (الجزائر: قسم اللغة والأدب العربي، جامعة المسيلة، 2013).

زريق، قسطنطين، معني النكبة (بيروت: دار العلم للملايين، 1948).

زريق، قسطنطين، معني النكبة مجددا (بيروت: دار العلم للملايين، 1967).

سعيد، جلال الدين، *معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية* (تونس: دارالجنوب للنشر، 1994).

السلطان، د. محمد فؤاد، الرموز التاريخية والدينية والأسطورية في شعر محمود درويش (الفلسطين: مجلة جامعة الأقصى، المجلد الرابع عشر، العدد الأول، يناير 2010).

الشيخ، عبد الرحيم، *متلازمة محمود درويش (11): الفكرة، الثورة، الدولة* (بيروت: مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، العدد: 125، الشتاء 2021).

الشنقيطي، أحمد بن الأمني، *المعلقات العشر وأخبار شعرئها* (الإينغليند: الناشر مؤسسة هنداوي سي آي س، 2018).

صالح، د. محسن محمد، *القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة* (مركزالزيتونة للدراسات والانتشارات، 2012).

الطراونة، د. عماد عبده، *حكاية محمود درويش في أرض الكلام* (بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 2016).

عباس، إحسان، ألشعر في الفلسطين حتي العام 1967(دمشق: الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد الرابع، هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1983).

عراف، شكري، *المواقع الجغرافية في فلسطين: الأسماء العربية و التسميات العبرية* (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2004).

العربي، عميش، محمود درويش خيمة الشعر الفلسطيني (الجزائر: ألفا للوثائق، 2014).

عزم، أحمد جميل، *الشباب الفلسطيني من الحركة إلى الحراك (1908-2018)* (فلسطين: المركزالفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، 2019).

العادل، د. الأسطة، *ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية و أبحاث أخري* (نابلس: منشورات الدارالوطنية للترجمة والطباعة والنشروالتوزيع، 1996).

عيسي الشعار، سلطان، الزمن في شعر محمود درويش (أردن: قسم اللغة العربية، جامعة مؤتة، 2011).

الفاخوري، حنا، *تاريخ الأدب العربي* (بيروت: منشورات المكتبة البولسية، 1953).

القاسم، سميح، ديوان سميح القاسم (بيروت: دار العودة، 1987)

قهوجي، حبيب، *القصة الكاملة لحركة الأرض* (القدس: منشورات العربي، 1978).

القيس، إمرؤ، *ديوان إمرؤالقيس*: اعتناء و شرح-عبد الدرحمن المصطاوي (بيروت: دار المعرفة، 2004).

كنفاني، غسان، أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966(بيروت: دار منشورات الرمال، 1966).

كامل، السوافيري، *الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين: من سنة 1900 الى سنة 1960* (القاهرة: مطابع سجل عرب، 1985).

الكيالي، سامي، *سيف الدولة و عصر الحمدانيين* (حلب: المكتبة الحديثة، 1939).

المدلل، د. وليد حسن، و د. عدنان عبد الرحمن أبو عامر، *دراسات في القضية الفلسطينية* (غزة: جامعة ألمة للتعليم المفتوح، 2013).

المعري، أبو العلاء، *اللزوميات –المجلد الأول*- التشريح: أمين عبد الزيز الخانجي (بيروت: مكتبة الهلا، 2010).

المتنبي، *ديوان المتنبي* (بيروت: دار بيروت للطباعة و النشر، 1983).

مونسي، د. حبيب، فلسفة المكان في الشعر العربي: قراءة موضوعاتية جمالية (دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 2001).

محجز، خضر، الأدب الفلسطيني في نظرية غزة: مكتبة المكتبة، 2010).
الأدب والنقد (

النقاش، رجاء، *محمود درويش: شاعر الأرض المحتلة* (القاهرة: دار الهلال، 1971).

، شاكر، *مجنون التراب: مجنون التراب: دراسة في شعر وفكر محمود* النابلسي *درويش* (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1987).

وازن، عبده، *محمود درويش: ولدت على دفعات* (فلسطين: الكرمل، العدد: 86، شتاء 2006).

هلال، جميل، *تكوين النخبة الفلسطينية منذ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية إلي ما بعد قيام السلطة الوطنية* (رام الله: مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2002).

يوسف اليوسف، *التوجيه إلي بيان المقاومة* (بيروت: الاختبار، 2008).

يعقوب، الدكتور ناصر، *قصيدة القناع: قراءة في قصيدة "رحلة المتنبي إلى مصر"* (دمشق: مجلة جامعة دمشق، المجلد: 24، العدد: الثالث+الرابع، 2008).

English

A H S M Alenzi, Suad, *"I am neither there, nor here": An Analysis of Formulations of Post-Colonial Identity in the Work of Edward W. Said and Mahmoud Darwish A Thematic and Stylistic Analy"tical Approach* (Manchester: School of Arts, Languages and Cultures, University of Manchester, 2015).

Ashcroft, Bill , Gareth Griffiths and Helen Tiffin, *Post-Colonial Studies: The Key Concepts* (London: Routledge, 2000).

Alnajjar, Abeer, *YHWH's Othering of Israel (Dublin:Department of Near and Middle Eastern Studies,* (Norway: University of Oslo, 2014).

A Sayegh, Fayez, Zonist Colonialism In Palestine (Beirut: Research cntre, Palestine Liberation Organisation, 1965).

Ajmal Khan, Muhammad, Cultural Memory and Exilic Perspective on Home and Identity: A Historico-Literary Analysis of Mahmoud Darwish's Works (Islamabad: Department of English, International Islamic University Islamabad, 2018).

Abu Eid, Muna , *Mahmoud Darwish: Literature and the Politics of Palestinian Identity* (London: I.B.Tauris, 2016).

Appendix C, Annex: Palestinian Declaration of independence by Antoon, Sinan, *Mahmud Darwish's Allegorical Critique of Oslo* (Beirut: Journal of Palestine Studies, Vol: 31 No.: 2, Winter 2002).

Awad Ibrahim, Abdul Aattar , *Ambiguity in Poetry: Definition, Function and Elements* (Iraqi Academic Scientific Journal, No. 72, 2008).

Aurora, Simone, *Territory and Subjectivity: the Philosophical Nomadism of Deleuze and Canetti* (minerva, An Online Open Access Journal of Philosophy, Volume 18, November 2014).
Assadi, Jamal &Mahmud Naamneh, *Maḥmud Darwīsh: A Revived Sufi or a Sufi Reviver* (Council for Innovative Research, Journal of Advances in Humanities, Vol. 3, No. 1, August 22 , 2014).

A Nicolson, Reynold, A literary history of the Arabs (London: T fisher, Unwin, Adelphy Terus, 1970).

Abu Sitta, Salman, *Mapping My Return: A Palestinian Memoir* (Cairo: The American University in Cairo Press, 2016).

Anderson, Benedict, *Imagined Communities; Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso Books, 2016).

A. Hamdan, Marwan, *Mahmoud Darwishe's Voicing Poetics of Resistance: A Receptionist Review* (International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 6, No. 10, October 2016).

Abed Al-hakim Salah, Ameerah, *Jerusalem in Poetry: A Comparative Study of the Palestinian Mahmoud Darwish, the Israeli Yehuda Amichai and the English William Blake* (Jordan: Department of English Language and Literatur, Middle East University, 2018).

Agamben, Giorgio, *The Time That Remains: A commentary On The Letter to Romans*—Translated his Original (Italian) *Il tempo che resta. Un commento alfa Lettera ai Romani*—by Bollati Boringhieri (California: Stanford University Press, 2005).

Al Salem, Mohd Nour, *The Translation Of Metaphor From Arabic To English In Selected Poems Of Mahmoud Darwish With A Focus On*

Linguistic Issues (England: school of languages, Cultures and Societies, University of Leeds, August 2014).

Ateek, Naim Stifan, A Palestinian, Theology of Liberation: The Bible, Justice And The Palestine-Israel Conflict (New York: Orbis Books, 2017).
Ateek, Naim, *Reflections on Sabeel's Liberation Theology and Ecumenical Work (1992–2013)—From The Zionist Bible Biblical Precedent, Colonialism and the Erasure of Memory*—Edited by Nur Masalha and Lisa Isherwood (London: The Lutterworth Press, 2014).

Ahmed Naser, Mu'tasem, *JERUSALEM MUNICIPALITY AND POLITICAL CONFLICT: 1918-194*2 (International Journal of History and Philosophical Research , Vol.4, No.1, March 2016).

Ali, Zarefa, *A Narration Without an End: Palestine and the Continuing Nakba* (Birzeit: The Ibrahim Abu-Lughod Institute of International Studies, Birzeit University, 2013).

Bakhtin, Mikhail, *The Dialogic Imagination*—Translated his Original (Russ) *Вопросы литературы и естетиќи (Voprosy literatury i estetiki*—by Caryl Emarson and michael holquist (Texas: The University Texas Press, 1981).

Benjamin, Walter, *On Violence*—from *walter benjamin: selected writings, vol. 1, 1913-1926* (USA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1996).

Bel, Daniel, *The theory Of The Mass Society: A Critique* (USA: Commentary, Vol. 22, July 1956).

Bakhtin, Mikhail, *Problems of Dostoyevsky's Poetics*—Translated his Original (Russ) *Проблемы поэтики Достоевского , problemy poetiki*

Dostoevskogo—by Caryl Emarson (Minnesota: University Of Minnesota Press, 1984).

Bakhtin, Mikhail, *The Dialogic Imagination*—Translated his Original (Russ) *Вопросы литературы и естетиĸи (Voprosy literatury i estetiki*—by Caryl Emarson and michael holquist (Texas: The University Texas Press, 1981).

Becker, Jillian, *the PLO: The Rise and Fall of the Palestine Liberation Organization* (New York: St. Martin's Press, 1984).

Bhabha, Homi K. *Locations of Culture* (London: Routledge, 1994).
B. Young, Eugene, Gary Genosko and Janell Watson, *The Deleuze and Guattari Dictionary* (London: Blooms Bury, 2013).

Ben Zid, Mounir, *Mahmoud Darwish's Poetics of Desire: Visions and Revisions* (Asian Journal of Social Sciences & Humanities Vol. 3(3), August 2014).

B. Qumsiyeh,, Mazin, *Popular Resistance in Palestine A History of Hope and Empowerment* (London: Pluto Press, 2011).

Beinin, Joel, *Forgetfulness For Memory: The Limits Of The New Israeli History* (Beirut: Journal of Palestine Studies Vol. XXXIV, No. 2, Winter 2005).

Boda, J. Mark, *Figuring the Future: The Prophets and Messiah*—from *The Messiah in the Old and New Testaments*—Edited by Stanley E. Porter (Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2007).

Benjamin, Walter, *Illumination*—Translated from his original *(German) Illuminationen*—by Harry Zohn (New York: Schockenbooks, 1968).

Benjamin, Andrew (Edited), *Walter Benjamin and History* (London: Continuum, 2005).

Benjamin, Walter, *The Arcades Project*—Translated from his Original (German) *das passagen-werk*—by Howard Eilend and Kevin Mclaughlin (UK: Harvard University Press, 1999).

Barthes, Roland, Image Music Text Essays selected and translated by Stephen Heath (London:Fontana Press, 1977).
Butler, Judith *What Shall We Do Without Exile?: "Said and Darwish Address the Future"* (Alif: Journal of Comparative Poetics, American University in Cairo Press, No. 32, 2012).

Barthes, Roland, Mythologies (New York: The Noonday Press , 1972).

C. Harrison, Olivia, *Transcolonial Maghreb: Imagining Palestine in the Era of Decolonization* (California: Stanford University Press, 2016).

Cobban, Helena, *The Palestinian Liberation Organisation: People, Power and Politics* (United Kingdom: Cambridge University press, 1984).

Cheng, Vennes: *The concept of constellation* (Online Research Publisher academia.edu).

Cohen, Stanley, Daphna Golan, *The Interrogation of Palestinians During the Intifada: Follow-up to March 1991 B'Tselem Report* (BTSELEM: The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, 1992).

Critchley, Simon, *Deconstruction and Pragmatism: Is Derrida a Private Ironist or a Public Liberal?*—from *Deconstruction of Pragmatism*—edited by Chantal Mouffe (London: Routledge, 1996).

Chouraqui, Frank, *The Body and Embodiment A Philosophical Guid*e (New York: Rowman & Littlefield, 2021).

Doumani, Beshara, Rediscovering Palestine Merchants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900 (Berkeley: University of California press,1995).

Dussel, Enrique, *Philosophy of Liberation—Translated from his Spanish Origina*l—*Filosofía de la Liberación* by Aquilina Martinez (New York: Orbis Books, 1985).

Dictionary of the Israeli Palestinian Conflict: Culture, History and Politics A-Z—Editors (USA: Thomson Gale, 2005).

Dunning,Tristan, *Hamas, Jihad and Popular Legitimacy: Reinterpreting resistance in Palestine* (London: Routledge, 2016).

Deleuze, Gilles, *Difference and Repetition*—Translated from his Original (French)—*Difference et Repetition* by Paui Patton (New York : Columbia University Press, 1994).

Deleuze, Gilles, *Felix Guattari, A thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*—Translated from his Original (French) *Mille plateaux, v. 2 of Capitalisme et Schizophrenic*—by Brian Massumi (London: University of Minnesota Press, 1987).

Danelius, Hans, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (United Nations, United Nations Audiovisual Library of International Law, 2008.).

Da'na, Tariq, *Disconnecting Civil Society from Its Historical Extension: NGOs and Neoliberalism in Palestine* (2014). (PDF) Disconnecting Civil Society from its Historical Extension: NGOs and Neoliberalism in Palestine (researchgate.net)

Darwish, Mahmoud, *Why Did You Leave The Alone*—Translated From His Original (Arabic) *Limaja Taraktu Al-Hisan Wahida*—By Shaheen, Mohammad (London: Hesperus Press Ltd,2014).

Darwish, Mahmoud, *Exile Is So Strong Within Me, I May Bring It To The Land*—Interview Conducted By Helit Yeshurun (Beirut: Journal of Palestine Studies Vol. XLII, No. 1, Autumn 2012).

Dyer, Rebecca, *Poetry of Politics and Mourning: Mahmoud Darwish's Genre-Transforming Tribute to Edward W. Said* (the modern language association of America, V. 122, N: 5, 2007).
Darwish, Mahmoud, In The Presence Of Absence—*Translated from His Original (Aabic) Fee Hadrat Al-Giab—by Sinan Antoon* (New York: Archipelago Books, 2011).

Derrida, Jacques, *Specters of Marx*—Translated From His Original (French) *Spectres de Marx—by* Peggy Kamuf (New York: Routledge,1994).

Edited by Wm. Roger Louis University of Texas at Austin Avi Shlaim University of Oxford, The 1967 Arab-Israeli War Origins and Consequences.

Elizabeth King, Mary, *Palestine: Nonviolent Resistance in the Struggle for Statehood, 1920s–2012*—from *Recovering Nonviolent History Civil Resistance in Liberation Struggles*—Editor: Maciej Bartkowski (USA: Lynne Renner Publisher, 2013).

Erica Mena, *The Geography of Poetry: Mahmoud Darwish and Postnational Identity* (Usa: Human Architecture: Journal Of The Sociology Of Self-Knowledge, Vol. 7, Issue. 5, Article 27. 2009).

Fanon, Frantz, *The Wretched of the Earth*—Translated from French Original—*Les damnés de la terre* by Richard Philcox (New York: Grove Press, 2004).

Fanon, Frantz, *Black Skin, White Masks*—Translated From His Original (French) *Peau Noire, Masques Blanc*—by Charles Lam Markmann (London: Pluto Press, 1986).

Fisher, Mark, *The Metaphysics of Crackle: Afrofuturism and Hauntology* (Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Culture 5(2), 2013).

Foucault, Michel, *The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language*—Translated from his Original (French) *L'Archeologie du Savoir* and *L'ordre du discours—by* A. M. Sheridan Smith (New York: Pantheon Books, 1972).

Farisani, Elelwani, *The Israelites in Palestine during the Babylonian Exile* (Old Testament Essays (OTE), Pretoria, 21/1, 2008).

Fried, Isaac, *Poetics of Exile in Darwish and Kafka* (Poetics and literature Seminar, Spring 2019).

Freire, Paulo, *Pedagogy of the Oppressed*—Translated from his Original (Brazilian)*Pedagogia del oprimido*—by Myra Bergman Ramos (New York: Continuum, 1970).

Flores-Rodríguez, Daynali, *Language Power and Resistance: Re-Reading Fanon in a Trans-Caribbean Context* (The Black Scholar, Volume: 42, No. 3-4, Fall-Winter 2012).

Ghanim, Hunaida, *Yaffa Met (J) Yaffa : Intersections Between the Holocaust and The Nakba in the Shadow of the Zionism—from The Holocaust and the Nakba: A New Grammar of Trauma and Historyby*

Edited Bashir Bashir, Amos Goldberg (New York: Colombia University Pres, 2019).

Gilbert, Helen and Joanne Tompkins, *Post-Colonial Drama: Theory, practice, politics* (London: Routledge, 1996).

Gramsci, Antonio, *Selections from the Prison Notebooks*—Translated from his original (Italian) *Quaderni del carcere*—by *Quentin* Hoare and Geoffrey Nowell Smith (London: Elec-book, Lawrence & Wishart, 1999).

Guney, Ajda and Guney Kaan, *A Brief Description of Jacques Derrida's Deconstruction and Hermeneutics* (Journal of New World Sciences Academy, Volume: 3, Number: 2, 2008).

Gutierrez, Gustavo, *Theology Of Liberation History, Politics, and Salvation*—Translated from his original (Latin American) *Teologia de la liberacion* by Sister Caridad Inda and John Eagleson (New York: Orbis Books, 1973).

Halbwach, Maurice, On Collective memory—*Translated from his original (French) les cadres sociaux de la memoire—by* Lewis A. Coser (Chicago: University of Chicago Press, 1992).

Hamade, Joyce, *The Construction of Palestinian Identity: Hamas and Islamic Fundamentalism* (Montreal: Institute of Islamic Studies, Mcgill University, 2002).

H. Sa'di, Ahmad, Lila Abu-Lughod (Edited), Nakba Palestine, 1948, and the Claims of Memory (New York: Columbia University Press, 2007).

Herzl, Theodor , *The Jewish State*—Translated from the German *Der Judenstaa* by Sylvie D'Avigdor (United State: The American Zionist Emergency Council, 1946).

Hammami, Rema, On (not) Suffering at the Checkpoint; Palestinian Narrative Strategies of Surviving Israel's Carceral Geography (Australia: Borderlands Journal, Volume: 14, Number:1, 2015).

Heidegger, Martin, *Poetry, Language, Thought—Translated by* Albert Hofstadter (New York: Harper Collins Publishers Inc., 1971).

Harlow, Barbara, *Resistance Literature* (New York: Methuen, 1987).

Heidegger, Martin, Being And Time—*Translated from his Original (German) Sein und Zeitby—by* John Macquarrie & Edward Robinson (USA: Blackwell, 1962).

Heidel, Alexander, *The Gilgamesh Epic And Old Testament Parallel* (USA: Chicago University Press, 1946).

H. Ellis, Marc, *Theologies of Liberation in Palestine-Israel and the Struggle for Peace and Justic*e—*From The Zionist Bible Biblical Precedent, Colonialism and the Erasure of Memory*—Edited by Nur Masalha and Lisa Isherwood (London: The Lutterworth Press, 2014).

H. Yahya, Adel, *Looting and 'Salvaging': How the Wall, illegal digging and the antiquities trade are ravaging Palestinian cultural heritage* (Jerusalem Quarterly, Issue: 33, Winter 2008).

Hooks, Bell, *Tklking Back*—from *Out There: Marglnalization and Contemporary Cultures*—Edited by Editors (Massachusetts: The MIT Press, 1990).

Izak, Cornelius, *The Many Faces of the Goddess: The Iconography of the Syro-Palestinian Goddesses Anat, Astarte, Qedeshet, and Asherah C. 1500-1000 BCE* (Switzerland: Academic Press Fribourg, 2004).

I. BITAR, Samir, Language, Identity, and Arab Nationalism: Case Study of Palestine (London: Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), Routledge, 2011).

Itzhaki, Masha, Sobhi Boustani, *The concept of the Other in Contemporary Palestinian and Israeli Poetry* (Cambridge: The Routeledge Handbook of Muslim-Jewish relations, 2016).

Ibrahim Banat, Bassam Yousef, Hasan Yahya, Bashir Ahmad, Fadwa Halabiyah, *Popular Beliefs in the Palestinian Society: An Analytic Study* (Open Journal of Social Sciences, August 2022).

Issa, Abdel Khaleq, Abdel Karim Daragmeh, *Aspects of Intertextuality in Mahmoud Darwish's Poetry Collection "Do Not Apologize for what you have Done*" (International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), Volume 6, Issue 2, February 2018,).
Jacobson, Roberta Steinfeld, *Liberation Theology as A Revolutionary Ideology In Latin America* (USA: The Fletcher Forum, No. 2, Summer 1986).

Jacques Derrida: Key Concepts—Edited by Claire Colebrook (London: Routledge, 2015).
J. Fassberg, Teddy , *The Greek Death of Imru᾽ al-Qays* (Journal of the American Oriental Society 140.2, 2020).

Jasinski, Jems, *Heteroglossia, Polyphony, and the Federalist Papers* (Rhetoric Society Quarterly, Vol. 27, No. 1, Winter 1997).

Karl, Kerényi, *The Gods of the Greeks* (England: Thames and Hudson,1951).

Khoury, Nadim, *National narratives and the Oslo peace process: How peacebuilding paradigms address conflicts over history* (Oslo, Nations and Nationalism, ASEN/John Wiley & Sons, 2016).

Kobler , Franz, *The Vision Was There, A History of the British Movement for the Restoration of the Jews to Palestine* (London: online edition: https://www.britam.org/vision/Kobler.pdf, 1956).

Kristeva, Julia, *Word, Dialogue and Novel*—from The Kristeva Reader—edited byT. Moi (New York: Basil Blackwell, 1986).

Klimowicz, Teresa (Lublin), *Giorgio Agamben and the Concept of Messianism*—from *Jews Studies: Almanach*—Edited (New York: Jews Institute of History, Taoro College, 2017).

Khalidi, Rashid, Remembering mahmoud Darwish (1941-2008) (Beirut: journal of Palestine studies, Vol. 38, N. 1, October 2008).

Khalidi, Walid, (Edited) *From Haven To Conquest Readings in Zionism and the Palestine Problem until 1948* (Beirut The Institute For Palestine Studies, 1971).

Khuri, Elias, Forward—The Holocaust and the Nakb: A New Grammar of Trauma and History by Edited Bashir Bashir, Amos Goldberg (New York: Colombia University Pres, 2019).

Kelly, Matthew Kraig, *Crime in the Mandate: British and Zionist criminological discourse and Arab nationalist agitation in Palestine, 1936-39* (Los Angeles: University of California, 2013).

Le Goff, Jacques, *History and Memory* (New York: Colombia University press, 1992).

Loomba, Ania, Colonialism Postcolonialism: The New Critical Idiom (London: Routledge, 1998).

Lefkowitz, Benjamin, *Emunism: Rethinking the Ideology of Messianic Religious Zionism* (USA: Social College of Studies, Wesleyan University, 2020).

Ludden, David, *A Brief History of Subalternity—from Reading Subaltern Studies*—by Ludden, David (New York: Anthem Press, 2002).

Masalha, Nur, *A Four Thousand Year History* (London: Zeed Books, 2018).
Masalha, Nur, *The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the Subaltern, Reclaiming Memory* (London & New York: Zed Books, 2012).

Masalha, Nur, *Expulsion of the Palestinians: The Concept of "Transfer" in Zionist Political Thought 1882-1948* (Washington D.C.: The Institute for Palestine Studies, 1992).

Masalha, Nur, *60 Years after the Nakba: Historical Truth, Collective Memory and Ethical Obligations* (Japan: Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-1, July 2019).

Moh'd Saleh, Dr.Mohsen, *The Palestinian Issue Historical Background and Contemporary Developments*—Translated from the Arabic *القضية الفلسطينية: خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة*—by Karim Traboulsi and Marilyn Chbeir (Beirut: Al-Zaytouna Centre for Studies and Consultations, 2014)

Morris, Benny, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1999 (New York: Vintage Books, 2001).

Morris, Benny, *The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

Makkawi, Ibrahim, *Teaching Colonial History and National Identity Development Among Palestinian Students in Israel: Resisting Colonization through Student Activism* (Argentina: CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2017).

Mattawa, Khaled , *When the Poet Is a Stranger: Poetry and Agency in Tagore, Walcott, and Darwish* (North Carolina: Department of English, Duke University, 2009).

Muhawi, Ibraim, Memory for Forgetfulness August, Beirut, 1982—Translated from the Arabic Book of Mahmoud Darwish—ذاكرة للنسيان (California: University of California press, 1995).

Muhawi, Ibrahim, *Journal of an Ordinary Grief*—Translated from Mahmoud Darwish's Original (Arabic)—*Yawmiyaat Al-Hujn Al-aadee* (New York: Archipelago Books 2010)

Malla, Mohammad, Spinoza's Concept of God: Modern Interpretations (). https://www.atlantis-press.com/proceedings/iccessh-22/125979034
Mahfoodh, Hajar, *The Poetry of Darwish in the 1960s: Homeland and Exile* (AWEJ for Translation & Literary Studies, Volume 5, Number3. August 2021).

Mumayiz, *Ibrahim, Imruʾ al-Qays and Byzantium* (Journal of Arabic Literature, Vol. 36, No. 2, 2005).

Moqbel Al Areqi, Rashad Mohammed , *Home, Homeliness and Search for Identity in Mohmoud Darwish's Poetry* (International Journal of English Language Teaching, Vol: 1, No:1, 2014).

Marchadour, Alain, David Neuhaus, *The land, the Bible, and History: Toward the land that I will Show You* (New York: Fordham University Press, 2007).

Meari, Lena, *Sumud: A Palestinian Philosophy of Confrontation in Colonial Prisons* (USA: The south Atlantic Quarterly, Vol. 113, No. 3, Summer 2014).

Moriel Schoifild, Josefine, *A Critique of the Concept of Mass Society* (Canada: The Universitty og british combia press, 1971).

Marx, Karl and Frederick Engels, *Manifesto of the Communist Party*—Translated From Original German *Manifest der Kommunistischen Partei—by* Samuel Moore (Moscow: Progress Publishers,1888).

M. J. Halabi, Aya, *Translation and the Intertextual Space: The Translation of Religious, Historical and Mythical Allusions in the Poetry of Mahmoud Darwish* (Nablus: Department of Linguistics and Translation, An-Najah National University, 2016).

Najjar, Abeer, *Othering the Self: Palestinians Narrating the War on Gaza in the Social Media* (Sharjah: American University of Sharja, January 2009).

N. Shklar, Judith, *After Utopia: The Decline of Political Faith* (Princeton Legacy Library, 2103).

Nisan, Mordechai, Religious, Cultural And Rhetorical Aspects In Palestinian Strategy—from *Israel And Palestine State: zero sum Gam*e—edited by Arieh Stav (Israel: ACPR Publisher, 2011).

M. Jami, Adil, *Mahmoud Darwish and Joy Harjo: Cosmic Consciousness* (Arab World English Journal (AWEJ), Volume3, Number3. August 2019).

Nelson, Cary, Rachel S. Herris and Keneth W. Stein, *A Concise History of Israel: The history of Israel*—from *The Case against Academic Boycotts of Israel*—Edited By Nelson, Cary and Gabriel Noah Brahm

(Chicago: MLA Members for Scholers Rights, Chicago State University Press, 2015).

Nora, Pierre , *Between Memory and History: Les Lieux de Memoire* (Representations, Special Issue: Memory and Counter-Memory, No. 26, Spring, 1989).

Ottman, E T, *A question of historiography: the "New Historians" of Israel* (Ritsumeikan Annual Review of International Studies, Vol.7, 2008).

Pappe, Ilan, *A History of Modern Psalestine* (Cambridge: 2006Cambridge University Press, 2006).

Pearlman,Wendy, *The Palestinian National Movement*—from *The 1967 Arab-Israeli War Origins and Consequences*—Edited by Wm. Roger Louis, Avi Shlaim (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

Pratheebaa, E., *New Historicism in The Select Poems Of Stephen Gill And Mahmoud Darwish* (India: Department of English, Madurai Kamaraj University, July 2020).

R. Fischel, Jack, *Historical Dictionary of the Holocaust: Historical Dictionaries of War, Revolution, and Civil Unrest, No. 42* (Toronto: The Scarecrow Press, 2010).

R. Witte, Oliver, *Inflammatory and Conciliatory Rhetoric in the Arab-Israeli Conflict: A Content Analysis of How Three Newspapers Covered Two Provocative Events* (Chicago: Graduate School, Southern Illinois University Carbondale, 2013).

Raheb, Mitri, Biblical Narrative and Palestinian Identity in Mahmoud Darwish's Writings—from Palestinian Identity in Relation to Time and Space—edited by Mitri Raheb (USA: Deer Publisher,).

Ross, Alison, *Revolution and History in Walter Benjamin: A Conceptual Analysis* (London: Routledge, 2019).

Reigeluth, Stuart, *Memory and Resistance A Literary Perspective of Palestinian Existence* (Lebanon: Center for Arab and Middle Eastern Studies, American University of beirut, June 2005).

Rijke, Alexandra & Toine van Teeffelen, *To Exist Is to Resist: Sumud, Heroism, and the Everyday* (Jerusalem Quarterly, Issue: 59, 2014).

Sepinwall, Alyssa Goldstein, *Napoleon, French Jews, and the Idea of Regeneration* (United State: CCAR (Central Conference of American Rabbis) Journal, No: 54, Winter 2007).

Segev, Tom, *One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate* (London: Abacus, 2001).

Sheehia, Lara and Stephen Sheeh, *Enactments of otherness and searching for a third space in the Palestine-Israel matrix* (Washington: Macmillan Publishers, 2016).

Suleiman, Yasir, *The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology* (Scotland: Edinburgh University Press, 2013).

Suleiman,Yasir, *Arabic in the Fray Language Ideology and Cultural Politics* (Scotland: Edinburgh University Press Ltd, 2013).

Suleiman,Yasir, *Arabic, Self and Identity: A Study On Conflict and Displacement* (Scotland: Edinburgh University Press Ltd, 2013).

Sapir, Edward, *Culture, Language, and Personality* (Berkeley: University of California Press, 1949).

Silverman, Netanel Haim, *Rereading Identity Cards: The Early Anticolonial Poetics of Mahmoud Darwish and their Hebrew Afterlives* (Canada: University of Toronto, 2019).

Shlaim, Avi, *The Iron Wall: Israel And The Arab World* (New York: W. W. Norton & Company, 2014).

Subaltern Studies: Writings On Asian History And Society—Edited by Ranjit Guho (UK: Oxford University Press, 1982).

Spivak, Gayatri Chakravorty, *Can The Subaltern Speak?*—from *Can The Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea*—edited by Rosalind C. Morris (New York: Colombia University Press, 2010).

Shamir, Shimon, *History of the Arabs in the Middle East in Modern Times* ().

Tawfiq Yousef, Aseel Abu Al-Rub, *The Subaltern in Some Selected Poems by Mahmoud Darwish* (USA: Cultural and Religious Studies, David Publishing Company, Vol. 4, No. 5, May 2016).

Tamar, Mebuki, *The Role of Intellectual Relation In Cultural Tradition* (Poland: Journal Of Literacy Research, Vol. 5 (2), 2014).
Torture and Ill-Treatment Israel's Interrogation of Palestinians from the Occupied Territories—Human Rights Watch/Middle East (New York: Human Rights Watch, 1994).

Twafiq Mohammad, Abdel Karim, "And we are now of Clay and Light": History, Myth, and the Palestinian National Memory in Mahmud Darwish's Poetry (International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol. 2 No. 3, May 2012).

Unsok Ro, Johannes, *Memory and History: An Introduction* (Germany: De Gruyter, 2021).

W. Said, Edward, *The End of The Peace Process: Oslo and After* (New York, Vintage Books, 2001).

W. Said, Edward, *On Mahmoud Darwish* (New York: Jean Stein, Grand Street, No: 48, Oblivion, Winter, 1994).

W. Said, Edward, *Afterword: the consequences of 1948*—from *The War for Palestine Rewriting the History of 1948, Edited by* Eugene L. Rogan and Avi Shlaim (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

W. Said, Edward, The Question of Palestine (New York: Times Books, 1980).

W. Said, Edward, *The Orientalism* (London: Penguin,2003).

W. Said, Edward, *Reflections on Exile: and Other Literary and Cultural Essays* (London: Granata, 2000).

W. Said, Edward, *Reflections on Exile: and Other Essays* (Harvard: Harvard University Press, 2003).

Windt-val, Benedicta, *Personal name and identity in literary contex*t (Oslo Studies in Language 4(2), 2012.).

Yahya al-Udhari, Abdullah Ali, *Jahili Poetry Before Imru' Al-Qais* (Michigan: Pro Quest LLC, 2017).

Yablonka, Hanna, *Survivors of the Holocaust Israel after the War* (Israel: Ben-Gurian University of the Negev, 1999).

Web Sites

عادل الأسطة

«أدب العائدين: محمود درويش «حيرة العائد

أدب العائدين: محمود درويش «حيرة العائد» - عادل الأسطة (al-ayyam.ps)

الإنتفاضة في شعر الوطن المحتل

تحميل كتاب الإنتفاضة في شعر الوطن المحتل PDF - مكتبة نور (noor-book.com)

توفيق زياد

https://www.aldiwan.net/poem11565.html

توظيف الأسطورة في شعر محمود درويش

توظيف الأسطورة في شعر محمود درويش - Google Search

تخليص الشعر مما ليس شعرا ,عادل الأسطة

تخليص الشعر مما ليس شعراً - ديوان العرب (diwanalarab.com)

عادل الأسطة - ديوان العرب (diwanalarab.com)

تطوُّر مفهوم الهُويّة في شعر محمود درويش د. نبيل طنوس

تطوُّر مفهوم الهُويّة في شعر محمود درويش.... د. نبيل طنوس (alwasattoday.com)

خليل إبراهيم، علي حد السيف: دراسة في أدب الانتفاضة الفلسطينية في الداخل

https://al-adab.com/volume/1991-v.39/01-03

مزن أتاسي

جدليّة الزمان والمكان في شعر محمود درويش

مجلة الكلمة - جدليّة الزمان والمكان في شعر محمود درويش (alkalimah.net)

د. آمال موسى، الخبز أكثر من الورد

الخبز أكثر من الورد (aawsat.com)

إبراهيم ابراش

الدولة الفلسطينية في المواثيق الوطنية
إبراهيم ابراش - الدولة الفلسطينية في المواثيق الوطنية (ahewar.org)

عزيزة علي
درويش التقط الوجدان الجَمْعي للأمّة وحول الشعر إلى قوّة وطنية وثقافية
درويش التقط الوجدان الجَمْعي للأمّة وحول الشعر إلى قوّة وطنية وثقافية - جريدة الغد (alghad.com),

سيرين سعدي مصطفى جبر، الانتفاضة في الأدب الشعبي الفلسطيني في شمال فلسطين
file:///G:/res/intifada_folk_literature%20(1).pdf

عباس بيضون يحاور محمود درويش: لو أعدت كتابة دواويني لاكتفيت بخمسة
عباس بيضون يحاور محمود درويش: لو أعدت كتابة دواويني - IraqWriters.com لاكتفيت بخمسة (iraqiwriters.com)

أ ـ د لميس حيدر
"غواية الذاكرة والصمود في قصيدة درويش "كم مرّة ينتهي أمرنا
مجلة أوراق ثقافية - "كم مرّة ينتهي أمرنا"غواية الذاكرة والصمود في قصيدة درويش (awraqthaqafya.com)

فدوى طوقان
https://www.arabicnadwah.com/arabpoets/madinati-fadwah.htm

فلسطين عربية منذ استوطنها الكنعانيون
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/e4329d51-7068-476f-ad78-89cd700baf96

قراءة انتبائية في الحركة الأدبية في فلسطين
http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1147

د.عادل الأسطة، لو أن الأنبياء أقل إلحاحا
http://hashm.logu2.com/montada-f7/topic-t105.htm

لست حاكيا ولا مراسلا حربيا للقضية الفلسطينيّة
محمود درويش : حاورته : رشأ التونسي
https://www.turess.com/echaab/5995

د. عادل الأسطة، لو أن الأنبياء أقل إلحاحاً : وقفة مع محمود درويش في جداريته
لو أن الأنبياء أقل إلحاحاً وقفة مع محمود درويش في جداريته [الأرشيـــف] - أخوية (akhawia.net)
محمود درويش، القربان
Alcarmel (alkarmel.org)

محمود-درويش
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/20/محمود-درويش

محمود درويش يهدي ريع (حالة حصار) للانتفاضة
محمود درويش يهدي ريع (حالة حصار) للانتفاضة | أخبار ثقافة | الجزيرة نت (aljazeera.net)

محمود درويش: السيرة الذاتية
السيرة الذاتية (mahmouddarwish.ps)

محمود درويش: سجل انا عربي
تحميل كتاب سجل انا عربي pdf - مكتبة نور (noor-book.com)

محمود درويش ومراحله الشعرية - أ . د. عادل الأسطة
محمود درويش ومراحله الشعرية | الأنطولوجيا - أ . د. عادل الأسطة (alantologia.com)
https://www.alkhaleej./ملحق/قرأة-في-أحد-عشر-كوكبا-للشاعر-محمود-درويش

حكيم عنكر
محمود درويش: شعري تعرض للكثير من القراءات المغرضة .. وهناك إفراط في التأويل السياسي لقصيدتي
ملفات شخصية محمود درويش (jehat.com)

الدكتوعلي القيم
محمود درويش: سجل! أنا عربي

(noor-book.com) مكتبة نور - pdf تحميل كتاب سجل انا عربي

عادل الأسطة
محمود درويش، والمتنبي وإمرؤ القيس و أبو تمام
(yumpu.com) ؤ القيس وأبو تمام وأمر المتنبي محمود درويش و

محمود درويش في ديوانه الجديد: «لا تعتذر عما فعلت»تناص مع النفس والآخر وعذاب في شهوة الايقاع
تورس : محمود درويش في ديوانه الجديد: «لا تعتذر عما فعلت»تناص مع النفس والآخر (turess.com) وعذاب في شهوة الايقاع

ولدت علي دفعات|عبده وازن
AlKarmel Issue 86
(laghoo.com) حوار مع درويش / عبده وازن

English

Abbas: Palestinians sorry for backing Saddam
Abbas: Palestinians sorry for backing Saddam (nbcnews.com)

Adam Chandler, The Legacy of Mahmoud Darwish
Remembering Palestinian Poet Mahmoud Darwish On The Five-Year Anniversary Of His Death - Tablet Magazine

Alona Ferber
When the Palestinian National Poet Fell in Love With a Jew
When the Palestinian National Poet Fell in Love With a Jew - Jewish World - Haaretz.com

Aziz Ali Dad, A Guide to Subaltern Studies' Critique of Orientalism
A Guide to Subaltern Studies' Critique of Orientalism (postcolonial.net)

Benedicta Windt-Val, Personal Names And Identity in Literary Contexts
View of Personal Names and Identity in Literary Contexts (uio.no),

Britannica
Golgotha | Definition, In the Bible, Meaning, Map, & Facts | Britannica

Council Establishment
Council Establishment (palestinepnc.org)

Dr. Ovamir Anjum and Dr. Omar Suleiman, The Palestinian Struggle Through the Prophetic Lens
The Palestinian Struggle Through the Prophetic Lens | Yaqeen Institute for Islamic Research

Dalia Karpel, Return of the 'Modest Poet'
Return of the 'Modest Poet' - Haaretz Com - Haaretz.com

Edward Said On Palestinian Identity: a Conversation with Salman Rushdie
Edward Said, On Palestinian Identity: A Conversation with Salman Rushdie, NLR I/160, November–December 1986 (newleftreview.org)

*Fawzy_Al-Ghadiry, The_History_Of_Palestine._A_study_*
https://www.academia.edu/3358305/

George D. Moffett III
Israeli left finds words, like stones, can hurt
Israeli left finds words, like stones, can hurt - CSMonitor.com

Hal Brands, Why Did Saddam Want the Bomb? The Israel Factor and the Iraqi Nuclear Program
Why Did Saddam Want the Bomb? The Israel Factor and the Iraqi Nuclear Program - Foreign Policy Research Institute (fpri.org)

Hobby Lobby funds Israeli settlement archaeology
Hobby Lobby funds Israeli settlement archaeology | Arts and Culture | Al Jazeera

Isaac Fried
Poetics of Exile in kafka and Darwish
(56) Poetics_of_Exile_in_Kafka_and_Darwish | Isaac Fried - Academia.edu

Israel is falsifying Palestinian history and stealing its heritage
Israel is falsifying Palestinian history and stealing its heritage – Middle East Monitor

Isn't it true that Palestine was empty and inhabited by nomadic people
https://www.palestineremembered.com/Acre/Palestine-Remembered/Story414.html#

Dhaka University Institutional Repository

Michael Bakhtin , 'Discourse in Life and Discourse in Art
https://usu.instructure.com/files/56960688/download?download_frd=1

Mohd Farhan, Construction of Home in the poetry of Mahmoud Darwish and Adonis,
(56) Construction of Home in the poetry of Mahmoud Darwish and Adonis | Mohd Farhan - Academia.edu

Palestine and the Palestinians (1948–67)
The partition of Palestine and its aftermath
Palestine - Arab Displacement, Unity, and Nationalism in UNRWA Refugee Camps | Britannica

palestine geography
http://www.ambasciatapalestina.com/en/palestine/geography/

Palestine Liberation Organization (PLO): History & Overview
History & Overview: PLO (jewishvirtuallibrary.org)

Paul Taylor
Palestinian leader Arafat was murdered with polonium: widow
Palestinian leader Arafat was murdered with polonium: widow | Reuters

Release of Crucial Documents on Kafr Qasim's Massacre on its 66th Anniversary – Statement Submitted to the Human Rights Council by Palestinian Return Centre (A/HRC/51/NGO/176)
Release of Crucial Documents on Kafr Qasim's Massacre on its 66th Anniversary - Statement Submitted to the Human Rights Council by Palestinian Return Centre (A/HRC/51/NGO/176) - Question of Palestine

Sinan Antoon "On the Ruins of History" - A Walter Benjamin Moment in Arab Thought?

EUME: "On the Ruins of History" - A Walter Benjamin Moment in Arab Thought? (eume-berlin.de)

The False "Nakba" Narrative
https://besacenter.org/perspectives-papers/nakba-false-narrative/#

The Naksa: How Israel occupied the whole of Palestine in 1967
The Naksa: How Israel occupied the whole of Palestine in 1967 | Features | Al Jazeera

The dictator's speeches,
The dictator's speeches | The Peninsula Qatar

The big reveal: The identity of Mahmoud Darwish's infamous lover "Rita" finally revealed
The big reveal: The identity of Mahmoud Darwish's infamous lover "Rita" finally revealed | Al Bawaba

Yousef Barahmeh
The Poetry of Mahmoud Darwish: A Study of the Three Developmental Phases of his Poetic Career
The Poetry of Mahmoud Darwish: A Study of the Three Developmental Phases of his Poetic Career | Request PDF (researchgate.net)

Yasser Arafat 'may have been poisoned with polonium'
Yasser Arafat 'may have been poisoned with polonium' - BBC News

12th Arab League Summit in Fez - Plan for Palestinian Independence (1982), ECF - Economic Cooperation Foundation: 12th Arab League Summit in Fez - Plan for Palestinian Independence (1982).